Published with the Financial Assistance of Sangeet Natak Academy, New Delhi

যোড়শ বর্ষ
(২০০৬ থেকে নিয়মিত)

TRIPURA THEATRE

Tripura Theatre is indexed in UGC Care List
ত্রিপুরা থিয়েটার ইউজিসি কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভূক্ত

TRIPURA THEATRE

Since 2006
Vol - 16, Issue - 1

ত্রিপুরা থিয়েটার-২০২১

থিয়েটার বিষয়ক নাট্যগ্রন্থ

নাট্যদল ত্রিপুরা থিয়েটার কর্তৃক উপস্থাপিত

ষোড়শ বর্ষ

অক্টোবর- ২০২১

প্রচ্ছদ

অপরেশ পাল, বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী, আগরতলা

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ

মাইক্রো গ্রাফিক্স, আগরতলা

ত্রিপুরা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত

TRIPURA THEATRE

A Journal on Theatre and Performing Arts

A Publication of Tripura Theatre (Drama Group) Agartala

16th Year, October - 2021

UGC Care List Sl. No. 1, Discipline - Art & Humanities

Sub-Arts & Humanities (All), Focus Subject - Visual Arts & Performing Arts

Cover Design - Aparesh Paul, Eminent Artist, Agartala

Type Setting and Printed at :

MICRO GRAPHICS, Mantribari Road, Agartala.

Published by Tripura Theatre

Price ₹. 250.00

(সন্তোষ মার্কেট, ৩৭, আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১,
মার্কেটের শেষ প্রান্তে, ডান দিকে)

সম্পাদক- বিভু ভট্টাচার্য

উপদেষ্টা - শ্রী শুভ্রাংশু চক্রবর্তী

সম্পাদকমন্ডলী

বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য, শেখর সি দত্ত, মিহিরকান্তি ভট্টাচার্য ও কমল মজুমদার

সম্পাদকীয় সহায়তা

পার্থ সেনগুপ্ত ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

দপ্তর - হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা - ৭৯৯০০১ ত্রিপুরা।

ফোন : ৯৪৩৬১২৬৮৪৬/৯৪৩৬৪৫০১৯৩/৯৪৩৬১৩৭৭২৯/৭০০৫১২২৯২৪

mail - bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com

Website : www.tripuratheatre.com

প্রাপ্তিস্থান

ত্রিপুরা থিয়েটার দপ্তর, অক্ষর, বইঘর - আগরতলা,
ধ্যানবিন্দু - কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা

TRIPURA THEATRE

(Santosh Market, 37, Akhaura Road,Agartala - 799001, Tripura,
at the end of the Market and then right side).

Editor - Bibhu Bhattacharjee

Advisor - Sri Subhrangshu Chakraborty, Agartala

Editorial Board

Biprajit Bhattacharjee, Sekhar C Datta, Mihir Kanti Bhattacharjee, Kamal Majumder

Editorial Assistance

Sri Partha Sengupta & Sri Debabrata Mukhopadhyay

Office

Hospital Road Extension Gandhighat, Agartala - 799001, Tripura

Ph. : 09436126846 / 9436450193, 9436137729, 7005122924

Mail - bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com

Website : www.tripuratheatre.com

Available at

TT's Office, Akshar, Boi-Ghar- Agartala,
Dhyanbindu, College Street, Kolkata

আপনি কি জানেন?

ত্রিপুরা রাজ্য সর্বাধিক ভূমিকম্প প্রবন অঞ্চল **জোন-৫** এ অবস্থিত

ভূমিকম্পের সময় জীবন বাঁচাতে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করুন:

যদি আপনি ঘরের ভেতরে থাকেন -

- ভূমিকম্পের সময় টেবিলের বা খাটের নীচে, ঘরের ভিতরের দিকের কর্ণারে, মজবুত দরজার নীচে এবং ঘরের ভিতরে জায়গায় আশ্রয় নিন এবং নিজের মাথাটাকে ঢেকে রাখুন।
- কাঁচের জিনিষ, জানালা, দরজা, অসুরক্ষিত অবস্থায় রাখা জিনিষ (আলমারি, তাক, ছবি, টিউব লাইট, ফ্রিজ এবং অন্যান্য জিনিষপত্র) থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বিছানার উপর থাকলে সেখানেই থাকুন এবং বালিশ দিয়ে মাথাকে ঢেকে রাখুন।
- ভূমিকম্প থামলে পর সোজা খোলা আকাশের নীচে চলে যান।
- ঘর থেকে বাইরে বেরোনোর সময় ধাক্কাধাক্কি বা হুড়োহুড়ি করবেন না।

যদি আপনি বাইরে থাকেন -

- দালান, বড় গাছ, বৈদ্যুতিন পিলার এবং বিদ্যুত পরিবাহী তার থেকে দূরে থাকুন।
- খোলা জায়গায় থাকলে কম্পন থামা পর্যন্ত সেখানেই থাকুন।

যদি চলন্ত গাড়িতে থাকেন -

- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি থামিয়ে শান্তভাবে বসে থাকুন।
- দালান, বড় গাছ, বৈদ্যুতিন পিলার এবং বিদ্যুত পরিবাহী তারের নীচে দাড়াবেন না।
- ভূমিকম্প থামার পর গাড়ি থেকে নেমে খোলা জায়গায় চলে যান।
- ভূমিকম্প থামার পর সাবধানে চলুন। যথাসম্ভব ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা, ব্রীজ এড়িয়ে চলুন।

ভূমিকম্পের কোন পূর্বাভাস পাওয়া যায় না।
তাই, অযথা গুজবে কান দেবেন না এবং গুজব ছড়াবেন না।

☞ ***মনে রাখবেন,*** *আপনার স্বপ্নের বাড়ি তৈরীর পূর্বে ইঞ্জিনিয়ারের বা প্রশিক্ষিত রাজমিস্ত্রির পরামর্শ নিন।*

রাজস্ব দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
জনস্বার্থে প্রচারিত
বিপর্যয়ের পূর্বাভাস জানতে বা জরুরী অবস্থায় যোগাযোগ করুন
রাজ্য নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র-১০৭০ (টোল ফ্রি) / ২৪১৬০৪৫ জেলা নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র-১০৭৭,আবহাওয়া দপ্তর - ২৩৪২২৯৫/২৩৪২২৫৩
Email: seoctripura@gmail.com/scrtripura@gmail.com
Wed site: www.tdma.tripura.gov.in
(সর্বদা সতর্ক ও সজাগ থাকুন, বিপর্যয় থেকে নিজের ও অন্যের জীবনকে রক্ষা করুন।)

সূ চি প ত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
✦ সম্পাদকীয়		৯
✦ শ্রদ্ধায় স্মরণ : চিত্রশিল্পী চিন্ময় রায়	প্রতিবেদক	১০
✦ শ্রদ্ধায় স্মরণ : কবি শঙ্খ ঘোষ	শুভঙ্কর ঘোষ রায়চৌধুরী	১১
✦ শ্রদ্ধায় স্মরণ : স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত	প্রতিবেদক	১২
✦ উৎপল দত্ত'র দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার	পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩ - ২১
✦ সঠিক উচ্চারণ	পবিত্র সরকার	২২ - ২৭
✦ থিয়েটারের বদল ঘটান	রথীন চক্রবর্তী	২৮ - ৩০
✦ তত্ত্ব বনাম নাট্যশালা	সৌমিত্র বসু	৩১ - ৪৩
✦ প্রসঙ্গ নাটকের অনুবাদ	অশেষ গুপ্ত	৪৪ - ৪৮
✦ দিল্লীতে বাংলা নাট্যচর্চা	আদিত্য সেন	৪৯ - ৫২
✦ অজানা বীরসেন	আশিস গোস্বামী	৫৩ - ৬০
✦ শিশু পালাকার অবনীন্দ্রনাথ	অপূর্ব দে	৬১ - ৭২
✦ আমি Macbeth- ম্যাকবেথ Mirror	শান্তনু দাস	৭৩ - ৯২
✦ থিয়েটারে অনুবাদের তত্ত্ব	শুভঙ্কর ঘোষ রায়চৌধুরী	৯৩ - ৯৮
✦ মা তুই ডাইনি বটেক	প্রশান্ত সেনগুপ্ত	৯৯ - ১০২
✦ লোকনাট্যের সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক	নির্মল দাশ	১০৩ - ১১১
✦ অপ্রকাশিত জয় বাংলা নাটক ঃ বিশ্লেষণ	ড. মলয় দেব	১১২ - ১১৯
✦ বাংলা থিয়েটারের প্রতিবাদী কণ্ঠ ও এই সময়	দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২০ - ১২৬
✦ বুদ্ধদেব বসুর নাটক	ড. গৌরাঙ্গ দন্ডপাট	১২৭ - ১৩৫
✦ গণনাট্য সংঘে ভাঙন ও পুনর্গঠন	অর্পণ দাস	১৩৬ - ১৪৪
✦ যাত্রা ও রামকুমার নন্দী মজুমদার	প্রসূন বর্মণ	১৪৫ - ১৫৫
✦ নাট্য ও নৃত্য সম্পর্ক	রত্নদীপ রায়	১৫৬ - ১৬৩
✦ অভিনয় ও বাদ্যযন্ত্র	অভী ঘড়াই	১৬৪ - ১৭১
✦ মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চা ঃ একটি সমীক্ষা	ড. সুবীর ঘোষ	১৭২ - ১৮০
✦ বোলপুরের নাট্যচর্চা ঃ একটি সমীক্ষা	অঙ্কুশ দাস	১৮১ - ১৮৯
✦ প্রবীর গুহ'র নাট্যজীবন	অঙ্কিতা ঘোষ	১৯০ - ১৯৭

English Articles

✦ Reading the theatrical sign: costumes in Shakespeare texts
Abhijit Sen 200 - 213

✦ Contemporary Indian Drama : Exploring Stage Possibilities and Staging Possibilities
Chandra Dasan 214 - 219

✦ Natyagram, a Theatre Laboratory
Subodh Patnaik 220 - 227

✦ On Drama and Theory an Interview with Edward Bond
Dr. Surajit Sen 228 - 234

✦ Theatre of Tripura & Sammilita Natya Prayas : the beginning of a collective dream
Sanjoy Kar 235 - 240

✦ Up-country dance: an aesthetic model of Sri Lankan stage drama
Dhanushka Washeera Salgamuwa 241 - 248

✦ Censorship and Resistance in Nineteenth Century Bengali Theatre
Dr. Sib Sankar Majumder & Dr. Arzuman Ara 249 - 258

✦ Approximating the 'Real' in life and Reality: initiating a Theoretical Comparison between Theatre and the Comic Strip
Archita Gupta 259 - 265

✦ Vaishnav Natya of Manipur : An Overview
Yumlembam Theba Devi, H. Nanikumar Singha 266 - 270

✦ 'What Awful Women Are We'- Reading Establishment, and Violence Against Women in Selected Plays of Mahesh Elkunchwar
Sreetanwi Chakraborty 271 - 278

✦ KartalCholom as a Part of Ritualistic Manipuri Nata-Sankirtana Theatre Performance
Leitanthem Santosh Singh 279 - 288

✦ Presentation of Contemporary City life on the Urban Stage: A Reading of Karnads Boiled Beans on Toast
Devamita Chakraborty 289 - 297

✦ Inter-Generational Negotiation of Post 9/11 Hyphenated Identity of Pakistani Muslim Americans in The Domestic Crusaders and Disgraced
Sabnaj Parvin 298 - 306

নাটক

নাটক	লেখক	পৃষ্ঠা
✦ দেব না তিতুন	কমল রায়চৌধুরী	৩০৯ - ৩৫৫
✦ প্রিয়জন	কুন্তল মুখোপাধ্যায়	৩৫৬ - ৩৭৬
✦ তিতাস একটি নদীর নাম (দ্বিতীয় ভাগ)	প্রবীর গুহ	৩৭৭ - ৪০৮
✦ অনন্ত-র-অপেক্ষা	শিবংকর চক্রবর্তী	৪০৯ - ৪২৬
✦ সুবলের কড়চা	শেখর দেবরায়	৪২৭ - ৪৪১
✦ শ্রুতিনাটক ঃ খেলাঘর	অনুপ রায়	৪৪২ - ৪৫১
✦ খনন কথা	মৈনাক সেনগুপ্ত	৪৫২ - ৪৮৩
✦ স্বপ্নচোর	শ্যামল ভট্টচার্য	৪৮৪ - ৪৯৯
✦ অস্তরাগ	শংকর বসু ঠাকুর	৫০০ - ৫২১
✦ চেক-মেট	সঞ্জয় আচার্য	৫২২ - ৫৩৩
✦ জলই জীবন	মৃণাল দে	৫৩৪ - ৫৪২
✦ নতুন শ্রাবণ	সংগীতা চৌধুরী	৫৪৩ - ৫৬০
✦ প্রি-পেইড হোটেল	পার্থ মজুমদার	৫৬১ - ৫৮০
✦ M.I.G.A *Make India Great Again*	বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য	৫৮১ - ৫৯৯

ত্রিপুরা থিয়েটার

(সন্তোষ মার্কেট, ৩৭, আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১,
মার্কেটের শেষ প্রান্তে, ডান দিকে)
দপ্তর : হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা-৭৯৯০০১: ত্রিপুরা

ত্রিপুরা থিয়েটারের অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বছরে ন্যূনতম একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, সঙ্গে পুরনো, দু'বছরে একবার আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব, বছরে একবার মহালয়ায় নাটকের বই (ত্রিপুরা থিয়েটার) প্রকাশ, সঙ্গে সেমিনার, ওয়ার্কশপ; এই নিয়ে ত্রিপুরা থিয়েটারের পথ চলা,

২০০৬ থেকে নিয়মিত।

আমাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রযোজনা

রচনা ও নির্দেশনা - বিভু ভট্টাচার্য

ধরতী আবা, **নয়া আন্দাজ**, **স্বামী বিবেকানন্দ** (২০১৪ সালে এন এস ডি আয়োজিত ডিব্রুগড়ে পূর্বোত্তর নাট্যোৎসবে যোগদান), **পাণিপথের ৪র্থ যুদ্ধ**, **চক্রব্যূহ**, **কাবুলিওয়ালা** (এনইজেডসিসি আয়োজিত গৌহাটিতে শিল্পগ্রাম উৎসবে যোগদান) **ও কঙ্কাল** (রবীন্দ্র গল্পের নাট্যরূপ), ছোট নাটক **অল্পমধুর** প্রভৃতি।

- চলতি প্রযোজনা -

'বাপুজী' (এনএসডি আয়োজিত প্রাগজ্যোতিষ নাট্যোৎসবে-২০২০, ইটানগরে যোগদান) সঙ্গে **'অলকা'**, **'মতিজানের মেয়েরা'** প্রভৃতি।

নাট্যোৎসব

প্রতি দু বছরে একবার 'বামাপদ মুখোপাধ্যায়' আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব
২০১২ থেকে নিয়মিত (করোনার জন্য ২০২০তে হয়নি)

নাট্যগ্রন্থ প্রকাশনা

বছরে একবার, ২০০৬ থেকে নিয়মিত।

২০২০ সাল থেকে বইটি ইউজিসি কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়।

——— যো গা যো গ ———

হসপিটাল রোড এক্সটেনশন ঃ গান্ধীঘাট ঃ আগরতলা - ৭৯৯০০১ ঃ ত্রিপুরা
ফোন ঃ ০৯৪৩৬১২৬৮৪৬/০৯৪৩৬৪৫০১৯৩
Email-bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com

website : www.tripuratheatre.com

সম্পাদকীয়

আমাদের চারপাশটা কি ক্রমশঃ গুটিয়ে আসছে! গত দেড় বছর ধরে আমরা কি ধীরে ধীরে অত্যন্ত পরিচিত অথচ এক অচেনা বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি? অখন্ড অবসর অথচ প্রকৃত অবকাশ নেই। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রিহার্সাল-রুম মঞ্চ সবই রয়েছে অথচ মুক্ত বাতাস আর আকাশটাই যেন হারিয়ে গেছে, জায়গা করে নিচ্ছে অমানবিক মুখ, প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে!

কিন্তু অতীত তো আমাদের অজানা নয়। আশ্চর্য লাগে যখন ইতিহাস ও সম-সময় অদ্ভুত ভাবে একাত্ম হয়ে ধরা দেয়। ১৮৯৭ সালে ভারতে প্রথম প্লেগের আত্মপ্রকাশ হয় বোম্বাই শহরে এবং ব্রিটিশ সরকার সেই রোগ আটকাতে "এপিডেমিক ডিজিজেস অ্যাক্ট" চালু করে এবং ১২৪ বছরের পুরণো আইনই এখনও আমাদের আইনি হাতিয়ার। আগে ছিল সেগ্রেগেশন ক্যাম্প আর এখন আইসোলেশন ক্যাম্প বা সেফ্ হোম। আগে ছিল নাড়ি টেপা ডাক্তারি আর এখন আরটিপিসিআর। তখনও রোগমুক্তির জন্য দেবতার নামগান করে প্লেগ দূর করার প্রয়াস চলত অবিরাম এখনো ঘরের আলো নিভিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে, কাঁসর ঘন্টা শঙ্খ ধ্বনির মাধ্যমে করোনা জয়ের নিদান, "গো করোনা গো"। তাহলে বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার কালে আমরা কতটা অগ্রসর হতে পারলাম? "কত শব ভেসে গেল নদীবক্ষে। কে পূণ্যার্জন করলো, নদী না ওই হতভাগ্যরা"?

অথচ বিত্তবানেরাতো দিন দিন ফুলে ফেঁপেই উঠছে। বাণিজ্যে তাদের লাভতো গাণিতিক হারেই বাড়ছে। প্লেগ বা করোনা যাই হোক না কেন, কাল নির্বিশেষে সবচেয়ে ব্রাত্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী বছরে সাধারণ ভারতবাসীর এটাই প্রাপ্তি। পুঁজি আরও বেশি বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয়ে সারা বিশ্বকে কয়েকটি বহুজাতিক কর্পোরেটদের মধ্যে ভাগ করে নেয়া, এতো আর কোন নুতন বিষয় নয়। মুনাফার সন্ধানে লাগামহীন ভাবে বন জঙ্গল সাফ করে মানুষই মানুষের ক্ষতি সাধন করছে। স্পষ্ট উদাহরণ ফাদার স্ট্যান স্বামীর আত্মবলিদান। এই অভিমুখ যদি না পাল্টায় কয়েক বছর পর পরই হয়তো নতুন কোন অতিমারী মানব সভ্যতার উপর আঘাত হানবে। আর বিত্তবানেরা ভ্যাক্সিনের নামে বিত্তহীনদের প্রতারণা করেই যাবে। উন্নতির নামে বিত্তবানদের কাছে নিজ দেশের দীর্ঘদিনের অর্জিত সম্পদ বিক্রি হয়ে যাবে আর প্রতিবাদহীনতাকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য নানাভাবে মানুষে মানুষে বিভেদ জিইয়ে রাখা হবে, সেই পুরণো কৌশলইতো নূতন করে চলছে।

তবে হাজার বছর ধরে মানুষ যেমন নানা বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করে এই পৃথিবীতে জীবনধারণ করছে তেমনি বৈচিত্রময় তাঁদের প্রতিরোধের হাতিয়ারও। সেক্ষেত্রে নাটকও ব্যতিক্রম নয় বরং আরো শক্তিশালী।

ইউজিসি তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে এটাই আমাদের প্রথম প্রকাশ। দেশ বিদেশের দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি অধ্যাপক, গবেষক এবং নাট্যক্ষেত্রে বিশিষ্টজনদের লেখায় এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ। সম্মানিত লেখক, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী বিজ্ঞাপনদাতা এবং নাট্যকর্মীদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

বিভু ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধায় স্মরণ

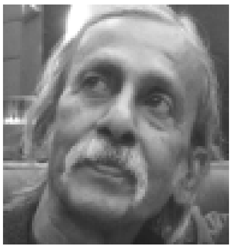

চিত্রশিল্পী চিন্ময় রায়

প্রতিবেদক

ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী চিন্ময় রায় গত ২৭ জুন প্রয়াত হয়েছেন। রাজ্যের সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে তিনি দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২।

আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে পাঠ শেষ করে চিত্রশিল্পে উচ্চাশিক্ষার্থে চলে যান শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে। রামকিঙ্কর বেইজ, বিনোদ বিহারী, দিনকর কৌশিকদের মত বিখ্যাত শিল্পীদের সান্নিধ্যে নিজেকে রঙতুলিতে প্রস্তুত করে চিন্ময় রায় হয়ে উঠেন রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। এছাড়া নৃত্যকলায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। শ্যামা নৃত্যনাট্যে কোটালের চরিত্রে, 'রানার' কবিতার বিখ্যাত দৃশ্য, প্রখ্যাত নৃত্য নির্দেশক বটু পালের নির্দেশনায় "অবাক পৃথিবী" কবিতার বিখ্যাত নৃত্যদৃশ্য এখনও দর্শক-শ্রোতার অনুভবে দোলা দেয়।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী পদ্মিনী চক্রবর্তীর সাথে ত্রিপুরায় সত্তর দশকের নৃত্য সংগঠন "অর্কেস্ট্রা"র সঙ্গে একাত্ম হয়ে নানা অনুষ্ঠান করেছেন। রাজ্যের অন্যতম নাট্য সংগঠন রূপম নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নাটকে মঞ্চশিল্পী (Stage craft Artist) হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল।

চিন্ময় রায় দেশের ললিত কলা একাডেমির, ত্রিপুরা সরকার মনোনীত সম্মানিত সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নানা বিশিষ্ট সংস্থার উদ্যোগে (EZCC/NEZCC/Lalit Kala Academi) বহু ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে ললিত কলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে ছবি আঁকেন। এটাই ছিল তাঁর শেষ পারফর্মেন্স। তিনি নিজে যেমন ছিলেন গুণী চিত্রশিল্পী তেমনি বহু ছাত্র ছাত্রীকে প্রকৃত চিত্রশিল্পী হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধও করেছেন।

ত্রিপুরা থিয়েটার তাঁর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

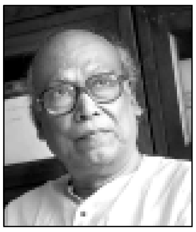

শ্রদ্ধায় স্মরণ

শঙ্খ ঘোষ

শুভংকর ঘোষ রায়চৌধুরী

প্রখ্যাত কবি, গদ্যকার ও প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ প্রয়াত হলেন ২০২১ সালের ২১শে এপ্রিল, ৮৯ বছর বয়সে। কোভিড অতিমারী যাঁদের কেড়ে নিল আমাদের কাছ থেকে, সেই তালিকায় আরও এক নক্ষত্র সামিল হলেন; বাঙালি আরও দীন হলো।

অবিভক্ত বঙ্গে জন্ম চিত্তপ্রিয়, ওরফে শঙ্খ ঘোষের। শৈশব-কৈশোর জুড়েই লেগেছিল দেশভাগের নৈরাশ্য, পূর্ববঙ্গ থেকে এপারে চলে আসা, মাথার উপর ছাদের খোঁজ, আর্থিক অস্বচ্ছলতা। এত প্রতিকূলতাকে জয় যে করেছিলেন তিনি, সে উল্লেখ বাতুলতা— বুদ্ধদেব বসু-পরবর্তী যুগের অবিসংবাদিত বিদ্বজ্জন হয়ে ওঠা থেকে জ্ঞানপীঠ-প্রাপক, এই সব তারই পরিচয়।

প্রাথমিকভাবে শঙ্খবাবু কবি; তাঁর বাচন ছিল মিত ও অর্থবহ, নীরবতাও সংবেদী ও নিবিড়। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে না থেকেও, মিছিলে-জনসভায় রক্তগরম ভাষণ না দিয়েও শঙ্খবাবু নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এক বিকল্প অস্ত্র ও প্রতিরোধ, তাঁর কবিতার ভাষায়। একক, নির্জন কবিতাগুলি সত্যানুসন্ধিৎসু; ফলত, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই হোক, বা আটপৌরে জীবনদর্শন, সবই প্রকাশ পেত স্বাভাবিকতায়।

আজীবন নিজেকে রবীন্দ্রচর্চায় নিমজ্জিত রাখা মানুষটির শুধুমাত্র রবীন্দ্রকবিতা বা সঙ্গীতের মতো বহুচর্চিত আঙ্গিক নিয়েই নয়, তথাকথিত স্বল্পালোচিত রবীন্দ্রনাট্যের পরিসরেও অবদান অপরিসীম। শঙ্খবাবু 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক' বইটি তাঁর নিজের অনুচ্চকিত জবানিতে "সাম্প্রতিক একজন পাঠক বা দর্শকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ" হলেও, বইতে রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাষা, নাট্যমুহূর্ত, অভিনয়রীতি, নাটকে গানের ব্যবহার, ঋতুচক্রের ব্যবহার এবং বিশেষভাবে 'রাজা' ও 'রক্তকরবী' বিষয়ে ক্ষুরধার আলোচনা সমৃদ্ধ করেছে বাঙালির সারস্বতচর্চাকে। 'ফাল্গুনী', 'শারদোৎসব' বা 'ডাকঘর'-এ "ডানাছাঁটা বর্তমান মুহূর্ত" অতীত ও ভবিষ্যতের যৌথ প্রবাহে যে এক "স্বর্গীয় লাবণ্য" লাভ করে, 'সময়ের দেশ' নিবন্ধে তাঁর রবীন্দ্র নাটক সম্পর্কে এই আলোচনাই বা ভুলি কী করে!

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময় শঙ্খবাবুর 'রক্তকরবী'র পাঠ কিংবদন্তি। শিক্ষকের সাফল্য তাঁর প্রভাবে— এই কথার প্রমাণেও কেবল এইটুকুই বলা যথেষ্ট হবে বোধ হয়, স্বরযন্ত্রের অসুখের কারণে শঙ্খবাবু শিক্ষকতা ছাড়লেন যখন হঠাৎই, ছাত্রছাত্রীদের কিছু না জানিয়েই, একটি ফাঁকা ক্লাসরুমে প্রিয় মাষ্টারমশাইকে ডেকে তারা তাদের অভিমান জানিয়েছিল 'রক্তকরবী'র ভাষায়, অভিনয়ে। সেদিন মোহিত হয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ, আজও মোহিত হই আমরা।

তাঁর স্মৃতির প্রতি ত্রিপুরা থিয়েটার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

শ্রদ্ধায় স্মরণ

অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত

প্রতিবেদক

স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদের কন্যা। মেধাবি, আদ্যোপান্ত সাংস্কৃতিক ঘরাণায় জাত। নাট্যমঞ্চেই আত্মপ্রকাশ, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। পরে ইংরেজী সাহিত্যে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ছাত্রী স্বাতীলেখা লণ্ডনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে মিউজিকে ডিপ্লোমা করেন। ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে এ.সি. বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এলাহাবাদে নাট্যচর্চা শুরু।

৭৮-এ চলে এলেন কলকাতায়। যোগ দেন নান্দীকার নাট্যদলে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় নাট্যকর্মের শুরু। তাপস সেন এবং খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত দক্ষতা ছিল বলে নান্দীকারের প্রায় সমস্ত নাটকের সঙ্গীতের কাজ নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। তাঁর শিক্ষকসুলভ মনোভাব নান্দীকারে অনুজ শিল্পীদের দক্ষতা বাড়াতে খুবই সাহায্য করেছে।

একে একে আন্তিগোনে, নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, মাধবী, শঙ্খপুরের সুকন্যা, পাতা ঝরে যায়, নাচনী সহ নান্দীকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনায় দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ভারতীয় থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি।

রবিঠাকুরের ঘরে বাইরে উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই বিখ্যাত ছবিতে তিনি ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে মুখ্য নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। সন্দীপ রায় বলছেন পিয়ানো বাজাতেন শুনেই সত্যজিৎ রায় ওঁকে 'ঘরে বাইরে'তে নিয়েছিলেন। অভিনয় কুশলতাতো ছিলই।

৭১ বছর বয়সে মঞ্চ দাপিয়ে বেড়ানো এই কিংবদন্তির পথ চলা থমকে গেল ১৬ই জুন ২০২১।

দেশের কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের স্মৃতির প্রতি ত্রিপুরা থিয়েটার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

উৎপল দত্তর দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন :
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর মুখোপাধ্যায় (দুজনই প্রয়াত)

(আগরতলার বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী শ্রী ঝলক মুখার্জী ২০১৫ সালের গোড়ায় কথায় কথায় আমাকে একটি " শিল্প সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক" এর কথা বলেন। নাম পর্বান্তর। জানুয়ারী ১৯৯৫-এ প্রকাশিত। দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতা, হাজরা রোড থেকে প্রকাশিত সাময়িকীটি পড়ে আমি অবাক হয়ে যাই। ১১২ পৃষ্ঠার (এ-ফোর) বই জুড়ে প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের সাক্ষাৎকার রয়েছে। ৮৮-র সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী ৮৯ পর্যন্ত ৩৩০ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘতম এই সাক্ষাৎকারে রয়েছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট, নাট্যকার ও নির্দেশক উৎপল দত্তের প্রায় ৪৫ বছরের বিশাল থিয়েটারী কর্মকাণ্ডের বিপুল অভিজ্ঞতা-মথিত উপলব্ধি সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ও অকপট কথোপকথন। বর্তমান সময়ে নাট্যকর্মীদের উপকারে আসবে ভেবে, 'পর্বান্তর' সাময়িকীর প্রতি ঋণ স্বীকার ও শ্রী ঝলক মুখার্জীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা ত্রিপুরা থিয়েটারে সাক্ষাৎকারটি পর্যায়ক্রমে ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবার নবম কিস্তি- সম্পাদক)।

পা.ব - উৎপলদা, এবার অন্য প্রশ্ন। থিয়েটার থেকে আপনি তো যাত্রা পরিচালনা করতে গেলেন। থিয়েটারে আপনি পরিচালনা করেছেন। তাদের সঙ্গে আপনার দীর্ঘ দিনের পরিচয় এবং তারা আপনার একটা ট্রেনিং -এর মধ্য দিয়ে ডেভেলাপ করেছে। যাত্রায়, একদম অন্য ধরনের অভিনেতা, পেশাদার অভিনেতা। তাদের সঙ্গে আপনার সেই যোগও নেই। তো সেখানে গিয়ে আপনি কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হলেন এবং সেগুলো কিভাবে মোকাবেলা করলেন।

উ.দ. - যাত্রার অভিনেতারা এত ভার্সাটাইল- যেহেতু ওরা পেশাদার এবং যেহেতু ওরা জনতার সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ, সেহেতু ওদের, নতুন জিনিস গ্রহণ করতে - ওরা সিদ্ধহস্ত। মানে আমাদের যে নাট্য আন্দোলনের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেমন নানারকম পাতি বুর্জোয়া পিছুটানে চিরদিন ভুগেছে, ওদের তো ওসব কিছু নেই। ওরা ছোটবেলা থেকেই পেশাদার। আর পেশাদার অভিনেতার একটা অসামান্য গুণ থাকে। অ্যাডাপ্টিবিলিটি। সে অ্যাডপ্ট না করতে পারলে তো সে না খেয়ে মরত বহুদিন আগে এবং তাকে প্রতি সিজনে ভালো করতে হবে। নইলে সে আর খেতে পাবে না।

এই যে চরম তাগিদ থেকে — ওদের যে আগ্রহ, যে প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে যায়

— তাতে ওদের আমার পালা টালা তুলে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হোত না। বরং আমি তো বলব, আমিই বরং রাইফেল নাটকের শেষটা একটু চাপা অবস্থায় করেছিলাম — রাইফেল তুলে নিয়ে স্লোগান দিয়ে শেষ করতে চাইনি। শেষটা অন্যরকম ছিল। পঞ্চু সেন এবং যাত্রার অভিনেতারা বললেন- না-না, শেষটায় আরো ইয়ে চাই স্লোগান চাই। অথচ ওরা কেউই কমিউনিস্ট নন, কেউই বামপন্থী নন। কিন্তু এরা জনতার ভেতরেই থাকেন এবং ওরা নাটক কিসে বেশী এফেকটিভ হয় এটা তো বোঝেন। এ নাটকের শেষটা যে ওভাবেই হতে হবে, এটা ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছিল। আমি রাইফেল নাটক যেভাবে ছাপা হয়েছে, সেভাবেই শেষ করি। আর তাছাড়া পঞ্চু সেনের গাইডেন্স ছিল। প্রচুর হেল্প করেছিলেন। Actually উনিইতো আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন। ওই বছর আমার কোন পালাই লেখার কথা ছিল না। সাত দিনে লিখেছিলাম প্রায়।

পা. ব. : থিয়েটারের সঙ্গে যাত্রার তো ফর্মেরও ডিফারেন্স হচ্ছে। আপনি যেভাবে নাটক করেছেন— তার থেকে খোলা মঞ্চ, তিনদিক খোলা বা চারদিক খোলা যাই বলুন, তাছাড়া ধরুন আলোর ব্যবহার সেখানে ভিন্ন ধরণের। কেননা পট তো থাকছেই না প্লাস সেটসও থাকছে না। সঙ্গীতের ব্যবহারেও ভিন্নতা আছে কিনা আমি জানি না, নিশ্চয়ই আপনি আরো ভাল বলতে পারবেন। এই সমস্তটা মিলে, দর্শক, একদম অন্য ধরণের দর্শক এই ফর্মটাকে আয়ত্ব করতে বা যাত্রা পরিচালনা করতে আপনার কোনো অসুবিধে হয়নি প্রথম দিকে?

উ. দ.: মনে তো পড়ছে না। এখন, কি অসুবিধে হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ছে না। ওইতো বলেছি, পঞ্চু সেনের সাহায্য ছিল মানে অপরিহার্য। অত বড় অভিনেতা এবং যাত্রার অত এক্সপিরিয়েন্সড লোক। যেমন একবার একটা জায়গায় করেছিলাম — একদল পুলিস বেরোল, তারপর নেক্সট সিনেই আবার ওরা ঢুকছে। উনি শিখিয়ে দিলেন, যাত্রায় ওরকমভাবে হয় না। যারা বেরিয়ে গেল তারা তক্ষুণি আবার ঢুকতে পারে না। ওরা বেরিয়ে যাবার পর কোন একটা কিছু ঘটবে, তারপরে আবার ঢুকবে। এসব বিষয় শিখলাম—টেকনিক—যাত্রায় কিভাবে সিনের পর সিন সাজাতে হয়। আর এমনি বিশেষ কিছু অসুবিধে হয় নি। কি অসুবিধে আছে, একই তো ব্যাপার। শুধু পুরো জিনিসটা ঢের বেশী চড়া দাগের, মোটা দাগের। সে আমরা আই পি টি এর শিক্ষা পেয়েছি আগেই। কেননা জানি, আমরা যখন পিপল-এর সামনে যাব তখন আমাদের অনেক জোরে অভিনয় করতে হবে। আমরা তার আগে বাইরে বাইরে অনেক নাটক করেছি। সেখানকার অডিয়েন্স আর কলকাতা শহরের অডিয়েন্স যে আকাশ পাতাল ডিফারেন্ট এটা আমরা অনেকেই জানি। তো এমনি যখন আমরা নাটক করেছি তখন আমরা কলকাতা শহরের জন্য যে নাটক আর গ্রামাঞ্চলের জন্য যে নাটক তার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে সে আমরা ভালো করেই জানতাম। তাই কোন অসুবিধে হয়নি পালা লিখতে।

তাছাড়া আমি যাত্রা দেখছি-টেকছি এবং স্টাডি করছি সেই একান্ন সাল থেকে। এ যে একেবারে আচমকা গিয়ে পড়লাম তাও না। রেগুলার যাত্রা দেখতাম এবং পড়াশোনাও করেছি, বোঝবার চেষ্টা করেছি। এও বুঝতে পেরেছি যে যাত্রা ফর্মটাকে কিভাবে বিকৃত করা হয়েছে এবং এও বুঝেছি যে বিকৃত করেছে বলেই বেঁচে গেছে। নইলে যাত্রা এতদিনে উঠে যেত। এবং একটা এক্সটিংকট ফর্ম নিয়ে কিছু পণ্ডিত রিসার্চ করতেন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে। ওই, সেই যে যাত্রা নামে একটা জিনিস ছিল পরিবর্তিত হয়েছে বলেই বেঁচে গেছে সময়ের সঙ্গে move করে।

পা. ব.: এবার আপনার প্রিয় বিষয়— আপনি বহু জায়গায় বলেছেন — পথনাটিকা। সাধারণ নাটকের সঙ্গে পথনাটিকার মেক-আপ থেকে আরম্ভ করে সব কিছুরতো একটা পার্থক্য আছে। পথনাটিকা কি ধরণের বিষয়কে নিলে মানে কিভাবে লিখলে সবচেয়ে সাকসেসফুল হতে পারে?

উ. দ.: পথনাটিকর প্রধান প্রাকশর্ত হচ্ছে একটা তাৎক্ষণিক ইস্যু, যাতে দর্শক এবং অভিনেতা একাত্ম হচ্ছে। দর্শক এবং অভিনেতা আগে থেকে রাজনৈতিকভাবে একমত। সেরকম ক্ষেত্রেই মাত্র পথনাটিকা অভিনয় করা যেতে পারে। কখনও কখনও আমাদের কমরেডরা ভুল করে। আমাদের নিয়ে যায় এমন জায়গায় যেখানে শত্রুপক্ষই প্রধান ফোর্স। ভাবেন, এই পথনাটিকার মাধ্যমে শত্রুপক্ষের প্রভাবে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদেরকে আমরা জয় করে নিয়ে আসব আমার দিকে। পথনাটিকার সে ক্ষমতা নেই। পথনাটিকার যে ক্ষমতা আছে সেটা হচ্ছে যে শত্রুর বিরুদ্ধে যে ক্রোধ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেই ক্রোধটাকে পুঞ্জীভূত করতে হবে, এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে এবং একটা বিরাট মিটিঙে সেটাকে এক জায়গায় জড়ো করে সেটাতে আগুন দিতে পারবে। সেটাতে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে। এইটে পথনাটিকা পারবে। কিন্তু যে আমাদের রাজনীতির লোক নয়, যে বিরোধী রাজনীতির লোক তাকে কনভিন্স করবে— এ ক্ষমতা পথনাটিকার আছে বলে মনে হয় না। তবে হয়তো দোনোমনা করছে এমন কোনো কোনো মানুষকে টেনে এনেছে আমাদের অজান্তে — তেমন লোক থাকতে পারে। কিছু কিছু চিঠি আমরা পেয়েছিলাম দিনবদলের পালার পরে। আমাদের নাটক দেখেই নাকি তিনি আমাদের দিকে এসেছেন। আসলে তিনি আগে থেকেই দোদুল্যমান ছিলেন। নইলে আসতে পারতেন না। ক্রমশ তারপরে আস্তে আস্তে পথনাটিকা পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক আর্গুমেন্টে। ওদের আর্গুমেন্টগুলোকে আমরা উপস্থিত করি। দুই আর্গুমেন্টের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় মঞ্চে এবং কেন ওদের আর্গুমেন্টগুলো ঠুনকো আর কেন আমাদের গুলো সঠিক সাইটে দেখানো হয়।

পা. ব.: পরিচালকের থিয়েটার — তার আগের যুগটা ছিল অভিনেতাদের থিয়েটার, এইটে ইউরোপে কি সময় থেকে এসেছে, কিভাবে ডেভেলপ করেছে এবং তারপরে কাদের কাদের হাতে সম্পূর্ণতা পেয়েছে? তারপরে এটা আমাদের দেশে উপস্থিত হয়েছে?

উ.দ.: এগুলো অসংখ্য বই-এ লেখা আছে। এগুলো টেকস্ট বইতে সব পাওয়া যায়। এইগুলো তো কোনো ওপিনিয়নের ব্যাপার না। ডিউক অফ্ সাক্স্-মাইনিঙ্গেন জার্মানীর। বলা হয় তিনি হচ্ছেন পরিচালকের থিয়েটারের জনক। কেননা প্রথম তিনি তার প্রজাদের নিয়ে — চাষীদের নিয়ে তিনি Team work দলগত অভিনয়ের সৃষ্টি করেন। তিনি মস্কো ট্যুর-এ গিয়েছিলেন। সেইটা স্তানিস্লাভস্কি তার অভিনয়ে দেখেন। তারপরে স্তানিস্লাভস্কিকে ধরা হয়। অ্যাডলফ আপ্পিয়া তার আগে ধরা হয় জার্মানীতে। স্তানিস্লাভস্কি-নেমোরোভিচ ডানচেঙ্কোর দান সবচেয়ে বেশী, যেখানে পরিচালক একেবারে ডিক্টেটরের পর্যায়ে উন্নীত হলেন। এমনকি কত সেকেন্ড পজ হবে, একটা পজের দৈর্ঘ্য কতটা হবে সেটা অব্দি স্ক্রিপ্টে লেখা থাকত, তারপরে এলেন দোজ জার্মান জায়ান্টস মাক্স রাইনহার্ট। একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি হত। তার নাম হত - রেগিবোখ। এই রেগিবোখ আজকের সব পরিচালকদের স্ক্রিপ্টের মডেল। কিন্তু রেগিবোখের মতন ডিটেইল স্ক্রিপ্ট আর কেউই করতে পারেন নি রাইনহার্টের পরে। তাতে প্রত্যেকটি চরিত্রের বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে যেই কালে, যেই পরিবেশে নাটকটা-সেই যুগ, সেই কাল এবং সেই পরিবেশের বিশ্লেষণ- তারপরে নাট্যকারের জীবনী, নাট্যকারের নানা নাটকের বিশ্লেষণ, এই বিশেষণ নাটকের তাৎপর্য — এই বিশেষ নাটকের স্থান, সেই নাট্যকারের জীবনী ইত্যাদি বহু ব্যাপার উনি নোট করতেন এবং ঐ রেগিবোখ-এ লিখে রাখতেন। এই সবশুদ্ধ নিয়ে একটা বিপুলাকৃতি নোট বই ব্যবহৃত হোত রিহার্সালে।

মাক্স রাইনহার্ট— যিনি জার্মান বাণিজ্যিক নাট্যশালার সবচেয়ে বড় জায়েন্ট বলে পরিচিত। তারপরে এলেন ব্রেখ্ট্, — পিসকাটর। ব্রেখটের গুরু-এরউইন পিসকাটর। তিনিও পরিচালকের থিয়েটারই করতেন। তিনি কমিউনিষ্ট। তিনি এসে বাণিজ্যিক নাট্যশালার পাশাপাশি বিপ্লবী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু সেই বিপ্লবী নাট্যশালায়, তিনি সজোরে ঘোষণা করলেন, একে বাণিজ্যিক দিক থেকে সফল হতে হবে। বাণিজ্যিক নাট্যশালাকে চ্যালেঞ্জ করতে গেলে বাণিজ্যিক দিক থেকে সফল হয়ে বিপ্লবী নাট্যশালাকে দাঁড়াতে হবে। এরকম হলে চলবে। না হলে আমাদেরটা হবে অ্যামেচার, সৌখিন আর পুরো বাণিজ্যিক নাট্যশালা কন্ট্রোল করবে থিয়েটার জগতকে — এ আমি হতে দেব না। তো তাই হোল, পিসকাটর যতদিন বার্লিনের থিয়েটারে ছিলেন ততদিন বিপ্লবী নাট্যশালা সমানে লড়াই করেছে বাণিজ্যিক নাট্যশালার সঙ্গে এবং শুধু তাই নয় মাঝে একটা সময় এসেছিল যখন বাণিজ্যিক নাট্যশালা পরাস্ত। পিসকাটর একাই রাজত্ব করছিলেন বার্লিনে। তারপর তো হিটলারের অভ্যুত্থান। পিসকাটরের পলায়ন— প্রাণ নিয়ে পলায়ন। নইলে পিসকাটরকে হত্যা করা হোত। পিসকাটর চলে এলেন— প্রথমে এলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে তারপরে পালিয়ে গেলেন প্যারিসে, তারপরে নিউইয়র্কে। ব্রেখটও পলায়ন করতে বাধ্য হলেন — আমেরিকায় পালিয়ে গেলেন। যুদ্ধের শেষে দুজনেই ফিরে এলেন স্বদেশে।

ব্রেখট গেলেন পূর্ব বার্লিনে। পিসরাটর গেলেন পশ্চিম বার্লিনে। কেন না তার থিয়েটার ছিল — এখন যেখানে পশ্চিম বার্লিন — সেখানেই ছিল তার বিখ্যাত থিয়েটার ফল্কস বিউনে অর্থাৎ পিপলস্ থিয়েটার। এখনও আছে সেটা। তা উনি ফিরে এসে পশ্চিম বার্লিনে ফল্কস বিউনে পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। এবং পুনরায় তাঁর থিয়েটার সারা পৃথিবীতে যশ অর্জন করল এবং পশ্চিম জার্মানীর শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হিসেবে পরিচিত হল। পশ্চিম জার্মানী কেন— পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হিসেবে। এবং তখন বার্লিনের কিরকম একটা নামডাক দেখুন— পশ্চিম বার্লিনে পিস্কাটর আর পূর্ব বার্লিনে ব্রেখট। দু'জনে সমানে নাটক পরিচালনা করছেন। পরে ব্রেখটের নাটকের ব্যাপারটাতো আপনারা জানেন — সকলেই জানেন। একের পর এক বিখ্যাত — মাদার কারেজ থেকে আরম্ভ করে নাটকগুলো একের পর এক অভিনীত হচ্ছে পূর্ব বার্লিনে। পশ্চিম বার্লিনে তখন ডেপুটি ..... নাটক, আমাদের পিস্কাটর পরিচালনা করলেন।

নাটক, দ্য ডেপুটি। পড়েছেন বোধহয় — খুবই বিখ্যাত নাটক। ন'ঘন্টার নাটক। দুপুর এবং সন্ধ্যে — দু'টো পারফরমেন্স হ'ত। পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু। পোপ— পোপের বিশ্বাসঘাতকতা। পোপ যে হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল এবং ইহুদী হত্যায় সাহায্য করেছিল— এই হচ্ছে এই নাটকের বিষয়বস্তু। সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষ করে শুধু তার বিষয়বস্তুর জন্য নয়— তার ফর্মের জন্য। পিস্কাটরের বৈপ্লবিক মঞ্চায়ন, মঞ্চরীতি। আর আজকাল যে অনেকে খুব হাল্কাভাবে বলেন যে ব্রেখট হচ্ছেন এপিক থিয়েটারের জনক-সেটা ঠিক নয়। এপিক থিয়েটারের কথা প্রথমে ব্যবহার করেন পিসকাটর। এপিক থিয়েটারের জনক বলতে পিসকাটরকে বোঝায়। —ব্রেখট নয়। এরাই তো হচ্ছেন পরিচালকের থিয়েটারের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, আজ পর্যন্ত যা যা হয়েছে। আরও হয়তো আছেন। আমি ভুলে গেছি— মানে ঠিক নাম বলতে পারছি না। গ্রতস্কি, পুওর থিয়েটার তার ফর্ম। পোল্যান্ডের গ্রতস্কি, বলা যেতে পারে, পরিচালকের থিয়েটারের চরম নিদর্শন। এদের সমকক্ষ আর নেই।

পা. ব : এইটেই আমাদের দেশে কিভাবে এসেছে?

উ. দ. : আসেনি। পরিচালকের থিয়েটারে ওই পর্যায়ে আমাদের দেশে আসে নি। চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। পরিচালকের কর্তৃত্ব, আধিপত্য স্থাপিত করতে, কায়েম করতে। তবে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তার কারণ আমাদের এখানকার যে সংগঠন, নাট্যশালার সংগঠন ততোটা তো সংগঠিত নয় ইউরোপের মতন। কেন না এখানকার পুঁজিবাদ ততটা বিকশিত নয়। কোনদিন ইউরোপের পুঁজিবাদের মতো বিকশিত পুঁজিবাদ নয়। সুতরাং এ পুঁজিবাদী সংগঠনের ভিত দুর্বল। নাট্যশালার সংগঠনের ভিত দুর্বল। তাই পরিচালকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তখনই যখন অর্থনৈতিক ভিত্তি খুব শক্ত, দৃঢ় । নাট্যশালায়, যদি অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ়মূল হয় তার, তাহলে সে পরিচালককে

নিয়োগ করে এবং সেই পরিচালকের সর্বময় কর্তৃত্ব সকলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আমাদের দেশের থিয়েটারের দিকে তাকিয়ে আপনি কখনো বুঝতে পারবেন না যে এই থিয়েটারের সর্বময় কর্তৃত্ব কারো হাতে আছে কিনা। এইখানে থিয়েটারের মালিক খামখেয়ালী। সে উচ্ছৃঙ্খল, সে টাকা ওড়ায়। হিসেব দিতে পারে না। সে এসে বক্স অফিস থেকে টাকা নিয়ে চলে যায়। যেটা একেবারে নিয়ম বিরুদ্ধ। বক্স অফিস থেকে কেউ টাকা নিতে পারে না।

নিয়ম যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বক্স অফিসের টাকা ব্যাঙ্কে যাবে। ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। তারপরে ব্যাঙ্ক থেকে চেক দিয়ে তুলতে হবে। এটাই সারা পৃথিবীতে থিয়েটারের নিয়ম। এটা হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট নিয়ম— পুঁজিবাদী নিয়ম। সমাজতন্ত্রের দেশেও তাই। কিন্তু এখানে সবই উল্টো। এখানে মালিক এসে ড্রয়ার থেকে একমুঠো টাকা নিয়ে চলে যায়। তিনি মদ খাবেন বোধহয়। এখন একমুঠো টাকা যে নিয়ে গেলেন তখন যিনি হিসেবরক্ষক আছেন তিনি কি লিখবেন তাহলে! ঐ লেখেন — বড়বাবু, এক থাবা। মেজোবাবু— দেড় থাবা। এইভাবে হিসেব মেলাতে হয়। এরকম অবস্থায় কারোরই কর্তৃত্ব কায়েম হতে পারে না। পরিচালকের তো নয়ই। কারণ পরিচালক এরকম একজন খামখেয়ালী কর্তৃপক্ষের এমপ্লয়ী মাত্র। আজ হয়তো তার চাকরি আছে। কাল থাকবে না। আর এইখানে পরিচালকের চাকরির স্থায়িত্ব শুধুমাত্র নাটক হিট করলে। এইখানে পরিচালকের প্রতিভা বিচার করবে এমন স্থিতধী নাট্য কোম্পানী—থিয়েটারের মালিক ছিল না বললেই চলে। কোনদিনই ছিল না। গিরিশবাবুদেরই আমলেও না; তারপর শিশিরবাবুদের আমলেও না। কখনই ছিল না। অর্ধশিক্ষিত সব লোক আসত। তাদের বেশিরভাগই আসত অ্যাক্ট্রেস নিয়ে ফূর্তি করবার জন্য। অভিনেত্রী একজন যদি রাখা যায়— একজন রাঁড়। সমাজে আমার যেরকম প্রতিষ্ঠা তাতে আত্মীয়-পরিজনরা বলছিল মোটে একজন রক্ষিতায় মান থাকে না। আর দু'তিনজন রক্ষিতা রাখবার জন্য তারা থিয়েটারে আসত। সুতরাং এদের হাতে আর পরিচালকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার তো কারণ নেই। কেননা পরিচালকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রতিভা ঠিকমত যদি যাচাই না হয় তাহলে পরে তো পরিচালকের হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ইউরোপে তা হয়নি। ইয়োরোপে বুর্জোয়ারা— তারা তাদের যখন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটছে তখন তারা থিয়েটারের মূল্য বুঝাত শিল্পের মূল্য বুঝাত। তারা যে সব পরিচালকরা কাজ করতে আসতেন — তাদের প্রতিভা বুঝত। তাদেরকে সারাজীবন ধরে প্যাট্রোনাইজ করেছে, তাদেরকে সাপোর্ট করেছে, তাদেরকে থিয়েটার দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারা যাতে কাজ করতে পারে বিনা বাধায় তার ব্যবস্থা করে রেখেছে এবং তারাও মনের সুখে কাজ করেছেন। সারাজীবন কাজ করেছেন এবং এক একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

আমরা যে ডিউক অফ সাক্সে-মাইনিঙ্গেনের কথা বলে আরম্ভ করলাম তিনি নিজেই ছিলেন একজন বিরাট প্রতিভাবান। তিনি একজন ডিউক এবং জার্মানীতে— জার্মানীর ইউনিফিকেশনের আগে- জার্মানী বহু ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ডিউক বলতে বোঝায় রাজা। তিনি একজন রাজা ছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন থিয়েটারের একজন বিরাট

পরিচালক। তিনি নিজের রাজ্যে থিয়েটার তৈরি করেছিলেন এবং নিজের প্রজাদের দিয়ে সেখানে অভিনয় করাতেন। বা গ্যয়টে। গ্যয়টে নিজেই একজন মস্ত বড় লোক— বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন, বিশ্বের মহাকবিদের একজন। এবং মহাধনী-জমিদার। তিনিও ভায়ামারিস্ থিয়েটার তৈরি করেছিলেন। তিনি এবং শিলার, দু'জনে মিলে। এরকম নাট্যরসিক, শিল্পী ও ধনী — একাধারে ধনী এবং শিল্পী বহু, মানে তাদের মিছিল এসেছে ইউরোপে। এবং তারা থিয়েটারকে প্রচুর দিয়েছেন এবং তারাই এইসব পরিচালকদের সমর্থন করেছেন। পরিচালকদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, পরিচালকদের কাজ করতে সাহায্য করতেন। আমাদের দেশে তা হয়নি। তথাপি চেষ্টা করেছেন— রবীন্দ্রনাথ নিজে চেষ্টা করেছিলেন।

আমাদের পিতৃদেবের ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথকে অন্য কারও ওপর নির্ভর করতে হয়নি। তিনি নিজেই জোড়াসাঁকোতে থিয়েটার তৈরি করে সেইখানে থিয়েটার করতেন। এবং বাঙলা নাটকের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ কতগুলি প্রযোজনা তাঁর। তো তারপর গিরীশ চন্দ্র ঘোষ। বাংলার শ্রেষ্ঠ পরিচালক। বাঙলা নাট্যশালায় অতবড় পরিচালক আর আসেননি। তার ওপরে যে অত্যাচারটা হোত, আজকের দিনে অকল্পনীয়। তিনি একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা এবং পরিচালক। নাট্যকার হিসেবে তাকে প্রতি সপ্তাহে নাটক লিখতে হোত। কেননা ঐ মালিকদের ধারণা বেশীদিন একটা প্লে চলবে না। চালিয়ে কেউ দেখেনি, তার নাটক চলে কিনা। যখন চালানোর চেষ্টা করেছে তখন দেখা গেছে একেকটা নাটক একশো রজনীর ওপরে অভিনয় হচ্ছে। কিন্তু বেশীরভাগ সময়েই মালিকরা চেষ্টা করত প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন নাটক নামানোর। খরচ কিছুই করত না তো। পুরনো কস্টিউমকেই ধুয়ে টুয়ে আবার পরিয়ে দেবে। পুরোনো যে সিন-সিনারি আছে সেগুলোকেই আবার নতুন রঙ করে চালিয়ে দেবে। কিন্তু নাটক নতুন চাই। তাই গিরিশবাবুকে অনবরত, দিনরাত লিখতে হোত। এবং সেগুলোর আবার রিহার্সাল করতে হবে। কারণ পরের সপ্তাহেই তো আবার নতুন নাটক। অতএব তিনি সারা সন্ধ্যে অভিনয় করতেন, সারা রাত্তির রিহার্সাল দিতেন। এবং এই অসম্ভব পরিশ্রম করবার জন্য তিনি মদ্যপানও করতেন প্রচুর। সারা রাত্রি মদ্যপান করতে করতে রিহার্সাল দিতেন। একটা নিয়মই ছিল— উনি এক বোতল ব্র্যান্ডি নিয়ে রিহার্সাল দিতে বসতেন, ব্র্যান্ডির বোতল যখন শেষ হোল, তখন রিহার্সালও শেষ হোল। এবং তারপর গিয়ে শুয়ে পড়তেন। সেইজন্য ওঁর যে মৃত্যু তার জন্য দায়ী ঐ মালিকরা। ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে তারপর মৃত্যু। এবং তার ওপর আছে অভিনয়ের পরিশ্রম। সবচেয়ে বড় পার্টগুলোই করতে হোত ওঁকে। এবং তিনি দু'টো অভিনয়ও করতেন।

এই সমস্ত দায়িত্ব একা সামলে গিরিশ ঘোষ মহাশয় আমাদের নাট্যশালাকে দাঁড় করিয়েছিলেন— স্বাবলম্বী করে তুলেছিলেন এবং তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তাঁর আগে নাট্যশালা এই বড়লোকদের খামখেয়ালীর ওপর নির্ভর। উনি সেটাকে পাবলিক থিয়েটারে পরিণত করলেন। অর্থাৎ কিনা টিকিট বিক্রী করে নাটক হবে। পাবলিক টিকিট কিনবে। সেই টাকায় থিয়েটার চলবে। মানে বড়লোক টাকা দিল, কি না দিল, তাতে কিছু

এসে যায় না। এতে করে থিয়েটারের স্বাধীনতা ঘোষিত হল। থিয়েটার, একদল বয়ে যাওয়া বড়লোক ছোঁড়া — ফিউডাল কোটিপতির হাত থেকে মুক্ত হয়ে পাবলিকের ওপর নির্ভরশীল হোল। ফলে পাবলিকের চাহিদাকেই রিফ্লেক্ট করতে শুরু করল, ফলে আমরা দেশাত্মবোধক নাটক পেতে শুরু করলাম, নইলে হোত না। পাবলিকের দাবী প্রতিফলিত করতে বাধ্য হয়েছে এবং যেহেতু মানুষ, দেশের জনতা দেশপ্রেমিক, তাদের কাছে দেশপ্রেমও প্রতিফলিত হোল। সিরাজদৌল্লা নাটক হোল। মীরকাশিম নাটক হোল। ছত্রপতি শিবাজী নাটক হোল। তিনটেই অবশ্য বেআইনী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেআইনী হবার আগেই সেগুলোর শত রজনী অভিনয় হয়ে গেছে। লোক ভেঙে পড়েছিল। এবং সেই সিরাজদৌল্লাকে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কুৎসা থেকে রক্ষা করে, সিরাজদৌল্লাকে ন্যাশনাল হিরো করে উপস্থিত করলেন গিরিশবাবু।

এবং বাঙলায় হিন্দু মুসলিমের ঐক্যের প্রতিচ্ছবি উপস্থিত করলেন। এই অ্যাচিভমেন্ট বড় কম নয়। ১৯০৫ সালে। এই তো গিরিশবাবুর অ্যাচিভমেন্ট এবং অবশ্যই সেটা পরিচালকের থিয়েটার করারই চেষ্টা করেছিলেন। কেননা গিরিশবাবু — ব্যাপারটা এখন তো অনেক সহজ হয়ে গেছে— এতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আসছেন যারা শিক্ষিত-শিক্ষিতা, যারা কালচারড, যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন। যারা পৃথিবীর খবর রাখবেন, যারা একটা নাটক পড়ে তার তাৎপর্য বুঝতে পারেন, যারা এমনকি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়েছেন, আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু তখন যারা আসতেন থিয়েটারে, তাদের তো বেশীরভাগই নিরক্ষর ছিলেন। তারা পড়তেই পারতেন না অনেকে। তারা প্রম্পট শুনে শুনে মুখস্থ করতেন। তাদের স্ক্রিপ্টটা সামনে দিয়ে দিলে কোন লাভ নেই। তারা কেউই পড়ে মুখস্থ করতে পারবেন না। কারণ তারা পড়তেই পারছেন না বাঙলা। সুতরাং অফিসে একজন পেশাদার প্রম্পটার থাকত। তার দায়িত্ব ছিল প্রত্যেককে মুখস্থ করানো, শুনিয়ে শুনিয়ে। এদিকে সময়তো নেই। কেননা প্রতি সপ্তাহে নতুন নাটক নামছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে। তারমধ্যে অত বড় বড় নাটক তারা মুখস্থ করতেন এবং গিরিশবাবুর শিক্ষায় তারা বিরাট বিরাট অভিনেতা হয়ে গিয়েছিলেন। এর পুরো কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের। এই মেটেরিয়াল থেকে— এই র মেটেরিয়াল থেকে অত বড় বড় অভিনেতা হয় এবং অত ভালো থিয়েটার। সেই যুগে তিনি করেছিলেন। তারপর থিয়েটার যে একটা টোটাল আর্ট— শুধু যে অভিনেতা নির্ভর নয়— এটা গিরিশবাবুরা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন। পরবর্তী যুগে বরং সেটা, অনেকাংশে বাঙলা থিয়েটার তার থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সে আদর্শ থেকে। কিন্তু গিরিশবাবুর থিয়েটারে এটা ছিল না অভিনেতাই একমাত্র চ্যাঁচাবেন আর পেছনে ন্যাকড়া ঝুলবে। এরকম ঘটত না গিরিশবাবুর নাটকে তাঁর যে নির্দেশগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কিরকমভাবে বিশাল বিশাল সেটা ব্যবহার হয়েছে। এবং শুধু আঁকা সিন নয়। আস্ত ত্রিমাত্রিক সেট ব্যবহার হয়েছে। মেক-আপে তারা কিরকম সতর্ক ছিলেন— মেকআপ সম্পর্কে, তারা নোস পট্টি পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলেন তার নিদর্শন আছে গিরিশবাবুর প্রবন্ধে। তারা কতরকম পরচুলা ব্যবহার করেছেন। তারপর

ধরুন কলকাতা। কলকাতা যতভাবে এসেছে গিরিশবাবুর নাটকে আর কারোর নাটকে তো অসেনি। কলকাতার রাস্তাগুলো তিনি নির্দেশ করছেন নাটকে। হ্যারিসন রোড। কলেজ স্কোয়ার। কলেজ স্কোয়ারের এক অংশ। আর কলকাতার লোকই যখন দেখছে তখন কলেজ স্কোয়ার তো শুধু বলে দিলে হবে না, তখন দেখাতে হবে কলেজ স্কোয়র। হ্যারিসন রোড দেখাতে হবে। এবং দেখিয়েছেন। কিছু কিছু সিন মিনার্ভায় আমরাও দেখেছি, শেষটুকু। সেগুলো ছিল। আশ্চর্যজনক— আশ্চর্য বাস্তবতা সেইসব সেট গুলোতে ছিল। কলকাতার রাস্তাকে তুলে ধরা কলকাতার দর্শকের সামনে। সেট-টেট সব এইভাবে ওঁরা করেছেন। তবে লাইট সে যুগে খুবই, ইলেকট্রিসিটির এরকম সুবিধে তো ছিল না তখন। তবু যথাসম্ভব তারা করেছেন। সঙ্গীত, নৃত্য, এসবের তো একেবারে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল বাঙলা থিয়েটার, যা এখনও পর্যন্ত আর হয়নি। একমাত্র জোড়াসাঁকোর থিয়েটার, তাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাড়াড়া কেউই এ থিয়েটারের একশো মাইলের মধ্যে আসতে পারে এমন নৃত্যগীতের ব্যাপারে, এরকম কোন জিনিস বাংলা থিয়েটারে হয়নি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ছাড়া। তো, সেইজন্য বলছি যে গিরিশবাবু হচ্ছেন সবচেয়ে বড় মানে টোটাল থিয়েটার, পরিচালকের থিয়েটার সৃষ্টি করার আদিপুরুষ, আমাদের দেশে। তারপর আধুনিককালে এসে এর চেষ্টা হয়েছে। আমরা সবাই চেষ্টা করেছি পরিচালকের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করতে। শম্ভুবাবু করেছেন। আমিও চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছি সেটা অন্যপ্রশ্ন।

(ক্রমশ:)

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যকর্মী **পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর মুখোপাধ্যায়,** (দুজনই প্রয়াত)

সঠিক উচ্চারণ

পবিত্র সরকার

১. আগে 'আবৃত্তি' কথাটার উচ্চারণ শিখি, তারপরে অন্য কথা

এ লেখার শিরোনামে চোখ পড়লেই পাঠক ভাববেন, এই রে! পুজোর সময় কোথায় বইপত্র খাটের তলায় ছুড়ে দিয়ে ক-টা দিন ফুর্তি করব তা নয়, এই এক ভাষার মাস্টার বসে গেলেন মাস্টারি করতে। ভাষাতত্ত্বের ক্যাঁচকঁ্যাচিতে মাথা ধরিয়ে না ছাড়ে! না, না, এ লেখা ভাষা নিয়ে নয়, আবৃত্তি নিয়ে। ভাষার ডোজ তত বেশি থাকবে না। শুধু উচ্চারণ বিষয়ে কিছু কথা থাকবে। আপনারাই বলুন, সঠিক উচ্চারণ ছাড়া আবৃত্তি বা নাটক হয় নাকি?

হ্যাঁ, আবৃত্তি আমরা অনেকেই করতে চাই, বাচ্চাদের শেখাতে চাই। তাই বলে পুজোর সময়, পুজো-সংখ্যায়? কোথায় মজার মজার গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী এই সব পড়ব, তা নয় আবৃত্তি শেখা নিয়ে প্রবন্ধ। সম্পাদকের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এই এক মাস্টারকে ডেকে এনেছে!

যাই হোক, দুর্লভ সুযোগ যখন একবার পেয়েছি, তা হলে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করি। আবৃত্তি নিয়ে একেবারে প্রথম কথা হল, 'আবৃত্তি' কথাটাকে ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে হবে। যারা আবৃত্তি করে, এমন কি আবৃত্তি শেখায়, তাদের মুখেও ভুল উচ্চারণ শুনি। কেউ বলে 'আব্বৃতি' [আব্-বৃ-তি], কেউ বলে আব্রিত্তি [আব্-বৃৎ-তি], আবার কেউ-বা বলে 'আবৃতি' [আ-বৃতি] তিনটেই ভুল, আর শেষেরটার মানে তো আলাদা, ও শব্দের মানে 'আবরণ, ঢাকনা'।

তা হলে কী হবে ঠিক উচ্চারণ? হবে **আ-বৃৎ-তি**। মনে থাকবে তো? বার বার করে ওই উচ্চারণটা করতে থাকুন, দুটো'ত্'— একটা খণ্ড আর একটা আস্ত ত উচ্চারণ করে। খণ্ড শুধু লেখায়, উচ্চারণে ওটাও আস্ত। কোনওটাই বাদ দিলে চলবে না। আচ্ছা- আমরা বাংলা বানানে ঋ-কার আর র-ফলার তফাত জানি তো? এটা হল বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণের একটা শিক্ষা। পরে আমরা সে-কথায় যাব, কিন্তু এটা আগে বলে নিই, দরকার বলে। বাংলা শব্দের মাঝখানে যে ঋ-কার থাকে, থাকে যে র-ফলা— এদের দুজনের উচ্চারণ কিন্তু আলাদা। না, **ঋ**-র পরে একটা '**ই**' আছে, **র**-ফলায় সেটা সব সময় থাকে না, অন্য স্বরধ্বনি থাকে— সে কথা নয়। যেমন 'আকৃতি' আর 'আক্রান্ত'। কিংবা 'ব্যাপৃত' আর 'সুপ্রভাত'। আসল তফাত সেখানে নয়। আসল তফাত হল, র ফলা যে ব্যঞ্জনের পা ধরে আছে, সেটা উচ্চারণে ডবল হয়ে যায়, ঋ-কারে সেটা হয় না। ফলে

ঋ-কারের ব্যঞ্জনটাকে আলতো করে উচ্চারণ করে তার পরে 'রি' বললেই হয়, কিন্তু র-ফলায় ব্যঞ্জনটাকে ডবল করে উচ্চারণ করতেই হবে। নীচে দেখুন দুটোর তফাত—

ঋ- কার	উচ্চারণ	র- ফলা	উচ্চারণ
আকৃতি	আ ক্-রি-তি	আক্রান্ত	আক্-ক্রান্-তো
প্রকৃত	প্রোক্-রি-তো	প্রক্রিয়া	প্রোক্-ক্রি-য়া
মাতৃগণ	মাৎ-রি-গন্	মাত্রাজ্ঞান	মাৎ-ত্রাগ্-গ্যাঁন্
ব্যাপৃত	ব্যাপ্-রি-তো	বিপ্রদাস	বিপ্-প্রো-দাশ্
অমৃত	অম্-রি-তো	আম্র	আম্-ম্রো
অনুসৃত	ও-নুস্-রি-তো	ত্রিস্রোতা	ত্রিস্-স্রো-তা

এই নিয়ম মেনেই, আবৃত্তি উচ্চারণ হল আব্-রিৎ-তি, আব্-ব্রিৎ-তি নয়। বোঝা গেল কি? ডবল ব হবে না।

২. এবার আসল কথাগুলো, ধাপ ধাপে

প্রথম কথা হল, সবাই আবৃত্তি করতে পারে। না, গলা ভালো নয়, গান গাইতে পারেন না বলে মিথ্যে হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না। আপনার মনে যদি স্বাভাবিক মানুষের আবেগ থাকে, যদি কবিতার শব্দের আবেগকে ধরতে চান, তাহলে আবৃত্তি নিশ্চয়ই করবেন। সব রকমের আবৃত্তি— কবিতা, সুরম্য গদ্য, নাটকের সংলাপ— কী নয়। প্রথমে জিভের আড় বা আড়ষ্টতা ভাঙতে হবে। শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্র নাটকের ছেলেমেয়েদের গলার চর্চা করার জন্যে একটা টোটকা দিতেন-খবরের কাগজ গুটিয়ে একটা চোঙা বানাও, সেটার একটা মুখ বন্ধ করে দাও, তারপর নির্জন জায়গায় (ছাদ, বাড়ির পাশের খোলা জায়গা) গিয়ে তাতে সা রে গা মা চ্যাঁচাতে থাকো, হারমোনিয়ামের দরকার নেই। প্রতিবেশীদের বিরক্তি বা বাচ্চাদের হাসিটিটকিরির ভয় কাটিয়ে সেটা যদি করে উঠতে পারেন তো ঠিকই আছে। তাতে গলার ক্ষমতা বাড়বে, হয়তো মিষ্টতাও।

জিভের এই আড় ভাঙাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা লক্ষ করবেন, বেশিরভাগ মানুষই খুব গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে শেখেনি। কেউ হড়বড় করে কথা বলে, কেউ গাঁক -গাঁক করে, কেউ ফিশফিশ করে, কারও বাক্যের শেষটা শোনা যায় না। কেউ একটা কথা বলতে গিয়ে তার মধ্যে আর-একটা কথা এনে ফ্যালে, তার ফলে আসল কথাটাই গুলিয়ে ফ্যালে, 'এই যাহ্, কী যেন বলছিলাম!' বলে হাসির খোরাক হয়। ফলে অনেকের কথাই আমরা শুনতে আগ্রহ বোধ করি না। কিন্তু তারই মধ্যে কিছু লোকের (মেয়েরাও নিশ্চয় আছে তার মধ্যে) কথা শুনলে কান খাড়া হয়, শুনতে ইচ্ছে করে। তার কারণ আর কিছুই না, তারা তাড়াহুড়ো না করে স্পষ্ট উচ্চারণে মনের কথাটা গুছিয়ে বলে।

এর জন্যে দুধরনের প্রস্তুতি লাগে। একটা জিভের, আর একটা মনের। দুটোর কাজকর্মের উৎস একই, আমাদের মস্তিষ্ক। জিভকেও মস্তিষ্কই চালায়, মন আর মস্তিষ্কও এক। জিভ শেখে উচ্চারণ, ছন্দ ইত্যাদি, আর মন কথাকে গুছিয়ে বলতে শেখায়, সাহস ও আত্মবিশ্বাস জোগায়, কথা বলার সময় খেয়াল আর আক্কেল ঠিক জায়গায় রাখে, অন্যমনস্ক হতে দেয় না, কথা বলার পেছনে যে চিন্তা তাকে গুছিয়ে দেয়। দুটোই অভ্যাস বা অনুশীলনের ব্যাপার।

উচ্চারণের কথা তো এ প্রবন্ধে বলবই। কিন্তু উচ্চারণ, ছন্দ, এগুলো হল প্রযুক্তি, এগুলো আয়ত্ত করার পদ্ধতি আছে, সেগুলো অনুসরণ করলে এগুলো শিখে ফেলা কঠিন না। তার একটা পাঠ তো ওপরে দিয়েছি। কিন্তু আমি বলব আপনারা সাহিত্যের গদ্যের পড়া দিয়ে অনুশীলন শুরু করুন। আয়নার সামনে ‘পথের পাঁচালী’ বা ‘ছিন্নপত্র’ থেকে নিজেকে পড়ে শোনান, তারপর অন্যদেরও পড়ে শোনান। দেখুন জিভের আড় ভাঙছে কি না। তারপর ‘মেঘনাদবধ’ পড়বেন, রবীন্দ্রনাথ পড়বেন, নজরুল পড়বেন— যা খুশি তাই পড়বেন। একা পড়বেন, বাড়ির লোকের সামনে পড়বেন।

জিভের আড় ভাঙার পরে এবার উচ্চারণের খুঁটিনাটি বুঝে নিন। কীসের উচ্চারণ? না, আমরা যাকে মান্য চলিত বাংলা বলি, বাংলাদেশে বলে প্রমিত বাংলা, তার উচ্চারণ। আমরা তিনভাগে ভাগ করে বাংলা উচ্চারণের কথা বলব। স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, আর যুক্তব্যঞ্জন। মনে রাখবেন, বাংলা লেখার সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের প্রচুর তফাত। লেখার মতো করে আমরা উচ্চারণ করি না। সেটা হয়তো ওপরের ছকে কিছুটা বোঝা গেছে।

৩. বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ

লক্ষ করুন, স্বরধ্বনি বলছি, স্বরবর্ণ নয়। কেন? না আবৃত্তি করি ধ্বনি দিয়ে, যা উচ্চারণ করি তা-ই হল ধ্বনি। আর বর্ণ হল যা দিয়ে লিখি। চোখে দেখার আর লেখার চেহারা হল বর্ণ। এই তফাতটা আমরা এ লেখায় করে যাব, খেয়াল রাখবেন।

না, উচ্চারণ আপনারা বেশিরভাগই জানেন। কিন্তু হয়তো এটা জানেন না যে, বর্ণমালার এগারোটা স্বরবর্ণ আমরা উচ্চারণ করি না, করি মোটে সাতটা স্বরধ্বনি। আমাদের এই মান্য চলিত বাংলায়। সেগুলো হল অ, আ, ই, উ, এ, ও আর অ্যা। ব্যাকরণে আপনারা পড়েছেন আমাদের দীর্ঘস্বর নেই, প্লুতস্বর নামে ফালতু ব্যাপারটাও নেই। এই ক'টা স্বর পরিষ্কার উচ্চারণ করা অভ্যাস করুন।

কেন এ কথা বলছি? গ্রাম থেকে অর্থাৎ উপভাষা-অঞ্চল থেকে গ্রামের ভাষা মুখে নিয়ে আসার জন্যে অনেকে অ-টা ও-র মতো করে বলেন। বা যেখানে ও হবে না সেখানে ও বলেন। যেমন ওপূর্ব, ওব্যাহত। অ কোথায় ও হবে আর হবে না, তার সব নিয়ম এখানে দেওয়া সম্ভব না, তার জন্যে আমার ‘বাংলা বলে’ বইটা (দে'জ) দেখতে পারেন। আসল কথা হল, পরিষ্কার করে স্বরগুলোকে উচ্চারণ করা, যাতে একটার সঙ্গে আর-একটা গুলিয়ে না যায়।

আ নিয়ে সমস্যা হল, আ-টা অনেকের মুখে ছোট হয়ে যায়। আ বলার সময় মুখের হাঁ-টা সবচেয়ে বড় হয়। হাঁ-টা বড় করে আ বলবেন। বাকিগুলো নিয়ে বেশি সমস্যা

নেই, কিন্তু ই বলার সময় ঠোঁট দুটো কাছে এসে দুপাশে ছড়িয়ে যাবে, আর উ-তে ঠোঁট শিশ দেবার মতো সরু আর গোল হবে। তাই ই আর এ, এবং উ আর ও-তে যেন গুলিয়ে না যায়। অ্যা-টাও যেন এ-র সঙ্গে বেশি ঘ্যাঁষাঘেঁষি না করে।

৪. বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ

স্বরধ্বনির মতোই বাংলা বর্ণমালার সব ব্যঞ্জনবর্ণ আমরা উচ্চারণ করি না। কী কী? উচ্চারণ করি না ঞ, ণ, য, ষ। উচ্চারণ করি না মানে কী? আমরা অন্য কিছু দিয়ে উচ্চারণ করি। এগুলো নিয়ে ভাবার দরকার নেই। খণ্ড ৎ আর ত-এর উচ্চারণ একই, যেমন ঙ আর অনুস্বারের উচ্চারণ— ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। চন্দ্রবিন্দুর কথা পরে বলব। ও হ্যাঁ, আলাদা করে শ, ষ, স— সব শ-এর উচ্চারণই এক-শ, যেমন শারী, সারা, ষাঁড়। য-কে নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই, কিন্তু যুক্তব্যঞ্জনে স আর শ কোথায় আলাদা হয় সে কথা আমরা পরে বলছি।

ব্যাকরণের মধ্যে বেশি যাব না, কারণ ব্যাকরণ সম্বন্ধে আপনাদের অনেকের ভয় আছে আমি জানি। তবু স্কুলে শেখা দু-একটা পরিভাষা আবার তুলে আনতেই হবে। যেমন অল্পপ্রাণ আর মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন। ক গ চ জ ট ড ত দ প ব ড হল অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন, কারণ এগুলোর উচ্ছারণে বেশি ধাক্কা লাগে না। ঙ ম আর ন, এবং র ল শ আর স কেও এর মধ্যে ফেলা যায়। কিন্তু মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের উচ্চারণে একটু জোরে ধাক্কা দিতে হয়। বাচ্চাদের ঠোঁটের সামনে তুলো বা মোমবাতির শিখা ধরে ক-খ, প-ফ, ব-ভ উচ্চারণ করতে বললে দেখবেন দ্বিতীয়টার বেলায় তুলো বা মোমবাতির শিখা বেশি ছিটকে যাবে।

কাজেই এগুলো অভ্যাস করুন। বাংলাদেশের অনেক জেলার মানুষদের এগুলো নিয়ে সমস্যা আছে, যেমন আছে চ ছ জ ঝ নিয়ে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার লোকেদের এই ধাক্কাটার কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। এই কথাগুলো প্র্যাকটিস করুন- কাকা খা খা, গা গা ঘা ঘা, চিঁ চিঁ ছি ছি, জি জি ঝিঁ ঝিঁ, টাটা ঠাঠা, তাতা থই থই, দাদা ধাঁধা, পিক পিক ফিকফিক, বারবার ভার ভার, মুড়ো মূঢ় গুঁড়ো গূঢ়। আর-একটা সমস্যার জায়গা হল র আর ড়-র উচ্চারণে তফাত করা। দুয়ের উচ্চারণ দুরকম। খেয়াল করে পড়ুন এটা-জিভের ডগা দিয়ে দুটোরই উচ্চারণ, কিন্তু জিভের ব্যবহার দুয়ের বেলায় এক রকম নয়। র উচ্চারণে জিভ স্বাভাবিক ডগাটাকে ওপরে তুলে ওপরের দাঁতের পাটির ঠিক পেছনে ছুঁয়ে আসে। কিন্তু ড় বলার সময় জিভটা উলটে যায়, তারপর ডগার তলাটা দিয়ে আরও ওপরে একটা গর্ত মতন জায়গায় ঝাপট মেরে আসে। নীচে এক কথাগুলোকে পাশাপাশি উচ্চারণ করার চেষ্টা করুন, জিভের চলনটাও লক্ষ করুন, নিয়ন্ত্রণ করুন—

করাকরি-কড়াকড়ি, গরগর-গড়গড়, চরাচর-চড়চাপড়, জরোজরো-জড়াজড়ি, ঝরে-ঝড়ে, তারা-তাড়া, দরাদরি-দড়াদড়ি, ধরাধরি-ধড়াচুড়ো, নরনারী-নড়ানড়ি, পরে পরে-পড়ে পড়ে, বর্বর- বড় বড়, বারি-বাড়ি, সারি-শাড়ি, নারী-নাড়ি, তারা-তাড়া, মরে গেছে-মোড়ে গেছে, সরাসরি-ষাঁড়াষাড়ি, হার-হাড়।

ব্যঞ্জনধ্বনির শেষ সমস্যার জায়গা হল শ আর স।

এও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণের সঙ্গে জড়িত। স আর শ-এর সঙ্গ ত থ ন র আর

ল- এর যুক্ত ব্যঞ্জন হলে দুয়েরই উচ্চারণ স বা ইংরেজি S-এর মতো হয়। 'প্রশ্ন' কথাটা ব্যতিক্রম। আর দু নম্বর স্ক, স্থ, আর স্ফ-এর বেলায় শব্দের গোড়ায় s, আর শব্দের অন্য জায়গায় sh উচ্চারণ হবে। যেমন স্কন্ধ, কিন্তু ভাস্কর [ভাশকর] , স্খলন, কিন্তু পদস্খলন, স্পন্দন কিন্তু নিঃস্পন্দ। এখানে আবার হৃৎস্পন্দন ব্যতিক্রম। স্ফুরণ, কিন্তু বিস্ফোরণ [বিশফোরোন]।

যাঁদের শ-এর বা স-এর দোষ আছে, তাঁদের সে দোষ কাটানোর কৌশল শিখিয়ে দিই। যাঁরা শাইকেল, শুটকেশ, শিনেমা শিগারেট বলেন তাঁরা শ বলতে জিভটা লাগান, তারপর তালু-তে সেঁটে রেখেই, আওয়াজ না থামিয়ে, সেটা এগিয়ে নিয়ে আসুন। দেখবেন শ-টা হয়ে যাবে। কোন জায়গায় স হচ্ছে সেটা লক্ষ করুন। এবার সেই জায়গায় লাগিয়ে স বলতে থাকুন।

আর যাঁদের স-এর দোষ, সামবাজারের সসিবাবু বলেন, তাঁরা এর উলটোটা করুন। তাঁরা স বলতে জিভ লাগান ওপরপাটির দাঁতের গোড়াকার ঢিবিটায়, তারপর স-এ থেকেই, আওয়াজ না থামিয়ে, সেটাকে পিছিয়ে নিয়ে যান একটু, দেখবেন শ হয়ে যাবে। এ লেখা যেহেতু পশ্চিমবাংলার পাঠকদের জন্য, সেহেতু আমি চ ছ জ ঝ ইত্যাদির উচ্চারণ নিয়ে কিছু বলছি না। যদিও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় চ আর জ-এর ইংরেজি s আর z -এর মতো উচ্চারণ হয়। তবে সেখানকার ছেলেমেয়েরা স্কুলে-কলেজে এসে সে-উচ্চারণ শুধরে নেন। তার ফলে গোসাবা, কাকদ্বীপ সব অঞ্চলেই চমৎকার আবৃত্তিকার তৈরি হয়েছে তার খবর আমি রাখি।

চন্দ্রবিন্দু

চন্দ্রবিন্দু হল নাকি স্বর, অর্থাৎ স্ববধ্বনিটা খানিকটা নাক দিয়ে উচ্চারণ করা। ভূতেরা যেমন করে কথা বলে বলে আমাদের কাল্পনিক ধারণা। ভূতেরাও কাল্পনিক, তবে এই নিয়ে এখন আমি বিতর্কে নামব না। চন্দ্রবিন্দুহীনতা পূব বাংলার মানুষের উচ্চারণে বেশি, আবার পুরুলিয়া ও ঝাড়খণ্ডের মানুষের উচ্চারণে খুব বেশি থাকে। তাই সাবধান হয়ে ঠিক ঠিক জায়গায় স্বরধ্বনিতে একটু নাকি সুর আনতে হবে, কারণ চন্দ্রবিন্দু স্বরধ্বনির ওপরেই ভর করে থাকে। এই জোড়া শব্দগুলো উচ্চারণ করা অভ্যেস করুন—

আট-আঁটো, ইতুর-ইঁদুর, উচ্চ -উঁচু, একে ওকে-এঁকেবেঁকে, কাচা-কাঁচা, চাচা-চাঁছা।
ছাদ-ছাঁদ, জাতি-জাঁতি, তুতো-তুঁতে, দাতা-দাঁতাল, পাশ-পাঁশ, বাধা-বাঁধা,
শূর-শুঁড়, সার-ষাঁড়, হ্যা হ্যা-হ্যাঁ হ্যাঁ।

৪. কথার সুর

আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গের হন তবে বিশেষ সমস্যা নেই। মান্য চলিত বাংলায় একটা বাক্যের যে সুর তা আপনি জানেন, রেডিয়োতে টেলিভিশনে, ক্লাসে, সভায় শোনেন। পুব বাংলার এতে খানিকটা অসুবিধে হতেই পারে, কারণ সেখানে বাক্যের সুর কিছুটা আলাদা। সে সুর এখানে শেখানোর বিশেষ অবকাশ নেই, কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে। 'আমি বাড়ি যাব' বলতে গিয়ে আমরা যেন যাব-র ব-তে বেশি জোর না দিয়ে ফেলি। বাংলাদেশের

মানুষ প্রমিত বাংলা যেভাবে উচ্চারণ করেন তা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য, যদি দু-এক জায়গায় তাঁদের উপভাষার সুর এসে যায় সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে। মান্য ভাষাও নানা দেশে নানা রকম হতে পারে। যেমন ব্রিটেনের মান্য ইংরেজি একরকম, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর অস্ট্রেলিয়ার মান্য ইংরেজি আর এক রকম। এ ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট যত্নশীল। ঢাকায় গেলে আপনি দেখবেন দেয়াল, প্রায়ই কোনও উচ্চারণের স্কুলের বিজ্ঞাপন লেখা আছে—'এখানে প্রমিত বাংলা উচ্চারণ শেখানো হয়।' তবে বলা বাহুল্য, পশ্চিম বাংলায় স্কুল-কলেজেই সে উচ্চারণ শেখার সুযোগ অনেক বেশি।

৫. প্রযুক্তি থেকে সৌন্দর্য

এতক্ষণ আমরা মুখের ভাষায় একটা প্রযুক্তির কথা বললাম, যার নাম উচ্চারণ। সব কিছুরই একটা এই প্রযুক্তির দিক থাকে। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন উচ্চারণের ব্যাপার আছে, তেমনই তার নিজস্ব একটু প্রযুক্তি আছে, তা হল ছন্দ, মিল, ছন্দের কবিতার নানা রকমের স্তবক বা প্যারাগ্রাফ ইত্যাদি। যাঁরা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করবেন, তাঁরা শুধু উচ্চারণ শিখে বসে থাকবেন তা নয়, তাঁদের কোন্‌টা কোন্ ছন্দে লেখা তাও শিখতে হবে। কিন্তু ছন্দকে যান্ত্রিকভাবে বললে চলবে না। পূর্ণিমা চন্দ্রের জ্যোতস্নাধারায় সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায় এই দুটি লাইন কেটে কেটে পূর্ণিমা। চন্দ্রের । জ্যোৎস্না ধা। রায়। সান্ধ্য ব। সুন্ধরা। তন্দ্রা হা। রায় — এ ভাবে পড়লে হবে না। লাইনের ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে ছন্দের ওই 'যতি' -কে নরম করে ডিঙিয়ে যেতে হবে। জ্যোৎস্নাধারায় আর সান্ধ্যবসুন্ধরা এক সঙ্গে বলতে হবে, অথচ ছন্দের আভাসটাও রাখতে হবে। অর্থাৎ কবিতার ভাবের কাছে তার ছন্দের দোলা বা লাফঝাঁপকে অধীন করতে হবে।

অবশ্যই কবিতার ওপর তা নির্ভর করবে। নজরুলের 'কামালপাশা' আবার খানিকটা বীরত্বব্যঞ্জক ঝাঁকুনি দিয়ে পড়তে হবে, কিন্তু কথার অর্থ কেটে যায় এমন চলবে না। মনে রাখতে হবে, কবিতার ভাবটাই বড়, আর ভাবটা শব্দ ও বাক্যের অর্থের ওপর নির্ভর করে। অর্থকে আড়াল করে ছন্দকে প্রধান করা চলবে না।

শেষ পর্যন্ত সবই আবৃত্তি বা নাটকের সৌন্দর্য নির্মাণে যুক্ত হয়ে যায়, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, আবেগ, চোখমুখের ভঙ্গি। কিন্তু হাত-পা ছুড়ে অতিনাটকীয়ভাবে বলার জন্য সব কবিতা নয়। চ্যাঁচানোর জন্যেও নয়। সেটা আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। জোরটা কণ্ঠস্বরে ওপরেই বেশি থাকবে। তা কখন উঁচু হবে, নীচু হবে, কখন স্বরধ্বনির বিস্তার হবে, নৈঃশব্দের ব্যবহার কতটা কখন করবেন, তাও কবিতাটি বলতে বলতে অথবা অভিনয়টা করতে করতে একটা স্বরলিপির মতো করে নেবেন। অন্তত মানসিক স্বরলিপি।

বলা বাহুল্য, শুধু কবিতা নয়, গদ্যও প্রচুর আবৃত্তিযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' বা 'আত্মপরিচয়' ইত্যাদি নানা বই থেকে পাঠ করা যেতে পারে, কিংবা অশোক মিত্রের বা শঙ্খ ঘোষের গদ্য। বিদ্যাসাগর থেকে পড়তেই বা কে বারণ করছে। যা আমাদের আবেগকে উদ্বোধিত করে তার সবই কবিতা, তা ছন্দে লেখা কি লেখা নয় সেটা অবান্তর। নিজে আবৃত্তি করুন, ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি করতে উৎসাহ দিন। ভাষার শিল্পের জগতে সকলের আমন্ত্রণ।

লেখক ঃ **পবিত্র সরকার,** বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন উপাচার্য্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বদলের সঙ্গে পা মিলিয়ে বদল ঘটান থিয়েটারের

রথীন চক্রবর্তী

থিয়েটারের স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে পারস্পরিক কথাবার্তা প্রায় নেই হয়ে এসেছে। দেখা হলেই প্রযোজনার খবর এবং বিভিন্ন নাট্যদলের কাজকর্মের অবস্থান নিয়ে জিজ্ঞাসা ও আলাপচারিতা এখন চলে গেছে এক প্রান্তিক পর্যায়ে। বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রায় দু'বছর হল প্রশাসনিক নির্দেশে ঝাঁপ বন্ধ করেছে। করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ দিকে অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে মুঠি কিছুটা শিথিল করলেও থিয়েটারের নিয়মিত থিয়েটারে ফিরে আসার ব্যাপারে কোনও কৌতূহল বা উদ্যোগ শোনা যাচ্ছে না, দেখা তো দূরের কথা। সংকটটা যখন গোটা রাজ্য তথা গোটা দেশ নিয়ে তখন এই ধরনের ব্যাপক সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধানের সূত্রও ব্যাপকতর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এই রচনা নির্মাণকাল পর্যন্ত সময়ে, এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি, পশ্চিমবঙ্গের থিয়েটার হল কবে খুলবে, বা আদৌ খুলবে কিনা। সিনেমা হল খুলে দেবার নির্দেশ যখন সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছে, তখন থিয়েটার হল খুলতে বাধা কোথায়? থিয়েটারের কর্মীরা চাইছেন অবিলম্বে হল খুলে দেওয়া হোক, নাট্য-সংস্কৃতি ফের বেগবতী এক নদী হয়ে উঠুক।

কিন্তু সমস্যা একটা বা দুটো নয়। করোনা আসার আগে থিয়েটার তার মতো করেই চলছিল। বছরে একটা প্রযোজনা তো অবশ্যই, কোনও কোনও দল দুটি প্রযোজনাও করেছেন। ভালো প্রযোজনা হলভর্তি মানুষকে কাছে টেনেছে। দুর্বল প্রযোজনা কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছে পরবর্তী জোরালো পরিস্থিতির। থিয়েটারের যাঁরা টেকনিশিয়ান, তাঁরা ভালো কাজ করতে চেয়েছেন, আর অভিনেতা -অভিনেত্রীরা দেহের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে আঁকতে চেয়েছেন প্রত্যাশিত মূর্তি। তা সত্বেও প্রচুর নাট্যদল অর্থের অভাবে ধার- বাকি রেখেই কাজ করে যায়, অঞ্জনের ছায়া চোখে নিয়েই কলাকুশলীরা পা রাখেন ভবিষ্যতের পথে।

কিছু কিছু নাট্যদল আগের তুলনায় অনেক বেশি অনুদান পাচ্ছেন, কেন্দ্র বা রাজ্য বা উভয়ের কাছ থেকেই। কিছুকাল আগেই, বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ঢালাও ৫০ হাজার টাকা করে দান পেয়েছেন বেশ কিছু নাট্যদল, অবশ্যই পছন্দের বিধি মেনে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পছন্দমতো নাট্যদলগুলি যা পেয়ে আসছেন গত কয়েকবছর ধরে তা এক কথায় যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। অনুদান পাওয়া বা না পাওয়া, কম বা বেশী পাওয়া— যাই ঘটুক না কেন অনুদান 'মহৎ' কিছু কাজও করেছে।

যেমন, ১. বেশ কিছু নাট্যদলকে রীতিমতো ধনবান করেছে। ২. প্রযোজনার অনুমিত বাজেট নিয়ে এখন আর দুশ্চিন্তার কোনও অবকাশ সেভাবে রাখেনি। ৩. এইসব অনুদানপ্রাপ্ত দল কিছু নাট্যকর্মীকে কিছু 'অ্যালাওয়েন্স' দিয়ে থাকেন। ৪. কিছু নাট্যদল এখন প্রয়োজনে ভাড়াটে অভিনেতা -অভিনেত্রী নিয়ে থাকেন। ৫. কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী এই সুযোগে পেশাদার হয়ে উঠছেন বা, ওঠার চেষ্টা করছেন। ৬. কর্পোরেট অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে একটি কর্পোরেট সংস্কৃতি গড়ে তোলা, তথা নাট্যদলের কাঠামোকে সেই বনিয়াদে তৈরি করার বাসনাও কেউ কেউ পুষছেন।

এইরকম এক নবোত্থানের পরিস্থিতিতে করোনার ছায়াপাত। দেড় বছরের ওপর লকডাউন। প্রথমে কিছু কিছু দল সাময়িক স্থিতির সিদ্ধান্ত নিল। তারপর জমায়েত না করার বিধি প্রায় পুরোপুরি স্থবির করে দিল নাট্যদলগুলিকে। এই অবস্থায় পর পর যে আঘাতগুলি এল তাতে: ১. নাট্যদলের ব্যবস্থাপনা বিধি অধিকাংশক্ষেত্রে ভেঙে গেল। যেটুকু নিয়মানুবর্তিতা কাজ করছিল, তা হয়ে পড়ল দিশাহীন এবং বেসামাল। ২. নাটক প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রযোজনার টেকনিশিয়ানরা কর্মহারা হয়ে পড়ল। এই সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন নাট্যদল, সমাজসেবা কেন্দ্র, ক্লাব ইত্যাদি রাস্তায় নামল। কোথাও কোথাও স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে খোলা হল ক্যান্টিন। কিন্তু তা অনেকাংশেই যথেষ্ট নয়। ৩. অনেকেই বিকল্প কাজের সন্ধান শুরু করলেন। সবজিওয়ালা, মাছওয়ালা, মাটি কাটার মজুর... যে কোনও কাজ। এই পরিস্থিতি অনেকটা ছড়িয়ে গভীর হতাশা ও অবসাদ তৈরি করল। নাট্যঘরে বাতি জ্বলল না। ৪. যেসব নাট্যদল কিছুটা সম্পন্ন তাঁরা পরবর্তীর হিসেবনিকেশে নিমগ্ন হলেন।

আর জেলা-মফস্বলগুলিতে যাঁরা নাটক করে থাকেন, নাট্যদল করে থাকেন, তাঁরা 'থিয়েটার চলছে, চলবে' এই ঘোষণায় একেবারে মাঠে ঘাটে, উঠোনে, রাস্তায় নাটক করা শুরু করলেন। এঁরা কচিৎ-কদাচিৎ কলকাতায় ও মফস্বল সদরে প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাটক করে থাকার সুযোগ পান। স্বভাবতই তাঁরা 'হারাবার কিছু নেই' মন্ত্রেই নাটক করা শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, এগুলির অধিকাংশই ছোট নাটক, ছোট প্রাকারের নাটক, এবং ছোট একক নাটক। দর্শনী হিসেবে দর্শক যা দিয়েছেন তা-ই এঁরা নিয়েছেন সম্মানের সঙ্গে। এখানে এসে নাটকের গুরুত্ব, তাৎপর্য ইত্যাদি খোঁজার তেমন সুযোগ নেই, প্রয়োজনও পড়ে না। একে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছে 'লক্‌ডাউনের থিয়েটার' বলে।

প্রশ্নটা হল, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে ভাঙা চৌকির ওপর দোল খাচ্ছে তাতে আগামী দশ বছরের মধ্যে কোনও উজ্জ্বল অবস্থা ফিরে আসার কথা কেউ-ই আশা করছেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন, প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৌশিক বসু থেকে শুরু করে অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে পাড়ার মুদি দোকানের মালিক, বাজারের সব্জিওয়ালা, শিক্ষক থেকে অধ্যাপক কেউই বলছেন না, এই সংক্রমণ-সংকট কবে মিটবে, বা অদূরবর্তীকালেই মিটবে কিনা। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদি ব্যতিরেকে। পাশাপাশি আর একটি সমস্যা আছে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নিজেই। এইসব ক্ষেত্রে দেশের মানুষের খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকা খুব মুশকিল।

অতবড় বিষয় ছেড়ে আমরা বরং এই ছোট প্রশ্নটাতেই এখন আসতে চাই, এই পরিস্থিতিতে আমাদের থিয়েটারের,অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটারের ভবিষ্যৎ কী? কলকাতা-কেন্দ্রিক কিছু দল, যাঁরা গোড়ায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমরা রাস্তায় থিয়েটার করব, প্রসেনিয়ামে না আটকে থেকে পথে-ঘাটে মহল্লায় গিয়ে নাটক করব, তাঁদের কাউকেই কিন্তু আমরা রাস্তাঘাটে দেখিনি। অন্যদিকে, প্রোসেনিয়াম থিয়েটারে অর্থাৎ বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে এখন নাটক করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ৫০ শতাংশ আসন ছেড়ে দিয়ে এবং প্রযোজনার ক্রমবর্ধমান খরচ মিটিয়ে নাটক করার মতো শক্ত মেরুদন্ড কোনও নাটকের দলেরই নেই। প্রতিটি শো-ই ফিরে আসবে বিপুল লোকসান নিয়ে। এত লোকসান মেটানোর মতো এবং সেইভাবেই প্রযোজনার শো চালিয়ে যাওয়ার মতো আর্থিক তাগদ কোনও নাটকের দলেরই নেই। যাঁরা কেন্দ্রের অনুদানের ওপর ভরসা করার কথা ভাবছেন তাঁদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা নিয়ে বিস্ময় জাগে! করোনা ভ্যাকসিনের টাকা জোগার করতে পারছে না কেন্দ্র, মৃতের সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। দশ বছর আগে ঘটে যাওয়া আমপান বিপর্যয়ের ক্ষত রাজ্য সরকার সারাতে পারেনি আজও। তার ওপর দিয়ে চলে গেছে ইয়াস। জলের সংস্কৃতিতে, কাটমানির সংস্কৃতিতে ভাসছে পশ্চিমবঙ্গ। টাকা লুট হয়েছে, টাকার অপব্যয়ও হয়েছে। আর একের পর এক দুর্নীতির খোসা ছাড়িয়ে চলেছে মোদির সরকার। এই অবস্থায় বাংলায় নৌটঙ্কি প্রকল্পের জন্য কোটি টাকা অনুদান?

গ্রুপ থিয়েটারকে তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসতেই হবে, ছোট জায়গা, ছোট বাড়ি খুঁজতে হবে। তার উপযোগী করে মঞ্চনির্মাণের কথা ভাবতে হবে। ২০০ টাকা ৩০০ টাকা ৫০০ টাকার টিকিট করার বাবুয়ানি ভাবনা ছাড়তে হবে। প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী নাটকের ফর্ম বদলাতে হবে। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির নিরিখে থিয়েটারের কাঠামোকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। বদলের সঙ্গে পা মিলিয়েই বদল ঘটাতে হবে। এছাড়া এর কোনও বিকল্প নেই।

লেখক : **রথীন চক্রবর্তী,** পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব, থিয়েটার ও পারফর্মিং আর্ট বিষয়ক গবেষণা পত্র "নাট্যচিন্তা" এর সম্পাদক।

তত্ত্ব বনাম নাট্যশালা

সৌমিত্র বসু

একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। ঘটনাটা নাকি আমার সামনেই ঘটেছিল, কিন্তু আমার মনে নেই, মানে যাকে বলে প্রাইমারি রেফারেন্স হিসেবে বলতে পারব না, পরে শুনেছি কারুর কারুর মুখে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাংলা অনার্স সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, ১৯৭৭ সাল। হ্যালহেডের ব্যাকরণ রচনার দুশো বছর উপলক্ষে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে একটা সেমিনার হয়েছিল। সেখানে এসেছিলেন ভাষাচার্য সুকুমার সেন। ব্যাকরণবিদদের কাজ কী, এই প্রসঙ্গে তিনি নাকি বলেছিলেন, কবি সাহিত্যিকেরা তো একটু কাছাখোলা গোছের হন, আমরা, ব্যাকরণের লোকেরা তাদের কাছাকোঁচাগুলো একটু ঠিক করে দিই, এটাই আমার কাজ। সুকুমার সেনের মত ভয়ঙ্কর মুখের মানুষ এমন রসিকতা করতে পারেন বলে বিশ্বাস হয় না বলেই বোধহয়, কথাটা আমার স্মৃতি থেকে উড়ে বেরিয়ে গেছে, অন্যের কাছে শুনে সেটাকেই কাজে লাগাতে হচ্ছে। এই গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখার শুরুতে এমন একটা চটুল কথা বলার উদ্দেশ্য নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। এই লেখক গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ লিখতে পারে না। সে যা বলবে, তা এই রকম সব অভিজ্ঞতার জায়গা থেকেই বলবে।

নাটক নিয়ে কথা বলতে বসেছি আমি, যার নাকি দুটো মুখ আছে। একটা মুখে নাটক হল সাহিত্যের একটি সংরূপ, যদি খুব আইন মাফিক ভাষায় বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে কোনো সাহিত্যের মতই তার একমাত্র অবলম্বন হল মানুষের উচ্চারণযোগ্য ভাষা। বহু প্রাচীনকাল থেকে তার কিছু তত্ত্ব আছে। এ বাবদে আর একটা ছাত্র বয়সের কাহিনী বলে নিই। ওই অনার্সের ক্লাস, অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্র এলেন বাংলা নাটকের ইতিহাস পড়াতে। বাংলা নাটকের শুরু কবে থেকে এই প্রশ্নের উত্তরে যেই লেবেদেফের নাম করেছি, সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন। কেন, সাহেবদের আগে বাংলা নাটক ছিল না? তোরা যে নাটক করিস (তখন আমি বহুরূপীতে ঢুকেছি সবে), সেটা ছাড়া অন্য কোনো নাটক নেই? এত অহঙ্কার? ওই ধমক আমাকে একটা বড় ধাক্কা দিয়েছিল। সত্যিই তো, নাটক বলতে কী বোঝায়, যদি একেবারে শাঁস থেকে দেখি, তাহলে তো লেবেদেফের আগে বহু নাটক তৈরি হয়েছে বাংলায়। অথচ এখনো কোনো কোনো কলেজের সেমিনারে গিয়ে লেবেদফ তত্ত্ব শুনতে হয়। বহুদিন পরে পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বোঝাতে হয়েছে চর্যাপদের বুদ্ধ নাটক হল নাটক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদতে নাটক। পরে তো সেলিম আল দীন এসে সব তছনছ করে দিলেন। মধ্যযুগের যা কিছু সাহিত্য, ছাপাখানা আসার আগে, সে সবই হল নাটক, কারণ তার গঠনের মধ্যেই আছে উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য।

যা বলছিলাম, সেই চর্যাপদের যুগ থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে যে বাংলা নাটক, তারও তো কিছু তরিকা ছিল, সে সব কালের নিয়মে পাল্টাতে পাল্টাতে গেছে। চর্যাপদের

সময় যেভাবে নাটক হত, তার তুলনায় চৈতন্যদেবের সময়কার নাটকের বিবরণ অনেকটা পর্যন্ত আলাদা। আঠারো শতকের শেষে য়ুরোপ থেকে আসা থিয়েটার সেই স্বাভাবিক বিবর্তনকে আজকালকার ভাষায় ঘেঁটে দিল, নানা তত্ত্ব ছত্রখান হয়ে পড়ল চারপাশে। এর বাইরে, নাট্যতত্ত্ব বলতে তো তার প্রয়োজনারীতিও বোঝায়। উচ্চারণযোগ্য ভাষার নাটক, আর তার সঙ্গে আরো উপাদান মিশিয়ে যে নাট্য, এ দুইয়ের তত্ত্ব আবার হাত ধরাধরি করে চলেছে, একের কথা বলতে গেলে অন্যকে বাদ দেওয়া যাবে না। সে সব পরে হবে, আপাতত আগের কাজ আগে সারা যাক।

ঠিক করে ফেলা যাক, তত্ত্ব কাকে বলে। ঢাকা বাংলা একাডেমির হাতসই সংক্ষিপ্ত অভিধানে দেখছি তত্ত্ব মানে হল ১. আসল বস্তু, প্রকৃত অবস্থা, যাথাথ্য সত্য(তত্ত্বদর্শী)। ২. স্বরূপ। ৩. মূল উপাদান। তথ্য ইত্যাদি। এইবার দেখি ইংরেজিতে Theory বলতে কি বোঝাচ্ছে। A number of internal related concepts, definitions, meaningful ideas, which present systematic view of a phenomenon through the specification of association between variables with the purpose to explain and predict a phenomenon. (Fredrick Kerlinger) কী বোঝা গেল এ সব সংজ্ঞা থেকে? তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসল বস্তু বা তার স্বরূপটি। ইংরেজি বিশ্লেষণে বলছে, পরস্পরের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যুক্ত অর্থবহ কিছু ধারণা, তার মধ্যে দিয়ে কোনো কিছুকে ঠিক ঠিক দেখার মত একটা অবয়ব তৈরি হয়। এইভাবে যদি দেখি, তাহলে পাশাপাশি নিশ্চয় এ কথাটাও বলতে হবে, এই যে ধারণাগুলো, এগুলো দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী পালটে যায়, ফলে সামগ্রিকভাবে তত্ত্বটাও পাল্টে যাওয়ার কথা। তাই যদি হয়, তত্ত্ব তাহলে, আমরা অধ্যাপকেরা অনেকে যেরকম বুঝি, অনড় কোনো একটা নিয়মের শৃঙ্খল নয়, নানান হাওয়ায় এখান থেকে ওখানে ভেসে বেড়ানো নৌকোর মত ব্যাপার। সময় বা পরিবেশের এক একটা পর্বে তাকে শুধু নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুকুমার সেনকে দিয়ে এ লেখা শুরু করেছিলাম, তার কারণ ব্যাকরণ বিষয়টাও তাই। সেও নিজেকে পালটাতে পালটাতে যায়। সাহিত্যিকেরা কাছা খুলতে খুলতে যান, নানান যুগে নানা সচেতন মানুষ এসে তাঁদের কাছা নানাভাবে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

এই অনড় নিয়মের শৃঙ্খলা ঠিক করে দিচ্ছে কে? পণ্ডিত অধ্যাপকেরা। যেমন অ্যারিস্টটল। যেমন ভরতমুণি, যেমন অভিনব গুপ্ত, যেমন অ্যালারডাইস নিকল। তাঁরা নানা রকম সাহিত্য ঘেঁটেঘুঁটে তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। যেমন ধরা যাক অ্যারিস্টটল আবিষ্কার করেছেন ট্র্যাজেডির মধ্যে এই জিনিস থাকে, ধনঞ্জয় দশ রকমের রূপক দেখেছেন, তার আবার নানা রকম উপ ধাঁচা দেখেছেন, তাদের এই এই বৈশিষ্ট্য দেখেছেন--- ইত্যাদি। কিন্তু এও তো আমাদের অজানা নয় যে অ্যারিস্টটল যাকে ট্র্যাজেডি বলে ভাবেন শেক্সপীয়র তাকে ভাবেন না, আবার আর্থার মিলারের ট্র্যাজেডির ধারণা অন্যরকম। বলে রাখা দরকার, সৃজনশীল শিল্পী, বা আমাদের আলোচনার আওতার মধ্যে থাকার জন্যে যদি বলি সাহিত্যিক, তাঁর কাজের সঙ্গে তত্ত্বের একটা বিরোধ এবং

সমন্বয়ের সম্পর্ক আছে। তত্ত্ব শিল্পকে এক জায়গায় বেঁধে দেবার চেষ্টা করে, শিল্পী অনবরত সেই বন্ধন থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে লড়াই করতে থাকেন। কেন বেরিয়ে যাবার এই চেষ্টা তা বুঝতে তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সৃষ্টি কখনো স্থানুত্বকে সহ্য করতে পারে না। তত্ত্ব যে পালটায়, তার পেছনে কতকুগলো কারণ থাকে। মানুষের যে কোনো প্রকাশের মধ্যে বাইরের একটা চাপ থাকে, তার সময়ের চাপ, রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজ নিয়ে যে পরিমণ্ডল তার চাপ, আবার তার সঙ্গে থাকে ব্যক্তি মানুষটির ইচ্ছে অনিচ্ছের চাপ। প্রত্যেকটি প্রকাশকামী ব্যক্তির একটি নিজস্ব প্রকাশতত্ত্ব আছে। একই স্থানকালের মধ্যে থেকেও আমি যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করি আপনি সেইভাবে করেন না। এটা যেমন সত্যি, তেমনি আবার আমাদের মিলিত প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কোথাও একটা সেতুও তো আছে। এর সঙ্গে মেশে উপভোক্তা বিষয়ে ধারণা। প্রকাশটি যাদের জন্যে এই শিল্প সম্বন্ধে তাদের ধারণা কেমন, এবং তাকে প্রকাশকামী মানুষটি কোন চোখে দেখছেন তার হিসেব। এদের মধ্যে একটি, দুটি বা কয়েকটি পালটে পালটে যায়। ফলে, আমরা নিশ্চয় দেখব, বাংলা নাটকের তত্ত্ব কেমন করে বদল বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের দিক থেকে বিচার করে একটি চমৎকার সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা যায়।

তত্ত্বকে মাথায় রেখে যাঁরা সাহিত্য বিচার করেন, তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যকারদের একটা খিটিমিটি চলতেই থাকে। বাংলা নাটক এবং নাট্যের জগতে এই বিরোধ খুব বেশি হওয়ার কারণ, নাট্যজনকে পণ্ডিতদের ওপরে নির্ভর করে থাকলে চলে না, তাঁদের মাথায় রাখতে হয় দর্শকের কথা, দর্শককে সাধারণভাবে পণ্ডিতেরা খুব চেনেন না এবং হয়ত কিছুটা তাচ্ছিল্যই করে থাকেন। সেই দর্শক পালটাতে থাকেন অবিরত, আবার একথাও ঠিক তাঁদের মধ্যে কতকগুলো অনড় রক্ষণশীলতা থাকে, পণ্ডিতেরা সে সব রক্ষণশীলতা থেকেও সাধারণত অনেক দূরের মানুষ। সময়ের টানে, বিশেষ করে আমজনতার নানামুখী স্রোতের টানে ভাসতে থাকা শিল্পী আর তত্ত্বের বয়া ধরে পণ্ডিতদের বিধান, এদের মধ্যে লড়াইয়ের শেষে, একটা মাঝামাঝি জায়গায় রফা হয়। তত্ত্ব কিছুটা নমনীয় হয়, শিল্পীকেও কিছুটা মেনে নিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই সমন্বয়ের চেহারা সবাইকার বেলায় এক রকম হয় না। নাট্যের ক্ষেত্রে অন্তত, যিনি পেশাদার মঞ্চের জন্যে নাটক লেখেন, নিজের মত করে তত্ত্ব তৈরি করার ঝুঁকি তিনি যতটা নিতে পারেন, যিনি আম জনতার জন্যে লেখার দায় বোধ করেন না, তাঁর স্বাধীনতা অনেক বেশি। দ্বিতীয় দলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ নিশ্চয়, রবীন্দ্রনাথ, বহু মানুষের মন যুগিয়ে চলতে হয়নি বলে, এবং একই সঙ্গে একেবারে গোড়া থেকে পণ্ডিতেরা তাঁর নাটককে নাটক বলে মনে করেন নি এই স্বাধীনতার আনন্দে অনবরত নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে যেতে পেরেছেন।

অধ্যাপকেরা সব জানেন, কিন্তু ছাত্রেরা যদি জিজ্ঞেস করে, কেন স্যার, বঙ্কিমচন্দ্র বলুন রবীন্দ্রনাথ বলুন, এঁরাও তো সাহিত্যতত্ত্বের উপর লেখা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের তো সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে একাধিক বই আছে, তাঁরা কি শুধু পণ্ডিত, তাঁরা কি স্রষ্টা নন? নিশ্চয়,

আমি বলব। কিন্তু তাঁরা যখন এই সাহিত্যতত্ত্বের ওপর লেখা লিখছেন, তখন তাঁরা তাঁদের যে সৃজনশীল মন, তাকে একটা কাঠানো দেবার চেষ্টা করেছেন, একটা যুক্তির ভিত। ধরা যাক, রবীন্দ্রনথ সাহিত্য বইয়ের প্রবন্ধগুলো যখন লিখছেন, তখন তার ভেতর দিয়ে তাঁর সেই সময়কার সাহিত্য ভাবনাকে একটা যুক্তিকাঠামোর ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা টের পাওয়া যায় না? আবার সাহিত্যের পথে যখন লিখছেন, তখন তার সূত্রে সাহিত্য কেমন হবে সেই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার ভাবনাচিন্তা প্রকাশ পাচ্ছে। লক্ষ করে দেখবেন, ঊনিশ শতকের আগে কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্যিকেরা সাহিত্যতত্ত্বের ওপর কিছু লিখছেন না, বস্তুত, আমার জ্ঞানে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য তত্ত্বের ওপর লেখা বোধহয় পাওয়া কঠিন হবে। তার একটা দুটো কারণের কথা মনে হয়।

যিনি তত্ত্ব রচনা করছেন, তাঁর একটা স্বাধীন চিন্তার পরিসর আছে, এবং তার চেয়েও বড় কথা, তত্ত্বের স্রষ্টাকে কিন্তু বিশেষভাবে সেই বিষয়ের মানুষই হতে হবে। সাহিত্যের বা সেই বিশেষ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নন এমন মানুষেরা তত্ত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে গোলমাল পাকিয়েছেন এমন উদাহরণ পরেও পাওয়া যাবে, চারের দশকে। তার কথায় পরে আসব। মধ্যযুগে সাহিত্যকে সাহিত্যের মানুষেরা নিয়ন্ত্রণ করতেন না। প্রাগাধুনিক যুগে সাহিত্যের কাজ ছিল মূখ্যত সামাজিক, অর্থাৎ , সেখানে যিনি রচনা করছেন তাঁকে আবিষ্কার করার বদলে মন দেওয়া হতো এর মধ্যে দিয়ে সমাজকে কী বার্তা দেওয়া হচ্ছে তার ওপর। বলা বাহুল্য, সে বার্তা সমাজ অনুমোদিত হতে হবে, মানে সমাজ যাঁরা চালান, সমাজের স্টিয়ারিং যাঁদের হাতে তাঁদের পছন্দসই হতে হবে। ধরা যাক, আমাদের প্রাচীন এবং যাকে মধ্যযুগ বলা হয়, শব্দটা সবাইকার পছন্দ নয় সংগত কারণেই-- ভারতীয় নাটকে ট্র্যাজেডি নেই। সেই কবে ভাস কী লিখেছিলেন তার কথা বাদ দিন, কিন্তু সংস্কৃত নাটক বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানপোষিত ধারা মিলনান্তই হয়, এই হল তত্ত্ব। কেন এই তত্ত্ব আমরা সকলে জানি। একটা কারণ এসেছে পরলোক থেকে, অর্থাৎ আমরা তো পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি, এ জন্মে মিলন না হলে পরের জন্ম অছে। ফলে বিচ্ছেদে কখনো কোনো কাহিনী শেষ হতে পারে না। এই সূত্রে মনে পড়বেই পুনর্জন্ম এবং বিবাহের সমস্যা নিয়ে পরশুরামের যুগান্তকারী দুষ্টুমির আখ্যান, কিন্তু সে তো বহু পরের কথা, সবাই জানেন। আর দ্বিতীয় কারণ হল, রাজামশাই, জমিদার মশাই প্রমুখ মশাইরা যা দেখবেন, তাঁদের কোমল প্রাণে আঘাত লাগে এমন কিছু কি সাহিত্যের মধ্যে থাকা উচিত?

এর মধ্যে একটা শব্দ বলে ফেলেছি, প্রতিষ্ঠানপোষিত, কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। মধ্যযুগের সাহিত্যের একটা ধারা আছে, যে ধারাটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন অধ্যাপকমশাইরা, লক্ষ করে দেখবেন, সেই ধারাটি কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে প্রতিষ্ঠান হতে পারে রাজা জমিদার ভূস্বামী, যিনি কবিকে খেতে পরতে দিচ্ছেন, জমিজমা দিয়েছেন থাকবার জন্যে। আর একটা হল কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ, যেমন বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায় ঠিক করে দিলেন, কী কী থাকলে কোন্ কোন্ পর্যায়ের পদ বলে ধরা হবে। প্রতিষ্ঠান তো কবির ওপরে তার নিয়মকানুন চাপাতে চাইবেই, এবং

কবিকে তা মেনেই চলতে হবে। কৃষ্ণচন্দ্রের মনে হল অন্নদামঙ্গলের মধ্যে একটু ভবানন্দের প্রশস্তি থাকা দরকার, কিংবা বিদ্যাসুন্দরের রসাল গল্প থাকলে মজা, ভারতচন্দ্রকে সোনামুখ করে তাই জোগাতে হবে। তবে বলবার কথা এই, যিনি ভাল খেলোয়াড়, এসব বাঁধাবাঁধির মধ্যেও তিনি খেলে দিতে পারেন, তার উদাহরণও মধ্যযুগের সাহিত্যে কম নয়।

এর বাইরে আছে আর একরকম সাহিত্য, যাদের ওপর প্রতিষ্ঠানের চাপ ওইভাবে নেই। ওইভাবে কথাটা খেয়াল রাখবেন, আমি কিন্তু পুরোপুরি নেই বলি নি। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গীতিকাগুলি , পূর্ববঙ্গ গীতিকা বা ময়মনসিংহ গীতিকা যা কিছু বলা যাক না কেন। এরা কোনো প্রতিষ্ঠানের আদেশে রচিত নয়, অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা, কিংবদন্তী মিশিয়ে মুখে মুখে রচিত হয়েছে, পরে তারা লিখিত রূপ পেয়েছে। তার ফলে, প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যে যা অসম্ভব, এখানে তা প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে, ট্রাজেডি বা অন্তত বিয়োগান্ত সাহিত্যের লক্ষণ। মজা হল, এই যে অপ্রাতিষ্ঠানিক গীতিকাগুলি, বহুদিন পরে বিদ্বৎসমাজ নামক প্রতিষ্ঠান তাকে গ্রহণ করতে গিয়ে নলচে অনেক কিছু পালটে দিয়েছে। কিন্তু যেটা খুব নজর করবার মত, এদের বিষয়ে না হোক গঠনের মধ্যে কিন্তু মঙ্গলকাব্যের যে ধাঁচা, তা বেশ খানিকটা মিশে যেতে পেরেছে। মধ্যযুগ বিষয়ে এই লেখক সম্পূর্ণ অনপঢ়, খানিকটা বাচালতার মত করেই হয়ত সে এর একটা কারণ বার করবার চেষ্টা করতে চায়। আখ্যানকাব্যের একটা স্বীকৃত রূপ তখন এমন কি হাওড় জঙ্গল মইষের শিং এই তিনে ময়মনসিঙের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত ছিল, শিষ্ট সাহিত্যের সেই স্বীকৃত গড়ন এদের প্রভাবিত করেছে। এই পালাগুলির সঙ্গে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, চরিত্র হিসেবে তারা এসেছে এই সব পালা গুলিতে, রচয়িতা হিসেবে এসেছে, এবং নিশ্চয়, জমিদারবাবু বা সম্পন্ন বাবুদের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে এই সব পালা গাওয়া হত। ফলে, খানিকটা প্রেস্টিজ রক্ষার উদ্দেশ্যে শিষ্ট সাহিত্যের আদলে নিজেদের সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা সেখানে অসম্ভব নয়। গীতিকাগুলিকে বাদ দিলেও দেখব, প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের বাইরে যাদের আমরা লোকসাহিত্য বলে থাকি, তাদের মধ্যেও বিষয় আর গঠনের একটা ধাঁচা তৈরি হয়ে উঠছে। ধাঁধাঁ বলুন, রূপকথা উপকথা বলুন, ছড়া বলুন, এরা সকলেই একটা নির্দিষ্টতার মধ্যে যেতে চায়। এর থেকে কি এমন সিদ্ধান্ত করা যাবে যে মানুষের সৃজন হয়ত জনপ্রিয়তার আকাঙ্খায় একটা ছাঁদের আশ্রয় চায়, সে আশ্রয় ছাড়া শিল্পী এবং গ্রাহক দুজনেই অসহায় বোধ করে। এই বশ্যতা হয়ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কম এমন জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞান, আধুনিকতার একটা বড় লক্ষণ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ, তা কিন্তু বার বার স্বীকৃত ছাঁচকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছে।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ যত বেশি বাড়বে, শিল্প সাহিত্যে তত বেশি করে নতুন ধাঁচা চলে আসতে চাইবে, বিষয়ে এবং তার প্রকাশভঙ্গিতে। নতুন নতুন বিষয় আসবে, যাঁরা নিয়ে আসছেন তাঁরা বুঝতে পারছেন পুরনো ধরন দিয়ে এই নতুন বিষয়কে প্রকাশ করা যাবে না, তখন তাঁরা নতুন প্রকাশভঙ্গি খুঁজে বার করতে চাইবেন, এবং সার্বিকভাবে তার চর্চা হতে থাকলে সেটা ক্রমে একটা তত্ত্বের চেহারা নেবে। নতুন বিষয় দুভাবে আসতে

পারে, বা ঠিক ঠিক করে বলতে গেলে তিনভাবে। একটা হল ভিন্ন কোনো সংস্কৃতি থেকে বিষয় এবং সেই বিষয়কে প্রকাশ করবার ধাঁচা চলে এল, তাকে অনুসরণ করলেন অন্য দেশের সাহিত্যিক। বুঝতেই পারছেন, আমি ঊনিশ শতক থেকে সাহিত্যতত্ত্বের যে য়ুরোকেন্দ্রিক পরিবর্তন আসছে তার কথা বলছি। ঔপনিবেশিকতার এইটা একটা প্রকাশ, যে দেশে তারা উপনিবেশ তৈরি করেছে, শুধু রাষ্ট্রীক দিক থেকেই নয়, মানুষের প্রকাশভঙ্গির এলাকাতেও নিজের আধিপত্য কায়েম করা। একে তো রাষ্ট্র চলছে তাদের ইচ্ছেমত, তার ওপরে তারা সঙ্গে এনেছে রেনেসাঁস পরবর্তী য়ুরোপের ভাবনা আর দৃষ্টিভঙ্গি, এদের মিলিত তীব্রতা আমাদের শিক্ষিত মানুষদের তা প্রভাবিত করেছিল, নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁদের মনে এক ধরনের হীনমন্যতা তৈরি হয়ে গেল। আমাদের ভাষা ফিশারম্যানের ভাষা ইত্যাদি ভাবতে লাগলেন তাঁরা, এবং সাহিত্যে সেই বিদেশী ধাঁচাকে নিয়ে আসার চেষ্টা শুরু হল। যদি নাটকের কথায় আসি, ভেবে দেখুন, আমি আপনি নই, বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদদের মত মানুষ মনে করছেন কালিদাস খুব বড় কবি, কিন্তু নাটক লিখতে জানতেন না। তাঁদের এই কথাটা মাথায় এল না যে কালিদাস যে ধরনের দর্শকের জন্যে যে ধরনের মঞ্চে যে ভাবধারার সমাজে নাটক লিখেছেন, শেক্সপীয়রের নাটক লেখার পুরো পটভূমি তার থেকে আলাদা, এমন কি, হায়, যে বঙ্কিম সাহিত্যে রেস মিলিয়ু মোমেন্টের সংযোগ নিয়ে প্রবন্ধ লিখছেন, তিনিও কথাটা বুঝতে চাইলেন না। এর ফলে একটা বড় সর্বনাশ হল। ঊনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোক আর অভদ্রলোক, ইংরেজি জানা আর ইংরেজি না জানায় বিভাজন তৈরি হয়ে গেল, এবং ইংরেজি জানা ভদ্রলোকেরা এই সাহিত্যতত্ত্ব তৈরি করলেন, যেখানে মধ্যযুগের উত্তরাধিকারকে ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা আছে।

শুধু যে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ এর জন্যে দায়ী এমনটা হয়ত নয়। এই ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি, আমি সংস্কৃতি শব্দটাকে তার সামগ্রিক অর্থেই ব্যবহার করতে চাইছি, এতটাই সার্বিকভাবে আমাদের ভদ্রলোকি ভাষায় চলে আসতে পেরেছিল তার কারণ, ঊনিশ শতকের বদলে যাওয়া সমাজ অর্থনীতি আমাদের, মানে শহুরে ভদ্রলোকেদের ভেতরে নানা রকম বিপন্নতা তৈরি করেছিল। স্থানু অর্থনীতির শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন থেকে বাঙালি ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে নতুন সময়ের ঘূর্ণীপাকে, এবং সবটাই ভগবানের হাত বলে নিজের ওপর যাবতীয় অবিচারকে মেনে নিচ্ছে না, সে পুরাণ থেকে, ইতিহাস থেকে, সমকাল থেকে তার বিপন্নতার সমর্থন খুঁজছে। মধুসূদন যে মেঘনাদবধ লিখছেন, তার পেছনে সমস্ত রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জীবনে তাঁর পরাভবের একটা বড় ভূমিকা আছে, সে তো মাস্টারমশাইরা ক্লাসে পড়াবার সময় বলেই থাকেন। আমার জীবন আমার ওপরেই নির্ভর করে না, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্য নানা রকমের ঘটনা পরম্পরা, মধুসূদনের নাটকে কি এই কথা নানাভাবে বলা নেই? বলা নেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাটকে, দ্বিজেন্দ্রলালের লেখায়? সোজা কথায় যদি বলি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা আত্মপরিচয় বা গ্রন্থোৎপত্তির কারণ জাতীয় অংশগুলো বাদ দিয়ে নিজেকে আড়ালে রাখতে চেয়েছেন, রাখতে বাধ্যও

হয়েছেন। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে কিন্তু লেখকের আন্তর আত্মজীবনী অনেক বেশি করে প্রকাশ্য হয়ে এল।

এইখানে একটা কথা বলি, নাটকের মানুষ হিসেবে। অন্য যে শহুরে সাহিত্য সংরূপগুলো, সেখানে লেখকেরা নিজেদের মত করে বৃত্ত তৈরি করে নিচ্ছেন, নিজেদের গোষ্ঠীর কথা ভেবে সাহিত্য রচনা করছেন, সেই রকম একটা সাহিত্যতত্ত্ব তৈরি হয়ে উঠছে। নাটকে কিন্তু এমনটা হওয়া মুশকিল, বিশেষ করে থিয়েটার পেশাদার হবার পরে। ১৮৭২ এ, যখন টিকিট বিক্রি করে নাটক করার কথা ভাবলেন, অর্ধেন্দু শেখর ধর্মদাস সুর ইত্যাদিরা, গিরিশচন্দ্র তাঁদের দলে গেলেন না। ছদ্মনামে লেখা তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতার লাইনটি মনে পড়বে আপনাদের-পেশাদার থিয়েটারে স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ীশুড়ী পয়সা দে দেখে বাহার। ভদ্রলোকের সন্তানেরা থিয়েটার করছেন, সেখানে পয়সা থাকলে হাড়ীশুড়ীও ঢুকতে পারবে, এতে গিরিশচন্দ্রের আপত্তি ছিল। সেই গিরিশচন্দ্রকে অভিমান ত্যাগ করে হাড়ীশুড়িদের জন্যে থিয়েটারের যাবতীয় দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে হল, সে তো অন্য কাহিনী। আমরা যদি তত্ত্বের দিক থেকে দেখি, সেই সময়ে ভদ্রলোকেদের থিয়েটার বিষয়ে একটা বিরাগ ছিল, ব্রাহ্ম ভদ্রলোকেদের সেই বিরাগ নিয়ে তো রসালো গল্পই চালু আছে। গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধে দেখছি, সমাজের শিক্ষিত মানুষেরা থিয়েটার দেখেন না, এই নিয়ে প্রবল খেদ প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং থিয়েটার চালাতে গেলে আম জনতার কথা ভাবতে হবে, তাঁদের মত করে নাটক লিখতে হবে, তাঁদের হৃদয়ের কম্পাঙ্কের সঙ্গে থিয়েটারের আবেগকে মেলাতে হবে। ছাপা যে কোনো সাহিত্য আদর পাবার জন্যে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করতে পারে, থিয়েটারে তো নগদ বিদায়। ফলে, উনিশ শতকে প্রতাপচাঁদ জহুরীর আগমনে যথার্থ অর্থে মালিকি থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বাংলা থিয়েটারের মূল ধারা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপগুলোর থেকে বেশ খানিকটা আলাদা হয়ে গেল, তার জন্যে বিদ্বৎজনেদের কাছে গালমন্দও খেল কম নয়।

নাটক নিয়ে বলার ফাঁকে একটা অন্য কথা বলে নিই, আপনারাও নিশ্চয় লক্ষ করেছেন সেটা। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে য়ুরোপের অনুগ্রহণটা এসেছে মূলত প্রকাশভঙ্গি বা সংরূপের স্তরে, নিশ্চয় দৃষ্টিভঙ্গির স্তরেও, কিন্তু ঘটনা বা পটভূমি সবটাই রেখে দেওয়া হয়েছে দেশজ করে। ধরুন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় লিখছেন তিনি সব রকমে ইংল্যান্ডের কবিতার অনুসরণে এই কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু বিষয় হল রাজপুতানার ইতিহাস। আলালের ঘরের দুলালের গোড়ায় বলা হচ্ছে , এই রকম পুস্তক লেখার প্রণালী এ দেশে খুব প্রচলিত নয়, কিন্তু পটভূমি সমকালীন বাংলাদেশ। ভারতীয় পুরাণকে নিয়ে তিলোত্তমাসম্ভব প্রসঙ্গে মধুসূদন চিঠিতে লিখছেন বিদেশী বাতাসের কথা। যখন থেকে সত্যিকারের পেশাদার থিয়েটার চলে এল, তখন থেকে আমাদের নাট্যসাহিত্য কিন্তু অন্য যেসব সাহিত্য সংরূপ, যারা পাঠকের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে, যারা কম পাঠকের একটি বৃত্তের জন্যেই তার লেখা লিখতে পারে, তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল।

থিয়েটার এখানে একটি পণ্য, সেই পণ্য বিক্রি করলে তবে থিয়েটারের সঙ্গে মানুষের পেটে ভাত জুটবে। এমন বাধ্যতা অন্য সংরূপের চর্চা যারা করছেন তাঁদের মধ্যে ছিল না। পেশাদার হবার দায়ে গিরিশচন্দ্রের মত মানুষকে বাধ্য হতে হল জনপ্রিয়তার উপাদান নাটকে ভরে দেবার জন্যে। সেই উপাদানগুলো কী কী? রামায়ণ মহাভারত থেকে আখ্যান বেছে নেওয়া হচ্ছে তো বটেই, তার গঠনের মধ্যেও নিয়ে আসা হচ্ছে মধ্যযুগীয় প্রথানুগ যাত্রার ধরন, প্রভূত পরিমাণে গান ব্যবহার করা হচ্ছে, পদ্য সংলাপ, মধ্যযুগীয় কমিক চরিত্র। এসব কিছুই মধ্যযুগের সাহিত্যের অনুবর্তন বলে মনে করা যেতে পারে। কেমন করে জনপ্রিয় বিষয়গুলিকে বেছে নেওয়া হচ্ছে থিয়েটারের জন্যে, তার উদাহরণ হিসেবে একটা ঘটনার কথা বলি আপনাদের।

আমার বিশ্বাস গল্পটা আপনাদের অনেকেরই জানা, তবু বলছি, কারণ এটা আমার খুব প্রিয় ঘটনা, সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে না হোক, নাট্যাভিনয়ের ছাত্র হিসেবে তো বটেই। প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে নাটকের দায়িত্ব নিয়েছেন গিরিশচন্দ্র, কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস থেকে কাহিনী নিয়ে নাটক লিখছেন, মূল রামায়ণ মহাভারত থেকে নিয়ে নয়। তার মানে, মধ্যযুগের বাংলার যে নিজস্ব সাহিত্য, বৃহত্তর বাংলার শিকড় থেকে উঠে আসা-- যার সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের একটা আভাসটুকু মাত্র বুনে দেওয়া আছে, তার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি করতে চাইছেন গিরিশচন্দ্র। প্রযোজিত হল সীতার বনবাস। প্রবল জনপ্রিয়তা পেল। এরপরে অভিমন্যু বধ। বিদ্বজনেরা ভাল বললেন, কিন্তু আম জনতার পছন্দ হল না। প্রতাপচাঁদ তখন গিরিশচন্দ্রকে ডেকে বললেন, বাবু, যব দুসরা কিতাব লিখ গে, তব ফিন ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও। অর্থাৎ পরের নাটকে লব আর কুশকে ব্যবহার করতে হবে। লেখা হল লক্ষ্মণ বর্জ্জন। অভিমন্যু বধ ছিল বীররসের নাটক, আর স্বামী বিনা অপরাধে স্ত্রীকে বিসর্জন দিচ্ছে, তার বঞ্চিত যমজ সন্তান লব আর কুশ, পিতার সেই পুত্রদের চিনতে পারা, তার মধ্যে আছে করুণ রস আর তীব্র ইচ্ছাপূরণের আখ্যান। বাঙালি দর্শক এই করুণ ইচ্ছাপূরণের কাহিনীই বেশি পছন্দ করবে। বিশেষ করে মনে রাখা চাই, প্রতাপচাঁদ মহিলাদের থিয়েটার দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঊনিশ শতকের সংসারে বন্দিনী অবহেলিত নারী তো এই চাইল্ড আর্কিটাইপের গল্প অভিভূত হয়ে পড়বেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যদি বলেন, এই নাট্যতত্ত্বের ভাবনা কি কোথাও স্বীকৃতি লাভ করছে? বলব, না, করছে না। এই পর্যায়ের নাটকে যেসব অংশকে নাট্যতত্ত্বের জনপ্রিয়তা তৈরির জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের হতচ্ছেদ্দা করছেন পণ্ডিতেরা, যে সব অংশ আসর জমানোর জন্যে, মহৎ ভাবকে প্রকাশ করছে না, অন্তত সাহিত্য হিসেবে অনের সময়েই তাকে স্বীকার করতে চান নি। পরবর্তীকালে আমরা জেনেছি জনপ্রিয় সাহিত্যের তত্ত্ব, সে তত্ত্ব অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনের মধ্যে আসতে তখন অনেক দেরি । পেশাদার বাংলা থিয়েটারের নাটক লিখতে বসে এই যে ধারণা বা ভাবনাগুলো বেরিয়ে আসছে, ব্যাপকভাবে এদের একটা তাত্ত্বিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি, তার থেকে বুঝতে পারা যায়, যাঁরা তত্ত্ব তৈরি করেন, তাঁদের সঙ্গে এই

নাট্যভাবনার একটা প্রগাঢ় অমিল রয়েছে। গিরিশচন্দ্র নিজে অবশ্য এই ভাবনাকে তত্ত্বের আকার দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর একাধিক লেখায়। মনে কি পড়বে, এই রচনার একেবারে শুরুতে বলা হয়েছিল, কেনো একজন লেখক তাঁর নিজের সাহিত্য ভাবনাকে প্রকাশ করবার জন্যে সাহিত্যতত্ত্ব তৈরি করেন। মধুসূজন করেছেন চিঠিপত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছেন, গিরিশচন্দ্রও তাই।

গিরিশ নাটকের এই যে তত্ত্ব, যা বাংলা পেশাদার থিয়েটারকে দীর্ঘদিন ধরে অধিকার করে রেখেছিল, আগেই বলেছি, তার মধ্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্য এবং অভিনয়ধারার খুব স্পষ্ট অনুবর্তন আছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, তা প্রায় কখনোই সাধারণ মানুষের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের মত কাব্য সেখানে ব্যতিক্রম মাত্র। এর দুটো কারণ। প্রথমত, মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত ধর্মপ্রচারের কথা ভেবে লেখা হচ্ছে, এবং যে কোনো প্রচার বাধ্যতামূলকভাবে সহজ, আম জনতার ভাষাতেই করতে হবে, তা না হলে তা অনেক মানুষের কাছে গৃহীত হবে না। আর দ্বিতীয়ত, এঁরা যে সাহিত্যতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন তার থেকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা অভিজাত সাহিত্যতত্ত্বও ছিল বহু দূরবর্তী, য়ুরোপীয় তত্ত্বের তো প্রবেশাধিকারই হয় নি তখন। ফলে, তখনকার মননশীল মানুষে আর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সহজ বোধগম্যতার সেতু ছিল বলে বুঝতে পারি, ঔপনিবেশিক যুগে এসে যে সেতু ভেঙে পড়ে গেল। গিরিশচন্দ্র থেকে ধরা যাক গণনাট্য সংঘের আগে পর্যন্ত যাঁরা নাটক লিখেছেন নাটক করেছেন, তাঁরা সকলেই য়ুরোপীয় রীতিতে উচ্চশিক্ষিত, তাঁদের ভাবনা চিন্তা রুচি পছন্দের জগতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের রুচি পছন্দের মিল না হওয়ারই কথা। তার ফলে, এঁদের অনেককেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিল্পের কাজ করতে হয়েছে। যদি বা কখনো ঝুঁকি নিয়েছেন, প্রায়শই ব্যর্থ হতে হয়েছে। শিশিরকুমার ভাদুড়ির সাহিত্যরুচি তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ করিয়েছে, যোগাযোগ বা তপতীর মত নাটক, তার করুণ ইতিহাস সকলেরই জানা। যোগাযোগের শেষটা পালটাবার অনুমতি দিতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, জন্ম বিদ্রোহিনী কুমুকে ফিরে যেতে হয়েছিল মধুসূদনের কাছে। তা না হলে লোকে দেখবে না এ নাটক। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ খুশি মনে মেনে নেন নি, প্রিয় শিশিরের অনুরোধে বাধ্য হয়েছিলেন বলা চলে। শম্ভু মিত্রের মারফৎ শিশিরকুমারের সেই খেদোক্তি আজ নাটকের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো মানুষই জানেন-- সারাজীবন ঘুঘুবীর(রঘুবীর) আর হালুমবীর(আলমগীর) করে গেলাম, একটা ভাল নাটক পেলাম না। এইভাবে মধ্যবিত্ত মননশীল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ থিয়েটার করছেন তাঁদের জন্যে, যাঁরা শিক্ষিতের যে চালু ধারণা, তাতে শিল্পী বা নাট্যকারদের সমান নন। কিন্তু তাঁরাই যেহেতু ক্রেতা, তাই তাঁদের মন রক্ষা করে চলবার নাট্যতত্ত্ব তৈরি হয়ে গেল।

চারের দশকে বাংলা নাট্যপ্রচেষ্টা একটা বড় বাঁক নিল। গণনাট্য সংঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নাটক লেখা শুরু হল, সেই সঙ্গে এই নতুন সময়ের নতুন ধাঁচার নাটকের প্রযোজনা। সে সব নাটকের ধরন কী রকম হবে, প্রযোজনাই বা কোন্ ভাবনার জায়গা

থেকে বাঁধা হবে? এতদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে নাটককার বা প্রযোজকেরা যাচ্ছিলেন অর্থ উপার্জনের জন্যে, এখন তাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের মনের মধ্যে রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রোথিত করে দেবার জন্যে। দুই শ্রেণির মধ্যে অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন ঘটছে না, শুধু উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিটা পালটে যাচ্ছে। চারের দশকে যাঁরা নাটক লিখছেন, নাটক করছেন, তাঁদের সামনে খুব স্পষ্ট করে ছিল রোমা রল্যাঁর নাট্যতত্ত্ব, সে তত্ত্বের বইটির ইংরেজি অনুবাদের নাম, আমরা সবাই জানি, The People's Theatre, মূল গ্রন্থটি প্রকাশ পায় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে, সেই অনুসারেই ভারতীয় কম্যুনিস্টরা তাঁদের সংগঠনের নাম দিলেন Indian's Peoples Theatre Association অথবা IIPTA। রোলাঁ বেঁচে ছিলেন ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, তিনি থিয়েটার তত্ত্বের যে শিখা জ্বালিয়েছিলেন, তা আমাদের দেশের তরুণেরা গ্রহণ করার পরে তাঁর প্রয়াণ হয়। তাঁর এই গণনাট্য বিষয়ক তত্ত্বে রোলাঁ কী বলছেন? সংক্ষেপে বলি, রোলাঁ চাইছেন, থিয়েটার নামক শিল্পমাধ্যমটিকে বিদ্বৎজনেদের আওতা থেকে সরিয়ে জনগণের কাছে নিয়ে আসতে, সর্বসাধারণের জন্যে একটি গণতান্ত্রিক থিয়েটার তৈরি করতে। সে থিয়েটার সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, এবং শ্রমিকশ্রেণিকে প্রতিবাদে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার শক্তি দেবে। রোলাঁ বলছেন, নাট্যশালার প্রথম কাজ হবে মানুষকে আনন্দ দেওয়া, তাকে জ্ঞান দেওয়া নয়। হতাশার বদলে আশায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে দর্শককে। এই নাট্যের নাটককার এবং শিল্পীরা শিক্ষক, পরিচালক, কিন্তু কখনোই হাতে ধরে শেখাবেন না, তাঁরা তাঁদের দর্শককে বাস্তবের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবেন, হাতে তুলে দেবেন বিচার করবার মাপকাঠি। রোলাঁর এই বই গোটা পৃথিবী জুড়ে সাড়া ফেলেছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থ, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তা শেষ হবার কুড়ি বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ--- পৃথিবীর একটা বড় অংশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সেই সূত্রে সামাজিক অবস্থা পালটে গেল, এই তত্ত্ব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। সেদিকে আমরা যাব না, আমরা শুধু এই তত্ত্ব কী ভাবে আমাদের ভাষার থিয়েটারের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে পেরেছে তাই নিয়ে দুটো কথা বলতে চাই।

একটা কথা হয়ত এর মধ্যে বেরিয়ে এসেছে যে তত্ত্ব আর সচল জীবনের মধ্যে স্পষ্ট কিছু বিরোধ আছে, যদি না তাত্ত্বিক তত্ত্বকে জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে রাজি হন। রোলাঁর যে তত্ত্ব, তার সঙ্গেও বাংলা নাট্যশালায় অনড় প্রথার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। রোলাঁ বলেছেন থিয়েটারকে শ্রমিক শ্রেণি, আমাদের মত দেশে নিশ্চয় কৃষক শ্রেণিও, তথা সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হবে। আপনারা নিশ্চয় বোঝেন,এর ফলে নাট্যের গঠনে পরিবর্তনের প্রয়োজন এসে পড়ল। এতদিন ধরে থিয়েটার হয়ে এসেছে একটি নির্দিষ্ট বাঁধা মঞ্চে, এই বাঁধা মঞ্চটিকে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিজেদের রুচি পছন্দ এবং প্রযোজনার দাবি অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পেরেছেন। সেই থিয়েটারের বাড়িতে দর্শক যাবেন নাটক দেখতে। এইবার চলনটা হয়ে গেল উল্টোমুখে,যেখানে নাটককে যেতে হবে মহম্মদ মানে দর্শকের কাছে। সেটা নিজের বাড়ি নয়, দর্শকের বাড়ি, অথবা বলা ভাল, বারোয়ারি জায়গা, সেখানে কোনো একটি বিশেষ প্রযোজনার বিশেষ দাবি মেটানোর মত

পরিকাঠামো নেই। তাহলে তাকে নির্ভার হতে হবে, যাতে সহজে সে যে কোনো জায়গার, যে কোনো পরিবেশের পক্ষে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারে। নাটক যিনি লিখছেন, তাঁকেও মনে রাখতে হচ্ছে কথাটা। অথচ, নাটকের প্রথম দায়িত্ব বিনোদন, সেটা ভুলে গেলে চলবে না। মানুষ যদি নাটকের থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে এই গণনাট্যের তো কোনো মানে নেই।

দুনম্বর কথা হলো, রোলাঁ নাটকের শিল্পীদের শিক্ষক হতে বলছেন, কিন্তু তাঁরা কখনোই হাতে ধরে শেখাবেন না, অর্থাৎ দর্শক যেন বুঝতে না পারে যে তাদের শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ধরনের শিল্প বহুদিন ধরেই পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত থেকেছে, বস্তুত আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তত প্রতিষ্ঠানপোষিত ধারাটি যে তার শ্রোতাকে কোনো না কোনো দেবতা বা দেবীর কাছে অনুগত হবার শিক্ষা দিচ্ছে তাও আমরা বুঝতে পারি। মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণব পদাবলী তো শিক্ষা দেবার জন্যেই লেখা, কিন্তু তাকে কি আমাদের ইস্কুল মাস্টারি বলে মনে হয়? শিল্পের ক্ষেত্রে দু'ধরনের ভাগের কথা বলা হয়ে থাকে--Diadactic আর Mimatic শিল্প। রোলাঁ স্পষ্টত প্রথম ধরনের শিল্প তৈরির কথা বলছেন, কিন্তু সে নাট্য তৈরি করতে হবে বিনোদনের মধ্যে দিয়ে। এই সঙ্গে আমরা জুড়ে দিতে চাই তাঁর আর একটি পরামর্শ, নাটক যেন তার দর্শককে হতাশায় ডুবিয়ে না দেয়, সে যেন শেষ পর্যন্ত মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলে।

রোলাঁর এই কথাগুলো অনুসরণ করতে গিয়ে কতকগুলো সমস্যা তৈরি হল। এর গণনাট্য সংঘ নিয়ন্ত্রিত হত মুখ্যত মধ্যবিত্তদের দ্বারা, এবং মধ্যবিত্তের মনের মধ্যে প্রায় অনপনেয়ভাবে লুকিয়ে আছে তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ সম্পর্কে এক ধরনের অবজ্ঞা। এই অবজ্ঞার নানা উদাহরণের কথা বহু মানুষের স্মৃতিকথার মধ্যে আছে। তার বাইরেও, এই লেখক মনে করতে পারছে, মৃত্যুর মাত্রই অল্প দিন আগে তার সুযোগ ঘটেছিল শম্ভুমিত্রের সামনে বসে তাঁর কথা শোনার। হয়ত বয়সের কারণেই, সারা জীবনের চাপা মুখ খুলে গিয়েছিল সেদিন, মধ্যবিত্ত ভাবনা কী ভাবে গণের সঙ্গে সংঘাত তৈরি করছে তার অনেক কথা বলে যাচ্ছিলেন সেই বৃদ্ধ। লেখকের কাছে ক্যাসেট রেকর্ডার ছিল না, তখনো মোবাইল ফোনের যুগ আসে নি, আফশোষ হয়, লুকিয়েও সে সব কথা রেকর্ড করে রাখলে আজ তা ইতিহাসের একটা বড় অংশ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু এ কথা আমরা সকলেই জানি, সিরিয়াস কথা গ্রামের মানুষ বুঝবে না বলে তাঁদের জন্যে শিল্পকে কিছুটা তরল করে উপস্থাপিত করা হত। শম্ভু মিত্রের নিবারণ পণ্ডিত নামে বিখ্যাত লেখায় আছে, গ্রাম্য এক কবি শম্ভু মিত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রভাত কবিতার আবৃত্তি শুনে গভীর রাত্রে একলা ঘরে কেমন করে নিজেকে বঞ্চিত মনে করার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, এ সব কথা তাঁদের বলা যায় না, শেখানো হয় না বলে। এর ফল বহু ক্ষেত্রেই ভাল হয়নি।

এর আর একটা রূপের কথা বলতে পারি। মধ্যবিত্ত পরিবারের যে শিল্পীরা অনুষ্ঠান করতে যেতেন, তাঁরা যে গ্রামের মানুষ অথবা শ্রমিক মানুষদের খুব ভাল করে বুঝতেন তা

নয়, খালেদ চৌধুরীর মুখে একাধিকবার শুনেছি, তাঁরা গণসংগীত পরিবেশন করে চলে যাওয়ার পরে চাষী মানুষেরা আবার তাদের নিজেদের গানেই ফিরে যেত, গণনাট্যের গান তাদের বিন্দুমাত্র পেনিট্রেট করতে পারে নি, এমনটাই ধারণা ছিল খালেদ চৌধুরীর। এই কথায় যে হতাশাজনিত কিছুটা অতিরেক আছে, তা অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু অনেকখানি সত্যও মিশে আছে এই দেখায়, তাতেও কোনো ভুল নেই। সর্বোপরি, এই মধ্যবিত্তেরা রোলাঁর তত্ত্বের দুটি উপদেশ বেশি করে মাথায় রেখেছিলেন। এক, শিল্পীকে শিক্ষক হতে হবে, আর দুই, মানুষকে উজ্জীবিত করতে হবে, নাটক যেন তার মনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আশার আলো জাগিয়ে তুলতে পারে। এর ফলে গণনাট্যের বেশ কিছু নাটক হয়ে উঠল খারাপভাবে শিক্ষামূলক, এবং সেই সঙ্গে আশাব্যঞ্জক হবার তীব্র তাড়নায় সে নাটক পুণ্যের জয় পাপের পরাজয় গোছের বাণী নিয়ে ছকবাঁধা রূপ গ্রহণ করল। শেষ দৃশ্যে লাল আলো প্রায় একটা লজ হয়ে গেল তখন নাটকের শেষে সমবেত শোষিতরা লাল পতাকা হাতে উঠে দাঁড়াবে, এ প্রায় নিয়মে পরিণত হলো। সোজা কথায়, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধাঁচাই ফিরে এল অন্যরকম মতাদর্শকে সঙ্গে নিয়ে, প্রায় একই ধাঁচায়। মনে পড়ে উৎপল দত্তের মত মানুষ তাঁর অঙ্গার নাটক সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ করেছেন, কারণ যে নাটকের শেষ কয়লাখনিতে শ্রমিকদের জলে ডুবে মৃত্যু দিয়ে, তা কখনো সদর্থক নাটক হতে পারে না। আমাদের পরিচিত নবান্নের কথাই যদি ধরি। অত বড় ঝড়ঝঞ্ঝা, অত বিপদের পরে আবার সবাই গ্রামে ফিরে আসে, এবং জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দেয়, এ কি কখনো সম্ভব? বিজন ভট্টাচার্য তাঁর ক্ষমতায় হয়ত একে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন, তাঁর তুলনায় কম ক্ষমতাসম্পন্ন নাটককারদের হাতে এ যে আরোপিত বলে মনে হতে বাধ্য তা তো বুঝতেই পারা যায়।

এখান থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে নানা নির্দেশক এবং দল নানা পথ নিলেন। শম্ভু মিত্রের বহুরূপী যেখানে ভাল করে ভাল নাটক করার দিকে জোর দিচ্ছেন, উৎপল দত্তের এল টি জি বা পরে পি এল টি সেখানে জোর দিচ্ছেন ইতিহাস এবং সমকালকে সামনে রেখে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন প্রচারের দিকে। বাদল সরকার একদিকে অনাবিল মজার নাটক করেছেন, অন্যদিকে নিয়ে আসছেন স্বাধীনতা পরবর্তী মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সমস্যাকে। শম্ভু মিত্র উৎপল দত্ত এবং অজিতেশ দেশী এবং বিদেশী নাটকের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করতে চাইছেন তাঁদের সময়ের তাৎপর্যকে--- এইভাবে গোটা পৃথিবীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বাংলা নাটকের ভাবনা। সেই আদর্শবাদিতার জায়গা থেকেও সরে আসতে চেয়েছে বাংলা থিয়েটার, কোম্পানি থিয়েটারের নতুন তত্ত্ব আনতে চেয়েছেন ব্রাত্য বসু। তার রূপ এবং সম্ভাবনা এখনো আমাদের চোখে স্পষ্ট হয় নি।

বাংলা থিয়েটারকে শেষ বড় রকমের ঝাঁকুনি দিতে চেয়েছিলেন বাদল সরকার, তাঁর অঙ্গন মঞ্চের নাট্যতত্ত্ব দিয়ে। একটি স্পষ্ট তত্ত্ব ছিল তাঁর। সে তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতেই পারে, এ লেখায় তার অবকাশ পাওয়া যাবে না। খুব সহজ কথায়,

থিয়েটারকে নির্ভার করাতে চেয়েছিলেন তিনি, তা যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারবে। নাটকের কাহিনী কাঠামোকে আখ্যানধর্মিতার থেকে সরিয়ে খানিকটা তথ্যনির্ভরতার দিকে নিয়ে আসবার প্রবণতা দেখেছি এই নতুন পর্বে বাদল সরকারের মধ্যে। সেই তথ্যনির্ভরতা প্রযোজনার মধ্যে এক ধরনের তীব্রতা তৈরি করে, গল্পের আড়াল না থাকার জন্যেই হয়ত তথ্যগুলোর অভিঘাত সরাসরি হতে পারে। বাদল সরকার উঁচু মঞ্চে অভিনেতা আর নিচু আসনে দর্শক বসানোর বিভাজন তুলে দিচ্ছেন, তুলে দিচ্ছেন অভিনেতা থাকবে আলোয় দর্শক থাকবে অন্ধকারে এই প্রথা। বস্তুত দর্শক আর নাট্যশিল্পীদের মধ্যে সমস্ত রকম বিভেদ মুছে দিতে চাইলেন তিনি। বেশি টাকার টিকিট যিনি কাটবেন তিনি বসবেন সামনের সারিতে, আর কম টাকার টিকিটের দর্শক বসবেন পেছনে, পণ্য সংস্কৃতির এই প্রকাশকেও তুলে দিতে চাইলেন তিনি।

তাঁর এই আভরণহীন থিয়েটারকে শহরের মানুষ গ্রহণ করেন নি, গ্রামের মানুষ করেছেন এমনটাই দাবি ছিল তাঁর। মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে এই উদ্ভাবনগুলো প্রথায় পরিণত হলো। শেষ বয়সে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হয়েছে, সেই অল্প আলাপের সূত্রে মনে হয়েছে হতাশা ঘিরে ফেলেছে মানুষটিকে। জানি না এই মনে হওয়া সত্যি কিনা। এই ধারার একজন স্বীকৃত নাট্যকর্মী একবার জনান্তিকে আমাকে বলেছিলেন, আমরা মিউজিয়ামের মধ্যে ঢুকে গেছি। তাঁর এই খেদ আমি ভুলতে পারি না। এইটাই হয়ত থিয়েটারের, বা অন্য যে কোনো সৃজনকর্মীর সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্কের নিয়ম। সৃজনকর্মী তাঁর কাজ দিয়ে তত্ত্ব তৈরি করবেন, তাঁর পরে যাঁরা আসবেন, তারা সেই তত্ত্বকে মিউজিয়ামে পরিণত করার চেষ্টা করবেন। তারপরে আবার আসবে উল্টোরথের পালা। আবার নতুন প্রজন্ম এসে রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানথের মত শিল্পকে ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে অনর্গল মুক্তি দেবেন, খেলাকে রক্ষা করবেন চূর্ণ করি খেলেনা শৃঙ্খল।

লেখক : **সৌমিত্র বসু**, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব।

প্রসঙ্গ নাটকের অনুবাদ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায়

অশেষ গুপ্ত

আমাকে একটা মস্ত ব্রাস এনে দাও
আমি এই শহরের গরমটা মুছে দিয়ে যাই,
তুমি ছবি এঁকে দিয়ো বৃষ্টির,
মুষলধারার ----
মানুষ ভিজুক,
বাড়িঘর
রাস্তা নালা ভিজে ভিজে একসারা হোক।
এই শহরের বুকে বৃষ্টি মেখে দিক
হাঁস ভিজিয়ে চলে যাওয়া-
('শহরে বৃষ্টি', কবিতা সমগ্র, পৃ.১৩৫)

স্বপন সেনগুপ্তের কবিতার ক্যানভাসের বৃষ্টিস্নাত উদ্বাস্তু শহর আগরতলা। সত্তরের দশকে আগরতলার যে বাড়িতে আমার জন্ম সেখানে ঘর থেকে উঠোন ছিল বড়। পাশাপাশি বাড়ির সঙ্গে বেড়ার চল ছিলই না, বড় জোর সীমানা বরাবর সুপারি গাছের সারি। পেছনেই পুকুর যেমন সব বাড়িতে থাকত। নিকোণ উঠোন আর ঘরের মেঝের ফোসকাগুলোকে পায়ের চাপে ফাটিয়ে দেয়া ছিল মজার খেলা। বিদ্যুৎ তখনো সার্ব্বজনীন হয়নি, কেরোসিন লন্ঠন আর মোমবাতির আলোয় নিজের আধিভৌতিক ছায়া শিহরণ জাগায়। নিকষ কালো অন্ধকার আর জ্যোৎস্না ছিল সমান গাঢ়। অলস দুপুরের অনুরোধের আসরের[১] মত জীবন ছিল ধীর ও প্রলম্বিত।, বৃষ্টি আসতো ঝেঁপে, উঠোন আর পুকুরের সীমানা বিলোপ করে, আর কুয়াসার চাঁদর মুড়ি দিয়ে আসতো শীত। তাতে ফুলকপি আর খেজুর গুড়ের গন্ধ।

সেই উঠোনের একদিকে এক বিশাল ঘর থেকে ভেসে আসতো নাটকের মহড়ার শব্দ। বাড়িতে সারাদিন অনেক লোকের আনাগোনা, উনুনে চাপানো ভাতের হাড়ির সঙ্গে সিঙ্কসাউণ্ডে [২] ঠাকুমার বিরক্তি। গভীর রাতে শোয়ের শেষে বাবা মার বাড়ি ফেরা। বাবা নাটকের প্রয়োজনে বড় স্পুলের টেপ রেকর্ডারে আবহের শব্দ রেকর্ড করতেন। আর ঘুম চোখে আমি দেখতে পেতাম জড়ানো ফিতে থেকে সেই শব্দের পুনর্নির্মাণ। তারপর দুরায়ত কীর্তনের সুরে পাশ ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়া। দৈনন্দিন জীবনের এই নাটকের প্রেক্ষিতেই আমার বড় হয়ে ওঠা।

তারও অনেকদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে নাটক পড়তে আর পড়াতে গিয়ে নাটকের অনুবাদ প্রক্রিয়া এবং অনুদিত নাটক নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করার

তাগিদ আমি বার বার অনুভব করেছি। তবে এখানে বলে রাখা উচিত যে আমাকে সব থেকে বেশি ভাবিয়েছে সাহিত্যের ক্লাসে নাটক পড়ানের সময় নাটক বিষয়টিকে ছাত্রদের সামনে যথাযথভাবে বোঝাতে বা অনুবাদ করতে না পারা। সাধারণত এই ক্ষেত্রে নাটকটিকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে, তর্জমা করে তার চরিত্র অথবা দৃশ্য নির্ভর 'অর্থ' বুঝিয়ে দেয়া হয়, যা কেবল মাত্র ভাষা, সংলাপ, কাহিনী অথবা গল্প নির্ভর একমাত্রিক অতিসরলিকরণেরি নামান্তর। নাটকের বহুমাত্রিক গঠন এই অনুবাদ প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যেতে বাধ্য। এ যেন সিনেমা দেখার বদলে তার গল্প শোনা। তাই 'ম্যাকবেথ'[৩] নাটকটি বহুবার পড়া সত্বেও ছাত্রছাত্রীরা কোনদিনও বুঝতে পারে না এই নাটকটির দৃশ্যায়ন- সেকালে ব্যবহৃত অস্ত্রসস্ত্রের ধরন কি ছিল, ডাইনিদের পোষাক কেমন হওয়া উচিত কিংবা সে সময়ে রাতের ডেনমার্ক কিভাবে আলোকিত করা হত। প্রথাগত শিক্ষা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায়, যেখানে ম্যাকবেথ অথবা লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র চিত্রণ কিংবা ম্যাকবেথের স্বগোতক্তি বিশ্লেষণেই নাটকের আলোচনায় যবণিকাপাত ঘটে, সেখানে নাটকের প্রতি সুবিচার সম্ভব হয় না। এখানে বলে রাখা উচিত এই লেখাতে আমি 'অনুবাদ' শব্দটিকে বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করেছি। তত্ত্বের খাতিরে 'অনুবাদ' আমার সংজ্ঞায় শুধুমাত্র ভাষারই রূপান্তর নয়, মাধ্যমেরও রূপান্তর, যাকে তত্ত্বের ভাষায় বলা যেতে পারে আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদ[৪] (intersemiotic translation)। আমি জানি, এই অনুবাদ/প্রতিশব্দটিও যথার্থ হয়নি, কিন্তু এখানেও প্রতিশব্দ নির্মাণে অর্থের নৈকট্যকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আবার নাট্যকার যখন তাঁর নিজের ভাবনাকে নাটকে রূপ দিচ্ছেন অথবা নির্দেশক সেই নাটকটিকে সাহিত্যরূপ থেকে মঞ্চে উপস্থাপনায় নিয়ে যাচ্ছেন, তখনো আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদের মাধ্যমেই তা সম্ভব হচ্ছে। তাই আমার আলোচনায় বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে এই আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদ প্রক্রিয়া, কারণ নাটকের বহুমাত্রিক গঠনে ও উপস্থাপনার বিশ্লেষণেও আমি অনুবাদ তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছি। নাটকের এই বহুমাত্রিক গঠনের মডেলটিকে আমি এইভাবে সাজিয়েছি ঃ

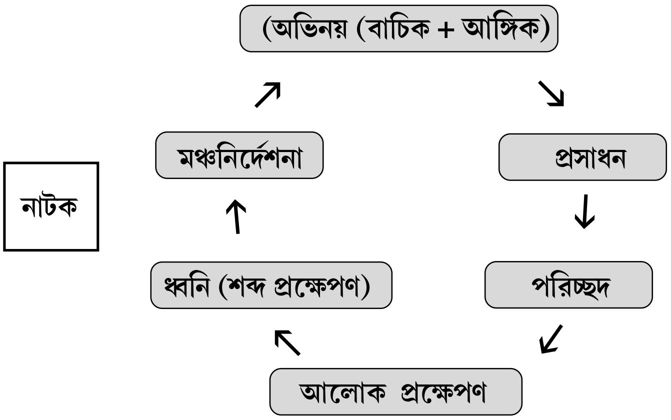

আবার নাটকটি যদি অভিযোজন (adaptation) না হয়, তবে সাধারণত সেক্ষেত্রে

↘ ↘ ↗↓↖↘

নাটকের অনুবাদে আঙ্গিক ছাড়া বাকি সব মাধ্যম অনুবাদ অগ্রাহ্য করে অ-অনুদিত থেকে যায়। কিন্তু নাটকের প্রকৃত অনুবাদ শুধুমাত্র একটি ভাষা থেকে অন্য আরেকটি ভাষায় রূপান্তরে, অর্থাৎ বাচিক অনুবাদেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পাঠককে মনে রাখতে হবে, নাটকের উপরোক্ত মডেল অনুযায়ী ভাষা (বাচিক অর্থে) কেবল একটি বার্তাবহ মাধ্যম মাত্র, এছাড়াও আরও পাঁচটি মাধ্যম নাটকে কাজ করে। বাচিক ছাড়াও অভিনয়ের আরেকটি অংশ আছে (আঙ্গিক)। এই মাধ্যমগুলোর এক বা একাধিকের সমন্বয়ে নাটক উপস্থাপিত হয় এবং অর্থবহ হয়ে ওঠে। অদ্ভুতভাবে যদিও এই সমস্ত বার্তাবহ মাধ্যমের সম্মিলিত রূপই হচ্ছে নাটক (মঞ্চে উপস্থাপনার অর্থে, পাঠ্য নয়), তবুও নাট্য নির্মাণে কোন একটি বিশেষ মাধ্যম কখনোই অপরিহার্য নয়। যেমন ঃ

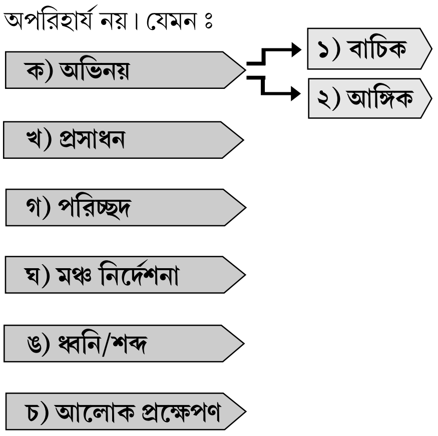

উপরোক্ত মডেলটিতেঃ
ক) এর **১)** অর্থাৎ বাচিক বাদ দিলে হয় '**মূকাভিনয়**';**ক)** এর **২)** এবং বাকি সব বাদ দিলে হয় '**শ্রুতিনাটক**';
শুধুমাত্র **ক)** এর **১)** আর **চ)** মিলে হয় রেডিও নাটক যেমন রেডিও মির্চি[৫] প্রযোজিত 'সানডে সাসপেন্স'।
ঙ) আর চ) এবং কোনো কোনে ক্ষেত্রে খ), গ) বাদ দিলে হয় 'পথ নাটক';
এছাড়াও যে নাটক কোনদিন মঞ্চস্থ করা হয়নি বা হবে না, অর্থাৎ যেখানে দৃশ্যায়নের কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাকে বলা হয় 'ক্লসেট ড্রামা।'

অনুবাদের লক্ষ্য এবং অনুবাদ প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের (translational agenda/mission) কথা এখানে আলোচনায় উঠে আসবেই। যখন ইংরেজি বা ফরাসির মত বিদেশি ভাষায় রচিত নাটক বাংলায় অনুবাদ করে মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়, তখন এমনভাবে অভিযোজন করা হয় যেন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতেও সেটি সমান প্রযোজ্য। এই অভিযোজনিক অনুবাদে চরিত্রদের নামধাম, পটভূমি, দেশ, কাল সবই বদলে যায়। বলা হয় মূল নাটকটির অন্তর্নিহিত অর্থ এবং বিষয়বস্তু সার্ব্বজনীন ও চিরন্তন। কিন্তু ককবরক নাটকের বাংলা অভিযোজনের ক্ষেত্রে চরিত্রদের নামধাম, পটভূমি, দেশ , কাল, প্রেক্ষিত অ-অনুদিত রেখে দেয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় সংস্কৃতি এবং সমাজের রূপান্তর/অনুবাদ উচিত নয়। অর্থাৎ মূল ককবরক নাটকটির সার্ব্বজনীন ও চিরন্তন অর্থ ও বিষয়বস্তুকে অগ্রাহ্য করে তার আঞ্চলিকতাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এই ভিন্নতর অনুবাদ লক্ষ্য এবং অনুবাদ উদ্দেশ্য কিন্তু বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের ও তারতম্যের ফলে সৃষ্ট শ্রেণিবিন্যাসেরই (hierarchy) ফসল। কাজেই অনুবাদ লক্ষ্য এবং অনুবাদ উদ্দেশ্যের (translational agenda/mission) পার্থক্যে নাটকের অনুবাদ

অথবা অভিযোজন ভিন্ন হতে বাধ্য। একদিকে যখন জিন্স ও টি শার্ট পড়িয়ে ম্যাকবেথের মঞ্চায়ন হচ্ছে, অন্যদিকে তখন ককবরক নাটক 'চেথুয়াং' -এর (লোককথার কাল্পনিক নাট্যরূপ) বাংলা অভিযোজনে তাকে ত্রিপুরার জনজাতির প্রেক্ষিত থেকে বিচ্যুত কর হচ্ছে না। একে অনুবাদের অন্তর্নিহিত রাজনীতি (politics of translation) বলা যেতেই পারে। প্রশ্ন করা যেতেই পারে যে এভাবেই কি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের এই শ্রেণিবিন্যাসকে নান্দনিক যৌক্তিকতা ও মান্যতা দেয়া হয়ে থাকে?

নাটক বহমান ও পরিবর্তনশীল, কাজেই একটি নাটকের কোন একটি উপস্থাপনাকে সেই নাটকের চূড়ান্ত এবং শ্রেষ্ঠ আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদ (culmination of intersemiotic trnaslation) বলে গণ্য করা যায় না। প্রত্যেক নাটকের মঞ্চ উপস্থাপনার নেপথ্যে অপরিহার্য অসংখ্য মহড়া (rehearsal) অথবা প্রস্তুতি । নাটকের পান্ডুলিপি থেকে মহড়া হয়ে মঞ্চ পর্যন্ত এই যে যাত্রা, তা আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদ প্রক্রিয়ারই বিভিন্ন ধাপ, এবং নাটকের এই অন্তর্নিহিত বহমানতা এই অনুবাদ প্রক্রিয়াকেও পরিবর্তনশীল করে তোলে। তাই মহড়া ও উপস্থাপনার নিরিখে নাটক প্রতি মুহূর্তে বদলে যেতে বাধ্য, এবং এখানেই নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য। নাটক জঙ্গম, চলচ্চিত্র স্থবির; নাটক বহমান, চলচ্চিত্র স্থির। শুটিং, সম্পাদনা (editing) , পোষ্ট প্রোডাকসন হয়ে অভিক্ষেপণ (projection) পর্যন্ত চলচ্চিত্রের বিস্তৃতি। এখানেও আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদ প্রক্রিয়ারই বহুমাত্রিক প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তার চূড়ান্ত পরিণতি মঞ্চে জীবন্ত (live) উপস্থাপনায়, চলচ্চিত্রে রূপোলি পর্দায় আগে থেকে রেকর্ড ও এডিট করা অভিক্ষেপণে। আবার দর্শক প্রতিক্রিয়ার নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে নাটকের কুশীলবদের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক, চলচ্চিত্রে তা বিলম্বিত।

নাটকের পান্ডুলিপি থেকে মহড়া বা প্রস্তুতি হয়ে মঞ্চায়নের বিভিন্ন ধাপে আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদ প্রক্রিয়ার প্রয়োগের কথা আগেই বলেছি। তেমনি এও বলেছি যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে নাটকের অন্তর্নিহিত বহমানতার ফলে কোনো উপস্থাপনাকেই সেই নাটকের চূড়ান্ত বা শ্রেষ্ঠ সফল মঞ্চায়ন বলা যায় না। নাটকের উপস্থাপনাতে শেষ কথা বলে কিছু নেই, তাই নাটক এবং তার আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদ প্রক্রিয়া অসমাপ্তই (open ended /resisting closure) থেকে যায়। কেননা উৎকর্ষ আপেক্ষিক। পাঠক মনে রাখবেন অনেক সময় একটি নাটকের একটি বিশেষ মহড়া উৎকর্ষের নিরিখে তার চূড়ান্ত উপস্থাপনাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই নাটকে শেষ বলে কিছু নেই।

নাটকের অনুবাদ বহুমাত্রিক। তাই সাহিত্যের ক্লাশে নাটক পড়ানোর সময়, সাধারণত শিক্ষক নাটকের ভাষা থেকে বিবরণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে অনুবাদ করেন, স্থূল অর্থে যাকে নাটকের 'অর্থ', 'বিষয়বস্তু' বা 'মানে' বলা হয়। আবার কোনো একটি নাটককে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়ে থাকে। সেই ভাষান্তর যদি পান্ডুলিপি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তা শুধুমাত্র ভাষারই অনুবাদ। কিন্তু যদি সেই নাটককে পান্ডুলিপি থেকে

মহড়া হয়ে মঞ্চে উপস্থাপনায় অনুবাদ করা হয় তাহলে তা আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদ। আবার নাটকের আভ্যন্তরীণ বহুমাত্রিক গঠনের উল্লিখিত মাধ্যমগুলো তাদের নিজস্ব পরিভাষায় অনুবাদ করে নেয় নাটকটিকে। যিনি আলোকসম্পাত করবেন তিনি একটি বিশেষ দৃশ্য অথবা চরিত্রের প্রয়োজনে একটি বিশেষ আলোকে অনুবাদ করে নেন সেই দৃশ্য বা চরিত্রের প্রধান ভাব বা অনুভবকে। সুরকার একটি বিশেষ ভাবকে দৃশ্যের প্রয়োজনে একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের সুরে অনুবাদ করে নেন। এভাবেই নাটকের প্রত্যেকটি বার্তাবহ মাধ্যমের পরিচালকেরা নাটকটিকে নিজের মাধ্যমে আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদ করেন। প্রসাধন শিল্পী (makeupman), পরিচ্ছদ শিল্পী (dress/costume designer) এবং মঞ্চ নির্দেশক (stage designer/art director), সবার আন্তর্সাঙ্কেতিক অনুবাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নাটকের উপস্থাপনা সম্ভব হয়ে ওঠে। এবং পরিশেষে নাট্যনির্দেশক তাঁর অভিজ্ঞতা, নান্দনিক বোধ ও মননে নাটকটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনায় অনুবাদ করেন। নাটক এবং অনুবাদ এভাবেই সম্পৃক্ত।

টীকা ঃ

১। ষাট সত্তরের দশকের আকাশবাণীর জনপ্রিয় বাংলা গানের অনুষ্ঠান।

২। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত শ্যুটিং এর সময় রেকর্ড করা শব্দ, যা স্টুডিওতে ডাব করা নয়।

৩। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রচিত বিয়োগান্তক ইংরেজি নাটক।

৪। একটি সাংকেতিক ব্যবস্থা বা মাধ্যম থেকে অন্য একটি সাংকেতিক ব্যবস্থা বা মাধ্যমে অনুবাদ বা রূপান্তর, যেমন সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে।

৫। একটি এফ.এম. চ্যানেল।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

সেনগুপ্ত, স্বপন। কবিতা সমগ্র ১। আগরতলা : অক্ষর। ২০১২, দহন ও জলন্তর। অক্ষর। ২০১০

Aguiar, Daniella, and Joao Queiroz, "Towards a Model of Intersemiotic Translation." The International Journal of the Arts in Society, vol. 4, No.4, 2009, pp.203-10. Accessed 20th July 2021.

Gupta, Ashes. Trans. 'Chethuang', in Murasingh, Chandrakanta ed. Tales and Tune from Tripura Hills. Sahitya Akademi. 2007.

Hutcheon, Linda. A theory of adaptation. Routledge, 2006.

Jakobson, Roman. " On Linguistic Aspects of Translation." On Translation, edited by Reuben Brower, Harvard UP, 1959, pp.232-39.

লেখক : **অধ্যাপক অশেষ গুপ্ত,** ইংরেজি বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা।
email: ashesgupta@tripurauniv.ac.in / ashesgupta69@gmail.com.

প্রসঙ্গ ঃ দিল্লীর গ্রুপ থিয়েটারে বাংলা নাট্যচর্চা তাপস চন্দের মুখোমুখি

আদিত্য সেন

তাপস চন্দ প্রায় পাঁচ দশক থেকে দিল্লির নাটকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছেন। দিল্লির নাটক প্রযোজনার যখন রমরমা অবস্থা সেই সত্তর দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত তাপস দিল্লির বিভিন্ন নাট্যসংস্থা যেমন শনিচক্র, নবোদয়গোষ্ঠী, ধূমকেতু, নবনাট্য ও বঙ্গীয় সমাজের প্রযোজিত নানা নাটকে শুধু যে অভিনয় করেছেন তাই নয়, দু-চারটে নাটকের নাট্যরূপও দিয়েছেন। তিনি Riginal-d Rose - এর Twelve Angrymen's Rose - বাংলা অনুবাদ ও রূপান্তর করেছেন। এছাড়া Brian Clarke- এর Whoe Life Is It Any Way। এই নাটকের বিষয়টি ইচ্ছামৃত্যু। এই দুটি নাটক বঙ্গীয় সমাজের এবং দীপক গুহ-এর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। হালে Edward Albee - এর রচিত The Zoo Storyé-এ র অবলম্বনে চিড়িয়াখানার গল্প-এর বাংলা অনুবাদ করেন। ২০১৯ সালে চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়ালে সেটা মঞ্চস্থ হয়। এছাড়া দিল্লির যাত্রার গৌরবময় দিনগুলিতে আদি শ্রীমতী অপেরার সঙ্গে তাপস যুক্ত ছিলেন।৭৭

আদিত্য সেনঃ আমরা জানি তাপস চন্দ, আপনি দীর্ঘ সময় প্রায় সত্তর দশক থেকে নব্বই এবং ২০০০ থেকে ২০১৯ সময়কালে, দিল্লিতে নাটক মঞ্চস্থ করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নাটকের সেই গৌরবময় দিনগুলির কথা একটু বলুন। যেমন উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকে সুভাষ দেশাই-এর ভূমিকায় আপনার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা একটু যদি খুলে বলেন।

তা. চ. ঃ দিল্লির বাংলা নাটকের ইতিহাস খুবই ঋদ্ধ। গত শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশককে দিল্লি নাট্য ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। কাশ্মীরিগেটের বেঙ্গলী ক্লাব, করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ, নিউ দিল্লী কালীবাড়ী, শনিচক্র, কালচক্র, চেনামহল, যাযাবর গোষ্ঠী, নাট্যকাল, চেনামুখ, নবনাট্যম, নবোদয়গোষ্ঠী, আমরা, অগ্রগামী, ধূমকেতু, সূত্রধার ইত্যাদি নাট্যদলগুলি বহু মঞ্চ জাগানো ও সাড়া জাগানো Experimental theatre প্রযোজনা করেছে। এই সময় বহু বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক,অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলা-কুশলীর পরিচয় পাওয়া গেছে এবং তারা এগিয়ে এসেছেন। তখন কয়েকজন বিশিষ্ট পরিচালকের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলো হল কাশ্মীরিগেটের বেঙ্গলী ক্লাবের ভূষণ্ডীর মাঠ, প্রয়াত প্রতাপ সেন -এর পরিচালনায় করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের কবয়ঃ এবং লম্বকর্ণ পালা। লম্বকর্ণ পালার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রবাদপ্রতিম সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং পরিচালক বিনয় রায়। শিশির

ভট্টাচার্যের আমরা নাট্যদলের এবং ইন্দ্রজিৎ, নিউ দিল্লির কালীবাড়ীর প্রযোজনায় 'কাবুলিওয়ালা, অজয় চ্যাটার্জীর পরিচালনায় তুঘলগ ও বারাব্বাস, প্রয়াত পরেশ দাসের পরিচালনায় চেনামহলের নাট্যকালের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র, প্রদীপ বসু, সেবাব্রত চৌধুরী এবং দিলীপ বসু ও অন্যান্যদের যৌথ উদ্যোগে নাট্যকালের অহো বিজ্ঞাপন ও চালচিত্র। প্রয়াত অমর হোড়-এর পরিচালনায় শনিচক্রের শের আফগান, জ্যাঠামশায়, নীচের তলার মানুষ, অঙ্গার। প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম পরিচালক ও দক্ষ অভিনেতা সুবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নবনাট্যমের ঈশ্বরের আশায় এবং চৈতালীর রাতের স্বপ্ন এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রয়াত শক্তি মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নবোদয়গোষ্ঠীর চোপ্ আদালত চলছে, ক্যাপ্টেন হুররা। এছাড়া ধূমকেতুর রাজরক্ত ও লেনিনের ডাক। প্রয়াত উৎপল মুখার্জীর পরিচালনায় মানুষের অধিকারের কথা এখনও দর্শকরা স্মরণ করেন। এই সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যকার হলেন প্রয়াত পুতুল নাগ, প্রবাদ প্রতিম হরিহর ভট্টাচার্য, প্রয়াত জগদীশ চক্রবর্তী, প্রয়াত স্মরজিৎ দত্ত, প্রয়াত শিশির কুমার দাস ও সেবাব্রত চৌধুরী। সেই সময় দুটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা চেনামহলের উদ্যোগে উৎপল দত্তের 'কল্লোল' এবং শিশির কুমার দাশ-এর মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। কল্লোল ছিল পাঁচটি নাট্যদলের যৌথ প্রচেষ্টা—নবোদয়গোষ্ঠী, ধূমকেতু, তরুণ সংঘ এবং চেনামহল। ১৯৮০ সালে দিল্লির আইফ্যাক্স হলে সাতদিন ধরে কল্লোল মঞ্চস্থ হয়। এ ছিল এক স্মরণীয় ইতিহাস যা লোকেরা এখনও ভোলেন নি। পরিচানায় ছিলেন চেনামহলের গৌর দাস, আর জয়ন্ত দাশ। কল্লোল নাটকে আমি সংগ্রামী সুভাষ দেশাই-এর চরিত্রে অভিনয় করি। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি নাটকটি অসাধারণ প্রযোজনা। কারণ অসাধারণ টিম ওয়ার্ক বিশেষ করে নারী চরিত্রে উমা বীট ও আরতি দত্তের অভিনয় অতুলনীয় বলে গণ্য হয়েছিল। পুরুষ অভিনেতাদের মধ্যে জয়ন্ত দাশ, পার্থ সেন, সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত, সুশান্ত দাস এবং বাবলু সান্ন্যাল অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। এটা স্মরণীয় যে আবহ, আলো আর প্রক্ষেপণে মিনার্ভার শ্রীপতি দাস ও ভানু বিশ্বাসই দিল্লিতে এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে খাইবার জাহাজটি স্টেজে খাড়া করেছিলেন দিল্লির অজিত দত্ত।

আ. সে. ঃ দিল্লির নাট্যদলগুলির নাটক মঞ্চস্থ করার যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আশি দশক পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি আজকের দিনের নাট্য মঞ্চস্থ করা সম্পর্কে নাট্য দলগুলির অনীহা এল কী করে? তার কার্যকারণ যদি একটু ব্যাখ্যা করেন। এবং দর্শকদের মধ্যে নাটক শেখার আগ্রহ কি আগের চেয়ে কমে গেছে?

তা. চ. ঃ এর অনেকগুলি কারণ রয়েছে। যেমন দিল্লির মানুষদের জীবনযাত্রার ধরণধারণ পালটে গেছে। মানুষের হাতে অবসর সময় এখন অনেক কমে গেছে। এছাড়া টিভির দাপট সাংঘাতির বেড়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা

অনেকটা কমে গেছে, প্রায় নেই বললেই চলে। এখন কলকাতা বা মুম্বাই থেকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের নিয়ে এসে অনুষ্ঠান করানোর দিকেই বেশী আগ্রহ। আগে দিল্লির বাংলা নাট্যদলগুলি কল-শো ছিল পূজো প্যান্ডেলে নাটক করা। নাটক ও যাত্রা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পূজোর সময় হত। এখন যাত্রা উঠেই গেছে এবং নাটকের শো খুবই কম।

আ.সে. ঃ পঞ্চাশ থেকে ষাট দশক পর্যন্ত দিল্লিতে বোধকরি ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি, তারপর সত্তর দশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটকের দিকে দিল্লির নাট্যগোষ্ঠীগুলি ঝুঁকল। নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আপনি, এ ইতিহাস যদি ঠিক হয় তাহলে তার ছবিটা যদি একটু তুলে ধরেন।

তা. চ. ঃ এটা খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। নাটক যেহেতু সমাজের দর্পণ তাই সত্তর দশকে নাটকের বিষয়ও পালটাতে বাধ্য হয়েছিল। যেমন ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট, নক্সালবাড়ি আন্দোলন এবং সবশেষে এমারজেন্সি পুরো ভারতবর্ষের চেহারাটা পাল্টে দেয়। তাই এই অস্থির সময়ের প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন নাট্য দলগুলির প্রযোজনায়।

আ.সে. ঃ এই সময়কালের নাট্যব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই আছেন তার মধ্যে চারজন ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক প্রবীণ নাট্যবক্তিত্ব হরিহর ভট্টাচার্য, দুর্দান্ত অভিনেতা ও পরিচালক সুবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলমার্কেটের জীবন মুখার্জী এবং নাটকের সব কৌশলগত দিকে পারদর্শী প্রতাপ সেন। পরেশ দাসের অবদান অনেক। এঁরা সবাই এখন প্রয়াত কিন্তু এদের কাজকর্ম, কৃতিত্ব এবং অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে দিল্লির নাট্য ইতিহাসে আপনার বক্তব্য।

তা.চ. ঃ আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত। শুধু একটি নাম আরও যুক্ত করতে চাই, তিনি হলেন পুতুল নাগ।

আ. সে. ঃ কলকাতার সব বড় বড় নাট্য ব্যক্তিত্ব যেমন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত,অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখার্জী ও আরও অনেকে তাঁদের নাটক মঞ্চস্থ করতে দিল্লিতে এসেছিলেন নানা সময়ে ঃ যদি এঁদের কারুর কথা আপনার বিশেষ করে মনে পড়ে।

তা. চ. ঃ অভিনয় এখনও করে যাচ্ছি বলে এই স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের কথা সব সময় মনে হয়। যেমন উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্জরি আমের মঞ্জরি, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ফুটবল, বিভাস চক্রবর্তীর মাধবমালঞ্চী কন্যা, অরুণ মুখার্জীর জগন্নাথ। এঁদের প্রযোজনা মনে হয় কোনো কালে ভুলব না।

আ. সে. ঃ দক্ষ অভিনেত্রী হিসেবে দিল্লিতে নাম কিনেছিলেন বাণী রায়, উমা বীট, বেলা রায়, মায়া হোড় এবং আরও কয়েকজন। এঁদের কারুর নাটক দেখেছেন এবং কোনো স্মৃতিকথা মনে করতে পারেন কি না।

তা. চ. ঃ নিশ্চয়ই, উমাদি ও মায়া হোড়- এর সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবনের মস্ত সম্পদ হয়ে আছে সেইসব স্মৃতিকথা।

আ. সে. ঃ ইদানিংকালে যে কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী দিল্লিতে তাদের নাটক এখনও মঞ্চস্থ করে যাচ্ছে— যেমন স্বপ্ন এখন, পিপলস্ থিয়েটার, আকৃতি নাট্যগোষ্ঠী, গ্রীণরুম এবং নবপল্লী নাট্য সংস্থা ও সংশপ্তক— এদের সম্পর্কে আপনার কি মতামত?

তা. চ. ঃ এঁরা সবাই খুব উদ্যোগী ও পরিশ্রমী এবং নতুন নতুন ভাবধারায় কাজ করার চেষ্টা করেছেন। সত্তর দশকের তুলনায় এদের সংখ্যা অনেক কম হলেও আমি মনে করি এঁদের অনেকেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

আ. সে. ঃ বেশ কয়েকবছর আগে চিত্তরঞ্জন কালীবাড়ী বছরে একবার নাট্যদলগুলিকে অনুদান দিয়ে তাদের নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ করে দেয়। তাতে দু-বছর বেশ সাড়া পাওয়া যায়। পরে সেই অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। এক সময় রিডিং রোড কালীবাড়ী, নিউ দিল্লী কালীবাড়ী, বেঙ্গলী ক্লাব, দিল্লী নাট্য সংঘ, মিলনী নাট্য দলগুলির মধ্যে প্রতি বছর নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। তাতে দিল্লির নাটকগোষ্ঠীরা নতুন নুতন নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ ও উৎসাহ পেত। এখন কি দিল্লিতে সেরকম কিছু প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়?

তা. চ. ঃ এখন খুবই কম। নিউ দিল্লি কালীবাড়ী ও চিত্তরঞ্জন পার্কের এঞ্জেল ভিশন ছাড়া আর কেউ নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে না। শুধু এর মধ্যে চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল সোসাইটি নাট্য দলগুলিকে বিনামূল্যে নতুন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ এখনও দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নাট্যদিবস পালন করেন।এবং তাতে প্রায় কুড়ি/বাইশটি নাট্যদল অংশগ্রহণ করে। এটা খুবই ভাল উদ্যোগ।

আ. সে. ঃ দিল্লি নাটকের ভবিষ্যৎ কি— একজন প্রাজ্ঞ অভিনেতা হিসেবে যা আপনার মন হয় জানতে ইচ্ছা করি।

তা. চ. ঃ এই ভয়ঙ্কর অতিমারির সময়কালে এর চেয়ে বেশি আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে। তবে অভিজ্ঞ অভিনেতা হিসেবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামী দিনে দিল্লি নাটক আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে।

লেখক ঃ **আদিত্য সেন,** দিল্লীর বাংলা সংস্কৃতি চর্চার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। দিল্লীর ত্রিভাষিক সাহিত্য পত্রিকা উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসের সম্পাদক।

অজানা বীরসেন

আশিস গোস্বামী

সম্ভবত ২০০৬ সালে সাংবাদিক পার্থপ্রতিম নাগের একটি প্রতিবেদনে 'দিন দশক পর প্রতিবাদী অভিনেতার স্মৃতিফলক নিয়ে কার্জন পার্কে ফের সিল্যুয়েট', এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার নাম বা তারিখ কোনটিই পাইনি, তবে মনে করা যেতে পারে গণশক্তি পত্রিকার কলকাতা নামক বিশেষ পাতায় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচনার শুরুতে সেই প্রতিবেদনটি পুরোটা তুলে ধরা যাক—

"সালটা ছিল ১৯৭৪। দিনটা ২০ জুলাই। ভিয়েতনাম সংহতি দিবস। এই সময়কালে এপার বাংলায় চলছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সন্ত্রাস আর আধা ফ্যাসিষ্ট শাসন। তারই মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী সিল্যুয়েট নাট্যগোষ্ঠী প্রতিবাদী নাটক মঞ্চস্থ করতে তৈরি। তার আগেই কার্জন পার্ক চত্বরের কিছু আগে এদিক -সেদিক ও মানুষের মিছিল জমায়েত হয়েছে। মুখে তাদের ভিয়েতনাম দিবস পালন উপলক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লোগান। একটি মিছিল যখন সবেমাত্র রাণী রাসমণির মূর্তির পাদদেশ থেকে যাত্রা শুরু করেছে -ঠিক তখনই তৎকালীন কলকাতার পুলিশের ডি সি পদের বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিরাসহ প্রায় আড়াইশত জনের বাহিনী কার্জন পার্কের চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। কেন? কারণ এই কার্জন পার্কের খোলা মাঠেই ছিল সিল্যুয়েট নাট্য সংস্থার প্রতি সপ্তাহের নাট্যমঞ্চ। নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহের শনিবার এখানে তারা মঞ্চস্থ করতো 'মুক্তি আশ্রম', এবং 'তখন সে এক ইতিহাস' এই নাটক দুটি। ২০শে জুলাই পুলিশ তাদের এই নাটক মঞ্চস্থ করতে দেবে না এই সিদ্ধান্ত নিয়েই তৈরি ছিল। তবু সিল্যুয়েটের কুশীলবেরা কার্জন পার্ক থেকে কিছু দূরেই শুরু করে দেয় তাঁদের দ্বিতীয় প্রয়োজনা অর্থাৎ 'তখন সে এক ইতিহাস' নাটকটি। এই নাটক লিখেছেন বীর সেন। তিনিই প্রযোজক তিনিই নির্দেশক"।

অভিনয় শুরুর হবার কয়েক মুহূর্ত পরেই পুলিশ সেই জায়গায় এসে বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ করতে শুরু কর দেয়। বন্ধ হয়ে যায় অভিনয়। দর্শকরা ছড়িয়ে পড়ে যত্রতত্র। ততক্ষণে নির্মম লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন অভিনেতা প্রবীর দত্ত ও নরেশ মন্ডল। নরেশ আঘাত সামলে নেন। কিন্তু প্রবীরের দেহ নিথর হয়েই সেখানে পড়ে থাকে। বীর সেন ছুটে গিয়ে রক্ত জমাট প্রবীরের দেহটা কোলে তুলে নিয়ে সেই জটলা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বেরিয়ে এসে ঐ অবস্থায় প্রবীরের দেহ নিয়ে ছুটে যান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানান শিল্পী যোদ্ধা প্রবীর আর নেই। ঘটনার আকস্মিকতা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে কলকাতাসহ শহরতলীর সর্বত্র। পুলিশ গ্রেপ্তার করে বীর সেনকে। ওরা সেদিন চেয়েছিল- এই ঘটনাকে উপজীব্য করে সারা পশ্চিমবাঙলায় প্রতিবাদী সংস্কৃতি চর্চাকে বন্ধ করতে। তবে তা পারে নি। প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন কলকাতা তথা রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা। তাই ঘটনার সংবাদ পেয়ে

সেদিনই হাসপাতাল চত্বরে গিয়েছিলেন মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, সৌরীন ভট্টাচার্য, সোমনাথ লাহিড়ী, গুরুদাস দাশগুপ্ত প্রমুখ। এছাড়াও এই বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেদিনই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্পাদক শিশির সেন, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

শুধু তো প্রতিবাদ নয় যে যে পুলিশ এই নির্মম হত্যাকান্ড সেদিন সংগঠিত করেছিল তাদের কঠোরতর শাস্তির দাবি করে তখন এই রাজ্যে, ওপার বাংলা সহ বিদেশেও বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, সত্যযুগ, গণশক্তি পত্রিকাতেও ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মামলার শুনানি, শাস্তির রায় সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে। যুগান্তর ও সত্যযুগ পত্রিকার শিরোনাম ছিল, 'আমার নিরপরাধ ছেলেকে মারলো কেন ? প্রবীরের মা'র প্রশ্ন। ঐ প্রতিবেদনে প্রবীরের মা রাণু দত্ত সরাসরি কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রেখেছিলেন।

নয় নয় করে বত্রিশটা বছর এখন অতিক্রান্ত। কার্জন পার্কের নাম হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ উদ্যান। সেখানে ভাষা স্মারক সমিতি সহ বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন এখনো নাটক মঞ্চস্থ করে মুক্ত মঞ্চে। লালন ফকির, আব্বাসউদ্দীন স্মরণে হয় নানা অনুষ্ঠান। সংস্কৃতি চর্চার এই চলন্ত অধ্যায়কে অব্যাহত রাখতে আগামী ২০শে জুলাই (বৃহস্পতিবার) বিকাল চারটায় শুরু হবে শহীদ শিল্পী প্রবীর দত্তর স্মৃতি ফলক স্থাপন অনুষ্ঠান। প্রবীর দত্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি এবং অবশ্যই সেই সিল্যুয়েট নাট্য গোষ্ঠিই এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সেই স্মৃতির সাক্ষী বহু জন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।।" এই প্রতিবেদনের বেশ কিছু তথ্য নিয়ে মতামত থাকলেও সেদিনের পুরো পরিস্থিতিটা বুঝতে ভীষণ সহায়ক বলে মনে করি বীরসেনের মত অনুল্লেখিত মানুষটি এদিনের প্রধান চরিত্র - এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়, সেদিনের ঘটনা যদি আমাদের নাটকের ইতিহাসের মনে রাখতে হয় তাহলে তাঁকেও মনে রাখতে হবে।

কিন্তু প্রায়শই দেখি, সেই সময়ের স্বজনদের কেউ কেউ অদ্ভুতভাবে এড়িয়ে যান বীরসেনের কথাটা। প্রবীর দত্তর ঘটনা মর্মান্তিক বললেও কম বলা হয়। কিন্তু বিপ্লবী প্রয়োজনে তাঁর নাম যত উচ্চারিত হন, বীরসেন হন না। তাই পরবর্তী প্রজন্ম শহীদ মানুষটির নাম যতটা শোনেন লড়াকু থিয়েটারের মানুষটার নাম ততটা শোনেন না। যেমন একটি লেখার অংশ আবার নিয়ে আসি, ' এই নাট্যানুষ্ঠানগুলি বন্ধ করবার চেষ্টা করলো তৎকালীন সরকার এবং তাদের ঠ্যাঙারে পুলিশ বাহিনী। অবশেষে ১৯৭৪ -এর ২০ জুলাই, কার্জন পার্কের মাঠমঞ্চকে ঘিরে ফেললো তৎকালীন সরকারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। এলোপাথাড়ি লাঠি চালিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল মাঠ মঞ্চের নাট্যানুষ্ঠান। লাঠির আঘাতে খুন হলো প্রবীর দত্ত নামে এক তরুণ দর্শক (আগের প্রতিবেদনে প্রবীর দত্ত ও নরেশ মন্ডলকে একসাথে অভিনেতা বলা হয়েছে। তার মানে কেউ একজন তথ্যগত ভাবে ভুল। গ্রেপ্তার হলো বহু নাট্যকর্মী এই

কার্জন পার্ক এবং বিভিন্ন দলের মহড়া কক্ষ থেকে। খেয়াল করুন, বীরসেন নামটা এলোই না)। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল বাংলা ও ভারতবর্ষের বহু সাংস্কৃতিক সংগঠন, নাট্যদল, নাট্যজন, চলচ্চিত্র শিল্পীসহ কবি, সাহিত্যিক, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন সহ বহু বহু প্রতিবাদী মানুষ। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, তাপস সেন, বিভাস চক্রবর্তী, শ্যামানন্দ জালান, অসিত বসু, গুরুদাস দাশগুপ্ত, কিশলয় সেন, জহর ঘোষ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলায়। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিবাদ সভা হয় কার্জন পার্কে ২৪ আগষ্ট ১৯৭৪। কার্জন পার্ক সহ পুরো অঞ্চলটা সেদিন সম্পূর্ণ দখলে চলে গিয়েছিল প্রতিবাদী মানুষের ।বিভিন্ন নাট্যদলের অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি হল বাদল সরকার পরিচালিত 'মিছিল' নাটকটি। পর পর দুটো বড় উদ্ধৃতি দিতে হল এই কারণে যে, মাত্র ৪৬ বছরের পুরনো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইতিমধ্যেই কেমন বদলে বদলে যাচ্ছে। প্রথমটিতে কিছু তথ্যের ভুল আর দ্বিতীয়টিতে সব আছে, সুন্দর করে আছে, নেই শুধু বীরসেন আর সেদিনের প্রযোজনাটির নাম - যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

বিজন মন্ডলের জন্ম ২৮ জানুয়ারি ১৯৫৭। বিজন তখন স্কুল পেরিয়ে কলেজ ছাত্র। স্কুলের মাষ্টারমশাই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কোন প্রভাব বিজনের মধ্যে ছিল কিনা জানা যায় নি। কিন্তু ছাত্র যখন নাটকের দল তৈরি করেন, তার পিছনে প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। এমনকি বহু বছর পর দুজনে মিলে যাত্রায় কাজও করেছেন। সেই বিজন ১৯৬৮ সালে তৈরি করলেন নিজের দল 'সিল্যুয়েট'। নাটক লেখার হাতেখড়ি তার আগেই। 'আমরা কোথায়' (১৯৬৪)-তে লিখেছেন। গোরক্ষবাসী রোডের ভাঙা বেড়ার আস্তানাতেই দলের কাজ শুরু। তখন তিনি প্রসেনিয়ামে কাজ করবেন বলেই ঠিক করেছিলেন। পর পর দুটি নাটক করলেন। তারপর চলে যেতে হলো চাকরিতে । সংসার বড় বালাই। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা বাধ্য করেছিল চাকরি নেবার, দলের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। দলের পুরনো যারা তারা বসে গেলেন। কিন্তু নতুন করে আবার এই বসে যাওয়া থিয়েটার পাগলেরা মধ্যমগ্রামে দলের পুরনো নামেই কাজ শুরু করলেন। সেই দলের একজন পাণ্ডা ছিলেন রামানুজ সেনগুপ্ত। তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি, সবে একটি প্রযোজনা প্রায় তৈরি শেষ, তখন বীরসেন ফিরে এলেন চাকরি ছেড়ে। তিনি নাটকই করবেন এবং সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে। পুরনো বন্ধুদের সামনে দাঁড়াতেই সসম্মানে তার জায়গা ছেড়ে দিলেন, দলের নাম ফিরিয়ে দেয়া হলো তাকেই। তবে সিল্যুয়েটের সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন মধ্যমগ্রামে নিজেদের একটি দল গড়লেন- শ্রীবিদূষক। সেটা নিতান্তই যাতায়াতের অসুবিধার জন্য। কোন মতান্তর ছিল না বলেই শুনেছি। অতঃপর সিল্যুয়েট বীরসেনের নেতৃত্বে তখন বিশ্বরূপা, শ্রীরঙ্গমে নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বিজন মণ্ডল তাঁর সঠিক নাম হলেও তিনি মূলত পরিচিত বীরসেন নামে। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য মূলত : এই নাম বদলানো। সত্তরের দশকে তো থিয়েটার খুব সহজভাবে করা যায়নি। পুলিশি নজর এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে চলতে হতো প্রায় সকল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মীকে।

গণনাট্যের সময় থেকেই আমরা দেখেছি, বহু নাটকের মানুষ কলম ধরার জন্য নতুন নাম নিয়েছেন। অনেকে একাধিক নামে লিখেছেন। বীর সেন সেই ধারার অনুসারী বলা যায়। তবে তিনি বীর এবং সেন কথা দুটি আলাদা করে ধারণ করতে চাননি, তিনি হতে চেয়েছিলেন বীরসেন, হয়ে গেলেন বীর সেন। বীর হলো মূল নাম আর পদবী হলো সেন। ছদ্মনামে সাধারণত কোন পদবী আলাদা করে হয় না, এখানে সেটা চালু হয়ে গেল। পুরাণ কথিত বীরসেন সম্পর্কে উইকিপিডিয়ায় লেখা আছে, **Birsen** is a common feminine **Turkish given name**. It is also used as a surname, and less commonly a masculine given name. The name is produced by using two Turkish word: Bir and Sen In Turkish **Bir** means **One** and **Sen** means **You**. Thus **Birsen** means **Only You**.ইতিহাসের ট্রাজেডি হলো, সারাজীবনে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে 'অনলি ইউ' হয়ে উঠতে পারেন নি। অথচ যতদিন বেঁচে ছিলেন থিয়েটার যাত্রা নিয়েই পথ চলেছেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত হবার ইতিহাস সেই শুরু থেকে সাথে সাথে চলেছে। এবং সেটা সিল্যুয়েটকে নিয়ে কাজ শুরুর সময় থেকেই।

বিশ্বরূপায় অভিনয় করে 'আবৃত্ত দশমিক'। তখন প্রযোজনাটি বেশ আলোচিত। কেউ কেউ বলেছেন, 'রাজরক্ত'র পর মনে রাখার মত কাজ 'আবৃত্ত দশমিক'। উৎপল দত্ত, ধরণী ঘোষ প্রশংসা করে লিখছেন, সেই প্রযোজনার অভিনয় হবে। অভিনয়ের আগের দিন দেখা গেলো তিনটে টিকিট বিক্রি হয়েছে। তখনো হলভাড়া পুরো দেয়া হয়নি, অভিনয়ের দিনের খরচ রয়েছে। বীরসেন সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনজন দর্শকের টাকা অনুরোধ করে ফেরত নিতে বলা হবে। অর্থাৎ অভিনয় হবে না, আর হল ভাড়া নিজেদের ঘড়ি, আংটি, জামা বিক্রি করে মিটিয়ে দেয়া হবে। সেই সংগে আর একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, এবার অভিনয় হবে খোলা পরিসরে। শুধুমাত্র এই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে তিনি স্থায়ী হয়ে গেলেন।

এর আগেও খোলা বা উন্মুক্ত পরিসারে থিয়েটার হয়েছে এই বাংলায়। কিন্তু সেটা কখনো নির্বাচনী প্রচার বা রাজনৈতিক কোনো ইস্যু নিয়ে সাময়িকভাবে। ১৯১৭ সালে মনমোহন গোস্বামীর লেখা 'হোমরুল' কলকাতার জেলে পাড়ার সঙের আঙ্গিকে লেখা পথ নাটক বলেন কেউ কেউ* আবার ১৯৩৮ - এ দয়াল কুমারের লেখা 'মুক্তির অভিযান' হুগলি জেলার গ্রামে গ্রামে অভিনয় হয়েছে বলে শোনা যায়। ১৯৫২ -এ পানু পাল লিখলেন 'ভোটের ভেট' এবং ১৯৬১-তে উৎপল দত্ত লিখেছিলেন 'স্পেশাল ট্রেন'। এই প্রযোজনাগুলি সাময়িক প্রয়োজন থেকেই লেখা এবং অভিনীত পথ নাটক। কিন্তু একটি প্রযোজনা হবে নিয়মিত সপ্তাহের শনিবার বিকেল চারটের সময়, দর্শক নাটক দেখার পর তার খুশিমত অর্থ দেবেন বা দেবেন না। এই সিদ্ধান্তটাই ঐতিহাসিক। মনে রাখতে হবে ১৯৭১ এ তখনো তৃতীয় থিয়েটার ভাবনা বাংলায় আসে নি, আসেনি অন্তরঙ্গ বা ইন্টিমেট থিয়েটার জাতীয় কথা। ১৯৭১- সালে একটি লোক নিয়মিত থিয়েটার করতে বেছে নিচ্ছেন খোলা একটা মাঠ- যার নাম দিয়েছিলেন, 'ওপেন এপিক থিয়েটার', প্রথম প্রযোজনা 'মুক্তি আশ্রম' ।

বীরসেন নিজেই গণনাট্য সংঘের একজন প্রধান পুরুষ হীরেন ভট্টাচার্যের কিছু কথা উদ্ধৃত করেছিলেন। " ৭০ সাল থেকে সন্ত্রাস শুরু। '৭১ সালে পি ডি এফ সরকার, হেমন্ত বসু হত্যা ইত্যাদি ঘটনা শুরু হলো। ৭১ সালে চারখানা নাটক লিখিত হলো। তারপর '৭২ থেকে ৭৭' এর প্রারম্ভ পর্যন্ত শ্বাসরোধী রক্তঝরা দিন। কোন নাটক পথে নামতে পারলো না। কিন্তু সিল্যুয়েট নাট্যগোষ্ঠী সব সন্ত্রাস উপেক্ষা করে কলকাতার কার্জন পার্কে বীর সেনের লেখা ও পরিচালনায় **মুক্তি আশ্রম** নাটকের অভিনয় করে। এবং সম্পূর্ণ মুক্তমঞ্চের আঙ্গিকে। " প্রথম যেদিন সতীর্থদের সামনে বীরসেন বললেন, নাটক হবে কার্জন পার্কে, সেখানে প্রচুর মানুষ গল্প করতে, জিরিয়ে নিতে আসেন-তাঁরাই দর্শক। আর বিকেলে অভিনয় হবে, কারণ, আলো দেবেন সূর্যদেব। আলো না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু আবহ হবে কি করে? টাকা খরচের কোন উপায় নেই। সেটা নিয়ে কথিত আছে, কার্জন পার্কে একদল হিন্দি ভাষার মানুষ নিয়মিত ঢোল করতাল নিয়ে গান বাজনা করতেন। তাদের কাছে সিল্যুয়েটের সদস্যরা গেলেন। বললেন, আমাদের নাটকে আপনারা সহযোগিতা করুন। আপনারা ঢোল বাজিয়ে দেবেন। অর্থ দিতে পারবো না, তবে নাটকের পর যদি কিছু টাকা দর্শকরা দেন, তার থেকে দিতে পারবো। তারা রাজী হয়ে গেলেন ।১১ ডিসেম্বর ১৯৭১- অভিনয় হলো, 'মুক্তি আশ্রম'। নাটকের শুরুতে কিছু নিজেদের নাটকের গান-যাতে ঢোল বাদনে ছিলেন সদ্য পরিচিত হওয়া বাজনদার।

' আবৃত্ত দশমিক' নাটকটি হঠাৎ বন্ধ করে নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই নাটকটি সাতটি অংশে ভাগ করা ছিল। যা দেখে অনেকেই বলতেন, ব্রেখটীয় নাটক। তারই এক অংশের নাম ছিল 'মুক্তি আশ্রম'। মূলত 'আবৃত্ত দশমিক' - সাতটি বিভাগের মধ্য এই অংশটি ওপেন এপিক থিয়েটার ফরমে করা যাবে বলে মনে হয়েছিল। তাই এই ঐতিহাসিক উপস্থাপনা। এরপর ছোট ছোট দশটি নাটক করে ফেললেন ১৯৭১ সালেই, আর ১৯৭২-এ করলেন আরো ২৬টি নাটক। ১৯৭১ এর ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই টানা তাঁর কাজের পরিধি এই কার্জন পার্ক ঘিরে। তথাপি তিনি অনালোচিত। কারণ, তিনি কখনো ঘোষণা করে জানান দেন নি, তিনি প্রসেনিয়াম ছেড়ে ওপেন এপিক থিয়েটার করবেন বরাবর। যে ঘোষণায় সোচ্চার ছিলেন বাদল সরকার।

বাদল সরকার লো কষ্ট থিয়েটার করবেন জানিয়েছিলেন। বীরসেন সেই কাজটিই করেছিলেন আরো আগে। নিশ্চয় দুজনের কোন তুলনামূলক কথা হতে পারে না। কিন্তু বার বার মনে হয়েছে দুজনে পাশাপাশি থেকে কাজ করলে হয়তো এই ধারার থিয়েটারের কাজ আরো ব্যাপ্তি পেতে পারতো। হয়তো আমি যা ভাবছি তা হতো না। কিন্তু এটা বাস্তব দুজনে একসাথে কোন কাজ করেন নি। বীরসেন গ্রেপ্তার হলেন ১৯৭৪-এর জুলাইতে, আর বাদল সরকার মাত্র দুদিন তিনটি নাটকের অভিনয় করলেন ১৯৭৪-এর অক্টোবরে। ১৯ অক্টোবর করলেন 'ভানুমতি কা খেল' এবং 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', এরপর তিনমাস বাদে ১৯৭৫-এর ১৮ জানুয়ারী করলেন, 'রূপকথার কেলেঙ্কারী'। তিনি প্রযোজনা আর না করলেও নানাভাবে কার্জন পার্কে ছিলেন অবশ্যই। কারণ, তখন বহুদল সেখানে কাজ করছেন, তাঁরা সকলেই তাঁকে গুরুপদে মেনে চলছেন, তাই তাঁকে যেতে তো হবেই। কিন্তু বাদল সরকারের প্রথম ও

শেষ পছন্দ ছিল অন্তরঙ্গ পরিসর, খোলা মাঠ তাঁর পছন্দের পরিসর ছিল না। এটা নানা জায়গায় তিনি বলেছেন।

তাহলে খোলা পরিসরের এই নাট্য প্রক্রিয়ায় বীরসেনকে যথাযথ মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে অসুবিধা কোথায় তা বুঝে উঠতে পারছি না। আসলে জীবিত সময়ে যে ক্যারিসমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে জানা দরকার ছিল, তা করায়ত্ব ছিল না তাঁর ! আর দায়ী ছিল তাঁর খামখেয়ালী জীবনযাত্রা। একজন ক্রিয়েটিভ ইমোশনাল মানুষের যে যে পরিণতি হতে পারে, তার সবগুলিই তাঁর জীবনে ঘটেছিল। অথচ বেশ কয়েক বছর ধরে টানা কাজ করেছেন, অনেকগুলি প্রযোজনা, বহুদল উদ্বুদ্ধ হয়ে সামিল হয়েছেন কার্জন পার্কে, নিয়মিত কাজ করছেন তাঁরা, সেই উৎসাহ থেকে বিবাদ-শনিবার বিকেলে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া না পাওয়া নিয়ে। সুরেন্দ্রনাথ পার্ক নাট্যসংসদ হলো - যাতে সুষ্ঠুভাবে সবাই মিলে কাজকর্ম করা যায়। (যদিও শুনেছি সেখানে সিল্যুয়েট বাদ হয়ে গিয়েছিল)। নানা জায়গায় উৎসব হচ্ছে, এই কার্জন পার্কের প্ল্যাটফরম বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ব্যবহার করতেন নানা ভাবে- সব মিলিয়ে এ তো একটা আন্দোলন, যার শুরুয়াত ঐ বীরসেনের হাতে এবং অবশ্যই পুষ্ট হয়েছিল বাদল সরকারের মত মানুষের কাজের মধ্য দিয়ে।

১৯৭৪-১৯৯৬ তিনি কোনভাবেই থিয়েটারের মধ্যে ছিলেন না। যাত্রা জগতে চলে গিয়েছিলেন। যাকে গুরু বলে মানতেন বীরসেন, উৎপল দত্তের পরামর্শেই গিয়েছিলেন। কলিকাতা যাত্রা সমাজ এবং আরো কয়েক জায়গায় কাজ করেছেন, পালা লিখেছেন প্রায় ৩১টির মত। সেটা অবশ্যই আমাদের থিয়েটারের ক্ষতি। কিন্তু ঐ যে শুরুতেই লিখেছিলাম, সারা জীবন একটু অর্থের জন্য তাঁকে এই কাজগুলি করতে হয়েছে। একবার বর্ধমান রায়না কলেজে পড়াতে গেলেন, আবার চলে এলেন। দিল্লিতে ইউনিসেফের হয়ে কাজ করতে গিয়ে থাকতে পারলেন না। নাট্যকার চন্দন সেনের যোগাযোগে সি এ ডি সির কিছু কাজ করলেন- সেটাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বার বার এই ভাবে ফিরে আসছেন তো একটা কারণেই- থিয়েটার করবেন। কিন্তু বাস্তব এই জীবনযাপনে নিজেকে স্থায়ী করা সম্ভব হয়নি বলেই থিয়েটার করতে পারছিলেন না। কার্জন পার্কে যেতে বারণ করছেন সুহৃদ জনেরা। তখন একটু অর্থ, একটা আশ্রয় দরকার হয়ে পড়েছিল তাঁর। এবং গুরু পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যাত্রায়, গুরু নিজেও তাই করছেন। সেখানেই নতুন ফুল ফোটানোর আশায়। কিন্তু তাতে থিয়েটারের জায়গা থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়া সহজ হয়েছিল আমাদের। ১৯৭৭-এর ৩০ জুলাই রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এক জায়গায় লিখেছিলেন -" শ্যামল ঘোষ, অসিত বসু, বীর সেন নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভুলে যাত্রায় নেমেছেন। অমর গাঙ্গুলি আমেদাবাদে সঙ অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনে গুজরাটি ভাষায় পরিবার পরিকল্পনার নাটক করছেন। বিভাস চক্রবর্তী কলকাতা দূরদর্শনের কাজে ব্যস্ত। " অসীম চক্রবর্তীকে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রসঙ্গগুলি আনছেন তিনি। কিন্তু যাঁদের কথা বলা হলো, তারা কিন্তু আজীবন থিয়েটার সংগ ত্যাগ করেন নি কেউ। আমাদের সামাজিক কাঠামোয় দাঁড়িয়ে তাঁরা যেভাবে থিয়েটার নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন, সেই চাওয়ার পথটা ভুল ছিল। ভালোবাসায় কোন ভুল ছিল না। বীরসেনও তাই।

বীরসেন যাত্রা ছেড়ে দিয়েছিলেন। যাত্রা ছাড়ার পর ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ দফতর আয়োজিত উৎপল দত্ত নাট্য উৎসবে নিজের দলের ব্যানারে করেছিলেন উৎপল দত্তের 'সন্ন্যাসীর তরোবারি'। অভিনয় হয়েছিল ১৯ আগষ্ট ২০০৫। এটা ছিল প্রক্ষিপ্ত একটি কাজ। যাত্রা ছেড়ে আবার নতুন করে শুরু করবেন থিয়েটার এই বাসনা সুপ্ত ছিল, কিছু বন্ধুর সাহচর্যে তা বিকশিত হতে চাইলো। কিন্তু যাদের উৎসাহ তাকে উৎসাহিত করেছিল, তাদেরও কাজের উৎসাহ আছে, অর্থের সামর্থ্য নেই। জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন। ক্রমাগত ধাক্কা খেতে খেতে মন তখন অবশ হয়ে আসতে চায়। এই সময়ে কয়েকজন তাঁকে পেশাদার মঞ্চে কাজের জন্যও উৎসাহিত করেছিল। গহনা বিক্রি করে নামী শিল্পীকে অগ্রিম দেয়া হয়ে গেল, পান্ডুলিপি তৈরি প্রায়। কিন্তু কাজটা করা গেল না। আরো যারা অর্থের যোগান দেবেন বলেছিলেন, তারা সেটা করলেন না। অভাবের সংসারের টাকা জলে ভেসে গেল। ভেবেছিলেন পেশাদার মঞ্চে কাজটা করে কিছু অর্থ পাওয়া গেলে সিল্যুয়েটের কাজটা করা যাবে আবার। কিন্তু হলো না এবারও। বুঝলেন , হেরে গেলেন তিনি বরাবরের মত। কর্ণের রথের চাকা আর তোলা যাবে না। অনিবার্য মৃত্যু তাঁর। এ মৃত্যুতে বাইরে কোন দাহ হবেনা। অনবরত দাহ হয়ে যাবে মন। তাই সব কিছু ছেড়ে উধাও হয়ে গেলেন। এই পর্বের কথা কেউ জানেন না তাঁর অনেক প্রিয় কাছের মানুষেরাও। হঠাৎ কোনদিন চেনা কারো বাড়িতে এসে খেতে চাইতেন, কয়েকটি টাকা চাইতেন। আবার চলে যেতেন নিজের মনে কোথাও। বলতেন নতুন লেখার মধ্যে আছি। হয়তো ঐ ভবঘুরেদের জীবন নিয়ে লিখবেন বলে তাদের মত করে থাকতে চেয়েছিলেন। সঠিক কারণ কাউকে বলেননি কোনদিন। বন্ধুজনেরা বুঝে নেবার চেষ্টা করতো মাত্র। একদিন খবর পাওয়া গেল দমদম রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফরমে ভবঘুরেদের মাঝে বসে আছেন, 'অনলি ইউ' বীরসেন। খোঁজ পেয়ে আনতে যাবার মাঝে তিনি নেই হয়ে গেলেন সেখান থেকে। শেষ পর্যন্ত অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁকে জোর করে নিয়ে আসা হয় ঘরে। এই মানুষ কি করে ঐতিহাসিক হবেন? তাই যতটুকু করেছেন, কেউ কেউ মনে রেখেছেন, কেউ কেউ লিখতে ভুলে যান, কেউ কেউ অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেন, তার সাথে কাজ করেছেন কেউ কেউ এখন তাঁকে নিয়ে গুছিয়ে বলে উঠতে পারেন না- এ অভিজ্ঞতা তাঁকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আমারও হয়েছে।

সময়ের অনেক আগেই শরীর মন দুই অচল হয়ে উঠছে প্রায়। সাথে রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে। ঘরের মধ্যে বই আর লেখা সঙ্গী। যে লেখাগুলির কোনটিই এখন কোথায় কিভাবে আছে জানি না। অন্তত ছাপার অক্ষরে দেখতে পাইনি। নাটকের পান্ডুলিপি রচনা বা সংরক্ষণ কোনটিই ঠিকভাবে করেননি। একই নাটকের চার পাতা আজ তো দু পাতা পরশু লিখে কার কার হাতে দিলেন মনে থাকেনা সব। টানা একটা নাটক লিখেছেন এমন প্রায় বিরল ঘটনা। কোন লেখাই নিজের কাছে রাখতেন না। ফলে যা হবার তাই হয়ে চলেছে এখনো। অধরা তাঁর পান্ডুলিপি। যে তালিকা নিচে দেয়া হলো তা সম্পূর্ণ নয় নিশ্চিত। তবু থাক কোথাও।

যাক সেসব কথা জীবনের যবনিকার কথা বলা যাক।

তিনি যেদিন মারা যান, সেদিন ছিল তাঁর মেয়ের বিয়ে। বিয়ে বাড়ির কেউ জানলো না, একজন সৃষ্টিসীল মানুষের অপচয় শেষ হয়ে গেল সংসার থেকে। সেদিন ছিল ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৩। এই তো সেদিন, অথচ কতদিনের করে দিলাম যেন আমরা , কোন চিহ্ন রাখতে চাইছি না আমরা কেউ। একদিকে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আর একদিকে নিথর শরীর বরফের চাদরে রেখে দেয়া হলো। শুভদিনে তো আর অশুভকে ডেকে আনা যায় না, তাই পরদিন সকলকে জানান দিয়ে চলে গেলেন তিনি। থিয়েটারের মানুষ কেউ ছিলেন? ছিলেন, সংখ্যাটা আর লিখলাম না। তবে স্মরণসভা হয়েছিল বেশ জম্পেশ করে। তারপর তাঁকে নিয়ে আমাদের নীরবতা চলছে চলবে।

বীরসেন রচিত নাটক ঃ আমরা কোথায় (১৯৬৪), নির্বাসিত হৃদয় (১৯৬৮), আলোর আলো(১৯৬৯), আবৃত্ত দশমিক (প্রথম অভিনয়-২৯/০৬/১৯৬৯, বিশ্বরূপা), গাজনের বাজনা (১৯৭০, মিনার্ভা), জ্যামিতিক প্রগতি(১৯৭০), চোর, চোর হে কলকাতা, বিবর্তন, কফন, বীরু মহারাজের তীর, মনসুরের ক্ষেত, বন্ধ দরজা, লাফিং গ্যাস, ডালিমা, রেশমি সকাল, রঘুরায় জিন্দা হ্যায়, ভারত গৌরব নেতাজি, এখন বলবো না, যা ভাবছো তা নয়, এখনো একলব্য, সকলি দেশের জন্য, তখন সে এক ইতিহাস, হুকো মুখো হ্যাংলা, ছোট্ট একটা ঘর, এক একটা দ্বীপ, থিয়েটার থিয়েটার, বিবাহ বিপনি, দেবালয়ে হত্যা, ইয়ে দিবার টুটেগা নেহি, আবার আলোতে, আবার ঘরে ফেরা, একটু ভাবুন, ক্ষুদিরামের বিচার, রোশনী সুরজ কা, এই চাঁদ আমাদের, নতুন সূর্য, খামারের রেওয়াজি পশু, ভরত, প্যারি কমিউন। **(মোট ৪২টি নাটক)।**

বীরসেন রচিত যাত্রাপালা ঃ তুফান, যুগের ধারাপাত, কালের ছোবল, সোনার হরিণ, পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ, সেই কালো রাত, শের ই বাহাদুর শাহ, মেহেরজান, বৌ বাজারের বৌ, স্মৃতিটুকু থাক, বিদ্রোহী পরশুরাম, গাজনের বাজনা, রূপবান, রক্তে রাঙা পাঞ্জাব, জটায়ু, সাদ্দাম হুসেন, আজকের দ্রৌপদী, বিশ্ব বন্দিতা ইন্দিরা, চরকার গান/ ভারতছাড়ো, লজ্জা, পৃথিবী টাকার গোলাম, সিঁদুর নিয়ে খেলা, বাসর ঘরে বধূর লাশ, স্বামী খুনের বদলা চাই, জেলে যাচ্ছে পরমা, কাঁটায় ঘেরা মায়ের আঁচল, দর্পণে কে? মায়ের আমার মধুর হাসি, কাল যমুনার বিয়ে, মেয়েরা খেলার পুতুল নয় । **(মোট ৩০টি যাত্রাপালা)।**

মিতা সেন সংগৃহীত

কৃতজ্ঞতা ঃ ভবেশ দাস, গৌতম সেনগুপ্ত, ভর্গোনাথ ভট্টাচার্য, প্রদীপ ঘোষ ও মিতা সেন।

পথ নাটকের চলতি কথা- সোমেন পাল, সব্যসাচী পত্রিকা ১৪ বর্ষ ২২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯১।

লেখক ঃ **আশিস গোস্বামী**, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।

জন্ম সার্ধ-শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ শিশু পালাকার, অবনীন্দ্রনাথ

অপূর্ব দে

রবীন্দ্রনাথের আদরের অবন অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি চিত্রশিল্পী, ছবির রাজা। ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন যুগের দিশারি। তিনি ছিলেন শিল্পের অন্দরমহলের অর্থাৎ অন্তরমহলের শিল্পী। তাঁর নিজের কথায় আর্টের তেতলার লোক যেখানে শিল্পী বিভোর, সেখানে সে মা হয়ে শিশুকে পালন করছে। সেখানে সে মুক্ত, ইচ্ছেমতো শিশুশিল্পীকে সে আদর করছে, সাজাচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন মস্ত বড়ো মাপের শিশুমনের অধিকারী। তাঁর অন্তর্গত রক্তের আঙিনায় তিনি সহজেই পা রেখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নেই; রয়েছে প্রাণের সঙ্গে মানবিক ও মানসিক সেতু বন্ধন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিশু মন নিয়ে শিশুদের জন্য কয়েকটি পালাধর্মী নাটিকা রচনা করেছেন। এসময় তিনি আট-দশ বছর ছবি আঁকেন নি, তুলি কাগজ ছুঁয়ে দেখেননি। ছবি না আঁকার কারণ হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন 'কি জান রবিকা, এখন যা ইচ্ছে করে তাই এঁকে ফেলতে পারি। সেজন্যই চিত্রকর্মে আর মন বসে না। নতুন খেলার জন্যে মন ব্যস্ত।' এই নতুন খেলা হল নাটক লেখা। নাটক নিয়ে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করা। রূপকথা, পঞ্চতন্ত্র, কথামালা, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি পঁচিশটিরও বেশি নাটক লিখেছেন। যদিও অবনীন্দ্রনাথ নিজে এগুলোকে নাটক না বলে যাত্রাপালা বলেছেন। নাটকের নামের সঙ্গে 'পালা' শব্দটি জুড়ে দিয়েছেন। যেমন 'উড়োনচণ্ডীর পালা', 'মউর ছালের পালা', ঘোড়া হাটের পালা', 'বৃক ও মেষ পালা', 'ধোড়া কাক ও বুড়ো শিয়ালের পালা', 'ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর পালা' ইত্যাদি । তাঁর অধিকাংশ পালা ও নাটিক শারদীয় 'আনন্দবাজার', 'দেশ', 'বসুমতী', 'রংমশাল', 'মৌচাক', 'অমৃত' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মূলত রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় সেগুলি বই আকারে প্রকাশিত হয়। শিশু নাটক রচনার যে পথ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন, সেই পথ ধরেই হাঁটা শুরু করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবনীন্দ্রনাথ নাটক লেখা ছাড়াও নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নানাভাবে। রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার সঙ্গে অভিনেতা ও মঞ্চস্থপতি হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হল দ্বিতীয় বাল্মীকি দস্যু 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে, 'বৈকুণ্ঠের খাতায় তিনকড়ি, 'ডাকঘর' নাটকে কবিরাজ ও মোড়ল, 'অলীকবাবু' নাটকে ব্রজদুর্লভ, 'রাজা ও রানি' নাটকে ছোটো ছোটো ছ'টি আলাদা চরিত্র ইত্যাদি। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকটি ১৮৯৭ সালে সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকে তিনকড়ির হাস্য ও চটুল চরিত্রে অবনীন্দ্রনাথ প্রশংসনীয় অভিনয় করে খুবই খ্যাতিলাভ করেন। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন — 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র

এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন-অবনদের ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।'[১] বোঝা যায় অবনীন্দ্রনাথের তিনকড়ি চরিত্রে অভিনয়ের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে চিরজাগরূপ ছিল।

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় কাবুলিদের মতো ইয়া গোঁফ ও পাগড়ির সমাবেশে ডাকাতদের ভীতিজনক রূপ অবনীন্দ্রনাথ সহজেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকের মঞ্চ সজ্জার দায়িত্বে ছিলেন হরিশ চন্দ্র হালদার (হ.চ.হ.)। সহযোগিতায় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় লিখেছেন— স্টেজে পিছনে আয়না দিয়ে আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হয়েছে, সঙ্গে কড়কড় করে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি, নিতুদা দোতলায় ছাদ থেকে দম্বেল দুটো গড়গড় করে এধার থেকে ওধার গড়াতে লাগলেন। ... যতদূর রিয়্যালিস্টিক করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল। 'ডাকঘর' নাটকের মঞ্চসজ্জার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। 'শারদোৎসব' নাটকে অবনীন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জা ভীষণ প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায় - 'শারদোৎসবে বক উড়িয়ে দিলুম ব্যাকগ্রাউন্ডে। কাপড়ে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে এক সার বক এঁকে দিলুম ছেড়ে। তারা ডাকতে ডাকতে স্টেজের উপর দিয়ে যেতে লাগল।' [ঘরোয়া] শরৎকালের আকাশকেও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রুপোলি কাগজ কেটে প্রতিপদের বড়ো চাঁদ ও কয়েকটি তারা বানিয়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিলেন আকাশের বুকে। নীল মখমলের বনাত (মোটা কাপড় বিশেষ) কাজে লাগালেন 'ফাল্গুনী' নাটকেরে দৃশ্যসজ্জায়। ব্যাকগ্রাউণ্ডে নীল বনাত টানিয়ে তৈরি করেছিলেন নীল রঙের রাতের আকাশ। বাদাম গাছের ডালপালা এনে স্টেজ সাজিয়েছিলেন। বাঁশের পায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলনা বানিয়েছিলেন। মনে হতো যেন গাছের ডালে দোলনা বাধা আছে। 'ফাল্গুনী ' নাটকের মর্মার্থের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের অঙ্গসজ্জা মিলিত হয়ে নাট্যের বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করে তুলেছিল। এ নাটকের মঞ্চসজ্জা বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মঞ্চসজ্জা। সমগ্র পরিকল্পনাটি করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, জাপানি উদ্যানবিদ কাসাহারা প্রমুখ।

প্রবন্ধশিল্পী হিসেবেও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তখনকার সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় 'নাচঘর' পত্রিকায় তিনি নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও নাট্য সমালোচনা লিখেছেন। বিহারের ভূকম্প-পীড়িতদের সাহায্যার্থে কলকাতার নাট্যনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। The Tagore Dramatic Group এর উদ্যোগে প্রবোধেন্দু নাথ ঠাকুরের প্রযোজনায় এই অভিনয় হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের ৬ এপ্রিল অভিনীত এই প্রযোজনার মুদ্রিত অভিনয়সূচির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নামক রচনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত 'নাচঘর' পত্রিকার ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র সংখ্যায় প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। 'মনোমোহনে সীতা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'নাচঘর' পত্রিকায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৩০ শ্রাবণ সংখ্যায়। 'বাংলা থিয়েটারের একটুকরো' প্রবন্ধটি 'নাচঘর' পত্রিকায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৬শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। ঠাকুরবাড়িতে কৃষ্ণযাত্রা, দাশুরায়ের পাঁচালি, ফারসি বয়েত, নিধুবাবুর টপ্পা, গোপাল উড়ের যাত্রা, উর্দু গজল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে ছোটবেলায় তিনি এসব শুনতে পেতেন। আর শুনতেন বাড়ির ওড়িয়া মালীদের গান ও সংলাপ, বিহারী দারোয়ান, কোচোয়ানদের গান বাজনা। তাঁরই আবিষ্কৃত ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা ছবির মতন তাঁর মনে মিলেমিশে ছিল উদ্ভট চিন্তা ও অলৌকিক কল্পনা। যা কিছু তিনি দেখতেন, শুনতেন, ভাবতেন সবই সেই ওয়াশের ছবি হয়ে রূপ নিতে। এই ছায়াছবির খেলার সঙ্গে যুক্ত হত আজগুবি জগৎ থেকে আনা উদ্ভট রস। 'ফ্যান' আর 'ফ্যানটাসি' মিলে যে উদ্ভট জগতের সৃষ্টি হয় তার কারবারী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপ্রীতি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অসীমকুমার ঘোষ লিখেছেনঃ

> অবনীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে যাত্রা পছন্দ করতেন। তিনি নিজে
> কয়েকবার যাত্রায় অভিনয়ও করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর উদ্যোগে
> ঠাকুরবাড়িতে বেশ কয়েকবার চিৎপুর থেকে আমদানী করা যাত্রার
> আসর বসেছিল। তিনি বলতেন সাধারণ লোকেরা যারা লেখাপড়া
> জানে না এবং মেয়েরা অনেক কিছু শিখতে পারে যাত্রা থেকে।'[২]

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাদরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'যাত্রা সীরিজ' ছবিগুলির মধ্যে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত নাটক 'শিবসদাগর' — ১৩২৫ বঙ্গাব্দে 'আগমনী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। আয়তনে খুবই ছোট হওয়ায় একে 'নাটিকা' বলাই ভালো। সময় বর্ষাকাল। নাটিকার কাহিনির স্থান হলদিগুঁড়ির মাঠের চৌবাড়ি। বর্ষায় হলদিগুঁড়ির মাঠের অর্ধেকটা ডুবে গেছে। একটি পাঠশালার দাওয়ায় বসে পড়ুয়ারা অপেক্ষা করছে তাদের গুরুর জন্য। এদের ভোঁতা চাষী, ইচিং-কামার বিচিং কুমার, চাঁচি হাড়ি ও এক মুচি আছে। এই নিম্নবর্গ তথা শূদ্রদের মধ্যে আছে এক কুলীন ব্রাহ্মণ তোতা। সাত পুরুষ ধরে তারা রাজার সভাপণ্ডিত। আর গোপাল ভাঁড়। পড়ুয়ারা সকলেই গুরুর জন্য অপেক্ষা করছে। তারা দুর্ভাবনায় ভীত এই ভেবে যে গুরু জলে ভেসে গেছে কি না? গুরুর অনুপস্থিতিতে সকলে নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে লঘু -গুরু কথাবার্তা বলছে। তারা গুরু বন্দনাও করছে এই ভাষায়ঃ

> 'বন্দি গুরু, গুরু বলে তাঁহাকেই মানি
> পিতলে করিতে সোনা সে পরশমণি'

অবশেষে গুরুর পরিবর্তে হাজির হয় শিব সদাগর। সে জানায় . গুরুটি বানে ভেসে গেছে। তার জায়গায় আমরা দুই গুরু এসেছি।' শিব মুচিকে প্রথম করে আর তোতাকে করে লাস্ট। তোতা রেগে গিয়ে রাজার কাছে নালিশ করার কথা বলে। সে এই পাঠশালা ছেড়ে অন্য পাঠশালায় ভর্তি হবে জানায়। রাজার পেয়াদার ভয়ে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। রাজার পেয়াদার মারের হাত থেকে বাঁচতে তারা সমুদ্রে পাড়ি দেবার পরিকল্পনা

করে। বিদেশে বাণিজ্য করে বেড়াবে। গুরুমশায়ের বেত হবে দাঁড় আর ভোঁতার চাদর দিয়ে পাল করা হবে। পরিকল্পনা মতো তারা যাত্রা শুরু করে। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হয় গুরু। তারই নেতৃত্বে সকলে পাড়ি দেয় দূরদেশে। গুরু ছাড়া যে ছাত্রদের শিক্ষার সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়- এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় নাটিকায়। গুরু সঠিকভাবেই বলে —' পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সকল কথায় দ্বন্দ্ব/ছেলেতে ছেলেতে কথা সকল কথায় ছন্দ।' এই নাটিকার সারা শরীর জুড়ে রয়েছে হাসির নানা উপাদান। যেমন শিব তোতার নাম জানতে চাইলে তোতা বলে 'আমার নাম তোতারাম, পিতার নাম আত্মরাম, পিতামহের নাম ননীরাম, প্রপিতামহের নাম বলরাম, তস্য পিতা ....'। অবশ্য হাসির মাঝে তোতার বংশগরিমাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। মিথ্যা আভিজাত্যের অহঙ্কার যে একশ্রেণির মানুষের অলঙ্কার হয়ে উঠেছিল তোতার মধ্য দিয়ে অদ্ভুতভাবে তুলে ধরেছেন নাটককার অবনীন্দ্রনাথ। এ নাটিকার বেশ কিছু সংলাপ যেমন ব্যঞ্জন ধর্মী, তেমনি গভীর অর্থবহ। যেমন বিচিং বলে—'সবচেয়ে ভালো হতো যদি ক-জনেই রাজার পেয়াদা হয়ে পড়তে পারতুম। যা খুশি করো, কাউকে ভয় নেই। আসলে 'শিব সদাগর' নাটিকা বহরে ছোটো হলেও ভাবনায় গভীর। শিশুরা এই নাটিকা পড়ে যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি বড়োদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়বে।

' রং-বেরং' নাটকটি ১৩২৭ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই নাটকে মোট ষাটটি চরিত্র। নাটকে স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতুবন্ধন করা হয়েছে। এখানে দেবতারা তাদের দেবত্ব ঘুচিয়ে মর্ত্যের মানব-মানবী হয়ে উঠেছেন। দেবাদিদেব মহাদেব এই নাটকে 'জটে' বাবা। শিব-পার্বতী বুড়ো-বুড়ি। বুড়ো-বুড়ির খুনসুটি, রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান প্রথম দৃশ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গা নিয়ে উভয়ের দ্বন্দ্ব, পার্বতীর জমানো অতিরিক্ত টাকা খরচ করা নিয়ে দু'জনের মনোমালিন্য বেশ মজার উদ্রেক করে। পার্বতীর কথায় কথায় বাপের বাড়ি যাওয়ার বায়না বেশ উপভোগ্য। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলে দেবতারা সবাই থিয়েটার দেখতে যাবে। থিয়েটার নিয়ে তাঁদের উৎসাহের অভাব নেই। নাটকের বিষয় দেব-দানবের হাঙ্গামা। তারপর সন্ধি তথা শান্তি। অভিনয় করবে দেবতার বাহন পশু-পাখিরা। নাটকটা অশ্লীল জেনেও পিতামহ ব্রহ্মা নাটক দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এরমধ্যে মধ্যবিত্তসুলভ অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠে। জীবনটাই যে থিয়েটার এই দার্শনিকসুলভ সংলাপ উচ্চারণ করে নন্দী 'ঠাকুর এলেন জটে -বাবা সেজে, অন্যরা এলেন তাঁর চেলা সেজে বুড়ো -শিবতালায়, এই তো এক থিয়েটার।' এই নাটকের ইন্দ্রের স্মোকিং রূপ আছে, দেবতার ড্রেস সুট, ফ্যান হাতে বাদাম খেতে খেতে শচীর প্রবেশ ঘটে, ব্রহ্মার চোখে চশমা, গরদের ধুতি-চাদর পরা, গরুড় পাখি হুঁকো টানে ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রমাণ করে দেবতারা আমাদের চেনা পরিচিত পরিবেশ থেকেই উঠে এসেছেন। সমাজের অধিপতিরা যে চিরকালই উচ্চাসনে বসেন তা স্পষ্ট হয় নিশুম্ভের একটি সংলাপে-'দেবতারা চিরকাল সিটে বসেন দেখছি।' নিম্নবর্ণের মানুষের উচ্চবর্ণের প্রতি কটাক্ষ স্পষ্ট হয়। অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতো এই নাটকেও নাচ, গান, অভিনয় আছে। তারমধ্যে

আত্মরামের গান 'যেখানে গয়া গঙ্গা কিংবা কাশী/সব কিছু না মেলে/সেই দেশেরই ছেলে আমি/সেই দেশেরই ছেলে'। বেশ জনপ্রিয় গান। নাটক দেখে দেবতাদের নানা প্রতিক্রিয়া ইঙ্গিতপূর্ণ। দুই সমাজদার জ্ঞানীগুণী নারদ ও ভরতমুণির মতে 'যা ভেবেছি তাই, যেমন গান-বাদ্য, তেমনি নাট্য, তেমনি দৃশ্য! বিপরীত ব্যাপার।' (ভরত)। নারদ—'আত্মারামকে মন্দ লাগল না।' অথচ জটে বাবার মতে- '(দনুর প্রতি) অতি পরিপাটি হয়েছে হে, জিনিসটার রস পাওয়া গেল।' ব্রহ্মার অভিমত-' বইটা তেমন রুচি সংগত হয়নি। তোমরা ডন জুয়ানটা প্লে করলে না কেন? ' পার্বতীর মন্তব্য-' বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর কথাটুকু বেশ লাগল, আর যাত্রার শেষে একটা সং দিলে ভালো হতো। কেবলি কান্না, একটু হাসি না হলে চলে...।' তবে ভরতমুণির দেবযাত্রায় উর্বশী, মেনকা, রম্ভার নাচ, গান, হাসি, তামাশা দেখতে দেখতে স্বর্গবাসী যখন ক্লান্ত, তখন দনু পরিচালিত দেবতার বাহনদের অভিনয়, নাচ, গান, নাটক নতুন প্রাণের বার্তা বয়ে এনেছে শ্রীধরের সংলাপে স্পষ্ট হয়। সব মিলিয়ে নাটকের নানা রঙ-বেরঙে 'রং-বেরং' নাটকটি পাঠকের মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। তবে এতগুলি চরিত্রের মঞ্চাভিনয় যে কোনো নাট্যদলের পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ।

'ধরা পড়া' নাটকটি 'শিক্ষক' পত্রিকার ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধরা পড়া ' নাটকে পুঁথিগত বিদ্যার অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে আমাদের সচেতন করেছেন। শেখানো বুলি যে জীবনের কোনও কাজে আসে না তা জীবনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে রাখাল ছেলে বড়কু। শিশুদের চার দেওয়ালে আবদ্ধ না রেখে, পুঁথিগত বিদ্যার যাঁতাকলে আটকে না রেখে, প্রকৃতির কোলে শিক্ষা দেওয়া দরকার- এই সত্যই ফুটে উঠেছে আলোচ্য নাটকে। 'ধরা পড়া' নাটকে শেখানো, মুখস্থ বিদ্যার নিস্ফলতা ধরা পড়ে যায়।

'এসপার ওসপার' নাটকটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায়। কৌতুক রসের নাটিকা হিসেবে এই নাটিকাকে চিহ্নিত করা যায়। নাটিকাতে যাত্রা চলাকালীন যবনিকার এপারে ও যবনিকার ওপারে ঘটনা ঘটছে। জীবন রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই অভিনয় করছি এবং অভিনয় শেষে যে যার ঘরে ফিরে যাই। এপারে অভিনয় করে চলে যাই ওপারে। জন্ম-মৃত্যুর মাঝে জীবন নামে এক বড়ো যবনিকা দাঁড়িয়ে থাকে। চিত্রকরের গানে সেই কথাই ফুটে উঠেছে ঃ

'এ পারে ওপারে
যাওয়া আসা করে
ভরল না তোর খেয়াতরীর মন-
সে যে কাঁদে সে যে বলে
বাঁধা রইব না রে।'

জীবনতরীর খেয়া এপার-ওপার করে। আসলে মন খেয়া নৌকার মতো খালি এপার-ওপারের মাঝের বাঁধা থাকতে চায় না। মন কেবলই বলে ' এই তো ভালো এই তো ভালো/খুশি মনে খুশির বেলা।' যাত্রাদলে আছে অধিকারী আছে হর্তা-কর্তা। তারা কুশীলবদের

নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু জীবনের খুশির যাত্রায় প্রত্যেকেই যেমন খুশি তাই করতে পারে। এখানে সকলেই স্বাধীন। অধিকারীর নিয়ন্ত্রণ নেই । এখানে সবাই অধিকারী, সবাই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। যেন 'আমরা সবাই রাজা/আমাদেরি এই রাজার রাজত্বে।' মানবপ্রেম , ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রকৃতির সান্নিধ্য, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ইত্যাদি দিকগুলি ফুটে উঠেছে সহজ, সরল, সংলাপের মাধ্যমে।

'রাসধারী' ('পার্বণী', ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) বাংলা নাট্য সাহিত্যে উৎকল্পনার হাস্যরসের নাটক হিসেবে পরিচিত। রূপকথার একটা কাহিনি কী কৌশলে অসম্ভবের কল্পনায় হাস্যকাহিনি হয়ে উঠতে পারে, 'রাসধারী' নাটকটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নাটকের মূল চরিত্র রাসধারী ক্ষীরের পুতুল হয়ে জন্মেছিল। পিঁপড়ে, চোপদার, হুকুমদার, মৌলবী মাস্টারের অত্যাচারে সে ঘর ছেড়েছে। তার সঙ্গী এক ভালুক। সে আবার যা তা ভালুক নয়। তার একটা বংশ গরিমা আছে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলে ঃ

> 'হুম ! আমি সবুর বাদশার উজির পুত্তুর, আমি ছোটো লোক
> নাকি ? উজিরি করা আর মন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া কোনো কাজ
> করা আমার দ্বারা হবে না। '

'ক্ষীরের পুতুল'-এ যেমন বানরের সাহায্যে দুয়োরানী সুয়োরানী হয়ে উঠেছেন। 'রাসধারী' নাটকেও তেমনি রাসধারী ও ভালুকের সাহায্যে 'দুয়োরানী' তার সৌভাগ্য ফিরে পেয়েছেন। রাসধারী ও তার ভালুক রাজ্যের সমস্ত সোনাকে মাছ, পাখি, প্রজাপতি করে উড়িয়ে দিয়েছে। সোনাশূন্য রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী, রাজপণ্ডিত, ভাঁড় সকলের অর্থ, সম্পদ লোলুপতা নগ্ন হয়ে পড়ে। সোনায় খাটো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বহরেও খাটো হয়ে গেছে। তাই গোপাল ভাঁড় বলে- ' দেশে সোনা নেই, তাই আমরা খাটো হয়ে গেলাম।' এমন কি মহারাজের জোব্বাটা মহারাজের গায়ে ঢিলে হয়ে গেছে। এক কিংভূত অবস্থা তৈরি করে নাটককার তাঁর কল্পনাকে হাস্যরসে মুক্তি দিয়েছেন। তবে সংলাপে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও খোঁচাটুকু রয়েছে। জাতপাতের সমস্যাকেও অবনীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোপালভাঁড় ব্রাহ্মণ বলে সে চাকর হতে রাজি নয় কেননা তাতে তার জাত যাবে। রাজ্যে একজনও দর্জি নেই কেননা 'যবন বলে তাদের নির্বাসন দেওয়া গেছে।' দুয়োরানী তার ছেলে নুলোকে সোনামণি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। তখন সোনা-বাপের প্রতিক্রিয়াটি লক্ষণীয় ঃ

> ' ... নীচ জাতের আস্পর্ধা দিন-কে দিন বাড়ছে। এর একটা বিহিত না
> করলে দেশে আর ধর্ম থাকে না। ছাত্র বা জাত এক হয়ে গেলে আমাদের
> মেমান থাকবে কোথায়, আর আমরাই বা থাকি কোথায় ? আজই তার
> ব্যবস্থা করছি।'

এই নাটকের চরিত্রগুলি নাট্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছে। জীবনের সঠিক অর্থ বাউলই খুঁজে পেয়েছে- ' আমার সোনাও নেই, রুপোও নেই- থাকবার মধ্যে ছেঁড়া কাঁথা আর ভাঙা

তানপুরা দিব্বি আছি।' এ নাটকে রাজা তার সোনার অহঙ্কার নিয়ে, মন্ত্রী তার অর্থলালসা নিয়ে, রাজপণ্ডিত তার শাস্ত্রানুশাসন ও ছুঁৎমার্গের সঙ্গে অর্থলোলুপতা নিয়ে ভাঁড়মশাই অর্থলোলুপতার সঙ্গে তাঁর রসিকতা নিয়ে জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত চরিত্র হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি চরিত্র তাদের আচার আচরণে, সংলাপে হাসিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। 'রাসধারী' নাটকটির প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরিয়ে যায়নি।

বাংলা সাহিত্যে একটি অসাধারণ গল্প পরশুরামের 'জাবালি' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) গল্পের কাহিনি নিয়ে পালা বেঁধেছিলেন অবন ঠাকুর। 'জাবালির পালা' নামে সেটি ১৩৬১ বঙ্গাব্দের 'শারদীয়া দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। জাবালি রামায়ণের একটি বিশেষ চরিত্র। রামায়ণের জাবালি স্পষ্টতই সুযোগসন্ধানী। অন্তত তাকে সেভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের কলমে তেমনি পরিবর্তিত। পরশুরামের জাবালির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের জাবালির তফাৎ অনেক। অবনীন্দ্রনাথের জাবালি আগাগোড়া বেদবিরোধী । প্রচলিত ধর্মাচরণে তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। দেবতারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হল বা না হল তাতে তার কিছু যায় আসে না। পুন্নাম বা নরকে যাওয়ার ভয় তার নেই। যে নিজেই বলে-'আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব অভিযোগ জানাইয়া তাহাদিগকে বিব্রত করি না।... আমার মার্গ যত্রতত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষের, পরিবর্তনসহ। ' আসলে জাবালি অত্যন্ত বাস্তববাদী চরিত্র। অথচ জীবনের কৌতুকময় দিকগুলিও তার কাছে উদ্ভাসিত। এ হেন জাবালিকে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ 'জাবালির পালা' ছাড়াও 'ঋষিযাত্রা' (শারদীয়া দেশ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) নামে একটি পালা লিখেছেন। 'ঋষিযাত্রা রামের বনবাস কাল থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু জাবালির পালা'য় হিমালয় প্রবাসী জাবালিকে নিয়েই কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য পালার মতো এই দুটি পালাতেও সরস, মজাদার সংলাপের অভাব নেই। নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টি করে হাস্যরসের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষ পত্রিকায়- ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়। পরে এই গল্পটি তাঁর গড্ডালিকা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' গল্প অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় লম্বকর্ণ পালা' রচনা করেন। পালাটি ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'শারদীয়া দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পালার কেন্দ্রে আছে লম্বকর্ণ নামে এক পাঁঠা। লম্বকর্ণ ঘাস, ফুলের মতো ডালমুট, তিলকুট, বিস্কুট খায়। জ্বলন্ত চুরুট খেয়ে হজম করতে পারে। চামড়ার ছিগার কেস চিবিয়ে খায়। কুচকুচে কালো, নধর দেহ পাঁঠাটি তার শিং দুটো বাগিয়ে সকলকে গুঁতো মারতে ছুটে যায়। বেলেঘাটা যাত্রাপালার জন্য লম্বকর্ণকে আনা হয়, তাকে নিয়ে জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর ও তার পরিবার এবং যাত্রাদলের সদস্যদের নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে তা হাসি, ঠাট্টা, মজার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। বেলেঘাটা যাত্রাপালাটির লম্বকর্ণ পালাটি শুরু হয় এই গানের মাধ্যমে ঃ

ও দেখেন দেখেন চেয়ে দেখেন জেগে জেগে বসে দেখেন।
উলটে দেখেন পালটে দেখেন লম্বকর্ণ পালা দেখেন।
চিনে রাখেন আসেন কে কে, জেনে রাখেন যান কে কে-
রায় বাহাদুর বংশলোচনবাবুর এই বৈঠকেতে।'

এই ধরনের 'ও দেখেন ও দেখেন' করে পালা শুরু করেছেন অবনীন্দ্রনাথ অনেক পালাতেই। যেমন কুঞ্জুষেব পালাও শুরু হচ্ছে এভাবে ঃ

দেখেন দেখেন কুঞ্জুষ বুড়ো যক্ষি,
লক্ষ্মীর ঘরে বসে আছেন যেন শকুন পক্ষী।'

লম্বকর্ণ রায় বাহাদুর বংশলোচন বাবুকেও ঢুঁ মারল। তিনি লাটু নন্দীকে পাঁঠাটা দিয়ে দেন একটা শর্তে- 'বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে না।' লাটুবাবু মাংস খাওয়ার বাসনাতেই নিয়ে যান। কিন্তু লম্বকর্ণ বাঘের পেটে যা হজম হয় না তা খেয়ে ফেলেছে। ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার দাঁত-চাবি, লোহার করতাল, লাটুবাবুর নব্বই টাকার নোট ইত্যাদি। তিনি বংশলোচনবাবুকে তার পাঁঠা ফেরৎ দিয়ে যায়। বংশলোচন মিঞা সাহেবের পরামর্শে লম্বকর্ণের গলায় লম্বা চাকতি ঝুলিয়ে হুলিয়া দেন-'এই ছাগল, বেলেঘাটা খালের কাছে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারা গতিকে পুনরায় সেই স্থানে ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা, কালী ও জিশুর দিব্য -ইহাকে কেহ মারিবেন না। লাল ফিতে জড়িয়ে হুলিয়া লেখা কাগজটা একটা হোমিওপ্যাথির শিশির ভিতরে ঢুকিয়ে গালা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। লম্বকর্ণকে ছাড়তে গিয়ে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতের মধ্যে পড়ে বংশলোচন বাবু অজ্ঞান হয়ে যায়। তাকে খুঁজে না পেয়ে সকলে যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তখন লম্বকর্ণই ছুটে এসে তার মনিবের খবর দেয়। ফলে বংশলোচন বাড়ি ফিরে আসে। লম্বকর্ণকে সকলে মেনে নেয়। এই ইচ্ছাপূরণের গল্পের শেষ হচ্ছে কিন্তু কমেডিতে । তাই অধিকারী বলে-' একটা লাস্ সং দাও হে - একটা লাস্ সং দাও।' আর 'লাস্ সং' টা হল ঃ

'পাঁঠা তুই বড়ই ভাগ্যবান
পাঁঠা তোমায় করতে খাসি
মাংস হবে রাশি রাশি
একসঙ্গে খাব বসে হিন্দু মুসলমান।'

- পালাটি পরশুরামের গল্পের ছায়ায় রচিত হলেও অবনীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যায় 'রংমশাল' এ প্রকাশিত হয়েছিল 'ভূতপত্রীর যাত্রা'। বনগাঁবাসী মাসির দেওয়া ভূতপত্রীর লাঠি আর লণ্ঠনটা অবন ঠাকুরের খুবই প্রিয় ছিল। সেই কারণেই তিনি কুড়ি বছর পর 'ভূতপত্রীর দেশ'- এর আদলে লিখলেন 'ভূতপত্রীর যাত্রা।' মাসির বাড়ির চার সের ওজনের মোয়ার চেয়ে পিসির বাড়ির দেবতার দুর্লভ কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল' কম লোভনীয় নয়। তাই লাঠি, লণ্ঠন নিয়ে বের

হয়ে পড়ে নায়ক। তার স্থির সিদ্ধান্ত - 'পালকি পাই ভাল, না পাই ভাল -খুঁটে বাঁধা খই মুঠা দুব্বার।' তার চলন বলনের গানও মনে রাখার মতো ঃ

' চলি হুম্পা হুয়া লাঠি বাগিয়ে - বনগাঁ পেরিয়ে ধপর ধাঁই
ধপর ধাঁই।
ভূত তাড়িয়ে - বনের ধার দিয়ে হুঁইয়ো মারি খবরদারি
পিসির বাড়িতে-
মনসাতলা, চালতাতলা, শেওড়াতলা, মাড়িয়ে।'

মাঠের মধ্যে শেওড়া গাছের ঝোপ ও ঘোড়ার গোর পার হতেই তেপান্তরের মাঠ শুরু। 'লম্বকর্ণ পালা'য় ছিল ছাগল, আর 'ভূতপত্রীর যাত্রা'য় আছে ঘোড়া। চালতাতলায় ঘোড়া ভূতের উপদ্রবে নায়ক নাজেহাল হল। চালতাতলার দ্বিতীয় মঞ্জিলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কতরকমের ঘোড়ার সন্ধান পায় নায়ক। রথের ঘোড়া, কাঠের ঘোড়া, তালপাতার সিপাই কি ঘোড়া, চিন তাতারে ঘোড়া, বিন্দে নেপাল ঘোড়া ইত্যাদি। তারপরেও আছে ঃ

'আগারোম, বাগারোম সবরোন্ ঘোড়া।
নর্মন ঘোড়া, জর্মন ঘোড়া,
টাক্‌টুম টাকাটুম বর্মণ টাট্টু,
টপাটপ্ টপাটপ্ স্টডব্রেড ঘোড়া।
হাইব্রীড ক্রসব্রীড কাথিওয়াড;
নাইনটি হর্স পাওয়ার কানট্রি ঘোড়া।
চক্কর ঘোড়া লক্কড় ঘোড়া হাসটন হাজির। '

সমাজ সভ্যতা যে হর্স থেকে হর্স পাওয়ারের অভিমুখে যাত্রা করছে, সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন পালাকার অবনীন্দ্রনাথ। ঘোড়াতেও যখন যাত্রা শেষ হল না তখন অগত্যা 'হাইটে চলো হাইটে চলো- 'বৈসে থাকার চাইতে ভালো' কিন্তু যাচ্ছে কে? যাচ্ছেন-'বর্ণনে হুবহু তাজাতাজা-অবিন ঠাকুর ছবির রাজা।' অর্থাৎ এই পালার নায়ক হলেন স্বয়ং অবিন ঠাকুর। হাসি, মজা, ব্যাঙের নাচ, ঝিঁঝি পোকার নাচসহ নানা ঘটনার ঘনঘটায় পালাটি শিশুদের উপভোগ্য হয়েছে।

হিতোপদেশের কচ্ছপের আকাশে ওড়ার গল্প অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথ লেখেন 'উড়নচন্ডীর পালা'। পালাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের 'শারদীয়া আনন্দবাজার' পত্রিকায়। এক সরোবরে বাস করত এক কচ্ছপ। একদিন জেলেরা এসে জানায় কাল জাল ফেলে কচ্ছপটিকে ধরবে। জেলেদের জাল ফেলার সংবাদে কচ্ছপ চিন্তিত হয়- 'কিং কূর্ম?'- কি করি? কচ্ছপ ভয়ে অন্যত্র চলে যেতে চায়। কিন্তু যাবে কি করে? সে যে উড়তে পারে না। উড়ে যাবার রাস্তা বাতলাতে নানা জনে নানা উপদেশ দেয়। এরমধ্যে ব্যাঙের উপদেশটি বেশ মজার ঃ

‘ এক আঁটি গঞ্জিকা, তাতে কিছু ভাঙ
ছিটেগুলি আর কিছু-কষে মারো টান
ধুয়া করে ছেড়ে দাও, তারপরে উড়ে যাও সটান।’

অনেক আলোচনার শেষে মিউজিক্যাল ড্রিলে ওড়ার প্র্যাকটিস করে কচ্ছপ। মন্ত্রের সাধন, শরীর পাতন করে আকাশে উড়ে যাবার জন্য হাইজাম্প, লো জাম্প শুরু করে দেয়। অবশেষে ঠিক হয়, হাঁসেরা একটি লাঠির দু'প্রান্তে ঠোঁট দিয়ে ধরে থাকবে আর মাঝে কামড়ে থাকবে কচ্ছপ। এভাবে উড়ে যাবার সময় রাখাল বালকেরা কচ্ছপকে নিয়ে মজা করে। তাদের গালি দিতে গিয়ে কচ্ছপ পড়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয়। এ পালার কচ্ছপ কানে কম শুনলেও জ্ঞানবৃদ্ধ। হিন্দি, ফারসী, সংস্কৃত, ইংরেজিতে সুপণ্ডিত। সে যখন বলে - ‘কি ফৈজতে পড়লেম - এখন কিং কুর্ম ? হে পতিত পাবন, হে পরম কারুনিক অনাদ্যন্ত মরুৎব্যোম, আমি confess করছি, আমি পাপী, আমি বলছি, আমি পড়েছি বিষম ফৈজতে, তুমি আমাকে পড়তে দিও না, তুলে নেও তোমার কোলে।’ তখন তার জ্ঞানের বহর দেখে তার দুরবস্থায় দুঃখ না পেয়ে আমরা হেসে ফেলি।

‘বৃক ও মেষ পালা’টি গ্রীক দেশের ঈশপের গল্প অবলম্বনে লেখা। পালাটি ‘শারদীয়া বসুমতী’তে ১৩৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পালায় দুষ্টু বাঘ ছাগলছানার মাংস খাওয়ার লোভে বিভিন্ন কাল্পনিক দোষে তাকে অপরাধী করে ঃ

‘ আরে দুরাত্মন, তুমি কি কারণ
তৃণচয় না করে রক্ষণ
করে হরণ করেছ ভক্ষণ ?
অকারণে যত তৃণচয় হল অপচয়
বল কি খেয়ে বাঁচে গজ হস্তী হয় ?
তৃণ হিলে নয় গর্দভের পরাণ রক্ষণ,
কি হবে এই ক্ষণ ?

বাঘ যখন ছাগলকে বধ করতে উদ্যত তখন সেখানে সতেজে সবেগে হাজির হয় হুড়ুদুম্বা নামে এক মেষ। তার আক্রমণে বাঘের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হয়। হুড়ুদুম্বার শিং -এর আঘাতে বাঘের কোমর ভেঙে যায়। বাঘ শয়তানির শাস্তি পায় ঠিকই কিন্তু তার স্বভাব বদলায় না। সে ছাগলকে নানা প্রলোভন দেখায়। তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে আসার কাতর অনুরোধ করে। ছাগল তার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বাঘের ছলনার ফাঁদে পা দেয় না। এমন কি বৈকুণ্ঠবাসের পূণ্য লাভের লোভকেও জয় করে। অবশেষে হতাশ হয়ে বাঘ বলে - ‘ যাঃ বেচি গেলি বড়।’ এই নাটিকায় অবনীন্দ্রনাথ হিন্দি, বাংলা, আধা ওড়িয়া ও বাংলার আঞ্চলিক শব্দের সুন্দর ব্যবহার করেছেন। যেমন ছাগলের অনুনয় গীতের মধ্যে হিন্দি, বাংলা, আধা ওড়িয়া শব্দের সুন্দর মিশেল লক্ষ্য করা যায় ঃ

‘হুকুমদার তেরি এক্তিয়ার
মারবে তুমি , মরবো আমি পাপটি হবে কার?
গরী পরবার করেন বিচার,
ম্যায় তো বেকার।

এখানে ব্যবহৃত ‘তেরি, ম্যায়, শব্দের মতো হিন্দি শব্দ সারা পালায় ব্যবহৃত। আবার ‘সব ভুড় করিলা হু অধিকাড়ি যাত্রা মিটি করিলা’, ‘বাঘটা বড় চতুর- এবাড় ধড়িলা ছাগলাক্ কিংবা’, ‘বাঘ মেষ শাবকের বাপ তুলিলা।’ ইত্যাদি সংলাপে আধা ওড়িয়া ভাষার প্রভাব প্রকট। বিদ্যাসাগরের কথামালায় এরকম একটি কাহিনি আছে। অবনীন্দ্রনাথ সেই কাহিনিকে অনুসরণ না করে, ঈশপ ফেবলকে আশ্রয় করে পালাটিতে নতুনত্ব এনেছেন। মাজা ভাঙ্গার যন্ত্রণায় বাঘ মূর্চ্ছা গেলে কোলা ব্যাঙের চৌপট নাচও গানে পাঠক হিসেবে আমরা আনন্দ উপভোগ করি। ক্ষমতাবানদের পতনে কিংবা পরাজয়ে সাধারণের মধ্যে খুশির বার্তা বয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ সেই বার্তাই যেন দিতে চেয়েছেন।

আরো বেশ কিছু পালা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন। যেমন ভূতপত্রীর ঘোড়াদের নিয়ে ‘ঘোড়া হাটের পালা’ (শারদীয়া অমৃত, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, শিয়াল ও আঙুর ফলের কাহিনি নিয়ে ‘ফসকান পালা’ (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), ঈশপের গল্প নিয়ে ‘দুই পথিক ও ভাল্লুকের পালা’ (শারদীয়া বসুমতী, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), ‘কাক ও পনির পালা’ (মৌচাক, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, কার্তিক সংখ্যা)বাল্মীকির কাহিনি নিয়ে ‘ ক্রৌঞ্চ - ক্রৌঞ্চী পালা’ (মৌচাক, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, কার্তিক সংখ্যা), ময়ূর পুচ্ছধারী কাকের কাহিনি নিয়ে ‘মউর ছালের পালা’(দিগন্ত’ পত্রিকা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি। এরমধ্যে ‘ফসকাল পালা’র সবটাই নাচ আর গান। গানের ভাষা, বেশ মজাদার। কাবুলীওয়ালাদের মজাদার গানের কিছুটা অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

‘আঙুর খরবুজ আলুবখরা
কাবুল কসমীর মস্কট হালবা
খিসমিস খিসমিস আখরোট পিস্তা
গুর্জিন পুস্‌টিন জাফেরান হোর হিং
খসখস ইত্তর বেহেতর খোরমা।’

এই পালাগুলি আকারে ছোট হলেও বেশ রসগ্রাহী। সহজেই শিশু পাঠকের মন জয় করে নেয়। স্থানাভাববশত সব পালাগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু যে কয়েকটি পালা বা নাটিকা নিয়ে আলোচনা করা গেল, তার মাধ্যমে নাট্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ কিংবা পালাকার অবনি ঠাকুরকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। সেই সময়ের যাত্রাপালার মতই তাঁর পালাগুলিতে অধিকারী, সূত্রধর, দোহার, তুড়িজুড়ি, মূলগায়েন সবই আছে। শিশুরা শিশু মন নিয়ে, বড়োরা শিশুর মানসিকতা নিয়ে পালা বা নাটিকাগুলি পাঠ করলে অবশ্যই রসাস্বাদন করতে পারবে। এমন কি তাঁর পালা বা নাটকগুলি শিশু কিশোরদের

অভিনয় করতে খুবই ভালো লাগবে। কেননা তাঁর পালাগুলিতে মজা পাওয়ার, আনন্দ উপভোগ করার, ছোট-বড় সকলকে নৈতিক উপদেশ দেওয়ার রসদ যথেষ্টই আছে। তবে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা কোনও ক্ষেত্রে খুব বেশি। ফলে মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে নাট্যদলগুলির অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

অবন ঠাকুর ছিলেন শিশু কিশোরদের স্বপনপুরীর বাদশা। বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। একথা ঠিক যে তাঁর সব পালা বা নাটিকা বা নাটক হয়ে উঠেছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। নাট্য বিষয় সব সময় শিশু মনের উপযোগী হয়নি। সব পালাতে বা নাটিকায় সুসংহত কাহিনি নেই যা শিশুদের মন আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। অনেক সময় চরিত্রগুলির দীর্ঘ সংলাপ পালার গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে বা হাস্যরস ব্যাহত হয়েছে। শ্রীমতী রানী চন্দের 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, অবনীন্দ্রনাথ নিজেও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন ঃ

> ' ... প্লট পাব কোত্থেকে? আমি কি প্লট ভেবে ভেবে লিখেছি?
> ছোটো ছেলেরা মেয়েরা স্ফূর্তির সঙ্গে নাচবে, গাইবে,
> এই তো যথেষ্ট। প্লট দিয়ে আমার কি দরকার?' ৩

আসলে শিশু কিশোরদের সঙ্গে জমিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে তিনি যতটা ব্যস্ত থেকেছেন- পালা নাটিকাগুলি মাজাঘষা করতে ততটা নয়। একটা কথা প্রচলিত আছে যে, বাংলায় ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, রসিকতা সাধুভাষায় যতটা জমে, চলিত ভাষায় ততটা নয়। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর নাটিকাগুলিতে সযত্নে সাধুভাষা এড়িয়ে চলিতভাষা ও কথ্যভাষাকেই আশ্রয় করেছেন। এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন নানা চমক। এক্ষেত্রে তিনি সফলই হয়েছেন। যে কোনো বয়সের পাঠক পালাগুলি পড়ে সরব, উচ্চকিত হাস্য করে ওঠে। অথচ অবনীন্দ্রনাথের পালাগুলি সেভাবে মঞ্চের মুখ দেখেনি। এ বছর তাঁর জন্ম সার্ধবর্ষে কোনো সুপরিচালক বা নাট্যদলগুলিকে এগিয়ে আসে কি না ভবিষ্যৎ সেকথা বলবে। আমরা শুধু বলব তাঁর পালাগুলির কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ সবই মঞ্চ উপযোগী। যথাযথভাবে মঞ্চস্থ করতে পারলে বাংলা নাটকে নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

১) অমল হোমকে লেখা চিঠি, ২৩ মাঘ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
২) 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী যাত্রাচর্চা' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।
'যাত্রাজগৎ পত্রিকা', ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, শারদীয়অ সংখ্যা, পৃ:২৫৮
৩) প্রদীপ্ত সেনের 'অবন ঠাকুরের পুঁথিপত্তর ঃ মহাভারত থেকে রামায়ণ' প্রবন্ধে উল্লেখিত। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা (অবনীন্দ্রসংখ্যা), বর্ষ ২৯, সংখ্যা-৩২-৩৬, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- দিব্যজ্যোতি মজুমদার, পৃ:১২১

লেখক : **ড. অপূর্ব দে,** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তর পাড়া কলেজ, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।

আমি —Macbeth— ম্যাকবেথ Mirror

শান্তনু দাস

স্মৃতি. ১

শেক্সপিয়রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি Macbethএর সঙ্গে কবে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল তা আজ আর সঠিকভাবে মনে নেই। তবে যতদূর সম্ভব, Macbeth রেখাপাত করে ক্লাস নাইনে। তখন কল্যাণীতে নান্দনিক বলে একটি নাট্যদলের সঙ্গে আমি যুক্ত। সেই নাট্যদলের কর্ণধার কাজল মহান্ত-র মুখেই এই নাটক ও শেক্সপিয়রের বিশালতা সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মায়। এরপর স্নাতক স্তরের লেখাপড়াকালীন অবস্থায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগে, ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক অমিতাভ রায়ের ক্লাসে Macbeth—এর সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। প্রফেসর রায়ের ক্লাসে যেন ম্যাকবেথকে আমরা দেখতে পেতাম। এই সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের নাটকের অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায় ও দত্তাত্রেয় দত্ত-র কাছ থেকেও Macbethসম্পর্কে কিছু ভিন্ন ধারণা জন্মায়। এই পর্যায়ে Macbethএর সঙ্গে সম্পর্ক শুধুমাত্র পাঠগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই নাটকের প্রয়োগের কোনো সুযোগ তখনও আমার ঘটেনি।

কিন্তু নাটক Macbeth ও চরিত্র ম্যাকবেথের প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতাম। সম্ভবত ম্যাকবেথের মতো বীর যোদ্ধার বিশালতা ও তাঁর ট্র্যাজিক পতন আমার মনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এটা আমি নিশ্চিত যে, সেই সময় পর্যন্ত Macbeth-এর যে পাঠ আমি গ্রহণ করেছিলাম, এটা তারই প্রতিফলন। যাই হোক, ম্যাকবেথের পাঠ থেকে প্রয়োগের প্রথম সুযোগ ঘটল National School of Drama (NSD) -এর দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যাপিকা অনুরাধা কাপুরের ক্লাসে। এটি ছিল নাট্য পরিচালনার প্রায়োগিক ক্লাস। প্রফেসর কাপুর তাঁর ক্লাসে যতটা না নিজের অর্জিত জ্ঞান থেকে পাঠ দান করতেন, তার থেকে বেশি আমাদের নানা প্রশ্ন করে Macbeth-কে নিয়ে অন্যভাবে ভাবতে উদবুদ্ধ করতেন। ফলত, আমার কল্পচিত্রের বীর ম্যাকবেথ ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করল। চোখের সামনে উন্মুক্ত হতে শুরু করল লেডি ম্যাকবেথ, ডাকিনী, ডানকান, ব্যাঙ্কো ইত্যাদি চরিত্রগুলি। ফলে ম্যাকবেথের একটি ভিন্ন পাঠ তৈরি হতে লাগল। এক একটি সংলাপের অর্থ বা অর্থের পেছনে আর একটি অর্থ খোঁজার কাজ শুরু হল। অর্থাৎ নাটকীয় ভাষা text আর subtext -এর খোঁজ শুরু হল। এ যাত্রায় আমাদের সুযোগ ছিল না সম্পূর্ণ নাটকটি মঞ্চস্থ করার। আমরা নাট্য পরিকল্পনা ও পরিচালনার তিনজন ছাত্রছাত্রী (আমি, রাজীব ভেলিচেট্টি ও শৈলজা জে) তিনটি দৃশ্যের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার সুযোগ পেলাম। আমার ভাগ্যে জুটল প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য, যে দৃশ্যে ম্যাকবেথ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আছে যে, সে ডানকানকে হত্যা করবে কি করবে না। অপরদিকে লেডি ম্যাকবেথ স্থির চিত্তে অবিচল

রয়েছেন তার লক্ষ্যে এবং ম্যাকবেথকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্ররোচিত করছেন। যাই হোক, এই নাটকের দৃশ্যের মঞ্চায়ন যখন করছি তখন সালটা ১৯৯৬; এই নয়ের দশক স্বাধীন ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়— নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে বেসরকারী সংস্থার প্রবেশ ইত্যাদি অনেক কিছু। ফলত, অনেক অন্ধকার জগতের রূপকথা বাস্তবতার আলোকবৃত্তে আমাদের কাছে ধরা দিতে লাগল।

সেই সময়েই মুম্বাইয়ের ডন দাউদ ইব্রাহিম, ছোটা শাকিল ইত্যাদির সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারছি। তার কারণ হতে পারে দিল্লির NSD-এর পরিমণ্ডলে মুম্বাই সিনেমা জগৎ নিয়ে সত্যি-মিথ্যের নানা গল্প সবসময় ঘুরতে থাকে। ১৯৯৩ সালের মুম্বাই বোমা বিস্ফোরণে সারা ভারতবাসীর নজর কাড়ে এই মুম্বাই ডনদের কীর্তিকলাপ। বোধহয় এই প্রথম তাঁরা সরাসরি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি আঘাত হানল। ফলে মুম্বাইয়ের ডনেরা আর শুধু চোরাচালানকারী, অসাধু ব্যবসায়ী ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার তথা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিমণ্ডলে তারা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিল। এই ঘটনাটি আমার মতোই সারা ভারতবাসীকেও নতুনভাবে দেখতে শিখিয়েছিল। এই ঘটনাক্রমের পরম্পরা আমার Macbeth নাটকের দৃশ্য-পরিচালনায় প্রভাব ফেলে। ভাবতে থাকি ১৯৯৬ সালের ভারতের প্রেক্ষিতে Macbeth নাটকের প্রাসঙ্গিকতা। খানিকটা দিবাস্বপ্নের মতো হলেও ভেবে ফেলি ম্যাকবেথ, ডানকান, ব্যাঙ্কো, লেডি ম্যাকবেথ প্রভৃতি চরিত্ররা মুম্বাইয়ের ডন সাম্রাজ্যের পাত্রপাত্রী। এই ভাবনার মূল সূত্র খানিকটা হলিনশেডের Macbeth থেকে পাই। ঐতিহাসিক ম্যাকবেথ রাজত্ব করেছিলেন সতেরো বছর, অর্থাৎ ১০৪০ থেকে ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু ম্যাকবেথের পূর্ববর্তী একশো বছরে (৯৪৩-১০৪০) স্কটল্যান্ডে মোট নয়জন রাজার মধ্যে সাতজনেরই মৃত্যু ঘটে অস্বাভাবিকভাবে- হয় গৃহযুদ্ধে, না- হলে রাজসিংহাসনের আশায় আগামী রাজার হাতে খুন হয়ে। ডানকান এদেরই একজন। ইয়োরোপে উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন প্রাপ্তির প্রথা প্রচলিত হওয়ার আগে সেখানে বহু জায়গায় প্রথা ছিল এই যে, রাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নয়, তাঁদের পরিবারের সর্বাধিক শক্তিমান আত্মীয় সিংহাসন পাবেন। ফলত, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ম্যাকেবেথের ডানকানকে হত্যা করা কোনো অন্যায় নয়। স্বাধীন ভারতে এইরকম ক্ষমতা দখলের জন্য অবলীলায় একে অন্যকে হত্যা করাটা ডন সাম্রাজ্যে খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। খানিকটা প্রক্ষিপ্ত ভাবনা হলেও এটাকেই সম্বল করে নাট্যদৃশ্যের পরিকল্পনা শুরু করে দিলাম।

ফলত, আমার ম্যাকবেথ মুম্বাইয়ের একজন মাঝারি মাপের ডন, যে তার প্রভু ডানকানকে হত্যা করে সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতে চায়। আর এই কাজে তার যোগ্য সহায়তা করছে তার স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথ। এই দৃশ্যের আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডানকান এসেছে সদ্য ঘোষিত -হওয়া কডর সামন্ত ম্যাকবেথের প্রাসাদে, তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং খানিকটা বিশ্বাসে ভর করে বিশ্রাম করতে। ফলত, ম্যাকবেথ দ্বিধাগ্রস্ত আর লেডি ম্যাকবেথ সংকল্পে অটল। এই দৃশ্যের পাত্র পাত্রী শুধু ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ; স্থান

ম্যাকবেথের শয়নকক্ষ; সময় রাত্রিকাল। পূর্বদৃশ্যের ঘটনাক্রম এবং এই দৃশ্যের কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে, ম্যাকবেথ ডানকান ও অন্যান্য অতিথিদের সাথে ভোজসভা থেকে মাঝপথে উঠে চলে এসেছে; স্বাভাবিকভাবে লেডি ম্যাকবেথও চলে আসে। মঞ্চসজ্জায় একটি বড় French window একেবারে up centre stage-এ রাখা। এই জানালাটির মাথার দিকটি Gothic architecture -এর মতো বানানো হয়েছিল। এই জানালার বিশালতা ও Gothic Style -এর সংমিশ্রণে 16th Century architecture - এর একটা আভাস তৈরি করা হয়েছিল। মঞ্চের up lift- এ diagonal করে একটি আয়না ও তার সামনে একটি বড়ো পিতলের পাত্র, তাতে গরম জল রাখা, যেটাতে একজন মানুষ vapour নিতে পারে। Up-stage - এর জানালা বরাবর একটি লম্বা hanger stand ছিল এবং তাতে অনেক ধরনের , coats রাখা ছিল। মঞ্চের down right- এর দিকে একটি dressing table with mirror ছিল, যেটা চিহ্নিত ছিল লেডি ম্যাকবেথের জন্যই। আর মঞ্চের down left- এ ছিল ছোটো গোল টেবিল, যাতে একটি ফুলদানিতে একটি হলুদ রংয়ের গোলাপ ফুল রাখা ছিল এবং এই টেবিলের সঙ্গে ছিল বসবার জন্য একটি টুল। ফলত, মঞ্চসজ্জার দিক থেকে খুব ভারী এবং অনেক কিছুকে পরিহার করে যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজন সেটুকুই ব্যবহার করা হয়েছিল। গোটা মঞ্চসজ্জায় নীল ও সাদা রংয়ের আধিক্য ছিল। জানালার রং সাদা, hanger stand কালো, তাতে নীল রংয়ের নানা shades-এর coats রাখা ছিল। mirror stand with table সাদা রংয়ের ছিল। Down stage - এ রাখা আসবাব সাদা চাদরে মোড়া ছিল। Identical colour হিসাবে একটি লাল রংয়ের তোয়ালে ওই hanger stand-এ রাখা ছিল, যেটা ম্যাকবেথ ভোজসভা থেকে এসে ব্যবহার করবে। লেডি ম্যাকবেথের প্রসাধনীতে ছিল মূলতানি মাটি, যেটা খানিকটা ochre yellow-র মতো । আর ছিল হলুদ রংয়ের গোলাপ। আলোক পরিকল্পনাতে আমরা ধরে নিয়েছিলাম , এটা চাঁদনি রাত। ফলত , ঘরের জানালা দিয়ে যে চাঁদের আলো আসছে সেটা light-এর key source এবং একটি oil lamp-এর আলো, secondary source। ফলে বোঝাই যাচ্ছে যে, আলোতেও নীল রংয়ের আধিক্যই থাকছে, সঙ্গে হালকা সাদা হলুদ রংয়ের ব্যবহার। পোশাকের ক্ষেত্রে ম্যাকবেথ পরে ছিল সাদা জামা, prussian blue pant ও coat। শুধুমাত্র - coat এর পকেটে একটি লাল রুমাল, যেটি ছিল সামান্য বের করা অবস্থায়। লেডি ম্যাকবেথ bottle green and white mix royal gown পরে ছিল। এই সামগ্রিক পরিকল্পনা থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে, ম্যাকবেথ মানেই লাল রংয়ের আধিক্য। এই বিষয়টি কে এখানে খুব identically emphasis করা হয়নি। কিন্তু অভিনেতা যখন নাটকের set, props ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই লাল রংকে আমরা দেখতে পাই।

এই দৃশ্যে ম্যাকবেথ মঞ্চে প্রবেশ করে প্রথমেই coat -এর পকেট থেকে লাল রুমালটি বের করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে সংলাপ বলে। তারপর ধীরে ধীরে coat ও shirt খুলে লাল তোয়ালেটি নিয়ে আয়নার কাছে চলে আসে এবং সেটি মাথায় দিয়ে

vapour নিতে থাকে এবং সংলাপ বলে। ফলত, দর্শক হিসাবে আমরা একবার ম্যাকবেথের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ লাল কাপড়ে মোড়া দেখছি, আবার কখনও লাল কাপড় সরে গিয়ে সাদা গেঞ্জি - পরা একজন সাধারণ মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। পাঠকরা নিশ্চয়ই খানিকটা আন্দাজ করতে পারছেন যে, এই দৃশ্যের প্রথমদিকে ম্যাকবেথের ডানকানকে হত্যা করা নিয়ে যে - দ্বিধাবিভক্ত অবস্থান সেটা অভিনয় চলাকালীন লাল তোয়ালের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে অভিনয়, মঞ্চ, আলো ও মঞ্চোপকরণের মধ্যে দিয়ে এক দৃশ্যকল্প রচনা করা হয়েছে, যেটি এই দৃশ্যের অন্যতম অভিঘাত। অপরদিকে এই দৃশ্যে লেডি ম্যাকবেথের ডানকানের প্রতি প্রতিহিংসার আগুন আমরা দেখতে পাই, যেটা আগে কোনো দৃশ্যে আমরা দেখতে পাইনি। এর ঐতিহাসিক দিকটি যদি আমরা একবার দেখি: ডানকানের পিতামহ দ্বিতীয় ম্যালকম তাঁর স্ববংশের একটি শাখাকে ধ্বংস করেছিলেন পৌত্র ডানকানকে স্কটল্যান্ডের সিংহাসন দেবার জন্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে ওই শাখার এক গর্ভবতী বধূ প্রাণে বেঁচে যায়। পরবর্তীকালে তিনি বিবাহ করেন মোরে বংশের ম্যাকবেথকে। ফলত, ওই গর্ভবতী রাজবংশীয় সন্তানের পিতারূপে ম্যাকবেথ স্কটল্যান্ডের রাজা হবার দাবিদার হয়ে ওঠেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ডানকান তাঁর সন্তান তৃতীয় ম্যালকমকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করায়। আবারও স্কটল্যান্ডের তৎকালীন রাজা হবার যে প্রথা ছিল তা ভঙ্গ হল এবং অন্যান্য সামন্ত পরিবারগুলি আবার রাজত্ব করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। এইরকম রাজনৈতিক অসন্তোষের পরিবেশে ম্যাকবেথ ডানকানকে হত্যা করে। এই হত্যালীলায় ম্যাকবেথ তাঁর স্ত্রীর সাহায্য, উৎসাহ ও সমর্থন পেয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। নাটকে এই ঐতিহাসিক দিকটি নেই। তবুও আমরা লেডি ম্যাকবেথ ও ম্যাকবেথের ডানকানের প্রতি প্রতিহিংসার কারণটা অনুমাণ করতে পারি। ফলে এই দৃশ্যে লেডি ম্যাকবেথ ও ম্যাকবেথের চরিত্রে masking ও unmasking -এর বিষয়টি দেখতে পাই। এই দৃশ্যে লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রের অভিনেত্রী মঞ্চে প্রবেশ করেই ম্যাকবেথকে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে যে, ম্যাকবেথ তার অবস্থান থেকে সরে এসেছে। এরপর লেডি ম্যাকবেথ ম্যাকবেথকে উত্তেজক কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে আক্রমণ করতে থাকে। এমনকি সে বলে যে, সে তার নিজের ব্যক্তিগত আবেগকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই প্রতিহিংসার কাজটা সম্পন্ন করবে। ফলত, লেডি ম্যাকবেথের এই প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপটি হঠাৎই দর্শকদের কাছে প্রকাশ পায়। আজও মনে অছে লেডি ম্যাকবেথরূপী তন্নিষ্ঠা চ্যাটার্জি ও ম্যাকবেথরূপী জে. ডি. অশ্বত্থামা কী সুনিপুণভাবে এই অংশটি ফুটিয়ে তুলেছিল। পরিচালক ও পরিকল্পকরূপে তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলাম মঞ্চে প্রবেশের পর ম্যাকবেথের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে ধীর পায়ে down right এ রাখা dressing table -এ এসে বসবে এবং ধীরে ধীরে সংলাপ বলার সঙ্গে সঙ্গে dressing table -এ রাখা মুলতানি মাটি নিয়ে সারা মুখে মাখবে। এর ফলস্বরূপ খানিক বাদেই লেডি ম্যাকবেথ যেন এক মুখোশের আড়ালে চলে যায় এবং ওই মুখোশের আড়াল হতেই সে তার প্রতিহিংসার ভাব প্রকাশ করতে থাকে। মুলতানি মাটির হলুদ-সাদা রং অভিনেত্রীর মুখে এক neutral mask এর ভাব ফুটিয়ে তুলছিল। অপরদিকে অভিনেত্রীর হিমশীতল কণ্ঠের অভিনয়ে প্রতিহিংসার যাবতীয় রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। দর্শকের

কাছে সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা— visually এক শান্ত ধীরস্থির মহিলা, অথচ কণ্ঠস্বরে এক হিমশীতল মানবীর পরিচয়। বোধ করি, মিসেস সিডন্স -অভিনীত লেডি ম্যাকবেথ প্রায় শতাব্দীকাল ধরে এই চরিত্রের মডেল হয়েছিল। তথ্যসূত্র বলছে, মিসেস সিডন্স এই দৃশ্যে অভিনয়ের সময়ে, বিশেষ করে যেখানে ম্যাকবেথ বলে—

আমি বুকে ধরেছি সন্তান;
স্তন যে দোহন করে, তাকে ভালোবাসা কী মধুর,
মা হয়ে আমি তা জানি। আমি তার হাসিমাখা মুখে
দন্তহীন মাড়ি থেকে স্তনবৃন্ত উপড়ে নিয়ে তার
মাথা চূর্ণ করতাম পাথরে আছড়ে মেরে তোমার মতন
সত্যবদ্ধ হলে।

— প্রায় হিস্টিরিয়া রোগীর মতো তীব্র উচ্চগ্রামে তিনি এই সংলাপটি শেষ করতেন, যেটা আজও অনেক পরিচালক ও অভিনেতার কাছে গ্রহণীয়। বোধ করি, ১৯৯৬ সালে আমাদের চিত্রায়িত হিমশীতল লৌহমানবীরূপী লেডি ম্যাকবেথ এক অধ্যায়ের সূচনা করে। ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথের undertoned অভিনয় ও সামগ্রিক পরিকল্পনা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে মুম্বাইয়ের ডন সাম্রাজ্যের এক চিত্রকল্প শেক্সপিয়রের নাটক Macbeth-এর মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত চলচ্চিত্র Maqbool, যেটি শেক্সপিয়রের Macbeth-এর adaptation এবং মুম্বাইয়ের underworld -এর প্রেক্ষাপটে তৈরি। এ যেন ১৯৯৬ সালের খণ্ডাংশের এক পূর্ণ চিত্ররূপ। যদিও ব্যক্তিগত স্তরে বিশাল ভরদ্বাজের সঙ্গে আমার কোনো আলাপচারিতা আজও নেই, তবু ১৯৯৬ সালের সেই প্রক্ষিপ্ত ভাবনার সমান্তরাল ভাবনার প্রকাশ ২০০৪ সালের ছবিতে খুঁজে পেয়ে মনটা উৎফুল্লতায় ভরে উঠেছিল। অবশ্য বিশাল ভরদ্বাজ ছবিতে দুজন পুলিশ অফিসারকে দিয়ে ডাকিনীদের অংশটির রূপদান করেছিলেন, যেটা শেক্সপিয়রের নাটকের তিন ডাকিনীর প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারণকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যায়িত করতে পেরেছিল বলে আমার মনে হয় না।

স্মৃতি ঃ ২

ছাত্রাবস্থায় NSD -তেই দেখি অর-এক শেক্সপিয়রের নাটক King Lear। এই নাটকের পরিচালক জন রাসেল ব্রাউন। এত বছর আগে দেখা নাটকের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। প্রসেনিয়াম মঞ্চের দুপাশের legs, tomentor, পিছনের কালো পর্দা ও সাইক্লোরামা খুলে ফেলে একটি 70-mm film frame -এর effect তৈরি করেছিলেন, যেটা King Lear নাটকের বিশালতাকে খুব সহজেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। যাই হোক, এরপর শেক্সপিয়রের সঙ্গে আমার খানিক বিচ্ছেদ ঘটে। ২০১২ সালে পুনরায় শেক্সপিয়রের সঙ্গে সংযোগ ঘটে South Africa-তে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে বক্তারূপে আমন্ত্রণ পেয়ে। আমার বিষয়টি ছিল বাংলা থিয়েটারে শেক্সপিয়রের নাটকের মঞ্চায়ন। শিরোনাম

দেখেই বোঝা যাচ্ছে মূল আলোচনাটি ইতিহাসধর্মী। এই বিষয়ে পত্র পত্রিকা ঘাঁটতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাংলা রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার Macbeth-এর মঞ্চায়ন হয়েছে এবং এর অনেকগুলি অনুবাদ পাওয়া যায়। কোনোটি গদ্যে লিখিত, কোনোটি - বা ছন্দে কিংবা শুধুই অনুবাদ। কিন্তু মঞ্চায়নের দিকে নতুন কোনো ভাবনার প্রকাশ আমরা দেখতে পেলাম না। কম বেশি সকলেই ওই এলিজাবেথীয় পোশাক পরিচ্ছদ ও পরিবেশ রচনার মধ্যে দিয়ে Macbeth নাটকের দ্যোতনাকে ধরতে চেয়েছেন। কেন জানি না, আমি ম্যাকবেথ ও তার গল্পের অনেক ঘটনার সঙ্গে আজকের সময়টি দেখতে পেতাম। আর প্রতিবারই নিজেকে নিরস্ত করতাম আমি ভুল ভাবছি বলে। শুরু হল খানিক পড়াশুনা। এই নাটকের যে বিষয়টি আমাকে বার বার আঘাত হানত তা হল, ম্যাকবেথ এক পরাক্রমী বীর যোদ্ধা যে তার নিজের যোগ্যতায় একের-পর-এক আসন দখল করছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ তিন ডাকিনী কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং তার দুটি মিলেও যায়। আর তৃতীয়টি তাঁকে আগামী দিনের ভাবী সম্রাট বলে সম্বোধন করে, যেখানে সে সম্রাট ডানকানের অধীনস্ত এবং সম্রাট এখনও জীবিত। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সম্ভাব্য দাবিদারদের একের-পর-এক হত্যা করে। আমরা দেখতে পাই, পরাক্রমী বীর যোদ্ধা ম্যাকবেথ একজন ভীরু, অহংকারী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে। নাটকের শুরুতে তিন ডাকিনী বোন নিজেরা এসে দেখা দিচ্ছে ম্যাকবেথকে। আর নাটকের শেষের দিকে ম্যাকবেথ যাচ্ছে ওই তিন ডাকিনী বোনের কাছে ভবিষ্যৎ জানতে। এই পুরো পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ম্যাকবেথ এই ডাকিনীদের কথা বিশ্বাস করছে, নিজের কার্যক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাকিনীদের কথার জালে জড়িয়ে পড়ছে। একদম নাটকের শেষে যেখানে ম্যাকডাফ ম্যাকবেথকে আক্রমণ করে এবং সকল সত্যের উদ্ঘাটন করে, তখন ম্যাকবেথ বুঝতে পারে সে কী ভুল করে বসেছে। তাই সে বলে-

—কুহকী শয়তানদের যেন
কেউ না বিশ্বাস করে। দুমুখো কথায় ওরা খেলে
আমাদের নিয়ে। ওরা কানে প্রতিশ্রুতি রাখে শুধু
আশার চরমে নিয়ে ভাঙবে বলে।

এই পর্যায়ে আবার আমরা পরাক্রমী বীর যোদ্ধা ম্যাকবেথ দেখতে পাই, যে তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পেরে অন্তিম সময় পর্যন্ত লড়াই করে বীরগতি প্রাপ্ত হচ্ছে। যাই হোক, সম্পূর্ণ নাটকের মধ্যে ম্যাকবেথের এই যাত্রার সঙ্গে আমি, কেন জানি না,আজকের সময়ের যুবসমাজের ছবি দেখতে পেতাম। যতদিন যাচ্ছে, মানুষ ক্রমশ নিজের কর্মের উপর বিশ্বাস হারিয়ে নানারকম দৈব-অদৈব বিশ্বাসে জড়িয়ে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

স্মৃতিঃ ৩

২০১৬ সালে Macbeth সম্পর্কে আমার এই ভাবনার মঞ্চরূপ প্রকাশের সুযোগ এল। শেক্সপিয়রের মৃত্যুর ৪০০ বছরকে স্মরণ করে ডেনমার্কে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক

আলোচনাচক্রে একটি ২০ মিনিটের নাট্যাংশ পরিবেশন ও প্রবন্ধ পাঠ করবার সুযোগ পাই। শুরু হল প্রস্তুতি। এবারও আমার নিজের ভাবনাটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে হতে লাগল। খোঁজ শুরু করলাম। ঐতিহাসিক চরিত্র ম্যাকবেথকে শেক্সপিয়র ব্যবহার করেছিলেন অদ্ভুতভাবে। তাঁর নাটকটি পড়লে মনে হয় যেন সমস্ত ঘটনাটি দু-চারমাসের মধ্যে ঘটেছে। কিন্তু হলিনশেডে আমরা পাই ম্যাকবেথ রাজত্ব করেছিল সতেরো বছর। ইতিহাসের ম্যাকবেথ ডানকানের দূর্বল ও অলস শাসনব্যবস্থা পালটে দেশে ন্যায়নীতি, অপরাধ ও কুকর্মের শাস্তিবিধান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত আইনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, যেটা শেক্সপিয়রদের নাটকে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এর কারণস্বরূপ আমরা অনুমান করতে পারি যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন স্কটল্যান্ডে উত্তরাধিকার প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন থেকেই ম্যাকবেথ দ্বারা এই ডানকান হত্যার ব্যাপারটা ঘোর পাপরূপে ব্যাখ্যা করা হতে লাগল। এর কারণ সম্ভবত ম্যাকবেথ ডানকানের জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করায় চার্চ-সমর্থিত উত্তরাধিকার প্রথাটি বিঘ্নিত হয়েছিল। ফলে ঐতিহাসিক রাজা ম্যাকবেথ সুশাসক থাকলেও তাঁর পরবর্তী ইতিহাসবিদেরা তাঁকে ও তাঁর শাসনকালকে নানা রকম কলঙ্কে জর্জরিত করতে লাগলেন। তাঁরা নানা রকম চরিত্র আনলেন, যেমন ম্যাকবেথের ডানহাত ব্যাঙ্কো, ম্যাকডাফ ইত্যাদি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সরিয়ে ম্যাকবেথকে সরিয়ে ম্যাকবেথ-ডানকানের ব্যক্তি বিদ্বেষের কাহিনি তৈরি করা হল।

পঞ্চদশ শতকে ম্যাকবেথের নামে নানা কিংবদন্তি তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাকবেথ ছিলেন রাজা ডানকানের ভাগনে, তাঁর মা এক Faery[1] -এর সঙ্গে সহবাসের ফলে ম্যাকবেথের জন্ম দেন। তাঁর জন্মের পরে Faery পিতা ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, অযোনিজ ছাড়া কেউ তাঁকে মারতে পারবে না। এরপর ম্যাকবেথ বড়ো হয়ে স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি তাঁর মামা ডানকানের সঙ্গে শিকারে যাচ্ছেন, এমন সময় তিন অপ্রাকৃত বোনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় এবং তাঁরা ম্যাকবেথকে ক্রোমাটির সামন্ত, মোরের সামন্ত ও স্কটল্যান্ডের রাজা বলে সম্বোধন করেন। এর কিছুদিন পর ডানকানকে হত্যা করেন ম্যাকবেথ এবং তাঁর মামিমাকে বিয়ে করে স্কটল্যান্ডের রাজা হন।

ষোড়শ শতকে এই স্বপ্নের ব্যাপারটা বদল হয়ে দাঁড়াল বাস্তবের ঘটনায়। আর ম্যাকবেথের সঙ্গে ডানকান নয়, ছিলেন ব্যাঙ্কো নামে একজন ব্যক্তি। এই সময়টা স্কটল্যান্ডে স্টুয়ার্ট রাজাদের আমল- যাঁরা দেশের সিংহাসনে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যাঙ্কোর পুত্র ফ্লিয়ান্সের বংশধর বলে দাবি করতেন। ফলত, ওই ব্যাঙ্কোর বংশ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীটা ডাকিনীদের মুখে বসিয়ে দেওয়াটা খুবই মানানসই হয়ে গেল। হলিনশেড মোটামুটি তাঁর পূর্বসুরিদের কাছ থেকে এইরকম একটা বৃত্তান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি শাসক ম্যাকবেথকে ততটা স্বৈরাচারী দেখাননি যতটা করলেন শেক্সপিয়র। এর কারণ কী? শেক্সপিয়রের সময় জেম্‌স স্টুয়ার্ট ইংল্যান্ডের রাজা। সেই কারণে ব্যাঙ্কো ঘাতক ম্যাকবেথ হল মহাপাপী আর জেম্‌সের পূর্বপুরুষ ব্যাঙ্কো হলেন মহান ব্যক্তি। এতকিছুর পরেও এই

নাটকে ঘোর দুরাচারী, পাপী, স্বৈরাচারী ম্যাকবেথের প্রতি যে বিস্ময়, মমতা ও করুণা জেগে ওঠে, তার কারণ অবশ্য মহান নাটককার শেক্সপিয়র। নাটকে ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যান হয়েই থাকে। কিন্তু তিনি নায়কের চরিত্রে সবরকমের অবনমন ঘটিয়েও তাকে আমাদের হৃদয়ের সান্নিধ্যে এনে দিয়েছেন। এর প্রধান কারণ ম্যাকবেথের যে দুর্বলতা, সেটি আমাদের মনে বীজরূপে আছে। আর তা ছাড়া Macbeth যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে সেগুলো আমাদের জীবনেরও প্রশ্ন বটে।

ফলত, ম্যাকবেথের দ্বিধা, সংশয় ও প্রশ্নের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়ি। নাটকের শুরুতেই ম্যাকবেথ উচ্চাশার বীজ বপন করে দেয় তিন ডাকিনী বোন। এদের কথায় ভর করে ম্যাকবেথ একের -পর-এক ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়ে যেতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই তিন ডাকিনীকে ম্যাকবেথের জীবন চালিকা শক্তি মনে হয়। ফলত, এই নাটকের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হল evil, অর্থাৎ অশুভের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দত্তাত্রেয় দত্ত তাঁর একটি লেখায় লিখেছেন, “আমাদের সাধারণ চিন্তায় অশুভ বা অমঙ্গল হল একটা নঞর্থক ধারণা। কিন্তু পশ্চিমা ভাবনায় evil অস্তিত্ব বাচক এমন এক শক্তি যা শুভর বিপরীত মেরুতে বর্তমান আছে। হিন্দুভাবনার ‘রিষ্টি’ বা বৌদ্ধচিন্তার ‘মার’ হল এই evil, যা মঙ্গলকে ধ্বংস করতে চায়। শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে একমাত্র ম্যাকবেথেই এই মার-এর উপস্থিতি এমন প্রকট ও ভয়াল। ডাকিনী বোনেরা এই মার এরই প্রতিভূ; তাদের শক্তি তামসী শক্তি। ম্যাকবেথের মধ্যে দিয়ে মার আত্মপ্রকাশ করে মঙ্গলের জগতে। শুভাশুভের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে রাজবংশ,সামন্তকূল, প্রজাবর্গ, সমগ্র রাজ্য ও প্রতিবেশী দেশও। সেই কারণে এ-নাটক শুধুমাত্র রাজহন্তা বা প্রভুহন্তার কাহিনী নয়; কেবলমাত্র নায়কের চিত্তস্থলে পাপপুণ্যের দ্বৈরথের আখ্যানও নয়। ব্যবস্থিত জীবনে মার-এর বিকট বিস্ফোরণ এবং তার অন্তিম পরাভব এ-নাটকের ঘটনাক্রমের যথার্থ পশ্চাৎপর্ব। এই মার যে ম্যাকবেথের মধ্যেই প্রকাশ পেল, তার কারণ তার অন্তরের সুপ্ত তমোবৃত্তি তামসী শক্তির সান্নিধ্যে এসে বৃদ্ধিলাভ করে তার সদ্গুণকে গ্রাস করে নিল।” অধ্যাপক দত্ত-র এই আলোচনা আমার ভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করল। অর্থাৎ ম্যাকবেথ ছিল একজন বীর, বিবেকবান ও কল্পনাপ্রবণ মানুষ। উচ্চাশাজনিত লোভ তাকে পাপের পথে ঠেলে দিল। আর এই কাজটি ত্বরান্বিত করছে তিন ডাকিনী বোন তাদের তামসীবিদ্যার দ্বারা।

স্কটল্যান্ডের রাজা জেম্‌স চার্লস স্টুয়ার্ট, তাঁর daemonologie প্রেততত্ত্ববিষয়ক বইয়ে লিখেছিলেন যে, আমাদের প্রত্যেকের মানসিক প্রবণতার সন্ধান শয়তান জানে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের প্রতারিত করে সর্বনাশ করে। এই নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখতে পাই তিন ডাকিনী বোনকে; অর্থাৎ নাটককার শুরু থেকেই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে এই নাটকে তামসী শক্তির একটা বড়ো ভূমিকা থাকবে। এরপর প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা দেখি তিন ডাকিনী বোনের সঙ্গে ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কোর দেখা হয় এবং ডাকিনীরা ম্যাকবেথকে গ্লাম্‌সের সামন্ত, কডরের সামন্ত ও ভবিষ্যতের রাজা বলে

সম্বোধন করে। এই রকম সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখতে পাই ম্যাকবেথের মধ্যে এক তামস প্রবৃত্তির উদয় হচ্ছে। এবার আমরা যদি ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ভালো করে দেখি। প্রথমত তারা সম্বোধন করেছিল গ্লাম্‌সের সামন্ত, যেটা ম্যাকবেথ ইতোমধ্যেই হয়ে আছে। দ্বিতীয়ত তারা বলে কডরের সামন্ত; আর ঠিক এই সময়েই রস ও অ্যাঙ্গাস এসে ম্যাকবেথকে কডরের সামন্ত বলল; আর সঙ্গে সঙ্গেই সে ধরে নিল তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ রাজা নিশ্চয়ই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে, দর্শক হিসাবে আমরা কিন্তু এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ম্যাকবেথ যে কডরের সামন্ত হচ্ছে তা জেনে গেছি। কডরের বিশ্বাসঘাতকে পরাস্ত করবার পর ম্যাকবেথই যে কডরের জায়গির পাবে, এটা একটা খুবই সাধারণ অনুমান, ভবিষ্যদ্বাণী নয়—এই বিষয়টি ম্যাকবেথের মাথায় এল না। আসলে ওই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির শেষটুকু ম্যাকবেথকে চুম্বকের মতো টানছিল। ব্যাঙ্কো তাকে সাবধান করে বলে—

কিন্তু জানো, এ বড় অদ্ভুত; এসব তামসী শক্তি আমাদের ধ্বংস করবে বলে আমাদেরই মন জেনে নেয়। তুচ্ছ ছোটোখাটো সত্যয় ভুলিয়ে বিশ্বাসহন্তার মত অন্তিমে ঘা মারে, অস্তিত্বের মূলে।

এটা একেবারে রাজা জেম্‌স তাঁর বইয়ে যেভাবে তামসীশক্তির কার্যকলাপ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, এ যেন তারই প্রতিচ্ছবি। আজকের দিনেও আমরা বর্তমানে কী করছি বা অতীতে কী করে এসেছি তার পর্যালোচনা না করেই ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর প্রবল বিশ্বাস করে নিজের কর্মক্ষমতাকে ভুলে গিয়ে অদৃষ্টকে বিশ্বাস করছি। এই ভাবনাকে সম্বল করেই এবারের যাত্রা শুরু করলাম Macbeth-এর সঙ্গে।

২০ মিনিটের নাট্যাংশের প্রস্তুতির জন্য আমি তিনটি দৃশ্যকে বেছে নিলাম : প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য, যেখানে তিন ডাকিনী বোন ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কোর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী , করছে; প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য, যেখানে ম্যাকবেথ দ্বিধাগ্রস্ত আর লেডি ম্যাকবেথ তাকে ডানকান -হত্যায় উদ্‌বুদ্ধ করছে; আর পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য যেখানে আমরা নিদ্রাচারিণী লেডি ম্যাকবেথের দেখা পাই। এই তিনটি দৃশ্যই Macbeth নাটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিন ডাকিনী বোন, ম্যাকবেথ, ব্যাঙ্কো, ডানকান, লেডি ম্যাকবেথ ও অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাটকে মূল অভিঘাত অনেকটাই ধরা পরে।

এই নাটকের তিন ডাকিনী বোন সম্ভবত সুপ্রাচীন মাতৃকাদেবীর ত্রিমূর্তিরূপের প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে অনুবাদক অধ্যাপক দত্ত তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন, “Hecate Triformis”-বা ত্রিরূপা হেকটি (যাকে আমরা ডাকিনীদের আরাধ্যা হিসেবে নাটকের প্রক্ষিপ্ত অংশে দেখতে পাই)। মাতৃকাদেবী চন্দ্রেরও দেবী। তিনরূপে তাঁর প্রকাশ; কন্যা (বর্ধমান চাঁদ; সেলেনি, অপর্ণা; কুমারী ইত্যাদি) পূর্ণযৌবনা (পূর্ণচন্দ্র; আর্তেসিস, আফ্রোদিতে, যোড়শী, লক্ষ্মী ইত্যাদি) এবং বৃদ্ধা ক্ষীয়মান চন্দ্র; হেকেটি ধূমাবতী ইত্যাদি) কালক্রমে ভয়ঙ্করী হেকেটি প্রধান হয়ে উঠে চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে পড়েন এবং ত্রিমূর্তিকে নিজেরই ত্রিরূপ করে দেন। ডাকিনীরা তাঁরই সেই তিন রূপ। এই নাটকে এরা দেবীর বদলে অপদেবীরূপে ধরা

দিয়েছে, যারা ম্যাকবেথের জীবন, মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক ও অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী। এদের লীলা, হেকেটি চরিত্র অনুসরণে, তামসীলীলায় নিমজ্জিত, এরা দূর্বল মানুষকে নিয়ে খেলা করে। ফলত, এই নাটকে তিন ডাকিনী বোনকে আমরা ম্যাকবেথের প্রচ্ছায়ারূপে ভাবতে চাইনি, বরঞ্চ তাদের অস্তিত্বকে ধরে নিয়ে নাটকের মধ্যে নিহিত শুভাশুভের দ্বন্দ্বটিকে গুরুত্ব সহকারে রূপদান করতে চেয়েছি।

আমাদের ভারতবর্ষের সর্বাধিক জনগোষ্ঠী হিন্দু এবং Hinduism-এ দেবী কালীর সাধনাতে পঞ্চভূত সম্বন্ধীয় চর্চা অনেক বেশি পরিমাণে আছে। তাই আমাদের ম্যাকবেথের প্রযোজনা প্রয়োগগত দিক থেকে ভারতীয়করণের ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কার ও দেবী কালীর আরাধনাকে প্রেক্ষাপট করেছি। মূল নাটক শুরু হয় তিন ডাকিনী বোন এক পোড়ামাঠে জড় হয়েছে ও আগামীতে কী হতে চলেছে তার আভাস দিচ্ছে। আমরা শুরু করেছি তিনজন অভিনেত্রী একদম মঞ্চের পেছনে চারটি ঝুলন্ত মোটা দড়ির পিছনে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই তিন অভিনেত্রীর পরনে শুধুই কালো পোশাক। এদের কণ্ঠনিঃসৃত একটি তানের মধ্যে দিয়ে মঞ্চে এদের উপর আলো আসে, এবং তানটি উচ্চগ্রামে পৌঁছাবার পর এরা মঞ্চের তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে মঞ্চে আলো বাড়তে থাকে এবং আমরা দেখতে পাই down stage-এ তিনটি পূজার আসন ও পূজার সামগ্রী রাখা আছে। তিন অভিনেত্রী ধীর পদক্ষেপে পূজার আসনের দিকে এগিয়ে আসে এবং লাল পাড় সাদা শাড়ি পরিধান করে। এরপর তারা আসনে বসে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কালীপূজার মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করে।

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহাঃ। ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহাঃ। ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহাঃ।
ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপুষ্পঋষি সুতলংছন্দ কূর্মদেবতা আসন
উপবেশনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ পৃথ্বীতয়া ধৃতা লোকাঃ বিষ্ণুনা ধৃতা তঞ্চঃ ধারয় মাং ভক্তং
পবিত্রং কুরু চঃ আসনম্।
ওঁ হ্রাং হ্রাং হ্রাং হ্রাং ক্রাং ক্রাং ক্রাং ক্রাং।
ওঁ এসৈ প্রানাঃ প্রতিষ্ঠান্তত অস্যৈ প্রানাঃ ক্ষরন্ত চঃ।
ওঁ ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্ঠিবর্ধনম্
উর্বারুকমিববন্ধনান মৃত্যুমুক্ষীয় মামৃতাত ওম্।
ওঁ ভূতং ত্বম্ আহূয়ামি। ওঁ ভূতং ত্বম্ আহূয়ামি। ওঁ ভূতং ত্বম্ আহূয়ামি।
ওঁ ভূতদ্বয়ঃ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ
ইহ সন্নিধেহী ইহ সন্নিরুদ্ধস্য অত্রাধিষ্ঠানং কুরু
মম পূজাং গৃহ্যান্।
ওঁ বেতালশ্চ পিশাচশ্চঃ রাক্ষসশ্চঃ সরীসৃপ।
দেশস্মাৎ বিনিসৃতা পূজাংপশ্যন্তু মৎকৃতম।

উচ্চগ্রামে সংগীত সহযোগে এই মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ওই তিন অভিনেত্রীকে দেখতে পাই তিন ডাকিনী বোনরূপে এবং তারা প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের সংলাপ বলতে থাকে। অর্থাৎ শেক্সপিয়রের নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের তিন ডাকিনী বোনের আবির্ভাব ও আগামীর অবতারণা এখানে ওই কালীপূজার মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। যেন তিন ডাকিনী বোন ওই পূজার অবতারণা করল। এটা একটা transformation from a woman to weird sister, যার ফলে শুরুতে আমরা তিনজন অভিনেত্রীকে কোনোরকম identical costume -এ দেখিনা। সাধারণ কালো রংয়ের ঢোলা পাজামা ও গলাবন্ধ ফুলহাতা গেঞ্জিতে দেখতে পাই। এরপর তারা এই পোশাকের উপর লালপাড় সাদা শাড়ি পরে পূজোয় বসে। অর্থাৎ একটা identity দেখতে পেলাম। পূজোর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তিন ডাকিনী বোনের রূপান্তর হয়। খুবই interesting ব্যাপার যে, এই transformation from one character to another ক্রমাগত এই প্রযোজনায় আমরা দেখতে পাই।

ফলস্বরূপ, একজন অভিনেতা যে এইমাত্র ডাকিনী ছিল, পরের সংলাপেই সে হয়তো ম্যাকবেথ কি লেডি ম্যাকবেথ অথবা অন্যান্য চরিত্র হয়ে উঠছে। এবং এই transformation-এ অভিনেতারা শুধু অভিনয়ই নয় তাদের পরিহিত পোশাক ও সামান্য বদল ঘটিয়ে চরিত্রের রূপদান করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ডাকিনী বোন থেকে যখনই কেউ ম্যাকবেথ হচ্ছে, শাড়ির আঁচল কাঁধ থেকে নামিয়ে ডানহাতে জড়িয়ে নিচ্ছে— visually একজন রাজা যেমনভাবে উত্তরীয় নেয়।

মঞ্চসজ্জায় আমরা দেখতে পাই, একদম up stage-এ চারটি দড়ি ঝুলছে back black curtain -এর সামনে। Down stage -এ right, centre left -এই তিনটি ভাগে তিনজন আলাদা আলাদা করে পূজো করতে পারে সেইমতো পূজা সামগ্রী দিয়ে সাজানো। এই পূজোর আসন ও সামগ্রী এমনভাবে রাখা যাতে অভিনেতা বসলেই সে সরাসরি দর্শকের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। এ যেন এক অদৃশ্য আয়নার অভিধানগত অর্থ : spiritual symbol of wisdom and awareness; mirrors are symbols and carriers of truth and reflect what our truth is. Some believe is that the mirror will reflect the noxious energy away from the house। পাঠকরা এখন অনুমান করতে পারেন যে, তিনজন অভিনেতা তিনটি নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট আলোকবৃত্তে বসে ডাকিনী, ম্যাকবেথ, লেডি ম্যাকবেথ ও অন্যান্য চরিত্র হয়ে উঠেছে এবং ওই স্থানে বসে প্রতিটি সংলাপ যেন আয়নায় দেখে কথা বলছে; আসলে প্রতিটি সংলাপ বলবার সময়ে তারা প্রতিপক্ষ হিসাবে দর্শককে পাচ্ছে। এটি একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তৈরি করে দর্শকের মনে। নাটক শুরু হবার খানিক বাদে দর্শকরাও অভিনেতাদের সঙ্গে eye contact করতে বাধ্য হয় এবং দর্শকদের মনে হয় তাঁরাও যেন এক আয়নার মধ্যে দিয়েই নাটকটি দেখছেন। তাই শেক্সপিয়রের লেখা নাটক Macbeth আমাদের প্রযোজনা কৌশলে হয়ে ওঠে ম্যাকবেথ Mirror।

বাংলা ভাষায় যে Macbeth -এর অনেকগুলি অনুবাদ হয়েছে, সে-কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আমরা আমাদের প্রয়োজনার জন্য অধ্যাপক দত্তাত্রেয় দত্ত-র অনুবাদটি গ্রহণ করি। তিনি তাঁর লেখায় এই অনুবাদ সম্পর্কে বলেছেন, “ বর্তমান অনুবাদটি আক্ষরিক, কাব্যিক বা সার্বিক অনুবাদ হিসেবে কল্পিত হয়নি (ক্লাস-পাঠ্য 'সহায়িকা' হিসাবে তো নয়ই) — যদিও প্রথম দুটি গুণ-এ অনুবাদে একেবারেই নেই, তা বলা যায় না। বর্তমান অনুবাদে অমিত্রাক্ষর, মিত্রাক্ষর, ছড়া, গদ্য ইত্যাদি যাবতীয় রীতির প্রয়োগে মূল নাটকে প্রযুক্ত রীতিকে অনুসরণ করে করা হয়েছে। [......] সেই বাচনধর্মিতার কথা মাথায় রেখে প্রধানত পয়ারের নিয়ম অনুসারে এই অনুবাদ পাঠ করতে হবে। তাতে দেখা যাবে যে সামান্য কিছু কিছু স্থানে বাক্যের অন্বয় অগদ্য সুলভ; কিছু কিছু স্থানে আপাত-অসংলগ্নতার প্রকাশ পাবে— শেক্সপিয়রেও ঠিক যেমনটি দেখা যায়। মোটের ওপর, বাস্তববাদী নয়, কাব্যধর্মী নাটক অভিনয় হচ্ছে— এই কথা মাথায় রেখেই বর্তমান অনুবাদ অভিনয় করা উচিত। ” ফলত, শেক্সপিয়রের Macbeth একাধারে যেমন নাটক, আবার কাব্যও বটে— এই বিষয়টি এই অনুবাদে ভীষণ ভালোভাবে ধরা পড়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের প্রযোজনায় শুরুতেই যে কালীপূজার আচার ও মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োগ আমরা দেখছি, যেটা নাটকের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে; নাটকের এই কাব্যধর্মিতার সঙ্গে মিলেমিশে এক কাব্যধর্মী, বাস্তববাদী ও মঞ্চায়ন-উপযোগী এক অনুবাদ হয়ে ওঠে।

আজকের বাস্তবতা

২০১৬-এর আন্তর্জাতিক সেমিনারে ম্যাকবেথের খণ্ড নাট্যাংশ পরিবেশনের পর সেখানে উপস্থিত অধিকাংশ অধ্যাপক ও অভিনেতারা তাঁদের মতামত জানাতে এসে প্রথমেই জানতে চান কেন আমি সম্পূর্ণ Macbeth টা করছি না, কবে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পাবে ইত্যাদি। একইভাবে, যখন এই নাট্যাংশের video recording -এর জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এর মঞ্চায়ন করেছিলাম, সেখানেও উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে একইরকমের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখেছিলাম। দর্শকদের এই উৎসাহে পরিকল্পনা করে ফেললাম সমগ্র নাটকের মঞ্চায়নের । ডেনমার্কে থাকাকালীন আমার NSD-র অগ্রজ সুনীল পোখরেলকে এই নাটকের ভাবনার কথা জানিয়েছিলাম। তিনি তৎক্ষনাৎ আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখেন নেপালের কাঠমণ্ডুতে একটি আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে। এবার একটু কপালে ভাঁজ পড়ল, কারণ সুনীলদার সঙ্গে কথা হচ্ছে April end -এ আর নেপালে show করতে যেতে হবে June end -এ, মানে হাত দুই-মাস বাকি, আর এর মধ্যে সম্পূর্ণ নাটকটা তৈরি করতে হবে।

<u>প্রথম অঙ্ক</u>

তৃতীয় দৃশ্য ঃ পোড়া মাঠে তিন ডাকিনী বোনের সঙ্গে ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কোর সাক্ষাৎ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা; ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কোর মনে লালসার জন্ম।

পঞ্চম দৃশ্য ঃ ইন্‌ভার্নেস প্রাসাদে লেডি ম্যাকবেথ ম্যাকবেথের চিঠি পড়ছে; আগামীর

আনন্দে আত্মহারা এবং ভবিষ্যদ্বাণী সফল করার জন্য দৃঢ়বদ্ধ।

সপ্তম দৃশ্য ঃ ইনভার্নেস প্রাসাদকক্ষে দ্বিধাগ্রস্ত ম্যাকবেথ লেডি ম্যাকবেথের প্ররোচনায় ডানকান-হত্যা কার্যকর করতে উদ্যত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ঃ দ্বিধাগ্রস্ত ম্যাকবেথ ডানকানকে হত্যা করতে চলেছে, এই সময়ে সে শূন্যে ছোরা দেখতে পায়, ডানকান হত্যা সমাধা করে; ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ নিজেদের প্রস্তুত করে সকলের সামনে স্বাভাবিক থাকবার জন্য।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ঃ দরবার ঘরে ব্যাঙ্কো তিন ডাকিনী বোনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবার কথা চিন্তা করছে; ব্যাঙ্কোর প্রস্থানে ম্যাকবেথ দুই ঘাতককে নিয়ে ব্যাঙ্কো-হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

চতুর্থ দৃশ্য ঃ ফরেসের প্রাসাদে পরিষদবর্গের সঙ্গে ভোজসভাতে ব্যাঙ্কোর ভূত দেখতে পেয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে; লেডি ম্যাকবেথ সকলকে সামাল দেয়।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ঃ ডাকিনীদের আস্তানাতে ম্যাকবেথ যাচ্ছে ভবিতব্যকে জানতে এবং আরও বেশি করে কথার জালে জড়িয়ে যাচ্ছে; আরও বেশি করে সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ঃ ডানসিনেন দুর্গের কক্ষে বৈদ্য ও পরিচারিকা, নিদ্রাচারিণী লেডি ম্যাকবেথের করুণ অবস্থা দেখতে পাচ্ছে।

তৃতীয় ও পঞ্চম দৃশ্য ঃ ডানসিনেন দুর্গে ম্যাকবেথ তার অনুচরবৃন্দের সঙ্গে অপেক্ষারত, ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে। দশ হাজার ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করতে আসছে শুনেও তাদের প্রতিহত করবার কথা না -ভেবে অন্ধ কুসংস্কারের ভবিষ্যদ্বাণী 'কোনো অযোনিসম্ভব ছাড়া কেউ তাকে মারতে পারবে না' — এই ভাবনায় নিমজ্জিত থাকছে।

পঞ্চম অঙ্ক

অষ্টম দৃশ্য ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে ম্যাকবেথ ও ম্যাকডাফ সম্মুখ সমরে উপস্থিত এবং ম্যাকবেথ জানতে পারে ম্যাকডাফ মায়ের গর্ভ চিরে পৃথিবীর আলো দেখেছে, কারও যোনিপথে ভূমিষ্ঠ হয়নি। ম্যাকবেথের কাছে দিনের আলোর মতো সবকিছু পরিস্কার হয়ে যায় এবং সে বুঝতে পারে ডাকিনী বোনের কথায় বিশ্বাস করে মস্ত বড়ো ভুল করে ফেলেছে।

পাঠকরা এই দৃশ্যগুলি অধ্যয়ন করলেই অনুধাবন করতে পারবেন, এইসকল দৃশ্যে ম্যাকবেথের উচ্চাশা , অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে এক শুভাশুভের দ্বন্দ্বের

প্রকাশ ঘটছে। পূর্বেই জানিয়েছি যে, তিন অভিনেত্রীর কালীপূজার মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এই নাটক শুরু হয় এবং বারংবার তা ফিরে আসে।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো প্রবেশের পূর্বে মূল নাটকে তিন ডাকিনী বোন একসঙ্গে একটা কবিতা বলে যার শেষে লাইনগুলি এইরকম—

তোর তরে তিন, মোর তরে তিন, ছয়
আবার তিনে পূর্ণ হল নয়। থামরে, এবার মন্ত্র গেছে ধরে।

এই কবিতাটি আমাদের নাটকে ব্যবহার না-করে এখানে তিন ডাকিনী বোন একসঙ্গে এই মন্ত্রোচ্চারণ করে—

ওঁ বেতালশ্চঃ পিশাচশ্চঃ রাক্ষসশ্চঃসরীসৃপা।
দেশাদস্মাৎ বিনিসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতম।

এবং এর সঙ্গেই ওই ডাকিনীদের একজন ম্যাকবেথ হয়ে সংলাপ বলে—

এত বিশ্রী শুভদিন আগে কখনো দেখিনি।

ফলত, শেক্সপিয়রের লেখা গুরুত্বপূর্ণ সংলাপটি বাদ গেলেও ওই মন্ত্রোচ্চারণ নাটকে এক অন্য মাত্রা যোগ করে দেয়। একইভাবে প্রথম অঙ্কের/সপ্তম দৃশ্যের শেষে ম্যাকবেথের সংলাপ—

চলো, গিয়ে সকলকে ধোঁকা দিই ঝুটো আপ্যায়নে,
প্রতারক মুখে চাকি প্রতারক হৃদয় কী জানে।

এরপর ম্যাকবেথ যেন ডানকান- হত্যার প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং মন্ত্রোচ্চারণ করে—

ওঁ হুং হুং হুং ফট্ স্বাহাঃ, ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহাঃ।
ওঁ ডং ডাং ডিং ডুং ফট্ স্বাহাঃ ,ওঁ গুণহা গুণহা দৃম্ দৃম্ ফট্ স্বাহাঃ।

ম্যাকবেথের অভিনেতা এই মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে। বাকি দুই অভিনেতা কালীপূজার খাঁড়া শূন্যে তুলে শূন্যে ধরে। ম্যাকবেথ এটাকেই ছোরারূপে দেখতে পায় এবং সঙ্গে সংলাপ বলে—

চোখে এ কী দেখছি? আমার হাতের দিকে মুঠ

পাঠকেরা এতক্ষণে অনুমান করতে পারছেন যে, এই নাটকের প্রযোজনাতে এলিজাবেথীয় নামকরণ ও নাট্য ঘটনার সাথে প্রাচ্যের সংস্কৃতির এক মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। এটা খানিকটা দুটি ভিন্ন রংয়ের সুতোর ব্যবহারে একটি চেক-চেক কাপড় বোনার মতো। এখানে প্রত্যেকটি রং এক-একটি box তৈরি করছে আবার দুটি ভিন্ন রংয়ের ছোটো ছোটো box সংবলিত হয়ে একটি কাপড়ের রূপদান করছে। ফলে এই প্রযোজনাটি ভারতীয় আঙ্গিকের একটি শেক্সপিরিয় ট্র্যাজেডীরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে।

এই নাটকের অভিনয়শৈলী খুঁজে বের করা একটা challenge ছিল। তার প্রধান কারণ text, আমরা যে -অনুবাদটি ব্যবহার করব বলে মনস্থির করলাম সেটি বাস্তববাদী নয়,

কাব্যধর্মী এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে কালীপূজার মন্ত্রোচ্চারণ । ফলে challenge-গুলো দাঁড়িয়ে গেল:

১। কাব্যধর্মী নাটকের বাচনভঙ্গি কেমন হবে, যেটা আজকের দর্শকের কাছে মনোগ্রাহীও হবে?

২। বাচনভঙ্গি যেটা হবে তার সঙ্গে অভিনেতার শারীরিক অভিনয় কেমন হবে? কারণ এই দুটির সংমিশ্রণ না-ঘটাতে পারলে সেটা প্রক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

৩। তিনজন অভিনেত্রী সমগ্র ম্যাকবেথ অভিনয় করবে? তাহলে তাদের এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্র হয়ে ওঠা, অর্থাৎ transformation-টা কী রকম হবে, যেটা দর্শক বুঝতে পারবে অথচ সেটা আলাদা খণ্ডচিত্রের মতো দেখাবে না?

মূলত এইরকম তিনটি সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু হল। তার সঙ্গে মাথায় প্রশ্ন রইল এদের পোশাক কী হবে। কারণ অভিনেতার অভিনয় প্রসঙ্গে costume ও make-up তার অভিনয়ের সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয় অন্যান্য বিষয়গুলির থেকেও। এটা আরেকটি চ্যালেঞ্জ। কাব্যধর্মী নাটকের মূল সমস্যা হল আজকের অভিনেতা এই কাব্য সংবলিত সংলাপকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে সহজ স্বাভাবিকভাবে তাকে দর্শকদের কাছে প্রকাশ করতে পারে না। তার মূল কারণ আধুনিক জীবন কাব্যচর্চা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। প্রতিদিনের কথাবলার ভাষাকে এক যান্ত্রিকতার ছন্দে বেঁধে ফেলেছি। সর্বোপরি, emoji ডিজিটাল লেখ্য ভাষায় ভাবপ্রকাশের অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে। ফলত, এলিজাবেথীয় যুগের সিরিয়াস নাটকের কাব্যনাট্যের ভাষা আজকের অভিনেতার নিজের ভাষা হয়ে ওঠা বেশ শক্ত। তার কারণ আজকের অধিকাংশ অভিনেতা সে শুধু 'এই চরিত্রটি আমার চরিত্র' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ভাবা উচিত: ' এই চরিত্রটা আমার এবং এই ভাষাটাও আমার।' ভাষা তো শুধু ভাষা নয়, সেই ভাষা থেকে আহৃত অর্থ প্রকাশটাই অন্যতম কাজ। ফলে এই ক্ষেত্রে খুব বেশি করে অনুশীলনের প্রয়োজন পড়ে ছন্দ, ঝোঁক, যতি ইত্যাদির। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সমস্যার আমরা সম্মুখীন হই রবীন্দ্রনাটকের প্রয়োজনার ক্ষেত্রেও। আমাদের এই অনুবাদটিতে অমিত্রাক্ষর, মিত্রাক্ষর, ছড়া, গদ্য ইত্যাদির যাবতীয় রীতির প্রয়োগ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে অনুবাদক নিজে বলেছেন— " বাংলা পয়ার বাচনধর্মী, এবং আঠারো মাত্রার পয়ারে পাঁচটি আঘাত পড়ে। কাজেই ইংরাজি unrhymed iambic pentamater of Blank verse - এর বাংলা সমান্তর হিসেবে এই ছন্দই এখানে অমিত্রাক্ষরে ব্যবহৃত হয়েছে। " ফলত, আমরা লেখ্য সংলাপের ছন্দটাকেই সম্বল করে আমাদের বাচনভঙ্গি তৈরি করি। এক্ষেত্রে অবশ্যই ঝোঁক বা যতি অভিনেতা বিশেষে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে এই সামান্য পরিবর্তনের ফলে পদ্যছন্দের সংলাপ কথ্য ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে, যেটা আজকের সময়ের দর্শকদের কাছে খুব সহজে communicate করেছে।

এই নাটকের উপযুক্ত অভিনেতার শরীর কেমন হবে? নাটকটিতে শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব একটা মুখ্য বিষয়। এলিজাবেথীয় যুগের মঞ্চে মেঝেতে গুপ্তদ্বার বা trap door থাকত।

অনুমান করা যায়, এই গুপ্তদ্বার দিয়েই প্রেত, ডাকিনী বোন ইত্যাদিরা আনাগোনা করত এবং ধোঁয়া, আগুন ইত্যাদি সহযোগে জাদুকরি ব্যবস্থাও ছিল। সংলাপে আমরা পাই, ব্যাঙ্কো ভাবে ডাকিনীরা মাটির বুদ্‌বুদ, মাটিতে মিশে গেছে আর ম্যাকবেথ ভাবে হাওয়ায় মিশে গেছে। অর্থাৎ stage floor-এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের নাটকেও সম্পূর্ণ পূজার্চনা অভিনেতারা মাটিতে বসেই করছে। নাটকের অনুসারে, অভিনেতা অধিকাংশ সময় মাটিতে বসা অবস্থায় রয়েছে। প্রথমেই আমরা এক-একজন অভিনেতাকে কাজ দিলাম এক-একটি চরিত্রের animal instincts খুঁজে বের করতে এবং সেই প্রাণীর চলন নিজের শরীরের আয়ত্ত করতে। এই পদ্ধতিতে তিন ডাকিনী বোন হয়ে দাঁড়াল নেকড়ে, শিয়াল ও বেড়াল, ম্যাকবেথ হাতি, লেডি ম্যাকবেথ সাপ ইত্যাদি। এই খুঁজে বের করবার ক্ষেত্রে আমি পরিচালক হিসাবে অভিনেতাদের শুধু নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলাম। প্রাণী নির্বাচনটা তাদের নিজস্ব ভাবনা ছিল। আমি চাইছিলাম ওদের নিজস্ব ভাবনায় আগত প্রাণীর প্রতিচ্ছবিটা যাতে ওরা সহজেই ওদের নিজেদের শরীরে আয়ত্ত করতে পারে। প্রতিদিনের চর্চায় প্রথম অর্ধ থাকত শরীর চর্চার জন্য; বাকি সময়ে আমরা নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে ওই দৃশ্যে অন্তর্নিহিত অর্থের দৃশ্যগত রূপ বা visual image খোঁজবার চেষ্টা শুরু করে দিলাম। ফলে আমাদের কাজটা এখন ত্রিস্তরীয় হয়ে গেল: বাচনভঙ্গির অভ্যাস, শারীরিক অভ্যাসের দ্বারা কোনো প্রাণীর চলন নিজের শরীরে আয়ত্ত করা, নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে visual image এর খোঁজ করা। মনে পড়ে, দিন দশেকের কঠোর পরিশ্রমে আমরা একটা জায়গায় পৌঁছালাম। এবার শুরু হল এই খণ্ড অভ্যাসগুলোকে একত্র করবার পালা। বন্ধুবর দেবকুমার পাল ও তপন রায়কে আসতে অনুরোধ করলাম যথাক্রমে movement ও কালীপূজার সঠিক মন্ত্রোচ্চারণ আমাদের অভিনেতাদের শেখাবার জন্য। এই সময়ে আমার কাজ ছিল এতদিন আমরা যা যা কিছু আহরণ করেছিলাম তার থেকে ঠিক যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই নিয়ে নাটকটি গেঁথে ফেলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রযোজনায় অনেক যোগ্য অভিনেত্রীই অভিনয় করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে যে দুইজন অভিনেত্রী তাদের পূর্বতন অভিনয়ের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে এইরকমের এক নতুন ধরনের অভিনয়শৈলীতে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় ও অনন্যা দাস। আজ অস্বীকার করতে বাধা নেই যে, এইরকম যোগ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দল না পেলে ম্যাকবেথ *Mirror* প্রযোজনার যে রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হয়তো গড়ে উঠত কি না জানি না। এক কথায়, পরিচালক-পরিকল্পক-অভিনেতার সঠিক সংমিশ্রণ ঘটেছে এই প্রযোজনায়।

সংগীত, আলো ও props এই নাটকে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের props বলতে মূলত পূজা সামগ্রী আমরা ব্যবহার করেছি। আর এই পূজাসামগ্রীগুলি সবই তৈরি করা হয়েছিল মাটি দিয়ে। ফলত, মাটির বাসনকোসন, ফুল, ধূপ ইত্যাদি সহযোগে নাটকের মধ্যে একটা rustic feel তৈরি করা হয়েছিল, আর এই কাজটি প্রসেনজিৎ ও শোভন খুবই যত্ন সহকারে করেছিল।

এখানে আমরা লাইভ মিউজিক ব্যবহার করেছি। মঞ্চের একদম down left এ মঞ্চ appron stage-এর সংযোগস্থল -বরাবর অংশে তিনজন musician বসে। এই নাটকে আমরা শুধুমাত্র ভারতীয় music instruments ব্যবহার করেছি, যথা দোতারা, সরোদ, বাংলা ঢোল, খমক, ঘুঙুর, করতাল, কাঁসর, শঙ্খ ইত্যাদি। অর্থাৎ সংগীতের মধ্যে দিয়ে যে পরিবেশ রচনা হয় তা সম্পূর্ণ ভারতীয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য, যেখানে ম্যাকবেথ দুই ঘাতকের সঙ্গে ব্যাঙ্কো হত্যার পরিকল্পনা করছে। দৃশ্যশেষে ঘাতকদ্বয় উদ্যত হয় ব্যাঙ্কো হত্যায়। ম্যাকবেথ বলে—

কথা পাকা হয়ে গেল, ব্যাঙ্কো, যদি স্বর্গে যেতে হয়।
এ রাত্রেই তার পথ খুঁজে পাবে— আর দেরি নয়।

এই সংলাপের সঙ্গেই আমরা দেখতে পাই দুই ঘাতক দুটি খাঁড়া নিয়ে নৃত্যভঙ্গিমায় প্রস্তুত হয় বলি দেবার জন্য। এর সঙ্গে তিনজনেই মন্ত্রোচ্চারণ করে—

ওঁ কালীকরালবদনী খড়্গাধারিণী রুধিরেনা গুনহ গুনহ স্বাহাঃ।

এই মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে যোগ হয় বাংলা ঢাক, কাঁসর, ঘন্টা ও শঙ্খধ্বনি। সেই সঙ্গে এই সময় অভিনেতারা লালপাড় সাদা শাড়ি কোমড়ে গুঁজে পরে, এইরূপ সংগীত সহযোগে, খাঁড়া হাতে নৃত্যভঙ্গিমা শেক্সপিরিও Macbeth সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হয়ে ওঠে। আরও interestingএই খানে আমরা দুটি চালকুমড়ো ব্যবহার করেছি বলির সরঞ্জাম রূপে। ঠিক এই দৃশ্যের পর আমরা তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে চলে আসি, যেটা পরিষদবর্গ নিয়ে ভোজসভার দৃশ্য। এই দৃশ্যের শুরুতে ম্যাকবেথরূপী অভিনেতা একদম down centre -এ রাখা পূজোর আসনে বসছে এবং পূজোর নৈবেদ্যর মন্ত্রোচ্চারণ করছে—

ওঁ নৈবেদ্যং স্বাদএক্ষ্যনং নানাভক্ষ্যয়ঃ সমন্বিতং ময়া নিবেদিতং ভক্তা
গৃণানঃ পরমেশ্বরী দয়াং নিবেদয়াং সহিত মহাকালৈ স্বাহাঃ।

ঠিক এই সময় বাকি দুজন অভিনেতা down left ও right -এ পুজোর আসনে বসে দ্বিখণ্ডিত চালকুমড়োর অর্ধেক যেন ব্যাঙ্কোর ছিন্নমস্তকরূপে পুজোর নৈবেদ্য হিসেবে অর্পণ করছে। আর এখানেই ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোর প্রেতকে দেখতে পাচ্ছে। মৃদুমন্দ ঘন্টার ধ্বনির সঙ্গে— কালীপূজার পরিবেশ রচনা ম্যাকবেথের ভোজসভা ও ব্যাঙ্কোর প্রেত দর্শনের দৃশ্য এক অনন্য অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। শুভদীপ গুহ যথার্থ রূপে এই নাটকের সংগীত সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে সংগত করেছে চক্রপাণি দেব।

আলোক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে -বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছি তা হল ছায়া। মঞ্চে কত রকমের ছায়া তৈরি করা যায় সেটা ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। অভিনেতার একদম উপর থেকে , পাশ থেকে, কোনাকুনি বা একদম floor ঘেঁষে আলোক প্রক্ষেপণের মধ্যে দিয়ে নানা রকমের ছায়া আমরা তৈরি করি। মঞ্চের সামনের দিক থেকে আলো আমরা প্রায় ব্যবহার করিনি। ফলত, অভিনেতাদের চেহারাতে সর্বক্ষণ এক আলো আঁধারির খেলা চলতে

থাকে। এক্ষেত্রেও আমরা শুভ-অশুভর দ্বন্দ্বকেই প্রাধান্য দিয়েছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাটকের propsরূপে ব্যবহার হয় তিনটি মাটির প্রদীপ, যা অবশ্যই পূজার সামগ্রী, যেটা এই নাটকের অন্যতম light source। একটি দৃশ্যের কথা উল্লেখ করি। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ম্যাকবেথ ওই তিন ডাকিনী বোনের কাছে ফিরে যাচ্ছে— তার আগামী সম্পর্কে জানতে এবং নানাবিধ ভবিষ্যদ্বাণীর জালে আরও জড়িয়ে পড়ছে। এই দৃশ্যটি শেষ হয় ম্যাকবেথের প্রতিহিংসামূলক সংলাপের মধ্যে দিয়ে। এরপর নাটকে আমরা পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নিদ্রাচারিণী লেডি ম্যাকবেথকে দেখতে পাই এবং আমরা এইখানে বৈদ্য ও পরিচারিকার সংলাপ বাদ দিয়েছি। ফলত, দৃশ্যটি এক ধরনের লেডি ম্যাকবেথের স্বগতোক্তির দৃশ্য হয়। ম্যাকবেথ সংলাপ শেষ করছে এইভাবে—

ম্যাকডাফের প্রাসাদে সহসা গুপ্ত আক্রমণ হেনে
জাগীর দখল করব, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়, সবাইকে
সঁপে দেব কৃপাণের নীচে, যাতে বংশে বাতি দিতে
কোথাও কেউ রয়ে না যায়।
এর সঙ্গে তিনজন মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করে—
ওঁ বেতালশ্চ পিশাচশ্চঃ রাক্ষসশ্চঃ সরীসৃপা।
দেশদস্মৎ কিনিসৃত্য পূনাং পশ্যন্তু মৎকৃতম।

এই সংলাপ বলতে বলতে তারা যেন লেডি ম্যাকবেথরূপে ছোটোবেলাকার বালিকা হয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতে খেলতে প্রথমবার রজঃস্বলা হবার ব্যথা অনুভব করে। সকলে মাটিতে বসে পড়ে। মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে কমে আসে; এর ফলে প্রদীপের আলো প্রাধান্য পায় এবং সমগ্র মঞ্চটি একটি ছোটো কক্ষের আভাস তৈরি করে। আজও আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরা ওই দিনগুলিতে নিজেদের একটু isolate করে রাখতে চায়। তিন অভিনেত্রী ধীরে ধীরে প্রদীপের কাছে এগিয়ে আসে যেন প্রদীপের এই ক্ষীণ আলোও তারা সহ্য করতে পারছে না। তারা প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। এই সময়ে সারা মঞ্চে সব আলো নিভে গিয়ে শুধুমাত্র প্রতিটি wing gap -এ একটি করে floor light-এর আলো আঁধারিতে ভীষণ প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই নাটকের আলোক পরিকল্পক অর্ণবকে শুরুতেই বলেছিলাম কোনোরকম লাল বা অন্য রংয়ের ব্যবহার আমি চাই না। সম্পূর্ণ সাদা আলোর মধ্যে আলোছায়ায় মঞ্চে ব্যবহৃত জিনিষগুলি রঙের সাহায্যে উদ্ভাসিত হোক এ নাটক। আর সেটাই সে করেছিল।

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে Macbeth -এর যে খণ্ডাংশ ডেনমার্কে প্রস্তুত করেছিলাম; তারপর ওই নাটকের পূর্ণচিত্র অদ্যাবধি ভারত তথা নেপাল, চেক রিপাবলিক, পোল্যান্ড, ইজরায়েল ও ভিয়েতনামের বিভিন্ন নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে মঞ্চায়নের সুযোগ ঘটেছে। দেশের বাইরের নাট্যোৎসবগুলিতে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ভাষায় অভিনীত ও প্রযোজনাশৈলীতে ভারতীয় ম্যাকবেথ Mirror দর্শকদের সঙ্গে খুব সহজেই এক যোগসূত্র

স্থাপন করেছিল, যা আজও আমাদের অভিভূত করে। এইখানেই বোধহয় খানিকটা সত্য হয়ে পড়ে যে, "থিয়েটারের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, যে ভাষা কথা ভাষার থেকেও শক্তিশালী, দর্শকদের সাথে সংযোগ স্থাপনে ।" এই নাটকটি নাট্য-আলোচকদের কাছেও খুবই সমাদৃত হয়েছিল। তার কয়েকটির কিছু কিছু অংশ আমরা একবার দেখে নিতে পারি।

The Telegraph (Kolkata), পত্রিকায় ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে অধ্যাপক আনন্দ লাল লিখেছেন, " I am not aware that anyone in the world has reduced Macbeth in the novel fashion, which impacts a preeminent position to transformation and possession."

The Himalayan Times (Kathmandu) ,২৬ জুন, ২০১৬ সালে লিখছে, "Women putting on red tika in the begining and putting on black tika int he last secnes were a symbol of the women changing into witches in the play. It was a brilliant work of the director to bring the feel of an English play into an Indian context."

চেক রিপাবলিকের Ostravan পত্রিকায় ৩০ জুলাই ২০১৭ সালে Ladislav Vrchovsky লিখছেন—" As has been said, it is expression of another culture and other theatrical traditions. With European theatre, however, this fascinating spectacle has nothing to do with anything but seeningly; there is work voice, full of dynamics from shouting and roar to whispering, there is a body language full of exotic positions and attitudes, including dance gestures known from the Indian traditional and folk dances."

Shakespeare Daily (Poland), পত্রিকায় ২ অগস্ট, ২০১৭ সালে Agata Tomasiewicz লিখছেন— "Creating an intercultural theatre is a laboratory experience, in which different traditions of cultural read-outs are distilled and try to find a universal level of communication. The intercultural marriage brings various effects, often disappointing, but most often the most valuable are not so much specific staging practices as the creative process leading to the negotiation of new meanings. It would be good to recall the achievements of Eugenik Barba, Peter Brook, Tadashi Suzuki and some stagings of Julie Taymor.

A good example of an intercultural theatre that derives from both the god-like tradition of Indian theatre and the legacy of the master from stratford is Macbeth Mirror directed by Santanu Das."

এই নাট্য-আলোচনার অংশগুলি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, আমরা দর্শকদের সঙ্গে আমাদের ভাবনাটা অনেকাংশেই Communicate করতে পেরেছি। প্রায় প্রতিটি আলোচনাতেই নাটকের editing, acting, music, set, light, props ও costume নিয়ে

বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সর্বোপরি, শেক্সপিয়র ট্র্যাজেডিকে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেও শেক্সপিরিয় ট্র্যাজেডির মূল দ্যোতনা দর্শকদের কাছে পরিবেশিত হয়েছে এবং এটা প্রশংসিত হয়েছে।

আজ এই প্রযোজনা নিয়ে লিখতে বসে মনে পড়ে যাচ্ছে, শুধু নাট্য-আলোচকেরাই নয়, আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবের সাধারণ দর্শকদের আমাদের এই প্রযোজনা নিয়ে উদ্দীপনার কথা। প্রতিটি show পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহ; show-এর দুদিন আগে Ticket শেষ; কোনো কোনো - showé-এ নির্দিষ্ট আসন না পেয়ে মাটিতে বসে নাটক দেখেছে দর্শকরা। ভিয়েতনামের আমন্ত্রিত আন্তর্জাতিক নাট্যপ্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক নাট্য-পরিচালনায়ও অভিনয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্তিও ঘটেছে। নাটকের শেষে তাদের করতালি ও standing ovation আমাদের অভিভূত করেছে। মনে প্রশ্ন জাগে এইরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা শুধুই কি নাটকে ব্যবহৃত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাশের প্রতি? নাকি সত্যি সত্যি আমাদের নাট্য-অন্বেষণ ম্যাকবেথ Mirror দর্শকের চিত্তে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। দত্তাত্রেয়, ম্যাকবেথ, Society for the Advancement of Performing Arts, ২০০৮
২। King James VI, Daemonologie, In Forme of a Dialogne, Aziloth Books, 2012
৩। Shakespeare, William, Macbeth, Maple Press, 2014
৪। Holinshed, Raphaell, Holinshed's Chronicles England, Scotland and Ire land, ed. Vernon F. Snow, New York: AMS, 1965

সহায়ক পত্র পত্রিকা

১। The Telegraph (Editor : Arup Sarkar), ABP Private Limited, 2016
২। The Himalayan Times (Editor : Ranjan Pokharel), International Media Network Nepal Pvt. Ltd. 2016
৩। Ostravan (Editor: Ales Honus), Spolek Pro Kulturni Denik, Ostravan, cz, 2017
৪। Shakespeare Daily (Editor: Jerzego Limona) , The Gdansk Shakespeare Festival, 2017

লেখক : **শান্তনু দাস,** অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

থিয়েটারে অনুবাদের তত্ত্বায়ন

শুভঙ্কর ঘোষ রায় চৌধুরী

বহুদিন ধরেই, সারস্বত চর্চায় বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে পারফর্মেন্স ও অনুবাদ- এই দুটি খুঁটি। একে অন্যের সঙ্গে আলাপচারিতায় এরা তৈরি করছে জটিল একটি সম্পর্কের নানা অভিমুখ, যা নিয়ে তর্ক-বিতর্কও চলছে নিরন্তর। আপাতভাবে শব্দদুটি আলাদা আলাদা দুই জমির বাসিন্দা- যারা অহরহ মুখোমুখি হয় না; তবু বছরের পর বছর এরা এক আশ্চর্য সম্পৃক্ততায় জড়িয়েছে একে অপরকে।

সুসান বাস্নেট, আঁদ্রে লেফাভ্যের, ফিলিস জ্যাটলিন, লরেন্স ভেনুতি প্রমুখের সাহায্যেই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অনুবাদ বিষয়টি ক্রমশই সারস্বত চর্চার, গবেষণার, ও আলোচনার একটি বিশেষ দিক হিসেবে মান্যতা পায়। সারা বিশ্ব জুড়েই এক সময় উদযাপিত হয়েছিল অনুবাদের 'cultural turn'টি[1]-মূল লেখার সাহিত্যিকের ছত্রছায়ায়, গৌণ একটি সত্ত্বা নিয়ে বাঁচার যে ম্লানতা, তা থেকে অবশেষে বেরিয়ে এল অনুবাদ। অধিকন্তু, সে হয়ে উঠলো এক পারফর্মেন্স- দুই বা ততোধিক সংস্কৃতির মধ্যে যেন সংলাপ চলছে। উদ্দিষ্ট ভাষায় অর্থ বহন করে নিয়ে যাওয়া ও নির্দিষ্টতা বজায় রাখার যে প্রাক্তন দায়, সে সব পেরোতে শুরু করলো অনুবাদ। স্থান ও কালের প্রতি সে হয়ে উঠলো সংবেদী; পারফর্মেন্সের মতোই সে হল মৌহূর্তিক ; অনূদিত অর্থ বদলে যেতে থাকলো সংস্কৃতির ফারাকে।

অন্যদিকে, এই সময়ই পারফর্মেন্সের[2] সঙ্গে অনুবাদের অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত। যে মুহূর্তে অনুবাদ তার একনিষ্ঠ সাহিত্যধর্ম থেকে বেরিয়ে এসে এক ধরণের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের রূপ নিল, থিয়েটারে তার প্রভাব সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল। প্রথাগত নিয়ম মেনে দেখতে গেলে, থিয়েটারের আদি আসলে নাটক অর্থাৎ লিখিত যে সংলাপসমৃদ্ধ টেক্সটটি- যা খাতায় কলমে সাহিত্য বটে, এবং অনুবাদেও সে কারণে সাহিত্যসুলভ বিবেচনাই তার ভাগ্যে এককালে জুটত। অনুবাদের 'cultural turn'- এর ফলে নাটক তার ভাষাগত সীমাবদ্ধতা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, নাটকের অনুবাদ কি কেবল ভাষার নিরিখেই করা হবে? ভাষা ব্যতীত নাটকের অভিনয়ে যে শরীরী অভিব্যক্তি, তা তো ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির অংশও বটে। তাহলে নাটকের রূপান্তর কেবল ভাষাগত নয়, বরং সাংস্কৃতিকও; এবং এই সাংস্কৃতিক মঞ্চই নাটকের অনুবাদকে ভাষার একরৈখিক চলন থেকে বার করে এনে ফেলে লিখিতেরও অতীতে, পারফর্মেন্সে।

ঠিক যেভাবে অনুবাদের ক্ষেত্রে উঠে এসেছিল কথাটি, থিয়েটারের ক্ষেত্রেও জন্ম নিল 'performative turn'! সিলভিয়া বিলিয়াজি, পিটার কফ্লার ও পাওলা অ্যামব্রোসি তাঁদের Theatre Translation in Performance (২০১৩) বইতে উল্লেখ করেছিলেন

বিষয়টি। বিশেষত, বইটির মুখবন্ধে থিয়েটারের এই 'performative turn' - কে উল্লেখ করে বলা হয়, থিয়েটারের ভাষ্য এখন নাটকের ভাষ্যের চেয়ে ভিন্ন; নাটকের সাহিত্যধর্মের চেয়েও থিয়েটারকে আসলে পথ দেখায় পারফর্মেন্সের নন্দনতত্ত্ব।[3] তাঁদের বইতে বিলিয়াজি, কফ্লার ও অ্যামব্রোসি লিখছেন-

Emphasis has consequently been laid on the playfulness of the performance and on the creative and translation options deriving from it, including audience targeted relocation practives (Upton and Hale; Fernandes), issues of domestication and foreignisation, the duplication of writer and translator,,, transforming the translator into a cultural promoter ,,,, and blurring the boundaries between translation, version and adaptation within an all-comprehensive, yet fairly vague, category of cultural (re)creation of meaning(s).[4] 'টেক্সট', 'থিয়েটার, 'পারফর্মেন্স', 'কালচার', 'ট্রান্সলেশন'- শব্দগুলি সাধারণ ও বিশেষ, দুই অর্থেই, তাদের নতুন পরিচয়ে তৈরি করতে থাকলো এমন কিছু মুহূর্ত, যাদের উইলিয়াম ওয়ার্দেন বললেন " moment of undisciplined, interdisciplinary flux, euphoria, uncertainly, mystery, and doubt."[5]। পারফর্মেন্সের প্রশ্নে একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া থিয়েটার ও অনুবাদ খুলে দিতে থাকলো নতুন সব দিগন্ত।

আধুনিক পারফর্মেন্সের ইতিহাসের দিকে যদি একবার তাকানো যায়, এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ নিয়ে কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে খুব মতের ঐক্য দেখা যায়, এমন নয়। বরং বৈচিত্র্যেই ভরা এক একটি মত। যেমন, Theatrical Translation and Film Adaptation : A Practitioner's View (২০০৫) বইতে থিয়েটার- অনুবাদের এগিয়ে চলার পথে তিনটি মুহূর্তকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করছেন ফিলিস জ্যাটলিন। প্রথমেই তিনি লিখছেন রবার্ট করিগ্যানের কথা; করিগ্যানের ভাষায়, অনুবাদকদের বোঝা আবশ্যক যে থিয়েটারের অনুবাদ আর যে কোনও সাহিত্য অনুবাদ করার চেয়ে আলাদা একটি কাজ। এমনকি আরও এক ধাপ এগিয়ে করিগ্যান বলছেন, থিয়েটারে যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকলে অনুবাদকের পক্ষে এই সুক্ষ্ম ফারাক বোঝা মুশকিল- " Without such training the tendency will be to translate words and their meanings. This practice will never produce performable translations, and that is, after all, the purpose of doing the job in the first place."[6]। জ্যাটলিনের লেখায় আরও উঠে আসছে জর্জ ওয়েলওয়ার্থের কথা; ১৯৮১ সালে ওয়েলওয়ার্থ থিয়েটারের অনুবাদ বিষয়ে বলছেন, যদি অনুবাদের ভাষা জড় ও অস্বাভাবিক হয়, পাঠক কেন, দর্শকও সেই ভাষায় লিখিত সংলাপের প্রতি মনোযোগ দেবে না। আরও সম্প্রতি, ১৯৯৯ সালে রিক হাইট অভিনেতাদের সংস্পর্শে থাকার উপদেশ দিচ্ছেন অনুবাদকদের; বলছেন, মূল ও উদ্দিষ্ট- দুটি ভাষারই বাচন ভঙ্গিমায় যে বিশেষত্বগুলি আছে, তাদের উপস্থিতি অনুবাদে আবশ্যক। যদিও ভঙ্গিমা সরাসরি ভাষা-সম্বন্ধীয় নয়, তবু নাটকের অনুবাদে অভিব্যক্তি, আভ্যন্তরীণ ছন্দ, বা বাচিক প্যাটার্নের বিশেষত্ব অপরিসীম গুরুত্বের দাবি রাখে, এমনটাই হাইটের মত।

এর একটি বিকল্প অবস্থান অবশ্য পাওয়া যায় বিলিয়াজি, কফ্লার ও অ্যামব্রোসির বইতে। আবারও, বইটির মুখবন্ধে তাঁরা তুলে আনছেন গবেষণার একটি আঙ্গিক- ব্রিগিট শুল্ ট্জ্‌কে উল্লেখ করে, যিনি ১৯৮৭ সালে প্রথম সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন, আমাদের মূলধারার সারস্বত চর্চায় নাট্য-অনুবাদের তত্ত্বায়ন নিয়ে গবেষণায় খরার কথা। অবশ্য নাট্য-অনুবাদের এই পরিস্থিতি নিয়ে শুল্ট্‌জের আগেই সুসান বাস্নেট ১৯৮০ সাল নাগাদ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পরে, ১৯৯১ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "Translating for Theatre: The Case against Performability" - তে বাস্নেট লিখছেন, " [I]n the history of translation studies, less has been written on problems of translating theatre texts than on translating any other text type"[7] ওই প্রবন্ধেই নাট্য-অনুবাদের সঠিক তত্ত্বায়নের অভাবের দিকে নির্দেশ করে আরও বলছেন, "[m]ost of the existing literature on theatre translation consists of case studies of individual translations and translators, translators' prefaces or generalized remarks"[8]। বাস্নেটের প্রসঙ্গ উত্থাপন বিলিয়াজি, কফ্লার ও অ্যামব্রোসি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন জোসেফ চে সু'র প্রবন্ধ " Compounding Issue on Translation of Drama/Theatre Texts", যেখানে সুনির্দিষ্ট তত্ত্বায়ন ও সংজ্ঞার অনুপস্থিতিকে নাটকের অনুবাদচর্চায় বাধা হিসেবে দেখছেন। একেবারে সম্প্রতি ২০০৪ সালেও কিছুটা একই সুর পাওয়া যাচ্ছে নরবার্ট গ্রিনার ও অ্যানড্রু জেনকিন্সের কলমেও; অনুবাদ-জগৎ তখনও নাটকের অনুবাদের বিষয়ে কোনও " unitary, scientific approach"[9] খুঁজে পেতে অপারগ।

শুধু এটুকুই নয়; এই ইতিহাসচর্চার একটি তৃতীয় সূত্রও পাওয়া সম্ভব। আসুন, আমরা পিঅর কুহিজ্যাক ও কারিয়া লিটাও সম্পাদিত A Companion to Translation Studies বইটিতে চোখ রাখি। এই বইয়ের একটি পরিচ্ছেদ " Theatre and Opera Translation" লিখছেন মেরি স্নেল-হর্নবি। ১৯৭০- পরবর্তী সময়ে অনুবাদ চর্চা কিভাবে গতি পেয়েছে, উঠে আসছে সে কথা। ১৯৭০ নাগাদ- তখনও অনুবাদকে কেউ অত মান্যিগন্যি করেন না- শুরু হল নাট্য-অনুবাদের প্রথম ঢেউ, খুবই স্বল্প সংখ্যক অনুবাদক-বিদ্বজ্জনদের হাত ধরে। সেই প্রথম যা কিছু actable বা performable, তাকে অনুবাদে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হল, কারণ ততদিনে অভিনেতা ও নির্দেশকেরা এ কথা বলে বলে হন্যে, আসল যে বিষয়টি রিহার্সাল পেরিয়ে শেষ অব্দি গিয়ে অভিনীত হয়, তা মূল নাটকটি (যা পাঠকেরা বইতে দেখেন) থেকে বিস্তর আলাদা; তাকে মঞ্চে তোলার আগে বদলাতে হয় বহু জায়গায়। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে ল্যুভেনে অনুষ্ঠিত, Literature and Translation' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কলোকিয়ামে তাঁর বক্তৃতা "Translating spatial poetry : An examination of theatre texts in performance"- এ সুসান বাস্নেট নাটক সম্বন্ধে বলছেন, "much more than a literary text, it is a combination of language and gesture brought together in a harmonious frame of timing."[10] এরপর ১৯৮০ এবং ৯০-এর দশক জুড়ে ধীর গতিতে হলেও নাট্য-অনুবাদের ধারা ক্রমে আরও তত্ত্বধর্মী হয়ে উঠেছে; অনুবাদের

সময়ে নাটককে আর পাঁচটা সাহিত্য থেকে আলাদাভাবে দেখার বোধ জন্মেছে ক্রমে-মঞ্চ নির্দেশনা ও বাচিক সহযোগে নাটক যে মূলত একটি অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যম, সে বিষয়ে অনুবাদকেরা সতর্ক হয়েছেন অনেকেই। প্রত্যেক অনুবাদে না হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই প্রকট হয়ে উঠেছে উদ্দিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতিকে পাঠকের নীরব পাঠের সম্ভাবনার বাইরে দৃশ্য ও শ্রুতির সম্ভাবনায় অনুবাদকে মুখর করে তোলার প্রয়াস।

দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে অনুবাদচর্চার আনাচে কানাচে জমে থাকা এই তত্ত্ব -আলোচনা, বা অন্তর্দৃষ্টি - যাই বলি, আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়, ঘুরে ফিরে নিয়ে আসে নাট্য-অনুবাদের সেই বৈপরীত্যে ভরা মর্মস্থলে। এই বিশেষ অনুবাদচর্চায়, প্রাথমিকভাবে play-text ও theatre-text- এর মধ্যে ফারাক নির্ণয় করা আবশ্যক। সেটুকু কাজ সারলেও, তারপর অনুদিত হতে চলা একটি নাটকের মধ্যে সম্ভাবনার মতো জেগে থাকে দুটি পৃথক ভার্শন- পাঠক-কেন্দ্রিক, ও দর্শক-কেন্দ্রিক। বইয়ের পাতায় একটি বাঁধা থাকে ভাষার জালে; সে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, পড়ার সময় বড়জোর নিজের কল্পনা খাটিয়ে পাঠক অনুমান করতে পারেন তার মধ্যেকার অনিশ্চিত সম্ভাবনাগুলি। আবার সেই একই নাটক, অভিনীত হচ্ছে যখন, তখন নমনীয়; আগেকার অনিশ্চিত সম্ভাবনাগুলিকে এই মুহূর্তে রক্ত-মাংসে ছুঁয়ে ফেলা যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ-তত্ত্বে আরও নানা দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, এবং তার সঙ্গে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে নাট্য-অনুবাদ চর্চার একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুবাদের উৎস হিসেবে যতই মূল ভাষার play-textটি থাকুক না কেন, অনুবাদকের লক্ষ্য যেন হয়ে ওঠে উদ্দিষ্ট সংস্কৃতি play-textটি দৃশ্যমান করে তোলা।

জটিল সমস্ত তত্ত্বের এই জমিতে ক্রমশই পাঠক-কেন্দ্রিক নাট্য-অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠছে সারস্বত সমাজ; অনুবাদক, নাট্যকার, নাটক, থিয়েটার ও দর্শকের মধ্যেকার যে গভীর সম্পর্ক, চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না আর কারুরই, অনুবাদ পড়ার সময়। নাট্যকারের হাতে বন্দী থাকা এককালীন ক্ষমতা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে অভিনেতা, নির্দেশক ও দর্শকের হাতে; এমনকি বরাবরই আড়ালে থেকে যাওয়া অনুবাদকও থিয়েটারের ক্ষেত্রে আর ঠিক ততটা আড়ালে থাকছেন না। নাটকের ভাষাগত কাঠামো আর সর্বেসর্বা থাকছে না, বরং অনেকগুলি ছোট ছোট কাঠামোর একটি হয়ে উঠছে। সুসান বাস্নেটের ভাষায়, নাটক ও থিয়েটার হয়ে উঠেছে “indissolubly linked”[11] যে কোনও বিশুদ্ধতাবাদ ও কৌলীন্যকে দূরে সরিয়ে রেখে।

[1] সুসান বাস্নেট ও আঁদ্রে লেফাভ্যের তাঁদের বই Translation, History and Culture (১৯৯০)-এ প্রথম আলোচনা করেন ‘Cultural turn’ - এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে।

[2] ‘Performance’ বলতে এখানে নাটকের অভিনয়-সম্বন্ধীয় পারফর্মেন্সের কথাই বলা হচ্ছে কেবলমাত্র।

[3] অবশ্য থিয়েটারের এই ভাষাগত সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার কথা রিচার্ড

শেখনারও উল্লেখ করেন তাঁর Performance Studies: An Introduction বইতে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগ থেকেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন শেখনার- নাট্যকারের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসে থিয়েটার লড়াই করেছে তার ভবিষ্যতের জন্য : নাট্যকারের ঈশ্বরীয় জগদ্দল পাথর সে ভেঙে দিতে চেয়েছে পারফর্মেন্সের মৌহূর্তিকতায়।

[4] Silvia Bigliazzi, Peter Kofler, and Paola Ambrosi, in Introduction to Theatre Translation in Performance, eds. Silvia Bigliazzi, Peter Kofler, and Paola Ambrosi (New York : Routledge, 2013), 2.

[5] William B, Worthen, "Disciplines of the Text/Sits of Performace," The Drama Review 39, no.1(1995): 23.

[6] Robert W. Corrigan, "Translating for Actors", in W. Arrowsmith, and R. Shattuck, eds. The Craft & Context of Translation, (Austin : University of Texas Press, 1961), 100, cited in Phyllis Zatlin, Theatrical Translation and Film Adaptation, (Toronto : Multilingual Matters Ltd. 2005),2.

[7] Susan Bassnett, "Translating for the Theatre : A Case Against Performability", Languages and Culture in Translation Theories 4, no. 1(1991):: 99.

[8] Ibid., 105.

[9] Bigliazzi, Kofler and Ambrosi, Theatre Translation, 3.

[10] Susan Bassnett-McGuire, " Translating spatial poetry: An examnation of theatre texts in performance", in Literature and Translation : New Perspectives in Literary bStudies (Leuven: Acco, 1978), 161.

[11] Susan Bassnett, " Specific Problems of Literary Translation", in Translation Studies, 3rd ed. (New York : Routledge, 2002), 125.

গ্রন্থপঞ্জী

Bassnett, Susan, " Translating for the Theatre : A Case Against Performability", Language and Cultures in Translation Theories 4, no.1 (1991) : 99-111.

--Translation Studies. 3rd ed. New York: Routledge, 2002.

-- and Andre Lefevere, Eds, Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. Toronto : Multilingual Matters, 1998.

Bassnett-McGuire, Susan. Literature and Translation : New Perspectives in Literary Studies, Leuven: Acco, 1978.

Bigliazzi, Silvia, Peter Kofler, and Paola Ambrosi, eds, Theatre Translation in Performance. New York: Routledge, 2013.

Lefevere, Andre.ed. Translation History Culture: A Sourcebook, New York: Routledge, 1992.

Maclntyre, Alasdair, "Tradition and Translation". In Translation Studies, vol. 1, edited by Mona Baker, 198-214,USA: Routledge, 2009.

Schechner, Richard, Performance Studies: An Introduction, 3rd ed. New York: Routledge, 2013.

Venuti, Lawrence. The Scandals of Translation: Towards and Ethics of Difference, New York: Routledge, 1998.

Windle, Kevin. " The Translation of Drama," In The Oxford Handbook of Translation Studies, edited by Kirsten Malmkjaer, and Kevin Windle. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Worthen, William B. " Disciplines of the Text/ Sites of Performance." The Drama review 39, no. 1 (1995) : 13-28.

Young, Robert, "Translation, " In Translation Studies, vol.1 edited by

Mona Baker, 47-53,USA: Routledge, 2009.

Zatlin, Phyllis. Theatrical Translation and Film Adaptation. Toronto: Multilingual Matters Ltd,. 2005.

লেখক : **শুভংকর ঘোষ রায় চৌধুরী,** পশ্চিমবঙ্গের রায়দিঘি কলেজে ইংরেজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, কলকাতার 'অন্তর-রঙ্গ' নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কবি ও নাট্যকার।

মা তুই ডাইনি বটেক

প্রশান্ত সেনগুপ্ত

[**প্রাক কথন**- ডাইনি কথাটা মানুষের ক্রুর প্রতিহিংসা, স্বার্থান্বেষী মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। অশিক্ষা জন্ম দিয়েছে যাবতীয় কুসংস্কার। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডাইনি অপবাদে একজন বা একাধিক মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে, গলা কেটে, মাটি চাপা দিয়ে খুন করার অগুন্তি ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে দেশে, বিদেশে। অগ্রমান বলে কথিত ইউরোপেও এ ধরনের চরম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। আফ্রিকা মহাদেশ, মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও কম ঘটেনি এ ধরনের ঘটনা।

আমাদের দেশে অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন রাজ্যের অশিক্ষা ক্ষুধা জর্জর সমাজে ডাইনি অপবাদে, খুন জখম, বাড়ি ছাড়া করার বহু ঘটনা ঘটেছে শত শত বছর। আজও ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, আসাম ইত্যাদি রাজ্যে মূলত আদিবাসী অংশের মানুষের মধ্যে ডাইনি, ওঝা, ঝাড়ফুঁক, কালো বেড়াল, কুবাতাস ইত্যাদি চরম কুসংস্কার বাসা বেঁধে রয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় যারা এসবে বিশ্বাসী কিংবা মানেন তাদের মধ্যে অশিক্ষিত মানুষ যেমন আছেন তেমনিই শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও কম নয়।

আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতেও ডাইনি ভূতপ্রেত, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি কুসংস্কার একসময় জাঁকিয়ে বসেছিল। ডাইনি অপবাদ দিয়ে বহু নিরীহ বিশেষ করে মহিলাকে খুন করা হয়েছে। ভিটেছাড়া করে সেই ভিটে জবর দখল করার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে উপজাতি সমাজে এই অশুভ অন্ধ কুসংস্কার বেশি ছিল। সময়ের বিবর্তন ও সমগ্র শিক্ষা, সাক্ষরতা অভিযান, সামাজিক শিক্ষার দৌলতে মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তবুও একবারে শেষ হয়ে যায়নি। কিছুদিন আগে কমলপুর মহকুমার এক উপজাতি পল্লীতে সভ্যতা বিরোধী একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

কয়েকবছর আগে ডাইনি হত্যা সম্পর্কে একটা সমীক্ষা করেছিলাম। পুলিশের সহযোগিতায় ৮/১০টি ঘটনার খবর পেয়েছিলাম। ওইসব জায়গায় গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখানে যে ঘটনাটির উপর আলোকপাত করছি সেটি আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। কারণ এক ছেলে তার জন্মদাত্রী মাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে মৃতদেহ গুম করেছিল। সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ও স্বীকারোক্তি দেয়।]

সত্য ঘটনা অবলম্বনে ঃ ইচ্ছা করলে নাট্যরূপ দেওয়া যেতে পারে।

“মা তুই ডাইনি বটেক”

ঘটনাস্থল মোহনপুর মহকুমার আমগাছিয়া, ব্রজবিনোদিনীপুর মনতলা অধুনা নরেন্দ্রপুর চা বাগান সংলগ্ন। ২০০৯ সালের ঘটনা। সবেধন নীলমণি একটামাত্র পীচের রাস্তা আগরতলা থেকে মোহনপুর হয়ে সিমনাছড়া চা বাগান, কলোনি গিয়ে শেষ হয়েছে। মোহনপুর বাজার

পেরিয়ে রাস্তার ডানদিকে নরেন্দ্রপুর চা বাগান। বাঁদিকে কাঁটাতারের বেড়া। সঙ্গেই সিধাই থানা, এখন বি এস এফ ক্যাম্প। নরেন্দ্রপুর চা বাগানের ভেতর দিয়ে একটা সরু রাস্তা উত্তরদিকে চলে গেছে ব্রজবিনোদিনীপুরের দিকে।

চারিদিকে শুধু সবুজ। সবুজ সমুদ্র। ব্রজবিনোদিনীপুর বস্তি যাবার রাস্তার একদিকে চা বাগান। সারি সারি সবুজ চা গাছ। অন্যদিকে ধান জমি। আমি যখন যাই তখন ধানগাছগুলি বড়ো হয়ে গেছে। শিষ আসেনি। সবুজ। মুন্ডাবস্তি যাবার রাস্তাটি প্রচন্ড এবড়োখেবরো। তখন দুপুর। রাস্তায় লোকজন নেই। ধানক্ষেতে একজন আগাছা পরিস্কার করতে ব্যস্ত ছিলেন। ভানু মুন্ডার বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলে পশ্চিম দিকে একটা ছোট্ট টিলা জমির উপর কয়েকটি কুঁড়েঘর দেখিয়ে দিলেন। গেলাম সেখানে। আমাদের দেখে দুজন মহিলা ঘরের উঠোনে এলেন। ভানুমুন্ডার ঘর দেখিয়ে দিলেন।

ঘর মানে কুঁড়ে ঘর। প্রখর দুপুরে ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। একটাও জানালা নেই। বাঁশের একটা দরজা। ঘরে যেতে মাথা নুইয়ে ঢুকতে হয়। একটা বাঁশের মাচা। তার উপর কাঁথা জামাকাপড়। ওখানেই ঘুমাবার জায়গা। ওই দরজার পাশে একটা ছোট্ট বেড়ার ঘর। কাঁচা উনুন। হাঁড়ি পাতিল। জলের কলসি, লাকড়ি ইত্যাদি। বড় ঘরটি মাটির। উপরে পাতলা শনের ছাউনি।

বস্তিতে এ ধরনের ঘর আট-দশটি। গোটা আটেক পরিবারের বসতি। বৈদ্যুতিক আলো নেই। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। শৌচাগার নেই। কেবল নেই আর নেই। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কয়েক মাইল দূরে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল অনেক দূরে। তবুও নেই রাজ্যে মুন্ডা বস্তির মানুষ বেঁচে রয়েছেন। লড়াই করে। অস্তিত্ব রক্ষার জীবনপণ জেদ নিয়ে।

বস্তিতে পুরুষ মানুষ দুপুরবেলা ছিল না। যে যার কাজে সকালেই বেরিয়ে যায়। কেউ ইট ভাট্টায়, কেউ অন্যের জমিতে কাজ করেন। সেদিন ভানু মুন্ডার খোঁজ করতে দু'তিন জন মহিলা বেরিয়ে এলেন। তারা ওর আত্মীয়, বৌদি। মাঝারি গড়নের হাল্কা পাতলা একহারা কালো চেহারা। ছোট নাক মুখ, চোখ। ভাবলেশহীন।

ভানু মুন্ডা, তার মা পারুল মুন্ডার কথা জিজ্ঞেস করতে ওরা যা বললেন- ওরা বাংলা, জিলোসিলো অর্থাৎ চা বাগানের সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাং, বেনজোয়ার, কল, পাঁড়ে ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষায়। ওরা চা শ্রমিক। চা শ্রমিকদের একটা অংশ নানা কারণে চাবাগান ছেড়ে আশেপাশের এলাকায় বসতি গড়ে তুলে ও জন মজুরি করে।

আমার প্রশ্ন অনেকগুলি ওদের কাছে। ওদের জবাবগুলি লিপিবদ্ধ করছি।

আপনারা এই জায়গায় কবে কোন সালে এসেছেন?

জবাব- বলতে নাই পারব। হামরা জানি নাইখে।

প্রশ্ন - পারুল মুন্ডারা কবে এসেছিলেন-

জবাব- জানিনা গো বাবু। তোর কী দরকার আছে?

বললাম কাজের কথায় আসি কেমন? ভালো করে জবাব দেবে। ওদের বয়স চল্লিশের নিচেই হবে মনে হল। আমার কথা শুনে একজন অন্যজনকে কি ইশারা করে, একজন অন্যজনকে মৃদু ঠেলা দেয়।

কী হয়েছিল পারুল মুন্ডার, ছোটছেলে ভানু মুন্ডা কেন ওর মাকে এমনভাবে খুন করে মাটিতে পুঁতে দিল? বাবু আর বলবি না। ভানু বিয়া করে বউ আনল ওই তালতলা থাইক্যা। বউটার বয়স কম ছিল। কিন্তুক ফি বছর পোয়াতি হয় যাই। পেটেই মইরা যায় বাচ্চাগুলান। তো হামরা বললাম, শাশুড়িমাও বলল ডাকদরের কাছে যা, দাওয়াই খাওয়ন লাগব।

কিন্তুক, ভানুর মন ধরল না বাবু গো। ও শ্বশুর বাড়িসে বুদ্ধি লই আইল। এক ওঝা বুড়ার কাছে বউটাকে লিয়া গেল। ওঝাকে এক জোড়া মুরগা, শরাবপানি আর হাবিজাবি অনেক জিনিষ দিল। পরে ওয়ার বউটা হামদের বলল ডাইনির নজর পড়ছে। হামার পেটের বাচ্চাগুলান ডাইনি বুড়ি খাইয়া ফালাইছে গো। কিন্তুক ডাইনিটা কে বটে গো কিন্তু ওই লেড়কি বলল না গো। ওয়ার কুছ কুছ দিন বাদ সানঝে শুনলাম হামদের শাশুড়ি মাকে লিয়ে বাজার গেল ভানু।

সেদিন বিকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আকাশ কালো। ভানু তার মাকে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরের একটা বাজারে। হেঁটে যেতে যেতে ভানু মাকে বলল- আজ তুকে হাঁড়িয়া খাওয়াব। কেন রে বেটা? মা জিজ্ঞেস করল ভানুকে। ও বলল- আজ তলব হপ্তা পাইলুম যে। মা বললেন- ভানু মদ খাইয়ে ইমানের পইস্যা নষ্ট করিস না। চাল ডাল আনাজপাতি লিয়ে রাখ। বউটাকে কিছু কিনে দিস। ভানু বলল- না মা আজ তুই আর আমি বেজান হাঁড়িয়া খাব। মোর হাওস হইছে।

বাজারে গিয়ে টুকটাক জিনিস কিনে ভানু মায়ের হাতে গামছার পুঁটুলিটা দেয়। ওতেই জিনিষপত্র বেঁধেছে। তারপর মাকে নিয়ে গেল হাঁড়িয়ার দোকানে। নিজে খেলা কম মাকে বেশি করে খাওয়াল। খেয়ে মায়ের অবস্থা বেসমাল। ইতোমধ্যে আঁধার নেমেছে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। পারুল মুন্ডা বলল- বেটা, বেটা চল ঘর চল। রাস্তা ঠাহর করতে নাই পারছি। ভানু তার মাকে হাত ধরে আস্তে আস্তে চলল ঘরের পথে। ঘন অন্ধকার। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। কোথাও জনমানবের শব্দ নেই। ধান ক্ষেত, ঝোপঝাড়। জোনাকি জ্বলছে। ঘরের দিকে না গিয়ে ভানু অন্য পথ ধরে যাচ্ছে। মা বেসামাল। কিছুই বুঝতে পারছে না। এক সময় একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল ভানু। মা জিজ্ঞেস করলেন - বেটা ঘর কাঁহা? ঘরে আইলাম নি রে? জবাব না দিয়ে মাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল ভানু। মায়ের বুকের ওপর বসে গলা টিপে ধরল। বলল- মা তুই ডাইনি বটেক। তুই হামার বউ এর পেটের বাচ্চাগুলানের খুন খাইছস। আর পারবি না ? একটু পড়ে মা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে যায়। আগেই কোদাল দা সেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ভানু। ঠান্ডা মাথায় গর্ত খুঁড়ে মার দেহ রেখে মাটি চাপা দেয়। তারপর চুপচাপ ঘরে ফিরে যায়। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। অনেক পরে তার বড়ো দুই ভাই ডাকাডাকি করে ভানুকে। মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে। ভানু জানায় মা তার আগেই ফিরে এসেছে।

মায়ের বাড়ীতে না ফেরা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। উদ্বিগ্ন দাদা বৌদিরা। দাদারা ঠিক করল ওরা মাকে খুঁজতে যাবে। হারিকেন লাঠি হাতে রাতেই বেরিয়ে পড়ল। নিশ্চিদ্র অন্ধকার।

মেঘলা আকাশে তারার চিহ্ন নেই। অনেক সময় ধরে এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করল। পরিচিত দুজনের বাড়িও গেল যদি মা সেখানে থাকে। না। কোথাও নেই। দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হয়ে বাড়ি ফিরল। পরদিন ভোর হতেই ফের খোঁজাখুঁজি। সকালে কয়েকজন এসে পারুল মুন্ডার নিরুদ্দেশের খবর পেয়ে বাড়ি এলেন। থানায় জানাতে পরামর্শ দিলেন।

থানায় দাদারা গেল। ভানু যায়নি। শরীর খারাপ দাস্ত হয়েছে। মামলা লিপিবদ্ধ করা হল। সন্দেহের তালিকায় তাকে রাখা হয় প্রথম থেকে। কারণ শেষদিন তার সঙ্গেই দেখা কথাবার্তা হয়েছিল। তার আচরণ কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ছিল। দাদারাও ওকে সন্দেহের চোখে দেখছিল। বিষয়টি পুলিশও জেনে যায়। পারুল মুন্ডা নিরুদ্দেশ হন ১৭ তারিখ রাতে। তার কয়েকদিন পর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ভানুকে। পুলিশের টানাজেরায় একসময় ভেঙে পড়ে। শেষে মাতৃহত্যার অপরাধ কবুল করে। কারণটাও জানায়। কেন কিভাবে খুন ও মৃতদেহ লোপাট করেছে তার স্বীকারোক্তি দেয়। অবশেষে ৩১ তারিখ ভানুর দেখানো জায়গা থেকে তার মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ভানুকে। তদন্ত শেষে চার্জশীট দাখিল করে।

অত:পর কী হল? বউকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে একদিন অজানা ঠিকানায় চলে যায় ভানু। কয়েক বছর পর তাদের খবর পায় দাদারা। তখনো নি:সন্তান তারা। সন্তানের মুখ দেখতে পায়নি ভানু। ওঝার অসৎ পরামর্শে নিজে জন্মদায়িনী মাকে গলাটিপে খুন করে দেহ লোপাট করেও কোনো উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

উপসংহার - অন্ধ কুসংস্কার কিভাবে মানুষকে উন্মাদ করে দেয় তারই একটা জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ এই মর্মন্তুদ ঘটনা। কুসংস্কার, অন্ধ অলৌকিক বিশ্বাস আজও বহাল তবিয়তে রয়েছে আমাদের সমাজে। এর প্রধান কারণ অশিক্ষা কুশিক্ষা। তুক্‌তাক, ঝাড়ফুঁক, জলপড়া, তাবিজ মাদুলি, পাথর, হস্ত বিচার ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকেই চলছে। আজও এসব বিদ্যমান। যখন দেখি বহু ডিগ্রীধারী শিক্ষিত মানুষও এসবে বিশ্বাসী তখন সত্যি দুঃখ হয়। বিজ্ঞান, যুক্তি তাদের কাছে মূল্যহীন কেন? কেন চটজলদি ম্যাজিক চায় নিজের স্বার্থসিদ্ধি জন্য। কেন রোগ নিরাময়ে চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে ওঝার কাছে যায় একধরনের মানুষ? এটা কী সামাজিক সুষ্ঠু বিকাশের পথে অন্তরায় নয়? সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকট হয় শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য থেকে। দেখেছি সম্পত্তি গ্রাস করার লোভে সুস্থ মানুষকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়। এমনকি এরকম ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকে।

সুতরাং ডাইনি নিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষাকালে যেসব ঘটনা দেখেছি, জেনেছি, শুনেছি তার একটিকে উপজীব্য করেই এই প্রতিবেদনটি তৈরি করলাম। একে ভিত্তি করে একটা নাটক তৈরি করা যেতে পারে বলে আমার ধারণা।

লেখক : **প্রশান্ত সেনগুপ্ত**, রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গল্পকার ।

বিষয় লোকনাটক ও থিয়েটার সম্পর্কের সূত্র সন্ধান

নির্মল দাশ

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা-পর্যালোচনায় নাট্যসাহিত্য ব্রাত্য এক ভুবন। মূলত ছোট গল্প - উপন্যাসকে ঘিরেই যেন মানুষের তাবৎ চর্চা, লিটল ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে বড়ো মাপের সাহিত্য পত্রিকা, কোনও কিছুতেই নাট্য-সম্পর্কিত বয়ান নির্মিতি তথা পর্যালোচনার প্রতি উপেক্ষা, অত্যন্ত বিস্ময়কর। নাটকের যে সাহিত্যস্বরূপ, তা যেমন বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণের দাবি রাখে, তেমনি সাহিত্যের কোনও উপাদানকে নাট্যরূপে জীবন্ত স্বরূপে বোদ্ধাদের সামনে উপস্থাপন করা এবং চেতনা প্রবাহে তাকে প্রবিষ্ট করিয়ে দেবার বিষয়টি যে নাটকই সাধিত করতে সক্ষম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কথাসাহিত্য সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষে, কিন্তু মঞ্চে উপস্থাপিত নাটক সেসবের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। উপস্থাপিত নাটক দর্শকের চিত্তভূমে সরাসরি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আবার পাঠ্য-উপাদান হিসেবে নাটকের প্রতি যে উপেক্ষা রয়েছে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন পড়ে না। পক্ষান্তরে, তা মঞ্চে উপস্থাপিত হলে, তার আবেদন হয়ে পড়ে সর্বজনীন।

নাটকের অতীতের দিকে একবার মুখ ফেরাতেই হয়। ঋগবেদেও রয়েছে নাটকের প্রসঙ্গ। পণ্ডিতাচার্য সুকুমার সেন দেখাচ্ছেন, সেখানে রয়েছে "নৃতু" শব্দটি । এর অর্থ হল, " বীরকর্মা, কমিষ্ঠ, অদ্ভুতকর্মা, শোভনবেশধারী, এবং শেষ অর্থ হইবে নর্তক-নতর্কী"। (সেন, ২০১৮ ১৬৬) ঋগবেদের যুগ পেরিয়ে এসে নাটক বহু পথ অতিক্রম করেছে। একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত নাটক ছিল মানুষের প্রাণের সম্পদ, অথচ, এখন তা জীর্ণ স্রোতধারা। বেদের স্তোত্র রচয়িতারা প্রথম ভাগে জীবনের বিচিত্র কথাই রূপকের আড়ালে বলে যাচ্ছিলেন। যেখানে নাট্যবীজের সন্ধান মেলে। তারপর সমস্যার সূত্র সন্ধান করতে করতে তারা প্রবেশ করে গেলেন অধ্যাত্মভাব ও ভাবনার জগতে। ফলে, বাস্তবতা এবং লোকজীবনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি ঘটল তাদের। কিন্তু জনমণ্ডলী তাদের মনের সম্পদকে ফেলে দিতে পারে নি। বরং চিত্ততুষ্টির উপকরণগুলো ক্রমশ পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে। চিত্ততৃপ্তির তাবৎ উপকরণের মধ্যে নাটক অন্যতম।

খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ কালেও আমাদের দেশে নাট্যচর্চা হত, আর বিষয়টি, পণ্ডিতপ্রবর ভরতাচার্যকে আলোড়িত করেছিল। তিনি এই বিষয়ে উদ্দীপিত হয়ে নাটক -সম্পর্কিত মহামূল্যবান একটি গ্রন্থও লিখে ফেলেছিলেন। তিনি সময়ের দাবিকে মান্যতা দিয়েছেন। জাতকের কাহিনিতে দেখি, বুদ্ধদেব শৈশবে নাট্যরস আস্বাদন করেছিলেন। বাঙালি জাতি এককালে বৌদ্ধধর্মে ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছিল। চর্যাপদের কবিদের অনেকেই বঙ্গদেশে

জন্মেছিলেন। চর্যার কবি লিখেছেন 'বুদ্ধনাটক বিষম হোই"। আবার তেরো নম্বর চর্যাগানে দেখি, কবি লিখেছেন, 'তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় এড্ডা"— তোমার জন্য আমি নটপেটিকা ত্যাগ করিলাম। এখানে ধর্মভাবনার সংযুক্তিকরণ লক্ষ্যণীয়। ধর্মনিরপেক্ষ লোকনাটকের জন্ম হয়েছিল তার অনেক পরে।

স্পষ্টতই, আমরা বঙ্গের লোকনাটক-সম্পর্কিত আলোচনার জগতে চলে এসেছি। ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ- দু'ধারার লোকনাটকই নির্বিশেষে আলোচ্য এখানে। অনেক আগেই এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানা মতামত ব্যক্ত করেছেন। লোকনাটকের আলোচনায় তাঁরা গ্রামকেই করেছেন মধ্যমণি। যারা হবেন লোকনাটকের কুশীলব, তারা হবেন একেবারেই গ্রামীণ মানুষ। পরিবেশও হবে গ্রামীণ, এবং সেগুলো উপস্থাপিত হবে গ্রামীণ পরিমণ্ডলে। ফলে কৃত্রিমতা এখানে কোনওভাবেই প্রবেশের সুযোগ পায় না। যারা দর্শক, তারাও গ্রামের বাসিন্দা। তারাই পরিবেশক এবং তারাই ভোক্তা এই লোকনাটকের। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যেসব বিষয় নিয়ে লোকনাটকের কাহিনি নির্মিত হচ্ছে, তা গ্রামীণ পরিবেশে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা। কুশীলবেরা দরিদ্র, অর্ধশিক্ষিত, না-শিক্ষিত মানুষ। শ্রমজীবী, ক্ষেতমজুর, রিকশাচালক, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করে বেঁচে থাকা এসব সাধারণ মানুষেরাই এর অভিনেতা, দর্শক, পৃষ্ঠপোষক।

নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, অথচ সাজসজ্জার বালাই নেই, নারীরাই পুরুষ সেজে অভিনয় করে যাচ্ছে। আবার পুরুষেরা যখন স্বাভাবিক পোষাকেই অভিনয় করছে, তখন নারীর ভূমিকায় যারা, তারা, নারী বুঝাতে গেলে যেটুকু সাজের প্রয়োজন, সেটুকু সেজে নিচ্ছে। কৃত্রিমতা সেখানে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না। আবার পোশাক পরিবর্তন করার জন্যও নেই কোনো সাজঘরের ব্যবস্থা। সমবেত দর্শকের পিছনে গিয়ে অভিনেতা তার সাজ পরিবর্তন করে নিচ্ছে। উপস্থাপনার সামগ্রিকতায় বাস্তবতা আশ্চর্য ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। সমবেত দর্শকদের মাঝখানে কিছুটা জায়গাকে কুশীলবেরা আর বাজনাদারেরা ঘেরাও করে রেখেছে। এখান থেকে উঠে তারা অভিনয়ে অংশ নিচ্ছে। একালের নাটকের সঙ্গে একে কোনোভাবেই মেলানো যাচ্ছে না।

কী অভিনয় করছে তারা? উত্তরে বলা যায়, লোকজীবনেরই কোনো ঘটনা যা গত এক বছরে ঘটেছে, যা জনজীবনকে আলোড়িত করেছিল, তাকেই নাট্য উপাদান করে তোলা হয়েছে। গ্রামীণ জীবনে এমন কত ঘটনাই তো ঘটে। সেই বছরের প্রণয়মূলক ঘটনা বা চাঞ্চল্যকর কোনও ঘটনাকে অবলম্বন করে মুখে মুখে গান বানায়; আবার তা-ই নাট্যকাহিনিতে, সঙ্গীতে, সংলাপে, নৃত্যে রূপ পায়। সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটির কথা পণ্ডিতেরা জানালেন তা হল তাৎক্ষণিক ভাবে (Extempore) উপস্থাপিত হবে লোকনাটক। এই অবস্থাতেও কাহিনির উত্থান-পতন পরিণতিও যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার কাহিনির ধারাবাহিকতাও যে থাকতে হবে, এমন কথা নেই। তাই একে নাটক সংজ্ঞায়িত না করে, বলা হচ্ছে লোকনাটক। এ'বছর যে সব গান, নাচ, সংলাপ মানুষ দেখলেন, শুনলেন, পরের বছর সেগুলোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকনাটকের উপরোক্ত শর্তাদি যথেষ্ট দৃঢ়।

লোকনাটকের গণ্ডিকে এই বিচারে সংকীর্ণ করে ফেলা হয়। উপরোক্ত শর্তাদি অনুসারে, “খন, পালাটিয়া এবং রঙ পাচাল” মাত্র এই তিনটি শ্রেণীকেই লোকনাটকের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণা তো থেমে থাকে না। তাই উক্ত বন্ধনের গণ্ডি ভেঙ্গে আমরা আরও সামনে এগিয়ে গেছি। লোকনাটককে আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখার চেষ্টা গৃহীত হয়েছে। যারা রসগ্রহীতা, তারা গ্রামীণ মানুষ। তারা নিজেরাই আনন্দের নানা উপকরণ আবিষ্কার করে নিয়েছে, যার মধ্যে লোকনাটক অন্যতম। আলকাপ, বিষহরা, গম্ভীরা, লেটো, ভাঁড়যাত্রা, ডোমনি, চোর-চুরনি পালা, মৈষাল বন্ধুর পালা, খন, কুশান, বনবিবির পালা—এমনই বিচিত্র সব লোকনাটকের চল রয়েছে গোটা বঙ্গভূমি জুড়ে। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন- “ কারো কারো মতে পাঁচালি থেকে যাত্রা বা বাঙলা লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে” (ঘোষ, ২০০০, ১৪) । আরো লিখেছেন: মঙ্গলগানের মধ্যেও লোকনাট্যের সন্ধান করা যেতে পারে (তদেব)। আমরা স্পষ্টতই লক্ষ্য করছি, লোকনাটক এবং যাত্রা আদিতে ছিল অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক ঘোষ তাঁর আলোচনায় এই দুইয়ের কোনো প্রভেদ সূচিত করেননি। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, লোকনাটক থেকে সরে এসে যাত্রা স্বতন্ত্র পথে হাঁটতে শুরু করেছে। কিন্তু শিকড়ের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। সুনির্দিষ্ট করে জানানো হয়েছে, চৈতন্যদেবের ঘরে চন্দ্রশেখর পালা রচনা করেছিলেন। এই পালাই প্রথম যাত্রাপালা। এগিয়ে চলতে চলতে যাত্রা অন্তর্কাঠামোতে নানা পরিবর্তন সংশোধিত হয়েছে। নগর সংস্কৃতির প্রভাবে যাত্রাপালার কী পরিণতি হয়েছে, তা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু লোকনাটকের বিষয়টি আলাদা। স্বতস্ফূর্ততাই এর প্রাণ। ফলে সুদীর্ঘকাল ধরে লোকনাটক নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারছে। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষের লেখা থেকে আরো দু’এক পংক্তি নেওয়া যেতে পারে।

> “ সম্ভবত সেই লোকধর্মী অভিনয় প্রাকৃত ভাষা আশ্রয় করে লোক পরম্পরায় স্মৃতিবাহিত ধারায় চলে এসেছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা উদ্ভবের পরে সেই ভাষার মাধ্যমে লোকনাট্য বা যাত্রা রূপে লোকরঞ্জন করে এসেছে” (তদেব)।

লোকনাটকের কাছে আবার ফিরে আসতে গিয়ে, আলকাপ, গম্ভীরা, লেটো প্রভৃতি নানা লোকনাট্যের সামান্য পরিচিতি প্রদান বাঞ্ছনীয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকনাটক আজও অভিনীত হয়। আলকাপ যখন মুর্শিদাবাদে আধিপত্য করছে, গম্ভীরা তখন মালদহের মানুষকে আনন্দ দান করে চলেছে। আবার মেদিনীপুরের মানুষ উপভোগ করে চলেছে ভাঁড়যাত্রা। দক্ষিণ-উত্তর চব্বিশ পরগণার মানুষ বনবিবির পালা দেখছে শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়। লোকনাটকগুলো উল্লিখিত অঞ্চলেই যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, তাই নয়; তা সীমানার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ, স্থানিক বন্ধনটির সেই অর্থে দৃঢ় নয়।

‘আলকাপ’ সম্পর্কে গবেষকেরা চমৎকার তথ্য দিয়েছেন। একেবারে শুরুতে আলকাপের অভিনয়ের সময় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাজানো হয়েছে হাঁড়ি-থালা-বাসন। আর আসর বসে যাচ্ছে ফাঁকা মাঠে। মাঝখানে সামান্য উঁচু করে বানানো হচ্ছে একটি মঞ্চ। মাথার উপরে পাটকাঠি বা খড় দিয়ে কোনোমতে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে মঞ্চকে। দর্শকদের

মাথার উপরেও তাই। অভিনয়ের বন্দনা অংশে যখন দেবদেবীর বন্দনা রয়েছে, তেমনি নাট্যাভিনয়ের অংশ হিসেবে তারপরে পরেই নাট্যাকারে উপস্থাপিত হচ্ছে কোনো না কোনো পূর্বে ঘটে যাওয়া বিষয়।

আলকাপ-এ 'আল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, "কন্টক, সীমানা, কীলক, হুল"। 'কাপ' হচ্ছে "কৌতুককারী, ছদ্মবেশী, তামাসা, সং"। সীমাহীন হাসি, তামাসা, অসংখ্য রঙ্গরসিকতায় মোড়া এই আলকাপ। বলদ বা মোষকে আল বা Pivot বসানো লাঠিতে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ঠিক পথে চালনা করতে হয়। তেমনি আলকাপের মাধ্যমে ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতি অসামঞ্জস্যকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেওয়া হয়। যাতে সমাজের অসঙ্গতি দূর হয়, সেই বিষয়কে মানুষকে, শাসককে সচেতন করার দায়িত্ব যেন আলকাপই বহন করে। এই দিক দিয়ে লোকনাটকের সঙ্গে যাত্রা বা থিয়েটারের অন্তর্নিহিত একটি সাদৃশ্য রয়েছে। বলা প্রয়োজন, সময়ের পরিবর্তনের হাওয়া সেখানেও লেগেছে। লোকনাটকের কাঠামো ঠিক থাকছে, কিন্তু নাগরিক সংস্কৃতির উপাদানও স্থান করে নিচ্ছে। একথাও সত্য যে, এই লোকনাটকের "পূজা-উৎসব, অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ" স্বরূপটিও কিন্তু এখানে প্রকাশ পেয়ে যায়।

কোচবিহার অঞ্চলে অভিনীত হতে দেখা যায় 'কুশান' ও 'দোতরা'। 'দোতরা'র রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ একটি রূপ, তখন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে অভিনীত হয় এই লোকনাটক। কুশান পালায় অলৌকিক বিশ্বাসের একটি জায়গা রয়েছে। কিন্তু দোতরা গানের বিষয়বস্তু লোককাহিনি-লোককথা, প্রবাদ বা সাধারণ কোনো কেচ্ছা-কাহিনি নিয়ে আবর্তিত হয়। কুশান পালার সঙ্গে বিষহরা পালার একটা সম্পর্কের দিক রয়েছে। উত্তর জনজীবনে দেবী মনসার পূজার ব্যাপক প্রচলন, লোকজীবনে মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তার কারণেই আলাদা করে বিষহরা বা বিষরী পালার প্রবল আধিপত্য লক্ষ্য করি আমরা। সতী বেহুলার হৃদয় যন্ত্রণা স্পর্শ করে সাধারণের অন্তর। বেহুলার কান্না আজও মানুষকে কাঁদায়। পালায় স্থানীয় ভাষার ব্যবহারের ফরে মানুষ আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়। জনসংযোগের এটাও একটি অন্যতম শর্ত।

লোকনাটক হিসেবে 'লেটো' যথেষ্ট জনপ্রিয়। বর্ধমান- বীরভূম- হুগলি- হাওড়া-মেদিনীপুর- মুর্শিদাবাদ-নদীয়া জুড়ে এর বিস্তৃতি। সারা রাত ধরে মানুষ লেটো গান শোনে তথা উপভোগ করে । অন্যান্য লোকনাটকের ক্ষেত্রেও তা সমান সত্য। মানুষ লেটো শোনে এমন নয় বরং একই সঙ্গে মেলাতেও অংশ গ্রহণ করে। গ্রামের বড়োলোক বা জমিদার শ্রেণির মানুষ এই মেলার আয়োজন করে। বৈষ্ণব সাধক বা পীরের স্মরণোৎসব উপলক্ষে বসে মেলা। হয়তো খালি শুকনো ধানজমি। সেখানেই মেলার আয়োজন হয়। কুশীলবদের মেডেল দেবার ব্যবস্থা থাকে। আর আসরের ওপরে ঝোলানো থাকে "কাংনি জিলাপি"। দু'দলের লেটো গান হয় মঞ্চে। থাকে অস্থায়ী সাজঘরও। বন্দনা গানে অংশ নেয় নারীবেশধারী কোনো কিশোর বা যুবক। যাকে বলা হয় সখি, বাই বা ছোকরা। আর দলে থাকে ভাঁড়। যাকে দেখামাত্রই শ্রোতারা হয় উল্লসিত। দলে বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য

থাকে নির্দিষ্ট কিছু শিল্পী। এদের মধ্যে কোনো ছেলে হয়তো মেয়ে সেজে নাচবে, কেউ বা রাজা সাজবে, কেউ হবে সেনাপতি অথবা খল। এরা জনগণের কাছে বেশ পরিচিতি পেয়েও যায়। আর অভিনেতারা মাটি থেকে উঠে আসা মানুষ। শ্রমিক, চাষি, রাখাল, কখনো কখনো ভদ্র ঘরের দু'একজন কিশোর-যুবক। এদের অধিকাংশই নিরক্ষর। লেটো গানে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের উপস্থিতিই বেশি করে চোখে পড়ে।

গম্ভীরায় শিব ঠাকুর জড়িয়ে রয়েছেন বেশি করে। সুদূর অতীতে শৈব ধর্মধারা আমাদের দেশে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কত বিচিত্র উপদান যে এই ধর্মধারাকে যে পুষ্ট করেছে, তা ভেবে পণ্ডিতেরা বিস্মিত হন। বামনগোলা থানার অন্তর্গত জগদলা অঞ্চলে গম্ভীরা লোকনাট্যের অঙ্গ হিসেবে মড়ার মাথার খুলি নিয়ে নৃত্য করা হয়। এখানে আদিম ধর্মানুষ্ঠান, তন্ত্রের প্রভাব যে জড়িয়ে রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। আবার ধর্ম ঠাকুরের সঙ্গে গম্ভীরার সম্পর্কের কথাও জানা যায়।

মালদহ তৎসংলগ্ন নানা অঞ্চলে গম্ভীরা আজও পালিত হয়ে চলেছে। গম্ভীরার সঙ্গে গীত অপরিহার্য। নিম্নবর্গের হিন্দু, আদিবাসী জনসম্প্রদায়, নাগর-ধানুক রাজবংশীরা গম্ভীরার পূজক সম্প্রদায়। গম্ভীরা কেন্দ্রিক যে পালাগান হয় তা একদিকে যেমন ধর্মসম্পৃক্ত অন্যদিকে জনচিত্তের আনন্দবর্ধক। গম্ভীরা উপস্থাপনের ছক রয়েছে। সেখানে শিবের উপস্থিতি লোকনাটকটির আবশ্যিক অঙ্গ। শিবকে একবার হাজির করানো হয়। তারপর শুরু হয় গম্ভীরা পালা। ভাষা সমস্যা, ইংরেজি শিক্ষার কুফল, দেশের রাজনৈতিক দলাদলি'র বিষয়গুলো এই লোকনাটকে উপস্থাপিত হয়। এখানে দৃশ্যপট নেই। রয়েছে বীর আর রৌদ্ররসের আধিক্য। আর রয়েছে স্থূল হাস্যরসে ভাড়ামি প্রদর্শন। বিষয় চয়ন এবং উপস্থাপনের সুবাদে গড়ে ওঠে লোক-সংযোগ। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

আশ্চর্য এটাই, ধর্মীয় অনুসঙ্গযুক্ত থাকলেও নাটকগুলোতে যা পরিবেশিত হয়, সেখানে মানুষের জীবনের কথাই নানাভাবে ব্যক্ত হয়। যারা অভিনয় করেছেন, তারা সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষ। যারা দর্শক তারাও একই শ্রেণীভুক্ত ।

শিবের বিয়ে মাস তথা চৈত্রমাসে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমানে 'বোলান' নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন শিবঠাকুর। পৌরাণিক বিষয়,যথা মেঘনাদবধ, রাবণ বধ, তরণীসেন বধ, লক্ষণের শক্তিশেল বা অভিমন্যু বধ প্রভৃতি পালা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য, বোলান বা আরো আরো লোকনাটকগুলো থেকে মানুষ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। এসব লোকনাটকগুলোর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য অভাবিত ও বিস্ময়কর। ঠাকুর দেবতা তথা ধর্মসম্পৃক্তি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

লোকনাটকের সঙ্গে সমান্তরালভাবে লোকনৃত্যও যে মিশে রয়েছে, তা খুব সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। অভিনেতারাই হয়তো নৃত্য করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করছে অথবা মঞ্চে শিবঠাকুর প্রবেশ করে নৃত্যরত হচ্ছে। তারই সঙ্গে নাচের তালে তালে বাজনা বেজে

চলেছে। বাঙালির জীবনে মননে শিবের আধিপত্য বিস্ময়কর। লোকনাটকে এই বিষয়টি মূল্যবান। এই নাচ ব্যাপক অনুশীলনের ফসল নয়, আবার এসব নাচ গুরুমুখীও নয়। লোকশিল্পী, যিনি অভিনয় করেন, তিনিই নাচলেন। একেবারে জলমাটি ছুঁয়ে থাকা নাচ, শিল্পীর মধ্য দিয়েই ঘটে তার সহজ প্রকাশ।

লোকনাটককে বিচ্ছিন্ন করেও দেখা যেতে পারে। তবু লোনাটকের সঙ্গে একই মঞ্চে একই নামেই চিহ্নিত হয় সে নাচ। উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙালিদের জনপ্রিয় নৃত্য হচ্ছে 'ধামাইল'। কৃষি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা। আবার বিবাহের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গেও এই নাচ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। নাচের সঙ্গে গান জড়িয়ে রয়েছে। এদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চড়ক-পার্বণের সঙ্গে যুক্ত, ঢাকের বাদ্য সহযোগে নাচ আর কালী নাচ তো ত্রিপুরার একেবারে নিজস্ব নাচ। এগুলোকে এখানকার কোন কোন নাট্যসংস্থা, যেমন ত্রিপুরা থিয়েটার' বা বাঙলাদেশের কোন নাট্যসংস্থা তাঁদের নাটকের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন। এতে নাটকে লৌকিক মাত্রা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

যাত্রাপালা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগুলেও একসময় থেমে গেছে এর গতি। যখন বিলিতি- থিয়েটার এসে আসর জাকিয়ে বসেছে, তখন মানুষ নতুন ধরনের এই উপস্থাপনাকে গ্রহণ করেছিল। তবে দর্শক কিন্তু আর নির্বিশেষ রইল না। বরং থিয়েটারের উপভোগ করা যেন আভিজাত্যকে উপভোগের সামিল হলো। তবু নাটক যে শক্তিশালী মাধ্যম তা আমাদের গুণী লেখকেরা বুঝতে পেরেছিলেন। একদিকে নাটক নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তা হতে আরম্ভ হয়ে গেছিল, তেমনি নাটক হয়ে উঠেছিল মানুষকে সচেতন করে তোলার হাতিয়ার স্বরূপ। লোকনাটক ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকল, কিন্তু লোক নাটকের আকর্ষণী শক্তি, তথা অভিনেতা ও দর্শকদের সমান সক্রিয়তার দিকটি কিন্তু নাট্য পণ্ডিতেরা অনুভব করেছিলেন। সূচনা থেকেই থিয়েটার ছিল আভিজাত্যে মোড়া। এর জন্য শিক্ষিত মনটির গুরুত্ব রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। তবু এটা যে সাহিত্যস্রষ্টারা কিন্তু জনমণ্ডলীর কথা বিস্মৃত হতে পারেন নি।

এককালে দীনবন্ধু মিত্র "নীলদর্পণ" নাটক লিখেছিলেন। নাট্যকার যাদের কথা লিখলেন, তারা লোকবৃত্তের মানুষ। তাদেরই দুঃখ দুর্দশার চিত্রটি নাটকে এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, নাটক এবং বাস্তবের ভেদরেখাটি মুছে গেছে। নিজেদের দুঃখ দুর্দশা নুতন আদলে দেখার জন্য মানুষের ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠেছে। ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সেটি। ভিতরে ভিতরে মানুষ সেটি থেকে কিছু শিক্ষা, কিছু প্রেরণাও লাভ করেছে। নাট্যকারকে ছাপিয়ে তা মানুষের সম্পদে পরিণত হয়েছে। তবু তা লোকনাটক নয়। এখানে দীনবন্ধু মিত্রের ঔজ্জ্বল্য অক্ষুন্ন থেকেছে। এটা নাট্য রচনার একটা সূত্রও বটে। কিন্তু যে উপাদান নিয়ে রচিত হয়েছে নীলদর্পণ, তেমন উপাদান সবসময় পেয়ে যাওয়াটা সহজে ঘটে না। দীনবন্ধু মিত্র মানুষের প্রতি নীলসাহেবদের সীমাহীন অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। লেখক-নাট্যকার সত্য ঘটনাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নাট্যমাধ্যম একালে যেমন শক্তিশালী, সেকালের ক্ষেত্রেও কিন্তু কথাটি

সমান সত্য। এখানে গ্রহণযোগ্যতার দিকটির কথাই বলা গেল।

নবীন স্বরূপে আবির্ভূত এই মাধ্যমটিকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা আজও চলেছে। আমাদের কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথও প্রচুর নাটক লিখেছেন। মাধ্যমটি তাঁর বেশ পছন্দের ছিল। ফলে নাটক নিয়ে তিনি অবিরাম পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' গ্রন্থে 'শারদোৎসব' নাটকের আলোচনায় অধ্যাপক প্রমথনাশ বিশী মশায় লিখেছেন, " ... প্রকৃতি ইহাতে মুখ্য হইয়া উঠিয়া মানুষের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চকে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে" (বিশী, ১৩৬৭,২০১)। আর সেখানে জনতাকে মঞ্চে হাজির করিয়েছেন ব্যাপকভাবে। রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ মানুষেরা বেশ ভীড় জমায়। এরা লোকবৃত্তের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে এদের ঠাঁই দিয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন-

"মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন আমরা গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো বড়ো হয়ে ওঠে" (ঘোষ, ১৯৭৬,৩৯০)।

রবীন্দ্র নাটক আলোচনায় সমালোচকেরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের দিকটিকে লক্ষ্যই করেননি। নাটকে দেখি, অভিজিৎ কিংবা পঞ্চক হৃদয়ে আনন্দ নৃত্য অনুভব করছে। 'ঠাকুরদা' চরিত্রটি এখানে এসে যেন জুড়ে গেছে, এমনই মনে হয়। আবার তার ছেলের দল আনন্দনৃত্যে মগ্ন। এমন ভাবনাই এসে যায় যেন চরিত্রগুলো নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। অথচ, এরা যে লোকবৃত্তের মানুষ, একথা ভুলে গেলে চলে না। লোকজগতের সঙ্গে নাটককে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত করার কথাই ভাবছেন কবি।

'অচলায়তন' নাটকে তো রবীন্দ্রনাথ অর্থহীন সংস্কার, অযৌক্তিক আচার ও প্রথার তীব্র নিন্দায় মুখরিত হয়েছেন। নাটকে জড়শক্তির পরাজয় এবং প্রাণশক্তির বিজয় ঘোষিত হয়েছে। এই সত্যটুকুকেই আমরা বার বার আলোকিত করতে চেয়েছি। কিন্তু নাট্যচরিত্র, যেমন, মহাপঞ্চক, পঞ্চক, দাদাঠাকুর, সুভদ্র- এরা কারা? তারা যে বৃত্তের মানুষ, সেই বৃত্তটিকে চিনে নেওয়া প্রয়োজন। অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন,

" তাহারা মুর্খ নির্ধন ব্রাত্যজাতি, কিন্তু মর্মবাণীটি বোধহয় তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছিল; অচলায়তনের স্ফীতকায় জ্ঞানগরিমার সহিত তাহাদের লেশমাত্র পরিচয় নাই, তাহারা হালকা প্রাণের খুশির ফুৎকারে জীবনের সব ভার ও বোঝা উড়াইয়া দিয়া নাচে-গানে মাতাল হইয়া ওঠে। আবার, শোণপাংশুদের মতো অবিরাম কর্মের পাকে ঘুরিতেও তাহারা চাহে না; সরল ভক্তি-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পরম নিশ্চিন্ত হইয়া আছে" (ঘোষ, ১৯৭৬, ৪০১)।

এ যে লোকজীবনেরই কথা, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রটিকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। জীবন বিচ্ছিন্ন ভাবনা কোনকালেই ভাবতে পারেন নি তিনি। 'ডাকঘর' নাটকটিকে অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন 'সাংকেতিক নাটক' আর প্রমথনাথ

বিশী বলেছেন 'তত্ত্বনাটক'। নাটকটিতে নানা প্রকরণের মধ্যে গ্রামীণ বাঙলার মেজাজ, রুচি ও প্রাণসত্তা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন, নাট্যশালার বাইরেও রয়েছে বাস্তবের নাট্যশালা। এটি চলমান স্বার্থক গণতান্ত্রিক নাট্যশালা। চোখের সামনে দিয়ে প্রতিনিয়ত বিচিত্র চেহারার রঙের ঢঙের মানুষ নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ এবং নানা বিচিত্র কর্ম করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বিরামহীন এই চলা। চলমান এই জীবনপ্রবাহকে নাটকে তুলে আনার গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেছেন। 'ডাকঘর' নাটক তো পথেরই নাটক, ওই পৃথিবীর মুক্তাঙ্গন। শান্তিদেব ঘোষের লেখায় রয়েছে কবিগুরুর কথা।

"চল, চল, বাইরে জল, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে; সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে ....। এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছিলেন, তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্খা। .... থাকব না থাকব না, যাব, যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে- আর আমি কিনা বসে রইলুম" (মিত্র, ২০০০, ৪৬)।

বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার আকুতিই তো ব্যক্ত হয়েছে এখানে। এই পৃথিবীই যেখানে নাট্যমঞ্চ, সেখানে মঞ্চকে কীভাবে বড়ো প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা যায়, তা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন তিনি।

পথ চলা'র মধ্যেই জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়। দিগন্ত বিস্তৃত এই পথের নানা বাঁকে বৈষ্ণব বাউলের গান, জারি সারি ভাটিয়ালি। গৃহস্থের বাড়িতে বাউল বৈষ্ণবের নাটকীয় উপস্থিতি, নাকে ও কপালে রসকলি, ভিক্ষার ঝুলি, অথবা রঙ-বেরঙের আলখাল্লা, হাঁটতে হাঁটতে গান গাওয়া অথবা গ্রামের পথে পা ফেলা - এ যে নাট্যমঞ্চে প্রবেশেরই সমতুল। সমকালের জীবনযন্ত্রণাকেও তো একই প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে দেখা যেতে পারে। নাটক বনাম গণসংযোগের এই দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। লোকজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর মনস্কতা লোক উপাদানের প্রত্যক্ষ সংগ্রহ এবং পরোক্ষভাবে সেসবকে কবিতায়, গল্পে এবং সবচেয়ে বেশি করে নাটক কাজে লাগিয়েছেন। লোকজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর মনস্কতা লোক উপাদারে প্রত্যক্ষ সংগ্রহ এবং পরোক্ষভাবে সেসবকে কবিতায় গল্পে এবং সবচেয়ে বেশি করে নাটকে কাজে লাগিয়েছেন। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন-

"যারা বিদেশী সিম্বলিক- এক্সপ্রেসনিস্ট নাটকে রবীন্দ্রনাট্যের উৎস বা সাদৃশ্য খুঁজে হতাশ হন, তারা বাঙলার বিচিত্র লৌকিক অনুষ্ঠানের সতর্ক বিশ্লেষণ করলে এর আসল বংশানুক্রমের পরিচয় পাবেন। গণসংযোগের বহুমুখী সম্ভাবনার অনন্যভাণ্ডার রবীন্দ্রনাটককে ঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি, এটা সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য(গুপ্ত, ১৯৯২,৮৫)।

লোকনাটক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সংযোগ- সম্পর্কিত বিষয়ে প্রবেশ করে গেছি। উপস্থাপনার সমান্তরালে সংযোগের প্রাসঙ্গিকতা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে উপস্থাপকমণ্ডলী-কুশীলবদের ভাবায়। গিরীশচন্দ্র ঘোষ ইংরেজি থিয়েটারকে অনুসরণে সচেষ্ট

হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণযাত্রার মতো গীতিবাহুল্য বা ভক্তিমূলকতাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারেন নি। নাটকে কায়দা-কানুন ইংরেজী ভাবভাবনার অনুসারী, কিন্তু বৃহত্তর জনমণ্ডলীর সঙ্গে সংযোগের বিষয়টি নিয়েও ভাবিত ছিলেন তিনি। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন-

"আজকাল অনেক গ্রুপ থিয়েটার লোকনাট্য-লোকগীতের নানা বৈশিষ্ট্য তাঁদের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত করেন। ব্রেখটীয় বা গ্রোটস্কির প্রয়োগ কৌশলের পাশাপাশি গম্ভীরা আলকাপের ব্যবহারও দেখা যায়। বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো নাট্যগোষ্ঠী হয়তো গ্রাম-মফস্বলের সাধারণ মানুষের সংযোগের অভিপ্রায়েই একাজ করেন" (তদেব, ৮৫)।

নাটক উপস্থাপনায় লোক উপকরণ মার্জিত রুচির দর্শক-শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপিত হলে ধুলো-মাটি সব পুরো চেহারাটা হয়তো আসবে না, কিন্তু তাদের টেনে ধরার চেষ্টাটা বিফলে যাবে না।

নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে, কিন্তু তার সঙ্গে জনসংযোগের বিষয়টিকে নিয়ে যে ভাবনা, তাঁকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অন্যথায়, সংযোগের সূত্রটি হারিয়ে যাবে, নাটক আবদ্ধ হয়ে থাকবে একটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে।

উৎস পঞ্জি

সেন, সুকুমার, ২০১৮, প্রবন্ধ সংকলন(৪), নট-নাট্য-নাটক, আনন্দ, কলকাতা

মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত), ২০০০, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, অজিতকুমার ঘোষ : যাত্রা : লোকনাট্য কি? (প্রবন্ধ), কলকাতা

ঘোষ, অজিতকুমার, ১৯৭৬ (ষষ্ঠ সং, প্রথম সং১৯৪৬), বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বিশী, প্রমথনাথ, ১৯৭৩, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

গুপ্ত, ক্ষেত্র, সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি, ১৯৯২, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা

লেখক : **নির্মল দাশ,** বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী'র জয় বাংলা নাটকের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি একটি বিশ্লেষণী পাঠ

ড. মলয় দেব

মুক্তি যুদ্ধ বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। দীর্ঘ তেইশ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির প্রতিবাদী-প্রতিরোধী মানসিকতার পরিচয় বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। উনিশশো বাহান্ন-র ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতেই এই গণচেতনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈর শাসন যত কঠোর আঘাত হেনেছে ততই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ পরিবর্তিত হয়েছে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনায়। আর এরই সূত্র ধরে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খরস্রোতা নদীর মতো বেগবান হয়ে ওঠে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির মনে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে সঞ্চারিত করে।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'পূর্ব-বাংলা'কে 'পূর্ব পাকিস্তান'এ রূপান্তরিত করা হয়) উপর নানা রকমের জোর জুলুম , দমন-পীড়ন চালাতে থাকে। প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধাশ্রয়ী পাকিস্তানি শাসক প্রভুরা দেশ গঠনের সাত মাসের মাথায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সকল রকমের দমন পীড়নকে উপেক্ষা করে আন্দোলন শুরু করেন। এরকম পরিস্থিতিতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে সরকারের ১৪৪ ধারা উলঙ্ঘন করে বাংলার ভাষাপ্রেমি মানুষ মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিক সহ আরোও অনেকের তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। পাকিস্তান সরকারের এই অমানবিক আচরণে সমস্ত বাংলা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে মুসলিমলীগের শোচনীয় পরাজয় আর যুক্ত ফ্রন্টের জয়লাভ। কিন্তু ঔপনিবেশিক মানসিকতা পুষ্ট শাসকদের কূট চক্রান্তে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম হয়নি।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি জাতির মৌলিক অধিকার হরণের জন্য আয়ুবখান সামরিক আইন জারি করেন। এতসবের পরও দিব্যক্যের, তিতুমীরের, দুদ্দু শাহের, সূর্যসেনের, চিত্তরঞ্জনের, নেতাজীর উত্তরসূরীরা তাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে শৃঙ্খল মুক্তির আন্দোলন থেকে নিজেদের বিযুক্ত করেন নি। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসকে কেন্দ্র করে

রাজনৈতিক আন্দোলন পুনরায় দানা বেঁধে ওঠে। এই বছরই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র কের প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবল বিতর্ক শুরু হলে শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীলরাই তাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন এবং ২৪-২৭ বৈশাখ এই চারদিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[১] ১৯৬২খ্রিস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নিরাপত্তা আইনে আয়ুবখানের সরকার করাচিতে গ্রেপ্তার করলে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র সবাই ঢাকার রাস্তায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই একই বছর হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে এই কুখ্যাত রিপোর্টের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী ছাত্র-জনতা মিছিলসহ ধর্মঘটের ডাক দেয়। তারপর একে একে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব বাংলায় শাসকগোষ্ঠীর পরোক্ষ মদতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের ‘মৌলিক গণতন্ত্র’ এর ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়ী হন।[২] বিরোধী গণসংযোগকে ছিন্নভিন্ন করে তিনি জনমতকে নিজের পক্ষে টেনে আনার জন্য ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।[৩] কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অবহেলা ও ঔদাসিন্য প্রভৃতির প্রেক্ষিতে এই বছরই শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি ঘোষণা করলে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ দলের ডাকে ৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়।[৪] হরতালের দিন নিরপরাধ মানুষের উপর পুলিশের গুলি বর্ষিত হলে বেশ কিছু লোক আহত ও নিহত হন। এর ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আরো বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে স্বায়ত্ব শাসনের দাবি তাদের কাছে প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়।

এরকম অবস্থায় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রে পাকিস্তান বিরোধী রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা, অগাস্ট মাসে আরবি হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার সুপারিশ, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র প্রধান অভিযুক্ত করে বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে গণ আন্দোলন বিক্ষোভের আকার ধারণ করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ধারণা আরো বেশি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।[৫] শেষপর্যন্ত প্রবল গণ আন্দোলনের চাপে আয়ুব খান ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে “আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা” প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে যৌথ পাকিস্তানের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগ ৬-দফার ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। “ এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ, জামায়েত ইসলামীসহ ইসলামপন্থী দলগুলো ভরাডুবি বরণ করে। এই নির্বাচনই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি। ... ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ রমনা রেসকোর্সে (পরবর্তীকালে সোহারওয়ার্দী উদ্যান) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ‘শপথ দিবস’ অনুষ্ঠিত করে।”[৬] ৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেও জুলফিকার আলী ভুট্টো এই ঘোষণা মেনে না নিয়ে হুমকি দেওয়া সত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনার পথ বন্ধ করেন না, তিনি তাঁর ৬-দফার দাবীতে অনড় থাকেন।[৭] এরকম পরিস্থিতিতে লারাকান ও

রাওয়ালপিণ্ডিতে বাঙালি নিধনের ষড়যন্ত্র পাকা হয়। ২ মার্চ হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা হরতাল পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। গোটা পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ দমনের জন্য সোনাবহিনী নামানো হয়। সোনাবহিনীর গুলিতে শত শত মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এরকম অবস্থায় ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। কার্যত এই দিনই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে সর্বাত্মক প্রতিরোধ আন্দোলনে যুক্ত হবার ডাক দেন। ২২ মার্চ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা যায়। গঠন করা হয় 'জয় বাংলা বাহিনী।'[৮] ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকার নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বরোচিত সামরিক অভিযান চালায়। আর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে (২৬ মার্চ) বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর হাতে বন্দী হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৯] তারপর থেকে ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ দুর্বার গতিতে বিজয়ের পথে ধাবিত হয়। বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতার কথা সর্বজনবিদিত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্য এই যুদ্ধে অভূতপূর্ব সাহায্য যেমন করেছে তেমনি এই অঞ্চলের সৃজনশীল লেখক শিল্পীদের মনকেও এই যুদ্ধ আন্দোলিত করে তুলে। সমকালে সৃষ্ট এরকমের একটি অপ্রকাশিত নাটক এই প্রতিবেদনের মূল আলোচ্য বিষয়।

মুক্তিযুদ্ধের মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা সমকালীন সমাজ জীবনের সর্বস্তরকে প্রভাবিত করেছিল। এই ঘটনা মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের নান্দনিকবোধকে যেমন উদ্দীপিত করেছিল, তেমনি পরবর্তীকালেও শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের চেতনাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত বন্ধুর পথের অভিব্যক্তি ঘটেছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায়। এক্ষেত্রে জনজাগরণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে কবিতা, গান ও নাটক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করা এবং শাসক শ্রেণির শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী করার ক্ষেত্রে, ঘরের শত্রু পাকিস্তানী দালাল ও রাজাকারদের চিনিয়ে দিতে নাট্যকারেরা সমস্ত রকমের ঝুঁকিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মসিকে অসিতে রূপান্তরিত করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে রচিত নাটকগুলি হল- মমতাজউদ্দিন আহমদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (প্রথম প্রযোজনা ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১),'এবারের সংগ্রাম'(প্রথম প্রযোজনা ১৪ মার্চ, ১৯৭১),'স্বাধীনতার সংগ্রাম' (প্রথম প্রযোজনা ২১ মার্চ,১৯৭১), জনৈক নাট্যকারের 'ভোরের স্বপ্ন' (প্রযোজনা মার্চ ১৯৭১), কবীর আনোয়ারের 'পোস্টার'(প্রযোজনা মার্চ, ১৯৭১); আখতার হোসেনের 'শপথ নিলাম'(প্রযোজনা মার্চ ১৯৭১); সোলায়মান হোসেনের 'রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য' (প্রযোজনা মার্চ, ১৯৭১), 'মুক্তির নেশা'(প্রযোজনা মার্চ ১৯৭১); মানুনুর রশীদের 'মৃত্যুহীন প্রাণ'(৭১ যুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে

সম্প্রচারিত), 'মুক্তির ডাইরী' (ঐ), 'পশ্চিমের সিঁড়ি' (রচনাকাল ১৯৭১, প্রযোজনা ৭২); খায়রুল বাসারের 'মুক্তির সংগ্রাম'(৭১ এ যুদ্ধকালে নবম সেক্টারে অভিনীত), 'লাল পথ' (ঐ); কল্যাণ মিত্রের 'জল্লাদের দরবার' (৭১ যুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত), ' একটি জাতি একটি ইতিহাস' (ঐ) ইত্যাদি। এই সময়ে রচিত নাটকে বুদ্ধির জায়গায় ভাবাবেগই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলত এই পর্যায়ের নাটকে " যুদ্ধের সংবাদ আছে, নারী ধর্ষণের চিত্র অংকনের জন্যে উন্মত্ত উন্মাদনা আছে, মাঠের করতালি নিনাদিত জনপ্রিয়তার জন্যে সর্বস্ব ব্যাকুল সংলাপ আছে। নাট্যকারদের উষ্ণ ধিক্কারে শত্রুপক্ষ মর্মান্তিকভাবে বিধ্বস্ত। জাতীয়তাবাদী প্রবল অনুরাগের উচ্ছ্বাসে বাঙালি মাত্রই দুর্দমনীয় দেশপ্রেমিক হিসাবে রূপান্তরিত।" ১০ এই ধারার আরেকটি নাটক হল প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামীর 'জয়বাংলা' নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৬ই আষাঢ়, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ (১লা জুলাই, ১৯৭১)। রচনার স্থান বিলপার- দক্ষিণ (শিববাড়ী) শিলচর। নাটকটি অপ্রকাশিত। মেশিনি তৈরি কাগজের খাতায় লেখা। নাট্যকারের পুত্র শ্রী প্রশান্ত চন্দ্র গোস্বামীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত।

'জয়বাংলা' একটি একাঙ্ক নাটক। এই নাটকে মোট দৃশ্য সংখ্যা পাঁচটি। প্রথম দৃশ্যের স্থান ঢাকার রাজপথ। একদল স্বেচ্ছাসেবক নিজেদের মনোবল যাতে কোনো অবস্থায় না হারায় সেজন্য রাজপথ দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার; জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ' গানটি গেয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্যের প্রথম সংলাপ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের। তার সংলাপ থেকে স্পষ্ট হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তানি শাসকদের বিস্মিত করে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ ৬-দফার দাবিতে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। তা পাকিস্তানি শাসকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেয়। সংলাপটি নিম্নরূপ-

"ভোটে আওয়ামী লিগ জিতেছে। শতকরা ৯০টি আসন তারা দখল করেছে। গোটা পাকিস্তানে তাঁরা একচ্ছত্র; একাধিপত্য তাঁদের রুখবার আর উপায় নেই। শেখ কি তাঁর মর্জি মাফিক চলবে; সংবিধান রচনা করবে? ক্ষমতা কি এবার ছাড়তেই হবে। " [১১]

তারপরেই নাটকে চরিত্র হিসাবে আমরা মুজিবুর রহমানকে পাই। তাঁদের দুজনের কথোপকথন থেকে ইয়াহিয়া খানের দুরভিসন্ধি ও মুজিবুর রহমানের দেশের জন্য ত্যাগ নিষ্ঠার পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠে। মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিনক্ষণ জানতে চাইলে ইয়াহিয়া টালবাহানা করতে থাকেন। তখন দৃঢ়চিত্ত মুজিবুর রহমান তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন— " জনগণ আপনারই নিয়ন্ত্রিত ভোটের মাধ্যমে তাদের রায় দিয়েছেন। আওয়ামী লিগের ৬ দফাতেই আছে পাকিস্তানের মঙ্গল। এর নড়চড় হবে না। আপনি জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভা আহ্বান করুন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করুন। নিজের পূর্বঘোষিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। তার আগে কোন কথা নয়। " [১২] এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের আহ্বান করেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান রাওয়ালপিন্ডি,সভাপতি ভবন। এই দৃশ্যে দেখা যায় ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত জাতীয় অধিবেশনকে টিক্কা খা, পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ও অন্যান্য বেসামরিক উপদেষ্টা মেনে নিতে রাজী হন নি। ভুট্টো পরিস্কার জানিয়ে দেন- " না, জাতীয় পরিষদ বসবে না। আমরা ঢাকা যাচ্ছি না। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রেসিডেন্ট সাবকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি। যদি আপনি জাতীয় পরিষদ ডাকেন, তবে গোটা পশ্চিম পাকিস্তান অচল করে দেব। আপনার গদিও নড়ে উঠবে।"[১৩] ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথায় সায় দেন এক শর্তে। শর্তটি হল টিক্কা খান ঢাকার গভর্ণরের দায়িত্ব নিলে তবেই তিনি জাতীয় অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করবেন। তার বিশ্বাস বাংলাদেশকে টিক্কা খানই ঠান্ডা করতে পারবেন। টিক্কা খান ইয়াহিয়ার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন এবং বলেন- " বাঙ্গালীরা শয়তান, বদমাস। ওদের এমন শিক্ষা দেব, আর কোনদিন ওরা মাথা তোলার সাহস পাবে না। বাঙ্গালীরা কম বড় বেইমান। ওরা আবার মুসলমান ! বাঙালী মুসলমান, আমি ওদের খতম করব।" [১৪]

টিক্কা খান ঢাকায় বাঙ্গালীদের শাস্তি দেবার জন্য আসতে রাজী হলে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন-" ৩রা মার্চ ঢাকাতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য অধিবেশন স্থগিত।" [১৫]

৩য় দৃশ্যের স্থান ঢাকার জনসভা। এই জনসভা লোকে লোকারণ্য। মঞ্চে মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতারা। মঞ্চে স্বেচ্ছাসেবকরা ' ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি গাইছেন। মুজিবুর রহমান জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের অনির্দিষ্টকালের জন্য যে স্থগিত করেছেন তা যেমন জানিয়ে দেন, তেমনি 'অধিবেশন আর ডাকা হবে কিনা' এনিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন- "জনতার রায়কে পদানত করে সামরিক জোট সারা দেশকে তাদের বুটের তলায় রাখতে চায়। তারা চায়, বাংলাদেশের উপর যে শোষণ তারা ২৩ বছর ধরে করে যাচ্ছে তা চালিয়ে যাওয়া। আমাদের তারা মানুষ মনে করে না"—[১৬] এই অবস্থা তিনি বাংলার সকল ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে সম্বোধন করে বলেন " প্রস্তুত হোন চরম আত্মত্যাগের জন্য, খুনের জন্য। আপনাদের উপর নেমে আসবে অত্যাচার, জেল, লাঠি, গুলি- মৃত্যু। কিন্তু বন্ধুগণ, শহীদের রক্ত কখনও ব্যর্থ হয় না, শহীদের খুনের উপরেই গড়ে ওঠে স্বাধীনতার ইমারত।"[১৭]

দূরদর্শী, বিচক্ষণ নেতা মুজিবুর রহমান জানতেন, পশ্চিমী স্বৈর শাসকরা কিভাবে পূর্ব বাংলার মানুষের অত্যাচার, নির্যাতন চালাতে পারে। তাই তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন। তাদের পাকিস্তানি শাসকদের ঘৃণা সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করে বাঙালি হিসাবে অহিংস গণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য ডাক দেন।

৪র্থ দৃশ্যে ঢাকার রাষ্ট্রপতি ভবন। এই দৃশ্যে ইয়াহিয়া মুজিবুর রহমানকে আন্দোলন বন্ধ করার কথা বললে মুজবুর জাতীয় পরিষদের অধিবেশ কেন ডাকা হচ্ছে না এবং কেন

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে না তার কারণ জানতে চান। ইযাহিয়া এর সুস্পষ্ট কোন উত্তর না দিয়ে তার ডাকা সর্বাত্মক হরতালে 'দেশের অখণ্ডতা বিপন্ন' এই অভিযোগ তুললে মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে কিভাবে পূর্ব পাকিস্তান শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরেন এবং দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দেন পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আর পূর্ব পাকিস্তানে চলবে না। তারপরই এই দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই ইয়াহিয়ার গোপনে বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য সংগ্রহ ও মহড়া, ভুট্টো ও টিক্কা খানের সঙ্গে বাঙালিদের শায়েস্তা করার শলা পরামর্শ, মুজিবুরের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে ভাওতাবাজী করে ইয়হিয়ার রাতের অন্ধকারে সৈন্যবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ২৫শে মার্চ (মধ্যরাত) ১৯৭১ (২৬শে মার্চ) পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম গণ প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসাবে ঘোষণা করে বাংলার সকল স্তরের জনগণকে সংগ্রামের ডাক দিয়ে বলেন— " আপনাদের যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন সংগ্রামে। প্রত্যেক বাড়িকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করুন। রাস্তায় রাস্তায় গড়ে তুলুন প্রতিরোধ।... আমি যদি না থাকি, তবুও আপনারা চূড়ান্ত জয় না পাওয়া পর্যন্ত জান মাল সব কোরবানী দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন- বাংলাকে, আমার প্রাণের দেশকে- সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বাংলাকে মুক্ত করুন। "[১৮]

পঞ্চম দৃশ্যে বাংলাদেশের পথে পথে পাকসেনা ও মুক্তি ফৌজের সংঘর্ষ, পাকসেনা কর্তৃক মুজিবুর রহমানকে নিজ বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া, ২৭শে মার্চ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সেনাপতি জিয়াউর রহমানের মুখ দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করানো হয় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ও অস্থায়ী সরকার গঠনের কথা। তারপর ভারতের পার্লামেন্ট ভবনে নাট্য কাহিনির দৃশ্যান্তর ঘটে। ভারতের পার্লামেন্ট বাংলাদেশে সম্পর্কে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে ঘোষণা করে-

" আমরা ভারতবর্ষের মানুষেরা বাংলাদেশের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারি না। ওখানে স্বৈরাচারী সামরিক শাসকরা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করছে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ কেহই রেহাই পাচ্ছে না। সারা বাংলাদেশ আজ কবরস্থান, শ্মশান। বিশ্ব বিবেকের কাছে আমরা এ গণহত্যার প্রতিকার চাই। নাদির, চেঙ্গিস, হিটলারকে পাকিস্তানী অত্যাচারকারীরা হার মানিয়ে দিয়েছে। এ অত্যাচারের নজীর নেই। ৬০ লক্ষ উৎপীড়িত নর-নারী প্রাণরক্ষার জন্য ছুটে এসেছে ভারতবর্ষে, আরও আসছে, আরও আসবে; ভারত এদের আশ্রয় দিয়েছে। আমরা এদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। আমরা দারিদ্র্য-পীড়িত; তবুও শাশ্বত মানবতার দাবীকে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমাদের সীমিত সামর্থ্য দিয়ে আশ্রয়প্রার্থীর উপযুক্ত সেবা শুশ্রুষা অসম্ভব। তাই আমরা বিশ্ববাসীর সাহায্য চাই। সাহায্য চাই বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রবর্তনে ও বাস্তুহারাদের স্বদেশে-স্বগৃহে সসম্মানে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থায়। " [১৯] তারপর পুনরায় দিল্লির পার্লামেন্ট ভবন থেকে বাংলাদেশের মুজিবনগরের আম্রকাননে নাট্যকাহিনীর দৃশ্যান্তর ঘটে। বিপুল জন সমাবেশের সামনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন নবজাগ্রত বাংলার জাতির পিতা

শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতির কথা এবং তারই নির্দেশে যে সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছে তা সকলকে জানিয়ে দিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তার অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দিনকে এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের হিন্দুদের সম্পর্কে নবগঠিত সরকারের নীতি কি হবে সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে জানতে চাইলে রাষ্ট্রপতি বলেন- " হিন্দু -মুসলমানের প্রশ্ন আর নেই। পাকিস্তানের কবর থেকে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ- রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজীর বাংলাদেশ; মিলিত হিন্দু মুসলমানের বাংলাদেশ। জয় বাংলা - " (পৃ. ২৪)

বাংলাদেশের সে সময়কার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা মৌলানা ভাসানী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখের বেতার ভাষণ থেকে শোনা যাচ্ছে। তাঁরা বাংলার মুক্তি সংগ্রাম যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে যেমন জনগণকে ওয়াকিবহাল করছেন তেমনি বাংলাদেশকে পাকিস্তানী নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে, বিশ্বে বিবেকের কাছে আর্জি জানাচ্ছেন। অন্যদিকে দেশের শত্রুদেরকে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন এই বলে যে " যারা পাকিস্তানী বাহিনীকে সাহায্য করবে, যারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াবে তাদের- ঐ বেইমান দালালদের আমরা ক্ষমা করবো না। চরম দণ্ড ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা নিঃসংশয়। জয় আমাদের হবেই, কোন চক্রান্ত আমাদের স্বাধীনতা ঠেকাতে পারবে না; আমরা সর্বস্ব দেব, কিন্তু স্বাধীনতা দিব না। আমরা বিশ্বাস করি- নিঃশেষে প্রাণ করিবে যে দান/ ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই /ভয় নেই, আমার সংগ্রামী ভাইরা, এগিয়ে চল; জয় আমাদের সুনিশ্চিত। স্বাধীন বাংলাদেশ -- জিন্দাবাদ। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান - জিন্দাবাদ। জয় বাংলা"[২০] এই দৃশ্যের অন্তিম দৃশ্যান্তরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত একদল পাক সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং মুক্তিযোদ্ধারা বীরদর্পে কুচকাওয়াজ করে " ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" এই গানটি গেয়ে গেয়ে জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে যায়। এখানেই নাটকটির যবনিকা পতন ঘটে।

প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে সচেতন থেকে সেই সময়ের বাস্তবকে নাটকের সংলাপে উপস্থাপিত করেছেন। নাটকটি বিপ্লবী ও বিদ্রোহী চিন্তা চেতনায় ঋদ্ধ। নাট্যকার তাঁর এই নাটকে পরিস্থিতির চাপে ছেড়ে আসা জন্মভূমির প্রতি প্রেম, জন্মভূমিকে শৃঙ্খল মুক্তির জন্য যারা মরণপণ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তাদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন, স্বৈর শাসকদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ আর বীরত্ব, বাংলা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দেশের মাটি ও মানুষের জন্য অনমনীয় সংগ্রামী মনোভাব সর্বোপরি পূর্ণরূপে দেশের স্বাধীনতা যে আসন্ন তারও প্রত্যয়দৃঢ় উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। নাটকের প্রতিটি প্রধান চরিত্র সমকালীন ইতিহাস থেকে নেয়া। নাট্যকার তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বিশ্বস্ততার সাথে অঙ্কন করেছেন এই নাটকে। এককথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

কালীন সময়ের রক্তাক্ত দলিল প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামীর "জয় বাংলা" নাটক। বরাক উপত্যকায় রচিত, অপ্রকাশিত এই নাটকটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাট্য চর্চার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রবন্ধটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণায় রত তাঁদের মনে যদি বিন্দুমাত্রও আগ্রহ জন্মাতে পারে তাহলে শ্রম সার্থক মনে করব।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সুকুমার বিশ্বাস, ১৯৮৮, বাংলাদেশের নাচ্যচর্চা ও নাটকের ধারা, বাংলা একাডেমী, প-.১৬১-১৬২
২। হারুন হাবীব (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), ২০১৭, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল ত্রিপুরা , সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ.৩১
৩। তদেব পৃ. ৩২
৪। তদেব পৃ. ৩২
৫। তদেব পৃ. ৩৩
৬। তদেব পৃ. ৩৪
৭। তদেব পৃ. ৩৪
৮। তদেব পৃ. ৩৮
৯। তদেব পৃ. ৫৫
১০। মমতাজউদ্দীন আহমদ, 'বাংলাদেশের নাট্য চর্চার ইতিবৃত্ত' ২০০০, আমার নাট্য ভাবনা' ঢাকা, পৃ.১৫৩
১১। প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী, জয় বাংলা, শ্রী প্রশান্ত চন্দ্র গোস্বামী ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত, অপ্রকাশিত, পৃ.১।
১২। তদেব পৃ. ৩
১৩। তদেব পৃ. ৫
১৪। তদেব পৃ. ৬
১৫। তদেব পৃ. ৬
১৬। তদেব পৃ. ৬
১৭। তদেব পৃ. ৭
১৮। তদেব পৃ. ১৬-১৭
১৯। তদেব পৃ. ২১
২০। তদেব পৃ. ২৫

লেখক : **মলয় দেব,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা থিয়েটারের প্রতিবাদী কণ্ঠ ও এই সময়

দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বজুড়ে সমাজ, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তার পাতা উল্টালেই যে সত্য প্রতিভাত হয় তা হলো ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে সভ্যতা যত উন্নত হয়েছে মানুষই তত মানুষের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। ক্রমবিকাশের স্তরেই এই শ্রেণীর উচ্চ মেধার মানুষ নিজেদের স্বার্থেই সমাজকে ভাগ করেছে বিভিন্ন শ্রেণীতে। স্বার্থ যখন মুল লক্ষ্য, স্বাভাবিকভাবেই দমন, পীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা ক্রমপ্রসারিত হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে জৈবিক নিয়মেই অবদমিত, অবহেলিত এবং শোষিত মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছে প্রতিরোধ ভাবনা, তাদের মুখে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা, মুখোমুখি লড়াই যেমন হয়েছে কালান্তরে বৌদ্ধিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছে। প্রস্তুত হয়েছে প্রতিবাদের বিভিন্ন মাধ্যম যা শুধু প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেনি, বহু বহু মানুষের চেতনা জাগাতে, আত্মসম্মান আত্মমর্যাদার ভিত গড়ে দিতে প্রবল কার্যকরী ভূমিকা দিয়েছে।

মানুষকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্য যতগুলো মাধ্যম জন্ম নিয়েছে তাদের অন্যতম নাটক। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির নানা স্তর এবং সামাজিক ওঠা পড়ার বিভিন্ন তরঙ্গ নাটকেই ধরা পড়ে সব থেকে বেশি। বহু নাট্যকার তৎকালীন সমাজের প্রতি ঔদাসিন্য তো দেখানই নি, বরং সেই যুগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করে অবদমিত, শোষিত মানুষদের আশা-আকাঙ্খা ও সংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের সৃজনকর্মে। নাটক হয়ে উঠেছে সংকটের অভিব্যক্তি। সংকট জর্জরিত সভ্যতাও শ্রেণী সংগ্রামের তীব্র দ্বন্দ্বে নাটকের সংজ্ঞাও তার রূপ বদলেছে। সে সময়ে ব্রেশট উচ্চারণ করেছেন—“ মানুষের বাজারে মানবতা বিকিয়ে যাচ্ছে,” বুর্জোয়া শিবির বিকল্প বিনোদিনী ধারার প্রচারে ঘাম ঝড়ালেও গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক থিয়েটার, যার অভিঘাতে স্বার্থান্বেষী শিবির ক্রমশ: পিছু হঠেছিল। অপরদিকে শোষিত, নিপীড়িত মানুষদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের ভাষা নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

বাংলা থিয়েটারের প্রতিবাদী কণ্ঠ সম্পর্কিত আলোচনার শুরতেই স্মরণ করতে হয় শ্রদ্ধেয় নাট্যশিক্ষক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর জবানীতেই বলি- “ বাংলা থিয়েটারের জন্ম মুহূর্ত থেকেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তাকে নিরন্তর লড়াই করে যেতে হয়েছে বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে।”

জন্মমুহূর্ত্ত থেকেই যে অত্যাচারিত, তাকে টিকে থাকতে হয়েছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শনকে অবলম্বন করে। ফলস্বরূপ, নিছক বিনোদনের মাধ্যম না হয়ে মানুষের চেতনায় ঘা দেবার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক আকার ধারণ করেছে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে নীলদর্পণ প্রথম প্রতিষ্ঠান বা সরকার বিরোধী নাটক বলে চিহ্নিত হলেও অপর একটি ঘটনাও ভুললে চলবে না।

১৮৭৬ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছেলে প্রিন্স অব ওয়েলস্ কলকাতায় এলে উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তার বিশাল সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাটি তৎকালীন শহরে বিরাট আলোড়ন তোলে। এরই প্রতিবাদ ফুটে ওঠে 'গজদানন্দ' নাটকে। সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ দিয়ে অভিনয় বন্ধ করে। প্রযোজক ফের নাটকটি অভিনয় করে নাম পাল্টে। একইভাবে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র অভিনয়ও সরকার বন্ধ করে দেয়। অনেকের ধারণা পর পর দুটি ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সরকার ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে কুখ্যাত নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করে। যদিও সরকার উক্ত আইন প্রণয়নের ভাবনা শুরু করেছিল ১৮৭৫ সালেই। কারণ ওই সময়ে নীলদর্পণ, গাইকোয়াড় দর্পণ, চাকর দর্পণের মত নাটকগুলি সরকারকে যারপরনাই বিব্রত ও উত্তেজিত করেছিল। যদিও চা বাগানের শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনি নির্ভর চাকর দর্পণ মঞ্চায়িত হয়নি বলেই বিশিষ্টরা মত প্রকাশ করেছেন।

ভারতবর্ষের অসংখ্য দরিদ্র ও অত্যাচারিত মানুষদের জন্যই সেসময়ে সঠিক বার্তাবাহী নাটকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। যাবতীয় অন্যায় নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার এবং বাঁচার দাবিতে লড়াই করার উদ্দেশ্যে সবিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল ওই সকল মানুষদের চেতনা জাগ্রত করার।

পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিংবা সাক্ষরতা, যৌথ আন্দোলন, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের স্বপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরতে নাটক অত্যন্ত জোরালো মাধ্যম হিসাবেই গঠনমূলক পথে এগিয়েছে। অর্থাৎ নাটক বা থিয়েটার, বিশেষ করে বাংলা থিয়েটার একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসাবেই সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। এ আন্দোলন সমাজের প্রেক্ষিতে সামগ্রিককে দেখা ও দেখানোর আন্দোলন। যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই আন্দোলন জীবনমুখীনতা ও মানবতার দোহাই দিয়ে জীবন বাস্তবতা হারিয়ে কৃত্রিমতার পথে পা ফেলেছে। তবে, দীর্ঘপথ পরিক্রমায় বিভিন্ন মোহজনিত এ ধরনের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি যা অবশ্যই সংশোধনযোগ্য, তবে সামগ্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। একাজে নাট্যকর্মীরা শ্রম, নিষ্ঠা ও কল্পনার মেলবন্ধনে বহু ত্রুটিহীন প্রযোজনার মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারের প্রতিবাদী কণ্ঠকে সোচ্চারে প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বাধীনতার কিছুকাল পরেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ থেকে কয়েকটি নির্দেশিকা দেওয়া হয়ঃ-

১। সংগ্রামী শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে।

২। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে যে গান নাটক কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে তাকে প্রগতিশীল জগতের সামনে নিয়ে যেতে হবে।

৩। প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে জানতে ও চিনতে হবে এবং প্রতিটি লড়াইয়ের ব্যারিকেডে রক্তের স্বাক্ষরে রেখে সংস্কৃতি রচিত হচ্ছে তাকেই শ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে হবে।

কতিপয়কে বাদ দিলে যারা এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকলেন তাঁরা অর্থাৎ গণনাট্যসংঘ এবং গ্রুপ থিয়েটারগুলি প্রাণ হাতে করে, কঠোর পরিশ্রম করে থিয়েটার চর্চাকে যথার্থ আন্দোলনে পরিণত করলেন। তাঁরা যে সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন তা হলো— প্রতিবাদ মানেই মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে প্রতিবাদ নয়, জীবনের সমস্যা, তার দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন Policy'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমাদের নাটক সমকালীন ঘটনাবলীতে সরাসরি প্রবেশ করবে, প্রতিবাদী ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন হলে অবশ্যই করবে এবং রাজনৈতিকভাবে সে সমস্যা মোকাবিলায় সামিল হবে। মনে রাখতে হবে শিল্প যেমন শুধুমাত্র শিল্পের জন্য নয়, তেমনই প্রতিবাদও নিছক প্রতিবাদের জন্য নয়। বিগত পাঁচ ছয় দশক ধরে বহু নাট্যকর্মী, নাট্যদল যে পথে এগিয়েছে এবং যার জন্য আমরা গর্ব অনুভব করতে কোনভাবেই দ্বিধাগ্রস্ত নই তা হলো তারা ঘটমান জাগতিক ঘটনা প্রবাহ অনুধাবন করার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগ্রামের প্রতি স্তরে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সামাজিক সম্পর্কগুলির গতি প্রকৃতি ও পরিবর্তন উপলব্ধি করে মানুষ ও সমাজ জীবনের দ্বান্দ্বিক ও জটিল প্রক্রিয়ায় ঢুকে উপাদান সংগ্রহ করেছে এবং সংগৃহীত উপাদান নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী ও উদ্ভাবনী ভাবনায় জারিত করে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছে। এটাইতো প্রতিবাদী আন্দোলনের স্বরূপ। সময়ান্তরে থিয়েটারের সচেতক ও প্রতিবাদী ভাবনার ক্ষেত্রেও নতুন নতুন ভাবনার সন্ধান পাওয়া গেছে। যেহেতু কোন কিছুই ধ্রুবক নয় ফলে নিয়ত পরিবর্তনশীল দুনিয়াতে কাজের ধারারও পরিবর্তন আনতে হয়েছে। পরিস্থিতির সাপেক্ষে বক্তব্যই হোক, উপস্থাপন ভাবনাই হোক ভিন্ন পথে পা ফেলেছে। রাজনৈতিক প্রতিবাদের অনিবার্য পরিপূরক হিসাবে সাংস্কৃতিক বামপন্থা বিকশিত ও লালিত পালিত হয়ে চলেছে। কল্যাণকামীতার মুখোশ পরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে থিয়েটার যখন মূল্যবান আয়ুধ, তখন এই পরিবর্তনশীলতার গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

শুরুতেই বলা হয়েছিল বাংলার বুকে প্রতিবাদী নাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সংগ্রামের গর্ভে ৫৯' এর খাদ্য আন্দোলন, ৬৬'র আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, সত্তরের সামাজিক রাজনৈতিক দুর্যোগ, জরুরি অবস্থা, শ্বেত সন্ত্রাস যখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উপর ব্যাপক দমন পীড়ন নামিয়ে এনেছে তখনই প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের অভিমুখ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। থিয়েটার হয়ে উঠেছে আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার। মানুষের চেতনাকে জাগিয়েছে, তার মুখে ও ভাবনায় জুগিয়েছে প্রতিবাদের ভাষা,সেই কাজ আজও করে যেতে হচ্ছে কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের কঠিনতম সময়ের মধ্যে দিয়ে আজ আমাদের দিনযাপন।

বলা হয় 'নবান্ন' প্রতিবাদী থিয়েটারের ইতিহাসে একটা টার্নিং পয়েন্ট। এবং পরবর্তীতে আমরা দেখি বেশ কিছু নাটক। যেগুলির মধ্যে মঞ্চ ও পথনাটক উভয়ই আছে। প্রতিবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে উমানাথ ভট্টাচার্যের চার্জশীট, LTG প্রযোজনা সাংবাদিক, পানু পালের ভোটের ভেট, ভাঙাবন্দর। এছাড়াও স্পেশাল ট্রেন, মুদ্রামুক্তি, আর কতদিন, সার্কাস, বাস্তবশাস্ত্র, মিছিল, পথে নামার সময়, বর্গী, জনতার বিচার, মরিচঝাঁপি, ঘরে তোলো ধান, অনুপ্রবেশ, খাদ্য চোর, দিন বদলের পালা, নতুন ইহুদি, ধর্মঘট, সাঁকো, এরাও মানুষ, বিশে জুন, তৈরি হও, ছোটলোক, সমাজতান্ত্রিক চাল এমন বহু নাটক পঞ্চাশ , ষাট ও সত্তরের দশকের সংস্কৃতি অঙ্গন তোলপাড় করে মানুষের ভাবনায় কড়া নেড়েছে। ৮০ এবং ৯০ এর দশকেও বহু উজ্জ্বল প্রযোজনার উল্লেখ করা যায়। এই সব প্রচার মূলক নাটকের পাশাপাশি বিভিন্ন মঞ্চ নাটক যেমন ছেঁড়াতার, রাহুমুক্তি, নতুন ইহুদি, প্রফেসর সামলক, কল্লোল, অঙ্গার, তিতুমীর, অজেয় ভিয়েতনাম, মানুষের অধিকারে, কালোহাত, রাজরক্ত, স্পার্টাকুস, নাজি'৭৪, দুঃস্বপ্নের নগরী, লেনিন কোথায়, রাসযাত্রা, ব্যারিকেড, কারাগার, চাকভাঙা মধু, মারীচ সংবাদ, বেড়া, পরবর্তী বিমান আক্রমণ, অশ্বত্থামা, জগন্নাথ, খাড়ির গণ্ডি, মহাকালীর বাচ্চা, চুল্লি, যুদ্ধের আগুনে, তুঘলক, পাপ, বেলা অবেলার গল্প, মে দিবসের গল্প, মহাবিদ্রোহ, বাংলা ছাড়ো, রক্ত থেকে জন্ম, কাজের দিন , মা, মুমূর্ষ নগরী এবং আরও অনেক প্রযোজনা সত্তর পেরিয়ে আশির দশক, এবং আরও পরে পরে প্রতিবাদের শিল্পীরূপকে হাজির করেছে মঞ্চে মঞ্চে ও পথে। ৭০'র শেষ, থেকে ৮০'র দশকের প্রথম কয়েক বছর বর্গা আন্দোলনের সাফল্যের ভিত ছিল সেই প্রতিবাদী চেতনা।

এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, বিসর্জন, চন্ডালিনী, অচলায়তন, রথের রশি এবং বেশ কিছু প্রতিবাদী বার্তাবাহী গল্পের নাট্যরূপ মঞ্চে মঞ্চেউপস্থাপিত হয়েছে এবং সেই ধারাবাহিকতা আজও বজায় আছে।

সময়ান্তরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এলো নতুন নতুন বিষয়। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঠান্ডা যুদ্ধ, দ্বিমেরু প্রবণতা, বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বিষয়গুলি নাট্যকর্মীদের শুধু ভাবায়নি, প্রতিবাদী নাট্য ভাবনারও জন্ম দিয়েছে। থিয়েটারের কণ্ঠরোধ করার মত ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নাট্যজগত, নাট্য প্রযোজনা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস কিংবা সেই বিষ্ণু ভাগবতের নৌকেলেংকারীতেও এই বাংলা থিয়েটার প্রতিবাদী ভাষা উচ্চারণ করেছে। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে চরম সংঘাত তৈরি করা কোনও নাট্য দলের কাজ নয়। তারা যে কাজটা করতে পারেন তা হলো ঘটনা পরম্পরার বাস্তব রূপায়নে মানুষকে জাগানো এবং তাদের প্রতিবাদী, বিক্ষুব্ধ ও হতাশ মানসিকতার পাশে দাঁড়ানো।

বিগত চার দশকে এবং সাম্প্রতিক কালেও কালো মাটির কান্না, পরাগ মণ্ডলের ঘর গেরস্থালি, তোমার তটরেখা থেকে, আহ্বান, দহনকাল, ভয়, কড়া নাড়ার শব্দ, চরিত্র,

আভাদির খোলা চিঠি, সোয়াইক গেল যুদ্ধে, রোশন, যতীনবাবু শুনছেন, লাল ঘাসে নীল ঘোড়া, ব্রাহ্মণ, সত্তর দশক, ধর্মরাজ্য, হে রাম, একজন প্রতারক, দুঃসময়, বাজারের লড়াই, কোজাগরী, কাল চক্র, লেফট রাইট লেফট, পিরানদেল্লো ও পাপেটিয়ার্স এমন বহু নাটক অত্যন্ত দৃপ্ত ভঙ্গিতে প্রতিবাদ সূচিত করেছে শহর থেকে মফ:স্বল হয়ে ভিন্ন প্রদেশের মঞ্চে মঞ্চে। সেই ধারা এখনও সার্বিক না হলেও গ্রামে গঞ্জে, মফস্বলে বিভিন্ন উৎসব ও প্রতিযোগিতা মঞ্চে কিয়দাংশে জারি আছে।

দেশের স্বাধীনতার বয়স যত বেড়েছে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ক্রমশঃ যেন প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে। জাতীয়তাবাদের নামে বৈরীতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচিতি সত্তার ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা, ধর্মের নামে একধরনের বালখিল্যতা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু পীড়ন, নারী নির্যাতন, বাক্‌স্বাধীনতা হরণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে " .... আমাদের চারিপাশে যে ভয়াবহ জনমতের বলয় ঘিরে আসছে অগ্নিবলয়ের মত, ক্ষণে ক্ষণে পরাধীন করে দিচ্ছে ওয়াটস্‌অ্যাপে, ফেসবুকে নিজ নিজ অর্ধসত্য বা মিথ্যা খবরের মাধ্যমে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার নাম করেই যেটা ঘটে চলেছে অবিরত .... সে সব কিছুর মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা খুব খুব সমস্যার। কিন্তু সেটাই যে একমাত্র মনুষ্যত্ব আমাদের।" (যশোধারা রায় চৌধুরী) মানুষকে একা করে দেবার, বিচ্ছিন্ন করে দেবার নগ্ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এই সময়কালের নাট্যকাররা কলম ধরেছেন ঠিকই, তবে সেই সৃজনকে সময়ের দাবিতে জোয়ারে পরিণত করা অবশ্য কর্তব্য।

মূল ধারার পাশাপাশি বাদল সরকার কিছু ভিন্ন ধারায় তাঁর থার্ড থিয়েটার নিয়ে পথে ঘাটে মাঠে সেই প্রতিবাদী কণ্ঠকেই ধ্বনিত করেছেন। তাঁরই অনুসারী হয়ে প্রবীর গুহর নেতৃত্বে খড়দা লিভিং থিয়েটার প্রায় পাঁচ দশক ধরে কাজ করে চলেছে। এছাড়া থিয়েটার প্ল্যাটফর্মও একই ধারায় কাজ করে চলেছে। সেও তো বিনোদনের থিয়েটার নয়, প্রতিবাদী কণ্ঠে মানুষের কথাই বলতে চেয়েছে।

মঞ্চ নাটকের বাইরে সেই চল্লিশের দশকের অন্তিম পর্যায় থেকেই পথনাটক প্রচার আন্দোলনে, প্রতিবাদী আন্দোলনে নাট্যকর্মীদের, বিশেষ করে সমাজ সচেতন নাট্য কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। গণনাট্য সংঘের বেশ কয়েকটি পথনাটক দেখে মুগ্ধ হয়ে উৎপল দত্ত লিখেছিলেন— " সংঘের যে দিকটি আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল- সেটি হলো খোলা আকাশের নিচে, বিনা রঙ্গমঞ্চে বিনা আড়ম্বরে রাস্তার পথচারীদের জড়ো করে তাদের সামনে অভিনয়। এর মধ্যে দেখলাম নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবার সম্ভাবনা, বিশেষ করে আমাদের মত দরিদ্র, অশিক্ষিত দেশে মুকুন্দ দাশ যাত্রাকে সর্বোপদেশের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন, এ তারই আধুনিক পকেট সংস্করণ।" পরবর্তীকালে উৎপল দত্ত যেমন পথ নাটক রচনা করেছেন, পাশাপাশি যাঁদের নাম উল্লেখ করতেই হয় তাঁরা হলেন শিব শর্মা, নিখিল রঞ্জন, দীপক সেন, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, দীপায়ন

ভট্টাচার্য, চন্দন সেন, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, অমল রায়, জোছন দস্তিদার ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বহু নাট্যকার। ইতিপূর্বে অনেকগুলি পথ নাটকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ফর্ম ও কনটেন্ট উভয়ই প্রশংসনীয়ভাবে শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ধ্বনিত হয়েছে যথার্থ প্রতিবাদী কণ্ঠ। নৃপেন্দ্র সাহা মন্তব্য করেছিলেন- পথনাটক সৃজনের মহাসংগ্রাম, জরুরি সংযোগের প্রয়োজনে নিত্য নতুন সংকেত আবিস্কার আর রকমারি সংকেতের ব্যবহারে এক রোজকার অগ্নিপরীক্ষা। বস্তুবাদী সংবেদনশীলতায় আর রোজকার সজীবতায় উদ্দীপিত থেকেছে নাট্যকর্মীদের স্নায়ু এবং আজকের পরিস্থিতিতেও যা অনেকাংশে ক্রিয়াশীল। গ্রোটাউস্কি, পিটার্সব্রুক, দারি ও ফো, আওগস্তো বোয়্যালের ভাবনার পথ ধরেই হেঁটেছেন সফদার হাসমি, উৎপল দত্ত এবং সারা বাংলার বহু বহু পথনাটককার। ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁচাতে নাট্যকর্মীরা আজও প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। সময়ের দাবি এবং নিজেদের দায়বদ্ধতা তারা কোন সময়েই উপেক্ষা করেননি আজও করেন না, সে মঞ্চনাটক কিংবা পথ নাটক যাই হোক না কেন। স্বাধীনতার পর থেকেই বহুভাবে বঞ্চিত হয়েছে বাংলা। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সব দিক থেকেই। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি নাট্যকর্মীরাও তাদের সৃজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু বহু অত্যাচার বহু নির্যাতন তাদের পথ রুদ্ধ করতে পারে নি।

তবে রাজনৈতিক প্রতিবাদী থিয়েটার সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় হীরেন ভট্টাচার্যের সতর্কবাণী আমাদের মনে রাখতে হবে, — " রাজনৈতিক বা প্রতিবাদী থিয়েটারের বড় ত্রুটি ঐ থিয়েটারের হিরো বা নায়ক চরিত্রগুলি আমাদের থিয়েটারে যতটা থিয়েটারের বাহন, ততটা প্রাণশক্তির বাহন নয়। বহু কিছু করলেও তারা দর্শকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না।

কেরালায় কিছু থিয়েটার দেখে প্রায় একই সুরে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ মন্তব্য করেছিলেন — " এই চরিত্রগুলি দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টকর হয় যে এরাই সমাজ পরিবর্তনের নেতা।"

কাজেই থিয়েটার অঙ্গনের সর্বস্তরে সে বিষয়ে বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি।

এই ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়েও সাম্প্রতিককালে নাট্যজগতের একটা অংশে বেশ কিছু অন্য ভাবনার বিকাশ চোখে পড়ছে। ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে গত ২৫/৩০ বছরে ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিতর্কিত ঘটনা ঘটে গেছে। সমাজের একাংশের দৈনন্দিন জীবনযাপনের দর্শনও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অপেশাদারিত্বের দর্শন থেকে পেশাদারিত্বের পথে পদচারণা স্পষ্টতই লক্ষ্যণীয়। থিয়েটার চর্চায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনুভবী ভাবনার তুলনায় বৈভবী ভাবনা প্রাধান্য পাচ্ছে। দল চালানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুদান প্রাপ্তির ভাবনা মাথায় রেখে এমন কিছু নাটক লেখা হচ্ছে এবং প্রযোজিত হচ্ছে যাতে সামাজিক দায়বদ্ধতার লক্ষণগুলি নিতান্তই অস্পষ্ট। আসলে বিষয়টা হলো আদর্শ আর ফাঁকির মধ্যে ঘোঁট পাকিয়ে যদি কেউ বা কেউ কেউ সমাজ পরিবর্তনের

কথা ভাবেন, তার থেকে পরিহাসকর বিষয় তো আর কিছু হতে পারে না। কারণ শত আকাঙ্খা, শত স্বপ্ন, শত দক্ষতা কিংবা আত্মত্যাগ থাকলেও নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন এতটাই প্রাধান্য পাচ্ছে এই সময়ে যে, আন্দোলন শব্দটা নাট্যক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বের দাবীদার সে প্রশ্ন থেকেই যায়। সম্পর্কের গল্প বাছাই, রাজনৈতিক বিতর্ক এড়িয়ে সকলের সুনজরে থাকা, ছোটো পর্দায় মুখ দেখানোর স্বপ্ন, সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষিত হবার স্বপ্ন ইত্যকার ঘূর্ণিপাকে নাট্য জগতের একটা বড় অংশই মানুষকে নিয়ে মানুষের জন্য থিয়েটার করার আদর্শ সম্পর্কে সাময়িকভাবে হলেও উদাসীন। এ বড়ো নির্মম সময়। বাজারী অর্থনীতির কালো থাবা থিয়েটারকেও ছেড়ে কথা বলছে না। সবশেষে উৎপল দত্ত'র এবার রাজার পালা নাটকে সেই চন্দ্রশেখর ডোমের গানটি স্মরণ করি—

" যেমন পাপ ঘুচিলে
পৃথিবী পবিত্র বলি শাস্ত্রমত।
দুর্জন ঘুচিলে গ্রাম,
দস্যু ঘুচিলে পথ।।
বাহু ঘুচিলে চাঁদ পবিত্র,
আলো করে ভুবন।
জঙ্গল ঘুচিলে স্থান পবিত্র,
বেণী ঘুচিলে কেশ।
অত্যাচারীর রাজ ঘুচিলে পবিত্র স্বদেশ।।"

স্বদেশকে পবিত্র করার দায় এই সময়কালের থিয়েটার কর্মীরা কি কোনভাবেই অবজ্ঞা করতে পারেন?

লেখক : **দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়,** পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, নাট্যপত্রিকা 'গ্রুপ থিয়েটার' এর সম্পাদক।

বুদ্ধদেব বসুর নাটক ঃ কবি যখন নাটককার

ড. গৌরাঙ্গ দন্ডপাট

বুদ্ধদেব বসু একজন কবি। প্রথমত এবং শেষত কবিত্বই তাঁকে অমর করেছে। সাহিত্যের বহু দিক বলয়ে তাঁর অভ্রান্ত পদচারণা সত্বেও, তিনি একান্তভাবে একজন কবি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন- " তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে যখন উদ্যত হই তখনই ধরা পড়ে যে গভীরতর অর্থে তিনি কবি ছাড়া আর কিছুই নন।"[১] একথাটি বক্তা বুদ্ধদেব বসুর নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কবিতার সূত্র ধরেই তিনি অন্য ক্ষেত্রেও যান। গদ্যের আঁধারেও এক পদ্যের লীলা জড়িয়ে দেন তিনি। অন্তত, গদ্য-পদ্যের একটু লুকোচুরি চলতে থাকে অবিরাম। কাব্যের প্রতি এই প্রেম বুদ্ধদেবের সহজাত। কবিতাই তাঁর স্বতোৎসারিত প্রাণবায়ু। বুদ্ধদেবের জীবনই কবিতা। তাঁর নিজের জবানীতে এর স্বীকৃতি আছে। কবিতা তাঁর কাছে ঠিক কী, নিজেই জানিয়েছেন বুদ্ধদেব এবং সেটিও কবিতারই মারফত,-" বিফল অহমিকার কুটিল চাতুরি/নাকি শুধু অন্য কিছু নেই বলে/এই ছলে কালের প্রহার ভুলে থাকা..." ('কেন যে আঁধার আলোর অধিক')[২]

নাটককার বুদ্ধদেব বসুর কাছে পৌঁছোতে গেলেও আমাদের কবিতার হাত ধরে এগোতে হবে। সদ্য প্রয়াত নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন, কবিতা কবির সম্পত্তি হলেও 'কবিত্ব' যেকোনো স্রষ্টার। " কবিত্বকে প্রকাশ করার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন কবিতার মধ্যে আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু কবিতার সম্পত্তি নয় কবিত্ব"[৩] আর আজকের নাটক তো এক কালের দৃশ্য কাব্য। ফলে কাব্যের আর দৃশ্যের বাঁধন সহজে ছেঁড়ার নয়।

বাংলাদেশে আমাদের নাট্য ঐতিহ্যর দিকে ফিরে দেখলে বুঝি, মাইকেল মধুসূদন থেকে ডি. এল. রায়, গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ- সংলাপের ভাষা কত সহজে বাস্তবকে অতিক্রম করে যায়। উচ্চারণের গভীরে লেগে যায় 'সুর'। এই গীতলতা, বিজন ভট্টাচার্যের মতো রাজনীতি সচেতন নাটককারের লেখা সংলাপেও লেগে থাকে। সে যেন লৌকিক জীবনবোধের মর্ম-গীতলতা। গদ্য-পদ্য-সুর-কথার সবচেয়ে বড় নিরীক্ষক নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ, তবু আধুনিক অর্থে কাব্যনাট্য বলতে যা বুঝি, সচেতন অর্থে তার জন্ম খুব বেশিদিন নয়। বুদ্ধদেব বসুকে সেই অর্থে সচেতন কাব্যনাট্যকার বলতে পারি। যদিও শুধু কাব্যনাটক লেখেন নি তিনি। তাঁর এ যাবৎ প্রকাশিত হওয়া, ছোট বড় নাটকগুলি পাঠ করলে পাঠক বুঝবেন, কতো বিচিত্র বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

।। দুই।।

হয়তো আরো নিরীক্ষা চালাতেন, রচনা করতেন আরো নতুন নতুন নাটক। কিন্তু

একটা সময় নাটক নিয়ে তাঁর মন ভেঙে যায়। মঞ্চের মানুষ ছিলেন না তিনি। তবু নাটককারের চাহিদার সঙ্গে কবি বা কথাসাহিত্যিকের চাহিদা মেলে না। নাটকের মুক্তি যে নাট্যে, নাট্যাভিনয়ে- একথা নতুন নয়। আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ পর্যন্ত সেই কবে তাঁর সাহিত্য-দর্পণ' এ একথা বলে গেছেন।

" দৃশ্য,তন্ত্রাভিনেয়ম্"। মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে আজকের মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সকলেই চেয়েছিলেন তাঁদের নাটক যেন মঞ্চস্থ হয়। সে কারণে তাঁরা তাঁদের নাটককে মঞ্চোপযোগী করার জন্য, বদলাতেও দ্বিধা করেননি। বুদ্ধদেব বসুও চেয়েছিলেন তাঁর নাটক যাতে মঞ্চে অভিনীত হয়। কিন্তু তা হয়নি। নোয়াখালিতে মেয়েদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দাদামশায়ের হাত ধরে প্রথম নাটক দেখা বালক বুদ্ধদেবের। সেই স্মৃতির বর্ণনা দেওয়ার কালে আমরা দেখি, তাঁকে সে বালকবেলায় প্রধানত আকর্ষণ করছে নাট্যের আবৃত্তির ভঙ্গি, অদ্ভূত সুর, কিংবা শব্দের অনুরণন। ছেলেবেলার স্মৃতি কথনে জানতে পারি, নোয়াখালিতে তিনি কেমন করে রীতিমত অভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন। বয়স্ক দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন," ... আশ্চর্যের বিষয় মঞ্চে নামলে আমার তোতলামির চিহ্নমাত্র থাকে না- আমাকে সাহায্য করে আমার উৎসাহ, শ্রোতাদের প্রীতি, আর সবচেয়ে বেশি কবিতার ছন্দ।"[৪]

বুঝতে অসুবিধা হয়না নাটকের ভেতরেও কবিতা খুঁজে চলেন তিনি। সে বয়সে তাদের নির্বাচিত এবং গুরুজনদের প্রিয় পালার সবই পদ্যে লেখা। 'মেঘনাদবধ কাব্য' কিংবা নবীন চন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' এর নির্বাচিত অংশ-সবই পদ্যে এবং কবিতার ছন্দে গড়া নাটক। ছোটবেলার এই নাট্যকৃতি কলকাতাতেও বহাল ছিল। কলকাতা বাসের শুরুতে বুদ্ধদেব বসু যে নিজেকে নাট্যকার রূপে কল্পনা করেছিলেন এ কথা অনেকেই জানেন না। 'কঙ্কাবতী' কবিতায় সদ্য যৌবনা প্রতিবেশিনী কে দেখে বাক্যালাপহীন যে প্রেমের উদ্গাম হয়েছিল, কবিতার সেই একই আবেগ তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল 'একটি মেয়ের জন্য' নাটকটি। যার বিষয় কনের পাকা দেখার দিন সপ্রেমিক গৃহত্যাগ। সেকালের পক্ষে 'সাহসী চুম্বন' দৃশ্য বর্জন ক'রে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল,-বিখ্যাত জগন্নাথ হলে। প্রভুচরণ গুহঠাকুরতার প্রশ্রয়ে লিখে ফেলেছিলেন 'রাবণ' নাটক। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে সে নাটক অভিনীত হবে, মনে বাসনা ছিল তাঁর। কিন্তু হয়নি। মঞ্চাধিকারী হারান ঠাকুরতার পছন্দ ছিল সে নাটক। নাট্যনিকেতনে মহড়া অনেকদূর এগিয়েও ভেস্তে যায়। আরোও অনেক কারণের পাশাপাশি প্রধান কারণ অবশ্যই কোলকাতার রঙ্গমঞ্চের পক্ষে তাঁর 'রোমান্টিক রাবণ' কে গ্রহণ করার অক্ষমতা। মন ভেঙে যায় বুদ্ধদেব বসুর। " নাট্যকার স্বপ্ন চৌচির" হওয়ার পরও ঘরোয়া আনন্দ আসরে নাট্যপ্রীতির নানা নিদর্শন পাই। বলা বাহুল্য এই আসরগুলির মধ্যমণি ছিলেন দুজন,- বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসু। এই ঘরোয়া আনন্দের আয়োজনে লেখা হয় 'অনুরাধা' নাটক। পটভূমি সে আমলের কলকাতা। সংলাপ লিখিত হয় প্রবহমান পয়ারে। সে নাটক কখনও ছাপা হয়নি। যদিও পয়ারে লেখা সংলাপ তাঁর কাব্যনাট্যকার হয়ে ওঠার

প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে। যোগেশ মিত্র রোডের বাড়ির উঠোনে এই নাটকের যখন অভিনয় হচ্ছে, তখন বুদ্ধদেবের বয়েস আঠাশ। সালটা ১৯৩৬। এর বেশ কয়েক বছর পর ১৯৪৪ সালে লিখে ফেললেন একটি রীতিমত বড় নাটক-' মায়া মালঞ্চ'। নাটকটি তাঁর 'কালো হওয়া' উপন্যাস অবলম্বনে লেখা। প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণায় এ নাটকের শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে অভিনয়ের খবর পাচ্ছি। কবিতা বার্ষিকী-২ তে এই প্রযোজনা নিয়ে লিখেছিলেন এই নাটকের অন্যতম অভিনেত্রী তপতী মুখোপাধ্যায়। মনে রাখতে হবে 'রাবণ' কিংবা 'অনুরাধা' এর সংলাপের থেকে 'মায়া মালঞ্চ' সম্পূর্ণ আলাদা। এ নাটকটি গদ্যে লেখা। কবির হাতের ছোঁয়া আছে,- এই পর্যন্ত। কন্যা এবং 'পাতা ঝরে যায় ও অন্যান্য' নাটকের প্রকাশক দময়ন্তী বসু সিং জানিয়েছেন, ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৬তে সুবিখ্যাত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' লেখার মাঝে বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টি রাজ্যে নাটক নেই। ব্যতিক্রম ১৯৬৬তে লেখা 'অশ্লীলতা'কে বিষয় করে 'চরম চিকিৎসা'। যদিও দেশ পত্রিকায় সেটি প্রকাশ পেয়েছে ১৯৬৮। 'হিতাকাঙ্খী' নামের একটা ছোট নাটিকা 'শারদীয়া মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও সন তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না।

।। তিন।।

যাটের দশকের শেষে তাঁর নাট্য রচনায় ফিরে আসা, একের পর এক উচ্চাঙ্গের নাট্য সৃষ্টি - আমাদের বিস্মিত করে। ১৯৪৪ সালের পর নাটক লেখা কিংবা মঞ্চের সাহচর্য- কোনোটিরই খবর নেই। ততদিনে তিনি প্রতিষ্ঠিত কবি। বাংলাদেশের কবি হবার স্বপ্ন দেখা যুবকের আশু স্বপ্ন, বুদ্ধদেব বসুব 'কবিতা' পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশ। সাহিত্য, বিশেষত রবীন্দ্র সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসু স্বনামধন্য। দেশ বিদেশের জ্ঞান সাগরের উন্মুখ ও অক্লান্ত পাঠক তিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রাণপুরুষ। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং অধ্যাপক। এ সবের পর আবারো তিনি নাটকে ফিরলেন। জীবনের শেষ একটা দশক নাটকের সঙ্গে স্বেচ্ছা সহবাসের কারণ জানতে মন চায়। বুদ্ধদেব বসুর স্নেহধন্য সমীর সেনগুপ্ত লিখেছেন-

" এই সময় থেকে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' থেকে তাঁর নাট্য রচনার যে-পর্যায় শুরু হল, সেখানে দেখতে পাচ্ছি মঞ্চ যোগ্যতাই তাদের একমাত্র গুণ নয়। নাটকের ফর্মটি ব্যবহার করে কাব্য রচনা- এবং পুরাণের পুনর্জন্মদান- এই দুটি এই পর্যায়ের নাটকের আসল লক্ষ্য।" [৫] সমীর সেনগুপ্তর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এ আসলে কাব্যেরই অন্যক্ষেত্র। কবিতার প্রকরণ ও শৈলীতে যার প্রকাশ কিছুটা বিস্তৃতি চায়। যখন কোনও নাটকীয় কাহিনী আশ্রয় চায় কাব্যবোধে, কিংবা বর্ণনাত্মক কথন' সংলাপের আশ্রয়ে অতিরিক্ত অর্থ পেয়ে যায়,-তখনই হয়তো 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' এর মতো কাব্যমূল্যে ভরপুর নাটকের কাছে আসতে হয়। বুদ্ধদেবের নিবিষ্ট পাঠক লক্ষ্য করবেন, তার কাব্যের বিষয়, - প্রেম মোহ কাম মুক্তি এবং পুরাণ,- তার কাব্য-প্রধান নাটকগুলিরও বিশেষত্ব। তবু নিছকই কবিতার অন্যরূপ হিসেবে ভাবা অন্যায় হবে তাঁর এই পর্যায়ের নাটককে। এদের নাট্যগুণও যথেষ্ট। নতুন করে নাটক লেখায় ফেরার

সময়ও এগুলির অভিনয় ভবিষ্যত নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন তিনি। কন্যা রুমিকে লিখছেন- " হঠাৎ একটা নাটক লেখায় হাত দিয়েছি- দুটো অংকের খসড়া তৈরি হয়েছে,... লিখি আর ভাবি কি হবে হয়তো অভিনয়যোগ্য হবে না, বই বেরোলেও বিক্রি হবে না।" যদিও এই চিঠিতেই তাঁর আশা, "শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের নাটুকে দল বেশ কয়েকটা তৈরি হয়েছে আজকাল, তাদের পুঁজি বেশিরভাগ বিদেশী নাটকের এডাপ্টেশন, সেদিক থেকে অন্তত একটা সম্ভবপর চাহিদা আছে। দেখা যাক।"[৬]

আধুনিক বাংলা কাব্যনাটকে দিলীপ রায়, রাম বসু, গিরিজাশঙ্কর কিংবা কৃষ্ণ ধরের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মিল বেশি। অন্যদিকে অলক রঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় হয়ে তরুণ সান্যাল পর্যন্ত কেউই নাটকের মঞ্চ সফলতা নিয়ে তেমন কিছু ভাবেন নি। 'সংলাপ কাব্য'- শব্দবন্ধে মঞ্চের দায় নেই। একসময় ভার্স ড্রামা, পোয়েটিক ড্রামা, ড্রামাটিক পোয়েট্রি নিয়ে যে তত্ত্ব এবং বিতর্ক হয়েছে, তার নির্যাসটুকু চেটেপুটে নিলে প্রশ্ন আসে, কবিতার জন্য নাটক নাকি নাটকের জন্য কবিতা? নাট্যকাব্যে কাব্যের মুক্তি বড় কথা, কিন্তু কাব্যনাট্যে কাব্য, নাটকের প্রধান হাতিয়ার। জীবনের অতল গভীরে যে নাটক, তাকে তুলে আনা কাব্যনাট্যের কাজ। ইয়েটস যেমন নাটক কে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে যেতে চান, এলিয়ট তা চান না। তিনি বরং নাটকীয়তাকেই কবিতার মধ্য দিয়ে টেনে বার করার কথা বলেন। " Dramatic situation such a point of intensity"[৭]তে পৌঁছলে, সংলাপ' অবলীলায় দর্শকের বিশ্বাসযোগ্য কাব্য-তরঙ্গ তৈরি করে নেয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণটি এলিয়েটের । মনে হয়, বহুক্ষেত্রেই বুদ্ধদেবের কাব্যনাটক -ভাবনা এলিয়েটের কাছাকাছি। নাটকের মুক্তির দূত হয়ে এসেছে কাব্য, কাব্যত্ব। বুদ্ধদেব বসু নিজে প্রকরণগত দিক থেকে 'অনাম্নী অঙ্গনা, 'প্রথম পার্থ', 'সংক্রান্তি' ও 'কালসন্ধ্যা'কে কাব্যনাট্য বলেছেন। তা বলে গদ্যে লেখা বলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী, 'কলকাতার ইলেকট্রা', 'পাতা ঝরে যায়' অথবা 'সত্যসন্ধ' - অকাব্যিক নাটক হয়ে যায় না। 'কবিত্ব' এই নাটক গুলিরও প্রাণ। অমিয় দেব যথার্থ লিখেছিলেন- " তাঁর কাব্যনাট্য পদ্যবাহী নাটক, কিন্তু কবিতায় সমৃদ্ধ। আসলে পদ্য মাত্রই যে কবিতা নয়, এবং গদ্য মাত্রই যে অ-কবিতা নয় সেই ভাবনা জাগ্রত ছিল বুদ্ধদেব বসুর। জানতেন গদ্যকে কবিতা করে তুলতে হয়। তার জন্য চাই স্বভাবোক্তির পাশে বক্রোক্তি, তার জন্য চাই উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চাই সংবেদনের ঘনতা আর ফাঁকে ফাঁকে বোধের উন্মেষ।"[৮]

।। চার।।

বুদ্ধদেব তাঁর নাটকের অভিনয়, খুব একটা দেখে যেতে পারেননি। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটি বিচ্ছিন্ন আয়োজনসহ তিনি "শৌভনিক" নাট্যগোষ্ঠীর মুক্তাঙ্গনে শততম রজনী দেখে যেতে পেরেছিলেন । আর শুনেছিলেন বম্বে'তে এক্সপেরিমেন্টাল প্রোডাকশনের ইংরেজি অনূদিত 'বাবু ও বিবি' এবং 'Leaves Fall'অভিনয় হচ্ছে, ডলি রিজভির পরিচালনায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাটকে যেমন বহুরূপী ' এর শম্ভু মিত্র, তেমনি বুদ্ধদেব

বসুর কাব্যনাটক কে 'থিয়েট্রন' এবং 'স্বপ্নসন্ধানী' মঞ্চে জনপ্রিয় করেছিল। বারংবার অভিনীত মঞ্চ সফল থিয়েট্রনের প্রযোজনা 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'প্রথম পার্থ' কিংবা 'স্বপ্নসন্ধানী' এর কৌশিক সেনের পরিচালনায় জনপ্রিয় প্রযোজনা- 'প্রথম পার্থ', 'কলকাতায় ইলেকট্রা', 'অনাম্নী অঙ্গনা'- বুদ্ধদেব দেখে যেতে পারেননি। বহুরূপীর 'কালসন্ধ্যা' কিংবা 'নান্দীকারের 'পাতা ঝরে যায়' ও তাঁর ছেঁষট্টি বছরে (১৯৭৪) মৃত্যুর কারণে দেখা হয়না। দেখা হয় না, ব্লাইন্ড দৃষ্টিহীন কুশীলবরা পরিচালক শুভাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, 'সংক্রান্তি ' নাটকের ধৃতরাষ্ট্রের শারীরিক ও মননের অন্ধতাজনিত প্রশ্ন গুলিকে কী অপূর্ব মুন্সিয়ানায় শিল্পময় নাট্যহিসেবে মঞ্চায়িত করেন!

কাব্য প্রধান নাটকগুলির মূল কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন রামায়ণ এবং মূলত মহাভারত থেকে। 'কলকাতার ইলেকট্রা' গড়ে উঠেছিল গ্রীক পুরাণকে বিষয় করে। মহাভারতের কথা'য় মহাভারতের গোত্র বিচার করতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন- " ... সেই সব সগর্ভ ও অনিঃশেষ রহস্যপূর্ণ চিত্রকল্প যাকে য়োরোপীয় ভাষায় ' মিথ' বলা হয়, আর হিন্দুরা আরো দৃষ্টিবান ভাবে যার নাম দিয়েছিলেন পুরাণ- একাধারে আদিম ও চিরন্তন, চিরপুরাতন ও চিরনতুন সেই সামগ্রী।"[৯]

সে সামগ্রীর কাব্যময় নাটকীয় ব্যবহারে বুদ্ধদেব বসু একজন সফলকাম ব্যক্তি। পুরাণের আধুনিক ব্যবহারে তাঁর নাটকগুলি এক দার্শনিক প্রস্থানভূমি নির্মাণ করতে পেরেছে। দিতে পেরেছে ভিন্নতর এক সাহিত্যক সংবাদ। পুরাণকে ব্যবহারের যোগ্যতর ধরণই পার্থক্য গড়ে দেয়। আর এক একটি পুরাণ নির্ভর, বা পুরাকল্প সমৃদ্ধ সাহিত্যের যোগ্য পাঠও নির্ভর করে যোগ্য সমালোচকের ওপর। এর কোনও সুনির্দিষ্ট পন্থা নেই। যেমন কমলেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার' গ্রন্থে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাট্যপাঠে সঙ্গতভাবে ফ্রেজার কথিত নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকে উপজীব্য করেছেন। আমাদের মনে হয়, 'কালসন্ধ্যা', সংক্রান্তি' নাটক দুটিকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে পড়া উচিত। আবার 'প্রথম পার্থ', 'অনাম্নী অঙ্গনা', কিংবা 'কলকাতার ইলেকট্রা' এর অন্দরে, মিথের সাহিত্য হয়ে ওঠাকে বুঝতে ফ্রয়েড-ইয়ূং এর চিন্তা আমাদের কাজে লাগবে। যাকে আমরা মনঃসমীক্ষণের 'আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজম' বলে চিনি। এই নাটকগুলিতে, পুরাণ চরিত্রের নতুন পাঠে সমকালীন জীবনের জট-জটিলতা গুলিতে শিল্পসম্মত ভাবে ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পুরাণ চরিত্রগুলি তাদের প্রতিবেশে এক থেকেও তৈরি করেছে একালের নিহিত তাৎপর্য।

তবে চরিত্রগুলি সমকালকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ধরতে পারলেও, সমকালের রাজনৈতিক উত্তাপের আঁচ সরাসরি নাটকের মধ্যে আসেনি। যে সময়ে তাঁর জনপ্রিয় নাটকগুলি লেখা হচ্ছে, সেই ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত- স্বাধীনতা উত্তরকালে সবচাইতে উত্তপ্ত সময়। রাজনৈতিক স্বপ্ন, আদর্শ, ভিন্ন আদর্শের রক্তাক্ত লড়াই, রাষ্ট্রশক্তির সীমাহীন পুলিশি সন্ত্রাস, গণতন্ত্রের হত্যা, স্বপ্ন-ভঙ্গ, এবং শেষত সাতাত্তরে ক্ষমতা বদল,-ষাট -সত্তরের এই ভয়াবহ সময়টি তেমনভাবে তাঁর নাটকে আসেনি। সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্য কর্ম রাজনৈতিক

সংস্কৃতি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিল। সাহিত্যিক হিসেবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাসভূমি। তাঁর সমকালের কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই যখন সময়ের দাবিতে বাম মনস্ক হয়ে উঠেছিলেন, তখনও তিনি অত্যন্ত সচেতন এবং সতর্কতা নিয়ে রাজনৈতিক ওঠাপড়া থেকে, নির্দিষ্ট আদর্শ-জারিত সাহিত্য থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। এবং এনিয়ে তাঁর অনুশোচনা ছিল না। অনেক বন্ধু বিয়োগ হয়েছিল । তাঁর কাব্য-কবিতা-মেধার ভক্তরাও তাঁকে নিভৃতচারী ভেবে দূরত্ব বাড়িয়ে ছিলেন। কেন এমনটা হয়েছিল, এ এক পৃথক অবতারণা। তাঁর জন্য পৃথক প্রবন্ধ লিখতে হয়। এতটুকু বলা যায়, তাঁর সুবিখ্যাত 'কবিতার শত্রু মিত্র' পাঠে বোঝা যায়, রাজনৈতিক আদর্শ এমনকি অতিরিক্ত সমাজ মনস্কতাকেও তিনি কবিতার মিত্র ভাবতে পারেননি। আবার, শিল্প শিল্পের জন্য 'শ্লোগানধারী কলাকৈবল্যবাদের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-চিন্তার কিছুটা অমিল আছে। নইলে কেন লিখবেন ঃ- " শিল্পের জন্য শিল্প কথাটাও অর্থহীন, কেননা মানুষ ছাড়া কেই বা আছে তার স্রষ্টা বা ভোক্তা।"[১০]

।। পাঁচ।।

আমরা জানি, ব্যক্তি সাহিত্যিকের রাজনীতি নিরপেক্ষতার,- এই তাত্ত্বিক অবস্থান তাঁর 'সাহিত্যে' সর্বদা মেলে না। হয়তো এ কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তামসিক প্রলয় মুহূর্তে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে। সেই কারণেই 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবিতায় বুদ্ধদেবকে লিখতে হয়েছিল-"অন্তরে লভেছি তব বাণী/তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে জানি" মনে করিয়ে দিয়েছেন নরেশ গুহ।[১১] আর শেষ বয়সে আর এক লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া উথাল পাথাল সময়ে, তাঁর নাট্য নির্মাণের গভীরে উঠে এসেছিল জীবনের বহুতর অর্থ। আর নীতি নৈতিকতার বিক্ষোভ-বিরোধের সে রক্তাক্ত সময়ে তাঁর নাটক খুঁজে বেড়াচ্ছিল, মানুষের নৈতিক জীবনকে। কখনো রামায়ণ, কখনো মহাভারত কখনও বা গ্রীক পুরাণের মধ্যস্ততায়।

ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনীটির প্রতি আকর্ষণ ছোটবেলার। রবীন্দ্রনাথের পতিতা' কবিতার সূত্রে। এছাড়াও কালীপ্রসন্নের মহাভারত, বুদ্ধজাতকের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের এই সংক্রান্ত কাহিনীটি তাঁর জানা ছিল। তারতম্য সত্ত্বেও এই কাহিনীর মিল ছিল, কুমার তাপসের কৌমার্য হরণের মধ্য দিয়ে বৃষ্টিপাত তথা উর্বরতার মিথটি। সভ্যতার কোন আদি প্রহর থেকে বৃষ্টি-বীর্য, প্রজনন ও ফসল, - সৃষ্টির যে কামনাময় অভিলাস সভ্যতার মর্মে প্রোথিত, ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যান তারই দ্যোতনাবাহী। এর সঙ্গে জুড়ে গেছে প্রেম-রোমান্স, কামনা এবং মুক্তির প্রিয় প্রসঙ্গ। শুধু তাই নয়, নাটককার বুদ্ধদেব সেই একক পতিতার রোমান্টিক প্রেমকেই তার নাটকে বিস্তার দিলেন। অন্তস্থলের মনোগত চাওয়া-পাওয়া উৎকণ্ঠা-শিহরণ আর মুক্তির নাট্যরূপ আঁকলেন, জীবনের প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে। রাষ্ট্রীয় চাতুরি, জনতার আকাঙ্খা, প্রেম-প্রণয়, ত্যাগ-তিতিক্ষা, পিতৃত্ব-মাতৃত্ব, - আরো বহুতর বিষয়কে তাৎপর্যময় ভাবে প্রকাশ সম্ভব হলো এই একটি মাত্র মিথিক উপাখ্যানকে ভর করে। এ অসাধ্য সাধন হলো আধুনিক সমর্থ কবির নাট্য রূপায়নে। 'কালসন্ধ্যা' নাটকে বিষয় করা হয়েছে মহাভারতের মৌষল পর্বকে।

মানব ইতিহাসের এক আদি সত্যের নাটক রূপান্তর ঘটিয়েছেন নাটককার । নিজেই মুখবন্ধে লিখেছেন "...বলাবাহুল্য দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহু দূরে প্রসারিত। এর মর্মে মানব ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান।" [১২] নাটকের শেষ সংলাপে উঠে আসে নাটকের মর্মার্থ-

" এই সব কুশীলব-ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার
একমাত্র অক্ষকেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার"[১৩]

এমনি আর এক মহৎ বংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার নাটক 'সংক্রান্তি'। 'সংক্রান্তি'কে সফলভাবে মঞ্চায়ণ করেছিলেন পরিচালক শুভাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁতঘর 'পত্রিকায় তিনি লিখেছেন-"আমাদের ধারণায় এটাই বোধহয় বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য। এতখানি সমাজ স্বদেশ বিষয়ক ন্যায়-অন্যায় ধর্ম অধর্মের তর্ক অন্যত্র নেই।"[১৪] কুরুক্ষেত্রের শেষ দিন দুর্যোধন ও তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও মাতা গান্ধারীর দুই পৃথক ধর্মব্যাখ্যার মধ্যেই নাটক -পতন, অবলুপ্তি ও নৈরাশ্যময় সমাপ্তির দিকে এগিয়েছে। যখন, হত্যা-প্রতিহত্যা, হিংসা-প্রতিহিংসার আগুনের পুড়েছে নাটককারের সমকাল। অন্যদিকে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি ইয়েটসের পার্গেটারি", যেখানে কিঞ্চিদধিক দু'শো পংক্তির মধ্যে একটা মহৎ ট্র্যাজেডিকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' [১৫]

নাটকটির ভারতীয়করণের একটি প্রধান কারণ এর বহিরঙ্গ আইরিশ ও শিরোনামা খ্রিস্টান হলেও এর ভেতরকার কথাটি হিন্দু ভাবাপন্ন। এই ছোট নাট্য কবিতাটিকে বুদ্ধদেব বসু স্থাপন করেছেন ভারতবর্ষের বাদশাহী আমলে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায়। নাটকটির চরিত্র পিতা ও পুত্রের সংলাপে কোন পৌরাণিক প্রেক্ষিত নেই। তবু পিতা-পুত্র পরম্পরা, জন্মান্তর ও ইচ্ছা-হত্যার এই নাট্যকাহিনী, চিরকালীন মিথিক কাহিনীর ওপরেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবুও একে কাব্যনাটক বলতে মন চায় না। নাট্য-কবিতা হিসেবে ভাবতে ভালো লাগে,।

প্রথম পার্থ অনাম্নী অঙ্গনা- মহাভারতের কাহিনী নির্ভর মনস্তাত্ত্বিক নাটক। প্রথম পার্থ, রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' এরই বিস্তৃত নাট্যরূপ। কর্ণর ক্ষমতা-কুর্শি-মোহ-মায়া এবং প্রেম প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে যেমন একটা ব্যক্তি মানবের মনস্তত্ত্ব উঠে এসেছে। তেমনি এসেছে বুদ্ধদেব বসুর সমাজ-রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতিরূপ। উঠে এসেছে সমকালীন সমাজমনের এক গভীর আভাস। নজর এড়ায়নি গুণী সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। লিখেছিলেন-"যে সময়ে এ নাটক লেখা হচ্ছে সে সময়টাও বাংলাদেশে এমনটাই। কুন্তীর মত ব্যবহারিক সাফল্যের প্রলোভন হাতছানি দিচ্ছে বারে বারে। কর্ণের মতো আদর্শবাদী ভূমিকা নিয়েই কাউকে বলতে হচ্ছে নিজের বীর ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকার ট্র্যাজিক সংকল্প।"[১৬] 'অনাম্নী অঙ্গনা' এর নাট্যকাহিনীতে আছে যেকোনও মূল্যে রাজবংশ রক্ষা করার মিথ। মহাভারতের আদিপর্বের ১০৬নং অধ্যায় এর মূল। বিদুরের জন্ম বৃত্তান্তের সূত্রে বিদুর মাতা সেই অনাম্নী অঙ্গনার মানসতা কে আধুনিক রুচি আর আদর্শ দিয়ে গড়ে তুলেছেন বুদ্ধদেব।

মহাভারতকার যেখানে কেবলমাত্র বর্ণনাকার, সেই বর্ণনার ভেতর থেকে তিনি গড়ে তুলেছেন নাটকীয়তায় রঙিন সব অনুভূতি মালা। আর "কলকাতার ইলেকট্রা প্রসঙ্গে ইস্কাইলাস, ও নীলের Morning Becomes Electra , এবং জা -পল-সার্ত্র প্রমুখের নাট্যপ্রয়াসের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন" এরা সকলেই স্বীয় দেশ কাল ও জীবন দর্শন অনুসারে গ্রীক পুরাণের এই করুণ ভীষণ মোহিনীকে ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নতুনভাবে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন; আমিও সমকালীন বাংলাদেশের পটভূমিকায় সেই চেষ্টাই করেছি,"[১৭] আমরাও দেখেছি বুদ্ধদেব বসুর প্রিয় ও পছন্দসই 'একলা মানুষ' এর মননের অতল গভীরতা, কীভাবে ঋষ্যশৃঙ্গের শেষত ত্যাগী রূপ, প্রথম পার্থ' এর একক নিভৃত উচ্চারণ, এবং সংক্রান্তি'তে কুন্তীর নিজস্ব দাহের সঙ্গে 'কলকাতার ইলেকট্রা' রূপী শম্পার প্রতিশোধ স্পৃহার মহৎ অন্ধকারকে এক জায়গায় এনে দাঁড় করায়।

।। ছয়।।

ষাট সত্তরের প্রতিবেশ ঘুর পথে বুদ্ধদেব বসুর নাটককে রঞ্জিত করলেও একটু মনোযোগ দিলে বোঝা যায় তার নাট্য ভাবনা ও শৈলী, ভীষণভাবে স্বতন্ত্র। তাঁর নাটক চাইলেই নির্মাণ করা অসম্ভব। তার জন্য মানসিক এবং বৌদ্ধিক প্রস্তুতি জরুরি। তাছাড়া কবিতার বোধ, ছন্দ-রেখা-সুরের বোঝাপড়াও জরুরি তাঁর নাটকের ভেতরে পৌঁছতে। আজকের বাঙালি অভিনেতার সে প্রস্তুতি তেমন থাকে কি? তাঁর ' পুর্ণজাগরণ, 'বাবু ও বিবি', 'সত্যসন্ধ', কিংবা 'নেপথ্য নাটক',-এর মতো অনেক সম্ভাবনাময় নাটক বাংলা রঙ্গালয়ের আলো দেখেনি। কাব্যনাটক গুলিতো প্রতি প্রজন্মের পরিচালকদের দিয়ে নতুন করে নির্মিত হওয়া দরকার। তাঁর বিখ্যাত নাটক সম্পর্কে খেদ একটাই। সবই কালের অবশ্যাম্ভাবী নিয়মাধীন-এই দার্শনিক প্রতীতি নাট্যপরিণতিকে কেবলই মহাকালের আশ্রয়ে ঠেলে দিতে চায়। কাহিনী ও চরিত্রের দহন শেষত একটা দার্শনিকতায় মুক্তি খোঁজে। সবক্ষেত্রে তার বোধহয় দরকার ছিল না।

সূত্রপঞ্জী:

১. বুদ্ধদেব বসু, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, ২০০১, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃ. ২৬

২. বুদ্ধদেব বসু, রচনা সংগ্রহ :৯, সম্পাদনা, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ১৩৯১, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১১২

৩. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার সংগ্রহ : দেবাশিস মজুমদার, পূর্ব পশ্চিম বার্ষিক নাট্যপত্র, ২০০৮, কলকাতা, পৃ.২১৮

৪. বুদ্ধদেব বসু, আমার ছেলেবেলা, ২০০৪, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ, পৃ. ৪৮

৫. সমীর সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, ১৯৯০, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, বিশেষ সংগ্রাহক

সংস্করণ, পৃ. ৩৪৮ পৃ. ২৬

৬. দময়ন্তী বসু সিং (স্মৃতি, সূত্র সম্পাদন), বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, কনিষ্ঠা কন্যা রুমিকে, পত্র ক্রমাঙ্ক: ৭০, পত্র তারিখ: ১২.০২.৬৬, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১১৬

৭. T. S. Eliot, Selected Prose, 1975, Faber and Faber, London, First Published edition, Reprinted 1984, page 74.

৮. অমিয় দেব, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য,তাঁতঘর, একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৬ সম্পাদক: অরূপ আস, হুগলি, পৃ. ১৩

৯. বুদ্ধদেব বসু, রচনা সংগ্রহ :১১, মহাভারতের কথা, ১৪০০, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৯-২০

১০. বুদ্ধদেব বসু, কবিতার শত্রু ও মিত্র, ১৯৭৪, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশিত সংস্করণ, পৃ. ৩৮

১১. নরেশ গুহ, ছিলো না বনের মৃগ, ১৯৭৪, শব্দমন্ত্র পত্রিকা, কলকাতা, পৃ. ২১

১২. বুদ্ধদেব বসু, রচনা সংগ্রহ: ১২, ঐ, তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী, পৃ. ৪৪৩

১৩. বুদ্ধদেব বসু, রচনা সংগ্রহ, ১২ , ঐ, পৃ. ৩৭২

১৪. শুভাশিষ গঙ্গোপাধ্যায়, কাব্যনাট্য সংক্রান্তি ও ব্লাইন্ড অপেরা, তাঁতঘর: একুশ শতক, ঐ, পৃ. ৮৪

১৫. বুদ্ধদেব বসু, রচনা সংগ্রহ, ১২ ,নাট্যমুখবন্ধ, ঐ, পৃ. ২৯৭

১৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ: অনুসঙ্গ, আধুনিক জীবন ও পুরাণ ছায়া, ১৯৯০, দে'জ, কলকাতা, পৃ.২৪৩

১৭. বুদ্ধদেব বসু, রচনা সংগ্রহ, ১১ , ঐ, পৃ. ৩৪৫

লেখক : **গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট**, পি.এইচ.ডি(কল) ২০১২। সহকারী অধ্যাপক ড:এ.পি.জে. আবদুল কালাম গভ. কলেজ। সম্পাদক- 'তান' (প্রয়োগ কলা বিষয়ক)

ছয়ের দশকে গণনাট্য সংঘে ভাঙন ও পুনর্গঠন একটি রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধান

অর্পণ দাস

যে-কোনো গণ-সংগঠনের উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সময়ের দীর্ঘ ইতিহাস। আমরা যদি বাংলায় গড়ে উঠা বামপন্থী গণ-সংগঠনগুলির ইতিহাস খুঁজি, তাহলে দেখতে পাব উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মতাদর্শগত দৃঢ় ভিত্তি সেগুলির উত্থানকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এ-পথেই আলো জ্বেলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সূচনা। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অশুভ আঁতাত বাঙালির কাছে ছিল এক মর্মান্তিক অগ্নিপরীক্ষা। আবার ছয়ের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের ইতিবৃত্ত এবং মতাদর্শগত সংঘাতের সঙ্গে জড়িয়ে যায় তার ভবিতব্য। অসংখ্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিল তিল করে গড়ে তোলা গণনাট্য সংঘের নাট্য-আন্দোলন রাজনৈতিক টানাপোড়েনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। মানবমুক্তির প্রেরণা নিয়ে যে-থিয়েটারের আবির্ভাব, ক্রমে তার পরিণতি হলো পার্টি ও পরে সরকারের প্রচারযন্ত্রে।

পথ ও মতের দ্বন্দ্ব সংঘের ইতিহাসের নতুন কিছু নয়; উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নতুন সমাজের খোঁজ করার রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নও ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। বিশেষ করে স্বাধীনতার পরে রনদিভের 'ঝুটা রাজনীতি'-র সময়ে। এলাহাবাদ সম্মেলন থেকে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয় যে ধানের ক্ষেতের শুধু ফুল ফোটালে চলবে না, ধান বুনতে হবে।[১] গণনাট্য সংঘ যদিও নিজেকে পার্টির প্রত্যক্ষ সংগঠন বলে দাবি করেনি, তবুও পার্টির পদচিহ্ন অনুসরণ করার প্রবণতা সংঘের সার্বিক শিল্প-প্রযোজনা ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

পার্টি রাজনৈতিক অবস্থান বদলানোর পর নতুন সম্পাদক হন অজয় ঘোষ। যিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রগতি কথাটা অস্পষ্ট, তাই যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল নয়, গণনাট্য সংঘ তাই-ই করবে।[২] আবার ১৯৫৪ সালে গণনাট্য সংঘের সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে কেরালার কমিউনিস্ট নেতা ই.এম.এস নাম্বুদ্রিপাদ প্রশ্ন তুলেছিলেন গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সংগঠনের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা?[৩] সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে 'সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি'-কে স্বাগত জানিয়ে প্রগতিশীল নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির একজন করে প্রতিনিধি গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয়। সংঘের শাখা ও নাট্য-প্রযোজনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এক ধরণের 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রভাব'[৪] গণনাট্যের মূল উদ্দেশ্যকে ক্রমে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

পাঁচের দশকের শুরু থেকেই স্বাধীন ভারতবর্ষের চরিত্র নির্ণয়, শাসকের শ্রেণিগত অবস্থান, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিন ও রাশিয়ার বিপ্লবের পার্থক্য প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের

অবকাশ তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষ আধা সামন্ততান্ত্রিক না আধা -বুর্জোয়া, সেই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া গেলেও ভারত সরকারকে বলা হলো 'বৃহৎ পুঁজিবাদীশ্রেণি কর্তৃক পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির সরকার'।[৫] যদিও "শাসক শ্রেণিগুলির মধ্যে নেহরু হইতেছেন সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল।"[৬] নেহরুর শান্তিনীতির মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করা হয়। সম্ভবত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিই তার প্রধান কারণ। ১৯৫৬-র পালঘাট সম্মেলনে গণতান্ত্রিক শক্তি ও সরকারের প্রগতিশীল অংশের মিলনে একটি 'জাতীয় ফ্রন্ট' গঠন গড়ার প্রস্তাব নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়। চৌ এন লাই ও ক্রুশ্চেভের ভারত-সফরে নেহরুর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতাও অনেকের মনে প্রশ্ন তুলেছিল।

একই সময়ে চিন-রাশিয়ার মতাদর্শগত পার্থক্য সহ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পট পরিবর্তনের ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব আরও বেশি প্রকট হতে থাকে। পালঘাট সম্মেলনে স্তালিনের মূর্তিপূজা নিয়ে একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলার কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। ১৯৫৭-তে বারো পার্টির দলিল ও ১৯৬০ সালের একাশি পার্টির দলিলে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্ব' এবং গৃহ যুদ্ধ ব্যতিরেকে পার্লামেন্টারি পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিতে সিলমোহর দেওয়া হয়। কিন্তু চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ২৫ পয়েন্টের একটি দলিলে তারা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত ভূমিকায় স্থাপন করে। দলিলটিতে বলা হয়েছিল,

"যতদিন সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ও মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ বর্তমান রয়েছে ততদিন যুদ্ধহীন পৃথিবীর কথা বলা এক নিছক বিভ্রান্তি।"[৭] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি শান্তির পক্ষে রায় দিলেও সকলের কাছে পক্ষ বেছে নেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। কিউবা সংকটে বা সুয়েজ খালের সমস্যায় রাশিয়ার সহযোগিতা যেমন প্রশংসনীয় ছিল, তেমনই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে চিনের ভূমিকাও অনস্বীকার্য ছিল। সোভিয়েত না চিন- এই বিতর্কে ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে ফাটল ব্যাপক রূপ নিতে থাকে।

১৯৫৯-এ তিব্বতের দলাই লামাকে ভারত সরকার আশ্রয়দান করে। ১৯৬০ সালে চিন ম্যাকমোহন লাইনকে অস্বীকার করে ভারতের বেশ খানিকটা অংশ নিজেদের সীমান্তে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্পষ্ট চিন বিরোধী অবস্থান না নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়ায় ভারতের বাতাসে কমিউনিস্ট বিরোধিতার বিষ ছড়ানো শুরু হয়। পার্টির মধ্যেও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। যারা রাশিয়ার 'শান্তি'র নীতিতে ও নেহরুর প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী তারা হয়ে গেলেন 'সংস্কারবাদী'। আর যারা চিনের জাতীয় সংগ্রামের তত্ত্ব ও নেহরুকে বুর্জোয়ার রক্ষক রূপে বিশ্বাস করতেন তারা অপর দলের কাছে হয়ে গেলেন 'সংকীর্ণতাবাদী'। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬২-র নির্বাচনে 'বিকল্প সরকার'- এর ডাক ব্যর্থ হলেও পার্টির ভোট ব্যাঙ্ক ও আসন বৃদ্ধি পায়।

১৯৬২-র এপ্রিলে উভয়পক্ষের দীর্ঘ বিতর্কের পর শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে কমিউনিস্ট

পার্টির নতুন চেয়ারম্যান হন। অক্টোবরে চিন সীমান্তে শুরু হল সংঘর্ষ। বাংলার প্রাদেশিক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চিনকে আক্রমণকারী বলতে নারাজ, তাদের মতে ভারতই 'প্ররোচনাদাতা'। পলিটব্যুরো চিনকে আক্রমণকারী বলে নেহরু সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল। 'প্ররোচনা'-র তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মধ্যে জ্যোতি বসু ও আর দুজন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীতে থেকে পদত্যাগ করেন। যুদ্ধ মিটে গেল, কিন্তু ভাঙন জোড়া লাগল না। ১৯৬৩-তে 'পৃথ্বীরাজ' ছদ্মনামে সমর মুখার্জি 'পার্টির সামনে গুরুতর সংকট' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে 'উগ্র-জাতীয়তাবাদী' নেহরুপন্থী 'সংশোধনবাদী'-দের হাত থেকে পার্টিকে রক্ষা করার ডাক দিলেন।[৮] ১৯৬৪-র মার্চে আকস্মিকভাবে জাতীয় মহাফেজখানা থেকে আবিস্কৃত হল বর্তমান পলিটব্যুরো চেয়ারম্যান ডাঙ্গের ১৯২৪ সালে ইংরেজ সরকারকে লেখা 'মুচলেকা'। অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ পার্টিতে এই ঘটনা ছিল পার্টি ভাঙার ঠিক আগের ধাপ। 'শ্রেণিসমন্বয়বাদী' ও 'বিভেদকামী'দের বিরুদ্ধে জ্যোতি বসু লিখলেন 'ডাঙ্গে চক্রকে অগ্রাহ্য করুন'[৯]

১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালীতে জাতীয় পরিষদ বিরোধী ৩২ জনের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। তেনালী নিজেদের 'প্রকৃত বামপন্থী' দাবি করে পলিটব্যুরো ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের ডাক দেয়। দুটি গোষ্ঠী আলাদা ভাবে সপ্তম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের পর পার্টি ভাঙনের কাজ সমাপ্ত হল। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে কেরালায় বিধানসভা নির্বাচন। ভোটে লড়ার জন্য নির্বাচন কমিশনে নথিবদ্ধ হল একটি নতুন নাম ও একটি নতুন চিহ্ন। 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' নামের সঙ্গে 'মার্ক্সিস্ট' যুক্ত করে 'কাস্তে হাতুড়ি তারা' চিহ্ন নিয়ে। দীর্ঘ কয়েক বছরের মতান্তর-মনান্তরের শেষে পার্টি ভাঙনের মধ্যে দিয়ে ভারতের মাটিতে নিজেদের 'প্রকৃত কমিউনিস্ট' প্রমাণের প্রতিযোগিতা শুরু হল।

চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ ও কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আগ্রাসী নখ-দাঁত নিয়ে ঢুকে পড়ে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশেও। দেশের 'নিরাপত্তার' খাতিরে সমস্ত রকম প্রশ্নের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল 'ভারতরক্ষা আইন' প্রয়োগ করে। স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির একাংশের মধ্যে থেকে উঠে আসা আলোচনার প্রস্তাবকে 'দেশদ্রোহিতার' নজরেই দেখা শুরু হয়। অনেক বামপন্থীদের মনে হয়েছিল, " যখনই জনতা চায় বস্ত্র ও খাদ্য/সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য।" বেছে বেছে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার, জুলুম, শাসানি শুরু হয়। বামবিরোধী বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সরকারের প্রচার পার্টির মধ্যে বাড়তে থাকা পারস্পরিক অবিশ্বাসকে প্রায় শত্রুতার পর্যায়ে নিয়ে গেল। যার প্রভাব দেখা দেয় বাংলার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলেও।

'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' নামক একটি সংগঠন তৈরি করে কয়েকজন সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী চিনের ভারত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করলেন। এই সংগঠনটির সদস্য ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অম্লান দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। 'দেশ'

পত্রিকায় শুরু হয় 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র ধারাবাহিক কলাম। যেখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিনেশ দাস প্রমুখরা চিনের আক্রমণের স্বরূপ উদঘাটন ও তার সঙ্গে বামপন্থীদের 'যোগসাজশ' নিয়ে লিখতেন। প্রমথনাথ বিশী 'শ্রী কমলাকান্ত শর্মা' ছদ্মনামে 'কমলাকান্তের আসর' শীর্ষক ধারাবাহিক লেখায় বামপন্থা বিরোধী বক্তব্য প্রচার করেছিলেন। সত্যজিৎ রায় এই প্রচারমূলক সাহিত্যে অংশগ্রহণ না করায় 'দেশ' পত্রিকা লিখেছিল 'সত্যজিৎ রায় নীরব কেন'?১০ স্পষ্টতই সি পি আই-এর নীতিকে প্রায় প্রোপাগান্ডার মতো ব্যবহার করে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা হয়েছিল। আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে এঁদের মধ্যে অনেকেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত গণনাট্য সংঘ ও বাম-প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ ও ফ্যাবিলেশিসের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশীর নাটকও গণনাট্য সংঘ অভিনয় করেছিল। বামপন্থী রূপে পরিচিত অনেক বুদ্ধিজীবীও চিন-বিরোধী অবস্থান নিয়ে বাংলার পার্টির অবস্থান থেকে দূরে সরে যান। গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় 'শুভবুদ্ধির আহ্বান' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে নেহরুর পাশে থাকার বার্তা দেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়'লগ্ন' নাটকে, গণনাট্য সংঘের সভাপতি দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সীমান্তের ডাক' নাটকে, নিবেদিতা দাসের নাটকে চিনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হল। ভূপেন হাজারিকা, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ গায়করাও তাদের গানে দেশাত্মবোধের প্রচার করলেন। এছাড়াও ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'সৈনিক', রমেন লাহিড়ীর 'অমর', গিরিশঙ্করের 'বেঙা ডাক্তারের চোখ', সুনীল দত্তের 'সীমান্ত প্রহরী', প্রীতি রায়ের 'রক্ত পদ্ম' নাটকগুলিও একই উদ্দেশ্যে রচিত।

বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলের দেশপ্রেমের মধ্যে বিপজ্জনক ভাবে ব্যতিক্রমী ছিল পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য সংঘ। কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটির রাজনৈতিক লাইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গণনাট্য সংঘ দেশাত্মবোধের জোয়ারে নিজেদের গা ভাসিয়ে দেয়নি। কমিউনিস্ট পার্টিতে সম্ভাব্য ভাঙন, ভারতরক্ষা আইনের দমন-পীড়ন-, সংবাদপত্রের পাতায় 'দেশদ্রোহী' বামপন্থীদের কুখ্যাতি, জনমানসে 'উগ্র-জাতীয়তাবোধের' গরিমার মধ্যে গণনাট্য সংঘ ছিল একক ও অসহায়। সংঘের মধ্যেও শুরু হয় মতান্তর-মনান্তর। সজল রায়চৌধুরী সম্পাদক পদ থেকে 'ছুটি' নেওয়ার পর নির্মল ঘোষ নতুন সম্পাদক হন। অবিশ্বাস- তিক্ততা ও রাজনৈতিক অবস্থানের পার্থক্যে থমকে যান অনেক সদস্য, অনেকে সংঘ ত্যাগ করেন। রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নে এবং সংগঠকদের অনুপস্থিতিতে সংঘ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। সংবাদপত্রের তীব্র চিৎকার, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে 'দেশবিরোধী ভাবমূর্তি এবং দেশরক্ষার নামে 'ডাইনি-খেদানো অভিযান' -এর মুখে সংঘের অস্তিত্ব-রক্ষা ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

কেমন ছিল ১৯৬৩ সালের গণনাট্য সংঘের পরিস্থিতি? চিররঞ্জন দাস 'ফ্ল্যাশব্যাক'-এ লিখেছেন, "১৯৬৩ মার্চ। কার্যত গণনাট্য সংঘ প্রায় অস্তিত্বহীন, অস্তিত্বহীন সবরকম

প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনও। কেমন স্থবির, মূল্যবোধহীন, বন্ধ্যা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। গণনাট্যের তখনকার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত নেতাদের কারো কারো পালা করে শরীর খারাপ, পারিবারিক বিপর্যয় শুরু হয়ে গেল, কারো তখন ইয়েলো ফিভার' থেকে রক্ষা পেতে লাল রঙটাকেই বদল করে সবুজ-গেরুয়া ইত্যাদি বহুবর্ণের জার্সি পরে মেরু পরিবর্তন করতে বেশি আগ্রহী। 'সন্ধ্যাদীপের শিখায়', কেউ 'জাতীয়' কর্তব্যে উদ্ভাসিত হচ্ছেন, কেউ হচ্ছেন 'হকিকতে', কেউ বা 'সিরাজদ্দৌল্লা', পুনর্জীবন করে রঘুপতি রাঘবের দেশপ্রেমের একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন— আবার কেউ কেউ জাতীয়তার রঙ মেখে হিংস্র শাসক শ্রেণি যে পথ কখনও চিনত না, সেই পথে প্রসাদ ভিক্ষা করে গণনাট্যের শিল্পকলা মতাদর্শের পৃষ্ঠে ছুরি বসানোর জাতীয় কর্তব্য নিপুণভাবে পালন করছেন।"[১১]

এই বন্ধ্যা সময়ে গণনাট্য সংঘে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জেগে থাকল 'সাম্প্রতিক শাখা', 'সীমান্তিক শাখা'র মতো কয়েকটি সংগঠন। সীমান্তিক শাখা তৈরি হয়েছিল ১৯৬১-তে এবং সাম্প্রতিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালের ১২ মে। অদ্ভুত হলেও সত্যি যে 'সাম্প্রতিক' শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে গণনাট্যের অনুমোদিত শাখা ছিল না। কারণ অনুমোদন দেওয়ার মতো জেলা কমিটি, রাজ্য কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। নাট্যপ্রযোজনার কোনো রাজনৈতিক লাইনও ছিল না। ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে সীমান্তিক শাখা দমদমে 'গণনাট্য উৎসব' আয়োজন করে। সংঘের প্রথম দুটি উৎসবের অনুষ্ঠানসূচি ও আয়োজনের তুলনায় এবারের উৎসব যদিও নগণ্য, কিন্তু ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে অপরিসীম। তিনটি নাটক, নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রসংগীত ও বক্তৃতা— এইমাত্র আয়োজন। উদ্বোধনী দিনে ভাষণ দেন অজিত কুমার ঘোষ ও সুধী প্রধান। পরিবেশিত হয় পুরনো 'কাজ নেই' ব্যালে। নাটক ছিল উৎপল দত্ত রচিত আন্তন চেকভ অবলম্বনে 'প্রস্তাব' ও চিররঞ্জন দাসের 'সন্ত্রাস'।[১২]

১৯৬৪ সালে গণনাট্য সংঘকে পুনর্গঠনের ভাবনা শুরু হয়ে যায়। সুধী প্রধানের মতো অভিজ্ঞ-দক্ষ সংগঠক পার্টি থেকে দূরত্ব বজায় রেখেও পুনরায় সংগঠনের কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। পুরনো শিল্পীদের অনেকেই ধীরে ধীরে ফিরে এলেন। সীমান্তিক, সাম্প্রতিক শাখার পাশাপাশি দেশবন্ধুনগর শাখা, ঘুঘুডাঙা শাখার মতো ৮-১০টি শাখা পুনর্গঠনের কাজ শুরু হল। পুনর্গঠনের কাজের অন্যতম স্থপতি শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

> 'নিচের দিকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত শাখাগুলি যারা গণনাট্য সংঘের পতাকা তখনও মাটিতে ফেলে দেয়নি— অস্তিত্বরক্ষার জন্য লড়াই করেছে— হাতড়ে হাতড়ে কাছে এসেছে।"[১৩]

এপ্রিলে'সীমান্তিক' শাখার মুখপত্র হিসেবে চিররঞ্জন দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'গণনাট্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা।

১৯৬৪ সালের অক্টোবরে পার্টির জাতীয় পরিষদ বিক্ষুব্ধ সদস্য অর্থাৎ যারা কিছুদিন পরে সি পি আই(এম) নামে পরিচিত হবেন তাদের সপ্তম কংগ্রেস কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল।

সেই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা। সম্মেলনে ‘সাম্প্রতিক’ শাখা অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ একটি যুদ্ধের ইতিহাস,’ ‘সীমান্তিক’ শাখা চিররঞ্জন দাসের ‘মৃত্যুহীন’ ও ‘প্রান্তিক’ শাখা শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আত্মহত্যা আইন কর’ নাটক মঞ্চস্থ করে। পার্টির এই অংশের সদস্যদের দশম রাজ্য সম্মেলনেও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন দুটি গণনাট্য সংঘকে উজ্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সপ্তম কংগ্রেসে বলা হয়েছিল,

> “ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজ শুধু আর্টের জন্য আর্ট সৃষ্টি নয়— গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাহায্যে তাঁকে এগিয়ে আসতে হবে। মহিলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাস্তুহারা প্রভৃতি ফ্রন্টের দুর্বলতা কীভাবে কাটান যায় নূতন রাজ্য নেতৃত্বকে তা বিশেষ ভাবে ভাবতে হবে। ” [১৪]

সিপিআই(এম)-এর প্রতিষ্ঠা পশ্চিমবঙ্গে সংঘকে সাংগঠনিক সমর্থন দেয়। তাছাড়া নীতিগত ভাবে সংঘের আদর্শ কোন ‘পন্থী’ হবে, তার উত্তরও পাওয়া গেল। অবশ্য সরাসরি পার্টির নিয়ন্ত্রণ ছাড়া গণনাট্য সংঘের পক্ষে উঠে দাঁড়ানো মুশকিল হতো। অনেক নেতা ও সংগঠক তখনো জেলবন্দী। আতঙ্কের পরিবেশও পুরোপুরি কাটেনি। পুরনো দক্ষ সংগঠক-শিল্পীদের অনেকেই সংঘে ফিরে আসেননি। দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পানু পাল পরে সি পি আই-এর নিজস্ব সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ’ বা আই.পি.সি.এ-র দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৬৫ সালের ২০ জানুয়ারি দেশ জুড়ে বামপন্থীদের গ্রেপ্তার ও আটকের প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস হলে একটি সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন মন্মথ রায়। ১৯৬৫-র ১২ই মার্চ উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভায় ‘কল্লোল’ অভিনয় শুরু করে। ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহে জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতা ও কমিউনিস্ট আদর্শের জয়গানে সমৃদ্ধ নাটক জনপ্রিয় হলে সরকার পক্ষ থেকে বাধা আসতে থাকে। উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হন। আলোকশিল্পী তাপস সেন স্লোগান তুললেন ‘কল্লোল চলছে, চলবে’। সমগ্র ঘটনার প্রতিবাদে বাংলার বামমনস্ক নাট্যব্যক্তিত্বরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখান থেকেই উঠে আসে ‘সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা’র প্রস্তাব। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ‘রূপান্তরী’র জোছন দস্তিদার, ‘উত্তরী’-র নির্মল ঘোষ, এলটিজি-র উৎপল দত্ত, ‘লোকসংস্কৃতি সংঘ’-এর শেখর চট্টোপাধ্যায় ও ‘ম্যাস থিয়েটার’-এর জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন সংগ্রামী সংস্থার মিলিত মোর্চার মাধ্যমে ‘সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা’ চেয়েছিল নতুন ধাঁচের গণ-সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তুলতে। গণনাট্য সংঘের পার্টিতে অন্তর্ভূক্তির ফলে এঁদের মনে হয়েছিল সংঘ বর্তমানে বিপথগামী হয়েছে, তাই গণনাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন সংগঠন চাই। [১৫] যার উত্তরে শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন,

‘গণনাট্য সংঘ মহান ভালো কথা, কিন্তু তার মহান শবদেহের ওপর দিয়ে অন্য সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা ভালো লাগেনি অনেকেরই, তাই আবার গণনাট্য সংঘ পুনর্গঠনের কাজেই লেগে পড়া গেল।”[১৬]

১৯৬৫-র জানুয়ারিতেই রাজ্য পার্টির একটি সভাতে গণনাট্য সংঘকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব রাখা হয়। ৬৪/এ লোয়ার সার্কুলার রোডের ওই সভায় ভারতরক্ষা আইনে বন্দীদের মুক্তির আন্দোলনে গণনাট্য সংঘের ভূমিকা ঠিক করে দেওয়া হয়। নব পর্যায়ে গণনাট্য সংঘ গঠনের অন্যতম সদস্য দিলীপ ঘোষালের মতে ১৯৬৫-র ১৭ জুলাই টিপু দাশগুপ্তের বাড়িতে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে ছিলেন জ্যোতি বসু ও আবদুল হালিম।[১৭] ২৯ জুলাই শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বায়ক করে ২৪ পরগণা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি তৈরি হয়। কমিটির উদ্যোগে গণনাট্যের ২৪ পরগণা জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই কনভেনশনে আহ্বান জানানো হয়নি সংঘের তৎকালীন সভাপতি দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল ঘোষকে। ‘সীমান্তের ডাক’ নাটক রচনা করে সংঘের ‘আদর্শ বিরোধী’ অবস্থান নেওয়ায় এবং উভয়েই ‘সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা’র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খেদের সঙ্গেই এই প্রক্রিয়াকে ‘অগণতান্ত্রিক’ বলেছেন।[১৮] কনভেনশনের পর ধীরে ধীরে অন্য জেলাগুলিতে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়। বলা যেতে পারে এই কনভেনশন থেকেই নবপর্যায়ে গণনাট্য সংঘের কার্যকলাপ শুরু হয়।

১৯৬৫ সালের সারা বছর জুড়েই নব-উদ্যোগের প্রেরণা গণনাট্যের শাখাগুলিকে উজ্জীবিত করে রেখেছিল। ফলে নাট্য-প্রযোজনাতেও আবার জোয়ার আসে। ১৪ জুলাই সীমান্তিক শাখা কলকাতায় মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে চিররঞ্জন দাসের ‘ভিয়েতনাম’ নাটকটি অভিনয় করে। সমকালে নাটকটি গণনাট্য সংঘের অন্যতম জনপ্রিয় প্রযোজনা। সীমান্তিক শাখার ১৭৮টি প্রযোজনা ছাড়াও অন্যান্য শাখা নাটকটি অভিনয় করেছিল। চিররঞ্জন দাসের ‘মৃত্যুহীন’, উৎপল দত্তের ‘দ্বীপ’, অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘শিবঠাকুরের দেশে’, বারীন রায়ের ‘চাঁদনী রাত’, শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অন্নপূর্ণার দেশে’, দুলেন্দ্র ভৌমিকের ‘গুপ্তবিদ্যা’, কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ‘ইংগিত’ প্রভৃতি নাটকগুলি বিভিন্ন শাখা সংগঠন সারা বছর ধরে অভিনয় করে। নাট্যশাখাগুলির সক্রিয়তা ও নাট্য-প্রযোজনার সংখ্যাবৃদ্ধিই প্রমাণ করে যে বাংলায় গণনাট্য সংঘের পুনরুত্থান শুধু সময়ের অপেক্ষা।

১৯৬৫-তে যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, তা পরিণতি পেল ১৯৬৭ সালে এসে। এবং এই সময়কালের মধ্যে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। ১৯৬৬-তে খাদ্য আন্দোলনের পর ১৯৬৭-র মার্চ মাসে বাংলার ক্ষমতায় আসে যুক্তফ্রন্ট সরকার। ফলে গণনাট্য সংঘের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে তুলনায় অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। ১৯৬৬-র এপ্রিল মাসে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়। ডিসেম্বরে

ডাকা হয় রাজ্য কনভেনশন। অবশেষে ১৯৬৭-র আগস্ট মাসে তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছরের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া পরিণতি পেল। সভাপতি হন কালীবিলাস ভট্টাচার্য ও সাধারণ সম্পাদক শিশির সেন। নবপর্যায়ে রাজ্যের গণনাট্য সংঘ সরাসরি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় চলে আসে। তার রাজনৈতিক আদর্শ, কর্মপদ্ধতি ও নাটক-নির্বাচনও ক্রমে পার্টি-নির্ভর হয়ে পড়ে।

১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট গঠনের দু-মাসের মাথায় নকশালবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। নকশালবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যে ধাক্কা খেয়েছিল গণনাট্য সংঘের পক্ষে রাজনৈতিক কারণেই তা অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না; সংঘের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল দুই মতাদর্শের তীব্র দ্বন্দ্ব। উৎপল দত্ত নকশাল আন্দোলনের প্রতি সহমর্মী হয়ে ওঠায় 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'র ভবিষ্যতও প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। নকশাল আন্দোলনের 'অতি-বাম' রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রত্যক্ষ সমর্থনে একদল নতুন নাট্যকার উঠে আসেন। ফলে ছয়ের দশকের শেষে প্রকৃত 'গণ' নাট্য-আন্দোলন বহুমুখে বিভক্ত হয়ে যায়।

সাতের দশকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমল বা জরুরি অবস্থা পার করে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা লাভের পর গণনাট্য সংঘ সুসংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। রাজ্য জুড়ে সংগঠনের বিস্তারপর্ব শুরু হয়। নাট্য প্রযোজনার সংখ্যাও বাড়ে। কিন্তু চারের দশকের বিক্ষুব্ধ সময়ে গণ-সংস্কৃতিকে নবসাজে সজ্জিত করার যে দায়িত্ব গণনাট্য সংঘ নিতে পেরেছিল, ছয় বা সাতের দশকে সংঘ সেই দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হল। আদর্শগত ও অঙ্গিকগত- দুদিক থেকেই গণনাট্য সংঘ বাংলা থিয়েটারের মূল কক্ষপথ থেকে অনেক দূরে সরে গেল। বিছিন্নভাবে কিছু ভালো প্রযোজনা হয়তো হয়েছে, কিন্তু সরকারের প্রচারকল্পে প্রযোজিত নাটকের সংখ্যাগত ঢক্কানিনাদে সামনে তা চাপা পড়ে যায়। সরকার মুখাপেক্ষী কাহিনি, আদর্শ 'কমিউনিস্ট' চরিত্রের পুনরাবৃত্তি, রাজনৈতিক লড়াইয়ের অভাবজাত দৈন্যতায় গণনাট্য সংঘের নাটক হয়ে ওঠে প্রচার সর্বস্ব। 'গণ' সরে যায়, আসে 'ভোটার'। দিলীপ ঘোষাল বলছেন, " পার্টি আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল মানুষকে, আবার নেতৃত্ব আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল পার্টিকে। মানুষের অভাবে একদিন প্রান গেল শুকিয়ে আমলাদের গড়া পাঁচিলের ওপারে।"[১৯]

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদলের পর পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে বর্তমান সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ক্রমে শূন্যে এসে ঠেকেছে। এ-রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবক্ষয়ও হাস্যকর ভাবে বেদনাদায়ক। এখন 'কাজ না করতে পারা'র অছিলায় দলত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভিন্নমতের দলে যুক্ত হওয়াটার পথটা কত প্রশস্ত। আবার সীমান্ত সমস্যার আবেগকে ব্যবহার করে ভোট কুড়োনোর সস্তা রাজনীতির ধারাও অব্যাহত রয়েছে। কোভিড- জর্জরিত সময়ে বদলে গেছে মানুষের বিনোদন ও প্রতিবাদের মাধ্যম। এই সংকটের দিনেও গণনাট্য সংঘ সীমিত সামর্থ্য নিয়ে তার নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শের জন্য লড়ে যাচ্ছে। আশির কাছাকাছি বয়সে এই রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাটুকুই সম্ভবত গণনাট্য সংঘের সবথেকে বড় প্রাপ্তি।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সজল রায়চৌধুরী, গণনাট্য কথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ: ৭৬।

২। অঞ্জন বেরা, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর, গণনাট্য প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ: ১১০।

৩। 'আই পি টি এ-র কি প্রয়োজন আছে'?, বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা(সম্পা), গণনাট্য: পঞ্চাশ বছর, গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, পৃ:২৪৭।

৪। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, উজান গাঙ বাইয়া, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ:১৩২।

৫। অনিল বিশ্বাস (সম্পা), পার্টি চিঠি ৩, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন: দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ: ১২৪।

৬। তদেব, পৃ: ১৩৬।

৭। অনিল বিশ্বাস (সম্পা), আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে মতাদর্শগত বিতর্ক সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন: দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০৫, পৃ:২৬৪।

৮। পার্টির সামনে গুরুতর সংকট, পৃথ্বীরাজ, তদেব, পৃ: ১৬৫।

৯। ডাঙ্গে চক্রকে অগ্রাহ্য করুন, জ্যোতি বসু, তদেব, পৃ: ৩১৩।

১০। দেশ, সম্পাদকীয়, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৬, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬২।

১১। চিররঞ্জন দাস, ফ্ল্যাশব্যাক, বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা(সম্পা), গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, পৃ: ১১৪।

১২। তদেব, পৃ: ১১৪।

১৩। শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণনাট্য: সেকাল একাল, প্রসঙ্গ গণনাট্য, গণমন প্রকাশন, মার্চ ১৯৮১, পৃ:১৬১।

১৪। অনিল বিশ্বাস (সম্পা), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ দশম রাজ্য সম্মেলন বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ:৪১০।

১৫। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, উজান গাঙ বাইয়া, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ: ১৪৭।

১৬। শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুরুর দিনগুলো (১ম পর্ব), প্রসঙ্গ গণনাট্য, গণমন প্রকাশন, মার্চ, ১৯৮১, পৃ:৯৮।

১৭। দিলীপ ঘোষাল, গণনাট্য কী ও কেন, গণমন প্রকাশন, ২০০৭, পৃ:৪৪।

১৮। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যচিন্তা শিল্প জিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, ১৯৭৮, পৃ: ৩৬৫।

১৯। দিলীপ ঘোষাল, গণনাট্য কর্মীর আত্মজিজ্ঞাসা, বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা(সম্পা), গণনাট্য: পঞ্চাশ বছর, গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, পৃ: ১৮০।

লেখক : **অর্পণ দাস,** গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

যাত্রার ঐতিহ্য ও রামকুমার নন্দী মজুমদার

প্রসূন বর্মণ

ভূমিকা ঃ

বাংলা যাত্রার প্রচার ও প্রসার শুধু বঙ্গদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা বঙ্গের বাইরেও লক্ষণীয়। 'মঞ্জরী অপেরা'য় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) লিখেছেন:

> পূজোর সময় থেকে মফস্বলে বের হয়ে এখান ওখান, শহর, গ্রাম ফিরে গাওনা করে একবার ফেরে অগ্রহায়ণের শেষ। পৌষ মাসটা বিশ্রাম, তারপর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা থেকে একনাগাড় কলকাতা থেকে সারা বাংলাদেশ, পূর্বদিকে অসমের সে গুয়াহাটি থেকে ডিগবয় ওদিকে শ্রীহট্ট শিলচর আবার বেহারে কাটিহার পূর্ণিয়া কিষাণগঞ্জ পর্যন্ত।[১]

অসমে বাংলা যাত্রাপালা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ঊনিশ শতক থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। অসমিয়া সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান আউনিআটি সত্রে[২] সে কালে মিশ্র ভাষায় 'ফৌজিয়া ভাওনা' অভিনীত হত। বরপেটার তিথিরাম বায়নের বাংলা যাত্রা গানের দল ঊনিশ শতকে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ অঞ্চলে বাংলা যাত্রার প্রচলন ছিল আভিজাত্যের অন্যতম প্রকাশ।

বাংলা ভাষায় 'যাত্রা' শব্দের ধারাবাহিক ব্যবহার দেখা যায় চৈতন্য পর্বে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের গোড়ায়। চৈতন্যের জন্ম-উৎসবকে বৃন্দাবন দাস (১৫০৭-১৫৮৯) 'যাত্রা' বলে অভিহিত করেছেন।[৩] শ্রীচৈতন্য ভাগবতে' সপারিষদ শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণলীলাভিনয়ের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুরের (পরমানন্দ সেন) সংস্কৃত নাটক 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়ে'ও এ অভিনয়ের উল্লেখ রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় (আনুমানিক ১৫০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দ) শ্রী চৈতন্যদেব সপারিষদ সারারাত কৃষ্ণলীলাভিনয় করেছিলেন।

অসমে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শ্রীমন্ত শংকরদেবের (?-১৫৬৮) রচনাতেও 'যাত্রা'র বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। অসমিয়া ভাষার প্রথম নাট বা নাটক হচ্ছে 'চিহ্নযাত্রা'। এই 'আসরী অভিনয় বা যাত্রাগান'-এ সূত্রধার ছিল, ছিল নানা কুশীলবের সংলাপ ও গান।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই অসমিয়া নাটগীতি নাট্যধর্মী যাত্রাগানের আঙ্গিক লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকী ত্রিপুরার রাজদরবারে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অভিনীত হয়েছিল মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের 'কালীয়দমন'।[৪] ঊনিশ শতকে মণিপুরী মহিলারা কলুটোলার বাবু মতিলাল শীলের (১৭৯২-১৮৫৪) বৈঠকখানায় অভিনয় করেছিলেন। এই 'যাত্রাওয়ালা সম্প্রদায়' নিয়ে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হল :

আশ্চর্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল
স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল।।
ললিতা বিসাখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী।।
ইন্দরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে।
পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তার তাল ধরে।।
কৃষ্ণের সঙ্গে রঙ্গ করয়ে রসিকা।
রসিকার রূপ গুন নাহিক নাসিকা।।
গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা।
শুনিলে সে মিষ্টস্বরনা যায় পাসরা।।
বাদ্যতালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্প।
গান করে জয়দেব মুদ্রা তায় কম্প্র।।[৫]

আগরতলাতেও মণিপুরী নাট্যগীতির প্রভাব পড়েছিল। বীরচন্দ্রমাণিক্যের (১৮৩৯-৯৬) সময়ে 'গৌড়ীয় ও মণিপুরি রীতির সমন্বয়ে'[৬] গড়ে উঠেছিল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা।

অন্য দিকে ক্রমশ বাংলা যাত্রাগান ঊনিশ শতক থেকেই সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যদেবের পর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা নাটযাত্রার বিশেষ কোনও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে বাংলাদেশে কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যজীবনীকে কেন্দ্র করে যাত্রাগান জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও সেই সব যাত্রাপালার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে যাত্রাগানের নিষ্ণাত গবেষক বৈদ্যনাথ শীলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ যোড়শ -সপ্তদশ -অষ্টাদশ শতকে লিখিত কোন যাত্রা বা নাট্য রচনা আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছে নাই। যে যাত্রার কথা আমরা শুনি বা যাহার নিদর্শন আমরা পাই তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের রচনা।[৭]

বাংলা যাত্রা বলতে কৃষ্ণযাত্রাই ছিল মুখ্য। এর পাশাপাশি ছিল 'চন্ডীযাত্রা', 'মনসার ভাসান যাত্রা', 'রাসযাত্রা', 'চৈতন্যযাত্রা' প্রভৃতি। ক্রমশ ঊনিশ শতকে যাত্রার ধারা অনেকটাই পাল্টে যায়। বিদ্যাসুন্দর পালার আবির্ভাব হয়। যাত্রায় নিম্নরুচি ও কুরুচির প্রাদুর্ভাব ঘটে এ সময়েই।

অবশ্য ঊনিশ শতকের শেষার্ধে যাত্রা রুচিপূর্ণ ও লঘু রসিকতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছিল। এ ক্ষেত্রে মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২), মতিলাল রায় (১৮৪২-১৯০৮), মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন রায় প্রমুখের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 'জানকী বিলাপ', 'মালিনী', 'বিজয়চন্ডী', 'সীতাহরণ', 'রাজ্যাভিষেক', 'সতী', 'হরিচন্দ্র নাটক', 'দক্ষযজ্ঞ', 'ধ্রুবচরিত্র', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' প্রভৃতি পালাগুলি ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা যাত্রাকে 'অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত সংগীত ও হাবভাব' থেরে রক্ষা করেছিল— এ কথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি

হবে না। এই পথেই নন্দী মজুমদারের (১৮৩১-১৯০৩) আবির্ভাব। কিন্তু বাংলা যাত্রাপালার ইতিহাসে তিনি প্রায় অনালোচিতই থেকে গেছেন।

২

উনিশ শতকে অসমে রামকুমার উপন্যাস-কাহিনি রচনা করেছেন,রচনা করেছেন 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তরকাব্য' (১৮৭২)। লিখেছেন নাটক, গান, যাত্রা ও পাঁচালি শ্রেণির রচনাও। তাঁর শৈশবাবস্থা কেটেছে অভাবনীয় দারিদ্রে। তবে তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল সংগীত ও সাহিত্যচর্চা।

মাত্র চৌদ্দো বছর বয়সে লিখেছিলেন পাঁচালি শ্রেণির রচনা 'দাতাকর্ণ'। মহাভারত থেকে নেওয়া কাহিনিটির পালা অভিনয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন পাটলি অঞ্চলের সংগীতরসিক জয়কিশোর ও নবকিশোর চৌধুরী।

'দাতাকর্ণে'র পর প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর রামকুমার কোনও গ্রন্থ রচনা করেননি। এরই মধ্যে তিনি কাছাড় তহসিল অফিসে কাজে যোগ দেন। শিলচরে আসার পর তিনি রচনা করেছেন'শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জন'।(১৮৫১), রামকুমার তখন কুড়ি বছরের যুবক। এছাড়া লিখেছিলেন 'লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বন্দ্ব'এবং '১৩০৫ সালের বোধন'। প্রথমটির নামেই স্পষ্ট যে এটি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত। এর পাশাপাশি '১৩০৫ সালের বোধন' রচিত হয়েছে চৈত্র মাসের ৫ তারিখ। এই পালাটিতে শক্তিপূজায় বলিদানের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। এবং শেষে 'গাজী সাহেবের পালা' নামক গ্রাম্য মুসলমানি শব্দমিশ্রিত একটি ছড়াও পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীহট্টীয় ছড়াটি নিম্নরূপ:

আল্লাজি! হেকমতে বানাইলায় কেলায় গাছ
তার খোলের উপর খোল।
কাইঞ্জল খাই, বুগুল খাই, খুরের বিরান নাই
কাঁচাকেলার ছালন খাই, পাকনা কেলা ছল্যা খাই,
পাতা কাট্যা খানা খাই, কোনচিজ যায় না বরবাদ।
খোল বিনা হয় না রে ভাই হেঁদুর ছরাদ।[৮]

রামকুমার নন্দী মজুমদার মোট এগারটি যাত্রাপালা লিখেছিলেন। এগুলি— 'নিমাই সন্ন্যাস', 'সীতার বনবাস', 'বিজয়বসন্ত', 'পদাঙ্কদূত', 'কংশবধ', 'উমার আগমন', 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডি', 'রাসলীলা', 'দোলযাত্রা', 'ঝুলনযাত্রা' এবং 'ভগবতীর জন্ম এবং বিবাহ'। তাঁর যাত্রা রচনার সংবাদে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতে (কাব্য এবং কথাসাহিত্য) রামকুমার মনোনিবেশ করলেও অত্যধিক খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি তিনি যাত্রা রচনার মাধ্যমেই পেয়েছিলেন। নইলে নানা কিসিমের এতগুলো যাত্রা তিনি কেনই বা লিখবেন?

৩

রামকুমার নন্দী মজুমদারের অধিকাংশ যাত্রাই পৌরাণিক কাহিনির ওপর আধারিত। একমাত্র ব্যতিক্রম 'নিমাই সন্ন্যাস'। তবে শুধুই কৃষ্ণলীলা নয়, রামায়ণ, ভাগবত থেকে তিনি যেমন

কাহিনির সূত্র নির্মাণ করেছেন, তেমনই দেবাদিদেব মহাদেবের ওপর আধারিত কাহিনিও তিনি গ্রহণ করেছেন। এমনই একটি কাহিনি হল 'ভগবতীর জন্ম এবং বিবাহ'।

নামকরণেই স্পষ্ট যে পালাটিতে রামকুমার দেবাদিদেব মহাদেব ও গিরি-কন্যা উমার বিবাহ পর্যন্ত কাহিনির সূত্র নির্মাণ করেছেন। মহাদেব নারদকে বলেছেন:

> আমার নন্দী ভগবতীর জন্ম অবধি পরিণয় পর্যন্ত একখানি গীতিকাব্য রচনা করেছে। মধ্যে ২ ভূতেরা অভিনয় করে থাকে; আমি মনযোগ পূর্বক শ্রবণ করেছি, কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছে, মূল ঘটনাগুলি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং কোন প্রকার অতিরঞ্জিত নহে।[৯]

মহাদেবের উক্ত মন্তব্য থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

> ক. মহাদেবের সহচর নন্দী একটি গীতিকাব্য রচনা করেছেন। বিষয়, ভগবতীর জন্ম থেকে পরিণয় পর্যন্ত।
>
> খ. মহাদেবের সহচরেরা প্রায়ই নাকি অভিনয় করে থাকে এবং বর্তমান গীতিকাব্যটি তাঁর মতে 'সুন্দর হইয়াছে।'

মহাদেবের সংলাপে রামকুমার শ্রোতা-দর্শককে আকৃষ্ট করার রীতি গ্রহণ করেছিলেন। আসলে নাট্য মুহূর্ত নির্মাণে এ পদ্ধতি অনেকটা জীবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রোতা-দর্শক ও কুশীলবের মধ্যে যোগসূত্র গাঢ়তর হয়। কেননা এর ফলে দর্শক ও শ্রোতা পালা কাহিনির পরবর্তী দৃশ্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 'ভগবতীর জন্ম এবং বিবাহ' যাত্রাপালাটিতে মোট আটচল্লিশটি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। মহাদেব, উমা, গিরি, মেনকা, নারদ প্রভৃতি মুখ্য চরিত্রের পাশাপাশি রয়েছে ইন্দ্র, মদন,রতি, উর্বশী, জয়া, বিজয়ার মতো অপ্রধান চরিত্র।

পুরাণ কাহিনিতে আছে যে দক্ষযজ্ঞে সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও উপস্থিত হয়েছিলেন। ভরা যজ্ঞসভায় মহাদেবের প্রতি কূট মন্তব্য করেন দক্ষরাজ। ফলে পতিনিন্দা সহ্য করতে না-পেরে সতী আত্মঘাতী হন। এবং পরবর্তীকালে পর্বতরাজ হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে উমা রূপে সতীর জন্ম হয়। রামকুমারের এ যাত্রাপালাটির সূচনা হয় উমার জন্মবৃত্তান্ত থেকে। গিরিরাজকে জনৈক পরিচারিকা এসে সংবাদ দিয়েছেন:

> মহারাজ ! রাজমহিষী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন।[১০]

এরপর রাজ অন্ত:পুরে রাজা সদ্যজাত কন্যাকে দর্শন করলেন। এবং তাঁর মনে হয়েছে যে এ বালিকা সামান্যা নন। রাজার আশঙ্কা প্রমাণিত হল দেবীরূপী কন্যার উত্তরে।

> পিতঃ আমিই আদ্যাপ্রকৃতি; আমার ইচ্ছাতেই সৃষ্টিস্থিতি এবং সংহার হয়ে থাকে; আমি সর্বজীবের অন্তঃবস্থা আমি জীবগণকে সংসারূপ সমুদ্র পার করে থাকি, আমি জগদীশ্বরী, আমিই ব্রহ্মরূপিনী।[১১]

যাত্রা পালাটির কাহিনি নির্মাণে প্রথম থেকেই রামকুমার কোনও জটিলতার সৃষ্টি করেননি। কেননা সহজ-সরল শ্রোতা-দর্শকের মনে তিনি সুস্পষ্ট কাহিনি নির্মাণের প্রতি সচেষ্ট ছিলেন। কাহিনি নির্মাণে তিনি তাই যাত্রার প্রথাসিদ্ধ রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। গিরিরাজ কন্যার 'রূপদর্শন' করেছেন। ক্রমে ক্রমে কাহিনির গতি ভগবতীর বিবাহ— এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। শুধু কাহিনিই নয়, চরিত্রের সক্রিয়তাও সেই উদ্দেশ্যকেই আলোকিত করেছে। গিরির মনে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে। বিদ্যা, পরমাত্মা, বিবেক প্রভৃতি বিষয়ে উমারূপী দেবী ভগবতী সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে কৌশলে রামকুমার শ্রোতা-দর্শককে এসব বিষয় অবগত করিয়েছেন— যা তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক ছিল।

রাজ অন্তঃপুরে উমা ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে। এবং দুরন্তও হয়ে উঠেছে সে। মেনকার চিন্তা বেড়েছে। আট বছরের শিশু উমাকে মেনকা বলছে:
মা এখনত তুমি একেবারে বালিকা নও ৮ বছরের হয়েছ। ঘরের কাজকর্ম কিছুই শেখনা, বে হলে পরে শাশুড়ী কি তোমাকে বসায়ে খাওয়াবে? না সমস্ত দিন খেলা কত্তে দেবে?[১২]

মেনকার এ আশঙ্কা স্বাভাবিক। বিয়ের পর স্বামী গৃহে কাজ করতে হবে, শাশুড়ি তাকে বসিয়ে রাখবে না। এমন কী হয়তো খেলতেও দেবে না আর-- এই ভাবনা মায়ের মনকে ব্যথিত করেছে। উল্লেখ্য যে নারীমনের শাশ্বত প্রকাশ ঘটেছে মেয়েকে নিয়ে মেনকার এই ভাবনায়। আর তা নাট্যকার সংক্ষেপে অপূর্ব এক মুনসিয়ানায় প্রকাশ করেছেন।

কাহিনির মধ্যপর্বে নারদ উমার বিবাহ বিষয়ে একটি সংবাদ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন: ইনি ত সেই দক্ষ কন্যা সতী দেবী তিনি সীমন্তিনী, তবে শিব বিনা তাঁর আর বর কোথা? [১৩]

যাত্রায় কাহিনির উপস্থাপনা ও প্রকাশই মুখ্য ব্যাপার। সাধারণ শ্রোতা দর্শককে আকৃষ্ট করার যে পদ্ধতি, তা রামকুমার সঠিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন। রামকুমার অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করেন নি-- সহজ-সরল ভাষায় ভগবতীর জন্ম এবং বিবাহের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন।

উপন্যাসে যেমন উপকাহিনির বিস্তার লক্ষ্যণীয়, এখানেও ঠিক তেমনই 'দেবসভা'র কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। উপকাহিনি আর ঘটনা এক নয় যদিও'দেবসভা'র প্রসঙ্গ এসেছে কাহিনির প্রয়োজনেই। কাহিনিকে আরও বেশি বাস্তবায়িত করে তোলার উদ্দেশ্যে। এমনকী দেবলোকের এই প্রসঙ্গ উমার জন্মের মূল প্রেক্ষাপটটিও বিশ্লেষণ করেছে।

দেবলোকে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা তারকাসুরকে কী করে বধ করা যায়, এই নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। উপায়ান্তর না পেয়ে তাঁরা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা তারকবধের উপায় বলে দিলেন:

> সতী বিরহে দেবাদিদেব মহাদেব তপস্যায় নিরত, এদিকে সতীদেবীও হিমবান গৃহে জন্মগ্রহণ মহাদেবের তপস্যা কত্তেছেন, এক্ষণ উভয়ের পরিণয় কার্য সম্পন্ন

হলে মহাদেব ঔরসজাত পুত্রের উৎপত্তি হবে, সেই কুমারকে সেনাপতি করে যুদ্ধে গেলেই তাপক নিহত হইবে এক্ষণ আপনারা তাহারই উদ্যোগ করুন গে।[১৪]

দেবতাদের এই 'উদ্যোগে'র প্রেক্ষিতেই এসেছে মদন-রতির প্রসঙ্গ। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে মদনের সক্রিয়তা ২০নং গানে ব্যক্ত হয়েছে। গানটির শেষের দুটি পঙ্‌ক্তি হল:

বিরূপাক্ষ বক্ষ লক্ষ করি মদন তখনে,
এড়িল বাণ ভাঙ্গিল ধ্যান, চাহিলা কোপ নয়নে।[১৫]

মহাদেবের বক্ষ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করার ফলে মদনকে আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। হর-কোপানলে মদনের ভস্মীভূত দেহ দেখে রতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

হে দেবগণ, তোমরা না অমর? তবে কেন প্রাণভয়ে মহাদেবের ধ্যান ভাংতে সাহস হলোনা? প্রাণনাথকে শিখিয়ে বুঝিয়ে এ দুঃসাহসিক কার্য নিযুক্ত কল্লে, এখন যে কেওকে দেখতে পাই না, তোমরা না বাক্যসিদ্ধা! বলেছিলেন মনদ'চিরজীবি হও' কেমন চিরজীবি হল হায়২ বৃথা অন্যকে কেন দোষারূপ করি সব আমারই কপালের দোষ, হৃদয়![১৬]

রতির এ সংলাপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নারীভাবনার প্রকাশ। স্বামীহীনতার শোকের চেয়েও তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে দেবতাদের ছলনা ও কপটতার বিদ্রূপ। উনিশ শতকে নারী তার নিজস্ব জগত তৈরি করে নিচ্ছিল। শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের ফলে এ সময়ই নারীর প্রতিবাদী সত্তার স্ফুরণ ঘটেছিল। রতির ব্যক্তব্যও তার প্রমাণ দিচ্ছে— এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। অবশ্য 'দৈববাণী'র দ্বারা আমরা জানতে পারি যে দ্বাপরে কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণীর গর্ভে কাম এবং সম্বর দৈত্য-গৃহে স্বৈরিন্ধ্রী বেশে রতির জন্ম হবে, আর সেখান থেকেই তাদের মিলন ঘটবে।

ঝড়ের পর যেমন সব শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে আসে, ঠিক তেমনই মদন ভস্মের পর কাহিনির মধ্যে এসেছে স্বাভাবিক ছন্দ। শিবের ধ্যানভঙ্গ করার পরিকল্পনাও তার বাস্তবায়ন পর্যন্ত যে ছন্দে কাহিনি এগিয়েছে, তাকে কাহিনির চরম পর্ব বলা যেতে পারে। এর পর যেন পালাকাহিনি সমে এসে থেমেছে। কেননা মহাদেব সন্ধান পেয়েছেন তাঁর সতী বা উমার। এর পর নারদের সক্রিয়তা ও বিয়ের আয়োজন। এবং হরগৌরীর কৈলাস যাত্রা দিয়ে রামকুমার কাহিনির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

৪

যাত্রার অন্যতম প্রাণ হল সংগীত। শুধু গদ্য বা কাহিনিতে সংলাপ ব্যবহারই নয়, রামকুমার সংগীতেরও সাহায্য নিয়েছেন। আর এই পদ্ধতি রামকুমার অনুসরণ করেছেন স্বাভাবিক নিয়মেই। 'ভগবতীর জন্ম এবং বিবাহ' যাত্রাটিতে মোট আঠাশটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। গানগুলি সংযোজিত হয়েছে নাট্যঘটনার প্রেক্ষিতে, কাহিনির মধ্যে গানগুলি অযথা বাধার সৃষ্টি করেনি। দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে:

ক. উমা তপস্যা করতে বনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সংলাপ বা গদ্য বর্ণনা পরিহার করে রামকুমার তা গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন:

চলিলা গিরি রাজতনয়া ত্যাজি জনক ভবনে
যোগারাধ্যা যোগমায়া যোগিনী বেশে কাননে।[১৭]

খ. মহাদেব অর্ধনারীশ্বর রূপ ধারণ করেছেন। এই রূপের বর্ণনা কোনও সংলাপে নয়, বর্ণিত হয়েছে গানের ভিতর দিয়ে:

কি যে রূপ সুন্দর, শিব শক্তি সহিত মিলনে।।
হের অর্দ্ধ প্রকৃতি অর্দ্ধ পুরুষ রূপ নয়ন রঞ্জনে।।
যেন বাস অর্দ্ধ শরীর শুদ্ধ পদ্মরাগ রতনে।
অর্দ্ধ দেহ শ্বেত কান্তি শশিমণি সম কিরণে।।[১৮]

‘ভগবতীর জন্ম এবং বিবাহ’ যাত্রাটির সংলাপ মূলত গদ্যনির্ভর। এর পাশাপাশি বেশ কিছু গানের ব্যবহারও লক্ষণীয়। বলা যায়, সংলাপের সহচর হয়ে উঠেছে গানগুলি। যাই হোক, এবার যাত্রাপালাটির গদ্য সংলাপের দুয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে।

ক. যাত্রাপালাটিতে মূলত চলিত ভাষায় সংলাপ বর্ণিত হয়েছে। উনিশ শতকের অধিকাংশ যাত্রায় চলিত পর্দারীতির ব্যবহার লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে গোবিন্দ অধিকারীর ‘দান-লীলা’, কৃষ্ণমঙ্গল গোস্বামীর ‘স্বপ্নবিলাস’, গোপালচন্দ্র দাস (করণ)-এর ‘বিদ্যাসুন্দর’, ব্রজমোহন রায়ের ‘সাবিত্রী-সত্যবান’ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যাত্রাপালার কথা। দর্শক-শ্রোতার কথা মাথায় রেখেই হয়তো যাত্রার ভাষা হয়ে উঠেছে কথ্য ভাষা -নির্ভর। এ ক্ষেত্রে রামকুমার নন্দী মজুমদারও ব্যতিক্রম নন। তাঁর ‘ভগবতীর জন্ম এবং বিবাহ’ পালাটি থেকে দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে:

অ. মা. তোমার উপদেশে আমি কৃতার্থ হলেম, বিষয় বাসনা প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক বলে বোধ হচ্ছে। মা তোমার প্রসাদে আমি ভব বন্ধন হতে মুক্ত হলেম এরূপ অনুমান হচ্ছে। [১৯]

আ. হে দেব দেব হে মহেশ্বর শুভ বিবাহের দিন পরশ্বই স্থির করে এলেম, আমি এক্ষণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে নিমন্ত্রণ করে আসি। আপনাকে বর বেশে তথা যেতে হবে। [২০]

‘হলেম’, ‘হচ্ছে’, ‘হতে’, ‘এলেম’, ‘করে’, ‘হবে’ প্রভৃতি ক্রিয়াপদের চলিত রূপের ব্যবহার রামকুমারের গদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

খ. নাট্য ঘটনার প্রয়োজনে রামকুমার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সূত্র বা তথ্যের বর্ণনা সংক্ষেপে করেছেন। আর তা পরিবেশিত হয়েছে সংলাপের মাধ্যমে। এমনই একটি ঘটনার বর্ণনায় নারদ মেনকাকে জানাচ্ছেন।

রাণি ! আমি মিথ্যা বলব না, পাত্রটি দ্বিতীয় বর, কিন্তু পূর্ব পক্ষের কোন সন্তান-সন্ততি নেই। পাত্রের এখনও অর্দ্ধেক বয়স হয়নি। দেখতে কি মদন ও তাঁর কাছে পরাভর, বড় শান্ত প্রকৃতি, ঐশ্বর্যও যথেষ্ট, ধনপতি কুবের তাঁর ভাণ্ডারি, কুলে শীলেও মহামান্য, কত অকুলের কুল দিতে পারেন। আমি যা যা বল্লেম বিয়ের পর এক দু করে গোনে নেবেন। [২১]

এ সংলাপের মাধ্যমে পালাকাহিনির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। আর এতে পালাকারের মুনসিয়ানাই প্রকাশিত হয়েছে।

গ. বিষয় অনুযায়ী সংলাপের ভাষা গড়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত:

অ. 'দেবী' রূপে উমার সংলাপ:

পিতা- আমার স্থূল রূপ অসীম তাহার সীমা কেও কত্তে পারে না। তন্মধ্যে শক্তিমূর্তিই আরাধ্যত্মা এবং আশু মুক্তি প্রদায়িনী। অথচ যে আমাকে মাতৃভাবে আরাধনা করে থাকে, আমি পুত্র জ্ঞানে তার শত শত দোষে শত শত অপরাধ ক্ষমা করে থাকি। [২২]

আ. কন্যারূপে উমার সংলাপ:

মা কোর থেকে এক বুড় ব্রাহ্মণ এসেছে, তাঁর দাড়ি গোপ হাটুতে পড়েছে আর একখানা কাষ্ঠ খণ্ডের দুদিগে আবদ্ধ দুটো অলাবু তাঁর হস্তে, বয়েসে বাবার চেয়েও বড়। আমাকে প্রমাণ কল্লে মা আমার বড় ভয় হচ্ছে বুড় ব্রাহ্মণ কেন আমাকে প্রণাম কল্লে মা। [২৩]

বলা যায়, উমার এই দ্বিমাত্রিক সংলাপ নাট্যঘটনার প্রয়োজনেই প্রকাশিত হয়েছে। উমা যখন 'দেবী' রূপে আবির্ভূতা হয়েছেন, তখন বক্তব্যের বিষয়গুণেই তার ভাষা হয়ে উঠেছে গুরুগম্ভীর। আবার পারিবারিক আলাপচারিতায় গিরি-কন্যা উমা হয়ে উঠেছে সাধারণ মেয়ে।

ঘ. 'ভগবতীর জন্ম এবং বিবাহ' পালাটিতে পুরাণ চরিত্রের সংলাপ ও গানের পাশাপাশি রয়েছে সাধারণ জীবনেরও প্রসঙ্গ। আর তার প্রকাশে রামকুমার ছিলেন স্বাভাবিক। এমনকী সংলাপের ভাষা হয়ে উঠেছে চরিত্রানুযায়ী। 'বরযাত্রগণ গিরিপুর উপস্থিত ও যথাস্থানে উপবেশন' এবং 'নারীগণের বরদর্শন', দৃশ্যের সংলাপ নিম্নরূপ:

১মা স্ত্রি- দিদি ! বর কোনটি লা, চিন্তে পাল্লুম না যে, ঐ যে চারিমুখ বড় রাঙ্গা এটি কি বর ? না ঐ কালো যে একটি সেটি বর ? কোলো হলেও এটির গঠন গাঠন বেশ ভালো, এটি হলেও মন্দ নয়। আর যে কেওকে মানশের মতই দেখছি না ঐ যে সকল গায়ে ঢোক একটি ভদ্রলোক বসে আছে এটিই কি বর ?

২য়া-স্ত্রি- ও অবোধিনি ! বর কোনটি চিন্তে পাল্লি না, বর কি আজ অন্যের সঙ্গে একাসনে

বোসতে পারি? ঐ দেখ যেটি বরের আসনে একা বসে আছে এটিই
বর।

১মা স্ত্রি- ওমা এটি যে মহা বুড়া, আবার সাজপোসাকই বা কেমন। আমি ভাবছিলাম, এই যে ভূত প্রেতগুলু এসেছে এটি তাদেরই প্রধান ভূত হবে। ওমা এ বরে কি মহারাজ উমাকে সম্প্রদান করবেন? এ যে মহারাজের বাপের চেয়েও বড় হবে।[২৪]

— প্রতিবেশিনীদের এ সংলাপ বড়ই সজীব। এবং বলা বাহুল্য গৌণচরিত্রও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভাষার এই ব্যবহারে।

ঙ. রামকুমারের সংলাপ বা গদ্য রচনায় আড়ষ্টতা নেই বললেই চলে। যেমন,

অ. রাণী ঃ মহারাজ! আমি উমার কথা শুনে অবাক হলেম। সে বলছে কি, অরণ্যে যেয়ে তপস্যা করবে, কোন মতেই বুঝতে পারি না।
গিরিঃ রানি! উমার যা ইচ্ছে হয় কত্তে দেওগে, তার জন্য কোন চিন্তা করো না, তার জন্ম বৃত্তান্ত মনে আছে কি?
রাণী ঃ আছে বৈকি? কিন্তু কথায়হ ভুলে যাই। [২৫]
আ. উর্বসী ঃ এগো পোড়ার মুখি মেনকা, হাকরে চেয়ে রলি কি শীঙ্গির ২ পালা না ঐ ধা ২ করে আগুন এসে মদনকে বেড়ে ফেলছে তার সঙ্গে মত্তে চাস ত থাক আমি চল্লেম। ও মাগো কোথা যাব গো-ও-ও[২৬]

তবে কাহিনি গঠনে শিথিলতা সুস্পষ্ট। অবশ্য প্রাচীন রীতির যাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল কাহিনির এই শৈথিল্য।

চ. রামকুমারের গদ্য সংলাপে প্রবাদের ব্যবহার স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে। প্রবাদের ওপর ভর করে সংক্ষেপে অথচ মূল বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ করতে রামকুমার সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন:

অ. যাই, আর অরণ্যে রোদন করে ফল কি? [২৭]
আ. ওমা! ও পোড়ারমুখ বলে কি গা? এ যেন কাটা ঘায় লোন দিয়ে গেল।[২৮]

৫

ঊনিশ শতকে অসমে বাংলা যাত্রাপালার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল, তা রামকুমার নন্দী মজুমদারের রচনা থেকেই ধারণা করে নিতে হয়। সংবাদ বা সাময়িকপত্রের পাতাতেও এখানকার ঊনিশ শতকীয় বাংলা যাত্রা -সম্পর্কে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে সে কালে এ অঞ্চলে বাংলা যাত্রাপালা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নইলে রামকুমার নন্দী মজুমদার মিছিমিছি এগারোটি যাত্রাপালা কেনই- বা লিখবেন? অথচ দুর্ভাগ্য যে এই রচনাগুলির অধিকাংশই অগ্রন্থিত রয়ে গেল।

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর গবেষণাপত্রটির বিষয় ছিল, 'The Jatras: or the popular Eramas of Bengal'। অভিসন্দর্ভটিতে তিনি আক্ষেপ করে জানিয়েছেন:

এর আগে মুদ্রণের অভাবে অজস্র যাত্রা পালা চিরকালের মত হারিয়ে গেছে।[২৯] তিনি যে আক্ষেপ উনিশ শতকের শেষার্ধে করেছিলেন, তা এই একুশ শতকেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে রামকুমার নন্দী মজুমদারের ক্ষেত্রে। মোট এগারোটি যাত্রা পালা তিনি লিখেছেন, অথচ আজ অবধি মাত্র দুটি যাত্রাপালা মুদ্রণ ও প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এই খণ্ডিত রূপ নিয়েই আমরা অসমের বাংলা যাত্রাপালার ঐতিহ্যের সূত্রায়ণ নির্মাণ করতে চেয়েছি।

সূত্র নির্দেশ

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জরী অপেরা, উল্লিখিত, দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'নির্বাচিত বাংলা যাত্রা ও সবিস্তার', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা,২০০৮, পৃ.৪৮

২. আউনিআটি সত্র: নদীদ্বীপ মাজুলিতে অবস্থিত।

৩. জন্মযাত্রা-মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দে করেন কেহ মর্ম নাহি জানে।।
চৈতন্যের জন্মযাত্রা-ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মাদিত এ তিথি করেন আরাধনা।।
বৃন্দাবন দাস, 'চৈতন্যভাগবত,' আদিখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ.১৫-৩০

৪. Subhas Das, 'Theatre in Tripura : From the pages of History,' Uttaran and Theatre Academy, Agartala, 2012, p.13

৫. জে.সি মার্শম্যান সম্পাদিত, সমাচার দর্পণ, ১৯ আগষ্ট, ১৮২৬, উল্লিখিত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১০(২০০৩), পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ১৪১

৬. বামাপদ মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরার নাট্যচর্চার গতি ও প্রকৃতি, উল্লিখিত : নিলিপ পোদ্দার সম্পাদিত, 'বিংশ শতকের নির্বাচিত প্রবন্ধ: প্রসঙ্গ ত্রিপুরা', পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, ২০০৪, পৃ. ৯১

৭. বৈদ্যনাথ শীল, বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, উল্লিখিত : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিতের ইতিবৃত্ত', ৪র্থ খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৫৫

৮. শ্রীহট্টবাসী শর্মণ, 'রামকুমার চরিত', সরস্বতী লাইব্রেরী, শিলচর, ১৯১৯, পৃ.৪৯-৫০

৯. রামকুমার নন্দী মজুমদার, ভগবতী জন্ম এবং বিবাহ, উল্লিখিত: অমলেন্দু ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'উন্মেষ', বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর, ২০০৩-০৪, পৃ.৫৫

১০. তদেব
১১. তদেব, পৃ. ৫৬
১২. তদেব, পৃ. ৬৮
১৩. তদেব, পৃ. ৬৯
১৪. তদেব, পৃ. ৭৪-৭৫
১৫. তদেব, পৃ. ৭৬
১৬. তদেব, পৃ. ৭৭
১৭. তদেব, পৃ. ৭০
১৮. তদেব, পৃ. ৮৫-৮৬
১৯. তদেব, পৃ. ৬৩
২০. তদেব, পৃ. ৮১
২১. তদেব
২২. তদেব, পৃ. ৬২
২৩. তদেব, পৃ. ৬৮
২৪. তদেব, পৃ. ৮২
২৫. তদেব, পৃ. ৭০
২৬. তদেব, পৃ. ৭৬
২৭. তদেব, পৃ. ৭৮
২৮. তদেব, পৃ. ৮৩
২৯. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, যাত্রা, উল্লিখিত : সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত, 'লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা', কলকাতা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১ (১৯৯৪), পৃ.১০০

লেখক : **প্রসুন বর্মণ,** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম।
সম্পাদক 'নাইনথ্ কলাম'।

নাট্য ও নৃত্য সম্পর্ক
(বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগ)

রত্নদীপ রায়

সূচক শব্দ

[বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগ, নৃত্য ও নাট্য, নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়, শিল্পকলা, সংস্কৃতি]

নাট্য ও নৃত্য শিল্পকলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি কলার মধ্যেই পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে। তবে নাট্য ও নৃত্য এই দুইটি কলার উৎস ও চলনে রয়েছে বিশেষ মিল। নাট্য ও নৃত্যের সম্পর্ক চিরন্তন। আলাদাভাবে বৈদিক যুগের ও বৈদিকোত্তর যুগের মিলগুলো খোঁজার ক্ষেত্রে শুরুতে আমাদের শিল্পকলার উৎস ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বিদ্বানরা কলাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বিষয়কে সঠিক ও সুন্দরভাবে রূপদান করে সম্পন্ন করাই হল আর্ট বা কলা। যার মধ্য দিয়ে সত্য ও সুন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। কলা মানুষকে নিম্নতর সত্য থেকে উর্ধ্বতর সত্যের দিকে নিয়ে যায়। কলার অনেক উপাদান রয়েছে। কলার এমনই অন্যতম একটি উপাদান শিল্পকলা। শিল্পকলা চর্চার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় অনির্বচনীয় আনন্দ এবং রস সঞ্চারকারী হৃদয় তৃপ্তি। শিল্পকলার চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে অপার্থিব জগতের লক্ষ্যে ধ্যানমন্ডিত করতে সমর্থ হয়। মানুষের মননের শাশ্বত সৃজনশীল প্রতিভা, যে সব সুক্ষ্ম কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাই শিল্পকলা। চিত্রাংকন, কাব্য, সাহিত্য, নাটক, নৃত্য, গীত, ভাস্কর্য ইতাদি আরো অনেকগুলো কলার বিষয়ে আমাদের সকলেরই জানা। এই শিল্পকলার দুটি ভাগ রয়েছে । একটি পারফর্মিং আর্ট ([1]) আরেকটি ভিস্যুয়াল আর্ট ([2])।

শিল্পকলা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকেদের জীবনের রাজনৈতিক সামাজিক উত্থান-পতনকে সঙ্গে নিয়ে, সাহিত্য দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবয়বিক ও আন্তর-রূপকে প্রতিষ্ঠিত করে। যা সেই জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বরূপ হিসেবে তাদের ভাবনাকে নির্দেশ করে। এভাবেই শিল্পকলা ধীরে ধীরে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক দর্পণ হয়ে ওঠে। প্রবাহমান এই ধারার মধ্য দিয়ে সেই জাতিগোষ্ঠী এগিয়ে যায়। এই প্রবাহকে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলা হয়। সংস্কৃতিকে যদি সভ্যতার নির্যাস কল্পনা করি, তাহলে এই সংস্কৃতির পঞ্চরঙ্গ হচ্ছে সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য, চিত্রকলা। শিল্পকলার মধ্য থেকে নাট্যকে অনেকে শ্রেষ্ঠ কলা বলে গণ্য করেছেন। থিয়েটারে বিভিন্ন কলার সামগ্রিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। থিয়েটার, নাটক নামেও আমাদের কাছে সমান পরিচিত। থিয়েটারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নৃত্য ও সংগীত এই দুই কলা সরাসরি সম্পর্কিত।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নৃত্য ও নাট্যচর্চা নিবিড়ভাবে

যুক্ত। সেটা সব সময় মঞ্চ বা পর্দায় উপস্থাপিত নাও হতে পারে। নাট্য ও অভিনয় পাশাপাশি বিষয়। আর এই অভিনয় রঙ্গ মঞ্চের বাইরে, মানুষের জীবনে অঙ্গ। 'সঙ্গীত দর্পণ' গ্রন্থে অভিনয় শব্দের বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে- অভি-পূর্বক নী ধাতু থেকে অভিনয় শব্দের নিষ্পন্ন হয়েছে। আভিমুখ্যার্থ নির্ণয় অর্থাৎ অভিমুখীকরণ এই অর্থে অভিনয় শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। মানুষের জীবন থেকে অভিনয়কে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। তেমনি নৃত্যগীত জীবনের অভিব্যক্তির স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক Ruth Bunzel বলেছেন

"Among all existing groups, there is none however rude in culture, that does not have some characterstic form of art. The Andamanese who have been described as not knowing the art of kindling fire, decorate their bodies with elaborate painted designs and wear ornamental head bands,dirdles, necklaces, bracelets on their otherwise naked bodies. All people tell tales presumeably for the pleasure of telling them, all people sing songs and dance and all people have more or less elaborate patterns of behaviour for public performance."

জীবনের অভিনয় হোক আর মঞ্চ-পর্দার অভিনয়। নৃত্য ও নাট্য দুই শিল্পের পদ্ধতি ও রীতি আলাদা হলেও একই। সেক্ষেত্রে নৃত্য নির্মাণের সময় নৃত্যশিল্পী শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ(৩)। সঞ্চালনার পাশাপাশি উপাঙ্গ (৪) ।সঞ্চালনার মধ্যে দিয়ে সরাসরি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। আবার নাট্য শিল্পী অভিনয়ের সময় ভাব ব্যক্ত করার জন্য যখন ছন্দ ও গতির সঙ্গে লীলায়িত ভাবে দেহ চালনা করে রসের উৎপন্ন করেন তখন তা সরাসরি নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এই বক্তব্যটি শুধুমাত্র যে বৈদিক যুগ বা বৈদিকোত্তর যুগের জন্যই সত্য তা নয়। সর্বকালেই নৃত্য ও নাট্য এভাবেই পারস্পরিক সম্পর্কিত । তাই নৃত্য ও নাট্য দুটিই সম্পন্ন হয় আঙ্গিক, বাচিক , সাত্বিক ও আহার্য অভিনয়ের সম্মিলিত রূপ এর মাধ্যমে।

অভিনয়ের এই প্রকার গুলোকে ব্যাখ্যায়িত করলে দেখা যায়, আঙ্গিক অভিনয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন হয়। যার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু এই অঙ্গ সঞ্চালন ছন্দ, তাল লয়কে বাদ দিয়ে হয় না। অঙ্গ সঞ্চালনাগুলো শরীরের ভার ও গতি সঞ্চালন এর মধ্য দিয়ে লীলায়িত হয়। এবং এর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ হয়। আর এই পরিবেশন পদ্ধতির দ্বারা যেই কলার সৃষ্টি হয় তাই নৃত্য ।অপর দিকে নাটকের ক্ষেত্রেও মনের ভাব প্রকাশের জন্য অঙ্গ সঞ্চালন এর পাশাপাশি বাচিক অভিনয়েরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নাট্য নির্মাতা নাট্য প্রয়োগে এই লীলায়িত অঙ্গভঙ্গি সহ বাচিক অভিনয়কে পুষ্ট করলে সেখানে নৃত্য সরাসরি স্থান পায়। আধুনিক থিয়েটার এগুলোকে কোরিওগ্রাফি বলে। আঙ্গিক অভিনয়ের মত বাচিক অভিনয় এর ক্ষেত্রেও নৃত্য ও গীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্যণীয় তখন, যখন অর্থপূর্ণ শব্দমালা ছন্দ সহযোগে সুরের কম্পনে ও

তালের আবর্তনে প্রকাশিত হয়। সেই সাথে দৃশ্যের বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সহায়ক সঙ্গীতের ভূমিকা পালন করে। মূকাভিনয়ের পাশাপাশি কখনো সংলাপ বা কখনো ছন্দোবদ্ধ চালনার মধ্য দিয়ে বাচিক অভিনয়কে সমৃদ্ধ করে। তাছাড়াও অর্থপূর্ণ কথা ব্যতীত স্বর সুরের সমন্বয়ে গঠিত শব্দ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বর্ণনার সহায়ক হয়ে যখন অভিনয়ের বক্তব্যকে পেশ করতে সাহায্য করে তখন তাকেও আবহসংগীত বলে । এভাবেই নাট্য প্রয়োগে গীত সরাসরি যুক্ত হয়। এবং নাট্য, নৃত্য ও গীতের সমন্বয় ঘটে। এই বিষয়বস্তু গুলি সম্মিলিত ও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হলে আদর্শ নাটক তৈরি করার সহায়ক হবে। যদিও এক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে যেগুলো আদর্শ নাটক তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমি নাট্য ও নৃত্যের প্রভাব নিয়ে আলোচনায় বিশেষ আলোকপাত করতে চাইছি। তাই অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। নাট্যচর্চা বিষয়ক প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অভিনয়, নৃত্য ও গীতের যোগাযোগ সেখানে বহুবার উল্লেখ করা আছে।

ভারতে নৃত্য ও নাট্যচর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন। আমাদের দেশের নাট্যচর্চার গৌরবময় অধ্যায় রয়েছে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সময়কালের বিভিন্ন মূর্তি, শিলালিপি ও ধ্বংসাবশেষে, থেকে তার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে নৃত্য ও নাট্যের এরকম আরো বহু নিদর্শন ইতিহাস গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক সময়কে বাদ দিয়ে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নৃত্য ও নাট্য সর্বোচ্চ উৎকর্ষতায় পৌঁছায় বৈদিক যুগে। বহু বছরের ক্রমাগত সাধনার মধ্য দিয়ে বৈদিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তখন নৃত্য, গীত, সাহিত্য, দর্শন সহ অন্যান্য শিল্পকলার ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে হ্যাভেল বলেছেন,

The vedic period is all important for the historian, because, except for a very brief period of its history, the vedic impulse is behind all Indian art."

নৃত্য ও নাট্য চর্চার প্রয়োগের জন্য সুসংহত ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মহর্ষি ভরত মুণি সমগ্র বিশ্বকে উপহার দিয়েছিলেন। আনুমানিক প্রথম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে ভরত মুণি 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটি লিখেছিলেন। তখনকার সময়েই আমাদের দেশে নাট্যচর্চায় মঞ্চায়নের পাশাপাশি প্রয়োগের অধ্যয়ন মূলক কাজও খুব উচ্চ পর্যায়ে হয়েছিল। সে সময়ে নাট্যচর্চায় নৃত্যকে অন্তর্ভুক্ত করে একাধিক কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'নৃত্যকলা' গ্রন্থে গবেষিকা গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেন-

" হরিবংশ পুরাণে উল্লেখ রয়েছে গঙ্গাবতরণ প্রথম নৃত্যনাট্য। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ দানবরাজ বজ্রনাভকে বধ করার জন্য প্রদ্যুম্ন শাশ্ব ও অন্যান্য ভৈমদের নাট্য সম্প্রদায় রূপে পাঠান। ভদ্র ছিলেন এই সম্প্রদায়ের প্রধান নট। এরা বজ্রপুরে দৈত্যরাজসভায় গঙ্গাবতরণ অভিনয় করেন এবং এই অভিনয়ে অসুররাজ ও অন্যান্য সকলে মুগ্ধ হন ও উপহার প্রদান

করেন। হরিবংশে এই প্রসঙ্গে বর্ণনায় নৃত্যকলার উৎকর্ষের চিত্র পাওয়া যায়। হরিবংশে উল্লেখিত গঙ্গাবতরণ অভিনয়কে প্রথম প্রযোজিত নৃত্যনাট্য বলা যায়।”

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো নৃত্যনাট্য শব্দটি। এই শব্দটি থেকে সহজ অনুমেয় যে নৃত্য ও নাট্য সম্মিলিতভাবে সেখানে মঞ্চস্থ হয়েছিল। পাশাপাশি সেই সময়ে নৃত্য ও নাট্য চর্চা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ পুথি তৈরীর মধ্যে দিয়ে চর্চার বিশাল উৎকর্ষতার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তখনই প্রথম সাংকেতিক মুদ্রা গঠিত হয়েছিল। এই হস্তমুদ্রাগুলো ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যে ও নাট্যে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও মহর্ষি ভরতের ‘নাট্যশাস্ত্রে’ উল্লেখিত চার প্রকার অভিনয় ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভরতের ‘নাট্যশাস্ত্রে’ নৃত্য, নিত্ত ও নাট্য এর গভীর ও বিস্তৃত আলোচনায় নৃত্যগীত নাট্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ‘নাট্যশাস্ত্রে’ নৃত্য, নিত্ত ও নাট্য এই তিনটি ভাগের মধ্যে আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই তিনটি ভাগের সঠিক ভাগের সঠিক সমন্বয়ে উচ্চমানের শিল্পকলার সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে একে একে আরো বেশ কিছু উচ্চমানের গ্রন্থ ভারতীয় নৃত্য ও নাট্য জগতকে পুষ্ট করেছে। নন্দিকেশ্বর এর ‘অভিনয় দর্পণ’, নারদার ‘সংগীত মকরন্দ’ সারঙ্গ দেবের ‘সঙ্গীত রত্নাকর’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যেগুলোতে নৃত্য ও নাট্যের যোগাযোগ সম্পর্ক একাধিকবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভরত মুণি ‘নাট্যশাস্ত্রে’ ৬০০০ স্তবকে নৃত্য, নাট্যতত্ত্ব, চিন্তা, প্রয়োগ, বিধি, নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এগুলো থেকে ধারাবাহিকভাবে পুষ্ট হয়েছে ভারতীয় মঞ্চ নাটক ও নৃত্য। ‘নাট্যশাস্ত্র’ ‘অভিনয় দর্পণ’ গ্রন্থগুলোকে পর্যলোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে নৃত্য, নাট্য ও গীত গভীরভাবে সম্পর্কিত।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ এর পরবর্তী সময়ে গ্রিস ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদানের এক বিশেষ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আবার অপরদিকে গ্রিক সংস্কৃতির কিছু প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিলক্ষিত হতে থাকে। সংস্কৃতির এই আদান-প্রদানের নিদর্শন হলো রঙ্গমঞ্চ, নৃত্যগৃহ বা নাট্যমন্দির। এই নাট্যমন্দির বা নৃত্যগৃহ ([৫]) দুটি একই স্থান। তা হলো রঙ্গমঞ্চ।

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে নৃত্য ও নাট্য তখনও আলাদা বিষয় ছিল না। পাশাপাশি এও বোঝা যায় যে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ভারতীয় শিল্পচর্চা কতটা উচ্চমানে পৌঁছে গিয়েছিল। পরবর্তীতে তা আরো উৎকর্ষতা লাভের মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয়তা ও প্রচার পায়।

পরবর্তী সময়ে মৌর্য যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিতে নৃত্য ও নাট্যের আরো সুদৃঢ় ভাবে প্রয়োগ হয়। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, প্রিয়দর্শী অশোক- এর মতো রাজাদের রাজত্বকালে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতাভিনয় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকমালায় সংগীত ও নৃত্যের উল্লেখের পাশাপাশি নাট্যচর্চার উল্লেখ রয়েছে। মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলিতভাবে নাট্য ও নৃত্যের প্রচলন ছিল।

তাছাড়া মহর্ষি বাৎস্যায়ন এর 'কামসূত্র' গ্রন্থে তিনি অভিনয়কে 'প্রেক্ষণক' বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে বাৎসায়ন যে চৌষট্টি কলার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে নৃত্য ও নাট্যকে তিনি অন্যতম কলা বলে নির্দেশ করেছেন। কেবলমাত্র পুরুষরা নয়। কুমারী ও বিবাহিত নারীদের মধ্যেও নৃত্য ও নাট্য অবাধ প্রচলনের কথা সেখানেই রয়েছে।

যদি আমরা গুপ্ত যুগের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে সমুদ্রগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন স্থানে নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয়েছে এবং সেখানে নৃত্যগীতেরও ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছে। গুপ্তরাজ বিক্রমাদিত্য এর রাজত্বকালে নট-নটীদের নর্তনমূর্তি, তাম্রফলক, সংগীতমালা, নাট্যগৃহ, নবরত্নসভা ইত্যাদি তৈরি হয়েছিল। যা তখনকার সময়ে নৃত্য, নাট্য, গীত চর্চার ব্যাপকতাকে নির্দেশ করে। এই তথ্যগুলো থেকে এরকম ধারণা করলে ভুল হবে না যে তখনও নৃত্যগীত এবং নাট্য সম্মিলিত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

মহাকবি কালিদাস নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্যকলার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নাটকের প্রয়োগে শাস্ত্রীয় নৃত্য, গীত এর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে অর্থপূর্ণ শব্দ বর্জিত অভিনয়ের ক্ষেত্রে নৃত্যের প্রয়োগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

"অঙ্গৈরন্তর্নিহিতর্বচনৈ: সুচিতং সম্যগর্থ:,
পাদন্যাসো লয়মূপগত তনময়ত্বং রসেসু।
শাখাযোনিনিমৃদুরবিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্ত,
ভাভাবংতুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধ স এব।।"

এছাড়াও বিশাখ দত্ত, শূদ্রক, হর্যবর্ধন, বানভট্ট, ভারবি সহ সেই সময়কার বহু বিখ্যাত লেখক, নাট্যকারদের লেখনীতে নৃত্য ও নাট্যের যোগসূত্র ও সমন্বয়ের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরোক্ত বিবরণের পাশাপাশি সমসাময়িক সময়ে আরও বিভিন্ন রাজাদের সময়কালে নৃত্যগীতকে ভিত্তি করে বহু নাট্যচর্চা হয়েছে । যার বিবরণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে রয়েছে। সে সময়ে রাজাদের কূলমন্দিরে রাজদাসী (৬) প্রথা নাট্য, নৃত্য, গীত চর্চার সাক্ষ্য বহন করে। উল্লেখিত সেই ঘটনাবলী ছাড়াও যে নৃত্যগীত এবং নাট্যচর্চা অন্য কোথাও হয়নি এমনটা কিন্তু নয়। পরবর্তীতে মন্দির কেন্দ্রিক আরও নৃত্যগীত ও নাট্যচর্চা শুরু হয়। দেবদাসী(7) প্রথা তার মধ্যে অন্যতম আরেকটি। যেখানে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হতো নৃত্য, গীতের মাধ্যমে। তাছাড়া নৃত্যগীত সহযোগে নাটকের মাধ্যমে দেবদেবীর মহিমা ও লীলা কাহিনী জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হতো। নাটকের পাশাপাশি এখানে থাকতো নৃত্যগীত এর প্রয়োগ। তখনকার সময়ে ভগবানের বিভিন্ন লীলা ও মহিমা গুণগান এর সহিত নৃত্যগীত সহযোগে বিবরণ করে অভিনয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা হতো। এই প্রক্রিয়া এবং ধারা ধীরে ধীরে লোকসমাজের সামাজিক রীতিনীতি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করতে লাগলো।

আমরা যদি পরম্পরাগত ভাবে চলে আসা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত নাট্যপ্রথার উপর আলোকপাত করি, দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নৃত্যগীত সহযোগে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করে এগুলো পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনীর বর্ণনা করা, ঈশ্বরের গুনগান করা, মহিমার ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই পালাগুলো করা হতো । বিভিন্ন স্থানে এই পালাগুলোর পরিবেশনার ধরনে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও সবগুলোর মধ্যে সাদৃশ্যতা ছিল বহু। এক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষা ও দলগত অভিনয় ছিল প্রধান। সুর, তাল, লয়, পরিবেশনার রীতিনীতিসহ আঙ্গিক অভিনয় ও নৃত্যের যথাযথ প্রয়োগের ফলে সকল অংশের মানুষের কাছে এগুলো ছিল সহজ বোধগম্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধারাগুলোর উৎস, প্রবাহ ও ধরনের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান সাদৃশ্য হল দেবতার বন্দনা করা। পরম্পরাগত এই নাট্যধারাগুলোর মধ্যে নৃত্য এবং গীত সমানভাবে বিদ্যমান। উপভোগ, আনন্দদান ও গুণগত মান বৃদ্ধি ইত্যাদি নাট্যমঞ্চগুলোর সহযোগী বৈশিষ্ট্য। এই নাট্য প্রথাগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাত্রাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই নাট্যধারাগুলি তৈরি হওয়ার সময় সেই ধারাগুলির প্রবর্তক বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসীরা হয়তো নাট্যগ্রন্থগুলো থেকে সরাসরি উপাদান গ্রহণ করেননি। তবে প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই পরম্পরাগতভাবে উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্ম, বিশ্বাস, লোকাচার, অনুকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে হয়ে আসা এই নাট্যধারাগুলিতে নৃত্য ও গীত সমানভাবে প্রবহমান। যা ভারতীয় বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের সাক্ষী। পাশাপাশি নৃত্য, গীত ও নাট্য-এর সম্মিলিত পরম্পরা সাক্ষী। দেশীয় নাট্যচর্চা অঞ্চলভেদে স্থানীয় উপাদানের নাট্য মানচিত্র বিশাল বড়। ভারতের বহু অঞ্চলে এমন বহু নাট্যধারা রয়েছে। এর শাখা প্রশাখার ধরণ প্রকৃতিতেও প্রচুর বিবিধতা আছে। এই শাখা-প্রশাখাগুলো বর্তমানে মূলত লোকনাট্য বা ফোক থিয়েটার(৪) নামে পরিচিত। সর্বোপরি এই ধারাগুলোর মধ্যেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক নৃত্য, গীত ও নাট্য।

শুধু ভারতেই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভ্যতার জয়যাত্রায় নাট্য, নৃত্য, গীত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। নৃত্য ও নাট্য -এর জয়যাত্রা সেই গ্রিক দেবতা অ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে করা 'ক্রটন কোরাস' থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন প্রবাহের মধ্যে দিয়ে সময়কে সাক্ষী করে কখনো ভারতে রামলীলা, নটংকি, তামাশার মধ্য দিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটিয়ে লোকনাট্য-এর শৈলীতে সুন্দর ও উচ্চ মানের নৃত্যগীত প্রয়োগের উদাহরণ তৈরি করেছে। আবার কখনো দ্রাবিড়ের কুটিয়েত্তম, মুদিয়েত্তু রূপে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকাশ্যে লোকনাট্য -এর শৈলীতে সুন্দর ও উচ্চ মানের নৃত্যগীত প্রয়োগের উদাহরণ তৈরি করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নৃত্যগীত ও নাট্যের এই প্রয়োগকে সর্বাধিক জনপ্রিয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উনার লেখা চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, শাপমোচন নৃত্যনাট্যগুলো তিনি তৈরিই করেছিলেন গীত, নৃত্য ও নাট্য-এর সমন্বয়ের ভাবনা থেকে। যার যথাযথ প্রয়োগ করে তিনি শিল্প চেতনার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছেন। এবং আবারো প্রতিষ্ঠা করেছেন যে

নৃত্য এবং নাট্য শিল্পকলার এই দুইটি বিষয়ে অন্তর্নিহিত মিল ও যোগাযোগ সেগুলোর যথাযথ সমন্বয়েই উচ্চমানের শিল্পীর জন্ম দেওয়া সম্ভব।

(1) পারফর্মিং আর্ট- নাটক, সংগীত এবং নৃত্যের মতো যে কলাগুলো দর্শকদের সামনে সরাসরি উপস্থাপিত হয় এবং সঞ্চালিত সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের রূপ পায় সেই কলাগুলোকে পারফর্মিং আর্ট বলে।

(2) ভিজুয়াল আর্ট- ভিজুয়াল আর্ট বলতে আমরা বুঝি চিত্রকলা, অঙ্কন, প্রিন্ট মেকিং, ভাস্কর্য, সিরামিকস, ফটোগ্রাফি, ভিডিও, ফিল্মমেকিং, কারুশিল্প এবং আর্কিটেকচারের মতো শিল্পকলাকে।

(3) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ - নৃত্য ও নাট্যের ক্ষেত্রে অঙ্গ বলতে আমরা বুঝি যা মানব দেহের বিভিন্ন ভাগ গুলোকে শ্রেণিবিন্যাস করে এবং সেগুলো সঞ্চালনের মাধ্যমে নৃত্য ও নাট্য রচিত হয় তাকে অঙ্গ বলে। নাট্যশাস্ত্রে ৬টি অঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে। মানব অঙ্গগুলির সাথে যুক্ত উপ-কাঠামো বা উপ অঙ্গ বা গৌণ অঙ্গগুলিকে উপাঙ্গ বলে। অভিনয় দর্পণ গ্রন্থে ৬টি প্রত্যঙ্গের উল্লেখ রয়েছে।

(4)উপাঙ্গ- মানবদেহের ছোট খাটো অংশ যা প্রত্যঙ্গের সাথে মিলিত হয় তাকে উপাঙ্গ বলে। নাট্যশাস্ত্র অনুসারে ১২টি উপাঙ্গ রয়েছে।

(5) নৃত্যগৃহ- নৃত্যগৃহ হল রঙ্গ মঞ্চে বা দরবার গৃহ। যা বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহ বা হলরুম হিসেবে পরিচিত। যখন গ্রিকদের রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, তখন বিভিন্ন রাজারা নৃত্যগৃহ নির্মাণ করেন।

(6) রাজদাসী- বৈদিক যুগে ও বৈদিক পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময়ে দেবমন্দিরের গোপুরমের কাছে ধ্বজ স্তম্ভের নিচে যে বিশেষ নৃত্য করতেন তাদেরকে রাজদাসী বলে। রাজদাসীরা দেবদাসীদের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন না।

(7) দেবদাসী- যখন মন্দির কেন্দ্রিক নৃত্য ও নাট্য চর্চা শুরু হয়, তখন একটা বিশেষ অংশের শিল্পীরা ভক্তিভাবে কেবলমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে শিল্পচর্চা করতেন এবং মন্দিরে জীবন যাপন করতেন। তাদেরকে দেবদাসী হলা হয়।

(8) ফোক থিয়েটার- একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, শিল্পকর্ম, ধর্ম-কর্ম, বিশ্বাস ও দর্শনের প্রতিবিম্ব হিসেবে যে লোকায়ত সহজ সরল পরিবেশন পদ্ধতির নাট্যধারা উঠে আসে তাকে ফোক থিয়েটার বলে।

তথ্যসূত্র :-

১) Nath, Das Gupta, Hemedra, The Indian Theatre, South Asia Books, South Asia Studies, Ashok vihar, Delhi, 110023, Publication date : 1st June, ISBN-10:978-0836422996

২) Chaturvedi, Ravi, Gupta, Tapati, Contemporary Indian Theatre, Samyak

Publication, 32 3, Club Road near Madipur Metro Station on Green Line, Paschim Puri, Punjabi Bagh, New Delhi, Delhi 110063,Publication year: 2017: ISBN: 9788131608562

৩) নাথ, ভবতোষ, নটবরী নৃত্যতত্ত্ব, নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, শিলং পট্টি, শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলচর১ , কাছাড়, আসাম, ৭৮৮০০১, প্রথম প্রকাশ: ২রা অক্টোবর: ২০১৬। ISBN: 9789382965336

৪) ঘোষ, শম্ভুনাথ, কত্থক নৃত্যের রূপরেখা, আদিনাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা, ৭০০০০৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ২০১১।

৫) রায়চৌধুরী, বিমলাকান্ত, ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, শ্রীমতি মঞ্জু ভট্টাচার্য, ৮৬/১৪ পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা-৩০, তৃতীয় প্রকাশ বৈশাখ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

৬) চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী, ভারতের নৃত্যকলা, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১২, ISBN: 9788184371604 ।

৭) ঘোষ, শান্তিদেব, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ২০১৫, ISBN: 978817066035।

৮) সেন, প্রবোধচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আর্য ম্যানশন, ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলকাতা- ৭০০০০১৩, চতুর্থ প্রকাশ ২০০৭।

৯) দত্ত, দেবব্রত, সংগীত তত্ত্ব (১ম খণ্ড), ব্রতী প্রকাশনী, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

১০) en.m.wikipedia.org/wiki/history-of-theatre (তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৮ই জুন, ২০২১)।

১১) https://www.amarchitrakatha.com/literature_details/evolution-of-indian-theatre (তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৮ই জুন, ২০২১)।

১২) https://hi:wikipedia.org/wiki (তথ্য সংগ্রহের তারিখ :১৪ই জুন, ২০২০)।

লেখক : **রত্নদীপ রায়,** গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সঙ্গীত ভবন, শান্তিনিকেতন।

অভিনয়ের সহকারী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের অবস্থানগত রূপ পরিবর্তন

অভী ঘড়াই

সূচক শব্দ ঃ-

পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ, নাট্যশাস্ত্র, সভ্যতার সঙ্গীত, বৈদিক যুগের সঙ্গীত, আবহসংগীতে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ, নাটক, নাট্য-মঞ্চে বাদকদের অবস্থান।

সংগীতের একাকিত্বের দিনযাপনে বহু উত্থান, পতনের সাক্ষী থেকেছে সময়। আদিম অবস্থায় জীবিকা নির্বাহের জন্য বিশেষত আহার জোগাড়ের জন্য শিকার, ফল-মূল সংগ্রহ প্রভৃতি বেছে নিয়েছিল। পরবর্তীতে পশুর চামড়া বা গাছের বিভিন্ন অংশকে ব্যবহার করে মানুষ তার লজ্জা নিবারণের কাজে লাগিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আনুষঙ্গিক সেই সময়ই বন্য জীবজন্তু বা অন্য অঞ্চলের মানুষের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য, বিভিন্ন আত্মরক্ষার সামগ্রী তৈরি করেছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা আমাদের সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানতে পারি, তবে সেখানে এই বিষয়ের সাথে আমরা আরো জানতে পারি যে, মানুষের আকৃতি বর্তমান অবস্থার মতো ছিল না। তবে যাই হোক কালের নিয়মে আস্তে আস্তে প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষেরও রূপ বদলেছে। উক্ত বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, সেই সময় মানুষ আত্মরক্ষার জন্য যেমন বিভিন্ন অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল তেমনি বিভিন্ন শব্দকে ব্যবহারের জন্যও বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার করেছিল এবং মুখ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইঙ্গিত বা মনের ভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করত, তার নিদর্শন আমরা বর্তমানেও পেয়ে থাকি বিভিন্ন ভাবে। বর্তমানে আমরা ভয় বা রাগ কাউকে বোঝাতে চোখ বড় করা, হ্যাঁ অথবা না বোঝাতে মাথা নেড়ে ইশারার মাধ্যমে তা বুঝাই। তা আদিম অবস্থাতেও ছিল একথা আমরা বলতেই পারি বর্তমানের এহেন বিষয় পত্র থেকে। সভ্যতা বিকাশের সময় সর্বপ্রথম আমরা সংগীতের ধারা পেয়ে থাকি তা হলো বাদ্য তা বলাই যায় কারণ শিকারের চামড়ার ব্যবহারের কথা শুনে। নিজের দলভুক্ত মানুষকে কাছে ডাকবার জন্য কিংবা ভয়হেতু দলের মানুষকে একত্রিত করার জন্য মাটিতে গর্ত করে চামড়ার আচ্ছাদন দ্বারা তৈরি করেছিল ড্রাম জাতীয় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র, যা বাজিয়ে প্রয়োজনে সকলকে একত্রিত করা হতো এবং বাদ্যযন্ত্রের সহযোগেই আনন্দ বা মনের ভাব প্রকাশ করা হত, শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। এর থেকেই জন্ম নিল (১) আনন্ধ বা অবনদ্ধ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র যা চামড়াচ্ছাদিত, আমরা তা জানতে পারি সংগীতের ঐতিহাসিক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। অনুমান করতেই পারি যে আধুনিক তবলা, পাখোয়াজ, ঢোলক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সেই সময়কার বাদ্যযন্ত্রের ফলশ্রুতি

স্বরূপ যা আদিতেও অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল সাথ সঙ্গত কারক হিসেবে এবং বর্তমানেও রয়েছে। তবে এই বিষয় নিয়ে আমরা এবার পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

প্রস্তর যুগের পরবর্তী সময়ে মানুষ শিকারের কারণে তীর ধনুকের ব্যবহার শিখেছিল, যা বর্তমান জীবনেও আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ সময়কে উপস্থাপনার জন্য তীর ধনুকের ব্যবহার এখনো আমরা দেখতে পাই। তবে বাদ্যের ক্ষেত্রে ধরা হয় সেই সময় ধনুকের ছিলা বা জ্যা-তে ব্যবহার করা হতো পশুর চর্ম বা নাড়ী। উক্ত পশু-চর্ম বা নাড়ী টান রাখা হত আঙুলের সাহায্যে। চালানোর সময় ছিলাতে এক বিশেষ আওয়াজ উৎপন্ন হয়, ধরা হয় যে সেই শব্দকে কাজে লাগিয়ে[২] তন্ত্র বাদ্যের আবিষ্কার হয়েছিল, পরবর্তীতে বৈদিক যুগেও আমরা অবনদ্ধ অর্থাৎ চর্মবাদ্যের সাথে সাথে তন্ত্র বাদ্য অর্থাৎ তারের বাদ্যযন্ত্রের নাম পাই, তবে সেই সময় তারের সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রকে বীণা বলা হত এবং অবনদ্ধ বাদ্য হিসেবে আমরা দুন্দুভির নাম পেয়ে থাকি। সেই সময় চামড়ার দ্বারা অচ্ছাদিত সকল বাদ্যযন্ত্রকেই দুন্দুভি বলা হত। মনে করা হয় যে পশুশিকার বা আনন্দ -উল্লাসকে প্রকাশ করার জন্য সেই সময় এই সকল বাদ্যযন্ত্র সহকারে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের উদ্দীপনা প্রকাশ করা হতো।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ২৩ নম্বর অধ্যায়ের ১০৬ নম্বর শ্লোকে আমরা কিছু বাদ্যযন্ত্রের নাম পাই তা হল -বীণা, বেনু, মৃদঙ্গ, দেবদুন্দুভি, দুরদুর, পনব, পুস্কর, শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। সেই সময়ে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্র সকল মঞ্চে উপস্থাপন করা হতো কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে একক বাদন উপস্থাপনা করা হতো না, একথা পরিষ্কার। মনের আনন্দ বা বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গভঙ্গির সাথে সঙ্গত, নাটক, অভিনয়ের আবহ বা ভাব প্রকাশ হিসাবেই বাদ্যযন্ত্রগুলিকে সম্যকভাবে প্রয়োগ করা হতো।

বৈদিক যুগে প্রধানত সংগীতের গীত ধারার প্রচার এবং প্রসার আমরা দেখতে পাই। উঁচু-নিচু এবং মধ্য সপ্তক বা স্বরের ব্যবহারের কথা সাধারণত আমরা জানতে পারি, যা গীতের সাথে সাথে বাদ্যযন্ত্রের সুর মেলাতে ব্যবহৃত হতো, যা বর্তমান সময়েও সুর মেলানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তন্ত্র এবং অবনদ্ধ বাদ্যে। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও শারীরিক অঙ্গভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে বা কিছু ক্ষেত্রে না লাগিয়েও, এই তিন সপ্তক বা স্বর ব্যবহার করা হয়ে থাকতো। বর্তমানেও আমরা দেখতে পাই যেমন দুরের কাউকে ডাকলে বা কথা বলতে উঁচু স্বরে তা বলতে হয় আবার কাছে থাকলে মধ্য স্বরে বা কখনো রেগে গেলে গম্ভীর স্বরে অর্থাৎ খাদের স্বরে আমরা কথা বলে থাকি। মঞ্চ অভিনয়ের ক্ষেত্রেও সময় বিশেষে এই স্বরগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এইগুলো আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানতে পারি এবং বর্তমানেও আমরা তা সকলে প্রত্যক্ষ করতে পারি। বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে সংগীত ক্রমশ পরিশীলিত এবং উন্নত হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিস্তার লাভ করে। এই সময় সংগীত বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত এবং মনীষীগণ বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ করে

গেছেন যা বর্তমান সংগীত ধারার অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। সেই সময় যেসমস্ত বিশেষ বিশেষ গ্রন্থগুলি আমরা পেয়ে থাকি তা হলো ভরত মুণি কৃত 'নাট্যশাস্ত্র', নারদ কৃত 'সঙ্গীত মকরন্দ' ও 'নারদীয় শিক্ষা', মতঙ্গমুণি কৃত 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থ, শারঙ্গদেব কৃত 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থ , পণ্ডিত অহোবল কৃত 'সংগীত পারিজাত' প্রভৃতি গ্রন্থ বর্তমান সংগীতের তথা ঐতিহ্যের মানদণ্ড। সেই সময় অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ, উপনিষদে, সাহিত্যে এবং মহাকাব্যে সংগীত বিষয়েও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিক পরবর্তী **বৌদ্ধ যুগেও** ভারতবর্ষে সঙ্গীত চর্চা অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধ 'থের' এবং 'থেরী' গাঁথাগুলি সুর সংযোগে বিভিন্ন তালে গাওয়া হতো এবং অভিনয়ের পাথেয় এই সমস্ত সংগীত জড়িত ছিল।

রামায়ণে আমরা পেয়ে থাকি, 'রাবণ' তিনি মৃদঙ্গ/পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, অতীতে আমরা বিভিন্ন চিত্র নাট্যতেও আমরা তা দেখতে পাই। বলে রাখা ভাল, পাখোয়াজ নামকরণের আগে পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রটিকে মৃদঙ্গ নামেও অভিহিত করা হয়। কারণ পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রটি পূর্বে মাটির দ্বারাই গঠিত হতো। আবার রাবণ আরেকটি বাদ্যযন্ত্রও আবিষ্কার করেন বলে বিভিন্ন পণ্ডিত মহল বিশেষত তন্ত্র বাদকগণ মনে করেন, তা হল 'রাবাব' পরবর্তিতে এই রাবাব বাদ্যযন্ত্রটি বিবর্তিত হয়ে 'সারেঙ্গী' বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই বিষয়টিও বিভিন্ন চিত্রনাট্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মহাভারতের পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস পর্যায়ে পাওয়া যায় অর্জুনের পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ চর্চা। তিনি ভগবান গণেশের কাছে পাখোয়াজ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, আমরা তা বিভিন্ন চিত্রনাট্যে দেখতে পাই।

এই দুই বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্য হলো আক্ষরিক অর্থে রামায়ণ ও মহাভারত শুধুমাত্র গল্পকথা হয়ে থাকলেও, বিষয়টিতে নাট্যরূপে মৃদঙ্গ/পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহার ঘটেছিল। আর যদি গল্পকথা না হয়ে থাকে বাস্তবেই যদি থেকে থাকে তাহলেও অসুবিধা নেই কারণ, পরবর্তীতে রামায়ণ এবং মহাভারতের বিভিন্ন চিত্রনাট্যতে মৃদঙ্গ/পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রটি প্রদর্শিত হতে দেখা গেছে এবং বহুল পরিমাণে সেখানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পরবর্তিতে **ভরতের নাট্যশাস্ত্র** গ্রন্থ বিশেষত এই গ্রন্থটি নাট্য বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটির ৩৬টি অধ্যায় দ্বারা গঠিত তাতে ২৮ থেকে ৩৩ নম্বর অধ্যায়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে (গীত ও বাদ্য)। নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি নাটকের বিষয়ে লিখিত হলেও সেই সময়ে নাটকের মধ্যে গীত এবং বাদ্য যে এক বিশেষ ভূমিকা বহন করত তা বোঝাই যায় গ্রন্থটি থেকে। সেই সময়কার বহু নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি সেগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

নাটক চলাকালীন সময়ে মাঝে যে বিরতি দেওয়া হতো বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে বাদ্য পরিবেশন করা হতো এবং নাটক শুরুর আগেও যন্ত্রগুলি একত্রে বাজানো হতো তাতে দর্শককে অবগত করা হতো কিছু সময়ের মধ্যেই নাটক মঞ্চে উপস্থাপনা শুরু হতে চলেছে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল তখনও পর্যন্ত বাদ্যযন্ত্রগুলোর স্বতন্ত্র বাদন পদ্ধতি শুরু হয়নি, তখনো বিভিন্ন নাটকে বাদ্যযন্ত্র সমাহারের সাথে একত্রে বাদন উপস্থাপনা করা হতো।

সেই সময়কার বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে আমাদের বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের আমরা নাম পাই তা শুধুমাত্র গানের সঙ্গে বা নাটকের সঙ্গেই বাজানো হতো। তবে গানের সঙ্গে সাথ-সঙ্গত করা হলেও নাটকের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পাওয়া যায়, কারণ নাট্যশাস্ত্রে [৩] 'আশ্রাবণা' কথাটার থেকে, এই বাদ্য নৃত্যানুষ্ঠানে নৃত্য গীতের বিরতিকালে ব্যবহৃত হতো। তবে সেই সময়ে নৃত্যনাট্য বা সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করে শুধুমাত্র অভিনয় কেন্দ্রিক নাটক উপস্থাপনা করা হতো। তবে এই বিষয় নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। সেই সময়ে নাটকে যে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল তা পরিষ্কার। চর্মবাদ্য হিসেবে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটি যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতো তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

সঙ্গীত রত্নাকরে শারঙ্গদেব ভরতের বলা[৪] 'কুতপ বাদ্য'-র উল্লেখ করেছেন শারঙ্গদেব। সেই কুতপকে [৫] 'পুষ্কর মৃদঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্র বলেছেন।

" কুতপে ত্ববনদ্ধশ্য মুখ্যে মাদঙ্গিকস্ততঃ"। - (নাট্যশাস্ত্রে সংগীত-২৪৩)।

বরাট, লাট, কর্নাট, গৌড়, গুর্জর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, ঢোল, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের লাস্য ও তাণ্ডব তত্ত্ববিদরা নাট্যকুতপের নাম বর্ণনা করেছেন।

" বরাটলাট কর্নাটগৌড় গুর্ডারকোঙ্কৌণঃ।

* * * *

" অঙ্গহার প্রয়োগজ্ঞৈলাস্যতা গুবকোবিদঃ।-

* * * *

নাট্যস্য কুতবঃ পাত্রৈরুত্তমাধ্যম মাধ্যমৈঃ। "- (নাট্যশাস্ত্রে সংগীত-২৪৩)।

ভরতকে অনুসরণ করে শারঙ্গদেব[৬] নাট্যকুতপের বর্ণনা করেছেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে এই নাট্যকুতপের উল্লেখ করে বলেছেন,

" উত্তমাধম মধ্যাতিস্তথা প্রকৃতি ভির্যুতঃ।

কুতপো নাট্যযোগেহত্র নানা দেশ সমাশ্রয়ঃ- (নাট্যশাস্ত্র অঃ ২৮/৬)

ভরত নাট্যারম্ভ শিল্পী সমাবেশের প্রসঙ্গেও বলেছেন নাট্যশাস্ত্রে পঞ্চম অধ্যায়ে। যবনিকা উত্তোলন অপসারণের পর বাদ্যযন্ত্রে রাগ আলাপের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের ও পাঠ্যের (কথার সঙ্গে গানের) অনুষ্ঠান হতো। পরে মদ্রক, বর্ধমানক বা বর্ধমানাদি গীতি ও তাণ্ডব নৃত্য হতো। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সমতা (তাল বা লয় রক্ষা করা) রক্ষা করে 'চারী' সম্পন্ন করা হতো। ভাবের উপর জোর দিয়ে বা ভাবাভিব্যক্তির জন্য যখন গান করা হতো তখন বাদ্যযন্ত্রের সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকতো। অঙ্গহার অনুষ্ঠানে মৃদঙ্গ বাজানো হতো। মৃগ নৃত্যনাট্যের সময় মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্র সহ বক্ত, বিভক্ত ও স্ফুট স্বরে বাজানো হতো। প্রথমে গানের কথা বা ভাবের

সঙ্গে প্রকাশ করা হতো পরে তা নাট্যরূপে পরিবেশিত হতো। মুখ ও উপোহরণের সময় বাদ্যযন্ত্র কখনো উচ্চ লয়ে, কখনো বা ধীর লয়ে বাজানো হতো। বিষয় দুটিকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য গানের, নৃত্য ও নাট্যের উপর নির্ভর করে বাদ্যযন্ত্রের তালের লয় নির্ধারণ করা হতো। গায়ক ও বাল্ট্রা রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যগৃহের দরজার মাঝামাঝি স্থানে আসন গ্রহণ করতেন। গায়কও বাদক মিলে প্রায় দশজন থাকতেন একটি নাট্যমঞ্চে। একজন মৃদঙ্গ বাদক, দুজন পনব বাদক, একজন গায়ক, একজন বাঁশি বাদক, একজন বেণু বাদক, আরো চারজন গায়ক সহকারী হিসেবে থাকতেন।

এই দশজনের মধ্যে অন্ততপক্ষে ছয় জন শিল্পী নেপথ্য দরজার কাছে থাকতেন। যবনিকার পিছনে যন্ত্রীরা বাদ্যযন্ত্রের সুর বাঁধতেন। রঙ্গশীর্ষে গায়ক-বাদকরা কোথায় কিভাবে বসতেন ভরত তাও বর্ণনা করেছেন। মৃদঙ্গ বাদকরা রঙ্গ পীঠের দিকে মুখ করে পূর্বদিকে বসতেন অর্থাৎ নেপথ্য গৃহের দরজার মাঝখানে মৃদঙ্গীরা আসন গ্রহণ করতেন, পনববাদকরা তাদের বামদিকে, গায়করা থাকতেন রঙ্গপীঠের দক্ষিণে, উত্তরদিকে মুখ করে বাঁশি বাদক এবং বেণু বাদকরা বাইরে যে স্তোত্র গান করা হতো সেখানে থাকতেন। বাইরে যে স্তোত্র গান করা হত তাকে 'বহিস্পবমান' গান বলা হতো। বহিস্পবমান স্তোত্র গান করার পর অজ্যস্তোত্র ও অজ্যস্তোত্র গান করা হত। তারপর পুনরায় প্রউগস্তোত্র পাঠ করা হত। ভরতের পূর্বেও নাট্যাভিনয়ে বহিগীতের রীতি সম্ভবত বৈদিক বহিস্পবমান স্তোত্র গানেরই অনুসরণ বা অনুকরণ। সেই সময় অর্থাৎ ভরতের সময়ে এইভাবেই গায়ক এবং বাদক গান নাটকের শিল্পীদের সাথে সমবেতভাবেই মঞ্চ উপস্থাপনার কাজ করতেন নেপথ্যে থেকে তা আমরা এই সময়কার বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানতে পারি।

পরবর্তী সময়ে বৈদেশিক আক্রমণের কারণে (তুর্কি) ভারতের সেই সময়কার শিল্প সংস্কৃতি সম্বন্ধে ততটা তথ্য পাওয়া যায় না। সেই সময়ে শিল্পচর্চা যে হত তা বোঝাই যায় কারণ তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মুদ্রা এবং মানুষের জীবনযাপন দেখে।

মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব বা প্রথম আলমগীরের মৃত্যুর আগে সংগীতে ঘরানা বলে কিছু ছিল না। বিষয়টি উপস্থাপনের বিশেষ কারণ হল এর আগে একক বাদন বা একক সঙ্গত বিষয়টা ছিল না সেই কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের আগে সংগীতের যে বিষয়টি ছিল পরম্পরা বা সম্প্রদায় ভিত্তির উপর নির্ভরশীল সংগীত। সেই সময় সম্প্রদায়ের দুটি প্রকার ছিল -১. আচার্য পরম্পরা বা সম্প্রদায় ২. গায়ক বাদক- নর্তক পরম্পরা বা সম্প্রদায়। বিশেষত সেই সময় মন্দির বা মসজিদ চত্বরে ধর্মাচরণের সাথে সাথে গান, বাজনা, নৃত্য এবং অভিনয়ের শিক্ষা দেওয়া হত এবং তা সমবেতভাবে চর্চাও করা হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ঘরানা' কথাটি এসেছ 'ঘর' শব্দ থেকে যার অর্থ পরিবার, বংশ প্রভৃতি। তবে সঙ্গীতের ঘরানার মধ্যে দুটি ভাগ দেখা যায় ১. গুরু শিষ্য পরম্পরা বা ঘরানা ২. পারিবারিক সঙ্গীত চর্চার পরম্পরা বা ঘরানা। ঘরানা বিষয়টি উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হল,

এই সময় থেকেই বিশেষত একক বাদন পদ্ধতি শুরু হয়। গীত, বাদ্য, নৃত্যের সাথে একত্রে উপস্থিত থেকে এবং মঞ্চের মধ্যেই বাদ্যযন্ত্রের সুর মেলানো হত এবং অবনদ্ধ বাদ্য বাদককে গীত, বাদ্য, নৃত্য উপস্থাপকের ডান দিকে রাখা হয়। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায় বর্তমানে বাদকদের অভিনয় শিল্পীদের সাথে মঞ্চের মাঝখানেই বসানো হয় কখনো বা মঞ্চের শেষ প্রান্তে কখনো বা মূল মঞ্চের বাইরে থেকে তারা উপস্থাপনা করেন সম্পূর্ণ বিষয়টি নির্ভর করে পরিচালকের বা নাট্য নির্মাতার উপর। তবে অবনদ্ধ বাদ্যের ঘরানার মধ্যে সব থেকে পুরনো ঘরানা হলো পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ ঘরানা। এই ঘরানা থেকেই পর্যায় ক্রমে ভেঙ্গে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অবনদ্ধ ঘরানার উৎপত্তি হয়েছে এবং বাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। মনে করা হয় পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ থেকেই তবলার উৎপত্তি হয়েছে, কারণ সেই সময়কার তবলা বাজানোর পদ্ধতি বা বোলবাণীগুলি বেশিরভাগই পাখোয়াজের বোলের অনুকরণ। সেই সময় পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রই ছিল একমাত্র, বিভিন্ন বোলের এবং লয়ের সমাহারে গঠিত সঙ্গত মূলক বাদ্যযন্ত্র। পরবর্তিতে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ এবং তবলা বাদ্যযন্ত্র দুটি একত্রে বাদিত হয়েছে একক বাদন, গায়ন এবং নৃত্য এবং নাট্য মঞ্চে।

পরবর্তি সময়ে বহু চলচ্চিত্র এবং মঞ্চ অভিনয়ে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যেমন বৈজু বাওরা চলচ্চিত্রে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নজরুল ইসলাম রচিত বহু নৃত্যনাট্য বা শুধুমাত্র অভিনয়কেন্দ্রিক বহু নাটকে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংলাপের মধ্যে প্লেব্যাক মিউজিক বা আবহ সঙ্গীত হিসাবে একক বাদন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক কালে বহু চলচ্চিত্রে এবং ধারাবাহিকেও বিশেষ আবহ হিসেবে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটি উপস্থাপনা করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বহু ক্ল্যাসিক্যাল এবং পৌরাণিক নাটকে দেশ এবং বিদেশের বহু নাট্য পরিচালক পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটিকে আবহসঙ্গীত , সাথ সঙ্গত, সোলো বডি মুভমেন্ট এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে তুলে ধরার জন্য খুবই জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মানুষের মনে দাগ কাটছে। বলা যায় যে পুরাকালে বহু প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হিসাবে বাদ্যযন্ত্র পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ যেমন হয়েছিল গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং বিশেষ অভিনয়ের এক বিশেষ অঙ্গ হিসেবে। মধ্যবর্তী সময়ে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটির প্রচলন একটু কমে গেলেও রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, বাবা আলাউদ্দিন খাঁ, কদৌ সিং, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি গুণী মানুষের চর্চিত বাদ্যযন্ত্রটি আবার পুরাণের মত স্বমহিমায় বর্তমানে তার শব্দের ধ্বনিতে এক নবতরঙ্গের দ্বীপ প্রজ্জ্বলন করেছে। বর্তমানে যারা আমরা বাদ্যযন্ত্রটি চর্চার মধ্যে যুক্ত আছি, আমাদের কাছে সব থেকে গর্বের বিষয় এই যে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটি এমন একটি বাদ্যযন্ত্র যার থেকে বহু অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটির গঠনগত এবং বাদনের পদ্ধতিগত রূপ বদলালেও স্ব-মহিমায় এখনো বাদিত হচ্ছে। সভ্যতা বিকাশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে আবিষ্কৃত হয়ে আজও সমানভাবে বাদিত

হয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীর বিখ্যাত বিভিন্ন বিষয়ের দিকপাল গুণিজনেরা পর্যন্ত পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের শব্দে মোহিত হয়ে চর্চায় ব্রতী ছিলেন এবং এখনও এর ধারা প্রবহমান। আরো গর্বের বিষয় পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটি ই একমাত্র আদি বাদ্য যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত 'আটা'কে গাব হিসেবে বামদিকের ছাউনীতে লাগিয়ে বাজান হয়। আধুনিক ভারতের অবনদ্ধ বাদ্য হিসেবেপাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটি আজও সমানভাবে গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং অভিনয়ের সাথে সমানতালে মুখ্য বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পুরাণ কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রয়োগ হয়ে চলেছে।

বর্তমানে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তবে সাধারণ বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের মতো এখনো শুরু হয়নি তবে আশা ভবিষ্যতে অন্যান্য বিষয়ের মত সংগীতের মধ্যেপাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। একক বাদনের সাথে সাথে সিলেবাসে গীত,বাদ্য, নৃত্য এবং অভিনয়ের সঙ্গে কিভাবে এর ব্যবহার করা হয়েছে পূর্বে এবং বর্তমানে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা সিলেবাসে একটি বিশেষ অধ্যায় হিসেবেই রাখা হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাতে থেরাপি হিসাবে এক বিশেষ অগ্রণী ভূমিকাতেও এই বাদ্যযন্ত্রটিকে এক বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও রোগীর মনোবল এবং সাধারণ মানুষের স্তব্ধময় জীবন যাতে বিষাদাচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে, তারজন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পর্যন্ত চিকিৎসার সাথে সাথে পাখোয়াজ/মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রটিকে এক বিশেষ থেরাপি হিসাবে ব্যবহার করছেন।

---

১) আনদ্ধ বা অবনদ্ধ- চামড়াচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রকে আনদ্ধ বা অবনদ্ধ বাদ্য বলে। যা হাত এবং আঙুলের সাহায্যে বাজানো হয়। যেমন -তবলা, পাখোয়াজ, ঢোলক, ঢাক প্রভৃতি।

২) তন্ত্র বাদ্যে- তার বা তাঁরের সাহায্যে নির্মিত যা হাতের আঙুল অথবা ছড়ি দিয়ে বাজান হয়। সেতার, সরোদ, তানপুরা ইত্যাদি।

৩) আশ্রাবনা- আশ্রাবনা অর্থাৎ শুষ্ক বাদ্য বা নিয়োগীত বাদ্যকে বলা হয়েছে।

৪) কুতপ বাদ্য- বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের একত্রে উপস্থাপনা করাকে কুতপ বাদ্য বলে।

৫) পুষ্কর- মাটির তৈরি বাদ্যযন্ত্র।
'নাট্যকুতপ' - নাট্য বা অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট কুতপের নাম 'নাট্যকুতপ'

তথ্যসূত্র ঃ-

১. রায়চৌধুরী, বিমলাকান্ত, ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, শ্রীমতি মঞ্জু ভট্টাচার্য, ৮৬/১৪, পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা-৩০, তৃতীয় প্রকাশ বৈশাখ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

২. দত্ত, দেবব্রত, সংগীত - তত্ত্ব (১ম খণ্ড), ব্রতী প্রকাশনী, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলকাতা-৭৩।
৩. দত্ত, দেবব্রত, সংগীত-তত্ত্ব(২য় খণ্ড), ব্রতী প্রকাশনী, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।
৪. ভট্টাচার্য্য, দুলাল, পরীক্ষার তবলা, বিশশতক, অধ্যাপক শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, ৫, ডাঃ অক্ষয়পাল রোড, কলকাতা-৩৪।
৫. রায়, ইন্দুভূষণ, তবলা বিজ্ঞান (১ম খণ্ড), আদিনাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ-মে ২০১৫।
৬. রায়, ইন্দুভূষণ, তবলা বিজ্ঞান (২য় খণ্ড), আদিনাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ-মে ২০১৫।
৭. https://hi:wikipedia.org/wiki/ (সংগ্রহের তারিখ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০১০)।
৮. অধ্যাপক স্বপন কুমার ঘোষ মহাশয়ের ক্লাস লেকচারের আলোচনা থেকে (সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী ২০১২-১৬ A.D)
৯. শ্রী প্রবাল নাথ মহাশয়ের ক্লাস লেকচারের আলোচনা থেকে (আন্দুল, হাওড়া- ২০১৮-১৯ A.D)
১০. htt://www.gitabitan.com/lyrics/T/anotherbabutumi.html (সংগ্রহের তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২০)।
১১. Agrawal. O. P., Preservation of Art Objects, publication- NBT. INDIA New Delhi-70, ISBN 978-81-237- 0643 - 6,2011.

লেখক : **অভী ঘড়াই,** নাট্য গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চা একটি সমীক্ষা

ড. সুবীর ঘোষ

বাংলা থিয়েটারের জয়যাত্রা মূলত রুশদেশীয় জ্ঞানতাপস হেরাসিম লেবেডফের 'বেঙ্গলি থিয়েটারে'র হাত ধরে। ১৭৯৫ সালে ২৭ নভেম্বর ৬নং ডোমতলা লেনের জগন্নাথ গাঙ্গুলীর বাড়িতে মাসিক ৬০ টাকা ভাড়ায় গড়ে ওঠে 'বেঙ্গলি থিয়েটার'। এখানে কাল্পনিক সংবদল' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা মঞ্চ নাটকের পথচলা শুরু। ইতিপূর্বে ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত প্লে হাউসে যেমন কোনো বাংলা নাটকের অভিনয় হয়নি, তেমনি সেই অভিনয় ধারার সঙ্গে বাঙালিদের তেমন কোনো যোগ ছিল না। বরং ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয় না হলেও 'হিন্দু থিয়েটার' ছিল সম্পূর্ণ বাঙালি প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার এবং এই থিয়েটারের হাত ধরেই বাঙালির সখের থিয়েটারের পথচলা শুরু। ১৮৩৫ থেকে ১৮৭২ সালে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়কালে এই সখের থিয়েটারগুলিই বাঙালির নাট্যচর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল। ১৮৭২ সালে ৭ ডিসেম্বর 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়েই বাঙালির পেশাদারী থিয়েটারে অভিনয় ধারার সূচনা। তবে বলে রাখা ভালো, শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে যখন প্রবল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে চলছে, তখন ব্রিটিশ পূর্ববর্তী বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলাও পিছিয়ে ছিল না। প্রাথমিক পর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চার সূত্রপাত ব্রিটিশদের হাত ধরে হলেও, পরবর্তীতে সংস্কৃতিপ্রেমী অভিজাত ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চায় বাঙালি অগ্রণী ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে। নাট্যচর্চার সেই ধারা যে আজও সমানভাবে বহমান তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উনিশ শতক থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চায় পৃথক দুটি ধারার অস্তিত্ব সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। একটি গ্রামকেন্দ্রিক লোকনাট্যের ধারা, অন্যটি নাগরিক রুচিসম্মত অভিজাত নাটকের ধারা। বলা বাহুল্য যে , প্রথম ধারাটি বেশ প্রাচীন এবং এর উৎস ও পৃষ্ঠপোষক নিঃসন্দেহে লোকায়ত সম্প্রদায়। দ্বিতীয় ধারাটি বিদেশী প্রভাবজাত এবং পরবর্তীতে অভিজাত জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ। প্রথম ধারাটিতে বোলান, আলকাপ, লেটোর মতো লৌকিক নাট্যধারাকেই চিহ্নিত করা হয়। যেগুলির সঙ্গে মঞ্চ বা নাট্যশালার কোনো যোগ ছিল না। এগুলি ছিল একেবারেই লোকমনোরঞ্জক ও লোকজ ভাবধারাপুষ্ট। মুর্শিদাবাদের আলকাপ গান খুবই জনপ্রিয় একটি লোকনাট্যের ধারা। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই লোকজ নাট্যধারাটির ক্ষীণ অস্তিত্ব এখনো অঞ্চলবিশেষে লক্ষ্য করা যায়। বিখ্যাত আলকাপ শিল্পী

ঝাঁকসু বা ধনঞ্জয় মণ্ডল এই মুর্শিদাবাদের মানুষ। মুর্শিদাবাদ জেলার লোকনাট্যের এই শিল্পীদের নিয়েই সৈয়দ মুজতবা সিরাজের 'মায়া মৃদঙ্গ' উপন্যাসের পটভূমি গড়ে ওঠে। বোলান গান মূলত বছরের একটি বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষ্যে লোকমনোরঞ্জক বোলানের পালা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে গ্রামে গঞ্জে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় শৌখিন মঞ্চ নাটকের সূত্রপাত নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ উদ্যোগে। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার রাজক্ষমতা ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গড়ে ওঠে ব্রিটিশ সেনাছাউনি বা বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট। এই সেনাছাউনির 'ম্যাগাজিন বিল্ডিং'- এ ব্রিটিশ সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য ১৮২০ সালে প্রথম অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। শোনা যায় এই অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে টিকিটের বিনিময়ে নাটক দেখার ব্যবস্থা ছিল। তবে ভারতীয়রা সেই অভিনয় দেখার সুযোগ থেকে যে বঞ্চিত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণত কলকাতার বিভিন্ন প্লে হাউস থেকে কলাকুশলীরা এসে এখানে নাটক অভিনয় করে যেতেন। বিশেষ করে দমদম থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত মিসেস লীচ, (যিনি পরবর্তীতে সাঁ-সু-চি থিয়েটার গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন) বহরমপুরের এই সেনাছাউনিতে একাধিকবার অভিনয় করে গেছেন। বিদেশি উদ্যোগে মুর্শিদাবাদে যখন থিয়েটার গড়ে উঠছে, সেই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ধনী জমিদার ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ নিজস্ব উদ্যোগে রাজবাড়ি বা বাগানবাড়িতে গড়ে তুলতে থাকেন সখের থিয়েটার। এক্ষেত্রে কান্দি রাজ পরিবারের কথা সবার আগে বলা দরকার। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন শহর কলকাতায় তৎকালীন নানান সমাজ সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটক অভিনয়ের জোয়ার এসেছে, ঠিক সেই সময়ে ১৮৫৯ সাল নাগাদ কান্দি রাজ পরিবরের উদ্যোগে একটি সুবৃহৎ রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। উদ্বোধনী রজনীতে অভিনীত হয় উমেশচন্দ্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকটি। অভিনয় দেখতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তবে এই একটি অভিনয়ের পর এই থিয়েটারের যবনিকা পরে। বিদ্যাসাগরের পরামর্শে এই থিয়েটার কক্ষকে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে যা রাজ কলেজিয়েট স্কুলের সম্পত্তি।[১]

মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার ইতিহাসে কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর অবদানের কথা না বললেই নয়। মূলত তাঁরই উদ্যোগে কলকাতার পেশাদারী থিয়েটারের নামী অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষকদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের সংযোগ সাধিত হয়। মূলত তাঁর উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারের অভিনেতারা মুর্শিদাবাদে এসে নাটক অভিনয় করে মফস্বলের মানুষজনের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করেন। স্বর্ণময়ী দেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই নিমতিতার জমিদার মণীন্দ্রনারায়ণ বাবু ১৮৯৭সাল নাগাদ নিজস্ব উদ্যোগে নিমতিতা রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন 'নিমতিতা হিন্দু থিয়েটার'। ১৯০২ সালে নিমতিতার জমিদার পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনরাত্রি ধরে পৃথক নাটকের অভিনয়ের কথা জানা যায়— 'সাবিত্রী', চৈতন্যলীলা' ও 'চন্দ্রশেখর'। এমন কি শিশির কুমার ভাদুড়ী

নিমতিতার এই রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার নাটকের অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।[২] সেগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকের অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়াও গিরীশ ঘোষের 'চৈতন্যলীলা', 'শঙ্করাচার্য', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' , 'আলিবাবা', 'নরনারায়ণ' , ভীষ্ম' প্রভৃতি নাটকগুলি দীর্ঘদিন ধরে 'নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারে' অভিনীত হয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটকটি যে এই থিয়েটারের জন্যই লিখিত হয়েছিল, তা নাট্যকার স্বয়ং নাটকটির ভূমিকায় জানিয়ে গেছেন। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এই থিয়েটারের নাট্যচর্চা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। অন্যদিকে, স্বর্ণময়ী দেবীর মৃত্যুর পর রাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজারের জমিদারির স্বত্ব লাভ করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৯৯ সালে গড়ে ওঠে 'কাশিমবাজার স্কুল ড্রামা'। এটি মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম নাট্যবিদ্যালয়। এই নাট্যবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এই নাট্যবিদ্যালয়ের অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল। এই থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে গিরীশচন্দ্রের 'রিজিয়া' ছিল অন্যতম। নাটকটি ছিল মূলত ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা সঞ্জাত। বিশ শতক থেকেই নাট্যচর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গড়ে উঠতে থাকে একাধিক নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্য সংগঠন।

মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় শুরু হয় বিশ শতকের চারের দশক থেকে। এই সময় ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি অভিনীত হয় বহরমপুরের একটি অস্থায়ি মঞ্চে। এছাড়া 'দশচক্র', 'উলুখাগড়া', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি নাটকগুলিও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় বহরমপুরের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে। ১৯৪৬ সাল নাগাদ মুর্শিদাবাদের গণনাট্য সংঘের সঙ্গে মহিলা শিল্পীদেরও সমন্বয় ঘটে। ঐ বছরেই মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' উপন্যাসের মঞ্চায়নে মহিলা শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। যোড়শী মজুমদার, ছন্দা বাগচি, কেয়া দাশগুপ্ত, হাসি দাশগুপ্তের অভিনয় বহরমপুর শহরে সাড়া ফেলে দেয়। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম নেতা ত্রিদিব চৌধুরীর উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে বহরমপুর শহরে গড়ে ওঠে 'ক্রান্তি শিল্পসংঘ', যা মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চায় এক অনন্য অধ্যায় যোজনা করে। বহরমপুরের সার্কাস ময়দান উদ্যানে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে অতীন মজুমদার রচিত 'জাগরণ গীতি' নামে একটি নাটক অভিনীত হয়। যদিও নাটকটির আসল নাম ছিল 'আগামীকাল'। এই অভিনয় দেখতে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম নেতা শওকত ওসমানী, শিক্ষাবিদ নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ। অতীন মজুমদারের 'জাগরণ গীতি' নাটকটির অভিনয় সমগ্র জেলা জুড়ে বিশেষ সাড়া ফেলে দেয়। জেলার অন্যান্য শহরেও নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়। 'ক্রান্তি' শিল্পী সংঘে'র কর্মকাণ্ডও এই সূত্রে প্রসারিত হয় সমগ্র জেলাজুড়ে। ১৯৪৯ সালে রবীন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বনে

অরুণ দাশগুপ্তের রচিত 'বাইশে শ্রাবণ' নাটকটি বহরমপুরের মীরা সিনেমা হলে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ১৯৫০ সালে অতীন মজুমদারের দেওয়া 'মহেশ' গল্পটির নাট্যরূপও একইভাবে সমগ্র জেলাজুড়ে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে অভিনীত হয়। ১৯৫১ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জেলা শাখা। বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সুধীর সেন। এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৫২ সালে বহরমপুরের মীরা সিনেমা হলে অভিনীত হয় তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকটি। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত সময়কালে গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় অভিনীত হয় 'মশাল', মুক্তির উপায়', 'আজকাল', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকগুলি। অবশ্য সাতের দশক থেকেই গণনাট্যের ক্রিয়াকলাপ ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে। তবে গণনাট্য সংঘের সদস্যরাই বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার ধারাকে স্বাভাবিক রাখে।

১৯৫৯ সালে 'ক্রান্তি লেখক শিল্পী সংঘে'র বেশ কয়েকজন শিল্পী (ষোড়শী মজুমদার, কালু সমাজদার, শৈলেন বসু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ) বেরিয়ে এসে 'রূপশিল্পী' নামে পৃথক একটি নাট্যদল গড়ে তোলেন। এটিই মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম গ্রুপ থিয়েটার। এই নাট্যদলের প্রথম প্রযোজনা 'রূপোলী চাঁদ', যা বহরমপুরের সূর্য সিনেমাহলে ১৯৫৯ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর অভিনীত হয়। নাটকটির রচয়িতা ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং নাট্য পরিচালক ছিলেন কালিদাস (কালু) সমাজদার। কালু সমাজদারের নাট্য পরিচালনায় 'রূপশিল্পী' নাট্যদল প্রায় ১০টিরও বেশি নাটক অভিনয় করে। পরে পাকাপাকিভাবে নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অনিল কুমার দত্ত। তাঁর নাট্য নির্দেশনায় 'রূপশিলী'র ব্যানারে প্রায় ৫০টির বেশী নাটক অভিনীত হয়। ১৯০৯ থেকে এই নাট্যদলটির গতি শ্লথ হয়ে পড়লেও, এখনো 'রূপশিল্পী' নাট্যদলটির অস্তিত্ব মিলিয়ে যায় নি। রূপশিল্পীর জনপ্রিয় নাট্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে অন্যতম 'রূপোলী চাঁদ', 'মাটির মায়া', 'দুই মহল', 'দালিয়া', 'মন নিয়ে খেলা', 'পলাশী', 'বড় পিসিমা', 'সৈনিক, 'রজনীগন্ধা', 'মৃত্যুর চোখে জল', 'বাকি ইতিহাস' প্রভৃতি। রূপশিল্পীর প্রযোজনায় ডি এল রায়ের 'পুনর্জন্ম' নাটকটি অনিলকুমার দত্তের নির্দেশনায় ২৯ বার, অনিলকুমার দত্তের নির্দেশনায় রমেন লাহিড়ীর একাঙ্ক নাটক 'রাজযোটক' ২৪ বার, শৈলেন গুহ নিয়োগীর একাঙ্ক নাটক 'ঝুমুর' ১৯ বার অভিনীত হয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথে 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপ ১৭ বার, মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ১৫ বার, গঙ্গাপদ বসুর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সত্য মারা গেছে' ১০ বার 'রূপশিল্পী'র প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়। উদয়নীল ভট্টাচার্যের লেখা 'বৃষ্টি আসছে' নাটকটি 'রূপশিল্পী'র সবচেয়ে বেশি মঞ্চ সফল নাট্য প্রযোজনা। 'রূপশিল্পী'র দীর্ঘ পথচলা মুর্শিদাবাদে অন্যান্য নাট্যদলের উদ্ভবের পথকেও প্রশস্ত করে তোলে।

'রূপশিল্পী'র নাট্য প্রযোজনার প্রভূত সাফল্য ও জনপ্রিয়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুর্শিদাবাদে আরও বেশ কয়েকটি নাট্যদলের উদ্ভব। এদের মধ্যে 'ছান্দিক' ও 'প্রান্তিক' নাট্যদল দুটির কথা সবার আগে বলতে হয়। দুটি নাট্যদলেরই উদ্ভব ১৯৬৮ সালে। একই

বছরের১৮ জুলাই 'ছান্দিক' এবং ২৫ ডিসেম্বর 'প্রান্তিক' নাট্যদল দুটি পথচলা শুরু করে। 'প্রান্তিক' নাট্যদলের অধিকাংশ সদস্যই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' নামে একটি নাট্য প্রযোজনার সময় মতানৈক্যের জেরে গণনাট্য সংঘ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে নাট্যাভিনয়ের জন্য 'প্রান্তিক' নাট্যদল গড়ে তোলেন। প্রাথমিকভাবে এই নাট্যদলের কর্ণধার ছিলেন অঞ্জন বিশ্বাস। জিয়াগঞ্জের 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত এই নাট্যমোদী গুণী মানুষটির নেতৃত্বে এবং অরবিন্দ ভট্টাচার্য, বিজয় মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ ঘোষ, তপন সান্যাল, শুভময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সহযোগিতায় অচিরেই 'প্রান্তিক' নাট্যদলটি বহরমপুর শহরের অন্যতম জনপ্রিয় একটি নাট্যদলে পরিণত হয়। অঞ্জন বিশ্বাসের পরিচালনায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নাটক 'শেষ থেকে শুরু' দিয়ে 'প্রান্তিক' নাট্যদলের পথচলা শুরু। পরে এই নাট্যদলে এসে যোগ দেন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব দিব্যেশ লাহিড়ী। দিব্যেশ লাহিড়ীর 'নানা হে' নাটকটি 'প্রান্তিক নাট্যগোষ্ঠীর সফল নাট্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে অন্যতম। নাটকটি মালদহের গম্ভীরা লোকনাট্যের আঙ্গিকে রচিত। এছাড়া প্রান্তিক নাট্যগোষ্ঠীর অন্যান্য মঞ্চসফল নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম 'দরজায় করাঘাত', 'গণ্ডার', 'মাই নেম ইজ গওহরজান', 'আমার পুতুল', 'নানা রঙের দিন', 'ইতিহাস কাঁদে', 'চাক ভাঙা মধু' প্রভৃতি। 'প্রান্তিক' নাট্যদলের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব অঞ্জন বিশ্বাসের। সাত ও আটের দশকে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা তো বটেই, এমনকি কলকাতার নামী নাট্যদলগুলির সঙ্গে 'প্রান্তিক'কে এক আসনে নিয়ে আসার কৃতিত্ব অনেকটাই অঞ্জন বিশ্বাসের। অঞ্জন বিশ্বাসের পর 'প্রান্তিক'নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রদীপ ভট্টাচার্যের উপর। অবশ্য তিনি বেশিদিন 'প্রান্তিকে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ১৯৮৬ সালে 'প্রান্তিক' থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি 'বহরমপুর রেপার্টরী থিয়েটার' নামে পৃথক নাট্যদল গড়ে তোলেন। নয়ের দশকে অঞ্জন বিশ্বাসের মৃত্যুর পর 'প্রান্তিক'-এর পথচলা খুবই শ্লথ হয়ে যায়। অবশ্য সম্প্রতি সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয়াঙ্কুশেখর দাসের নেতৃত্বে 'প্রান্তিক' নাট্যদল পুরনো গৌরব ফিরে পেতে সচেষ্ট হয়েছে।

অঞ্জন বিশ্বাস যেমন 'প্রান্তিক' -এর প্রাণপুরুষ ছিলেন, 'ছান্দিক', নাট্যগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ ছিলেন শক্তিনাথ ভট্টাচার্য। ১৯৬৮ সালে ১৮ জুলাই নিজের লেখা 'শূন্যে বিহার' নাটক পরিচালনার মধ্যে দিয়ে শক্তিনাথ ভট্টাচার্য 'ছান্দিক' নাট্যগোষ্ঠীর সূচনা করেন। তাকে সাহায্য করেন গোরাচাঁদ দত্ত, সুব্রত হালদার, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অংশুজিৎ সিনহা, রঞ্জিত দে প্রমুখ। শক্তিনাথ ভট্টাচার্যের নাট্যগুরু ছিলেন তপন মিত্র। কিশলয় সেনগুপ্ত 'ছান্দিক'-এ যোগদানের পর নাট্যদলটি বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিশলয় সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'আসামী হাজির', 'সময়ের রং অন্য', 'মে দিবস', 'কবর', 'নয়ন কবীরের পালা', 'আমি মদন বলছি', রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। রবীন্দ্র নাট্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে বহরমপুর শহরে সবচেয়ে বেশি সাফল্যের

দাবিদার 'ছান্দিক' নাট্যগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকটি 'ছান্দিকে'র প্রযোজনায় একশোরও বেশি বার অভিনীত হয়েছে। তবে ২০০৯ সালে কিশলয় সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর 'ছান্দিক' নাট্যগোষ্ঠীর গৌরব স্তিমিত হতে শুরু করে।

'রূপশিল্পী', 'প্রান্তিক', 'ছান্দিক' নাট্যগোষ্ঠীর মতো বহরমপুর শহরে আরও বেশ কয়েকটি নবীন নাট্যদল নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করে। তাদের মধ্যে 'যুধাগ্নি' নাট্যদলটির কথা সবার আগে বলতে হয়। এছাড়া 'শাশ্বত', 'বহ্নি', 'স্বস্তিক', 'সুহৃদ' প্রভৃতি নাট্যদলগুলিও অনিয়মিতভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অভিজিৎ সরকারের উদ্যোগে কমল লাহিড়ী, পঙ্কজ চক্রবর্তী, প্রিয়শঙ্কর সাহা প্রমুখের সহায়তায় ১৯৭৪ সালে ১ লা মে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে 'যুগাগ্নি' পথচলা শুরু করে। উদ্বোধনী রজনীতেই অভিনীত হয় অভিজিৎ সরকার রচিত ও নির্দেশিত 'অসমাপ্ত' নামে একাঙ্ক নাটক। অবশ্য 'যুগাগ্নি'র প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা রাধারমণ ঘোষ রচিত 'সূর্য নেই স্বপ্ন আছে।' পরবর্তীকালে 'যুগাগ্নি'তে এসে যোগ দেন পম্পু মজুমদার। 'যুগাগ্নির নিয়মিত নাট্য প্রযোজনার ধারাকে অব্যাহত রাখতে পম্পু মজুমদার নিজেই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং পরবর্তীতে 'যুগাগ্নি'র প্রধান নাট্যকার হয়ে ওঠেন। 'স্রোত', 'রাখাল', 'শিকার', 'খোদার মর্জি', 'পেরেক', 'খণ্ডযুদ্ধ' প্রভৃতি পম্পু মজুমদারের অনন্য সৃষ্টি। এছাড়া 'যুগাগ্নি'র অন্যান্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে 'বিছন', 'গণ্ডি', 'নবজাতক', 'গরমভাত', 'পালাবার পথ নেই' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'যুগাগ্নি'র সবচেয়ে বেশি অভিনীত নাটক হল 'আমি মেয়ে'। নাটকটি প্রখ্যাত নাট্যকার সফদার হাসমি রচিত 'আওরাত' নামে একটি হিন্দি নাটকের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেন আশিস গোস্বামী। নাটকটি নির্দেশনার সময় অভিজিৎ সরকার আরও বেশ কিছুটা সম্পাদনা করেছিলেন। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার কথাই নাটকটির মূল কথা। 'যুগাগ্নি'র আর একটি সফল প্রযোজনা হল 'মা অভয়া'। 'যুগাগ্নি' মঞ্চনাটকের পাশাপাশি পথনাটকেও ছিল সমান সক্রিয়। সফদার হাসমির 'হল্লাবোল' নাটকটির অভিনয় 'যুগাগ্নি'কে যেমন জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল, পাশাপাশি বিরূপ সমালোচনার শিকারও হতে হয়েছিল। ১৯৯০ সালে নাটকটি যখন অভিনীত হচ্ছিল, তখন তৎকালীন সমাজ সমস্যাগুলিকেও নাটকটির সঙ্গে মিলিয়ে অভিনয় করানোর ফলে এক শ্রেণির রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষের প্রবল বিরোধিতার শিকার হতে হয়েছিল 'যুগাগ্নি'কে।[৩]

'যুগাগ্নি'র মতোই রাজনীতি সচেতন একটি নাট্যসংস্থা 'চুঁয়াপুর সুহৃদ'। ১৯৭৬ সালে এই নাট্যগোষ্ঠীর পথচলা শুরু মূলত 'সুহৃদ' নামে একটি ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে। দলে নিজস্ব নাট্যকার না থাকলেও নাট্যদলটি বিভিন্ন নাট্যকারের সমাজ সমস্যা সম্বলিত নাটকগুলি নির্বাচন করে অচিরেই বহরমপুর শহরে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যদলে পরিণত হয়। বিদ্যুৎ দাস, বিশ্বনাথ রায়, কল্যাণ চক্রবর্তী, কমল ভট্টাচার্য প্রমুখ তরুণদের প্রচেষ্টায় দিব্যেশ

লাহিড়ীর 'নাজি৭৪' নাটকের মধ্যদিয়ে এই নাট্যদলের যাত্রা শুরু। প্রথম দিকে এই নাট্যদলের নির্দেশক হিসাবে পম্পু মজুমদারকে নিয়ে আসা হত। ২০১৭ সালের পর এই নাট্যদলের নাট্যকার ও নাট্য নির্দেশক হিসাবে অনন্যা ভট্টাচার্য এই গুরুদায়িত্ব বহন করে চলেছেন। তাঁর লেখা 'সম্পর্ক' ও 'অবভাস' নাটক দুটির অভিনয়ও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। নাট্যাভিনয় ছাড়াও 'চুঁয়াপুর সুহৃদ' প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাসে নাট্যমেলার আয়োজন করে থাকে। বর্তমান প্রজন্মকে নাটক অভিমুখী করার জন্য বিভিন্ন থিয়েটার কর্মশালাও অয়োজন করে 'চুঁয়াপুর সুহৃদ'।

১৯৮০ সালে সাতজন নাট্যমোদী যুবক মিলে বহরমপুরের খাগড়ায় সৈলদাবাদে গড়ে তোলেন 'সপ্তর্ষি' নামে আর একটি নাট্যগোষ্ঠী। এই নাট্যদলের কর্ণধার ছিলেন কিশোর মুখার্জী। বাকি ছয়জনের মধ্যে গনেশ মুখার্জী, প্রবীর মুখার্জী, প্রদীপ কয়রাল, অনুপ কয়রাল, বাপি দাস, কানু ভট্টাচার্য অন্যতম। পরে আরও একাধিক সদস্য এই নাট্যদলে যোগদান করেন। কিশোর মুখার্জী একাধারে নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা ও নাট্য নির্দেশক। একশোর বেশি নাটক তিনি রচনা করেছেন নিজের নাট্যদল 'সপ্তর্ষি'র জন্য। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নাট্যনির্দেশনা হল 'যযাতি', 'একটি নীড়ের সন্ধানে', 'ডাইনি', 'সিংহাসন', 'মতিঝিলের কান্না' প্রভৃতি। প্রত্যেকটি নাটক তাঁর নিজেরই রচনা। বর্তমানে কিশোর মুখার্জীর পাশাপাশি গৌতম পাত্র ও জাগ্রত দাসও নাট্যনির্দেশনায় কিশোর বাবুকে সাহায্য করে চলেছেন। কলকাতা দূরদর্শনে কিশোর মুখার্জীর 'অশান্তি', ও 'পরম্পরা' নাটকদুটির সফল অভিনয় 'সপ্তর্ষি'কে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় করে তোলে। 'সপ্তর্ষি'র বহুল অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে 'ডাইনি' নাটকটির নাম সবার আগে করতে হয়। কিশোর মুখার্জীর লেখা এই নাটকটিতে ডাইনি সন্দেহে নারী নির্যাতনের বীভৎস রূপকে তুলে ধরা হয়েছে। 'সপ্তর্ষি'র আর একটি মঞ্চ সফল ও বহুল অভিনীত নাটক হল 'যযাতি'। নাটকটি ওড়িশার সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়ায় সেরা নাটক এবং প্রধান অভিনেতা হিসাবে কিশোর মুখার্জীকে 'নাট্যবিভূষণ' উপাধি দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার ইতিহাসে আর একটি নাট্যসংস্থার নামও সাদরে উচ্চারিত হয়- 'ঋত্বিক'। 'ঋত্বিক' কেবল মুর্শিদাবাদ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে নাট্যচর্চার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। ১৯৮০ সালে ৮ মে বহরমপুরের রাধারঘাট অঞ্চলে ন'জন তরুণ যুবক মিলে এই নাট্যদল গড়ে তোলেন। অবশ্য তারও আগে বহরমপুর শহরে 'ঋত্বিক নাট্যগোষ্ঠী' নামে একটি অখ্যাত নাট্যদল ছিল। কিন্তু সেই দলের নাটক অভিনয়ের কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। অবশ্য এই পুরনো নাট্যদলের চারজন সদস্য এবং আরও পাঁচজন নতুন সদস্য মিলে নবকলেবরে 'ঋত্বিক' গড়ে ওঠে। এঁরা হলেন দিলীপ বিশ্বাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, কুন্দন বিশ্বাস, প্রবীর রায়, সুশান্ত নন্দী, সুজিত চৌধুরী, কিশোর মাহাতো, বাবলু দত্ত, দুলাল দত্ত প্রমুখ। উদ্বোধনী রজনীতে অভিনীত হয় 'সিংহাসন' নাটকটি। 'ঋত্বিক' শুরু হওয়ার বেশ

কিছু দিন পরে দলে এসে যোগ দেন গৌতম রায় চৌধুরী। 'ঋত্বিক' এর যাবতীয় খ্যাতি ও সুনাম মূলত এই গৌতম রায়চৌধুরীর জন্যই। ২০১১ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নাট্য রচনা ও নাট্য নির্দেশনার সমস্ত দায়িত্বই দক্ষতার সঙ্গে পালন করে 'ঋত্বিক'কে সর্বভারতীয় খ্যাতি এনে দেন গৌতম রায় চৌধুরী। তাঁর অবর্তমানে দলের দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন বিপ্লব দে। বিপ্লব দে'র পরিচালনায় 'শেষ রক্ষা', 'আদি রাজা', 'কঙ্কাল', 'আঁধারে সূর্য', 'চম্পাবতী', 'তুষের আগুন' খুবই জনপ্রিয় ও সফল নাট্য প্রযোজনা। গৌতম রায়চৌধুরীর রচিত ও নির্দেশিত নাটকগুলির মধ্যে 'জামগাছ', 'কাল মার্কস', 'সীমা চৌহদ্দি', 'আত্মবিম্ব', 'মেঘবতী', 'দেশদ্রোহী' খুবই সফল নাট্য প্রযোজনা। সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে' অবলম্বনে রচিত 'মেঘবতী' নাটকটি গৌতম রায়চৌধুরীকে প্রবল খ্যাতি এনে দেয়। নাটকটি দেশে-বিদেশে একাধিকবার অভিনীত হয়েছে 'ঋত্বিক'-এর ব্যানারে। আগাগোড়া বামপন্থী মানসিকতা সম্পন্ন 'ঋত্বিক' বরাবরই রাজনৈতিক নাটক অভিনয়কেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০০০ সাল থেকে অনুষ্ঠিত 'ঋত্বিক'-এর নাট্যমেলা বহরমপুরের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষজনের আকর্ষণের অন্যতম ভরকেন্দ্র। এই নাট্যমেলায় দেশ-বিদেশের একাধিক নাট্যদলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বর্তমানে বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চার ধারাকে যে সমস্ত নাট্যদল স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তাদের মধ্যে 'ঋত্বিক'-এর নাম সবার আগে করতে হয়। এই ঐতিহ্যশালী বড় নাট্যদলগুলি ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি নবীন নাট্যদলের অস্তিত্বও বহরমপুর শহরে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে 'নবীন নাট্যসংস্থা', 'বহরমপুর রেপার্টরী থিয়েটার', 'বহরমপুর ছাড়পত্র', 'রঙ্গাশ্রম' প্রভৃতির নাম অবশ্যই করতে হয়। মূলত 'গ্র্যান্ড হল' এবং 'রবীন্দ্র সদন'-এর স্থায়ী মঞ্চেই বহরমপুরের সমস্ত নাট্যদলের নাট্যচর্চা আবর্তিত হয়।

বহরমপুরের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী শহর লালবাগ ও জিয়াগঞ্জেও নাট্যচর্চার প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। লালবাগের জমিদার ধরণী ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'বান্ধব সমিতি' খেলাধূলা, শরীরচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত নাট্যচর্চাও করতো। ধরণী ঘোষের পুত্র অরুণ ঘোষ পিতার মতোই ছিলেন নাট্যমোদী ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজস্ব উদ্যোগে নিজের কাছাড়ি বাড়ি ভেঙে 'পারুল শেখের স্মৃতিমঞ্চ' নামে একটি স্থায়ি মঞ্চ নির্মাণ করেন। ১৯৫৯ সালে শিশির ভাদুড়ির হাত দিয়ে এই নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন হয় এবং উদ্বোধনী রজনীতেই শিশির ভাদুড়ির নির্দেশনায় অভিনীত হয় 'সাজাহান' নাটকটি। এই নাট্যমঞ্চে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহু নাটকের অভিনয় হয়। সাতের দশকে লালবাগ শহরে আর একটি নাট্যদল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে- 'অরুণ আর্ট সেন্টার'। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অগ্রদূত' নাট্যসংস্থাটি বছর পাঁচেক নিয়মিতভাবে নাট্যাভিনয় করে বন্ধ হয়ে যায়। জিয়াগঞ্জ শহরের নাট্যচর্চার সূত্রপাত ১৯২৮ সাল থেকে 'বালুচর ভারতী নাট্যসমাজ'-এর হাত ধরে। এই নাট্যসংস্থার নাটক অভিনয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বহুমুখী নাট্যসংস্থা' জিয়াগঞ্জে নিয়মিত নাটক অভিনয়

করতো, সে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।[৫] সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদী’ নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই নাট্যসংস্থার পথ চলা শুরু। তারপর বহু নাটকের অভিনয় করে জিয়াগঞ্জের মানুষকে আনন্দ দিয়ে চলেছে এই নাট্যদলটি। মুর্শিদাবাদ শহরের বেলডাঙ্গা শহরে ‘অন্নপূর্ণ থিয়েটার’ নামে একটি প্রাচীন নাট্যদলের কথা শোনা যায়। কলকাতার নাট্যপ্রেমী ব্যক্তি প্রমথনাথ ভাদুড়ি বেলডাঙ্গায় এসে স্থানীয়দের সহায়তায় এই নাট্যদল তৈরি করেন। ১৯০৭ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এই নাট্যদলটি অসংখ্য নাটকে অভিনয় করে। মুর্শিদাবাদের আর এক শহর জঙ্গিপুরে ১৯৩৯ সালে ‘শ্রীভবন’ নামে একটি নাট্যমঞ্চ গড়ে তোলেন ঐ অঞ্চলের জমিদার সৌরীন্দ্রমোহন রায়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই নট্যমঞ্চে নিয়মিত নাটকের অভিনয় হত। অর্থাৎ শুধুমাত্র সদর শহর বহরমপুর নয়, সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়েই নাট্যচর্চার একটি গৌরবময় ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে , যা এই জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এখনো অক্ষুন্ন করেছে। শহুরে রঙ্গমঞ্চের পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষজনের মঞ্চ বেঁধে যাত্রা, আলকাপ অভিনয়ের ধারাও এই জেলার সাবেক ঐতিহ্যকেই তুলে ধরে।

<u>তথ্যসূত্র</u>

১) ‘বহরমপুরে নাটকের পথচলা’, শক্তিনাথ ভট্টাচার্য, অনুপ চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘ছান্দিক নাট্যোৎসব’, ২০০৮, বহরমপুর, পাতা - ৪০
২) ‘বহরমপুরে নাটকের পথচলা’, শক্তিনাথ ভট্টাচার্য, অনুপ চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘ছান্দিক নাট্যোৎসব’, ২০০৮, বহরমপুর, পাতা - ৪০
৩) ‘যুগাগ্নি’র সালতামামি’, ‘যুগাগ্নি স্মারক পত্রিকা’, অভিজিৎ সরকার, ২০০৫, বহরমপুর, পাতা - ১৯
৪) ‘নাট্যচর্চায় মুর্শিদাবাদ জেলা’ দুলাল চক্রবর্তী, স্বপন দাস সম্পাদিত ‘থিয়েটার প্রয়াগ পত্রিকা’, কলকাতা, ১৪১০, পাতা- ২৮৭

লেখক : **ড. সুবীর ঘোষ,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (BHU)।

বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে গ্রুপ থিয়েটার চর্চা (১৯৬০-২০২০)
একটি অনুসন্ধান মূলক সমীক্ষা

অঙ্কুশ দাস

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধনা ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে মাত্রাতিরিক্ত পর্যটকদের প্রাদুর্ভাবের দৌলতে বোলপুর শহর সমগ্র বাংলায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অধিক 'জনপ্রিয়'। অধিকাংশ পর্যটকদের কাছে দিঘার বিকল্প এহেন্য সামাজিকমান বা ছবি (সোশ্যাল ইমেজ) উন্নতির মাপকাঠি শান্তিনিকেতনের দোসর, বিগত বেশ কিছু বছর যাবৎ খোয়াই-এর হাট বা শনিবারের হাট। এসবের দৌলতেই শান্তিনিকেতন গুরুদেবের সাধনাক্ষেত্র অপেক্ষা সপ্তাহান্তে অবসর ও বিনোদনের সেরা ঠিকানা হয়ে উঠেছে। এইভাবে ক্রমশ জনবহুল ও উন্নত (?) হতে থাকা এই শহরের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সহ সাংস্কৃতিক ইতিহাস আর পাঁচটা উদীয়মান জায়গার মতই বিকশিত সভ্যতার চরণতলে পিষ্ট হয়ে কালের পৃষ্ঠায় দ্রুত বিলীন হয়ে গেছে। তারই মধ্যে যা কিছু এ সময়েও অবশিষ্ট তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এই প্রজন্মের অবশ্য কর্তব্য। সেই বোধের জায়গা হতেই বর্তমান গবেষক বোলপুর শহরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম অঙ্গ গ্রুপ থিয়েটার চর্চাকে বেছে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যচর্চাকে এই গবেষণার অন্তর্গত করা হয়নি। কারণ এটি একটি বিশদ বিস্তৃত ও স্বতন্ত্র গবেষণা ক্ষেত্র সহ অবাক হলেও এটাই সত্যি যে, গুটিকয়েক (পরিসংখ্যানের নিরিখে) রবীন্দ্র প্রযোজনা ছাড়া এই পবিত্র প্রাঙ্গণের নাট্য ধারার তেমন কোন প্রভাব বোলপুর তথা সমগ্র বীরভূম জেলার নাট্যচর্চায় পরিলক্ষিত হয়নি।

গবেষণার সমস্যা ও সীমানা - যথাযথ পর্যাপ্ত লিখিত বা মুদ্রিত তথ্য না থাকা এবং সূচনাকালে এই সাংস্কৃতিক ধারার সাথে যুক্ত সক্রিয় ব্যক্তিদের পরলোক গমন অথবা তাদের মলিনস্মৃতি সঠিক তথ্য সংগ্রহকে ব্যাহত করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রুতি নির্ভর করে তুলেছে। বিশেষত স্বাধীনতার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে এখনও সক্রিয় থাকা কোন নাট্যদলই নিজেদের কর্মকান্ডের পূর্ণাঙ্গ তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে না রাখায় স্মৃতি হতে প্রাপ্ত সময়কালের তথ্য যাচাই করা দূরহ হয়ে গেছে। তাই তৎকালীন বেশ কিছু আঞ্চলিক সংবাদপত্র ও পত্রিকায় মুদ্রিত বোলপুরের নাট্যচর্চার খবরাখবর, টিকিট, পোষ্টার, হ্যান্ডবিল প্রভৃতি গবেষণার অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রথম উপাদান সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাকালে প্রতিটি নাট্যদলের সর্বাপেক্ষা প্রবীণ এবং বর্তমান সক্রিয় নাট্যকর্মীদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেই সাথে শান্তিনিকেতন থানা তৈরির পূর্বে বোলপুরের

থানার অন্তর্গত বোলপুর শহর ও শান্তিনিকেতনসহ তার চতুপার্শ্ব হল এই গবেষণার ভৌগলিক সীমানা।

গবেষণার রূপরেখা ও উদ্দেশ্য - নাট্যদলগুলির সূচনাকালীন ইতিহাস সহ বর্তমান অবস্থা, নাট্যচর্চা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকাণ্ড, বর্তমান সক্রিয় নাট্যকর্মীদের সম্পূর্ণ (নাম, বয়স, মূল পেশা) তালিকা সহ ধারাবাহিক কালানুক্রমিক প্রযোজনা তালিকা (সাল, প্রযোজনার নাম, গল্পকার, নাট্যকার, নির্দেশক ও মঞ্চায়নের সংখ্যা) সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২০ সালের ১লা মে হতে ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পন্ন করা এই প্রবন্ধের সমীক্ষায় অধিকতর ভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে সমস্ত নাট্যদলের এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত ধারাবাহিক প্রযোজনা তালিকা এবং সক্রিয় নাট্যকর্মীদের তালিকা। ধারাবাহিক প্রযোজনা তালিকা হতে জানা যায় বোলপুর শহরে নাট্যদলগুলি দ্বারা কোন সালে কতগুলি প্রযোজনার নির্মাণ হয়েছে এবং নাট্যকর্মীদের তালিকা হতে জানা যাবে বর্তমানে মোট কতজন নাট্যকর্মী বোলপুর শহরে সক্রিয় আছেন? সেই সাথে জানা যাবে কোন বয়সের কতজন নাট্যকর্মী বোলপুরে সক্রিয় এবং মোট সক্রিয় নাট্যকর্মীদের মধ্যে কতজন পুরুষ এবং মহিলা রয়েছেন? এছাড়াও জানা যাবে সক্রিয় মোট কতজন কোন কোন স্থায়ী পেশার সাথে যুক্ত? প্রসঙ্গত ইতিপূর্বে বা সমগ্র বীরভূম জেলার উপর এ বিষয়ে এমন সমীক্ষা হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। নিম্নে আত্মপ্রকাশের সালানুসারে থিয়েটার গ্রুপ তথা নাট্যদলগুলির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করা হল।

যদিও পঞ্চাশের দশকে মধ্য পর্যায়ে ক্ষুদিরাম সেন,জগদীশ মণ্ডল, নীলমণি ঘোষ, (কালিকাপুর), মঙ্গল চৌধুরী, (আদি বাড়ি বর্ধমান,), ঠাকুরদাস মিত্র, মমতাজ আহম্মদ' প্রমুখ স্থানীয় কিছু শিল্পীদের দ্বারা 'শ্রীনাট্যম' নামে সম্পূর্ণ অপেশাদারী এক গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় তথাপি এই গোষ্ঠীকে কোন ভাবেই 'গ্রুপ থিয়েটার' বা নাট্যদলের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কেবলমাত্র সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আদর্শে এঁরা নাটচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। "কিছুদিন পর উৎসাহী সদস্যবৃন্দ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় 'শ্রীনাট্যম' এর বিলুপ্তি ঘটে।[২]"

বোলপুর শহরে প্রথম নাট্যদল তথা গ্রুপ থিয়েচার মহম্মদ বদরে আলম প্রতিষ্ঠিত 'ভার্ডেন্ট থিয়েটার গ্রুপ' যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে। যার প্রথম প্রযোজনা বদরে আলমের নির্দেশনায় 'এরাও মানুষ'। জ্যোৎস্না মিত্র, সীতারা বেগম, সত্যব্রত , আমির হোসেন প্রমুখ সহ একসময় এই দলের নাট্যকর্মীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫ জন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে শৈলেন দে প্রদত্ত নাট্যরূপের 'মহেশ' এই দলের সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রযোজনা যা ২০ বারেরও বেশি মঞ্চস্থ হয়েছিল। জীবিকার জন্য বদরে আলম ব্যস্ত হয়ে পড়লে ১৯৮০ সালে শেষবারের মত 'মহেশ' মঞ্চস্থ হয়ে 'ভার্ডেন্ট থিয়েটার গ্রুপ' স্তব্ধ হয়ে যায়। সমীক্ষার ক্ষেত্রে এই দলের মোট ৭টি প্রযোজনাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এরপর ১৯৬৯ সালে নির্বাচনের পরেই সুজাতা লুনাবৎ , প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ও প্রতিভা সিংহ রায়ের ভূমিকায় বোলপুরে গড়ে ওঠে প্রথম গণনাট্যের শাখা 'রূপান্তর' গোষ্ঠী যার প্রথম প্রযোজনা ছিল 'রক্তে বোনা ধান'। সত্তরের দশকের প্রথম পর্বে রাজনৈতিক

অস্থিরতায় এই নাট্যদলের কর্মকাণ্ড নানান বাধার সম্মুখীন হতে থাকে। রূপান্তরের নাট্যকর্মীদের উপর রাজনৈতিক আক্রমণ হয় একাধিকবার। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে রূপান্তর ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে। রূপান্তরের মোট ৮টি প্রযোজনাকে সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

সত্তরের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তৈরি হয় বোলপুর সহ সমগ্র বীরভূমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৃহৎ নাট্যদল (প্রায় ১০০ জন নাট্যকর্মী ছিল) 'নাট্যসারথী'। প্রতিষ্ঠাতা পার্থসারথী ভট্টাচার্য ছাড়াও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যকর্মীরা হলেন- প্রদীপ কবিরাজ, সুবোধ নায়েক, অশোক ভক্ত, অশোক চক্রবর্তী প্রমুখ। নাট্যসারথীর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলা হয়েছে 'নাট্যসারথী আত্মপ্রকাশ করেছিল এমন এক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থায় যখন স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের আসমুদ্র-হিমাচল কম্পিত করেছিল যে ছাত্র যুবক বিদ্রোহ তা তখন কারার পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত।'[৩] প্রসঙ্গত এই নাট্যদলই শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর পরিবৃত্তের বাইরে বোলপুর শহরে প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্য অবলম্বনে বিবিধ রবীন্দ্র প্রযোজনা একের পর এক মঞ্চস্থ করে। নাট্যসারথীর প্রথম প্রযোজনা পার্থসারথী ভট্টাচার্য রচিত ও নির্দেশিত 'দেওয়াল' যা প্রথম মঞ্চস্থ হয় নিচুপটী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। ১৯৮১-৮২ সাল থেকে বিবিধ প্রাসঙ্গিক কারণে প্রতিষ্ঠাতা পার্থসারথী বাবুর সাথে নাট্যসারথীর সম্পর্ক মলিন হতে হতে এক সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দলের হাল ধরেন প্রদীপ কবিরাজ। ১৯৯০-৯১ সালে মনোমালিন্যের জন্য প্রদীপ কবিরাজ এই নাট্যদল হতে অব্যাহতি নেওয়ার পর অমিয় চট্টরাজ দলের দায়িত্ব নিলেও দলের ভাঙন রোধে খুব একটা সাফল্য পাননি। ১৯৯৭ সালে ২৫ বছর পূর্তিতে শেষবারের মত এক বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পর থেকেই নাট্যসারথীর অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। ২০১০ সালে প্রদীপ পুরোহিতের নির্দেশনা 'কর্ণকুন্তীর সংবাদ' মঞ্চায়নের মাধ্যমে অন্ধকার যুগের সমাপ্তি ঘটলেও তা পূর্বের গৌরবের প্রতি যথাযথ সুবিচার করতে সক্ষম হয়নি। সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে নাট্যসারথীর বর্তমান ২০ জন নাট্যকর্মী এবং ৫২টি প্রযোজনা।

নাট্যকর্মীদের উপর রাজনৈতিক আক্রমণের ফলে 'রূপান্তর' বন্ধ হয়ে গেলে ১৯৮১ সালে বোলপুরে 'উত্তরণ' নামে গণনাট্যের আরো এক শাখা তৈরি হয়। যদিও নতুন সরকার গঠনের পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৮ সাল থেকে গণনাট্যের এই শাখার কর্মকাণ্ড শুরু হয়। শুরুর দিকে রূপান্তরের বেশ কিছু নাট্যকর্মী এতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই একাধিকবার দলের দায়িত্ব বিবিধ কারণে পরিবর্তন হওয়ায় 'উত্তরণ' -এর প্রযোজনাগুলির কালানুক্রমিক পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দলের বর্তমান সম্পাদক কামদেব গোস্বামীও তার সময়কালের প্রায় ২৭টি প্রযোজনারই কোন নির্দিষ্ট সালের তথ্য দিতে পারেনি। তাই সমীক্ষায় কেবলমাত্র উত্তরণের বর্তমান ১৬জন নাট্যকর্মীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

উত্তরণের জন্মকালেই অর্থাৎ ১৯৮১ সালেই গোরাচাঁদ সেনগুপ্ত প্রতিষ্ঠা করেন 'হোমানল' নাট্যদল। সূচনাকালে যে সকল নাট্যকর্মী হোমানলে সক্রিয় ছিলেন তাদের

কয়েকজন হলেন- কল্যাণী চক্রবর্তী, শ্যামল কর, বীরেন বিশ্বাস, অর্ধেন্দু রায়, দীপক ভট্টাচার্য, সুনয়না দাস প্রমুখ। হোমানলের প্রথম প্রযোজনা গোরাচাঁদ সেনগুপ্ত রচিত ও নির্দেশিত 'বাতিল' যা এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ বার মঞ্চস্থ হয়েছে। এই দলের মোট ২৩টি প্রযোজনা এবং বর্তমান ১৯ জন নাট্যকর্মীকে সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এরপর বোলপুর সহ সমগ্র বীরভূমে বর্তমানে রবীন্দ্র প্রযোজনার অন্যতম বিশিষ্ট নাট্যদল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামকরণ করা এবং নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রতীক (লোগো) দ্বারা গৌরবান্বিত 'সাহিত্যিকা'। আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই 'সত্তরের দশকে সাহিত্যিকার সংগীত ও নাট্য বিভাগ গড়ে ওঠে,'[৪]। যদিও আত্মপ্রকাশের সময় হতে পরবর্তী প্রায় ৪৯ বছরের (১৯৩৭-১৯৮৬) প্রযোজনাগুলির কোন পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই কেবলমাত্র ১৯৮৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া মোট ৩৭টি প্রযোজনা সহ বর্তমান ২৮জন নাট্যকর্মীকে সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রদীপ কবিরাজ নাট্যসারথী থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৯০ সালে গঠন করেন 'পাঞ্চজন্য' নাট্যদল। সক্রিয় নাট্যকর্মীদের মধ্যে ছিলেন - প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পরিতোষ দে, পার্থ কুন্ডু, রফিকুল আলম প্রমুখ। ১৯৯১ সালে প্রদীপ কবিরাজ নির্দেশিত বাদল সরকারের 'মিছিল' হল পাঞ্চজন্যের প্রথম প্রযোজনা। সেই বছরই প্রথম অভিনীত হওয়া স্বাক্ষরতা বিষয়ক প্রযোজনা মুক্তি মুখোপাধ্যায় রচিত এবং প্রদীপ কবিরাজ নির্দেশিত 'বর্ণপরিচয়' প্রায় ১৬২ বার উপস্থাপিত হয়েছে যা বোলপুরের নাট্যদলগুলির মধ্যে এখনো পর্যন্ত সর্বাধিক উপস্থাপিত হওয়া প্রযোজনা। ১৯৯৪-৯৫ সাল নাগাদ প্রদীপ কবিরাজ যাত্রা দলের সাথে যুক্ত হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই পাঞ্চজন্য বন্ধ হয়ে যায়। পাঞ্চজন্যের মোট ১০টি প্রযোজনাকে সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পাঞ্চজন্য প্রতিষ্ঠার ঠিক ২-৩ বছর পরেই ১৯৯৩-৯৪ সালে শুভব্রত রায়চৌধুরীর উদ্যোগে তৈরি হয় 'কিণাঙ্ক' নাট্যদল। সঞ্জয় মজুমদার, মদন রায়, শ্যামসুন্দর ঘোষ, শিবরঞ্জন কুণ্ডু প্রমুখরা ছিলেন এই দলের প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যকর্মী। এখনও পর্যন্ত ১১ বার মঞ্চস্থ হওয়া শুভব্রত রায়চৌধুরী রচিত ও নির্দেশিত 'মনমন্দির' কিণাঙ্কর প্রথম প্রযোজনা। মঞ্চ নাটক ছাড়াও কিণাঙ্ক বীরভূম জেলার শ্রুতিনাটকের একটি নির্ভরযোগ্য দল হিসেবে অধিক পরিচিতি লাভ করেছে। সমীক্ষায় কিণাঙ্কর ৩৭টি প্রযোজনা (এর মধ্যে ১৮টি শ্রুতিনাটক) এবং বর্তমান ২৫জন নাট্যকর্মীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এরপর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রাক্তনী প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিষেধে জর্জরিত হয়ে ১৯৯৫ সালে তৈরি করেন 'শান্তিনিকেতন রূপ-কথা' যার প্রথম প্রযোজনা ১৯৯৫ সালেই টেরেনসি ম্যাকনেলি রচিত ও সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 'নেক্সট'। প্রসঙ্গত রূপ-কথা জন্মের পূর্বে এর নাট্যকর্মীদের একটি বড় অংশ 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ'-এর নামে প্রযোজনা মঞ্চস্থ করতেন। এমনকি বর্তমানেও 'শান্তিনিকেতন রূপ-কথা' ও 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ'-এর বহু প্রযোজনা পরস্পর পরস্পরের ব্যানারে মঞ্চস্থ করে

থাকে। 'শান্তিনিকেতন রূপ-কথা'র মোট ৯টি প্রযোজনা এবং বর্তমান ২৪ জন নাট্যকর্মীকে সমীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে।

সত্তরের দশক হতে একের পর এক গ্রুপ থিয়েটারের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে যে বিপুল নাট্যচর্চার স্রোত বোলপুর শহরকে প্লাবিত করেছিল সেই স্রোত নব্বই দশকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে তুলনামূলকভাবে ক্রমশ স্তব্ধ হতে থাকে। ঠিক এমনই এক সময়ে একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালের প্রথম ৫-৬ বছরের মধ্যেই বোলপুর শহরে একের পর এক আত্মপ্রকাশ করতে থাকা ৫টি নাট্যদল স্রোতের সেই স্তব্ধতা মোচনে কিছুটা হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এই পর্বের আত্মপ্রকাশ করা প্রথম নাট্যদলটি হল 'ইলোরা'। ২০০২ সালের ২২শে অক্টোবর বর্ধমান জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম পিণ্ডিরাতে 'ইলোরা'র জন্ম হলেও নাট্যদলের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যকর্মী মলয় ঘোষ ১৯৯৯ সাল হতে বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সূত্রে বোলপুরে এক প্রকার স্থায়ীভাবে বসবাস করার দরুন 'ইলোরা'র একটি শাখা ২০০২ সালেই বোলপুর শহরে তৈরি করেন। সেই সূত্রেই 'ইলোরা' বীরভূম ও বর্ধমান উভয় জেলার নাট্যদলের তালিকাতেই স্থান পেয়েছে। বর্তমানে উভয় জেলায় সমভাবে সক্রিয় থাকা 'ইলোরা'র প্রথম প্রযোজনা ২০০২ সালে মলয় ঘোষ রচিত ও নির্দেশিত 'প্রতিবেশী'। নাট্যচর্চার পাশাপাশি নাট্যপত্র প্রকাশে এই নাট্যদলটি বোলপুর সহ সমগ্র রাজ্যে সমাদৃত হয়েছে। ২০১০ সালে বোলপুরের তিনটি নাট্যদলের সাহায্যে 'ইলোরা ক্যানভাস' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে যার পরবর্তীতে নাম হয় 'থিয়েটার ক্যানভাস'। বেশ কিছু বছর প্রকাশের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও এই নাট্যদল হতে ২০০৯ সাল থেকে প্রতি বছর প্রকাশিত 'ইলোরা' নাটকের বর্ষকথা'র নাট্যতথ্য ভরপুর প্রতিটি সংখ্যা আগামী প্রজন্মের কাছে বাংলা নাট্য গবেষণার এক অনিবার্য উপাদান হিসেবে গৃহীত হবেই। এই প্রবন্ধের সমীক্ষায় মোট ৩৩টি প্রযোজনা এবং বর্তমান ১৮ জন নাট্যকর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

একই বছরেই অর্থাৎ ২০০২ সালেই অভিষেক দত্ত তৈরি করেন 'নৃত্যনিকেতন ড্যান্স গ্রুপ এন্ড স্কুল'। মূলত এলাকার মাদকাসক্ত শৈশব কৈশরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়া এই নাট্যদলের সূচনায় ছিলেন অনুপ মাহাতা, বাবুসোনা দাস, নরেন মির্ধা, সুভাষ দাস প্রমুখ। ২০০২ সালে অভিষেক দত্ত নির্দেশিত 'হিংসুটে দৈত্য' 'নৃত্যনিকেতনের প্রথম প্রযোজনা। অধিকাংশ প্রযোজনাতেই নৃত্যের প্রভাব সহ রায়বেঁশের আধিক্য থাকা এই নাট্যদলের ৩১টি প্রযোজনা ও ৪৫ জন নাট্যকর্মীকে সমীক্ষার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ঠিক এর পরের বছর ২০০৩ সালে ২৫শে জুলাই জুলফিকার জিন্নার নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করে 'আমরা সবুজ' নাট্যদল। পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনলাল বিশ্বাস, মঞ্জিরা গুপ্ত, অভিজিৎ পালিত সহ ১২ জন নাট্যকর্মীকে নিয়ে শুরু হওয়া 'আমরা সবুজ'-এর প্রথম

প্রযোজনা ছিল মনোজ মিত্র রচিত এবং জুলফিকার জিন্না নির্দেশিত 'সত্যি ভূতের গপ্পো'। ২০১৬ সাল নাগাদ শান্তিনিকেতন সংলগ্ন বল্লভপুর গ্রামে ২ বিঘা ৬ কাঠা জমির উপর স্থাপন করা 'নিভৃত পূর্ণিমা নাট্যগ্রাম' নাট্য চর্চার পরিসরে এখ সম্ভাবনাময় সংযোজন। 'আমরা সবুজ' -এর ৪৪টি প্রযোজনা এবং ২৬ জন নাট্যকর্মীকে সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পাড়ার কতিপয় শিশু-কিশোরদের নিয়ে সুর্নিমল বসুর ছড়া অবলম্বনে 'রামায়ণে নেই' এবং প্রমদারঞ্জন রায়ের গল্প অবলম্বনে 'বনের খবর' প্রযোজনা দুটি উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে গৌতম মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আত্মপ্রকাশ করে 'স্থাপনা' নাট্যদল। 'স্থাপনা' আয়োজিত কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে এসেছেন বাবুল চক্রবর্তী (বীরভূম আনন), অরুণ মুখোপাধ্যায় (চেতনা), কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (শান্তিপুর সাংস্কৃতিক), অম্বরিশ ভট্টাচার্য (বিশিষ্ট অভিনেতা) সহ বহু বিশিষ্ট নাট্যজনেরা। সমীক্ষাতে 'স্থাপনা'র ২৫টি প্রযোজনা এবং ২২ জন নাট্যকর্মীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এর ঠিক পরের বছরই ২০০৬ সালে বিভাস বিষ্ণু চৌধুরী নির্দেশিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রযোজনাটি বিশ্বভারতীর সিংহ সদনে উপস্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত কিছু ছাত্রছাত্রীদের তৈরি নাট্যদল 'দল-এ থিয়েটার গ্রুপ'। এই নাট্যদলের ৫টি প্রযোজনা এবং ৭ জন নাট্যকর্মীকে সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২০১৫ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরো কিছু নাট্যপ্রেমী ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হয়ে তৈরি করে 'সহজযান' নাট্যদল। সুপ্রিয় কাঞ্জিলাল রচিত ও নির্দেশিত ' অসুখ' হল 'সহজযান'-এর প্রথম প্রযোজনা। সমীক্ষাতে 'সহজযান' এর ৫টি প্রযোজনা এবং ৪জন নাট্যকর্মীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

মনোমালিন্যের জন্য অভিষেক দত্তর নৃত্যনিকেতন হতে বেরিয়ে এসে ২০১৬ সালে শুদ্ধদেব ঘোষ তৈরি করেন 'চতুরঙ্গ' নাট্যদল। শুদ্ধদেব ঘোষ রচিত ও নির্দেশিত 'বিবাহ বিভ্রাট' হল 'চতুরঙ্গ'র প্রথম প্রযোজনা। এই নাট্যদলের প্রযোজনাগুলি উপস্থাপনার আঙ্গিকে নৃত্য ও শরীর চর্চার প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সমীক্ষায় 'চতুরঙ্গ'র ১২টি প্রযোজনা এবং ২৩ জন নাট্যকর্মী অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

এই পর্বের শেষ নাট্যদল 'চতুর্থমাত্রা' যা কাবেরী বসু ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ২০১৮ সালে শান্তিনিকেতনের শ্যামবাটী সংলগ্ন গোয়ালপাড়ায় 'অচিরা' নামক গৃহে আত্মপ্রকাশ করে। বোলপুর সহ বীরভূম জেলায় প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে পরিসর ভিত্তিক প্রযোজনা উপস্থাপনা করা 'চতুর্থমাত্রা' অল্প দিনের মধ্যে নাট্যপ্রেমীদের মনোযোগ আকর্ষণে সফল হয়েছে। 'চতুর্থমাত্রা' র ৯টি প্রযোজনা ও ২ জন নাট্যকর্মীকে সমীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত নাট্যদলগুলি ছাড়াও একাধিক গোষ্ঠী বা সংস্থা এই সময়কালের

মধ্যে বোলপুর শহরে নাট্যচর্চায় যুক্ত থাকলেও কর্মকাণ্ড কখনই গ্রুপ থিয়েটার বা নাট্যদলের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে না পারায় তাদের প্রসঙ্গ এই গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

উপরে উল্লেখিত পরিসংখ্যা হতে পাওয়া গেল বোলপুর শহরে নাট্যদলগুলির বর্তমান সক্রিয় নাট্যকর্মীর মোট সংখ্যা ২৭৯ জন। সমীক্ষানুসারে যার মধ্যে ১৭৫ জন পুরুষ এবং ১০৪ জন মহিলা। অর্থাৎ মোট সক্রিয় নাট্যকর্মীর ৩৭.২৭ শতাংশ মহিলা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'নৃত্যনিকেতন ড্যান্স এন্ড স্কুল' নাট্যদলটিতে সর্বাধিক সক্রিয় ৪৫ জন নাট্যকর্মীর তথ্য সমগ্র পরিসংখ্যানকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে এই নাট্যদলের মোট ২৪ জন মহিলা সংখ্যা বোলপুর শহরের মোট সক্রিয় মহিলা কর্মীর ২৩.০৭ শতাংশ। সেই সাথে ১০ থেকে ২০ বছরের মোট ২৮ জন মহিলার মধ্যে ১৪ জনই নৃত্যনিকেতনের। এছাড়াও সকল নাট্যদলগুলির ১ থেকে ১০ বছরের মধ্যে মোট ২৮ জন নাট্যকর্মীদের মধ্যে ১৪জনই নৃত্যনিকেতনের। সুতরাং পরিসংখ্যানের নিরিখে নৃত্যনিকেতনকে ব্যতিক্রম ধরলে সমীক্ষাগত ভাবে বলাই যায় বোলপুরের নাট্যচর্চার সাথে নতুন প্রজন্মের মেয়েরা সামগ্রিকভাবে যুক্ত নয়। সেই সাথে ২০ থেকে ৩০ বছরের মোট ৭৯ জন নাট্যকর্মীর মধ্যে আমরা সবুজ ও চুতরঙ্গ নাট্যদলেরই মোট ২৫জন নাট্যকর্মী আছেন ৩১.৬৪ শতাংশ। অর্থাৎ এ সকলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বর্তমান বোলপুর শহরে গুটিকয়েক নাট্যদলে কিশোর-কিশোরী বা যুবক -যুবতী তথা নতুন প্রজন্ম নাট্যচর্চায় যুক্ত থাকলেও তা সমগ্র বোলপুর শহরের নিরিখে মোটেও যথেষ্ট নয়।

পাশাপাশি লক্ষ করার মত বিষয় ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে যেখানে সক্রিয় মহিলা নাট্যকর্মীর সংখ্যা ৩০ জন সেখানে ৩০ তেকে ৪০ বছরের মধ্যে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯ জনে। অর্থাৎ ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বলা বাহুল্য শিক্ষার প্রসারের ফলে মহিলাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের গণ্ডী বৃদ্ধি পেলেও তাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা যে প্রসার ঘটেছে এমনটা বলা যায় না। তাই কি বিবাহিত মহিলারা সাংসারিক বেড়াজালে আটক হয়ে নিজেদেরকে সাংস্কৃতিক অঙ্গন হতে সরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন? তারই কি প্রতিফলন ঘটছে বোলপুর সহ সমগ্র জেলা তথা রাজ্যের নাট্যচর্চায়? এ বিষয়ে বিশদে পরিসংখ্যানভিত্তিক আরো স্বতন্ত্র গবেষণার প্রয়োজন। যদিও বর্তমান গবেষকের বোলপুরের নাট্যদলগুলির বর্তমান সক্রিয় নাট্যকর্মীদের উপর করা পেশাগত সমীক্ষায় (চিত্র-২) উপরোক্ত আশঙ্কার পরিসংখ্যানগত সমর্থন মেলে। সমীক্ষায় পাওয়া গেছে বোলপুরের মোট সক্রিয় নাট্যকর্মীদের মধ্যে মাত্র ১৭ জন গৃহবধূ নাট্যচর্চায় যুক্ত, যা মোট সক্রিয় নাট্যকর্মীর ৬.০৯ শতাংশ।

পেশাগত সমীক্ষা হতে আরো পাওয়া গেছে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক চর্চাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন মাত্র ২০ জন যা মোট নাট্যকর্মীর ৭.১৬ শতাংশ। অর্থাৎ এই পরিসংখ্যা হতে নিশ্চিতরূপে বলা যায় এই শহরে সাংস্কৃতিক চর্চা যেমনই হয়ে থাকুক না কেন তা দিনান্তে অন্ন সংস্থানের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হতে পারেনি। শহরের সক্রিয় নাট্যকর্মীদের

একটি বৃহৎ অংশ শিক্ষকতা (৬৩ জন) এবং পড়াশুনার (১০৪ জন) সাথে যুক্ত। এই ১০৪ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৫০ জন ছাত্রী। উল্লেখ্য শিক্ষকতা পেশার মধ্যে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও অধ্যাপকদের অন্তর্ভূক্ত করা হযেছে। এখানেও ১০৪ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৩৯ জন নৃত্যনিকেতনের যা মোট পড়ুয়ার ৩৭.৫ শতাংশ। বোলপুর শহরের নাট্যদলগুলির সক্রিয় নাট্যকর্মীদের পেশাগত সমীক্ষা হতে এমন ধারণা গ্রহণ বোধ করি অনুচিত হবে না যে, ৯২.৮৪ শতাংশ নাট্যকর্মীই জীবিকা তথা পেশা হিসেবে একেবারে অন্য ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন বা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এবং এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে বোলপুর শহরে নাট্যচর্চা ব্যবসায়িকভাবে একেবারেই সফল নয়। বলা বাহুল্য এমন চিত্র প্রায় সমগ্র বীরভূম জুড়ে বর্তমান।

এরপর আসা যাক নাট্যদলগুলির মোট ৩৪৭টি প্রযোজনার পরিসংখ্যান ভিত্তিক সমীক্ষায়। তবে প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন সমীক্ষাটিতে কখনই সমগ্র বোলপুর শহরের সামগ্রিক প্রযোজনার ছবিটি পরিস্ফুটিত হয়নি এবং একই সাথে এই সমীক্ষা কখনই প্রযোজনার গুণগত মান নির্ণয়ের বিন্দুমাত্র সহায়ক নয়। বরং বোলপুরের নাট্যদলগুলির প্রযোজনা নিয়ে একটি ধারণা প্রদানের প্রচেষ্টা মাত্র, যা কখনই সার্বিক নয়। কারণ বহু নাট্যদলই তাদের প্রথম দিকের প্রযোজনাগুলির কোন পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করে রাখেনি। ফলস্বরূপ অনেক নাম যে বাদ গেছে তা বলাই বাহুল্য। পরবর্তীতে বিশেষত ২০০০ সালের পর হতে সরকারী অনুদান সংক্রান্ত বিষয় সহ অন্যান্য বিবিধ কারণের জন্য যখন কর্মকাণ্ডের বিশদ বিবরণ নথিভূক্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে তখন থেকে নিজ নিজ নাট্যদলের তথ্য লিপিবদ্ধ করার প্রবণতার জন্য অধিক প্রযোজনার নাম সঠিক সাল সহ পাওয়া সহজ হয়েছে। তবে বলতে দ্বিধা নেই ব্যতিক্রমী নাট্যদল জন্মলগ্ন হতেই নিজেদের কর্মকাণ্ডের তথ্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লিপিবদ্ধ করে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে।

পরবর্তী প্রসঙ্গ অবশ্যই নাট্যদলগুলি দ্বারা উপস্থাপিত রবীন্দ্র প্রযোজনা। হতাশার হলেও এটাই সত্যি খোদ গুরুদেবের সাধনাক্ষেত্র বোলপুরের নাট্যদলগুলি দ্বারা উপস্থাপিত/মঞ্চস্থ রবীন্দ্র প্রযোজনার সংখ্যা মাত্র ৫৭টি, যা মোট প্রযোজনার ১৬.৪২ শতাংশ। তাহলে কি শান্তিনিকেতনের ওই সংরক্ষিত প্রাঙ্গণের বাইরে রবীন্দ্রনাথ বড়ো বেশি দুর্বোধ্য সাধারণের কাছে? নাকি রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থকরণের জন্য যে চর্চার প্রয়োজন নাট্যদলগুলিতে তার অভাব ছিল বা আছে? কোথাও গিয়ে খোদ বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে যে স্বতঃস্ফূর্ত নাট্যচর্চার পরিসর ছিল তা সময়ের সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিকতারই কাঁটাতারে আক্রান্ত? না হলে বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী বা প্রাক্তনী অথবা আশ্রমিকদের কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত অধিকাংশ নতুন নাট্যদল বা সংগঠন কেনই বা এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে পূর্বের মত মহড়াক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না? এমন আরো অনেক প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য আরো ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে অনুসন্ধান মূলক ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা আবশ্যক।

এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে মোট ৫৭টি রবীন্দ্র প্রযোজনার মধ্যে সাহিত্যিকা দ্বারা উপস্থাপিত প্রযোজনা ১৭টি এবং নাট্যসারথীর ১৩টি প্রযোজনার সন্ধান পাওয়া গেছে; যা মোট প্রযোজনার ৫২.৬৩ শতাংশ ত্বরান্বিত করে সমগ্র বোলপুর শহরের মুখ রক্ষা করেছে। পাশাপাশি ২০১১-১৫ সালের মোট ১৭টি রবীন্দ্র প্রযোজনার মধ্যে সাহিত্যিকা ও নৃত্যনিকেতন উভয়েই ৫টি করে প্রযোজনা উপস্থাপিত করেছে। সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য হতে এটা বলা যেতে পারে যে, ২০০৬ সালে হতে রবীন্দ্র প্রযোজনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে, অবশ্য এই তথ্যের পরেও সেই সব প্রযোজনাগুলির গুণগত মান নিয়ে কোনভাবেই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলতেই হয় পরিসংখ্যার দিক হতে বোলপুর শহরের নাট্যদলগুলির প্রযোজনা সংখ্যা শেষে ২০ বছরে বাড়লেও নাট্যচর্চার সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থা পূর্বের তুলনায় তেমন কোন আশানুরূপ প্রসার বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়নি।

তথ্যসূত্র ঃ-

১. কবিরাজ, প্রদীপ। "বোলপুরের নাট্যচর্চার পাঁচ দশক।" একলব্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৭১
২. চক্রবর্তী বন্দিরাম। "স্বাধীনতার উত্তরকালের বীরভূমের নাটক নাট্যকার ও নাট্যচর্চা।" নবপর্যায়ে বীরভূমি, ৩৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৭
৩. "পথ চলার এই আনন্দে" । স্মারক পত্রিকা, নাট্যসারথী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩
৪. রুদ্র, কুন্তল। "সাহিত্যিকা: সেকাল থেকে একাল।" সাহিত্যিকা নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, কুন্তল রুদ্র ও অসীম চট্টরাজ সম্পা, ১ম সংস্করণ, স্যাস পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩২

ঋণ স্বীকার ঃ-

১) ড. সোমনাথ সিংহ (অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ২) ড. গগনদীপ (সহকারী অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)৩) মধুশ্রী দত্ত (গ্রন্থগারিক, শিরাকোল মহাবিদ্যালয়) ৪) মহম্মদ বদরে আলম (ভার্ডেন্ট থিয়েটার) ৫) অধ্যাপক কুন্তল রুদ্র ৬) প্রদীপ পুরোহিত (নাট্যসারথী) ৭) কামদেব গোস্বামী (উত্তরণ) ৮) গোরাচাঁদ সেনগুপ্ত (হোমানল) ৯) দেবাংশু মজুমদার (সাহিত্যিকা) ১০) প্রদীপ কবিরাজ (প্রবীণ নাট্যকর্মী) ১১) শুভব্রত রায় চৌধুরী (কিণাঙ্ক) ১২) সুবীর ব্যানার্জী (রূপ-কথা) ১৩) মলয় ঘোষ (ইলোরা) ১৪) অভিষেক দত্ত (নৃত্যনিকেতন) ১৫) জুলফিকার জিন্না (আমরা সবুজ) ১৬) গৌতম মুখোপাধ্যায় (স্থাপনা) ১৭) অরূপ শঙ্কর মিশ্র (দল-এ থিয়েটার গ্রুপ) ১৮) সুপ্রিয় কাঞ্জিলাল (সহজযান) ১৯) শুদ্ধদেব ঘোষ (চতুরঙ্গ) ২০) কাবেরী বসু (চতুর্থ মাত্রা) ২১) শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় (চতুর্থ মাত্রা) ২২) মৈনাক চ্যাটার্জী (রায়পুর)।

লেখক : **অঙ্কুশ দাস,** গবেষক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ।

প্রবীর গুহ-র নাট্যনির্মাণশৈলীতে লোকসংস্কৃতির প্রভাব

অঙ্কিতা ঘোষ

থিয়েটারের ইতিহাস ক্রমান্বয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় থিয়েটার কিভাবে একটা একটা যুগ অতিক্রম করে এসেছে। আদিযুগ হোক বা বর্তমান থিয়েটার সব সময় মানুষের কথাই বলে। আমরা বর্তমানে প্রধানত দুই ধরনের থিয়েটার চর্চা করে থাকি। এক - ইউরোপীয় থিয়েটারের আদলে প্রসেনিয়াম থিয়েটার, আর দুই- বিকল্প থিয়েটার বা তৃতীয় ধারার থিয়েটার[১]। বাংলায় এই বিকল্প থিয়েটারের প্রবর্তক হলেন নির্দেশক শ্রী বাদল সরকার[২]। আমাদের বোঝার সুবিধার্থে তিনি থিয়েটারকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন[৩]। প্রথম-লোকনাট্য। দ্বিতীয়-প্রসেনিয়াম থিয়েটার। তৃতীয় - লোকসংস্কৃতি। লোকশিল্পকে আধার করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তাকেই লোক সংস্কৃতি বলা হয়। বাদল সরকারের পরবর্তীতে এই বিকল্প ধারার থিয়েটারের একজন অন্যতম ধারক ও বাহক হলেন নির্দেশক শ্রী প্রবীর গুহ[৪]। তিনি বলেন- 'থার্ড থিয়েটার কোন থিয়েটারের ফর্ম নয়। থার্ড থিয়েটার হল এক ধরনের থিয়েটার দর্শন। তবে বিকল্প ধারার থিয়েটার চর্চা করার সুবাদে তাঁর নাট্য নির্মাণশৈলীতে লোক সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ।

নির্দেশক প্রবীর গুহ-র গোটা জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সম্পূর্ণটাই গ্রামে। তিনি ছেলেবেলা থেকেই গ্রামের নানান লোকশিল্প দেখে বড় হয়েছিলেন যা সুপ্ত অবস্থায় থেকে গেছিল তাঁর মনের অন্তরে। সেখান থেকেই তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন দেশজ সংস্কৃতিকে মাটি থেকে শিকড় সমেত উপড়ে ফেলে সেই স্থানে বিদেশি কোন সংস্কৃতিকে বপন করার চেষ্টা একেবারেই অর্থহীন। তিনি মূলত বাংলার থিয়েটারকে তাঁর কাজ দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। তাই আমাদের বাংলার থিয়েটারের উৎপত্তির ইতিহাস জানতে হবে। যদিও এ বিষয় বহু মতান্তর আছে। কারো মতে বাংলার থিয়েটারের মাত্র পাঁচশো বছরের পুরনো । আবার কারো মতে তা প্রায় দেড় হাজার বছর পুরানো। পাঁচশো বছর আগে বাংলায় লোকশিল্পের আধিক্য ছিল প্রবল। সেই লোকশিল্প ছিল সাধারণ মানুষের একমাত্র অন্তরের সুর। ষোড়শ শতকে শ্রী চৈতন্যদেবের সময় (১৪৮৬ খ্রিঃ থেকে ১৫৩৩ খ্রিঃ) । লোক গান, লোকনৃত্যের সাথে নানাবিধ কাহিনী মিলেমিশে জন্ম হয় 'যাত্রা'[৫] নামে এক নবতম লোকশিল্পের । সে সময় চৈতন্যদেব নিজে যাত্রায় [৬] অভিনয় করে মানুষকে মাতিয়ে দিতেন। চৈতন্যদেবের প্রভাবে তখন অনেক যাত্রা লেখা শুরু হয়[৭]। বহু সংস্কৃত নাটক বাংলায় অনুবাদিত হয় [৮]। যদিও সেসময়ের রচিত কোন নাটকের লিখিত রূপ পাওয়া

যায়না। এইভাবেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক পেরিয়ে যাত্রা অভিনয় চলতে থাকে।

এরপর আসে অষ্টাদশ শতক বাংলার ইতিহাসে পালাবদলের কাল। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করে, ব্রিটিশ সরকার ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে। তার তেরো বছরের মধ্যে বাংলার পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে, ১৭৭০ সালে দেখা দেয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে বাংলার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেদফ এর হাত ধরে বিদেশি থিয়েটারের আদলে ভারতে প্রথম শুরু হয় বাঙালির আধুনিক থিয়েটার চর্চা[৯]। এর পরে উনিশ শতকের শেষের দিকে সেইসব এলিট বুদ্ধিজীবীরা সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং ব্রিটিশ থিয়েটারের অনুকরণে শুরু করে প্রসেনিয়াম থিয়েটার চর্চা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের মত স্বনামধন্য নাট্যজনেরা সেই থিয়েটার[১০] চর্চাকে পরবর্তিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন।

যারা বাংলা থিয়েটারের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন বাংলাদেশের সেলিম আল দীন[১১]। তাঁর মতানুসারে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের ইতিহাস জানতে গেলে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয়[১২] ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান অপরিহার্য। কারণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যনাট্য লেখা হয়েছে প্রায় হাজার বছরের আগে, তবে তারও অনেক আগে থেকে অলিখিতভাবে নাটকের অস্তিত্ব ছিল। আবার ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' -এ ঔড্রা মাগধী[১৩] নামে নাটকের কথার উল্লেখ আছে। আবার হিউয়েন-সাং[১৪] এর বিবরণীতেও বাংলা নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাপদেও বাংলা নাটকের[১৫] কথা বলা আছে। 'যাত্রা' প্রচলনের পূর্বে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার ও ওড়িষ্যাতে 'চর্যা' বলে একটি নাটকের ধারার কথা পাওয়া যায়। বলা হয় এই চর্যার প্রভাবেই পরবর্তীতে ভাওয়াই, নৌটঙ্কির মত বিভিন্ন লোকনাট্যের উদ্ভব হয়। চর্যাপদ থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি [১৬] ধরা হয়, সেই সময় থেকে বাংলা অক্ষর আসছে, বাংলায় লেখার সূচনা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী বঙ্গ নাটকের বৈশিষ্ট্য[১৭]

১। প্রাচীন মধ্যযুগীয় বাংলা নাট্যাভিনয় বিভিন্ন লোকাচার ব্রত-উৎসব ও ধর্ম সম্প্রদায়ের কৃত্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। উদাঃ - বাংলার গম্ভীরা লোকনাট্যে এই কৃত্য আর নৃত্যের যোগসূত্র অনস্বীকার্য।

২। পালাগানে পালা গায়ন এককভাবে কাহিনী বর্ণনা করত উক্ত প্রত্যুক্তিমূলক অংশগুলিকে দোহার মধ্যস্থিত বায়েন অংশ নিত। একে বলা হত বর্ণাত্মক অভিনয় রীতি।

৩। কারো কারো মতানুসারে গীতগোবিন্দ যাত্রায়, রাধাকৃষ্ণের ভূমিকা পুতুল দ্বারা দেখানো হত। অর্থাৎ পুতুল নাচের মাধ্যমে এই কাব্য নাট্য পরিবেশিত হত।

৪। এছাড়াও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যে কোন অভিনয়ের পূর্বে মঙ্গলাচরণ রীতি পরিবেশন করা হত। সেখানে নাট্য ভূমির বিবরণ থাকত।

৫। প্রাচীনকালের পাঁচালিতে, লীলা নাটে সুত্রধরের ভূমিকা ছিল গায়েনের মতই অপরিহার্য। ভাবনা নাটের অভিনয়ে নৃত্যের পূর্ণ প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল।

৬। শস্যবপন-তিথি-পার্বণ-সামাজিক-বিনোদন প্রভৃতি উপলক্ষে অসমিয়া অঙ্কিয়ানাটের অভিনয় হত। সেসব নাটকে চরিত্র অনুযায়ী মুখোশের ব্যবহার করা হত। বাংলার ছৌ নাচে, গম্ভিরাতে ও উত্তরপ্রদেশের রামলীলা নাটেও মুখোশের ব্যবহার করা হত।

প্রবীরবাবু বিভিন্ন সময় কাজের প্রয়োজনে বাংলায়, গোটা ভারত তথা এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে অসংখ্য লোককলা দেখেছেন। যদিও তিনি অনুকরণে নয়, অনুসরণে বিশ্বাসী। তাই তিনি নানাবিধ লোককলা নিজে শিখে আত্মস্থ করে সেই শিক্ষা থেকে মূল রসটুকু বের করে এনে তিনি তাঁর কাজে ব্যবহার করেছেন। যার মূল ভাবটা রয়ে গেছে এশিয়ার সংস্কৃতির গর্ভস্থলে আর বাকিটুকু প্রসারিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে অভিনব সব নাটক।

প্রবীর গুহ বলেন[১৮]— 'বাংলার লোক সংস্কৃতি সহজিয়া মতে চলে। যা কিছু সোজা, সরল, প্রচণ্ড নিয়মে বাঁধা নয়- তাই সহজিয়া। 'সহজ' — যা মানুষের স্বভাবের অনুকূল। শরীরকে হতে হবে অনুশাসিত, বাধ্য ও সকল কর্মের উপযোগী। শরীর ছাড়া সাধন অসম্ভব। তাই শরীরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।' এই দেহ নিয়ে সাধন, সেই সাধনার নাম সহজিয়া। তিনি ইউজেনিও বারবা, জর্জি গ্রোটোস্কি, শেকনার, পিটার ব্রুক এর মত বহু বিদেশি বিশিষ্ট নাট্যজনের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তাঁদের কাজের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হলেও দেশজ সংস্কৃতিকেই চিরকাল তিনি নিজের কাজের মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এবার দেখতে হবে সেই সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান-

কারা করত?

মানব সমাজ গঠনের আদিপর্বে মানুষের কাছে বেশি শব্দ ছিল না। আস্তে আস্তে শব্দ এলেও, কথার প্রচলন হয়নি তখনও। তারপর এসে কথ্য ভাষা। তারও অনেক পরে এসে আমরা পাই ভাষার লিখিত রূপ। এ থেকেই বোঝা যায় একদম প্রথমে লোকনাটকের কোন লিখিত ধারা পাওয়া যায় নি। সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের বিশ্বাস ও ধর্ম থেকে সৃষ্টি করেছিল বিভিন্ন ধরনের লোকসংস্কৃতির।

কেন করত?

মানুষের মধ্যেকার নানান কামনা-বাসনা আর প্রকৃতির বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার তাগিদে ব্রতের জন্ম। প্রাচীনকালে মানুষ প্রকৃতির রোষকে ভয় করত। মানুষ তখন শুভ শক্তিকে তুষ্ট করে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করার তাগিদেই ব্রত পালন করত। তা করতে গিয়ে মানুষ এক জায়গায় সঙ্ঘবদ্ধ হতো এবং কিছু কৃত্য সাধন করত। যাকে আমরা অনায়াসে থিয়েটার বলতে পারি। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনেই থিয়েটারের জন্ম হয়েছিল।

কোথায়, কিভাবে করত?

মানুষই শিল্প সৃষ্টি করে। তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন চাহিদা থেকেই বিভিন্ন দেবদেবীর ব্রত করত, পাঁচালী পড়ত। যেমন লক্ষ্মীর পাঁচালী, শিবের ব্রত, মঙ্গলচণ্ডীর, মনসার ব্রত

ইত্যাদি। মানুষ বিশ্বাস করত নিষ্ঠাভরে উপবাস করে ব্রত পালন করলেই তাদের জীবনের সব দুঃখ কষ্ট মুছে যাবে। সেই বিশ্বাস থেকেই তারা বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে একটি স্থানে একত্রিত হয়ে স্থানটিকে পরিস্কার করে, আলপনা দিয়ে ব্রত পালন করত। আলপনার মধ্যে আঁকা হত বিভিন্ন প্রতীকী চিহ্ন।

কাদের জন্য করত?

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই মানুষের চাহিদাও গড়ে উঠেছিল নিজ স্বার্থের উর্ধ্বে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থে। সেই বিশ্বাস থেকেই গ্রামের মানুষ ছৌ, চড়ক, গম্ভীরা, আলকাপ, গাজন ইত্যাদির মত নানাবিধ ও লোক সংস্কৃতি চর্চা করত।

আর সেই ধর্মীয়-আচার-অনুষ্ঠানগুলো ধরনই বা কেমন ছিল?

এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, লোক সংস্কৃতি ও লোকনৃত্য-লোকগীতি ঠিক কেমন ছিল তা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। [২০]

ছো ঃ কথাটা ছৌ নয়, ছো। ছদ্মবেশে বা ছাউনি থেকে এক কথার উৎপত্তি। বাংলার পুরুলিয়া জেলায় শুরু হয়ে বিহারের অধুনা ঝাড়খণ্ডের সেরাইকেল্লা আর ময়ূরভঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকের ফর্মই আলাদা। পুরুলিয়াতে এটা একটা রিচুয়াল। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব ঠাকুরের পায়ে তাদের নাচ দিয়ে পুজো দেওয়া হয়।

চড়ক ঃ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকোৎসব। চৈত্রের শেষ দিনে এ পুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিনব্যাপী চড়ক পূজার উৎসব চলে। এটি চৈত্র মাসে পালিত হিন্দু দেবতা শিবের গাজন উৎসবের একটি অঙ্গ।

গাজন ঃ গাজন নামকরণটি বাংলা শব্দটি গর্জন শব্দ থেকে বুৎপন্ন হয়েছে। এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসীরা প্রচণ্ড গর্জন করেন বলে উৎসবের এইরূপ নামকরণ হয়। অপর মতে, গা শব্দের অর্থ গ্রাম এবং জন শব্দের অর্থ জনসাধারণ, গ্রামীণ জনসাধারণের উৎসব হওয়ায় এই উৎসবের এইরূপ নামকরণ হয়।

গম্ভীরা ঃ রাজশাহির চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে এপারের মালদায় আসে। শিবের আর এক নাম গম্ভীর। মালদায় তাঁর নাম 'নানা'। প্রান্তিক মানুষ তাদের কষ্টের, অবিচারের, বঞ্চনার কথা নাচে, গানে 'নানা'কে অভিযোগ জানায়। তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ । সে কারণে নানা সময়ে তাদের রাজনৈতিক রোষেরও শিকার হতে হয়েছিল।

আলকাপ ঃ মুর্শিদাবাদ , মালদা, বীরভূম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহির বিভিন্ন অংশে আলকাপের প্রচলন ।সমাজের আর্থ-সামাজিক চিত্রগুলো গান নাচের মাধ্যমে তুলে ধরে। ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করে।অতীতে আমাদের

লোক সংস্কৃতিতে নৃত্যায়িত ভঙ্গিমার কোনো সুসংবদ্ধ রূপ ছিল না। সেগুলো ছিল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল বহিরপ্রকাশ। ঠিক তেমনই অভিনেতার অন্তর থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসা অভিব্যক্তি থিয়েটারের 'way of communication' । তাঁর দলের ছেলে-মেয়েরা, তাঁরই সহযোগিতায় দীর্ঘদিন নানাবিধ লোককলা চর্চা করে তার থেকে নিজস্ব অভিব্যক্তি বের করে আনে। তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতি ব্যতীত বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর নাটকেকাজ করে থাকেন। সব সময় তাঁর কাজের মধ্যে চলতো নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বাংলার থিয়েটারের এত বছরের ঐতিহ্যের ইতিহাস থেকে প্রবীর গুহ তাঁর নাটকে ঠিক কি কি বিশেষ উপাদান নিয়েছেন? আর তাঁর থিয়েটারের মুখ্য বিষয় কোনটি? উত্তরে বলা যায়—লোকনাটকের সরলতা। সাবলীল শরীরি ভাষার প্রয়োগ। প্রতীকী চিহ্নের ব্যবহার। লোকনৃত্যের ও লোকসঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ। কিছু অতি সাধারণ জিনিস দিয়ে অসাধারণ কিছু দৃশ্য নির্মাণ। স্থান সম্পর্কিত সংকীর্ণতার দূরীকরণ। নাটকের স্বার্থে নির্মিত আবহ সংগীত, ও সাথে লাইভ মিউজিকের এক অনবদ্য মেলবন্ধন তাঁর নির্মিত নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।তাঁর নাটক নির্মাণের মুখ্য বিষয় দুইটি। যথা- ১ম- বৃহত্তর জনজীবনের স্বার্থে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা।

প্রবীর গুহ বিনোদনমূলক নাটক করেন না। নির্বাক মানুষের প্রতিবাদের একমাত্র ভাষা, যার একটা শক্ত দার্শনিক ভিত্তি আছে। অভিনেতারা কোন সমাজজীবন বহির্ভূত জীব নয়। তাঁরা সমাজের ও সময়ের প্রতি দায়বদ্ধ। তাঁদেরকে সময়ের সঙ্গে হতে হবে আধুনিক। এর পাশাপাশি থিয়েটারের একটা নতুন ভাষার অনুসন্ধান করতে হবে। যা হবে থিয়েটারের একান্ত নিজস্ব ও ব্যতিক্রমী ভাষা। সমাজের সংখ্যালঘু, নিম্নবিত্ত মানুষ ও নারী জাতির ওপর চলতে থাকা নিপীড়ন, অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একমাত্র হাতিয়ার। 'সমুদ্র অস্থির', 'এখন মাঝরাত', 'অহল্যা' হল তাঁর লিখিত ও নির্দেশিত প্রথম সারির নাটক। সময়ের সাথে সাথে নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর রেখা বারংবার পাল্টে পাল্টে গেছে। এর পরবর্তীতে 'তৃতীয় যুদ্ধ', যৈবতী কন্যা', 'আরষ্ঠ জননী', 'আম্মা', 'ঘরে ফেরার গান' 'অ্যানাদার রেইনবো', 'বিষাদ কাল', 'কোশ্চেনমার্ক', 'ভালোবাসার রঙ' এর মত বহু পরীক্ষামূলক নাটক আমরা দেখতে পাই।

দ্বিতীয় হল - নাটকের পরিবেশনশৈলী। এর প্রেক্ষিতে তিনটি নাটকের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(১ম) 'তৃতীয় যুদ্ধ'/ 'Third War', (১৯৯৮ টোকিও, জাপান)- বিশ্বে ১৯১৪-১৯১৮সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৩৯ - ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এর পর আর কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। কারণ যে কোন যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হল একটা দেশের অন্য একটা দেশকে দখল আর সেখানে বাজার তৈরি ও বিস্তার। যদি যুদ্ধ না করেও তা সম্ভব হয় তবে আর যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? অযাচিত অর্থ খরচ, অসংখ্য মানুষের প্রাণহানির অহেতুক দরকার পরে না। একেই বলে গ্লোবালাইজেশন। যেখানে মানুষকে তার দেশজ সংস্কৃতি

ভুলিয়ে দিয়ে তার উপর কোন বাহ্যিক সংস্কৃতিকে জোর পূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপর রূপ। নির্দেশক প্রবীর গুহ তাঁর 'তৃতীয় যুদ্ধ' নাটকে সমাজের-রাজনীতি, অর্থনীতির এই প্রেক্ষাপটটিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় নাটকটির বিষয়বস্তু একশ শতাংশ রাজনৈতিক। কোন ভাষার ব্যবহার নেই, পুরোটাই 'জিবারিশ'। 'জিবারিশ' একটি ইংরেজি শব্দ, যার মানে হল অর্থহীন কিছু কথার সমষ্টি। কিন্তু এই নাটকে প্রচুর প্রতীকী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, এছাড়া এই নাটকে মঙ্গলাচারণের রীতি মেনে প্রচুর ব্রত, কৃত্য, রীতিনীতি দিয়ে গোটা নাটকটি সাজানো।

(২য়) 'তিতাস একটি নদীর নাম' (২০১৩ আগরতলা, ত্রিপুরা)- তেমনই এক নাট্য রচনার উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তিনি ২০১৩ সালে রচনা করেন নাটক 'তিতাস'। যদিও এই নাটকটি করা তাঁকে ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখে পর্‌তে হয়েছিল। স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তর সৃষ্ট নাটক, স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা, স্বনামধন্য যাত্রা পরিচালক শ্যামল ঘোষের যাত্রার পর তিনি নাটকটির নবতম নাট্যরূপ দেন। নাটকের স্বার্থে তিনি নিজে কিছু সংলাপ ও সংগীত রচনা করেছিলেন। এই উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে ভাঙচুর করলেও কোন অংশেই লেখক অদ্বৈতমল্লবর্মণের মূল রচনাকে এতটুকুও ছাপিয়ে যায় নি। তবে গোটা নাটকের সমস্ত উপাদান নেওয়া হয়েছে আমাদের বাংলা লোকসংস্কৃতি থেকে। এই নাটকে ব্যবহৃত হয় সহজলভ্য উপাদান। বয়াতির বা সূত্রধরের ধারা এই নাটকের প্রাণ রচনা করে। একটি নদীকে কেন্দ্র করে তার দুই তীরের মানুষের বসতি গড়ে ওঠে, আর সেই নদীর গতিপথের সাথে সাথে তাদের জীবনযাত্রা কালের নিয়ম কিভাবে পাল্টে যায়, সেটাই এই নাটকের প্রেক্ষাপট। বিকল্প ধারার নাটকের দর্শন মেনে প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাটক করা সম্ভব কিনা সেটাও ছিল তাঁর কাছে একটা বড় পরীক্ষা। যাতে তিনি একশ শতাংশ সফল।

(৩য়) 'ভালবাসার রং'/'Colours of Love' (২০১৮ মধ্যমগ্রাম, কলকাতা)-প্রবীরগুহর এ পর্যন্ত শেষতম নাটক হল 'ভালোবাসার রং'। নাটকটি তিনটি পর্বে অভিনীত হয়ে থাকে। ১ম পর্বে একজন মেয়ে তাঁর জীবনের কথা বলে দর্শকেরা তার পুরোটাই চোখ বন্ধ করে শোনেন ও তার সাথে-সাথে নাটকের আনুষঙ্গিক জিনিসের অনুভূতি পায়। ২য় পর্ব- যেখানে দুজন মেয়ে একটি কালো কাপড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে এই একই যন্ত্রণার কথা ফুটিয়ে তোলে নানাবিধ নৃত্যায়িত ভঙ্গিমা ও অতি অল্পসংখ্যক কিছু কাব্যিক সংলাপ সহযোগে। এরপর আসে ৩য় পর্ব- নাটকটিতে এই পর্বে এসে লোকসংস্কৃতি ধারা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সেই সময় দর্শকদের পুনরায় চোখ বন্ধ করতে হয়। সাথে চলতে থাকে একটি গান। সাথে সাথে কুশীলবরা নাটক মঞ্চায়নের স্থানে,ধুপ, ধুনো জ্বালিয়ে, মাটিতে আলপনা দিয়ে নানান প্রতীকী চিহ্ন এঁকে তাঁরা নাটকটাকে একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের রূপ দেন। কাগজে আলতা দিয়ে লক্ষ্মীর পায়ের মত ছাপ এঁকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। একটি বাল্যবিধবা মেয়ে

এককোণে বসে থাকে তাঁর শরীর থেকে রক্তের ছড়া বেরিয়ে আসে। যার শেষে একটা মঙ্গলঘট আঁকা হয়। সেও সুযোগ পেলে সৃষ্টি করতে পারত তেমন বার্তাই দেওয়া হয় দর্শককে। এর মধ্য দিয়ে তিনি মহিলাদের প্রতীকী যন্ত্রণা তুলে ধরেন সমাজের সামনে।

এর থেকেই আমরা নির্দেশক প্রবীর গুহ-র বিকল্প থিয়েটার চর্চার একটা স্পষ্ট ধারণা পাই। প্রবীর গুহ তাঁর রচিত ও নির্দেশিত নাটকের জন্য বাংলা ছাড়িয়ে ভারত, তথা গোটা বিশ্বের কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধি পেয়েছেন। তাঁর নাটকে সমাজ, রাজনীতি ও লোক সংস্কৃতির প্রভাব একেবারেই অনস্বীকার্য। তাঁর দীর্ঘ নাট্য জীবনে নিজের রচিত ও নির্দেশিত আনুমানিক মোট চুরাশিটি নাটকের মধ্যে, এখানে মাত্র তিনটি একেবারে ভিন্ন রকমের নাটক বিস্তারিত আলোচনা করা হল। যাতে তাঁর কাজের কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া যায়।

<u>তথ্যসূত্র ও টীকা ঃ</u>

১। বাদল সরকার, 'থিয়েটারের ভাষা', কলকাতা প্রতিভাস, পৃ.-২০।

২। বাদল সরকার- জন্ম ১৫ জুলাই, ১৯২৫। মৃত্যু ১৩ই মে , ২০১১। বাদল সরকার ছিলেন একজন আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি নাট্যব্যক্তিত্ব। বাংলায় 'থার্ড থিয়েটার' অর্থাৎ বিকল্প ধারার থিয়েটারের প্রবক্তা।

৩। বাদল সরকার, 'থিয়েটারের ভাষা', কলকাতা প্রতিভাস, পৃ. ৮-১০।

৪। প্রবীর গুহ- হলেন স্বতন্ত্র নাট্যধারার একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। জন্ম:১৯৪৭ সালের ৫ই মে, খুলনা জেলায়। ১৯৭৭ সালের ২৫শে এপ্রিল খরদাহে তিনি তাঁর দল 'লিভিং থিয়েটার' স্থাপন করেন। পরবর্তিতে ১৯৯৩ সালে মধ্যমগ্রামে তিনি তাঁর নাটকচর্চা কেন্দ্রের পুনঃস্থাপন করেন। নাম দেন 'অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার'। ১৯৭৭ থেকে বর্তমান সময় (২০২১ সাল) দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরের তাঁর থিয়েটার জীবন।

৫। 'যাত্রা' যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'জার্নি', মানে এক স্থান থেকে অপর স্থানে গিয়ে যাত্রা অভিনয় করা হতো। তার থেকেই 'যাত্রা' শব্দের উদ্ভব।

৬। 'ব্রজলীলা' ও 'রুক্মিণী হরণ' (১৫৬০ খ্রিঃ) ইত্যাদি যাত্রাপালা।

৭। কবি কর্নপুর, রায় রামানন্দ, দেবিনন্দন সিংহ প্রভৃতি পালাগুলি উল্লেখযোগ্য।

৮। লোচনদাস অনুবাদ করে রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ, যদুনন্দন দাস করেন রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব, পুরুযোত্তম মিশ্র চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

৯। প্রতিষ্ঠাতা লেবেদেফ, উদ্বোধন ২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫ নাটক কাল্পনিক সংবদল। স্থায়িত্বকাল ১৯৭৫-১৯৯৬ সাল।

১০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক - 'একেই কি বলে সভ্যতা', বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ১৮৬০। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক - 'নীল দর্পণ' ১৮৬০।

১১ সেলিম আল দীন- জন্ম ১৮ আগস্ট। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ। মৃত্যু ১৪ জানুয়ারি, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ।

১২। মধ্যযুগীয় সময়কাল- চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী।

১৩। বঙ্গানুবাদ - ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ ছন্দা চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন কলকাতা, ১৯৮২, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ-৬৯-৮০।

১৪। হিউয়েন-সাং ছিলেন একজন বিখ্যাত চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষু, পণ্ডিত , পর্যটক ও অনুবাদক। তিনি উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৬৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব) এসেছিলেন।

১৫। 'বুদ্ধনাটক', 'বাংলা সাধন সংগীত'।

১৬। বাঙলা ভাষা আনুমানিক ১৩০০ বছরের পুরানো। চর্যাপদ এ ভাষার আদি নিদর্শন। বাংলা ভাষার লিপি হল বাংলা লিপি।

১৭। সেলিম আল দীন। 'রচনা সমগ্র-৪'। বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৮। প্রবীর গুহ। 'সহজিয়া থিয়েটার'। কলকাতা মৌহারি, ২০২১ পৃ-১২৩।

১৯। ঐ, পৃ- ১৪০-১৪৩
এবং প্রবীর গুহের নিজস্ব সাক্ষাৎকার, ২২শে এপ্রিল ও ২৪শে আগষ্ট, ২০২১ ।

লেখক: **অঙ্কিতা ঘোষ,** পি এইচ ডি গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

Presenting the official website of Tripura Theatre, A new destination for theatre lovers

www.tripuratheatre.com

নাট্যপ্রেমীদের জন্য সুখবর
ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যদলের নতুন অনলাইন ঠিকানা।

English Articles

Reading the theatrical sign: costumes in Shakespeare texts

Abhijit Sen

I

According to Jiri Veltrusky, "All that is on the stage is a sign" ("Man and Object in the Theater", 1940). The theatrical sign operates using the available conditions of production and reception, which would be acceptable to all the collaborators - author, actor, designer, audience. Only through such a consensual acceptance can the theatre emerge as a collective experience of the community. A particular signification - usually borrowed from socio-cultural codes of behaviour - is encoded in the theatrical sign by the author and/or actor during production and is later decoded by the viewer/ reader in the process of reception. This process of production/reception as well as encoding/decoding is predicated upon the mutual agreement or "tacit consent" shared by all the collaborators, which provides the basis for the staging conventions of an age. This, in turn, generates the theatrical sign as a dramaturgical tool that facilitates encoding/decoding of significations. In fact, at more inspired moments of cultural communication the theatrical sign may also function as an ideological apparatus that promotes more nuanced construction and/or contestation of meaning on the stage.

The theatrical sign may operate through various codes used on the stage - visual and oral/aural, lingual and paralingual - sometimes singly, sometimes in combination. Even as the audience receives these codes it moves through a process of decoding that enables the reading of the audio-visual text which the stage performance generates. Particularly from the twentieth century onwards, the engagement of the spectator (in this process of production/reception) has been increasingly emphasized. It has been averred that the audience, too, has a role to play - not merely as passive receptor but rather as active participant negotiating with the text in performance. Practitioners and/or theorists, like Bertolt Brecht, Richard Schechner or Augusto Boal, have radically altered the notion of the spectator's role in the theatre. Instead of remaining a mere conduit of passive empathy, the spectator is now seen as invested with an active agency that propels critical responses to the performance and instigates her/him to action.

Though this radical revision of the relationships between author-ac-

tor-audience has majorly impacted modern performances, much of this was also available in theatre practices prior to the advent of the nineteenth-century realistic theatre. Without the illusionistic trappings of realism that the proscenium stage came with, the earlier theatres allowed a closer rapport between performers and spectators. This was particularly available, for instance, in the theatres that thrived in England during the sixteenth and seventeenth centuries. On the one hand, gifted dramatists like Christopher Marlowe, Ben Jonson, Thomas Dekker or John Webster, talented actors like Edward Alleyn, Richard Burbage, William Kempe or Robert Armin, and astute proprietors and entrepreneurs like John Burbage or Philip Henslowe all collaborated together to precipitate the glorious age of the English Renaissance theatre. The star of the period, of course, was William Shakespeare; he shone not only as a playwright creating his dramatic masterpieces, but was also an adept actor and a judicious share-holder in his theatre company. On the other hand, the robust body of Elizabethan/Jacobean audiences clamoured for good entertainment worth their money. This volatile atmosphere was often a cause for severe headache for the authorities, but it also ensured a lively and exciting community experience in which performers as well as spectators were more-than-willing participants. It may be recalled that, with a full-fledged readership of drama yet to arrive, the Renaissance play-text was, in the main, read by the contemporary viewer not on the page but on the stage. Much of this reading, of course, was done with the help of the theatrical sign - encoded by the authors and actors, on the one hand, and decoded by the spectators, on the other.

In the charged atmosphere of the English Renaissance playhouses, the transmission of the theatrical sign allowed meanings to be constructed, communicated, and even contested. While, therefore, the theatre functioned as a site where meanings were made/unmade/remade, the theatrical performance always remained a living and indeterminate, as well as an infectious and volatile experience. Even in recent scholarship the theatrical event has been viewed chiefly as an "ideological transaction between a company of performers and the community of their audience". This transaction, generating a shared community experience, always bristles with spontaneity and indeterminacy. Victor Turner has considered the theatrical experience - like other modes of social living - as a continuous struggle between "indeterminacy", which precipitates the "wish" for what could be/should be/ought to be, and "modes of determination" that define the normative structures of

society. This enables the theatre to promote contestation of meanings, with the "indeterminate" element (encapsulating the "wish" for what ought to be, and hence for a change) privileged over the "modes of determination" (representing the societal norms which try to keep society bound together according to certain given codes).

Because the theatre is always inscribed with this "indeterminacy" it poses a threat to the normative structures that uphold the socio-political and cultural status-quo. As such, the theatre is generally regarded with deep-seated distrust, even outright hostility, by the administration. In Renaissance England, too, the authorities in power (both the London Municipality and the Church) continuously tried to control/contain/prohibit the theatre - on the plea of disruption of law and order; as a health hazard during outbreaks of plague; as a potential channel for seditious and libellous sentiments; and also for promoting licentiousness and immorality. But, the more they tried to suppress the performances, the more the theatre-practitioners came up with strategies to circumvent the barriers imposed. Among these strategies was the astute use of the theatrical sign for its latent indeterminacy; this enabled the practitioners (authors and players alike) to challenge/undermine/subvert the prevalent modes of determination. The "indeterminate" theatrical signs, then, could unmake the customary associations of meanings and regenerate new significations - sometimes overtly, often covertly - and, in turn, could alert the reader/viewer to its radical potency to challenge, subvert, and even deny the conventionally accepted societal "modes of determination".

II

Among the theatrical signs used by the English Renaissance dramatists the most prominent would be, perhaps, the visual signs like stage properties and stage costumes. If one keeps the English Renaissance playhouse in mind, one would remember that the stage was a large bare platform, with two or more doors fitted to the rear facade. Some minimal stage properties would be introduced from time to time to designate particular locales - this is corroborated by the list of properties mentioned among the inventories of Philip Henslowe. So, a bed could be introduced to suggest a bed chamber (for instance, in the last scene of *Othello*), a throne for the royal court of Lear (in the opening scene of *King Lear*), or even some potted plants to denote a forest (in *As You Like It* or *A Midsummer Night's Dream*). Certain scholars are even of the opinion that in the Renaissance non-illusionistic

theatre, not yet cluttered with the appendages of the realistic stage, a simple gestural code - a wave of the hand or the use of the index finger - along with words like "Well, this is the forest of Arden" would suffice to create the forest before the mind's eye of the viewer.

A more tangible visual sign was the stage costume. The playhouse wardrobe was a major asset of the theatre companies. Apart from acquiring costumes from noblemen, the companies often spent lavishly to purchase material for costumes - in fact, more than what they spent to procure texts from authors. Peter Thomson perceptively observes, "On the empty platform, costumes were individual splashes of colour and the composite picture was always vivid and could be splendid." On the Renaissance stage, costumes denoted not only class and gender, but even the social/historical/ geographical context of the character. So, in *Antony and Cleopatra*, the rapid shifts between Alexandria and Rome would be affected less through change of scenery, more through the quick exits and entries of the Egyptians and Romans, their identities marked out by the costumes they wear (Egyptian and Roman respectively). On the apron stage of the English Renaissance theatre, even as a group of Egyptians made their exit by one door, a group of Romans entered by another door so that the stage unobtrusively changed from Alexandria to Rome. Changes of scenes and/or locales were executed with this simple theatrical convention, and the costumes etched out the identities of the characters on the stage. As scholars have observed, in the plays of Shakespeare scenes emerge more as "person scenes" than "place scenes"; so "the neutrality of the platform's space implies the strongest commitment by author, actor, and audience to the particular relationships of the play."

In Henry Peacham's 1595-sketch of the opening scene of Shakespeare's *Titus Andronicus,* if Titus is draped in a Roman toga over a military garb, Tamora wears flowing draperies in the Renaissance fashion, her sons and Aaron are in a mix of Renaissance-Roman styles, and the soldiers wear Elizabethan military wear. Historical and/or geographical accuracy in costuming does not seem to have been the aim; what emerged was a style of "mingled costume". Even then, certain markers or appendages would probably have been in use to signify the identity of the wearer. So, Shylock would be noted in his Jewish gabardine, setting him apart from the Christian Venetians. The soldiers would be in armour, while the fools would be dressed in the tell-tale motley. Other professionals, like the two doctors in

Macbeth, or the friars and priests in different plays (*Romeo and Juliet, Measure for Measure*) would presumably wear costumes bearing signs of their profession. Perhaps the most significant marker would be the crown, the wearing of which would denote the character to be a king - as with Lear or the many kings in Shakespeare's history plays. But, one may hasten to add, when usurpers like Macbeth or Claudius enter wearing the crown, the theatrical sign takes on a new connotation as it denotes usurpation; this not only falsifies the received signification of the theatrical sign but also exposes the indeterminacies with which it may be layered.

This element of indeterminacy is foregrounded in the use of the coronet in the opening scene of *King Lear.* The first quarto text directs: "Sound a Sennet, Enter one bearing a coronet, then Lear, then the Dukes of Albany, and Cornwall, next Gonorill, Regan, Cordelia, with followers" (Q1), and though not found in the folio text this stage-direction has been generally retained by later editors. A coronet is a small crown, usually worn by a lesser royal like a prince or regent. The Oxford English Dictionary defines the "coronet" as "a small or relatively simple crown, especially worn by lesser royalty and peers or peeresses"; having originated from the "Old French coronete 'a small crown or garland'", the coronet implies a certain degree of authority bestowed upon the wearer by the Crown, i.e., the monarch. As part of the stage costume, a coronet, then, would invest the wearer with a certain degree of authority.

In Lear's division of the kingdom, the silent coronet - which is not worn by any character but is only carried in - plays a significant role. The coronet is brought in as Lear makes his entry, with the rest of his court, with his express intentions to announce the division of his kingdom. There is only one coronet, and it does not figure at all during Lear's allotment of the portions of the kingdom to Goneril and Regan. When Cordelia refuses to play Lear's strange love-test, in sharp contradiction to his expectations, the infuriated king disowns and disinherits her completely:

Let it be so! thy truth then be thy dower!
... ...
Here I disclaim all my paternal care,
Propinquity and property of blood,
And as a stranger to my heart and me
Hold thee from this for ever.

(*King Lear,* I, i, 112-120)

The portion of the realm, originally set aside for her, is to be shared by Goneril/Albany and Regan/Cornwall. Interestingly, earlier when Regan was given her share after Goneril, Lear mentioned gifting her "an ample third" (at line 82). As the second daughter, we would have expected her to receive the second portion. It probably is an indication that the second - and perhaps a larger - portion was kept reserved for Cordelia. One might even conjecture that her portion would have been located geographically in between the "first" and "third" portions of Goneril and Regan; Cordelia's realm, then, might have served as a buffer state between those of her elder sisters, to prevent future strife. Lear even confesses that he had hopes of setting up home with Cordelia: "I lov'd her most, and thought to set my rest/On her kind nursery" (ibid., 128-129). Now, even as Lear disinherits Cordelia, it becomes devalued into the "third" share (133), to be absorbed within the realms of the other two daughters:

> ... Cornwall and Albany,
> With my two daughters' dowers digest this third;
> Let pride, which she calls plainness, marry her.
> .. .. The sway,
> Revenue, execution of the rest,
> Beloved sons, be yours; which to confirm,
> This coronet part betwixt you.
> (ibid., 132- 144; emphases added)

Notably, it is in this context that the coronet is brought back into the course of action only to be "parted" between his sons-in-law, in confirmation of the halves of Cordelia's share allotted to them. Scholars have glossed the use of the term "part" in the Shakespearean sense to mean "divide into parts" or "share with others, take a share of". We might even hazard a guess that Lear, in his fury, breaks up the coronet in two and gives the two broken pieces to Albany and Cornwall to authenticate the new arrangement. Whether broken (divided into parts) or worn in turns (shared with others), the coronet loses the original intention for which it was brought in by Lear - namely, to crown Cordelia with it and make her the mistress of the second/central/ largest portion of his divided kingdom. Instead of functioning as a gift for the best-loved daughter, its intended role is jeopardized in being "parted".

It is worth noting that though Lear proposes to divide his realm among his three daughters, he does not have ready three coronets - one for each

daughter - but a single one. As pointed out earlier, Lear makes no reference to the coronet when allotting his elder daughters their shares - it was evidently not meant for them. He had kept it reserved for Cordelia, whose crowning would have been the supreme climax of his grand show of the division of the kingdom. The crowning of Cordelia with the coronet, then, would act as a visual endorsement of not only giving her a larger/better share but also a greater authority/power than what was given to her sisters. Lear's design is fraught with his preferential tilt in her favour. However, when Cordelia refuses to comply with his well-planned scheme, it not only spoils Lear's grand show but also frustrates the role Lear had in mind for the coronet. Lear's "mode of determination" was inscribed upon this assigned role of the coronet, but with Cordelia's disobedience the customary assumptions are unsettled, opening up latent indeterminacies in the theatrical sign. This indeterminate role of the visual sign disallows any fixity of meaning, and adds to the sense of indeterminacy with which the opening scene - perhaps the entire play - is loaded.

The coronet, as a visual sign, undergoes a radical departure of its assigned signification, and, in turn, exposes the fissures in Lear's "mode of determination". Significantly, even before Lear has spoken a word, the coronet is brought into the scene. In fact, the quarto stage-direction indicates that the bearer of the coronet enters before Lear: "...Enter one bearing a coronet, then Lear, ..." (Q1: emphasis added). The coronet, a dumb piece of stage costume, remains inert on the stage but speaks volumes to the viewer. As mentioned, the presence of a single coronet instead of three underscores Lear's preferential treatment of Cordelia, who was always his favoured daughter: "I lov'd her most" (128). Even Goneril and Regan are fully aware of their father's partiality and admit as much to each other: "He always lov'd our sister most" (314). Yet, infuriated by her rejection of his love-test, Lear instantly jeopardizes his own design disowning and disinheriting Cordelia, whom he now calls "my sometime daughter" (124). Spurred by fury at having his carefully-planned show marred by Cordelia, Lear cuts her off from her apportioned share and divides the coronet between Albany and Goneril. This action of Lear points to his illogical whimsicality. Towards the close of the first scene Goneril and Regan voice their distinct misgivings not only about Lear's ingrained whimsicality but also about how it has been growing with his age:

Goneril. You see how full of changes his age is. The observation we

have made of it hath not been little. He always lov'd our sister most, and with what poor judgement he hath now cast her off appears too grossly.

Regan. 'Tis the infirmity of his age; yet hath he ever but slenderly known himself.

Goneril. The best and soundest of his time hath been but rash then we must look to receive from his age, not alone the imperfections of long-grafted condition, but therewithal the unruly waywardness that infirm and choleric years bring with them.

Regan. Such unconstant starts are we like to have from him as this of Kent's banishment.

(ibid., 313- 325)

Their words underline that Lear has been "full of changes"; the "best and soundest" periods of his reign have also been "rash"; his "imperfections" have been "long-grafted"; and his advanced years forebode more "unruly waywardness" and "unconstant starts".

These two traits - partiality and whimsicality - are major blemishes in Lear, both as father and king. If the presence of a single coronet highlights Lear's partiality, his sudden decision to disinherit Cordelia and therefore break/ divide the coronet signifies his whimsicality. If one follows the quarto stage-direction, the bearer of the coronet enters before Lear: "...Enter one bearing a coronet, then Lear, ..." (Q1: emphasis added). So even before Lear's entry, a static piece of stage costume is brought onto the stage and remains there, playing an apparently inert role, but all the while attesting to the blemishes in Lear as king and father and raising questions about arbitrary and despotic use of kingly and/or parental authority. An innocuous theatrical sign, the coronet, contests its associated meanings and becomes a tool to expose the flaws in King Lear's "mode of determination" - in the public space of the state apparatus and in the domestic space of his own family, both headed by him.

III

The roles of women were played by boy-actors, whose voices had not yet broken; they appeared in women's costumes, complete with wigs. The use of boy-actors to play the female roles brought to the fore "(t)he constant, witty play around the sexuality of men and women on and off stage" and Shakespeare was quick to utilize the exciting possibilities arising out of this

convention making several of his women characters disguise as men/boys. The immediate purpose, it may be surmised, was a theatrical exigency - in allowing the woman character to appear as a boy or man would ultimately be easier for the boy-actor playing that role. This is sometimes deployed with comic exaggeration to extract the maximum mileage - in *As You Like It,* a boy-actor plays Rosalind (a woman), who goes to the forest disguised as Ganymede (a boy), who, in turn, pretends to be the woman Rosalind and asks Orlando to rehearse his wooing with her/him. When preparing to go to the forest Rosalind dons the male attire with much bravado:

A gallant curtle-axe upon my thigh,
A boar-spear in my hand, and in my heart,
Lie there what hidden woman's fear there will,
We'll have a swashing and a martial outside, ...

(*As You Like It*, I, iii, 113-116).

Though Orlando sportingly plays the game of mock-wooing, he describes Ganymede/Rosalind as "The boy is fair,/Of female favour" (IV, iii, 85-86). And when Oliver produces the blood-stained napkin of Orlando, Rosalind faints, succumbing to what she had called her "hidden woman's fear", despite her outward male attire. However, to Oliver's "You a man! You lack a man's heart" (IV, iii, 164-165), she responds with feigned jollity, trying to pass off her fainting as mere pretence: "I pray you tell your brother how well I counterfeited. Heigh-ho!" (IV, iii, 166-167).

In *The Merchant of Venice*, Portia and Nerissa follow their husbands to Venice masquerading as male lawyers. Prior to their disguising, Portia flaunts before Nerissa the comic possibilities of their male attire in which their husbands will not recognize them:

... I'll hold thee any wager,
When we are both accoutred like young men,
I'll prove the prettier fellow of the two,
And wear my dagger with the braver grace,
And speak between the change of man and boy
With a reed voice, and turn two mincing steps
Into a manly stride, and speak of frays
Like a fine bragging youth, and tell quaint lies,
How honourable ladies sought my love,

Which I denying, they fell sick and died;
I could not do withal; ...

(*The Merchant of Venice, III,* iv, 64-74)

Portia's parading leaves Nerissa quite aghast: "Why, shall we turn to men?" (ibid., 81). While, on the one hand, the use of disguise exploits to the hilt the hilarity informing the dramatic situation, on the other, this convention of cross-dressing underscores the fluidity of gendered identities on the English Renaissance stage and problematizes the issue of female impersonation by male actors. Portia and Nerissa, in their male garb, are able to enter the Venetian court of law, which is primarily a male bastion. Surrounded by the men folk - Shylock, Antonio, Bassanio, their friends, and even the Duke - it is Portia who is able to effectively turn the tables on Shylock and wrench Antonio from his grasp. Aided by her disguise, she is able to play this role in a public space considered accessible only to men. This, in turn, subverts the conventional societal demarcations between public and private spaces available in terms of the gender divide.

One of the most notable instances of such subversion of the gender divide is to be found in the representation of the Weird Sisters in Macbeth. Appearing as bearded women, they thwart the well-defined social/cultural/ moral demarcations between the genders. It is Banquo who first describes their physical appearance: "So withered and so wild in their attire", "choppy finger", "skinny lips" and "...you should be women,/And yet your beards forbid me to interpret/That you are so" (I, iii, 39-47). All the details of their stage appearance, including their costume and their beard, represent them as old hags with indeterminate gender identities. This androgynous representation of the witches may have stemmed from a theatrical exigency, for these roles (women with beards) could have been played by adult men-actors on the Jacobean stage. But this theatrical disadvantage is strategically exploited by Shakespeare to foreground a major area of ambiguity in the play: the representation of the woman question, and the re-evaluation of gender stereotypes. Much of this is precipitated by the beard of the Weird Sisters - once more a visual theatrical sign that invites a problematized reading.

In this context, one may recall that Reginald Scot, in his The Discoverie of Witchcraft (1584), stated that facial hair (beard and/or whiskers) was often a physiognomical incongruity found in old women after menopause

("in whome the ordinarie course of nature faileth in the office of purging their naturall monethlie humors"). But, at the same time, he is of the opinion that they were often victims of religious as well as socio-economic-cultural persecutions ("these poor women ... are examined ... by cunning inquisitors, who having the spoile of their goods, ... spare no maner of allurements, thretenings, nor torments, untill they have wrong out of them all that, which either maketh to their owne desire, or serveth to the others destruction"). King James himself is known to have showed a more than passing interest in witchcraft and necromancy, which may have prompted his composition of the Daemonologie (Edinburgh, 1597; London, 1603). When James came to England, he found more sceptical responses to the problem of witchcraft (the writings of Reginald Scot, for example). Though in his Daemonology he had attempted to explain why witches were usually women ("as that sex is frailer than man is, so is it easier to be entrapped in these gross snares of the Devil") , he still found it strange that English witches were, almost without fail, old and destitute women. In fact, after his initial enthusiasm in demonology and witchcraft, James himself was showing signs of reluctance in prosecuting many of them and even had suspicions about the often-preposterous charges brought against them.

Shakespeare, in revisiting this topical and controversial subject of witchcraft, seems to have followed a definite agenda in his delineation of the Witches in *Macbeth.* Though they are designated as "Witches" in the stage-directions and the speech-headings, in the text of the play - except for one oblique reference (I, iii, 6) - they are never referred to as "Witches" but as the "Weird Sisters". The folio text spells the term as "Weyward", recalling Holinshed's spelling and signalling their waywardness. In Holinshed, the ambivalence in their nature is suggested through the either-or binary: "the common opinion was, that these women were either the weird sisters, that is (as ye would say) the goddesses of destinie, or else some nymphs or feiries, indued with knowledge of prophesie by their necromanticall science". In Shakespeare's play, however, they are both "Witches" and the "Weird Sisters". As "Witches", they conform to the image of the old country hags that Renaissance audiences would readily associate them with; they are even shown as engaging in witching rituals commonly linked to popular notions of necromantic practices (IV, i). But as the "Weird Sisters" they rise above this level of mere country hags, suspected of dabbling in witchcraft. What remains as an either-or binary in Holinshed, becomes more deliberately

ambivalent in Shakespeare. Stephen Greenblatt, addressing this problem of ambivalence, locates in Macbeth Shakespeare's attempts to reconcile "epistemological and ontological dilemmas" with "deeply contradictory ideological situation" that informed contemporary witchcraft discourses; this becomes even more effective in the theatre precisely because witchcraft and theatre "are both constructed on the boundary between fantasy and reality".

Though it may seem that we have digressed from our discussion of the costume as theatrical sign, this analysis is pertinent to realize how in the English Renaissance theatre stage-costume and its appendages - whether a coronet, or a male disguise put on by a female character, or even the beard of old women suggestive of the androgynous - were often explored in ways that went beyond the customary associations of meanings. And when that happened, the theatrical sign, through its indeterminacies and its subversive potentialities, was invested with new signification replacing the conventional meaning. The exciting game of creating and contesting meanings was taken a step ahead in the theatre, inviting the spectator to engage in her/his own reading of the theatrical sign.

Notes and References:

1. As quoted in Keir Elam, The Semiotics of Theatre and Drama (London & New York: Metheun, 1980) 5.
2. For instance, when a character (say, A) is seen kneeling before another character (B) on the stage, the obvious inference would be that B, in whatever respects (social, moral or otherwise), is superior to A, because that is the way it would happen within the received notions of social conduct.
3. This term is used by Raymond Williams in his Drama from Ibsen to Brecht (Harmondsworth: Penguin, 1983; originally 1952) 3.
4. Brecht's theory of "alienation-effect" or Boal's promotion of the notion of the "spectactor" all point to the active agency in the spectator who can be moved to action.
5. Baz Kershaw, The Politics of Performance: Radical Theatre as Cultural Intervention (London: Routledge, 1992) 16.
6. See Victor Turner, From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play (New York: Performance Arts Journal Publication, 1982) specially 76-77.
7. The Henslowe Papers records a list of properties belonging to the Admiral's

Men in 1598, beginning with "i rock, i cage, i tomb, i Hell mouth…" (Henslowe Papers, ed. W.W. Greg, London: A.H. Bullen 1907: 116).

8. See, for instance, Alan C. Dessen, Elizabethan Stage Conventions and Modern Interpreters (Cambridge: Cambridge UP, 1984).

9. Peter Thomson, Shakespeare's Professional Career (Cambridge: Cambridge UP, 1992; Canto edn, 1994) 90.

10. J.L. Styan, "Stage, Space and the Shakespeare Experience" in Shakespeare in Performance, ed. Robert Shaughnessy (London: Macmillan, 2000): 24-41; here quoted from 25; see also J.L. Styan, Shakespeare's Stagecraft (Cambridge: Cambridge UP, 1967).

11. Spellings retained as in Quarto text (Q1); emphasis added. The Folio text does not mention "… one bearing a coronet".

12. The early quarto texts may be reconstructions of actual stage performances in Shakespeare's theatre and therefore cannot be dismissed, in spite of their corruptions. In this case, the coronet being carried in (preceding the entry of Lear himself) may be an eye-witness account of the way this was performed on the Globe stage, and, as such, may not be ignored.

13. The New Oxford Dictionary of English, ed. Judy Pearsall (Oxford: Clarendon Press, 1998) 411.

14. C.T. Onions, A Shakespeare Glossary, revised 2nd edn. (Oxford: Clarendon Press, 1919; rpt. 1978) 157.

15. It may be noted in passing that a woman in distress was presented through the theatrical sign of loose and dishevelled hair - whether to suggest sorrow (as with the grieving Queen Elizabeth in Richard III) or even madness (as with the mad Ophelia in Hamlet or the sleep-walking Lady Macbeth in Macbeth). It was relatively easy to have the boy-actor change from a wig of coiffured hair to one of loose hair.

16. Kathleen McLuskie, Renaissance Dramatists (London: Harvester Wheatsheaf, 1989) 100.

17. This stage convention of cross-dressing was frowned upon by the Church and was considered immoral as it tended to fudge gendered identities.

18. As mentioned above, the Church fathers were hostile to this theatrical practice of cross-dressing as they thought it violated not only the social or cultural demarcations but also the moral segregation between genders designed by God.

19. Reginald Scot, The Discoverie of Witchcraft, Booke XVI, Chapter IX (1584),

ed. Montague Summers (New York: Dover Publications, 1972) 282.

20. The Discoverie of Witchcraft, Booke II, Chapter XII, 21; emphases added.
21. As quoted in William C. Carroll (ed.), William Shakespeare, Macbeth: Texts and Contexts (Boston & New York: Bedford/St. Martin's, 1999) 326.
22. Though it is commonly believed that the witch prosecutions reached "epidemic proportions" during James's reign (Peter Stallybrass. "Macbeth and Witchcraft" in Macbeth: A New Casebook, ed. Alan Sinfield, London: Macmillan, 1992: 25), the actual facts may have been very different. Kittredge, for instance, is of the opinion that there was no significant addition to the number of witch-killings during James's reign of twenty-two years compared to the number available for the last twenty-years of Elizabeth's rule (George Lyman Kittredge, Witchcraft in Old and New England, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1929: 288).
23. As cited by Kenneth Muir in Macbeth, Arden Shakespeare series (London: Bloomsbury Publishing, 2013) 178; emphases added.
24. Stephen Greenblatt, "Shakespeare Bewitched" in Shakespeare and Cultural Traditions. The Selected Proceedings of the International Shakespeare Association world Congress, Tokyo 1991, ed. Tetsuo Kishi, Roger Pringle and Stanley Wells (Delaware, Newark: U of Delaware P, 1994) 17-42; here quoted from 32-33.

Abhijit Sen is a former Professor of English, Department of English, Visva Bharati, Santiniketan. His chief areas of interest include Renaissance Studies; Theatre Studies; Rabindranath Tagore.

Contemporary Indian Drama: Exploring Stage Possibilities and Staging Possibilities

Chandra Dasan

One could speak fairly well only about his own life and experiences. Thus this paper is trying to position my theatre into its context and to look back into the concerns and contradictions of my life in theatre.

The story of performing drama in modern era, started with the attempts to embody the words written by the playwright with maximum efficiency and efficacy. As anywhere else, the history of modern Indian theatre was trying to embody the text written by eminent poets and playwrights. The actors personified the 'characters' as created by the author. With the flourishing conflict of words between characters, and with the suggested meaning and embedded poetry, the playwright was the master-builder of the art of Drama. The word and the literary quality was supreme and the work of the actor was to employ his talent and craft on histrionics to explore the layers of underlying meaning and sense of the text. The actors rendered the dialogues with verve and sharpness so as to add more depth and feel to the meaning and expressiveness of the word. The performance was embodying, nourishing and following the written text and the actors were instilling life into the characters and situations as sketched in the 'play'.

As the art of theatre flourished, the thrust was shifted from the text to the subtext and to the hidden layers of meaning. The effective exposition of the subtext without altering the shade and nature of the character as suggested by the playwright was identified as the true art of acting. The actor has to follow the inner life of the character and give life, emotion and expression to the written words. As the 'divine fate' ruled the destiny and life of the character, the playwright decided the fate and poetics of drama in performance. The other technicians, and musicians supplemented to increase the efficacy of the work of the author. The illusion of the world/life created on stage with the effective organization of words, was made more concrete, physical, profane and visible by the use of scenery, lights, costume, set and other effects.

In Indian context, the authority of the word in performance is a later development that was ensued with the advent of colonialism. Formerly

Indian theatre was the arena of the actor and his imaginative expression of craft acquired and nourished by systematic and continuous practice. Actors were not to follow the written text as such, but he has to interpret and create his own parallel/corollary to the literary work. He could be 'in' the character, or 'out' of the character, so as to interpret, narrate, critique, elaborate and extrapolate the written material. The playwright was not the divine idol in the ritual of Indian theatre, both in Sanskrit and folk traditions. The actor ruled the stage and the audience was keen to appreciate his impromptu ability to take the written material beyond its peripheries. The literary text was the raw material to suite the form, craft and expression of the actor.

The popular theatre of the modern era also followed this tradition. The audience went to theatre to witness and appreciate the histrionics and 'performance' of the actor. The mannerism of the actor, his style of expression and delivery of dialogue were venerated. That is why melodrama which is considered inferior in terms of literary values became the favorite material for the actor and also of the audience. Melodrama gave enough space for the actor to expose his craft and histrionics so as to produce effects and marvels on stage!

The Directors Speak

Then the directors started to speak through theatre, exploring new possibilities of staging the text. With the interpretation of the text, designing of space, and the use and advent of technology and with the collaboration of allied arts, theatre fostered as an altogether distinct form. Many a times the written text was subdued and was used as a means to create the performance text. The transient and volatile language of theatre was nourished to create a new language of independent expression. The written play was reorganized, edited and mutilated to create a new narrative of visual images, expressive movements, visual poetry of moving bodies, embodiment of music and sound, symphony of orchestrated emotions, fluidity of corporal entities amalgamated with the sonority and resonance with the spoken word, to create a new form of expression. The text was deconstructed and reconstructed to explore newer meanings that can establish contact with the time and space of performance.

Looking back, I could say that, the directors of my generation was mostly attempting to create a theatre which was still based and rooted within the written text, even if it was deconstructed or reorganized. Theatre was trying to respond and share the agony and anxiety of the people; it was trying to voice the social, cultural and political experiences of the day. The

text became the means to derive the spatial and temporal connect with the present, while reciprocating to the past history. The written text was supplemented and supported with information and memories from beyond, At times, more than one text or more sources were juxtaposed to create a deeper understanding of the reality. Theatre was expressing the live experiences of contemporary life, through the live and humane medium, an aesthetic expression rooted in history, stretching its wings into the agony, aspirations and trauma of the people. The text found newer relevance in relation to the political, cultural and contemporaneity of life and society.

Theatre started voicing the marginalized and exploited; it started speaking about the story that is not written in the conventional moorings of history, it raised concerns about the socially deprived ones, about the unseen and unsaid exploitation embedded in the power structures, about the disintegration and fragmentation of social establishments, about the dynamics of power relations within a family system and in the social fabric, and many more. The text ceased to be just the narrative of the story as locked inside the time and space of the fiction and its characters. The experience of the characters were extrapolated and connected to the present day reality - the real experience of the audience.

In such an event, the director and the actor, reaffirmed the relationship between the performance and the audience, explored the body of the actor, the colour, texture and tone of the visual and auditory images. The design acquired new meaning and relevance in theatre. Theatre became interdisciplinary; art, music, and other forms acquired equal significance along with the written play to create and establish the new concerns, demands and scope of theatre. Theatre became a collaborative of many forms of expression, a collaborative of different artists including playwright, poet, designer, director, actor, visual artist, lighting designer, dancer, choreographer, traditional artists and craftsmen, and also the spectator.

Such explorations and varied resources nourished the language of theatre to take it beyond the realm of the written word. Still theatre retained the flavour of the written play or of the adapted material like the story, or poetry. The new performance language generated was in human terms and was trying to address and connect with the people.

Modified as Desi

At the same time, it is a fact that most of our directors and playwrights modelled their work on the modes of the west, in defining the narrative structure, in the approach to understand and negotiate with life, in

the use of images and metaphors, and more in the philosophy towards life, artistic expression and aesthetics. This was further facilitated by the interests of colonialism and post-colonialism. It is from this long western influences – direct and indirect – that our theatre is mostly restricted to proscenium. Even the so called theatre of the roots, – the texts as well as productions – are defined by the narrative and grammar of the proscenium, with its unique frames and compositions, imageries, entries, exits etc., spiced with Indian ingredients like references of a myth, a half curtain, a song, a dance sequence or the use of a mask. This dependence on western notions of drama and theatre is visible in the craft of playwriting, designing, the mode and aesthetics of performance and its organization.

The attitudes, dynamics and the socio-political, cultural inclinations of contemporary Indian society is getting more and more westernized. The planning, nation building, structuring of social system, values, modes of education and pedagogy, the order of governance and its priorities are all western oriented, focusing the urban elite and the mighty multinational entrepreneur. Even our elections and democratic processes are event-managed, following the successful trends from the west. If our politics and the construct of nationhood itself is open to the corporate and multinational interests of western practices, it is foolish to imagine that our theatre flourishes in native flavor. If the priorities of western modes rule every aspect of the social system, we cannot expect our theatre speaking a native tongue. We may be framing and coining Hindi/Sanskrit words to name these western notions to make it appear as 'Desi', but the essence and inner core is developed and dictated by the capital markets and urban dreams, the neo-colonists and the so called 'entrepreneurs'. The westernized urban ethos is ruling the aesthetics, mode and structure of our performance system and the entertainment industry. The tragedy of contemporary Indian society is that our priorities, ideologies, and politics is basically westernized and urban, which is camouflaged and modified as Desi, clad in an Indian attire.

The new techno-world and its Theatre; the urchin in the global market Theatre has always used technology to facilitate its mode of presentation. The advent of sound system, electric lights and the like has revolutionized the practice of theatre. Girish Karnad has written that one of the initial marvels that affected his understanding of drama was the introduction to the use of spot lights. The possibility of lighting a single character and focusing the light to one face, gave the opportunity to look deeper into the psychology of one person. Thus the art of playwriting could use this possibility to pursue the inner life of a character.

Technology has supported and supplemented the art of performance. It helped the actor to be more effective, make his life on stage more comfortable, and the performance appeared more focused. But, theatre remained as a humane activity integrated around the live actor and his relation with the audience. Priorities might have changed from the playwright, actor, or the director or to the mutuality of all of these different creators of theatre, but it remained humane and connected with the spectator.

But, in the last twenty years there is a 'sea-change'. Technology became the first and foremost area of exploration and execution of theatre, at least among the new generation of directors especially from metro cities. Innovations in multi-media, live soundscapes, video streaming, and computer generated garbs, virtual performances, and the like became the post- modern mantra. Multitudes of images, sounds, and their fragmented cacophony created an illusion of hyper reality. Theatre was transformed as a collage of disorganized, disjointed images that lacks any specificity to a meaning or feeling. The emotional content of the expression is lost; both-the actor and the playwright disappeared or made lifeless on stage. Theatre became more mechanized, technical, and fess humane. The argument is that contemporary life is overtly ruled by mechanization, gadgets, technology, and a plethora of sounds and images surrounding us in every possible environment; this theatre is just a bye-product of such a grotesque situation. Theatre seizes to speak about the society at large, because such a social connection do not exist. The society is fragmentized and highly individualized; every act has turned to be egocentric, closed and personal. So do theatre; it turned out as the expression of the individual, and it no longer is concerned about the collective.

However, still I feel, that theatre has to be humane, live, emotive, concerned with the people, reinforcing the social instincts of man, reflecting and imaging one another, and rooted in the ground reality of the life around us. Theatre has to be actor-oriented, with a narrative that can connect with the audience; the written text becomes important even if it is not to be followed with at most reverence. The design has to mutually link the written play, with the actor's faculties of expression, and the experience of the immediate society.

The Stage possibilities Vs the staging possibilities.

Another very important question that arises is about the staging possibilities of a production. Where do we perform a play and what is the kind of patronage and from whom? The society which is disintegrating fast

has withdrawn from the responsibility of patronizing or supporting theatre. The state support is minimal and almost void. It is demeaning that there is little public space, available for assembling, rehearsing and for performance. The common spaces are disappearing very fast with the fortification of the new economic scenario of market oriented globalization. Theatre has ceased to be the concern nor is the engagement of the public, People find carnivals, exhibitions, and malls to spend their time and leisure as the new means of engagement and entertainment.

Then the other options are to search for corporate sponsorship and also depend on those very few major theatre festivals for survival. The theatre festivals in India is in the process of making its own cult which advocates a monolithic ‘festival’ genre; since most of the festivals are ‘curated’ by the same set of like-minded people. If the corporates become the patron, naturally theatre will end up as a harmless, toothless show of pretentions. Strangely the festival genre and the theatre supported by the multinationals happens to be of the same school; a school of new elitism, which has no real connection to the Indian reality, in social, cultural, political, aesthetic or performative realms.

In such a scenario each theatre group has to find its own resources, means and modes of survival. Thus exploring staging possibilities becomes a bigger priority to the contemporary Indian theatre than exploring stage possibilities of performance. May be both will be corollary —and complementary; innovation in one may lead to the other. That is my hope.

Chandra Dasan, is the founder and artistic director of Lokadharmi Centre for Theatre and Mazhavillu, a children’s theatre group in Kochi, Kerala, India. Chandra Dasan is also a designer, director, actor, playwright and a translator.

NATYAGRAM, A THEATRE LABORATORY
For concentration and creation as a community
Subodh Patnaik

History

Natya Chetana got registered in 1986 as a non-profit making theatre organisation in Bhubaneswar. Initially, the team comprised of a band of young and enthusiastic drama students and the attempt was just to imitate other theatre organisations already functioning as "group theatre" or "committed amateur theatre groups". But gradually a sense prevailed that it was time to comprehend theatre as social work and our professions needed to be different to earn a livelihood. So, as drama graduates, we all were searching for jobs in movies or in All India Radio. Television was not prominent at that time as it was introduced in India only in 1984 with Asian Games. But when we saw that chances were less and the atmosphere of these circles was not favourable, as we were neither hopeful nor artistically satisfied, a few of us decided to pursue theatre full time so that a minimum income, through performances, could be raised. Natya Chetana also got encouragement from the NGO sector as they invited performances and paid little fee against that. This heightened our spirit to rent a house and practice intensively day and night to make our art better and also to prove ourselves as artists. That was the seed of "community living", which proved to be more encouraging for us. It was a nice feeling to stay together and work as much as we wanted. Natya Chetana was moving forward with a philosophy - "Live together, plan together and work together", which was practiced as a way of life during our stay at the rented house in Bhubaneswar. This also created a bonding among the members and we felt the spirit of being a "team". So, this initial process was from 1987 onwards.

In 1990, while visualizing a future of such a community living style, we could foresee that after 10 years, when all the members would be married and would have their families, a rented complex house of that size wouldn't be able to sustain us. This dream provoked us to plan for developing our own village. During that time, we could not think for a better place beyond Bhubaneswar. We applied to the Government for a plot in Bhubaneswar,

but failed to get any response. However, there was a dilemma. On one hand we wanted a place of our own which was unique, traditionally rooted where a cultural life (like a village) could be practiced by the families of the artists and on the other hand Bhubaneswar was almost succumbed by the modern western culture. It was a period of great struggle. So having a shelter inside Bhubaneswar city was not fitting into our imagination of a commune living. The process seemed to be complicated.

We started searching for a land with our savings to buy, without waiting for any external support. The criteria were - to search for a secluded land, without affiliation to any village, so that we could be politically free to decide our own rules and principles to follow at our own campus. And minimum required land would be 5 acres to accommodate 20 families at least to stay together and have a working place for theatrical activities. We wanted to set up our own village of 20 families. That is how the name of the campus emerged as - "Natyagram" or "Theatre Village". Due to our limited resources, we could not find a private land near by Bhubaneswar city. Finally, a barren land of around 5 acres near Khordha town was available for a huge price, which was our complete savings. Natya Chetana bought that land, where young boys from local village used to play football and occupied it in 1991. The choice stemmed from two major factors. 1) This was behind the Barunai Mountain range which was an important place for India's freedom struggle and still there remains a damaged version of the last freedom fort of India which the British occupied. So, it is symbol of protest. 2) 12 kilometres on the other side there is a place called Kaipadar, where Hindu and Muslim community jointly worship a spirit. That temple or mosque was built by a Muslim devotee Peer and the land was being donated by the King of Puri who has links to Lord Jagannath. So, it is a symbol of tolerance. And Natyagram land is in the middle of these two points.

The First Cottage in 1993

It took more than two years to realize that Natya Chetana is the owner of a land. It took some time to establish our ownership because earlier kids used to play football there. So, we fixed up tents and conducted a theatre workshop there, although there were no light or electric sources or water sources. Surrounding the play ground there was small hill on one side and a little forest on the other. We completed a 15 days camp there and rehearsed a play. That is how the local population could realise that we were a theatre

group. There was a boy from the village who assisted our cook. He was from a tribal pocket. He became interested in theatre and was not happy living in the slums of Bhubaneswar. So, this factor encouraged us to build the first cottage and a shelter for people like him and start developing the campus. This gave us a dream to give a shape to our Theatre Village. We made a map and drew on the wall of this cottage. The ideas of living, planning and working were the main features for developing that theatre village. This sense of togetherness pushed us to have our working space soon.

With a cottage built at a secluded place, we were concerned about the security, as this land was situated at the outskirts of the nearest village - Shialia. It was 5 kilometers away from the local town named Khordha. So, the next attempt was to have a boundary and a gate. It was too costly to think about a wall around the campus of 5 acres. The idea also was to include the public in the development of the campus in a moral sense. This means that the public must know what is happening in this campus. So, it was decided to have a wire fencing. This was our immediate attempt before having a working place.

The round shaped Training Hall - Natyashram in 1995

In 1995, we built a circular space as our main laboratory to work in. The circular shape was influenced by ALT (Alternative Living Theatre) led by Sri Probir Guha, eminent theatre director who had his own practice space named "Akhra" in Madhyamgram, Kolkata. Almost 10 years of journey in developing our own theatrical style with the belief that Theatre (Natya) is for building Awareness (Chetana) mainly, for which we named our group Natya Chetana, we were undergoing a process of transformation within ourselves. Many old friends had left by that time. Many new friends from villages joined to share our vision of Theatre for Awareness. The choice of circular hall was a political choice in a way. For example - we always sit in a circle when we have meeting in our group. We made a circle so that everybody can see each other and no one will get a special seat to draw

attention as a leader or commander. Circle provides equal distribution of rights to each members present there. We find our temples in Odisha having circular shapes. Our circular space is a well-ventilated place. The top was made with thatched roofing, which collapsed in 2015. This forced us to rebuild the round hall in concrete. This, followed by a 2 roomed hostel adjacent to round hall, was a step towards developing a complex for training.

THE OVERALL LONG-TERM PLAN

The land was being demarcated into parts to attain the goal to simultaneously live and practice theatre. The idea was to establish a University of People's Theatre at Natyagram. The University will not follow the stereotypical structures of courses, campuses etc, rather will give an alternative living and learning by practicing and perceiving theatre as a tool for people's awareness. Theatre is a form of art that is rooted in the cultural fabric of India since hundreds of years. The teachers of the university will impart knowledge as guardians, like in Indian Gurukul, focussing on upgrading the skillset of the students instead of providing only a certificate, and instilling in them a sense of trust, team spirit and spiritual belief.

1. **Natya Ashram :** a training complex
2. **Natya Gyan :** a documentation centre
3. **Natyasala :** place for Natya Chetana theatre practice
4. **Natya Mandap :** a stage for performances
5. **Natya Nivas :** Residential complex for Natya Chetana full timers and Guest House
6. **Natya Chetana :** the coordination unit of the village
7. **Nata Hata :** a place for marketing theatre materials and publications etc.
8. **Natya Lipi :** a publication house [yet to come up]

- We have decided not to have any building higher than 2 storeyed in this campus.
- We will not develop anything that is artificially decorated like parks or urban lawns etc.
- We will give place to statues having connection to Theatre without following a commitment to any religion. We have fixed Natraj, as he stands as God of Theatre, Saraswati as a Goddess of Art and Culture, Buddha as a symbol of concentration and meditation, and Nata-Nati (as Natyashastra hails them as initiators to a play when performed.)

Existing infrastructure by 2021

Year by year Natya Chetana invested its own money to develop a small cottage first, then a wire fencing, a round hall to work, a hostel of two rooms, few toilets, a well for water supply which was maintained as the Natya Ashram up to 1999. The super cyclone damaged the cottages.

After the cyclonic impact, ***Natya Chetana*** received a grant from NORAD (Royal Norwegian Embassy) to build up a concrete building with an idea of multipurpose use. So Natya Chetana has a place of rescue but was mainly to establish a museum of folk musical instruments of Orissa. So (by the end of 2004) we have ***Natya Gyan*** (the documentation centre), library, photo exhibition, property exhibition, mask exhibition, puppet exhibition etc.

Then we got individual donations from international friends by which we could repair the damaged ***Natya Ashram*** in a better way. Now there is a storeroom and a kitchen added to it. The dinning space on the top of it is yet to be completed.

Then we gradually built the coordination centre of the village where we would sit for planning together. The small complex named ***Natya Chetana*** is at the centre. The administration files and official control is from this building.

By the end of December 2004, we used our major savings for starting the complex of ***Natya Nivas***. The entrance part has been started. But the main part of having an infrastructure for 20 families is yet to be completed. The idea is to have a joint family type of complex, where there will be 2 storeyed buildings with 2 BHK separations for 10 families in ground floor and 10

families upstairs. All families will be facing a central space like an Indian Village architect. There will be a common Guest House.

In 2005 January, by the time we held our 10th Peoples Theatre Festival, the temporary stage was converted into a permanent stage of 30 feet x 40 feet for performances. This stage (***Natya Mandap***) has been planned to adopt the design of Indian stage mentioned in ***Natya Sastra***, just by having two exit gates to go behind the stage.

There is an area demarked for Theatre Market (Nata Hata) in the campus, which becomes active during People's Theatre Festival every year. The idea is to facilitate availability of theatre related materials and books in this market. It is designed like a rural weekly market. For time being there is a new room built as Reception- "Swagat Kakshya".

However, the principal idea is to maintain this as a village. So features like : village type normal pathways, bushes, some trees and a pond (waiting for filled up by rain during Mansoon days), the ant houses are still there. There are many trees which automatically grew after the fencing of the campus.

Major Activities here - Now

- **Training and Workshop:** All Natya Chetana's Training activities are organized here unless and until it is required to have a camp elsewhere.
- **Seminar and Exchange meet :** Natya Chetana organizes seminars and exchange meets here. These are short duration activities.
- **Peoples Theatre Festival :** Usually a village has a special event of its own. That is how "Lok Natya Mela" has become a popular event where a large gathering occurs and people from the city, other villages and even from abroad come and meet each other. Performances, theatre workshops, seminars and theatre market all take place during those days. This is an event of 5 to 7 days time.
- **Museum of Musical Instruments :** There are 30 folk musical instruments displayed along with a photo exhibition, book exhibition, poster

exhibition. And some selective costumes or properties are displayed for the public.

Discipline majors

- The campus is free from "smoking", any kind of "Tobacco Use", "Alcohol" and "Tea".
- *(**We neither take nor offer 'Tea / coffee'**. It is a practice since 1987, when we supported a movement against Tea Companies for which tribal people had to be displaced. Also, tea bags were being seized which were injected with slow dose of drugs. Rather during winter or when we feel like, we take and offer a hot drink named "**Pancharasa**", prepared with five natural / herbal elements. People do like it and many times shift to this practice.)*
- The campus is not treated as a free public place for entering at any time, rather people can come on invitation during usual visiting hours.
- The Campus is looking forward to develop a commune living spirit carrying cultural gestures and traditional rituals with friendly relationship.
- It abhors cultural practices which have the capacity to hamper the reputation of Indian culture and self-dignity. This addresses the choice of clothing, choice of music, men-women relationship like sensitive issues.
- Specific time schedule or disciplinary majors are declared for each activity.

Major Challenges ahead

Electricity - The flow is from the rural connection, which does not guarantee a constant flow.

Water - There is no ground water and neither a facility of supplied drinking water available here. A lot of experiments have been made to identify points of ground water resource, which has failed. As it is an up-land area.

Internet network - In a way, if the mobiles are getting low signal, it is not bad for a meditative atmosphere. But important communications to be made outside through mobile or web calls or online meetings can get affected for which one needs to go out of Natyagram.

How to reach

Natya Gram is easily reachable and is situated about 35 kms from Bhubaneswar, the capital city of Odisha, and Khordha - the district headquarters. Bhubaneswar is well connected by air and rail with major

metropolises. The nearest airport is Bhubaneswar. The nearest railway station is Khordha Road. The Railway station - Khordha Road Junction is about 15 kms away from Natyagram. But Bhubaneswar railway station is connected better to outside. There is a good connection of Buses from Bhubaneswar to Khordha.

There is an old Bus station and a new bus station in Khordha. It is always better to get down at "New Bus Stand" and a special auto rickshaw (three-wheeler) can be reserved to reach us by asking - "*Anda Bajpur road, just after Sialia village, Natya Gram*". It is 4 kms from new and 5 kms from old bus stand of Khordha town.

If you are travelling in your own car/hired from Bhubaneswar Town, take the National Highway aiming towards Chennai, the south. This NH-road goes via Khordha Town. You need to be attentive when you see the mountain Barunei on your left side, just after crossing the point of "*way to Last Freedom Fort of India*" (where you will find statues of freedom fighters fixed in a line at the corner of that point). You will get a point where the road has a park on the left side. This square is known as - "*Collector Office square*". You need to turn LEFT towards Anda-Bajpur. Drive about 2 kms, crossing an over bridge of a railway line, Natya Gram is on your left. You will find the gate of entrance.

Postal Address : NATYAGRAM, Chadakamara Padia, Near Sialia Village, PO- Daleiput, Dist-Khurda, Odisha, India, PIN - 752056	Better Contact : NATYA CHETANA, N-3/344, Nayapalli Lottery Plot Area, Bhubaneswar, Odisha, India, PIN - 751015 Mob : 9437055590 / 9437522389, E-mail : natyaindia@gmail.com

Subodh Patnaik - Director and eminent theatre personality. He is popularly known for his new endeavour of 'Natyagram' in Odisha.

ON DRAMA AND THEORY AN INTERVIEW WITH EDWARD BOND

Dr. Surajit Sen

Born on 18th July in 1934 in Holloway, North London, Edward Bond is a British playwright, poet, director and theorist. He is regarded to be one of the best playwrights in contemporary British drama. With around fifty plays to his credit till date, he is also one of the most prolific playwrights of modern age. He has received much fame and acclaim for his dexterity in writing drama no doubt, but he has been equally criticised, if not more, for his portrayal of violence on stage and his political stance on drama. The attack on his works often has been severe, particularly in his own country.

Edward Bond wished to understand the world we live in and the people we come in contact with in our everyday life. He is highly spoken about his theatrical originality and active imagination which are the resultants of his scrutinization.

The society in which he was born dragged him into the person he turned out to be as an activist and a playwright who touches on the issues of politics and social discrepancies. As he confesses, it would be wrong to separate his experience from his philosophies.

It is not possible not to criticize Bond because of the wildly performed unvarnished realities of the world but according to Bond, they are the realities that the human beings should not ignore and be indifferent to. However, Bond is an optimist who wants to make the world a better place to live by presenting those aspects of life through his plays and finding solutions to them.

At the future, Edward Bond casts a very positive glance and believes in the potential of the people to do right. Therefore, in his plays, he encourages people to seize that one chance.

Bond has also become involved in Theatre in Education (TIE), A project based in Birmingham, England, called the Big Brum TIE Company. He has written a number of plays for them and has participated in tours and workshops.

In the beginning of his career as a dramatist, Edward Bond became part of a group of young writers that gravitated around George Devine's Royal Court Theatre. These were years of great turmoil for English theatre. The plays of Beckett and Pinter were being performed in London's West

End, while John Osborne’s 'Look Back in Anger' received its premiere in 1956, followed by plays by Arden and Wesker, thus opening the period of the Angry Young Men. The influences of the London theatre scene could be felt above all in Bond’s earliest plays, which combine the ‘kitchen-sink’ realism of the Angry Young Men with aspects of Theatre of the Absurd, with results that are quite different from either movement. Whereas Bond criticizes Osborne and his angry friends for their lack of clarity and a barren approach towards romantic nostalgia, he contrasts the crude existential emptiness of Beckett’s absurdity with a more enlightened and ‘operative’ position that brings him closer to Brecht . 'The Pope’s Wedding' (1962), his first work, mediates between these various aspects. It is with 'Saved' (1965) that the ‘unbearableness’ of Bond’s theatre powerfully emerges. In Brechtian fashion, each episode in the plays is presented in its own terms; the immediate concerns of the characters are falsified by tricks like inessential verbal eloquence, elaborate by-play or moral comment. 'Red, Black and Ignorant' is also Brechtian in the sense that it follows the episodic style, characterization and open-endedness of a typical epic theatre play.

'The Woman: Scenes of War and Freedom' and 'Bingo' are the two plays selected which show the transitional features in Edward Bond’s dramas. Some epic features are there in these plays, but there are distinct deviations also. After initial euphoria with the epic techniques, Bond felt that those were not adequate to counter the questions propagated by the changing era.

With the passage of time, Bond seeks many things in theatre which are specifically ‘anti-Brecht’ or for that matter, anti-epic theatre. He does not believe that it is enough just to have people in the theatre to make them think; the audience’s emotions must be involved as well, because that is the way to challenge them most thoroughly. He also gives highest importance to the power of imagination and his theory of ‘radical innocence’. He rejects the account of tragedy given by Aristotle and Brecht and says that without the tragic there can be no moral order and so no humanness. Bond’s life-concern is with how humanness can be created.This has prescribed areas of explorations his plays have needed to enter, and in seeking to make his plays work in the same way for others, this has entailed developing theatre form.

In the plays 'The Woman: Scenes of War and Freedom' and 'Bingo', there are little adherence to the epic theatre mode. Theoretically and performance-wise, these plays take a different approach from the previous plays. The episodic structures, use of poems are present but strong story-lines, theatre/drama events, new historicist approach employed in the plays lead us to a new domain of theatre.

Through the plays 'Lear', 'The Bundle' and 'Human Cannon', Bond's 'rational theatre' has been explained. His 'Rational Theatre' tries to understand the present day crisis in world affairs and human history and to show the potential for achieving a sane society. He advocates devices to reach this sort of theatre. It focuses the subjective and the objective, the character, the personal, in the social, through evoking the imagination to seek reason. Rational theatre, as seen in the plays, works to draw in the audience, to confront us through his devices, the Extreme, the Drama/Theatre Event, Accident Time, cathexing and decathexing objects, the Invisible Object and so on. These see the human individual as someone who can be, has to be, creatively responsible for him or herself and the rest of humanity: humanity Radically Innocent, embodying the human imperative to seek justice. Bond goes far beyond the naked realism of his earlier plays, commanding an eloquence that seems to stem not from the author but from the speaker's intelligence and feeling. The performance style also changes in 'rational theatre' plays where Bond gives utmost importance to the actors. Bond's scripts require a conceptual approach on the actor's part.

Bond's rational view states that acceptance is not enough; Man must participate to develop his character and his society. Bond believes that the modern society is irrational. He also suggests that justice may help people evolve. According to Bond, societies are corrupted by violence, exploitation, oppression, science and technology. Bond believes that it is a myth if we say man is innately born violent and that technology came to solve man's problems.

Dr. Surajit Sen who is presently working as Assistant Professor in English at Ramthakur College, Agartala has done his PhD on Edward Bond's dramatic strategy from Assam University, Silchar, Assam. While pursuing his research-work, he had interviewed the celebrated dramatist in 2015 through mail. Below are the questions and answers of that interview.

Question : How many of your plays can be categorized as 'rational', Sir? Once you have told so, as far as I can remember.

Edward Bond: Throughout all my (over) fify plays I have used the same method. (An exception being a few occasional pieces such as Black Mass and Passion. These were written on request as part of political campaigns and were first performed at rallies.) At one time I described my theatre as rational. And in fact it is – but this misled people into relating my work with Brecht's. I regard Brecht as a disaster. Rational is too restricted a title because it seems to exclude other parts of the human psyche such as imagination.But there is also a danger in this! – because "imagination" is widely misunderstood as being to do with (as Schiller said) play, or to be

entertainment or wishful thinking or to put us in touch with an other-worldly supernatural reality which mysteriously is the source of human moral values. Instead I now talk of the logic of imagination and my work is strictly materialist.

Question : Please tell me something about reason and imagination.

Edward Bond: I will try to make some useful comments. Commonly "rational" is related to "reason." We are said to be human because we can reason. But reason allows us to make H-bombs, instruments of torture, to wage wars and stage riots. Reason on its own cannot make us human but may make us inhuman. Reason has no moral value, no moral imperative. Moral comes from other parts of the psyche. But In the same way, imagination may also make us behave inhumanly – in politics and creeds, for example. Just as reason on its own may make us behave madly, imagination may drive us mad. We are made up of the ability to reason (make torture instruments or medical instruments) and imagination. You can say reason is derived from the working of the practical laws of nature which we learn by being in the world, but also from our introspection of our self because we are in many ways physical natural "things" existing in the world. But imagination is derived from our subjectivity, our self-consciousness. And so there are two separate things that, each alone, may make us inhuman. Humanness comes from a specific, not casual, relation of the two. This is the human dilemma. Nature is "rational" in that it abides by its own laws. Think what it would be if nature was self-conscious and so with a will or purpose of its (extra-)own. It might make the earth fly around as if it were a bird, or fire survive happily in water. Nature cant do that because it has laws but no will or purpose. But imagination can do the equivalent of that, it can go mad! – because it has no laws (except to the degree that we are mortal and vulnerable things, part of nature). Instead of laws humans have creativity. This is the substance and form of drama.To be self-conscious is to be conscious that humans have vast problem because drama is obviously a place of imagination (Hamlet doesnt really die). Drama is possible because we know other people have subjectivities like our own and until we can treat other people with respect as if they were our self we will never be at peace. That is ancient understanding but in the past it was often a form of ideology – which both repressed and stabilized communities. But now that truth has to become part of the logic of imagination. That logic is created when we treat others as if they were our self. That means that we then use reason to make societies human not to make wars, or top make some rich by making other poor. The (human) logic of imagination is in fact the substance and point of drama. But then you have to say: what is it in humans that

would make them makers of humanness? That is why I write at length about the way in which the new born infant enters into reality and becomes responsible for its own pleasure and pain – but because of the way it enters in to reality (it does this by learning the geometry of nature) it is responsible for the pleasure and pain of the human world in general, of the human situation on the natural site. That would mean that nature and self are related in a way that increases the self's well-bing, happiness. If a day-old, an hour-old, infant had the experience and learning of adults then imagination (self-consciousness) and reason (nature) would be one, be combined for our happiness. Unfortunately (for strictly historical reasons) the child will grown up not into a just society but into a corrupt one – and the corrupt one will maintain its existence by ideology, it will pervert the relationship of reason and imagination to maintain its corrupt power (and it will unfortunately often do this not cynically but self-righteously). What follows is this: reason and imagination become combined in destructive ways. But the combination is always volatile and restless. This creates drama, is the actual substance of drama – it seeks to tear reason and imagination apart, release them from the corrupt bind of ideology. This can be done only in extreme situations, in fact, in the tragic -- not in order that we may suffer (societies do that anyway) but so that we can know and experience through the drama and the actors the logic of imagination – that humanness is enthralled in ideology. And I will briefly mention a final point: a drama (such as Antigone or Hamlet or Macbeth) may be created out of the creative purpose Ive described – but the actors will still be captured (emotionally and economically) by the forms and purposes of ideology. In my plays I have to devise situations where it is difficult for actors to remain in the manners and mannerisms of ideology. Nevertheless they will naturally (in a strict sense) cling to their ideology because ideology invades (again, for historical reasons) art and drama. This becomes a social and political problem because acting and performance are a social institution. Drama is the means our species has of creating its humanness – but it may be reduced to theatre, which imitates the human problem (as ideology must if it is to have a spurious relevance to our situation). Theatre is the total opposite of drama. In theatre, the actors do not recreate the process by which the child enters into reality – and that is the nature of all creativity, Instead they perform the mannerisms of ideology – which is graced as "style" because to be plausible ideology must always dignify itself. Really they are performing as puppets – and because ideology is increasingly reactionary and (because of all pervasive technology) no longer has historical access even to the desire to be human but only to be consumers. In theatre the actors become puppets. In the age of TV Hollywood and Bollywood they become the puppets of the dead. That is the theatre of

Capitalism.

Question : So naming your theatre would not be proper, Sir?

E.B: I hope this is clear enough to be useful. Ive had to reply to your letter rapidly if I am to reply to it at all. Recently we have been trying to think of a useful name for my theatre. Its is difficult because all the key words have been occupied and perverted by ideology. In my plays I try to push aside the evasions of cultural misrepresentation and use the resources of humanness. You will notice I say "push aside" and not talk of reaching concealed depth. Doing that may create a false mystique of art. We would see out problems on the surface if we knew how to look.

Question : Sir, can you elaborate on your dramatic strategies? How have you evolved over the years?

E.B: I am writing to you again because I think I might not have been as helpful as I should like to be. I wanted to make it clear that "Rational Theatre" was a temporary title. It didnt describe my plays well. But you are right about the apparent different forms. Most of these come about from the situation in which I was writing rather than in what I was trying to achieve in writing. For instance, the three War Plays move from an agit-prop form -- but the form breaks down because agit-prop cannot deal with the complications which make the soldier shoot the "wrong" person. His reason for doing are to be found in the Palermo paradox. I realised I would have to extend the analysis. 'The Tin Can People' (the second War play) is a sort of half-way house. I used choruses. But although in 'Tin Can People'I was able to describe the situation and the characters in a way I could not in agit prop, it was still insufficient. So I wrote the third play 'Great Peace' in which the Woman wanders in the nuclear wilderness. I call the opening part of 'Great Peace' a Greek tragedy because it confronts the soldier with a tragic choice and because the play forms a tragic whole. It was still not enough and so I wrote the second half of the third play in which the Woman is in the wilderness. It allowed me to penetrate more deeply into the characters' inner-being, their inner worlds, to find their social and political being in that world. The inner being is like the trigger on a rifle. Without it the rifle is useless. The character is then both the trigger and the finger-pressure on it. This connects directly with what I say about the way the child consciously enters into reality. There has to be a static situation of laws – nature – and the mobile human will which always seeks its permanency: the moral human imperative. Without these two things there would be no history. Power does not come from the barrel of a gun, it comes from the trigger. I should add that I consciously made the three plays a history of drama, of its main types.

Its is the duality of humans (the objectivity and the subjectivity) which

makes us human by giving us the problems of inhumanness.

Question : You have extensively used chorus in your plays, Sir. Is there any fascination?

E.B: I also used choruses in 'Human Cannon'. This is because I was recording actual historical events – and the choruses enabled me to record these – but also I was as always analysing the characters' subjectivities. And because of the existential closeness of the two orders (nature and self-consciousness) I allowed the woman Agustina to turn into the (form of a) cannon, a thing. This appears to run history backwards but that comes from the duality of our situation. The duality of human beings (objectivity and subjectivity, things and will) makes us human but also present us with the problem of inhumanness. In this drama goes to the profoundest human problems, dilemmas and assertions.

Question : What are you doing presently, Sir? I got to know that you are in public stage domain in France. And do you see anything significant coming up in British drama?

E.B: In recent years I have been able to write for a large public stage in France. This suggests the appearance of epic – but remember I am always seeking the logic of imagination because that is germane to the logic of the situation. In the UK I have written for smaller groups – mainly in co-operation with Big Brum, a young people's theatre based in Birmingham. Its resources are extremely limited, three – and at the moment two – actors and a mobile set to be shifted from school to school. But I have still pursued the same objective. In fact, often in a refreshed way because young people (teenagers) are on the cusp of the double dilemma that makes us human. The UK theatre is in a state of collapse and does no significant work at the moment. It thinks it is "in the swim of things," dealing with the present world. No, it is like a Hippopotamus in a stream trying to clean its nails with a nailbrush.

Question : Any parting comment on epic theatre, Sir?

E.B: About the supposed objectivity of epic. Its astonishing how more profound Homer is than Brecht, how his intimate knowledge of the human mind and its passions warns of the dangers of the Gulag terror-labour camps.

I hope these remarks are clarifying.

DR. SURAJIT SEN,
Asstt. Prof. Department of English, Ramthakur College, Agartala, Tripura

Theatre of Tripura & Sammilita Natya Prayas the beginning of a collective dream

Sanjoy Kar

For more than a period of 125 years, the theatre of Tripura has been searching for a right direction to reach its goal. If we look back to the numerous ups and downs in the long journey of theatre in Tripura we shall see that many meaningful steps were taken. From rehearsals in the royal family within the confines of the palace to the age of bringing theatre within the reach of common people, advancing from amateur theatre towards a theatre of commitment, modernization in creativity and technical skills etc. many milestones were achieved in the theatre of Tripura during this long and arduous journey, which simultaneously bear pride and stigma. Prior to my discoursing on my topic, I would like to acquaint my readers with the background of theatre in Tripura which may help us to understand the need for the formation of Sammilita Natya Prayas in Agartala. The history of theatre of Tripura may be divided into 3 (three) phases:

First Phase : Royal period to the merger with India : 1897-1949 A.D.
Second Phase : Age of amateur theatre: 1949- 1965 A.D.
Third Phase : Age of theatre of commitment.

Since a large portion of the territory of Tripura included the fertile lowlands of Bengali inhabited areas which became the part of the then East Pakistan after partition, Bengali culture and tradition have always influenced the cultural and literary flavour of this kingdom. The court language of Tripura was Bengali. The first westernized theatre stage grew up in Agartala during Radha Kishore Manikya's reign in 1897, known as Ujjayanta Natya Samaj. The royal group started its performance with a five-act play "Patibrata' written by Maharaj Kumar Mahendra Debbarman. Birendra Kishore succeeded his father Radha Kishore in the year 1909 and continued the performances of Ujjayanta Natya Samaj among which were Tagore's plays 'Raja o Rani' and 'Visarjan'. Birendra Kishore was directly involved with Ujjayanta Natya Samaj. Later on, he formed another group inside the palace called "Pushpabanta Natya Samaj'. The king's keen interest in drama inspired the members of the royal family, the thakur society and local artists

to actively engage in building an environment congenial to the growth of theatre. 1917 onwards, several theatre groups owned by the Thakurs and Kartas like Ranbir Karta's Theatre and Lebu Karta's Theatre came into existence. Ranbir Karta's passion enthused the youth and student fraternity of Tripura and drew them to amateur acting as a mode of creative expression. By 1923, theatre groups like Umakanta Chhatra Natya Sangstha, Edward Memorial Medical Institutes Theatre Group, Tarun Sangha, Student's Association Theatre Wing, B.K.Institute, Belonia Theatre Sangstha took the theatre among the middle-class students and professionals out of the confines of the palace. In 1928, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ascended the throne and attempted to revive the court centric drama by establishing 'Tripur Natya Sammilani' and staged few musical dramas and dance dramas fusing Manipuri and Bengali dialogues written by him. With some old timers of the Student's Union Theatre Wing, Rana Bodhjung Bahadur, Minister of Royal court established 'Matrimandir' in 1936. This new group was more progressive in their style and expression compared to their predecessor. Time was fast changing and so did the trends in theatre. Matrimandir was revamped into Tripur Shilpayatan under the leadership of Tripuresh Majumder, one of the greatest theatre activists of Tripura and a man of reverence even today not for being just as an accomplished actor only but also for being a great theatre organizer. Meanwhile,Tripura merged with the Indian Union on 15th October, 1949.

Second Phase : Age of amateur theatre: 1949- 1965 A.D

Within a few years of merger of the princely state of Tripura with Indian Union, amateur theatre groups grew rapidly in Agartala and in other sub-divisional towns like Belonia, Udaipur, Sonamura, Khowai, Kailasahar, Kamalpur and Dharmanagar. These groups made theatre an important medium of creative expression and popular entertainment. In the meantime, Sudhanya Debbarma, the legendary volunteer of Janashiksha Movement, wrote a bi-lingual play 'Egiye Chalo' with dialogues both in Bengali and Kakborak. The play was staged all over the state. In the late 1940s, theatre groups like Shilpi Sangsad (1948), Loka Shilpi Sangsad (1955) and Shilpayan joined hands with other groups with their plays blending the folk, traditional and contemporary themes and forms. The most important contribution made by Loka Shilpi Sangsad which emerged in 1955 under the leadership of Shakti Halder, introduced women actors in female roles ushering a new era in theatre culture of Tripura. Loka Shilpi Sangsad staged Tagore's play 'Raktakarabi' in 1956. Till that period, there was no permanent stage or hall for performance and the groups had to perform in school campus

or cope up with the makeshift arrangements.

Third Phase : Age of theatre of Commitment: 1965—till date.

Late sixties had seen many unprecedented changes in the socio-political and cultural scenario in the country as well as in the State. In 1971, Tripura provided shelter to the refugees from erstwhile East Pakistan more in number than its existing population during the Independence war of Bangladesh. Tripura attained the status of Statehood in 1972. Emergency was imposed in the country in 1975.There was political change in the governance of Tripura in 1977. Rabindra Satabarshiki Bhawan was built in 1973 in Agartala. Meanwhile, the wave of IPTA movement along with the factors mentioned above influenced the young educated theatre practitioners resulting in a change of outlook from amateur to social commitment. A number of theatre groups were formed.These groups came forward with new thoughts and experiments in the state. This may be called the modern era of Tripura theatre. Regular activities of these groups in terms of experiments with naturalistic, symbolic, absurdist, satiric, fantastic and farcical themes and implementing them in their performances resulted in an upheaval in quality. The period from seventies to eighties may be regarded as the golden period of theatre of Tripura. The Inter Office Drama Competition started from 1969 paved the way for productions of more experimental and qualitative plays. An important thing came into practice during the eighties which may be regarded as the most precious gift of this period. The Theatre of Tripura slowly was slowly getting its own identity with the plays written by local playwrights. National, international and local content came up in the plays. From the nineties, more theatre groups came into being with new hopes and promise.

Salient Features of theatre activity during last three decades:

1. The theatre groups have started staging plays written by local playwrights.

2. Training for theatre artists has been conducted at different levels by National School of Drama and Sangeet Natak Academy resulting in improvement in the production both in technical and non- technical aspects giving rise to a professional attitude in the productions.

3. Due to the incorporation of local tribal and non-tribal lives in the stories, a new identity of Tripura theatre is created.

4. Kokborok plays have begun to sprout with new hopes & achievements.

4. NSD has come forward to establish its TIE wing through which a number of youngsters of the State have been trained. SNA, NE Centre has been established in Agartala and took several activities like organizing National

and International Theatre Festivals & intensive theatre workshops etc. Few theatre groups continued to organise National Theatre Festivals as well.

5. Theatre Groups from Tripura have been participating in many National and International theatre festivals of the country and neighboring countries. Plays from Tripura were staged in 8th Theatre Olympic, New Delhi which is regarded as the world's largest and most prestigious theatre event.

Challenges:

1. The dramatic status of the State is not steady. Having a strong legacy of about 125 years, more or less 30 theatre groups have been working in the field of theatre in the State.

2. The groups are run mainly by the employees of Govt. and non-govt. offices, retired employees and by unemployed youths. So, theatre has become a part time creative work in Tripura.

3. The youngsters think twice before joining a theatre group because there is hardly any hope of earning a livelihood. Professionalism is a far-fetched dream here.

4. The expenditure for a simple production is about Rs. 40/50 thousands which is not possible to meet up by staging only a play or two. So, regular production is hampered.

5. The declining interest of audiences towards theatre is a matter of serious concern.

These challenges make us, especially the theatre groups of Agartala, to think deeply on some serious questions.

1. How can the theatre groups of Agartala continue regular shows confronting the above challenges?

2. Is there any scope for the theatre groups to come closer to each other to share financial burdens for running regular shows in Agartala?

3. How should the theatre people promote, encourage and enhance the theatre activities in Agartala to contribute to its growth and development across the State?.

4. Can we work collectively for each other to enhance the quality of production of the plays?

During the course of searching the answer of these questions, we got the only answer: Yes, collective effort can show us a new path to overcome the challenges. Initially, we discussed the matter with the group leaders of

different theatre groups of Agartala and finally we sat together to give our thoughts an organizational shape on 24th August, 2019 at Dakshini Griha of Rabindra Parishad, Agartala. That was a glorious day for the theatre groups of Agartala as the day has drawn the veteran and young theatre artists together for a common interest and for the overall development of theatre in the state. Sammilita Natya Prayas came into being from that day. We had a number of meetings among ourselves to mitigate the differences within us and pointed out some common objectives to operate the organization. The work planning of Sammilita Natya Prayas is as follows:

1. Sammilita Natya Prayas is a platform of cooperation and coordination to enhance the theatre activities at Agartala. Though we start with Agartala, our dream is to spread it throughout the state in future.

2. The motto of the organization is to provide healthy entertainment through regular theatre shows on every second Saturday of each month.

3. Sammilita Natya Prayas will organize seminars, theatre workshops, and festivals for the enrichment of theatre in this region.

4. 16 theatre groups of Agartala assembled under the umbrella of this collective effort with a commitment that each group will support financially by selling tickets of the shows of others & will take common responsibility for advertisement of the shows.

5. The expenditure of the show will be borne by the group itself.

6. Name of Theatre Groups included in Sammilita Natya Prayas, Agartala are Tripura Puppet Theatre, Kabitalok, Natyalok, Surpancham, Shilpatirtha, Natyabhumi, Kabyalok, Natyabhumi Group Theatre, Patabhumi, Tripura Theatre, Nandantrisha, Rangpeeth, Uttar Phalguni, Bhabia, Samarpan, Rangamati.

There is a saying; there are a hundred obstacles to perform good deeds. We prepared ourselves to start the journey of Sammilita Natya Prayas on 27th March, 2020, the World Theatre Day which is a noble day for all theatre workers. But, the preparation and enthusiasm had to face the lockdown due to the COVID 19 pandemic. We had to wait for a year to restart the venture. At last, the glorious journey of Sammilita Natya Prayas started on 27th March, 2021, the World Theatre Day with a short inaugural programme. The equal numbers of male and female representatives of 16 theatre groups lit the candle of hope of hundreds of theatre lovers of the city. Keep Silence, a well-designed production of Shilpatirtha was staged on that day. But, after the staging of Krishnapoksha, a production of Natyabhumi on the second

Saturday of April, 2021, the second wave of COVID 19 disrupted all creative initiatives including our regular shows. We are waiting with great hope for the day when everything becomes normal and people feel free to acquire his bread and butter and as well as enjoyment. Surpancham is preparing for their next turn of second Saturday show.

The objective of doing regular shows is being badly hampered by the COVID situation. But, the theatre groups under Sammilita Natya Prayas have a strong determination- to strive, to seek, to find, and not to yield. We hope to transform our dream into reality. We are very much thankful to the Department of ICA, Govt. of Tripura for extending financial support for running 16 month long regular shows at Rabindra Satabarshiki Bhawan, Agartala. With this support, theatre groups no longer have to worry about renting a hall. Theatre is a composite art form and considered to be a mini society. In this age of self-centrism and consumerism, it is a hard task to gather some people to achieve a common creative goal. So, Sammilita Natya Prayas need commitment, determination and keep collective aim above all personal interests.

Sanjoy Kar - Eminent Theatre personality of Tripura, Founder, director of Natyabhumi.

Up-country dance : an aesthetic model of Sri Lankan stage drama

Dhanushka Washeera Salgamuwa

Abstract

Up-Country dance has a special place among the dance traditions of Sri Lanka Kohomba Kankariya (traditional ritual) is the Repository of this dance tradition. There are several unique theatrical performances in Kohomba Kankariya. It is undeniable that these dramatic parades served the local drama of Sri Lanka. Kohomba Kankariya features storytelling, imitation, replication, transplanting, dialogue and singing. Decorations, backdrops and theatrical equipment are also used. The use of costumes to portray the characters reflects theatrical features. Imitation, adaptation and transplanting showcased by the dramatic Parades of the Kohomba Kankariya in Up-Country dance explain the demography of the society of that time through the use of ideological imitation. Demonstrates various character imitation situations. It shows the actor's adaptation to the beat of the Gataberaya drum, the main instrument of tradition. Theatrical costumes and moods reflect internal transplanting and external transplanting. External Transplanting is evident by the way teachers dress for different characters. The main costume in this dance tradition is the Ves costume. This research is based on qualitative data analysis research methodology and critical methods will be used to analyze the research. It is clearly understood by in depth research of the dramatic features used in Kandyan dance. Most Pandits (scholars) are of the opinion that such aspects of the dramatic features have long ceased to exist from Sri Lanka except a few mentions in the “Shastra”. It is a matter of pride that such dramatic elements as can be seen in up country dance today have been nurtured in the stage drama. This article reviews information on the rural culture of Sri Lanka as well as the cultural value of drama and dance in the country.

Key Words : Kohomba Kankariya, Gataberaya, transplanting, Up-Country

Introduction

Sri Lanka, an island in the Indian Ocean, is located to the south of the Indian subcontinent. Sinhala (also called Sinhalese) is the mother tongue of the Sinhala ethnic group which is the largest in Sri Lanka. It belongs to the

Indo-Aryan branch of the Indo-European native speakers. It is one of the constitutionally-recognized official languages of Sri Lanka. Theravada Buddhism is one of the most important religions of Sri Lanka. The ancient Lankan art of song, drama, dance and musical instrument playing can be divided into four main categories. Up-country dance is an offering ritual for pleasing invisible forces, pleasing demons, pleasing the gods, and also associated with entertainment. Ancient data may be divided into several time periods (eras) and adequate attention given to performing of dance. Detailed information on up-country dance can be obtained from historical sources written in pre- and post-Buddhist eras in Anuradhapura, Polonnaruwa, Dambadeniya, Kurunegala, Gampola, Kotte, Kandy, Matara and Colombo. The dance tradition of the Up-Country is considered as the chief dance tradition of Lanka. This tradition known as Udarata Natum (Up-country Dance) is famous both locally and globally. It is embellished with attractive hand and foot movements according to the beats of an advanced system of rhythm. Anyone paying attention to Udarata Natum will clearly understand that it is a dance tradition centered exclusively in the Up-Country popularly known as Udarata. When searching for the origin of the Up-Country dancing traditions, much information can be gleaned from such source's oral folklore, folktales, literature and archaeological records. On analyzing the data from the above-mentioned sources, it becomes clear that the Up-Country dancing tradition is the oldest dance tradition of the county. The ritualistic dance known as the Kohomba Kankariya is the most important feature of Up-Country dancing tradition. It is said that the Kohomba Kankariya was performed in order to invoke blessing on king Panduwasadewa who reigned after king Vijaya considered to be the first king of Aryan descent to rule Lanka.

From the presence of Kohomba Kankariya in the Up-Country dancing tradition it can be deduced that it was the source of Up-Country dancing tradition. It can also be observed that with the passage of time the Kohomba Kankariya gradually lost its ritualistic importance and acquired an identity as a form of entertainment. There is an indication that Up-Country dancing emerged as a ritual without royal patronage. Available descriptions of the royal court dancers of the Kotte period indicate the dancing was exclusively performed by male dancers.Although most historical and archaeological factors pertaining to dancing contain a lot of carvings, figures and paintings exist. Most of them exhibit rhythmic poses of female dances. There are also

instances of up-country dancing depicted by carvings and figures of the Kotte.

Origin of Up-country Dance in Sri Lanka

The most important ritual in the Kandyan dance tradition of Sri Lanka is the Kohomba Kankariya ritual. It is also evident that the dance characteristic present in the Kankariya as well as the activities intended for appeasement of demands, carried out by the original inhabitants constitute the basis for the beliefs. Kohomba Kankaria performances (Figure 2) take place in a Buddhist temple, devalaya, the threshing floor.. Since Kohombayak Kankariya which is a ritualistic dance exhibits all the main characteristics of Udarata dancing (Figure 3), it indicates many faces of ancient history of the Sinhala people. Although the theory regarding the origin of Udarata Natum (the dance tradition of the hill country) presents the view that it originated and developed from a ritualistic dance form performed to worship the Kohomba god. Therefore, this concept of the Kohomba God may be considered as the inseparable ritualistic link between the Sinhala society and the Udarata dance tradition. For the performance of the Kohomba Kankariya in which the worship of demons or the Kohomba god plays a prominent role, a special place is selected where rice and other offerings are kept and a ritual called 'Pooja' is carried out. In addition to chants and 'Kolmura' poems. The main instrument of this tradition is the Gataberaya drum (Figure 4). It has a long history. This drum occupies a central place in traditional rituals,

This ritual contains the beliefs of the Up-Country people as well as many of the dances that exist in these areas. According to the story behind the Kohomba Yakka Kankariya, Kohomba Yak, an ancient ritual offering in Sri Lanka, is considered to be a ritual performed to pay homage to the God Kankariya. Also known as Kohomba Kankariya, Kohomba Yakuma, this ritual is said to have been performed by the Malay King and his entourage in a pavilion in the Mahamevna Uyana (Beautiful Garden built in the sacred city of Anuradhapura in 500 BC) in Anuradhapura to cure a disease that afflicted King Panduwas. Vijaya landed in Sri Lanka with a group of five hundred and drove out the Yaksha tribes who ruled Ceylon. King Vijaya ruled Lakdiva (Sri Lanka) with the help of Kuveni, a woman of the Yaksha tribe, in his struggle for power. Later King Vijaya drove Kuveni away and married a princess who was brought from Madurai India. Kuveni cursed

King Vijaya in retaliation for his expulsion. An angry Kuveni disguises herself as a Leopard and tries to kill King Vijaya. Curse of King Vijaya followed and it is said that King Panduwas, who succeeded King Vijaya, fell ill and saw a dream where Kuveni was disguised as a leopard.

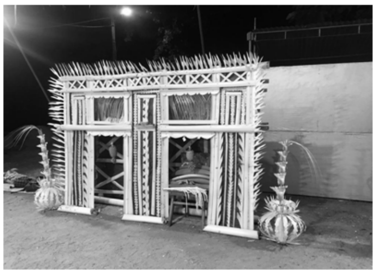

Decorations of Kohombayak kankariya

First performance of Kohombayakkankariya

Ves Dancers of Kohombayakkankariya

Gatabera players of Kohombayakkankariya

The stories of Vijaya and Kuveni and the curse of Kuveni became popular in Sri Lanka as a folk tale. Kohomba Kankariya was first written in the book 'Kuveni Asna' written by Uthurumula Thero during the rule of Kotte in Sri Lanka. Coming from India. King Panduvasdeva was healed by the sacrifice of King Malaya. Kuveni Asna states that King Parakramabahu VI of Kotte cured of his illness by performing the Kohomba Kankariya (AD 1412 - 1467) Kandyan period 'Siyaba Asna' mentions that King Narendrasinghe (AD 1707 - 1739) had all his sins removed and God's protection. Written in the Whurtha Granthi language style. This offering is called "Kohomba Kankariya" as it is primarily offered to the god Kohomba. Apart from that Irugal Bandara, Weeramunda and Kadawara Devi are also offered. In Kohomba yakkankariya addition to the offerings and dances, there are a number of dramatic. It can be said that it influenced the development of the art of academic drama in Sri Lanka. A tree is set aside as collateral before the Kohomba Kankariya. A coconut tree is selected for this purpose. The coconut oil needed for Kohomba Kankariya is also

obtained from that coconut tree. The chief Yakdessa who performs Kohomba Kankariya gives an auspicious day for planting in the shed. Uses a branch of the jackfruit tree. It is Atamagala middle (An image drawn on the ground using a variety of patterns) in the ground. Shed construction begins after that. After preparing the Kohomba Kankariya shed, the shed is done. After that water is mixed with pure sandalwood and sprinkled with milk to purify the shed and make it clean. Kohomba Kankariya begins with the procession of the God's jewels. The jewels are brought from the Devalaya and placed on the flower bed. It is used as a symbol of God. Incense burning, chanting, etc. are performed for the gods. A similar procession also brings "Akyalas" to the gods. The part that is first set aside for God after the harvest is called "Akdyala". After the completion of the basic activities, the main dance will be performed. The dramatic elements of this Kohoba Kankariya are the yakkam paha (five) (Yakkama is a part of the drama with dialogues from Kohoba Kankariya in the up-country dance), Guruge malawa (A dramatic element with dialogue in Kohomba Kankariya) and Gabada kollaya (A dramatic element with dialogue in Kankariya). After the completion of the basic activities, the main dance elements will be performed. The ritual known as the yakkam is an important event in Kohomba Kankariya.

Vadhi Yakkama

The Vedda (Indigenous people) is the first of them. This begins with the agreement of the Veddas. Kottoruwa plays the Vedda and Yakdesa plays the Malay king (Figure 5). The Vedda is wearing a piruvata and a piece of bed cloth around his neck They both run around on a mat lying on the ground as the Malay king chases the Vedda. The Veddas also dance around a mortar (Figure 6). Demonstrates Vedda socialization by placing a garland on the Vedda.

Naya yakkama

There are many simulations of the Naya(snake) Yakkama. Yak Dessa and others collect paddy to give alms to Soliya Guru. It is done as an imitative action. Paddy farming imitates all post-harvest activities. It mimics the trunk that carries the alms, the falling of a trunk near a snake tomb, and the bite of a snake. Then, to dispel the fear of the snake, he made a statue of the snake and bit it on the head, chest and hands, saying that the person would not die from the snake.

Ura Yakkama

The story revolves around a pig who begins to destroy the Malay king's garden during a pig attack. The Ura (pig) yakkama is accompanied by

humorous dialogues. A yakdessa (charmar) who wears in a Ves costume and a conversation between his assistant is key here. Accordingly, the chief Yakdessa tells his aide that he had wandered in various parts of Sri Lanka in search of the desolate pig in the garden of the Malay king. In this conversation. Mispronunciation of names in places. Cheating on other animals (frog, elephant) thinking it is a pig creates a sense of humor. Eventually the pig meets. Here a replica of a pig made of banana stomach is brought to the audience. Eventually the pig is found. Here a replica of a pig made of banana stomach is brought to the audience. The pig is shot with a bow and the buffalo is carried under the cover. The servant come disguised as a buffalo. We call him as "Kottoruwa". Bows and arrows are made of coconut leaves and strings. The piercing of the pig is modeled after the Gataberaya. Finally, pork is divided into different castes. Here an attempt is made to look at every caste in Sri Lankan society.

Seetha Yakkama

This is a Yakkama in which drummers disguise themselves as Tamil merchants. Here the story of Prince Rama searching for Princess Sita is staged.

Dharshana/ Dharpana Yakkama

Describes the route taken by the teachers to perform theKohombaKankariya ritual. Describes theatrical decorations and props that appear on stage.

Guruge Malawa

GurugeMalawa is a conversation between chaman and a drummer. Yakdessa plays the role of 'Nalla Sami' or 'Guru'. He is a foreigner who cannot speak Sinhala properly. Accordingly, 'Nalla Sami' does not know Sinhala. Since the drummer does not know the language of 'Nalla Sami', humor arises from the conversation between the two.

Gabadakollaya

The part of the KohombaKankariya shed where rice, coconut, vegetables etc. were stored is called the warehouse. Chaman comes in with an employee disguised as an elephant and imitates breaking down the warehouse door. A haystack is symbolically set on fire.

Results and Discussion

Realistic or professional dramas do not have a very long history in Sri Lanka. Such a long history exists only in local traditional ritual and folklore. Artists, since time immemorial, have been instrumental in creating a theatrical art

that is close to the local generation. It is clear that the modern era of Sinhala drama which emerged with 'Maname' created by Mr. Sarachchandra in 1956 is being updated. The art of stage drama exists in Sri Lanka and the experience gained from Up-country dance has been instrumental in building that tradition. Experience is paramount in the creation of a play and the experience of the director is also very important in building the story. Therefore, the experience gained through self-experience, other experiences, text experiences is created for the society with the aim of the audience over time. Up-country dance (Kohomba Kankariya) used his inspiration to create Sinhala drama. By taking the Up-country dance tradition, natyadharmi and lokadharmi were produced. These dance dramas have been implemented by the help of Up-country dance costumes, percussion, and beats. The Kohomba Kankariya ritual emerged from the up-country dance tradition. Tradition brought together various hilarious traits, satires, various aspects of society, love, heroism, kindness, conflict, to enhance the taste of stage dramas and to make it easier to popularize. Jayalath Manorathne's “Guru Tharuwa” 1996, “Thalamala Pipila” 1988(Figure 6), “Andarela” 1995, Dayananda Gunawardena's “Madhura Jawanika” 1983, Jaliya Rajapaksa's Sokari 2011 (Figure 7) For the stage drama above, use of Up-country Dance, Angahara. Conversations, decorations, Gataberaya Drum, vocals, melodies, added.

Conclusion

The Up-Country Dance originated from the Kohomba Kankariya rituals, which were based on the beliefs and practices of attributing divinity to natural objects and worshiping. Dramatic art has been established in Sri Lanka, absorbing parts of the Up-Country dance of the past. The play, which is the seed of theatrical art, is performed using artists. Kohomba Kankariya also has its own style of acting, Yakkam paha, Guruge malawa, Gabada kollaya. This Kohomba Kankariya / drama adds entertainment as well as social role to the mind of the viewer. Until the nightfall modern audience is reluctant to watch Up-Country dance. The modern playwright brings to the stage with his script the various gestures used in Up-Country dance. The reason for this is that watching this stage drama which is limited to a few hours, has given security to the Up-Country dance. This format includes elements of Stage drama that originated in Sri Lanka, such as characters, thinking, perspective, conflict situations, etc. However, the Sri Lankan Up-Country dance and stage drama are characterized by gestures Bharatamuni’s theatrical art. Many formal institutes have been established in Sri Lanka to preserve and research it and to display it to the outside. The main effort is to preserve

the traditional Up-Country dance performances. The government has set up various institutes to study drama and learn about theatrical drama, focusing on formal and academic aspects to deal with performance. Thus, in the artistic form, the drama based on the devotion based Up- Country dance Sri Lanka Kohomba Kankariya has a special place and it is truly appreciated by the whole world.

References

1. Dissanayake Mudiyanse, dance of Sinhalese, S. Godage and brothers, Colombo, Sri Lanka,1993. Page 8,9.
2. Dissanayake Mudiyanse, dance of Sinhalese, S. Godage and brothers, Colombo, Sri Lanka, 1993. Page 3,4.
3. Kariyawasam Thissa, Shanthikarma haa Sinhala Samajaya, Pradeepa Publisher, Colombo, Sri Lanka,1976. Page 65,69.
4. Dissanayake Mudiyanse, Kohombayak Kankariya saha samajaya, S. Godage and brothers, Colombo, Sri Lanka, 19889. Page 104,105.
5. Dissanayake Mudiyanse, Narthana Wagkosha, S. Godage and brothers, Colombo, Sri Lanka, 2001. Page1018.
6. Sarachchandra Ediriweera, Sinhala Gami natakaya, Government press, Colombo, Sri Lanka, 1968.

Dhanushka Washeera Salgamuwa - Ph.D Scholar at Department of Dance and Music, Manipur University.

Censorship and Resistance in Nineteenth Century Bengali Theatre

Dr. Sib Sankar Majumder
Dr. Arzuman Ara

The foundation of National Theatre, the first native public theatre in Bengal on 7th December 1872, symbolized the rising cultural-nationalist aspirations of the Bengali middle-class, that section of the Bengali society which aspired to take a decisive role in most socio-political matters by borrowing influential ideas from the Western modernity. Light-hearted farces like *Kulinkulasarbaswa* (1854), *Ekei Ki Bole Sabhyata* (1860) or *Budo Shaliker Ghade Ron* (1860) which thrived in the private theatre spaces of rich and influential patrons of North Calcutta were gradually fading away and serious plays like *Nil Darpan* (1860) became the prototype of a series 'reformative' plays. This subtle thematic transformation in public theatre, however, did not escape the attention of the colonial government and a series of legal provisions were drafted to curb its influence. Starting with the draconian Dramatic Performances Control Act (1876) the British government introduced other stringent laws like (a) Sec. 99-A of Code of Criminal Procedure (1898), (b) Sec. 124-A of Indian Penal Code, (c) Sec. 1 (sub section 4 and 12) of Indian Press Act (1910) etc. These enactments had an adverse impact on popular theatre of the natives. Public theatre apparatus in Calcutta was still at a nascent stage and rather unprepared to deal with the rigors of censorship and proscription. For more than three decades since the enforcement of Dramatic Performances Act of 1876, Bengali theatre practitioners had to constantly negotiate, maneuver and devise ingenious methods to avoid state censorship.

In an unprecedented assault on the freedom of theatre by the colonial Government of Bengal, a police party led by Col. Lambert, Superintendent of Calcutta Police raided the premises of National Theatre on the evening of 4th March 1876 and arrested almost all the prominent members of the theatre group including Amritlal Bose, Manager of National Theatre Company and several artists like Upendranath Das, Motilal Sur, Amritlal Mukherjee, Shibchandra Chatterjee, Gopal Roy, RamtaranSannyal etc. There was great chaos and confusion in the theatre hall as some of these artists tried to escape arrest by adopting all kinds of imaginable and

unimaginable methods. Bhuban Mohan Neogi, one the proprietors of National Theatre Company surrendered before the High Court on the next day (i.e. on 5th of Match). Criminal charges were slapped against the artists, manager and proprietor of National Theatre for their involvement in the production of Surendra-Binodini. The prosecutor of the colonial government accused that:

Both Babu Upendranath Das and Amritlal Bose, Director and Manager…wilfully exhibited to public view an obscene representation of a woman having the saree stained with blood in front [sic] carried in the arms of a man having his shirt stained with blood in front [sic], intending thereby to represent the immediate result of such woman having been discoloured by such man. (Kar 131-2).

Surendra-Binodini became the first Bengali play to be officially proscribed by the British government. Referring especially to a particular molestation sequence in the play the pro-European press of Calcutta reported that the city's white community felt particularly "outraged" by the vilification of colonial officials (Kar 131).

"the subject of the present persecution was not that the text had been departed from but the drama was obscene. There was another scene in the drama in which the same European Magistrate Mr. Crimble made an attempt of criminal assault on the maid Brijmohini, a grown up girl who jumped down from the balcony to avoid outrage" (Dasgupta 270).

In his testimony before the magistrate John Charles Owen, a British employee of Calcutta High Court opined that he did not find anything 'libelous' or 'subversive' in the play and certainly nothing which was "aimed at any person/s employed at Her Majesty's service under the imperial government" (Dasgupta 277). Referring to the charges of 'obscenity' he further added that, "The object of the [molestation] scene" which was mentioned in the list of accusations was not to provoke racial hatred but to "incite virtuous indignation towards the magistrate [Mr. Crimble], who is depicted as villain" (ibid 277). However, P.D. Dickens, the presiding was not impressed by the testimony of Owen. On 8th March 1876 in a thickly packed courtroom verdict was delivered in the *Surendra-Binodini* case in which Dickens remarked:

The evidence of the defence, it appears to me, proves too much,

according to it nothing would be obscene, unless it is couched in obscene words. According to my opinion the passage in evidence is grossly obscene. It appears, a good taste is afforded by the daily newspapers, which have rejected the passages as unfit for publication (Kar 133).

Upendranath Das and Amritlal Bose were pronounced guilty on charges of circulating 'obscene' content under Section 292 and 294 of British-Indian Penal Code. Both were sentenced to one month's imprisonment. The case was subsequently presented before a two judge bench of High Court and both the convicts were set free on 20th March 1876.

Upendranath Das' *Surendra-Binodini* presented the most serious 'moral' and 'cultural' challenge to the British Empire since the controversy surrounding Dinabandhu Mitra's *Nil-Darpan.* In comparison to *Nil-Darpan,* Upendranath's *Surendra-Binodini* was brazenly more critical of the repressions and exploitations on the subaltern classes of Bengal by the colonizers. It'sassault was directed right at the heart of colonial judiciary, the professed 'righteousness' of legal system which wasoffered to the colonial subjects as the cornerstone of British enlightenment. Upendranath's depiction of a British/European magistrate, a protector of law, a white man as a rapist, infuriated the colonial administrators, particularly the colonial judicial authorities.

A few years before when a small group of amateur performers associated with National Theatre resolved to perform Dinabandhu Mitra's *Nil Darpanon* the evening of 21st December 1872, it stirred public opinion of colonial Calcutta, both for and against the production. Though the earliest edition of *Nil Darpan* was published from Dhaka in 1860, it started drawing wider public attention only when an English translation of the play appeared during May 1861. On 6th June 1861 Land Holders and Commercial Association of India, a consortium of European planters operating under the British East India Company registered a legal suit in the Supreme Court of Calcutta against C.H. Manuel, publisher of *Indigo Planting Mirror* [translated version of *Nil Darpan*]. Interestingly, the case was registered only against the publisher and not against the author. On examining Manuel, the publisher, the name of Reverend James Long, an Irish Jesuit missionary surfaced as the principal architect in the controversy. Manuel was discharged on submitting a written confession with a penalty of rupees ten on 19th July, the same day on which began the trial of Long. From that time Long became

the face of popular resistance against the oppressive indigo planters in Bengal. James Long's trial and imprisonment began an acrimonious battle of words between the prominent English news dailies of Calcutta led by *The Englishmen* and *The Harkurra* and nativedailies like *Indian Mirror and The Bengallee.* In such a scenario the approval of colonial administration for the performance of this 'seditious' and 'subversive' play provoked scathing and sharp responses from English press. In its editorial dated 20th December 1872 *The Englishman* reminded the colonial government about its 'suspicious' role in the litigation involving Indigo Planters and Reverend James Long. The report also emphasized on the necessity to install a series of mechanism to appropriately "censor" plays which appear provocative, subversive and radical (Kundu 257):

Considering that Rev. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for libel on Europeans it seems strange that the Government should allow its [*Nil Darpan's*] representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor, and the libelous parts been excised" (ibid 257).

The Englishmen editorial, published barely two months since the establishment of Bengal's first professional theatre company, is significant for two reasons - (i) it heralded the possibility of enactment of stringent censorship law which was ultimately realized through the enactment of Dramatic Performances Control Act (1876) and (ii) an increased surveillance on the performances of vernacular theatre apparatus of the natives by the colonial state. In hindsight, it may also appear to be profoundly ironical that the genealogy of theatre censorship in British-India coincided with the inception of public theatre, a self reliant theatre, free from the patronage of the gentry. Since *The Englishmen* was a veritable mouthpiece of the colonial government, and the most prejudiced among the English language news dailiesof the empire, it openly suggested that a 'free theatre' might ultimately prove to be detrimental to the interest of the colonial government. On 29th February 1876 Lord Northbrooke, the Viceroy of British-India, issued an ordinance from his summer abode in Shimla which provided extraordinary powers to the Government of Bengal for controlling dramatic performances within the province. The fact that such ordinances were issued from the Office of the Viceroy only as an 'emergency measure' under the provision of Government of India Act of 1858 suggest the anxiety of the colonial government about the growing influence of native public theatre apparatus.

It was issued by Northbrooke after a special representation submitted by the Government of Bengal for a legal instrument for prohibiting dramatic performances, which were deemed to be "scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest" (Kundu 347).The day on which the Viceregal ordinance came into force, i.e. on 1st of March, *Indian Mirror* news paper congratulated the colonial government,

All honour to Lord Northbrooke for the prompt action taken by him to uphold the cause of public morality and decency (ibid 347).

Two days after the issuance of the Viceregal ordinance, on the evening of 1st of March 1876, National Theatre launched its latest farce titled *The Police of Pig and Sheep*, this time targeting Sir Stuart Hogg, the Commissioner of Calcutta Police and Mr. Lamb, Superintendent of Police. One could hardly miss the resemblance of the species of animal referred to in the title of the play with the surname of Deputy Commissioner and Superintendent of Calcutta Police. Between the first few months of 1873 to early 1876 the functionaries of Bengali public theatre wrote and performed a series of farces targeting colonial officials and administrators. A good number of these farces ridiculed colonial law and judicial system, including the judges. The earliest play of this type is Dinabandhu Mitra's *Kude Gorur Vinna Goth* (1861) which he wrote soon after the jail verdict of Reverend James Long satirizing the conduct of Mordant Wales during the court proceedings. On numerous other instances judicial luminaries were targeted in ridiculed through comical representation in farces and pantomimes. In a secret report prepared by the Detective Department of Calcutta Police on Mitra's *Sadhabar Ekadashi* alleges that:

The character of Kenaram, a Deputy Magistrate, who is termed by the author 'Ghatiram Deputy' appears to be an attack on the selection by the Government men for the executive service which is chiefly filled up by men of high qualifications, strong character and good social status (Kar 135).

Another short satirical play titled *Gajadananda O Jubaraj* (1875) scripted on the occasion of the arrival of Prince of Wales to Calcutta troubled the colonial administration the most. During this visit, Prince Edward was honoured by Jagadananda Mukherjee, a High Court lawyer and reportedly introduced to the women in the *zenana* [a taboo among the high class/caste Hindus] which was widely publicized and ridiculed by a section of the vernacular native press. Upandranath Das wrote a farce on the controversy

and a few songs were added to it by Girish Chandra Ghosh. On 19th February 1876, National Theatre announced the performance of the farce through an advertisement in local newspapers -

Great National Theatre

This Evening Saturday 19th February 1876.

For the last time SAROJINI.

To conclude with the Farce GOJADANANDA AND THE PRINCE!

Come ye men of the long robe (Kundu 346)

Reportedly, the farce/pantomime had a brief song-sequence set at the backdrop of the High Court of Calcutta during which a character called Belbabuused to sing -

> "Ore Judge hote chao, Gajagiridhan?" (Kundu 345)
> [Do you want to be a Judge, O Gajagiridhan? (my translation)]

The reference here is to Gajadananda, [a name which is suggestive of a ridiculous person in chap books and popular Bengali literature] who is projected as a sycophant in the play. However, the performance had to be stopped midway on that evening because of the intervention from city police. Exactly one week later on 23rd of February it was scheduled to be performed once again under a different title - *Hanuman Charitra.* In this slightly revised version the character of Prince of Wales was transformed to Aurangzebe's Son and Gajadananda became Hanuman. But the police raid continued that evening as well andthe production was disrupted. Whereas, the colonial administration looked determined not to allow a single production of this play in city theatre halls, certain secret performances were organized, especially in response to its appeal among spectators. However, in order to deceive the administration, the title of the play was frequently changed. For example, on 26th February an English newspaper reported about yet another production of the play in the city - "*Hanoomana Charitra* will be presented for the second time by request of many persons who had not the opportunity of seeing it last Wednesday" (ibid 346). Most importantly, at the end of the performance on that evening Upandranath Das delivered a fiery speech criticizing recent instance of repression on public theatre by the city police.

On the evening of 1st of March, the Deputy Commissioner and Superintendent of Calcutta Police visited the premises of Great National Theatre and handed over a copy of Viceroy's ordinance to Amritlal Bose,

the manager of the company. Instructions were given to him to stop all performances of *Gajadananda* [alternatively *Hanuman Charitra*], *The Police of Pig and Sheep* and similar other farcical productions which were libelous and obscene (Kundu 347). Records suggest that performances of *Gajadananda O Jubaraj* and *The Police of Pig and Sheep* were stopped suspended by National Theatre immediately after the receipt of the notification. It was apparent that the Bengali public theatre apparatus had become the object of increased surveillance by colonial administration for its provocative plays. Three days after the notification, on 4th of March 1876, ten members of National Theatre Company were arrested during a sudden crackdown in the theatre hall during an ongoing performance.

Contrary to popular expectation, native public opinion on this clamp down on the theatre apparatus was not unanimously sympathetic. Certain native vernacular news paperswhich maintained a disapproving stance about the farcical and satirical productions of National Theatre openly supported the crackdown on National Theatre. As early as on 25th January, 1873 *The Bengallee,* which is generally believed to be a pro-colonized news paper, published a review on Dinabandhu Mitra's *Sadhabar Ekadashi* in which the play was condemned for being "excessively vulgar". The report also revealed the reaction of a certain section within the "native gentlemen" who found its production encroaching "too much upon the borders of decency" and not catering to "refined taste and manners" (Kundu 262). Especially, the pro-colonizer faction within the Bengali intelligentsia was rather unhappy about the harsh criticism and ridicule to which the colonial judiciary was subjected by native theatre practitioners. A report published in Indian Daily News on 27th February described *Gajadananda O Jubaraj* as a play promoting "ignoble sensibility" (ibid 346). It further added on a warning note that the government was manufacturing "a club" to thrash such plays and productions (ibid 346). Such reports in the leading news dailies suggestthat a section among the colonized natives could not only foresee but fancied the possibility of stringent anti-theatre law.

On 20th March 1876, the Dramatic Performances Control Bill was presented before a select committee of four members from the Legislative Council of Bengal - Mr. Cockrel, Raja Narendra Krishna Deb Bahadur, Sir Alexander Arbuthnot and Mr. Hobhouse. While introducing the bill to his fellow members Mr. Hobbhouse made an eloquent speech emphasizing on the necessity of a powerful legal provisions to effectively tackle the growing

menace of what he termed as "scandalous and defamatory" plays (Dasgupta 192). He also informed that the colonial government was contemplating to enact a separate law to censor scandalous plays which has done considerable damage to the reputation of Her Majesty's government.The members"agreed unanimously that the Bill should be passed" and then it was "placed before the Legislative Council for final debates" (ibid 193). A gazette notification announcing the enactment of Dramatic Performances Control Act was issued on 25th March 1876.

On 16th December 1876 Dramatic Performance Control Act came into force. The colonial government was aware of the lacunas in the existing legal framework which were used by the native theatre practitioners to escape conviction. For long the Imperial Government maintained a sympathetic attitude towards the private native theatre, complementing its growth but the inception of a vibrant public theatre shook the very foundations of its colonialist regime. The *Surendra-Benodini* case, however, where the prime accused were released by the court because of the absence substantive evidence, marked a paradigmatic shift in the approach of the government. Taking a clue of from this debacle the colonizers focused on enacting a comprehensive law for curbing radical tendencies within 'native' theatre. Dramatic Performance Control Act provided sweeping powers to the authorities to search theatre halls, seize goods and artifacts or arrest individuals associated with theatre performances if it deemed any "Public dramatic performance" to be "scandalous, defamatory, seditious or obscene" (Kar 80). It had the provision to summon "author, proprietor or printers" of a drama or "the owner or occupier" of a place in which a play "is intended to be performed" for "ascertaining the character" of any play/production (ibid 80).

Ironically, however, theday on which the Dramatic Performances Bill was placed before Legislative Council, the Bengal government lost the controversial Surendra-Binodini case. A fresh verdict was delivered in this case by the High Court of Calcutta whereby both Upendranath Das and Amritlal Bosewere released from imprisonment. The release of the functionaries of popular theatre from British prison coincided with the passage of a draconian law. The morale of the artists of National Theatre was seriously shaken by this incident and the company ceased to exist after a year.

It may not be erroneous to conclude that opinion of the citizens, outside the orbit of public theatre, was favourable for the passage of powerful enactment and they largely viewed the ordinance as a consequence for the performance of seditious and provocative plays. However, petitions and memoranda were drafted criticizing the Viceregal ordinance of March 1876 as well as the Dramatic Performances Control Act both of which were applied in a heavy handedmanner by the colonial government. One such petition drafted by a few prominent citizens of Calcutta mentioned that,

"the Ordinance of February 29th 1876, was an exercise of extraordinary powers of the Viceroy not called for by the exigencies of the case, and that the production of a single farce condemned by the general sense of the community, on the boards of a single theatre in one of the Presidency Towns, does not justify the introduction of a stringent measure regulating the stage throughout British India" (Kundu 350).

During the next few years a series of protests were organized and number of petitions were drafted and submitted to the government requesting withdrawal of the Dramatic Performance Control Act but the colonial administration was not in a mood to relent. As far as censorship of 'native' theatrical performances/productions and dramatic literatures is concerned the colonial administrative reaction can be broadly distinguished into the following categories - (i) partial/ complete censorship of plays on ground of inciting 'hatred' or 'prejudice' among different sections within society; (ii) partial/ complete censorship of plays for articulating 'libelous' comments against government officials and administrative authorities (iii) partial/ complete censorship of plays for criticizing, ridiculing, vilifying or portraying them in poor light (iv) partial/ complete censorship of plays for igniting anti-government feelings through 'fabrication' of facts and history. Whereas frequent tortures and repression unleashed on 'native' theatre patrons, performers and producers in the form of arrest, detention, trial, imprisonment and imposition of penalty were the standard procedural action of the colonial state's 'Repressive Apparatus', in most occasions proscriptive and prohibitory notifications used to be justified by upholding the 'sanctity' of juridical framework, the power of the state or the law. On most occasions, however, the dramatic literatures seized as well as productions banned were touted to be "detrimental and harmful to public morality" (Kar 40-41).Such protestations for public 'morality' and public 'good' were a part of strategy

of the colonial authority to garner approval of that section of the colonial subjects which had complicity in furthering the hegemonic interest of the rulers. Equally important was the task to convince the colonized subjects of the British Crown about the objectivity, impartiality and superiority of British juridical system. In both cases, however, the subtle operation of the Ideological Apparatus of the colonial governance remains apparent. An even more significant dimension of Althusser's proposition vis-à-vis 'Ideological State Apparatus' is that though the colonial state acted mostly "by repression" but "ultimately…this [was] very attenuated and concealed, even symbolic" (Althusser 19). The attenuated or symbolic dimensions of the Ideological Apparatus of the colonial state were revealed in numerous gazette notifications and press releases where the subversive strategies of the adversary were depicted as "a tendency to bring hatred and contempt towards His Majesty or the Government established by law in British India" (Kar 224). The first phase of Bengali political theatre effectively came to an endwith the enforcement of Dramatic Performance Control Act and the methodology of protest theatre significantly transformed in the province during the next few decades. "[P]oliticaland social protest was forced underground" observes theatre historian Darren Zook, "Indian producers had to pass it off [i.e. political contents in their plays] under the thinly veiled guise of historical and mythological subject matter" (Zook 178).

Reference:

Althussar, Louis. *On Ideology.* London: Verso, 2008 (1971)

Dasgupta, Hemendra Nath. *The Indian Stage.* Calcutta: Metropolitan Printing and Publishing House, 1934

Kar, Sisir. 2009 (1988). *British Shashane Bajeyapta Bangla Boi.* Kolkata: Ananda Publishers.

Kundu, Brindaban Chandra. *Bangla Theaterer Potobhumi, Prothistha Ebong Bikash.* Vol.1. Kolkata: Abhishikta Publication, 2008.

Zook. Darren C. "The Farcical Mosaic: The Changing Masks of Political Theatre in Contemporary India" *Asian Theatre Journal.* 18.2 Autumn 2001: 174-99. https://muse.jhu.edu/article/3224/summary

---

Dr. Sib Sankar Majumder is Assistant Professor in the Department of English, Assam University, Silchar. **Dr. Arzuman Ara** is Assistant professor of ELT in the English and Foreign Languages University, Shillong Campus.

Approximating the 'Real' in life and Reality initiating a Theoretical Comparison between Theatre and the Comic Strip

Archita Gupta

Abstract

This paper attempts at analyzing the representation of action through visual and performative codes in the texts of comic strip and performance in theatre and thus, initiates a comparison between the two. The presumption that art imitates life/ reality triggers the question as to how far visual representation through action in theatre as well as in comic strips approximate/re-present the 'real'-the real of reality being impossible to achieve and every effort of representation in art such as that of theatre and comic stripbeing approximation in terms of Aristotelian mimesis. This paper, however does not attempt to investigate 'the real' in terms of critical or spiritual/ classical perspectives, but in terms of the 'action/the performative' technicalities employed in theatre and comic strip. The representation of 'real life' by means of live performance in theatreand the illustration in comic strip has the basic difference of moving/dynamic and fixed attributions respectively.Comic strip illustration however allows varied scope/dimension for representing the world. If viewed from the perspective of the division of high art and low/popular art the 'written' drama categorized as high art, does not possess the visual,action or performative qualities as it does when staged as theatre that is generally viewed as a popular art form and this attribute brings comic strips closer to theatre in terms of represented action. The visual and action coded in the performance triggers response from audience who in turn fill the gaps and this theatrical encoding differentiates such texts from literary non-illustrative texts.

'Sequential Art', the term used by Will Eisner (Eisner,1990) for comics hints at the dramatic elements in comic strips or comics. The individual strip as well as strips in a sequence of panels involves action and visual and the story/plot progresses through and across the panels. To consider comic strips/comics therefore, only as printed or ecriture would be erroneous. Comic medium is more akin to theatre and film medium than it is to the photographic image. Using Barthes' analogies in "The Rhetoric of Image", one can see that while photographic reality involves an awareness of having been there, or "the stupefying evidence of this is how it was, giving us, by a

precious miracle of reality from which we are sheltered",(23)the dramatic element or the progress in action is constituted by the 'de-stilling' of the images through the continuity of images in the comic medium. Just as the photographic image is related to a pure spectatorial consciousness, the film medium depends on "a more projective, more `magical` fictional consciousness(ibid).The film medium consequently involves an awareness of 'being there' rather than 'having been there'. The photograph can at best represent a flat anthropological fact. The film on the other hand, with its present continuous narratives can establish links and therefore construct a story. This theoretical postulation can be extended with equal applicability to the medium of theatre which by its nature of performance is dynamic and ever-evolving and has a close parallel to the comic strip. Within its own limitation of space and constraints of the medium, comic strips achieves a 'de-stilling' that distances it from the literary text (sans illustration or images) and brings it in closer proximity to theatre. That is to say the action that is represented through performance on the theatre stage is to a great extent approximated in the comic strip medium through its panels. Moreover, from the perspective of the division of high art and low/popular art the 'written' literary text of a drama categorized as high art, does not possess the visual,action or performative qualities as it does when staged as theatre which is generally viewed as a popular art form and this attribute brings comic strips closer to theatre in terms of represented action.

However, different 'texts' involve distinct textual elements. Theatre as performance is a live (on stage) combination ofatleast two different levels of performance:

1) Vocalics: dialogue, language, that is heard
 and,
2) Kinesics: body language, action, that is seen live on stage.

Literary text has the narrative language (vocalics coded in written language) but in the absence of illustration the action (kinesics) has to be imagined/ visualized by the reader. And this is the limitation of a written text, and even of the text of a drama that is not performed. On the other hand comic strip is a combination of :

1) Language, dialogue, narration in speech bubble (vocalics coded in written language)
 and,
2) Action that is visible/ represented in illustration/images (Kinesics coded in illustration)

Therefore, comic strips have a dimension of performance in illustration (non-live) that is in addition to the literary text meant for reading only and this brings it closer to theatre. However, if reading- viewing duality by the reader as triggered by comic strips is taken into consideration, then the notion of viewing the illustration in a comic strip medium simulates a virtual audience-like perception analogous to the audience of a live theatre performance. This is the mainstay of this paper and the hypothesis on which the argument made henceforth is constructed. This paper argues that in representation of reality in terms of 'action' represented or performed, comic strips come closer to theater. This becomes further evident in the praxis of selected panels from two popular vernacular Bengali comic stripsNante Fante and Handa Bhonda.

The following panels show vocalic/ language and action/kinesics coded respectively in the text- image combination of the comic strip panel. The display of kinesics or action presents the scene in a manner that is almost similar to theatre despite the constraints of the medium. In live performance of theatre these two panels detailing the performance, however, could have been clubbed together in a single unfragmented scene. This fragmentation that leads to a detailed sequential break-up of the kinesics+ vocalics model in a comic strip is what also separates it from the live theatre. However, each medium has its own advantages too. In comics or comic strips the reader/ viewer has the liberty to go back to the previous panels, whereas in theatre, the dynamic / continuous representation through scenes does not permit the same to the audience unless the scene, in parts or as a whole is repeated. Here the reader should be reminded that the film medium does have the facility of playback. Moreover, the decoding process and the audience responseare immediate in live performance of the theater, but in case of films, they are delayed, since the shooting (which is the only live aspect of film making), production, post-production, editing and then screening of a film distances it from the live reality that it represents. However, comicstripsand theatre vary in their ways of narration or storytelling. Comics tell a story from panel to panel and thus previous actions can be viewed next to the future ones on the same page. Moreover two actions happening in very different places can be shown as happening in adjacent panels But that is not possible in the performance of theatre, since in all its dynamicity and on stage improvisations, as well the unpredictable element of any performance, the future in a theatrical narration is uncertain as is in reality unless foretold, and if the unities of time, place and action are to be conformed with. Thus comic strips can take liberty with the concept of time, place and action which theatre, unless experimental, cannot execute:

Debnath, Narayan. Nante Fante La-jabab, Kolkata: Patra Bharati 2002.

The close-up sequence similar to film technique (that is not available inherently in theatre) has been aptly utilised in the above panel. Theatre is a live performance with the characters present on stage at any given point of time.The representation of an action with close up in the middle panel is akin to film-medium. Theatre cannot provide the choice of visual perspectives of a close-up, zoom-in or zoom-out to its audience. While viewing a play, the perspective of the viewer is defined by his/her sitting position in the auditorium. Nothing can change that, short of changing one's seat. Thus theatre always shows a zoomed out, frontal view of the scene, with all the people of the scene simultaneously in perspective. However, both film and comicstrip can facilitate this to the audience through the medium of the camera or the illustrator's perspective as reflected in the panel of the comic strip. Even if there are multiple characters present in a film scene or a comic strip panel, the frame (whether it's a panel or a screen) can focus on a single one of them by these afore mentioned techniques. The perspective need not only be frontal, but can also be lateral or top down. This is a feature that the theater in its pure form (not multi-media or mixed-media experimentation in theatre) cannot afford. The use of light/ illumination on stage can at best emphasise a character but cannot facilitate close-up.

The vocalics and kinesics, although coded in the still frame of a comic strip provide enough space for audience to participate and decode the action in a manner similar to live theatre.

The above panels, if enacted in a theatre performance would require a single scene to depict the action. The interesting fact about the action represented in these three panels is that the kinesics can convey the meaning even if the vocalics is omitted and this is true for both comic strips and

theatre. Infact, there is a separate sub-genre of theatre known as pantomime or mime that categorises the absence of vocalics. This implies that the audience decodes the visual representations more easily as these are made of signs analogous to comic strip iconography, embedded in the social and cultural structure.

This logically substantiates the hypothesis of this paper that comic strip is an in-between state between conventional non-illustrated literary text and theatre and is closer to theatre in its codification of vocalics (Language, dialogue, narration in speech bubble) and kinesics (action, body language) and also comes closer to the 'real' of reality and life. This contributes to the notion of theatricality and theatrical elements in comics in a realistic physical sense of dual depiction (image + speech bubble/ relay text+ anchorage text). Moreover the added codification through iconography in comics almost functions like a theater prop where the object codifies the action and intention.

The aspect of stage setting (physical, material context) in theatre is also analogous to the depiction of the context interms of the illustration of the background in a comic strip. The front cover of 'Senapati Ray Kachag', a comic book from Tripura by Alak Dasgupta conveys the space as well as the time through the representation of iconic signs and approximates the stage setting of theatre. The image shows Ray Kachag in action in a setting with Mata Tripureshwari in the background clearly representing the space - the then capital Rangamatia of Tripura. An uprooted tooth of the enemy whom he was encountering has been shown in the speech bubble showing Ray Kachag's extreme physical prowess and strength.

This codification brings out the humour associated with comics genre. This also is a kinesics that could have been performed in theatre, but would

Debnath, Narayan. Nante Fante ki Ananda Kolkata : Patra Bharati. 2005

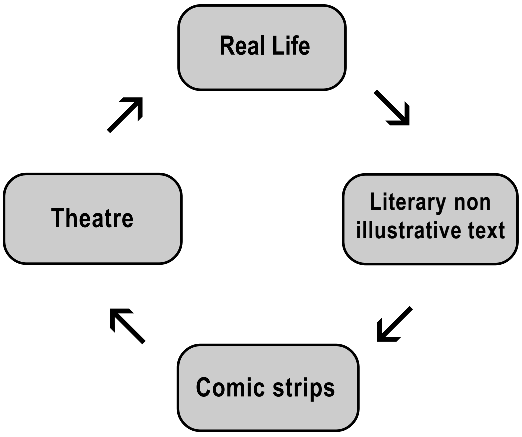

get diluted in the extra-explicatory description in a conventional literary text that does not have the visual element.

Infact the proposition of this paper can be appropriately represented through a diagram that shows how, in their imitating and coming closer to the 'real' in life and reality and in their perennial pursuit of approximating life, various textual mediums including, in a clockwise direction, the non-illustrated literary text, the comic strip and the theatre are sequentially arranged, with the theatre as a live performance being closest in its representation of the 'real' in life and reality and the non-illustrated literary text being the farthest. Comic strip as a medium comes closer to theatre in its image-text combine model of depiction analogous to the kinesics- vocalic model of performance in theatre.

This circular pattern represents how notion of kinesics (action/body language) which is complete in real life and is real/true, gets represented across different mediums in ascending proportion of representation as the arrow tip indicates. This is lowestin non-illustrative literary texts in comparison to comicstrips,since the former has no illustration (no kinesics and only vocalics in terms of language). Comics on the other hand have an almost performative representation (Kinesics i.e. performance/action/body language depicted in illustration + vocalic i.e. language positioned in the speech bubble). The highest is in theatre (Kinesics + vocalic represented/ performed on stage). The pattern is circular since the reality of action is in real life. Comic strip is closer to theatre in this aspect of representation.However theatre is live, it is the present moment on stage

frame, it is flitting and dynamic. But comics are created and handed over for consumption in a post-creation time frame. The reader/ viewer reads comics after a time gap and has delayed responses as in a film. Same is true for a non-illustrative literary text.In theater the response of the audience to the performance is immediate.

WORKS CITED

Barthes,Roland. "The Rhetoric of Image" Studying Culture:An Introductory Reader. Edward Arnold. 1993.16-30.Print.

Dasgupta, Alak. Senapati Ray Kachag . Agartala: Bhasa, 2003.Print.

Debnath, Narayan.Nante Fante Collection .vol.7.8.9, Kolkata: Patra Bharati. 1998.Print

Nante Fante Collection .6 Kolkata: Patra Bharati. 1999.Print.

Nante Fante Collection .7 Kolkata: Patra Bharati. 2000.Print.

Nante Fante Collection .8 Kolkata: Patra Bharati. 2000.Print.

Nante Fante La-jabab, Kolkata: Patra Bharati 2002.Print.

Best of Nante Fante Kolkata: Patra Bharati .2002. Print

Nante Fante banam Keltuda. Kolkata: Patra Bharati .2007. Print.

Nante Fante ki Ananda Kolkata: Patra Bharati .2005. Print.

Handa Bhondar Kandakarkhana 10-12. Kolkata: DebSahitya Kutir. 1995.Print

Handa Bhondar Kandakarkhana 13-15. Kolkata: DebSahitya Kutir. 1995. Print

Eisner,Will. Comics and Sequential Art.United States: Poorhouse Press, 1990. Print.

Archita Gupta is a Post Graduate Teacher in English. She has done her Ph.D from Tripura University. Her areas of interest include popular literature, translation, cultural studies, performing Arts, Folk Culture of Tripura, etc.

Vaishnav Natya of Manipur: An Overview

Smt. Yumlembam Theba Devi
Shri H. Nanikumar Singha

Introduction

The Manipuri V*aishnav Natya* (theatre), an indispensable part of the lives of the Vaishnavite Meiteis, evolved with the advent of the Chaitanya school of Vaishnavism in the valley of Manipur. Due to adoption of the new faith during the 1800 CE, a cultural shift occurred which bestowed the development of numerous *Vaishnav natya* forms with significance of religious worship and ceremony. These art forms are based on the Vaishnavite philosophy, blended with the pre-Vaishnavite indigenous traditional essences like *Lai-haraoba. Lai-haraoba* is a well structured and preserved religious traditional theatre form which is celebrated by the Meitei community since time immemorial. This living theatre is performed both by the Vaishnavite as well as the non-Vaishnavite Meitei. The *Vaishnav natya* of Manipur has neatly woven dance and music, which is an integral aspect of natya performances as illustrated by Bharata Muni unlike Western theatre. It is a form of worship with *bhakti* (devotion) being the main aspect, which the Vaishnavite devotees trace the origin to the philosophy of various old scriptures including the *Shrimad Bhagavat.* Sri Rupa Goswami's Sanskrit works, *Bhakti-Rasmrita-Sindhu* and *Ujjavala Nilamani* also further strengthened the concept of *bhakti* in the Bengal school of Vaishnavism. Hence, the Vaishnav devotees consider the *Vaishnav natya* (religious theatre) as a manifestation of God and a medium of achieving *moksha* (salvation) in the *Kaliyuga.*

Historical Background

The seed of *Vaishnav natya* was in fact sown during the reign of King Kiyamba (1467-1508 CE) with the introduction of Kirtana singing and Vishnu worship in the valley of Manipur. Hinduism was formally adopted by the people of Manipur as King Garibniwaz (1709-1748 CE) accepted Hinduism as his personal religion. He undertook several measures to popularize the new faith by introducing many cultural *loishangs* (institutions) for dance, music and literature, and established *Bangadesh Pala* also known as *Ariba Pala*, the earliest Sankirtana in Manipur, as the main ritualistic

means of worship. During the reign of King Jai Singh (1763-1798 CE), popularly known as Rajarshi Bhagyachandra, the Chaitanya or Gaudiya school of Vaishnavism emerged as the religion of the state which led to the most creative period in the cultural history of Manipur. He introduced a new style of Kirtana singing known as Nata-Sankirtana with stylized movements and patterns, based on the Vaishnavite faith and coloured with the indigenous Manipuri tradition. In 1779 CE, *Maharaas Leela* was composed and offered to Shree Govindaji at Chanchipur in a five-day long festival. Since then the roots of Gaudiya Vaishnav philosophy has percolated deep into the rich cultural soil of Manipur resulting in the emergence of numerous Vaishnav natya (theatre) forms based on the theme of the Hindu *Puranas.* It is pertinent to mention here that while creating the Vaishnav art forms, the several centuries old indigenous Meitei folk elements remained the base of the newly introduced philosophy; and there was amalgamation of the two transformed unique art forms, which also became the social norm of the Vaishnav people of Manipur. Theatre, being an effective way of communication with the masses, was patronized by the King. The Hindu *puranas* were adapted to the medium of *natya* based art forms which were employed as a means of propagating religious messages.

Characteristics and Kinds of Vaishnav Natya

According to the Gaudiya Vaishnav tradition of Manipur, the devotees (*bhakta*) imagine the performance of *Vaishnav natya* like Nata-Sankirtana to be the same as the Sankirtana performed by Sri Chaitanya Mahaprabhu and his followers in Nabadwip. Hence the performance area (*mandap*), the performers known as *natas*, and the devotees or *bhaktas* develop an intricate symbolic spiritual relationship transforming them to the spiritual eternity of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Nabadwip and Brindavan of Sri Radha Krishna including the Gopa and the Gopis. Thus, the well-trained performers and the audience having knowledge of Gaudiya Vaishnavism become participants of Sri Chaitanya's imagination (Gouranga Bhavi) of Sri Radha Krishna's *leela.* Certain rituals prior to the performance such as worship of the flag (Chhattra-puja), performance area (Mandali-puja), and musical instruments (Yantra-puja) are performed. Shri E. Nilkanta Singh, a well-known scholar says:

> The Manipuri musician singing Kirtana is called Nata - a classical term in Sanskrit, meaning that the person who knows the four

> abhinayas and different types of Natya gets himself merged in the rasa which he is trying to portray and appears physically on the stage as a dancer with songs on the lips.

Several local scholars of Manipur opine that the Sankirtana of Manipur represents an extension of Leela-Kirtana of Thakur Narottam Das of Bengal singing *Goura-chandrika* (glory of Sri Chaitanya) which serves as prologue (*purvaranga*) to each Sankirtana. The performance follows the sequence of *Raga Sanchar, Goura-Chandrika, Mel, Tanchup, Menkup* and *Vijay*. The storyline is the re-enactment of the Radha-Krishna Leela through *bhakti* (devotion) and the imagination of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Shri N. Premchand, a well-known theatre director says:

> Nata-Sankirtana is a drama which enacts non-realistically the lilas of Shri Krishna by using a medium growing out of the creative fusion of dance, vocal music and instrumental music produced by Kartal (cymbal), Poong (drum) and Moibung (conch). It is also a Sadhana having no scope of exhibitionism. The essence or bhava is given maximum emphasis and it is realized through an abstract and non-realistic presentation.

Nata-Sankirtana of Manipur is an essential part of the religious rituals including the life cycle ceremonies from birth to death, inauguration of temples, ponds and houses; annual festive occasions like *Saraswati Puja, Holi* or *Yaoshang, Basanti Puja, Ratha Yatra* or *Kang, Jhulon Jatra, Krishnastami* or *Krishna-janma, Radhastami or Radha-Janma, Baman-Janma, Durga Puja, Kali Puja and Vishakarma Puja, etc.*

Nata-sankirtana encompasses *Vaishnavite natya* (drama) like the Raas Leelas; has several forms which have emerged as branches or associate enactments to the classical theme of Raas Leela. With the spread of the practices and principles of Vaishnavism in different areas, the *leelas* of Lord Krishna and Gouranga Mahaprabhu as a child, and their achievements, miraculous deeds and pranks all became educative experiences for the Vaishnav community irrespective of age, i.e., ranging from the young to the old.

Raas Leelas are based on the legends of Radha Krishna with emphasis on *prema-bhakti* (pure love and devotion). Maha Raas performed following the sequence as mentioned in *Srimad Bhagavata's* Ras Panchayadhyay, includes dance and music idioms bringing out the emotions, sentiments and

subtle *abhinaya* (expression). According to Manipuri traditions, the scholars have divided Manipuri Raas into five kinds such as (i) Maha Raas, (ii) Kunja Raaas, (iii) Basanta Raas, (iv) Nitya Raas, and (v) Diba Raas. Each one is performed according to the seasons. King Bhagyachandra (1763-1798) created three Raas leelas such as - Maha Raas based on Ras Panchadhyay of *Srimad Bhagavatam*; Kunja Raas based on *Govindaleelamritam,* and Basanta Raas based on *Brahmavaivarta Purana, Gita Govinda, Padakalpataru, Sangeet Madhav* and *Rasullasatantra.* Nitya Raas, developed by King Chandrakriti (1850-1886) and Diba Raas, introduced during the period of King Churachand (1891-1941) were based on *Govindaleelamritam.*

Gostha Leela, popularly known as 'Sansenba' and 'Udukhol', are Vaishnav Natya based on the *Srimad Bhagavata* purana (10th *skanda*) showcasing the childhood pranks and games of Krishna and Balarama along with the gopas, and love of their parents. Gostha Leela is performed annually at the Govindajee temple and also other temples of Manipur. The temple episode revolves around the childhood pranks and games of Krishna and Balarama and their initiation into cow tending. The second part of the Gostha Leela is performed in the open space and the episode includes the enactment of killing of two evil demons, Dhenukasur (bull) and Bakasur (giant crane) by Balarama and Krishna. Udukhol, popularly known as Balya Leela is one of the recent *Vaishnavite natya* forms of Manipur. It portrays episodes like marriage of Devaki and Vasudeva, birth of Krishna in the jail, His departure to Nandagram, killing of demons - Putana and Trinavarta, Surya-puja and uprooting of Udukhal trees. The role of Krishna, Balarama and the Sakhas are played by children; they are trained in dance, vocal music and abhinaya.

Goura Leela, depicting the life history of Shri Gouranga Mahaprabhu, who is regarded as an incarnation of Lord Vishnu in Kaliyuga, is performed in the mandap of temples or erected pavilion generally in *Shumang* (courtyard). The Goura Leela may be performed on any auspicious day. The performance of Goura Leela begins with the *Nata-Sankirtana* of Nipa Macha Pala (young boys), Gourachandrika, and the major episodes are *Brahma Mohan, Prabhu Janma, Ganga Snan, Sukriti Brahman Udhar, Balya Leela, Bol Bikram, Nityananda Balya Leela, Kazi Udhar, Digvijaya Pandit, Jagai Madhai Udhar, Hi-lanba, Prabhu sam kokpa, Sachi Bilap, Advaita Bhojan, Sarbabhouma sangga, Samudra Poton, etc.*

Conclusion

Vaishnav Natya of Manipur is an integral part of the life of the Manipuri Vaishnavites. It has been inextricably woven into their social life strengthening the social relationship between the individual and the community. These religious theatres, initially patronized by the royal court, percolated deeply into the socio-religious system, and became indispensible part of the religious observances marking the various stages of the lives of the people and the festive occasions round the year. The cultural history of Manipur is an account of the socio-cultural system of a group of people who have a rich cultural tradition since ancient times. The religious syncretism which occurred during the 1800 CE has transformed the unique cultural expression of the State today.

Bibliography

English

Singh, Elangbam Nilakanta. Aspects of Indian Culture. Imphal: Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy, Imphal, 1982.

Singh, Kirti M. Religious Development in Manipur in the 18th &19th Century. Imphal, 1980.

Singh, R.K. Singhajit. Dances of India: Manipuri Series Edited by Alka Raghuvanshi. New

Delhi: Wisdom Tree C-209/1 Mayapuri Phase-II.

Vatsyayan, Kapila. Classical Indian Dance in Literature and the Art, 1st ed. New Delhi: Sangeet Natak Akademi, 1968

Vatsyayan, Kapila. Introduction to Dances of India: the Classical Tradition, Edited by Saryu Doshi, xiii. Bombay: Marg Publications, 1989

Kubui, Gangumei. History of Manipur Vol.1. Imphal, 1991

Singh, R.K. Jhaljit. A Short History of Manipur. IInd edition. Imphal, 1992

Premchand Nongthombam. Rituals and Performances

Manipuri

Devi, Chongtham Jamini. Shija Laioibi Amashung Maharas: An Analytical study of the Culture of Manipur. Imphal: Raipravina Brothers, Sagolband, Tera Bazar, 2006

Singh, L. Ibungahal and N. Khelchandra (ed). Cheitharol Kumbaba, Imphal, 1967

Devi, Yumlembam Gambhini. Basak. Imphal, 2012

Devi, Kumari Yumlembam Ranjana. Manipuri Nat Sankirtan. Imphal, 1983

Y. Theba Devi and **H. Nanikumar Singha** - Smt.Y. Theba Devi is a Ph.D Research Scholar in the Dept.of Manipur R.T. School of Indian Languages and Cultural Studies Assam University, Shri H. Nanikumar Singha is a Professor at the same Dept. Assam University.

'What Awful Women Are We'- Reading Establishment, and Violence Against Women in Selected Plays of Mahesh Elkunchwar

Sreetanwi Chakraborty

Abstract:

Violence against women remains rampant as one of the most alarming phenomena and a hindrance for any local, national, or international development. Drama and theatrical forms, on-stage presentations of the woman-question, and how they become the victims of violence are relevant themes that Indian playwrights and directors like Mahesh Elkunchwarhave experimented with. Along with stagecraft, presentation, setting, backdrop, dialogues, and props, street plays and stage drama in Indian have always highlighted the burning issues that women face in their homes or outside. The trajectory of gynocriticism and other segments of Indian and Western Feminist thoughts talk about radical changes that need to be brought around in the lives of women. Although there have been multiple state declarations and declarations that the United Nations made with reference to the women's condition over the world, it remains a bleak scenario in India. Extreme forms of torture, in physical or in cerebral forms get represented on stage, through production and performance.

Key Words: Violence, Women's Studies, Theatre, Indian Drama, Female

Introduction:

Indian theatre, Indian regional drama translated into English, and Indian play scripts chosen for stage enactment are fraught with multiple interpretations. The large trajectory of understanding violence depicted in Indian plays takes into consideration the social, ethical, religious, and political domains.These domains keep on alternating between hierarchies that the supreme sources of patriarchy have coined for the women to a large extent andhighlight sudden structures that are a result of resistance by women. Domestic violence, sentimental violence, violence in and out of marriage, and violence that is often inflicted by the self-we find different instances of violence among women that Mahesh Elkunchwar's plays highlight. The act

of violence as shown in the regional plays and in Indian English drama, all have subtle differences in terms of introducing experimental language and themes on stage. It is the fine work of the director to assimilate the sociological, cultural, and political background of the characters and give birth to an understanding of violence on stage. Aggression and violence are tendencies that are associated with the deeper, animalistic recesses of the human mind. Article 2 of the UN Declaration makes this clarification of what constitutes a list of violence against women, as the UNFPA report on Violence against Women: Forms and Manifestationssays:

'These acts include spousal battering, sexual abuse of female children, dowry-related violence, rape, including marital rape, and traditional practices harmful to women, such as female genital mutilation. They also include non-spousal violence, sexual harassment, and intimidation at work.' (International Centre for Research on Women (ICRW).

In South Asian literature, and Indian theatre and drama, we find new words that keep the victims suspended in the entire discourse of action, enactment, and even public responses which are some of the points where complications arise. With the changing role of Indian women, the dramatization of violence has also been taking newer forms and motifs, thus adding to an already-existing source of knowledge. As Kate Millet points out in her celebrated work Sexual Politics, there is always a power play, stature-division, and interpretation that goes on between a man and a woman is embedded in the family. For her, there is a crystal-clear distinction between power, politics, domesticity, and who ultimately wields power. As she says:

'Vicious, Patriarchal powers still have the military and financial means. Patriarchy is not only male domination of females but also a militaristic hierarchy among males.' (Millet:xxii)

The Indian theatrical scene:

In the large corpus of Indian theatre and plays, we find how violence takes manifold forms. Elkunchwar's plays like *Old Stone Mansion*, for instance, presents the establishment of the female hierarchy, along with rigidity and silent acts of violence in certain instances. Rigorous mental and psychological tortures, and human relationships bordering on negotiations are some of the instances that define the subtle characteristics of closeted violence. The politics of sustenance of the self, the politics of enacting violence on stage, and having repercussion among the audience is yet another factor that becomes important as an outcome of the study. In the foreword to Lucy

Nevitt's famous book *Theatre and Violence* Catherine Cusack says:

> 'It seems to me that drama is always had to reflect the violent forging of our world. And the refinement and changes in the presentation of that violence in theatre continue to keep pace with the kinds of violence we inflict upon one another. Whether it's subtle struggle within a family, dressed-up corporate violence or state-funded annihilation.' (Cusack: xii)

Therefore, drama as a composite form of art definitely has an indirect level of politics that has a tremendous effect on the masses. Street plays, Feminist plays on stage, bastions, and protocols that are created for the women and modulated as part of an existing hierarchy, all contribute to establishing a political image hidden in the man-woman binaries that the dramatists portray. Mahesh Elkunchwarand, his experimentation with stage themes, techniques, lights, props, and background all have instances of social, moral, political, religious, and emotional violence perpetrated on women. If there is a talk about democracy as part of the political or alternative forms of theatre, then that democracy and ideas of radicalism also spring forth from the home and hearth etched by these two dramatists. In the broader arena of Marathi theatre, along with other famous names like Satish Alekar, Vijay Tendulkar, and Shyam Manohar, Mahesh Elkunchwar also stands as one of the most impressive, modernist Marathi dramatists of his time. Almost all his heroines, Dolon, Subhadra, Garbo, Aruna, Lalita, and others watch the growth of violence under two paradigms: one, when they live inside claustrophobia, second when they want to get out of the politics of claustrophobia. For instance, in his play *Sonata*, which is about three female friends Aruna, Dolon, and Subhadra, the politics of domestic violence and psychological break-up are shown very effectively. In Act One, when Dolonand Aruna are having a tittle-tattle in their apartment and Subhadra arrives at the place, they notice that she is again hit black and blue by her partner. She tries to evade the topic but then the answer to Aruna's question 'What is the mark under the eye?' makes the concept of violence a part of a woman's routine life:

Aruna : What is that mark under the eye?
Subhadra : He hit me. Aur kya!
Dolon (gasps) : Again?
Subhadra : It's our routine, Sweeti Pie.
Dolon (delicately touching her under the eye) : Ma go!

Subhadra : I too gave him back…(Elkunchwar :264)
In this connection, if we consider a study of the tenets of Radical Feminism, then we shall see how it theorized the entire system of female oppression as very systematic, the position of the woman was systematically relegated to the background and the private sphere, whereas men exercised all the power in public life.

The Cultural Hegemony of Indian Politics:

In Elkunchwar's plays, the entire structure and the cultural hegemony of Indian politics, Indian socio-political fabric, and the quintessence of the Indian patriarchy are reflected in an often-dismal variation. In *Garbo,* another play by Elkunchwar, there are instances of constant alienation, a human crisis based on existential futility, murder and an inherent loveless world that has no solace to offer to the audience. Garbo in this play is a B-grade actress, whose relationship with the three men in the play raises several instances of violation. What are those types? One, that Garbo violates the sense of an ideal Indian woman and challenges and subverts the normative order of the society. Second, an act of violence occurs when she tells the three men about the abortion of the child growing in her womb. And third, the act of killing or murdering Garbo is used on stage as an act of violence. For all the three men in the play, Intuc, the college professor, Shrimant, the businessman, and Pansy, the art school dropout, Garbo was nothing but a woman whose physical wealth and vitality was waning slowly, and through her non-conformity to society's politics and rules, she became a deviant, a kind of social stigma. As she calls herself an unchaste yet vulnerable woman who fell for the tricks of the three men, she also raises an alarm at what filthy creatures these men are. When she asks an amount of ten thousand rupees to be given to her for her abortion, the three men threaten her that this is nothing short of blackmail. And then she answers:

> You miserable creature. How would you understand that? Do you want me to go to some back-alley quack to have my insides scraped out and die in the process? (Elkunchwar:37)

The lines show inhumanity, the despicable condition of the woman not just in Elkunchwar's play, but one who stands erect as a sole survivor and protester against the establishment of violence. The realist mode that Elkunchwar opts for, can stand not just for Garbo, Dolon or Subhadra, but it can mean any other woman in and out of the audience, who might have faced the same torturous instincts. We find there is a constant need for the

reorganization of agency and violence as establishments. When these establishments cannot be annihilated at all, then arises the theory of creating an alternative power structure through the female force in his plays. This bears a close resemblance to what Foucault says about torture, power, and knowledge in his book *The History of Sexuality*:

> To analyze the political investment of the body and the microphysics of power presupposes, therefore, that one abandons-where power is concerned- the violence-ideology opposition, the metaphor of property, the model of the contract or of conquest; that- where knowledge is concerned- one abandons the opposition between what is 'interested' and what is 'disinterested', the model of knowledge and the primacy of the subject. (Foucault :43)

In this connection, understanding the role of women in the plays of Elkunchwar corresponds with the larger social and familial plights of women on a large, realistic, and out-of-the-stage case.

Violence Within and Without Marriage: An Observation

Violence within and without marriage, violence as part of coercing a woman into a marital bond or fidelity get represented in terse words, often Elkunchwar's cynicism and scathing satire verging on the concept of national stability itself. The microcosmic realm of domestic violence is encrypted in different creative mechanisms on stage, through lights, channelization of dialogues, production, and arrangement of props, set designs, colour combinations and so on. The whole art of enactment often resultsin a cathartic effect and hence it is not just any artificial or synthetic dramatic mechanism that Elkunchwar presents on stage. For instance, Elkunchwar's play *Desire in the Rocks* is not about the perversion that is unfit for marriage, but it depicts the violence against a woman in a completely convoluted way. In it, the dramatist uses the sublime notions related to art, but there is also incest, socially-tabooed relationships and finally, violence that yields no better opportunity for anyone in the play. Hemakant and Lalitha are the two major characters of the play. There is a distinct form of resistance that happens with the modes of incest. Hemakant is an artist, a sculptor who has the finest passion and a guiltless mind when it comes to giving birth to the most divine pieces of sculpture. He finds his perfect sculpting model in Lalitha and in a moment of desperate sexual pleasure, he wants to etch out that perfect sculpture. There is Lalitha's arousal to the highest passion and then Hemakant carves her in that instance only. Against the wishes of the villagers,

he sets up a complete control on Lalitha, and the questions of sin, violence against women, violence against social structures all become very relevant in the play. On the one hand, the repressive societal norms that have been like shackles for generations, are broken by Hemakant and Lalitha, but on the other hand, Hemakant, through his desperate art, starts being institutional again. If we notice very carefully, there is a whiff of the supreme power that Hemakant wishes to explore and utilize while coercing Lalitha into the physical act. As he promises Lalitha:

> I will take you in all your moods…Lali of the full, inviting lips, Lali of the breasts heaving with emotion, Lali of the navel as deep as desire. Lali of the long, long thighs trembling with irresistible lust.(Elkunchwar : 91)

His words, 'my world is different from yours. It's a world that is mine alone' is evidence enough where the artist is self-centred, concentrating on only the highest paradigms of resources for nourishing the self.The villagers retort Lalitha's act by saying that she should defile only the cursed mansion and not spread the filth of sin in the entire village, thus again, carrying on the concept of mob dictate.Tinged with a sense of creating and nurturing the male supremacy, the gaze and utilizing silent strands of violence in the play, Hemakanthimself becomes the absolute emblem of violence. Just like what we find in some of his other plays like Garbo, Sonata, and Reflection.

There are certain codified norms, rules and establishments that strive in all possible ways not to make the woman an independent, autonomous being. If there has been a stream of codified knowledge at work, that is also entirely the male domain.

Creating Violence as an Establishment

Hence, the idea of creating violence as an establishment and then taking the female subject as part of that violent domain remains as a part of Feminist study also at present. It is also the presence of politics, the politics of using violence as a weapon for the one who has the voice, to mutilate and suppress the one whose voice should not be heard. A theatrical space or the act of performance on stage all portray how the characters in the play not only have an interwoven relationship, but how the theatrical space enlarges and often encompasses the larger socio-political space of an entire nation. The political space that is created on stage does not remain restricted to one social or geographical location only. If theatre is equivalent to a microscopic social mirror, then it will not be an exaggeration in pointing out that it reflects

the social, political, religious, economic realms of a certain nation at a certain time within a definite framework. Patriarchal subjection has been a global phenomenon, and so have been the tenets of resistance and violence. The establishment of these two forms has a marked effect on the women of society. As per the UNFPA report “Violence against Women in India: A Review of Trends, Patterns and Responses”, there is always a theory of suppression of the institution of violence, when it comes to domestic matters, especially if the perpetrator is a part of the family. There are more women dropouts from school, they are most often considered non-productive in terms of dealing with property, and most cases of domestic violence go unnoticed as a private affair, not to be disclosed. This is well-portrayed in *Old Stone Mansion*, where after the death of Tatyaji, the old patriarch of the household, Vahini, his daughter-in-law heaves a sigh of relief and takes the reign of empowerment in her own hands. On one hand, there is a representation of women based on caste hierarchy, and on the other hand, they are also represented as harbingers of change. The social perspective is not to be disregarded at all. The UNFPA reports have also taken this dimension as an integral point that the established forms of violence against women retard the very goal of any national development. Since under acts of violence women cannot move about or act freely, the national developmental goals get jeopardized to an alarming extent. And that is represented not just through dramatic or theatrical ideas but also through a distinct sense of grammar. In one of his interviews in the year 2016, to Deepa Ganesh of The Hindu, Mahesh Elkunchwar mentions this distinct grammar of drama and how it affects the readers in a way different from that of fiction: “One basic rule in drama is that whatever appears irrelevant and unnecessary vis-à-vis the dramatic intention on stage automatically becomes redundant, unbeautiful and parasitic…Therefore if a script is full of unnecessary and unwarranted embellishments, used only to decorate the text, due to wrong notions of 'beauty in drama', the reader refuses to acknowledge such plays as literature. (Elkunchwar, 2016)”

The tragic fate of women based on caste hierarchy, disenfranchisement by the society, and atrocities inflicted upon the woman as she the course of belonging is for another caste-also stand as some of the rudimentary cases of establishing violence in Indian drama and theatre.

Conclusion:

There has been rigorous experimentation in the field of Indian theatre and

drama, mostly verging on plausible responses and reactions from the urban audience. Changes in parental structure, marriage, living beyond marriage, divorce, women and child rights, the use and abuse of the body, loving the self and above all, redefining the forces of humanity on a sublime level are what these two playwrights have embarked upon. The myths regarding the family as the safest heaven is no more, women and acts of brutality perpetrated on them take manifold angles, and in some cases, the victim and the perpetrator also change positions. There has been an initial shift in the tendency to see women not just as beneficiaries to economic and social development but to see them as participants in the development. But much remains to be done in the realm of renegotiating the position of women. Habitual assaults, property seizure, domestic and closeted violence still remain as three of the most prominent and pressurizing problems even today.

References:

1. Baksh-Soodeen, Rawwida, and Wendy Harcourt. The Oxford Handbook Of Transnational Feminist Movements. Oxford University Press, 2015.
2. Dey, Sayan. Decolonial Existence And Urban Sensibility: A Study On Mahesh Elkunchwar. Manipal Universal Press, 2019.
3. Elakunchwar, Mahesh, and Samik Banerjee. Collected Plays Of Mahesh Elkunchwar. Oxford Univ. Press, 2010.
4. Foucault, Michel, and Robert Hurley. The History Of Sexuality. Vintage Books, 1990.
5. Kaur, Amandeep. "The Partiarchal Perspectives On Female Subjectivities In The Selected Plays Of Atamjit And Mahesh Elkunchwar". Central University Of Punjab, 2019.
6. Millett, Kate. Sexual Politics. Columbia University Press, 2016.
7. Nevitt, Lucy. Theatre And Violence. Palgrave Macmillan, 2013.
8. Singh, Anita. Staging Feminisms. Routledge India, 2021.
9. Subramanyam, Lakshmi. Muffled Voices-Women In Modern Indian Theatre. Har-Anand Publication, 2013.
10. Violence Against Women: Forms And Manifestations. International Centre For Research On Women (ICRW), India, 2004, https://india.unfpa.org /sites/default /files /pub-pdf / 435.pdf. Accessed 5 Feb 2021.
11. Titchiner, Beth M. The Epistemology of Violence. Palgrave Macmillan, 2019.

Sreetanwi Chakraborty - Sreetanwi Chakraborty is an Assistant Professor in AIESRK, Amity University Kolkata. Her areas of interest include Indian drama, Feminism and cultural politics and South Asian Diasporic Studies.

KartalCholom as a Part of Ritualistic Manipuri Nata-Sankirtana Theatre Performance

Leitanthem Santosh Singh

Abstract

Manipuri Nata-Sankirtana is a performing art form where Manipuri male musicians or artistes sing Sankirtana, which consists of Pungyeiba (Pung player), Eshei-sakpa (singers or vocalist), and Moibungkhongba (conch blower or conch sound producer) by following its prescribed ritualistic theatrical sequence.It has got many theatrical elements whereKartalCholomalso plays its part in it. Kartal Cholom is the dexterous and vigorous movements of the body from head to toe playing Kartal by singers having different modes of acting according to the beats of playing Pung creatively. This article aims 1) To determine the theatrical elements present in ritualistic Nata-Sankirtana performance 2) To identify the different parts of the body for doing KartalCholom 3) To understand the basic foundations for learning KartalCholom. It uses the descriptive qualitative method to discuss the topic in detail. The tools and techniques of interview and observation (both participant and non-participant of the researcher) are utilized to collect the required data. KartalCholom describes an essential role in expressing the different theatrical elements of Nata-Sankirtana ritualistic performance. Doing it uses the whole parts of the body. This helps in the development of the psychomotor skills of the learners. Further, it will also develop the cognitive and affective domains of learning as this unique performing art form is based on bhakti and body-mind coordination performance. This research article will provide a universal benefit in the field of performing arts.

Keywords: *Cholom, Guru-Shishya Parampara,KartalCholom, Manipuri Nata-Sankirtana, Theatre Performance*

Introduction

Manipur, a north-eastern state of India, is famous and well known throughout the world for its different performing art forms. Manipuri Nata-Sankirtana (Figure 1) is one such unique performing art form among them. It is included in UNESCO's Intangible Cultural Heritage List of Humanity as Sankirtana:

ritual singing, drumming and dancing of Manipur, on 4th December 2013. Manipuri Nata-Sankirtana is a performing art form where Manipuri male musicians or artistes sing Sankirtana, which consists of Pungyeiba (Pung player), Eshei-sakpa (singers or vocalist), and Moibungkhongba (conch blower or conch sound producer) by following its prescribed ritualistic theatrical sequence. It uses three musical instruments, namely Pung (a Manipuri percussion musical instrument), Kartal (a Manipuri cymbal), and Moibung (Conch Shell).Many theatrical elements are present in such a performance. Here KartalCholomalso plays a significant role in expressing different parts of theatrical elements.

Figure 1: Ritualistic Nata-Sankirtana Theatre Performance

Origin and Development of KartalCholom

The ritualistic theatrical Manipuri Nata-Sankirtana performance is developed under the Guru-Shishya parampara tradition where pupils stay at the house of Guru or come from their respective places everyday for learning. Bhakti, dedicated service, and discipline are essential qualities of such a unique art form.

(T. C. Singh), 1969 opined that the origin of Manipuri KartalCholom was associated with the mythological story of the creation of land where Atiya Guru Shidaba along with nine celestial Gods (Laipungthou Mapal) and seven celestial Goddesses (LainuraTaret) made mounds (Leipung) above the water body. In order to level the ground, they trod their footwork. After the mounds were completed, they felt happy by jumping, singing, and dancing rhythmically. Taking those body movements of the event, KartalCholom movements were created.

(L. D. Singh), (E. N. Singh), (Parratt), (Sharma), and (M. T. Singh), all discussed that the Vaishnavism practised in Manipur became a peculiarly

Manipuri Vaishnavite culture in form, adopting the different aspects of Meitei culture and being modified by it.The new GaudiyaVaishnavite religion in Manipur reached its zenith during King Bhagyachandra (1759-1798). All the past events were assimilated with the charms of new cultures and practices. He again confirmed Chaitanyaite Vaishnavism as the state religion and introduced different kinds of innovative art forms into religious life. So, Vaishnavite forms of worship continued, and Sankirtana were also held in many ritualistic activities. His most significant contribution was introducing Manipuri Jagoi Ras (an Indian Classical dance) and creating a more refined Manipuri Sankirtana form. On the 12th of Hiyanggei (November/December), Friday, 1776, the idol of Shree Govinda was installed at the palace of Langthabal, Canchipur.In 1779, he introduced Jagoi Ras performance. Before the start of the Ras dance, Manipuri Nata-Sankirtanawas performed. This was the first-ever Nata-Sankirtana performance which we witness in the present day too. The Bangdesh Pala was introduced during King Garibniwaz, making some changes in Pung, Kartal, costumes, and singing style; King Bhagyachandra gave the name Nata-Sankirtana to this unique performance. From that onwards, Nata-Sankirtana performance was done in different services to Gods and Goddesses, ritualistic activities, and ceremonies related from birth to death of Manipuri Vaishnavite society. He had put his stamp on the Manipuri religion by bringing his particular genius into the Vaishnavite worship of Krishna. He destined to re-establish Sankirtana Mahayajna, the religion of the Kali-yuga, in Manipur.

The footwork and body gestures for KartalCholom were taken out from Manipuri Martial Art (Thang-Ta). The body's form, position, and structure were obtained from Mukna (indigenous Manipuri wrestling).

(E. C. Singh), and (N. S. Singh), the two writers gave their idea that Shri Dhara Sai was the first to start the new Kartal Cholomof Nata-Sankirtana in King Bhagyachandra's time. During King Chandrakriti(1850-1886), Sorokhaibam Oja Senggum ba introduced simple Rajmel Cholom. After that, Harokcham Oja Shamu created Rajmel Cholom Areibi, where the performers turned their bodies in Kartal movements. During King Churachand (1891-1941), Chungkham Oja Thambalangou introduced different Gaits (Gati) of birds, animals, and other natural phenomena in doing KartalCholom. Thangjam OjaChaoba created Rashesori Mityeng (looking at Srimati Radhika) in Rajmel KartalCholom in King Bodhachandra's time (1941-1955). Again, Maibam OjaIbohal introduced Bansi Da Mityang Thamba (looking the eyes at the hands of Krishna playing flute)in Rajmel Kartal Cholom.

Cholom and KartalCholom

Cholom is the body movements and gestures performed by the Nata-Sankirtana artistes by using the music of Pung and Kartal with or without the accompaniment of songs in specific time measures and rhythm.

Danisana (2012) writes that the literal meaning of the word- Cholom in Manipuri language can be broken into two parts viz. Cho, which is a derivative of the root word Chat meaning to go or to move, and Lom is indicating the limit or zenith of a thing. So, Cholom is the most dexterous and refined part of all the body movements from head to toe of the Nata-Sankirtana performing artistes. Naturally, nature is the source of all the existing storehouses of art and culture, which designates the human society from the rest of the living entities. Likewise, most of the movements of cholom are imbibed and refined from natural phenomena.

Rangitabali (2004) discussed that the Manipuri word- Cholom is derived from the Sanskrit word- Chalan, which literally means a composed movement in sequence. Generally, it is taken as a distinct structuralized rhythmic body movement and expression from head to toe for men accompanied by the songs and music of Pung and Kartal. It connotes more of tandav bhava, and from the word chalan, it develops into Cholom.

Though Cholom is derived from Chalan, all body movements and expressions used are the original creative products of Manipur, which is unique. Cholom has more of Tandav's body movements with some Lasya elements while making bhakti and devotion. It is part and parcel of Manipuri Nata-Sankirtana ritualistic theatre performance.

Both Pungyeiba and Esheisakpa perform Cholom. So, there are two types of Cholom in Nata-Sankirtana performance. They are:-

1. PungCholom- The cholom did by Pung Performing Percussionist using Pung instrument to the punglons or drum beats

Figure 2: KartalCholom Performance

2. KartalCholom or Nata-Pala Cholom- The cholom done by Singers using Kartal with or without songs

KartalCholom is the dexterous and vigorous movements of the body from head to toe playing Kartal by singers according to the beats of playing Pung creatively. The Kartal is played according to the playing syllables or compositions of Pung. All the body movements are energetic, accompanied by acting, gestures, and added with bhakti, grace, poise, and delicacy. Its tempo lies in between the Manipuri Martial Art (Thang-Ta) movements and the Manipuri Dance performance. Doing KartalCholom needs three things. They are:-

1. The body movements through different modes of acting having bodily gestures and expressions
2. The Kartal movements as a visual
3. The language or syllables of Kartal playing (Kartal Marol)

Radharani (2012) viewed the ritualistic Nata-Sankirtana as theatrical because various events were expressed through body movements. In Kartal Cholom, the actors' gestures were symbolical expressions depicting the songs' sentiments and emotions (Rasa). Rangitabali (2004) discussed Nata-Sankirtana as a complete ritual theatre form for the people. Its whole performance involved a total theatrical experience.

It is indeed necessary to understand the various theatrical elements present in ritualistic Nata-Sankirtana performances. Besides, identifying different parts of the body utilized in KartalCholom and the basic foundations for learning this is to be determined to know its part as a ritual theatre performance.

Objectives of the study

The following are the objectives of the present study:-

1. To determine the theatrical elements present in ritualistic Nata-Sankirtana performance.
2. To identify the different parts of the body for doing KartalCholom
3. To understand the basic foundations for learning Kartal Cholom.

Methodology of the study.

1. Method- Descriptivequalitative method is used in the present study
2. Tools and Techniques- The tools and techniques of interview and observation (both participant and non-participant of the researcher) is being used in the present study to collect the required data

Delimitation of the study.

Only ritualistic Nata-Sankirtana theatre performance is being

considered to study the current topic without considering the stage performance.

Findings and Analysis

Using interview and observation for collecting the required data related to the topic, different theatrical elements are determined from ritualistic Nata-Sankirtana performance.

1. The Performance Place- The performance place for conducting ritualistic Nata-Sankirtana theatrical performance is called Mandap. It is temporarily constructed on the courtyard of the house where the ritual will be held or uses a permanently built one attached to temples. The temporary made Mandap has 9 pillars, Jatra (the foundation pillar) at the centre and the remaining 8 pillars forming a square demarcation. It has 2 entrances or exits. If the Mandap is attached to a temple, then it has 12 pillars without a foundation pillar at the centre. It has only one entrance or exit. The central portion of the Mandap is called Mandali.

2. Actors- The performing artistes Pung performers (Pungyeiba) use Pung percussion instruments, and Singers (Esheisakpa) use Kartal instruments. They are together called Nata-Pala. The two Pung players, Head singer (EsheiHanba) and Head repeater (Duhar), are the main actors. Other remaining Palas are supporting actors.

3. Act or Sequence- Like different acts and scenes in a theatre performance, seven compulsory sequences are to be followed in such performance: Raga, Raga Taba, Mel, Tanchap, Menkup, Swadhin, and Vijaya.

4. Audience- The organizer (Yumbu or Karma Dhari) invites friends, relatives, and local community people to attend as an audience.They are an essential part of the successful conduct of the ritualistic Nata-Sankirtana theatre performance. They are also taking part in the worshipping process.

5. Arranger- The arranger of such a performance is called Arangpham. They will make arrangements and preparation for all the required materials, customs, and formalities associated with ritualistic Nata-Sankirtana theatre performance to be done.

The moods and sentiments of songs sing are expressed by doing different Kartal Cholom acting through body movements and gestures, which is theatrical. While performing Nata-Sankirtana KartalCholom, most parts of the body from head to toe are used. Systematically, the body parts are divided into three parts. They are:-

1. Head along with neck
2. Body from shoulder to waist along with hands
3. The body below waist- Legs along with buttock

The following sub-divisions are again made within those mentioned above three main divisions to identify different body parts used in Kartal Cholom in detail.

1. Head along with neck- In doing KartalCholom, head and neck are used together along with how the eyes are placed. So, the positions of keeping eyes in Manipuri Mityeng are divided into three different ways viz. ahanbamityeng (nollukpamityeng), anesubamityeng (mayaioibamityeng), and ahumsubamityeng (arappamityeng)

2. Body from shoulder to waist along with hands- The eight different sub-divisions are identified. They are:-i) Shoulder ii) Chest iii) Upper back surface of the body iv) Abdomen/Stomach/Belly v) Waist vi) Hands from wrist to the five fingers vii) Arm viii) Elbow.Five different names are given based on the positions of hands (khutpham) kept viz. chaningkhutpham (pelvis position), khoidwkhutpham (navel position), thamoikhutpham (chest position), lengdonkhutpham (shoulder position), and natonkhutpham (nose position)

3. The body below waist(Legs along with buttock)-Five different subdivisions are identified. They are:-i) Buttock ii) Thigh iii) Knee iv) Calf v) Heel and toe.

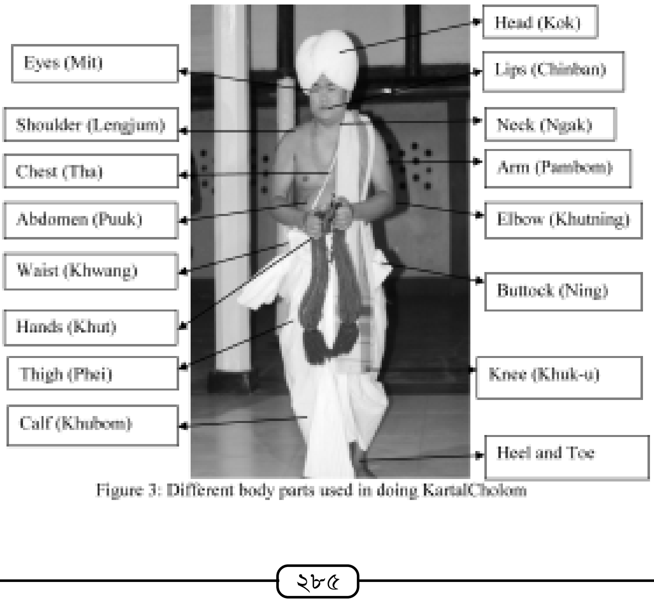

Figure 3: Different body parts used in doing KartalCholom

Furthermore, some basic foundations are to be learned in order to do KartalCholom perfectly. They are:-

1. 3 different Cholom Phithup (posture and positions of the body)

I. Phirep phithup (standing in normal position with toes pointed out)
II. Pheithek phithup (sitting in a squatting manner up to the level where the wrist touches the knee)
III. Pheithup phithup (sitting in a squatting manner where the elbow of the hand touches the knee)

2. 3 different cholomkhongpham (positions of legs)

I. Ahanbakhongpham (sagolkhongpham, the manner of keeping the horse's legs)
II. Anesubakhongpham (nongsakhongpham, the manner of keeping the lion's legs)
III. Ahumsubakhongpham (Shamu khongpham, the manner of keeping the elephant's legs)

3. 3 different cholomkhongthang (leg movements or footwork)

I. Leimaishitkhongthang or movement of legs touching the surface
II. Khujengywbakhongthang or movement of legs reaching up to the ankle
III. Khubomywbakhongthang or movement of legs reaching up to the calf
There are another3 more leg movements of complicated ones;they are
IV. Position of legs between touching the surface and ankle
V. Position of legs between ankle and calf
VI. Movement of legs reaching the level of knee

4. 3 different cholomkhongchat (modes of using leg movements or footsteps) in doing KartalCholom. They are:-

I. Maphei da chatpakhongchat (movement on left and right side or sidewalk)
II. Mangdachatpakhongchat (movement in the front or walking in the front)
III. Tung hannachatpakhongchat (movement on the back or walking at the back)

5. 3 different cholomkhongthin (ways of using legs in beating mode on the surface or placement of foot) while doing cholom. They are:-

I. Khongsheknathinba
II. Khongkaonathinba
III. Khongmapumthinba

Again, different KartalCholom Gaits (Figure 4) (Gatee, the manner of body movements and gestures through imitation from animals, birds, and other natural things) are also done, which is a theatrical element. Imitation of movements from i) Wahong (Peacock) ii) Lin (Snake) iii) Tennawa (Parrot) iv) Shamu (Elephant) v) Kangnga (Swan) vi) Sagol (Horse) vii) Shajee (Deer) viii) Nongsha (Lion) ix) Urok (Heron or Stork) x) Umaibi (Kite) xi) Khambrangchak (Tailor) xii) Esinggeepom (The wave of water movement) xiii) Nongleinungshit ke sahum (manner of the storm),

Figure 4: Different Gaits (Gati) in KartalCholom

etc., are utilized to express different moods and sentiments.These bodily movements, gestures, and expressions make Kartal Cholom a vital part of making ritualistic Nata-Sankirtanaa theatre performance.

Conclusion

The ritualistic Manipuri Nata-Sankirtana performance contains different theatrical elements. In it, KartalCholom has a significant role in expressing different ways, modes, expressions, and forms of performance. Each and every sequence of the ritualistic performance, namely, Raga, Raga Taba, Mel, Tanchap, Menkup, Swadhin, and Vijaya, has unique parts played by Kartalcholom making a wholistic theatrical expression. The kind of theatrical practices witnessed in Nata-Sankirtana is a deep symbolic gestures and expression interpreting the different events by the actors. In doing Kartal Cholom, whole parts of the body from head to toe are used. Some basic foundation needs to be learned by the artistes before the actual KartalCholom

performance. This will make them more creative and knowledgeable for doing KartalCholom nicely. It expresses the moods and sentiments related to songs being sung through body movements and gestures as a form of acting. Such a unique performance is highly theatrical.This helps in the development of the psychomotor skills of the learners. Further, it will also develop the cognitive and affective domains of learning as this unique performing art form is based on bhakti and body-mind coordination performance. This will provide a universal benefit in the field of performing arts. Thus, KartalCholom occupies an essential position in ritualistic Nata-Sankirtana theatre performance.

References

Devi, RK Danisana. Manipuri Dances [A Panorama of Indian Cultures]. New Delhi: Rajesh Publications, 2012. Print.

Parratt, Saroj Nalini.The Religion of Manipur. Calcutta: Firma KLM Private Limited, 1980. Print.

Radharani, Elangbam. A Study on Nata Sankirtana of Manipur. Imphal: Department of Dance, Manipur University, 2012. Print.

Sharma, Aribam Chitreswar. A Collection of Nata Sankirtana and Its Related Forms. Imphal: Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy, 2012. Print.

Singh, Elangbam Chaobhal. Cholom. Imphal: Laihui Publishers, 2002. Print.

Singh, Elangbam Nilakanta. Aspects of Indian Culture. Imphal: Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy, 1982. Print.

Singh, Leishangthem Dhaka. Manipuri Nata Sankirtana Eshei Seirol. Thoubal: Dhaka Publications, 2007. Print.

Singh, M Thoiba. "Manipuri Nata Sankirtana as a Mahayajna." Voice of Research 5.3 (2016): 12-15. Document.

Singh, Ningthoujam Shyamchand. Nata Sankirtana Sheishak Sheihou. Imphal: Shyamchand Publication, 2002. Print.

Singh, Thangjam Chaoba. Meitei Nata Pala Amasung Cholom. Imphal: Chaoba Publishers, 1969. Print.

Waikhom, Rangitabali. A Historical Study of Traditional Manipuri Theatre (From Ancient Times to 1947). Imphal: Manipur University, 2004. Document.

Leitanthem Santosh Singh - Ph.D research scholar at Department of Dance and Music, Manipur University.

Presentation of Contemporary City life on the Urban Stage A Reading of Karnads *Boiled Beans* on Toast

Devamita Chakraborty

Abstract : Karnad's literary career begins with *Yayati* written in 1961 and concludes with *Boiled Beans* on Toast written in 2013. With *Yayati*, Karnad realises that he is destined to be an Indian playwright and not a poet. The decision to be a playwright again puts forth before the artist the tension of choosing the proper idiom to negotiate with his audience as he feels that writers like him have to acrobat between the traditional and the modern in search of their identity. The paraphernalia of his theatre has changed over the time. From experimenting with myths and folktales Karnad towards the end of his career started to present contemporary urban life mostly located in cities.

Boiled Beans on Toast presents the cosmopolitan life in the city of Bangalore through stories from all walks of life narrating lives experiences. The story of the Padabidri family is in the centre of the play. The life of Anjana Padabidri, Kunaal (her son) and Anusuya (her mother in law) is deeply affected due to the absence of Mr. Padabidri who is busy seeking fortune abroad in order to live a better life. The other stories of the minor characters present a similar search for better life in the city which is defined by economic standards only. All the stories narrate lives experience in Bangalore from different perspectives which challenge concepts of charity, honesty, and morality. People survive on their own in the big city and this present reality becomes all the more ironic in the context of the quintessence of the original narrative of kindness that gives the city its name.

Keywords : traditional and modern, Realism, human values.

The Oxford University edition of *Collected Plays: Volume Three* introduces Girish Karnad as a playwright, filmmaker, and actor who writes in Kannada, the language of the state of Karnataka, and has translated his plays into English that some of his recent plays were originally written in English.[1] The note rightly contours the map of the dramatist whose writing and concerns have changed over the time in order to negotiate with his immediate audience. Karnads literary career begins with *Yayati* written in 1961 and concludes with *Boiled Beans* on Toast written in 2013. Like his

other plays, *Boiled Beans on Toast* is originally written in Kannada and then, almost simultaneously, unlike the first play, is translated into English. *Boiled Beans on Toast* has been first presented on stage in a Marathi adaptation titled, *Uney Purey Shahr Ek,* at the Yashwantrao Chavan Natyagriha. It has been performed by Aaskata group on March 1, 2013. It presents on stage contemporary urban life in a realistic setting and is a sharp departure from his most popular genres of myths and folktales. This paper tries to contextualise the play in the oeuvre of Karnads dramaturgy.

While throwing light on his dramaturgy, Karnad, on multiple occasions, has stated that being the first to come of age after India became independent of British rule he has faced hurdles in defining the essential Indian theatre and searching for its essential idiom which demanded to be resolved without apologia or self-justification.[2] Karnad explains the situation as one of explicit tension which has critically shaped his theatrical idiom. The tension was to imbibe or reject the multifarious traditions he has inherited on one hand and on the other the ones he was exposed to tensions between the cultural past of the country and its colonial past, between the attractions of Western modes of thought and our own traditions.[3] The playwright sums it up as We [Karnad and his contemporaries] keep acrobating between the traditional and the modern in order to balance between them and thereby hit upon a form.[4] This act of acrobating is an essential component in Karnads negotiations with his audience.

Karnad grew up under the influence of diverse theatrical forms like the touring Natak companies which were the offshoots of the Parsi theatre and of the *Yakshagana*, the traditional folk theatre of Karnataka. Karnads concept of the proscenium gets changed in Mumbai where he saw Strindbergs *Miss Julie*, produced by Ibrahim Alkazi.[5] And the final major influence on the playwright was the productions of host of Western playwrights like Shakespeare, Shaw, Brecht, Rattigan, Osborne, Wesker, Grotowski and others. Karnad is unequivocal in acknowledging the inevitable influence of Ibsen and Shaw but also rues that the influence has a negative effect on dramatists who started to write on the western model often ignoring the different intricacies of Indian Society and therefore presenting wrong sociology, wrong understanding of how we live.[6] Although Karnads stay in England has enriched him in theatre arts, the passage has not been a smooth one and marks a crucial point in the life of both the person and artist. The occasion has been a traumatic one as he has had to struggle against the wishes of his parents in order to pursue his dreams of going and settling abroad. His parents appear to be selfish at that time in their desire to shape

his future according to their ideology. It is in fact this tussle that gave birth to the artist who not only finds his vocation but also the medium of expression. *Yayati* is written on the eve of his journey and has for its theme parental selfishness and imposition of choice. *Yayati* has made the playwright realise that he has practised the wrong language and that when it really came to expressing ones tension it came off in Kannada.[7] And Karnad himself says that traumatic experience literally dictated my future.[8] He is destined to be a Kannada playwright depicting Indian sensibilities without cultural amnesia.[9] However Karnads genius does not remain confined to Kannada stage alone. His plays have been translated into Hindi, mostly under the aegis of National School of Drama in the 1960s in its desire to become truly national and look for plays from regional languages, and later on into English mostly by the playwright himself, a decision which he thinks would have affected his career as a playwright.[10] Thus in a nutshell it can be said that both time and space played a crucial role in the formation of the artist.

As already mentioned Karnads plays have been categorised by Aparna Dharwadker in the Introduction to *Collected Plays: Volume Two* in terms of form and content. She argues that Karnads:

> Plays reveal equally distinct and recurrent patterns of thematic engagement with ancient myth *(Yayati, Hittina Hunja, Agni Mattu Male)*, premodern and modern history *(Tughlaq, Tale Danda, The Dreams of Tipu Sultan)*, the time less but recognizably traditional world of folktales (Hayavadana, *Naga-Mandala, Flowers*), and carefully chosen aspects of contemporary life (*Anjumallige, Broken Images*).[11]

The critic again in the introduction to the third volume of the anthology says that *Boiled Beans on Toast,* along with *Wedding Album*, is a continuation of the change in direction signalled by *Broken Images.*"[12] This categorisation helps in the initial contextualising of the play. A play is both a text and a context and, the final play gives a concluding remark on the creative journey of an artist.

Girish Karnad defines a play as a product of a specific cultural milieu which carries with it an audience with a definite cultural and emotional background that it cannot shake off.[13] So his plays have gained pan Indian acclamation be it ones dealing with folk tales and myths or contemporary urban life in cities. And Karnads last play is no exception as even when *Boiled Beans on Toast* is a narrative specific to the city of Bangalore, the Marathi version of the play gets easily connected with the immediate

audience because the play presents a conflict that is pertinent to every developing city in India. Padmavati Rao in an interview points out to the fact that the theme of the play applies to any developing nation, any city any urban area that aspires to become like any other city in the developed world and therefore connects to all.[14] In a note at the beginning of the text, Karnad adds the story of the etymological evolution of the name of the city which also is the subject of the play.[15] The reference to the legend of the eleventh century King Veera Ballala gives a perspective to the play which posits before the audience the issues of What was and what we are heading to.[16] The story is a reminder to the audience that the foundation of the city lies in human values of kindness and charity which becomes a sharp contrast to the city that is presented in the play. Besides the reference to human values the corruption of the name Bengaluru to Bangalore also hints at the historical fact of the influence of the colonial masters upon the cultural orientation of the residents of the city. In fact toast belongs to western cuisine. Thus the modern city has a cultural past and a colonial past and the people are a product of the two tensions.

Shanta Gokhale in the introduction to the Oxford University publication play says:

> The chief protagonist of *Boiled Beans on Toast* is the city of Bangalore, a throbbing organism spawned by globalisation. The play holds a mirror to the fractured lives of its floating population which occupies a broad social spectrum from the struggler to the street-smart survivor, from the small town aspirant to the elite. This is a city of wild hopes and dashed dreams, of disappointment and despair, of environmental destruction and rapid development.[17]

Gokhales words echo Karnads words about the subject of the play. The development or transformation of the city into the present state is problematised in the play as it posits critical and contradictory perspectives on the concept of development which is discussed later in the paper.

The Padabidri family is in the centre of the play. The master of the house, Mr. Padabidri, is an absent character without the first name. He is the husband, father and the master who, in spite of being the point of connection of all the members of the house Anjana, his wife, Kunaal his son and Anusuya, his mother, fails to connect to any one of them. He is abroad seeking better fortune and better life but actually gets alienated from his family. Incidentally all the members are in tussle with him. The most apparent tussle is between the father and the son which reminds the critics

about *Yayati*. The archetypal conflict between parent and child reiterates in Karnads last play. The father is worried about the future of his son who is wasting time in pursuing a career of a guitarist and a singer. He demands that Kunaal should concentrate only on his studies so as to become established. Mr. Padabidri, being a self-made man, measures success in life by economic terms and not by romantic ideals of pursuing ones dreams. Besides the age old contentions Karnad implicates new issues of homosexuality and drug abuse. The father is worried that his son may become a homosexual and may also fall prey to drug peddlers. These issues further widen the gap between the two.

The tussle between Anusuya and her son again presents a continuation of the same note. Anusuya, coming to stay with her daughter in law at Bangalore takes interest in race courses. She goes on betting on horses and losing them all. She secretively lends money and even pawns her jewellery worth two and a half lakhs for her new interest. Later it is revealed she has taken the money and it is the responsibility of her son to repay the creditors. Money lenders soon arrive at the Padabidri residence once she leaves the city. The traditional ethics and customs empower the mother, who is otherwise dependant on the son here, to fulfil her desires even when it might incur huge financial loss on the part of the son. Here, too, the parent apparently makes her child accept her decisions and make sacrifice. The play has both comical and satirical overtures when the Anusuya says that everyone is in search of God and she has found them in the horses.

Anjana Padabidri is not seen to be at a tussle with her husband. She is supportive to her husband and appears to be a typical elite society woman who is ignorant about the daily activities in her house and more bothered about the outside worldabout Karunashraya, a charitable hospice care unit she has built. Kunaal complains that she is too committed to her husband and defines her as a devoted Hindu wife.[18] But the words become ironical as later it is revealed that underneath the apparent unison of the couple lies lack of understanding for each other. The city which changed her husbands fortune has changed hers too. Bangalore is a multicultural space. In her initial days in the city when Kunaal was little baby, she befriends a Bengali youth in the city with whom she finds cultural compatibility. But the latter ditches her all of a sudden compelling her to take harsh decision. Anjana has tried to commit suicide out of loneliness and friendlessness. The trauma of attempting suicide robs her of her sweet voice but her husband remains unaffected. However, she emerges as the only human bridge in the otherwise too individualistic family between the father- son (Mr. Padabidri

and Kunaal) and also between mother-son (Anusuya and Mr. Padabidri). There is no direct conversation between the father and the son even over the telephone. And Anusuya is detached from her son too. She actually holds her son responsible for being negligent towards Anjana and being the cause of her losing her singing. Anjana when she comes to know about this decides to tell the truth primarily to Kunaal and also later to Anusuya as well. She becomes instrumental in sorting out hidden grievances between mother and son. She herself reconciles with her son and accepts Kunaals decision to become a singer.

Aparna Dharwadker finds that the play has a modern genealogy [It] joins the line of modernist fiction, non-fiction and cinema which takes the industrial or post-industrial city as its subject.[19] In this sense she connects the play to host of examples and finds that:

> Karnads intervention in the unfolding of the Indian city suggests that neo-liberalisation and globalisation have given class privilege a commonplace quality, but their larger effect has been to harden class divisions and resentments, amplify greed, and make survival a more contingent condition.[20]

Karnads presentation of Indian society portrays a shift in the cultural orientation in the cities where caste is replaced by class. Anjana points out that caste has nothing to do in her house when Muttu, the younger servant in the Padabidri house, points out that she belongs to the Mudalier caste. She even goes ahead to warn Prabhakar, a job/fortune seeker in the city, not to mention the issue of caste in front of her husband if he is to work under him. So the modern developing city has learnt to dismantle the traditional hierarchies but caste is only replaced by class for in the very second scene of the play we find Vimala, the elder servant in the house warning Muttu, that the mistress does like the family of the servants visiting them at her residence.

Boiled Beans on Toast has multiple subplots which narrate the stories of minor characters like Muttu and Vimala (the domestic helps in the house), Dolly Iyer (Anjanas friend), and Prabhakar Telang, who happens to enter into familys narrative in search of job under Mr. Padabidri. All the stories present multiple lenses which scan the society from different walks of life. Unlike in *Wedding Album or Broken Images* the play does not confine the plot to one family. The multiple subplots narrating the conditions of different families belonging to all sections of the society contribute to Karnads realism. Although the play has the Padabidri family at the centre

only seven scenes (three in Act 1 and four in Act 2) out of seventeen scenes in this two Acts drama dramatise the events of the family members. However, the locale is not the mere living room of the house as it is in the case of Western Realism. The stage comprises the service room, the living room, the garden and the bedroom of the Padabidri house. The rest of the scenes are located on different settings ranging from café, to Race course gallery, corporate office, houses of servants and even the Police Station. Each setting presents a narrative which collectively forms a collage and presents a realistic picture of the Silicon Valley.

The narrative of Dolly Iyer is a foil to that of Anjana. Belonging to the elite society Dolly takes fancy in showing off that she has acquaintance with great corporate houses and in assuming a high class attitude before others. In spite of being a school teacher, her inclination to show off her status does not make her hesitate to tell lies and even ruin the lives of others. She deceives Prabhakar in making him believe that she will certainly get job for him in the Wipro Company. Her husband is well aware of her lack of scruples but is unable to abate her from this. The question that lingers throughout the play is the reason behind Dollys behaviour. But finally the audience is left with no choice or answer but to accept that Dolly is like that but it cannot be denied that people like Dolly are out in the city with their maleficent agendas. And Prabhakar who gets deceived, loses his job and gets separated from his family because of Dolly resolves not to harm Dolly but to become the Man of his dream and become rich. There is a subtle hint that Prabhakar may be the future Mr. Padabidri.

Apparently Dolly and Vimala are same. Both are cheaters but while the former cheats out of fancy the latter does so out of need. Vimala is a self-made woman belonging to the lower class of the society who flouts every possible human values of honesty, integrity, chastity, and so on that are taught to every individual. She secretly takes up job in another house without intimating Anjana and steals there, she rents out Anjanas gas cylinders, mixer grinder and microwave oven to the neighbours without her knowledge and even lives with multiple men all of whom happen to be her first cousin in the metropolitan city. Thus the only human value for Vimala is to make money in order to survive in the city which shows no mercy to the people like her. Muttu on the other hand is not as rebellious as Vimala and is of much subdued nature. However the city has also taught her the uselessness of sticking on to family sentiments and the utmost necessity of pragmatism for survival. Although in the beginning of the play Muttu and her husband tries to keep in touch with the village house and the village

community, even when it incurred financial burden, by the end of the play both Muttu and her husband abandon the idea keeping in touch with her injured brother who also arrives in the city to seek fortune. He is left to survive on his own just as Muttu and her mother did in their initial days.

The developing city with its concrete buildings, flyovers and neon lights not only demand the felling of trees but also changes human values. Almost all characters in the play survive in the city on their own. The play ends with Kunaal coming to the realisation that he could have been dead, killed by her own mother in the childhood as Anjana has fed him sleeping pills too. Each character changes to adapt to the city which in turn is itself churning upside down. All arguments about city, development, human values given by the different characters like Anjana, Kunaal, Vimala, Dolly, Muttu, her mother, Prabhakar and the host of others like them put the audience in an uncomfortable situation as they cannot pass any judgement but are compelled to accept Karnads realism as he presents it.

Notes

1. Aparna Bhargava Dharwadker, About the Playwright, in *Collected Plays: Volume Three*, by Girish Karnad (New Delhi: Oxford University Press, 2018), 259
2. Girish Karnad, *Collected Plays: Volume One* (New Delhi: Oxford University Press, 2005), 301
3. Karnad, Volume One, 301
4. Girish Karnad, Acrobating Between the Traditional and the Modern, in *Authors Speak,* ed. K. Satchidanandan (New Delhi: Sahitya Akademi, 2006), 73
5. Karnad, Acrobating Between the Traditional and the Modern, 64
6. Ibid, 69
7. Ibid, 62
8. Girish Karnad, *Collected Plays: Volume Three* (New Delhi: Oxford University Press, 2013), 253
9. Karnad, *Volume One,* 304
10. Girish Karnad, *Volume Three,* 253
11. Aparna Bhargava Dharwadker, Introduction, in *Collected Plays: Volume Two*, by Girish Karnad (New Delhi: Oxford University Press, 2005), viii
12. Dharwadker, Introduction, in *Collected Plays: Volume Three,* by Girish Karnad (New Delhi: Oxford University Press, 2018), xiii
13. Karnad, *Collected Plays: Volume Three*, 257
14. Padmavati Rao, Interview on Boiled Beans on Toast, Dec 7, 2017. https://youtube/n6F9Zhf-oUU

15. Karnad, *Collected Plays: Volume Three,* 172

16. Rao

17. Shanta Gokhale, Foreword," in *Boiled Beans on Toast*, by Girish Karnad (New Delhi: Oxford University Press, 2014), vii

18. Karnad, *Collected Plays: Volume Three*, 241

19. Dharwadker, *Collected Plays: Volume Three*, xxv

20. Ibid.

Bibliography

Dharwadker, Aparna Bhargava. Introduction. In *Collected Plays: Volume Two,* by Girish Karnad, vii-xxxix. New Delhi: Oxford University Press, 2005.

---.Introduction." In *Collected Plays: Volume Three*, by Girish Karnad, ix-xxxiv. New Delhi: Oxford University Press, 2018.

Gokhale, Shanta. Foreword." In *Boiled Beans on Toast*, by Girish Karnad, vii-viii. New Delhi: Oxford University Press, 2014.

Karnad, Girish. "Acrobating Between the Traditional and the Modern." In *Authors Speak*, edited by K. Satchidanandan, 61-76. New Delhi: Sahitya Akademi, 2006.

---. *Collected Plays: Volume Three*. New Delhi: Oxford University Press, 2018.

---. Collected Plays: Volume One. New Delhi: Oxford University Press, 2005.

Rao, Padmavati. Interview on Boiled Beans on Toast, Dec 7, 2017. https://youtu.be/n6F9Zhf-oUU

Devamita Chakraborty - Assistant Professor of English at Dr. Bhupendra Nath Dutta Smriti Mahavidyalaya.

Inter-Generational Negotiation of Post 9/11 Hyphenated Identity of Pakistani Muslim Americans in The Domestic Crusaders and Disgraced

Sabnaj Parvin

Abstract

Multiculturalism is one of the most popular themes in Pakistani English literature. The problems and sense of displacement are not entirely physical or geographical; instead, this sense of displacement is also cultural and historical, which gives birth to psychological conflict and cultural identity crisis. This paper examines the post 9/11 hyphenated identity of the Pakistani American Muslims of different generations in Wajahat Ali's play *The Domestic Crusaders* (2010) and Ayad Akhtar's Pulitzer Prize-winning play, *Disgraced* (2012). The study also examines the Pakistani American family, consisting of a diaspora of different generations, different stories of their ethnic history and present condition in America, and the misrepresentation of Muslims as violent "crusaders". The analysis shows how Pakistani American Muslim immigrants deal with their multicultural identity and how they negotiate to achieve their cultural hybridity in post 9/11 America. This paper also observes the theme of national identity in a multicultural land and multiple layers of hyphenated identity in post 9/11 America.

Key Words: Pakistani American Drama; Hyphenated Identity; Muslims in America; Assimilation; Post 9/11; Identity Crisis; Inter-generational Identitarian Crisis.

Immigrants' experiences and multiculturalism are the central themes in Pakistani American literature. Multiculturalism is one of the most popular themes in Pakistani English literature in general. Pakistani fiction writers such as Mohsin Hamid, Nadeem Aslam, and Kamila Shamsie brilliantly depict the moral dilemma, confused identity, and alienation in the host society and in-home. The problems and sense of displacement are not entirely physical or geographical; instead, this sense of displacement is also cultural

and historical, which gives birth to psychological conflict and cultural identity crisis. The first-generation Pakistani American writers such as Bapsi Sidhwa, Sara Suleri, or Zulfikar Ghose and younger generation writers born in the USA such as Daniyal Mueenuddin, Nafisa Hazi, Wajahat Ali, and Ayad Akhtar consciously and skillfully dealt with similar themes. Their works examine the issues like acculturation or cultural assimilation in American countries and the obstacles the immigrants face during renegotiating their multicultural or hyphenated identity.

Most recent writings based on the American context mainly focused on the American-born protagonists who rarely connect with their parents' national, ethnic, religious, and cultural histories. They are born and brought up in American culture and believe that they are also a natural citizen of America. The Pakistani American writers primarily focused on the intertwined situation of the protagonists. They are victims of the problematic political histories of their homeland and the host country. They cannot accept their parents' culture to mold their identity or escape their multicultural status. Banibrata Mahanta, in a discussion on Jhumpa Lahiri's famous novel, which brilliantly deals with the theme of multicultural identity, says that the second-generation diasporas are trapped between two different cultural worlds. One is "unacceptable," and the other is "unaccepting". (Mahanta 2005) Professor Himadri Lahiri, in his book *Diaspora Theory and Transnationalism,* comments on generational conflicts of the diaspora and the tendency of the second generation diaspora towards acculturation. They are more into the host culture. This creates their disassociation with their ethnic and religious culture. (Lahiri 2019)

In its new wave, the Pakistani diaspora literature represents the struggles and moral dilemma of the Pakistani Muslim protagonists in the backdrop of the 9/11 attack. "The war on terror has continuously exposed the Pakistani-Americans, and the wider American Muslims as co-conspirators have created a degree of resentment even to the ordinary American mortals."(Tariq Khan 2020). The diaspora writers observe the complex and changing relationship of the mainstream Americans and Pakistani American Muslims in the wake of terrorism. In Mohsin Hamid's novel, *The Reluctant Fundamentalist* (2007), the protagonist Changez's life takes a new turn in post 9/11 America. Changez is a brilliant student who completed his education at Princeton University in New Jersey and, being sincere about

his career, managed to get his dream job. But the 9/11 terrorist attack negatively affected the identity of South Asian Muslims. This incident puts him in question of his identity in post 9/11 America.

Kamila Shamsie's novel *Burnt Shadows* (2009) is thematically different from her previous novels. In this novel, she has depicted immigrants' lives in America and the effect of 9/11 on them. For dealing with such themes as identity issues, ethnic past, and post 9/11 impact on Muslim immigrants, she can be considered in the 21st century as a literary Florence Nightingale of the Pakistani diaspora. H. M. Naqvi, in his novel, *Home Boy* (2010), has portrayed an attachment with his birthplace Pakistan and multiple identity issues and the effect of 9/11 on Muslim Americans. In fiction, poetry, and essay, a lot of work has been done on this theme.

But it takes comparatively more extended time to flourish such themes in theatre. A theatre production is complex, requiring collaborative work, theatre house, and, most notably, financial funding. The dramas on multiple facets of Pakistani American experiences written by the same ethnic community are "double-minority". Wajahat Ali's play *The Domestic Crusaders* first made its way to the journey of the Pakistani diaspora play written about the post 9/11 problems of the Pakistani Muslims living in America. It was first opened in 2009 at Nuyorican Poets Café, and it was first published in 2011 by McSweeney. The playwright crafted a multi-generational family of Pakistani descent after the terrorist attack of September 11 in America. Ali examines the misrepresentation of Muslims as violent crusaders. The Pakistani American family, spanning three generations of diaspora, tells different stories of their ethnic histories and present conditions in America.

The play *The Domestic Crusaders* is set in a sub-urban Muslim middle class family house. The family is preparing to celebrate the 21st birthday of the younger child, Ghafur. The family spanning three different generations of Pakistani Muslims throws light on the intergenerational cultural conflicts in a foreign land. The play depicts the problems of Muslims living in post 9/11 America. *The Domestic Crusaders* analyses the American Muslims' concerns and burning issues in a war on terror situation. The play depicts various problems in familial relationships like the father-son relationship, mother-daughter bond, and relationships among the siblings. These family members from different generations possess different out-looks to see their

position and bond with America.

Hakim's (grandfather) character shows love for Pakistani culture and everything related to Pakistan. It seems that he is very particular about his choice of things, and he is very strict, never ready to compromise with his will and traditional lifestyle. He is very concerned about his heritage and tradition and tries to teach these to his son and grandchildren. When Salman slapped Ghafur for disrespecting his parents' choice by deciding to become a teacher, Hakim says all of them present there and regrets, "You-all of you-can't let go of our traditions. Respect! Respect for our way of life! If you lose it, your parents, me, we… we've all failed you and our ancestors."(Ali 2010)

Hakim's son, Salman, and daughter-in-law, Khlusoom, belong to the 2nd generation of Pakistani descent. They were born and brought up in Pakistan but came to America for livelihood. The purpose behind their immigration was only for academics and professionals. They are well aware of their root culture and realize the necessity of assimilation in this foreign land. They are trying to acculturate with the new culture and teach their children the value of their root culture and the need for assimilation with the host culture. Salman is making an effort to succeed in his professional as well as personal life. Khulsoom also sacrificed her dream and quit her higher education to raise her children and hope for a happy family.

But things get worse in their lives with the fall of the twin towers. Salman informs Khulsoom how he is not selected for the post for which he was the most suitable one. His job is his only reason to stay in America over the years. He tries his best and proves his efficiency in the workplace. But in post 9/11 America, every equation has changed for Muslims. They face enormous problems and discrimination in the workplace and in everyday routine. They are suspected of having links with terrorist activity without proper evidence. In his family, he is trying to find some solace. But he sees that every child is going against his choice and does not have enough respect for him. Salman clearly sees that his next generation has lost the link of their root culture, and they are all now self-proclaimed Americans. But the reality is not unknown to him, and he is only afraid of consequences.

Salman and Khulsoom's three children, Salahuddin, Fatima, and Ghafur, belong to the third-generation diaspora. They all are born in America and brought up in Islamic as well as American culture. They call themselves

Americans and consider America their homeland. They do not like Pakistani or Muslim culture. They often argue with their elders on their different opinions on various topics. Their identities are formed in a very complex process.

Salahuddin, a twenty-seven-year-old young man, is all-American in his appearance and dressing style. He has no attachment with his parent's Pakistani roots. Unlike their parents, his thoughts are very progressive regarding marrying a person from a different caste, country, or religion. His younger sister, Fatima, believes in the assimilation of Pakistani and American culture. Her appearance and lifestyle show an amalgamation of both these cultures. She wears jeans and modern clothes but also puts on a hijab whenever she steps outside. She is all aware of her Islamic culture and not also unaware of the American style. She actively raises her voice for oppressed women. Her choice of marrying a "black" man reflects her modern attitude with conservative thoughts.

Salman's youngest son, Ghafur, is also a man of modern independent thought. He takes responsibility for protecting the image of Islam. He rejects the comfortable lifestyle of his parents and is not so Americanized as his elder brother. He chooses to live with a hyphenated identity. Showing his concern for his Muslim identity, he decides to "make people unlearn all the misinformation they've been forced their whole lives about Muslims, Islam, Arabs, and the Middle East."(Ali 2010). He wants to be a teacher and not continue his medical education. His decision makes his parents very upset, but he is very much determined about his choice. Salman cannot suppress his anger and even slaps Ghafur. But all of them know that he is the only child who tries to follow their root culture and respect his parents, and the changing situation of Muslims in post 9/11 America bound him to take such a step. His experience in the airport reveals how a Muslim is suspected of terrorism. Ghafur describes his experience, "They spend five minutes doing a body search.... The other passengers stroll on by, witnessing the Muslim-mammal zoo exhibit. I'm sure it made them safe, that I was being sanitized."(Ali 2010)

People of different generations of the diaspora are going through various mental and physical struggles. While people like Salman and Khulsoom are only concerned about their place in American society and economy and trying to inculcate their root culture among their next

generations. But their children have a different attitude towards their root culture and their purpose of life in America. Post 9/11 situation makes a drastic change in the American people's lives, and Muslims are the most affected community. Such a situation entirely changed their lives, affecting their relationships with their family members and the other Americans. The intergenerational gap becomes more vivid after the attack.

The re-examining of hyphenated identity in post 9/11 theatre is best represented in Ayad Akhat's Pulitzer Prize-winning play Disgraced. This play is definitely a mature work in dealing with the theme of national identity in a multicultural land and multiple layers of hyphenated identity in post 9/11 America. The play's success and recognition were limited to the American theatre audience, but it reached out worldwide. This success gives credit to South Asian American theatre and opens new vistas in the theatrical world. Ashis Sengupta mentions that South Asian American theatre brings a new kind of "aesthetic" to introduce a different understanding of "a diasporic consciousness that both encompass a plural sense of nation, belonging, and ethnic and cultural identity in a transnational capitalist and global context and is, at the same time, not free of tension between those plural narratives and positionings."(Sengupta 2012)

Ayad Akhtar's *Disgraced* premiered at American Theatre Company in Chicago on 30th January in 2021 and started to gain immense success. Then it was staged in Off-Broadway Lincoln Theatre in October of the same year. In March 2015, it ran for five months at the Lyceum Theatre on Broadway. Akhtar mainly focused on the "misrepresentation of Muslims" and the psychological aspects of the Pakistani Muslims in post 9/11 America. The protagonist Amir Kapoor, who presents himself as an apostate, denies his religious and national identity of being a Pakistani diaspora Muslim and believes Islam as a "backward way of thinking and being". (Akhtar 2015) As the play develops, Amir's act of rejecting his religious identity and his Pakistani origin to avoid various discriminations post 9/11 America becomes clear. Throughout the space, we observe how his hyphenated identity is reframed and continuously reconstructed for multiple reasons. The whole journey of his identity formation evidently shows his psychological pain and his inner transformations.

Amir has married a white woman, Emily. Unlike her husband, she

loves and celebrates the Islamic tradition. She sees it as "the spiritual and artistic heritage we can all draw from". His act of marrying a non-Muslim white woman seems to him a ladder to reach the American upper-middle-class society, and he succeeds in doing so. He was living a life of his desire, marrying a white wife and getting a job. Emily's decision to marry a brown Muslim man indicates her romanticizing the Islamic art. It seems that her primary concern is not her family or her Muslim husband but her love for the appropriation of Islamic art. Her attempt to portray Amir as Velazquez's painting of his Moor assistant "brings complications to how his identity is constructed…Emily's representation of Amir in the painting is an act of ascribing a meaning of identity to this object which serves to define her husband to the world as she sees him."(Alyssa Syahmina Putri 2019)

Amir's effort to resist Emily to draw a parallel between him and the moor in Velazquez's painting shows his resistance to becoming the object of white fantasy. Emily's attempt to project Amir as a brown subject for her painting leaves a significant impact on his psychology. Its effect is reflected in his violent action at the end of the play. Amir deliberately tries to hide his religious and ethnic identity because it gives him pain. But Emily, without paying any attention to Amir's mental condition, only focuses on her project, her painting. Throughout the play, it will be clear that this "fetishization" of the Muslim male by the White female contributed to the overall Identitarian crisis of this Pakistani Muslim man, Amir.

Amir's notion of identity starts falling apart with the arrival of his nephew, who changed his Muslim name Hussein Malik to Abe Jensen requests Amir to give legal counsel to a local imam who is accused of raising funds for terrorist organizations. Amir reluctantly decides to go to the court on his wife's insistence but as an unofficial counsel. Amir's this act of kindness becomes his "Achilles'-heel," and his ethnic identity is now a matter of discussion in his known circle. The revelation of his Islamic identity took a critical turn in the central scene of the play when Issac, Emily's *de facto* promoter in the artistic world and a Jewish curator in the Whitney Museum, and his wife, Jory, an African American woman, Amir's co-worker in the Law firm arrived for a dinner party in their Upper East Side apartment.

The politically correct conversation at the beginning takes a shocking twist when Amir expresses his pride by saying that he felt good and told, "we were finally winning" (Akhtar 2015) on the incident of September 11.

Here the word "we" suggests Amir's first-time acceptance of being a Muslim in the play. Within a few minutes, Amir's American dream shatters when he realizes that despite all his extensive experiences and eligibility, Jory will become the partner of the law firm, not him, because his association with the imam has become public. Along with this shocking revelation, Emily's affair with Isaac shatters every aspect of a perfect narrative of assimilation. As Jory and Isaac leave Amir in a fit of anger starts hitting his wife, Emily, in "a discharge of a lifetime of discreetly building resentment"(Akhtar 2015).

Akhtar represents Amir's character in a very controversial way. Being raised in a Pakistani Muslim family, Amir faces numerous problems to assimilate with the American culture. After all his effort, when he starts to think that now the situation is better for him, he faces the blow of 9/11. It has shaken his dreams and his life. The post 9/11 situation makes him change his religious and national identity. Being a first-generation diaspora, Amir decides to keep a South Asian name that also contains his first name. The fact also shows his attachment to his root culture. But his nephew, who is a second-generation diaspora, is less connected with his ethnic root and changes his Muslim identity and took a Christian name. Akhtar also analyses that the struggles and problems are different for the members of the other generation.

The Domestic Crusaders by Wajahat Ali and *Disgraced* by Ayad Akhtar open a new vista for the South Asian American drama. Both of these plays respond to the experiences of the Muslims received in the aftermath of the 9/11 attack. The negative representations of Muslims found a significant place in Pakistani diaspora literature, a pressing theme that needs proper attention. Wajahat Ali and Ayad Akhtar, in their plays in the exploration of the identity struggles of Muslim Americans of different generations, examine the interplay of various crucial contemporary debates through the lens of post 9/11 developments.

The Muslim characters are trying to assimilate with the host culture, and in such ways, their hyphenated identity is formed. The first-generation diaspora is found more inclined towards the homeland that prevents them from accepting the foreign culture. Amir's character not only understands his identity as triangulated identity, i.e., being an American, Pakistani, and a Muslim also but also a hybrid identity which is constructed not only based

on the dominant representation and perception but also with the amalgamation of self-representation and self-perception. The second-generation diasporas do not visualize the problems before they face the post 9/11 scenario. The attack surfaces the discrimination against the immigrants. It also reveals the differences of nature towards assimilation among the different generations of diaspora. The indifferent nature of both Americans and immigrants regarding the matter of accepting each other creates confusion. This confusion leads to misperceptions and misrepresentations of both communities.

Works Cited

Akhtar, Ayad. Disgraced. New York: Dramatists Play Service Inc., 2015.

Ali, Wajahat. The Domestic Crusaders. San Fransisco: McSweeney, 2010.

Alyssa Syahmina Putri, Herlin Putri Indah Destari. "On the Orientalism and Neo-Orientalism in Ayad Akhtar's Disgraced: Analysis on the Dynamics of Amir and Emily's Relationship." Humaniora. October 2019. https://pdfs.semanticscholar.org/84de/f18bd7e2ef769d320bf113c533c64e44411b.pdf (accessed March 16, 2021).

Lahiri, Himadri. Diaspora Theory and Transnationalism. Hyderabad: Orient Blackswan Private Limited, 2019.

Mahanta, Banibrata. "Of Coats, Names and Identies: Jhumpa Lahiri's The Namesake". Dialogue, 2005: 68-76.

Sengupta, Ashis. "Staging Diaspora: South Asian American Theater Today." Journal of American Studies, 2012: 837.

Tariq Khan, Safeer Awan. "Cultural Hybridity and Post-9/11 Transformation: A Pakistani-American Experience." ResearchGate. March 2020. https://www.researchgate.net/publication/339926809_Cultural_Hybridity_and_Post-911_Transformation_A_Pakistani-American_Experience (accessed July 15, 2021).

Sabnaz Parvin - M.Phil Research Scholar, Dept. of English, Visva-Bharati University, Santiniketan.

নাটক

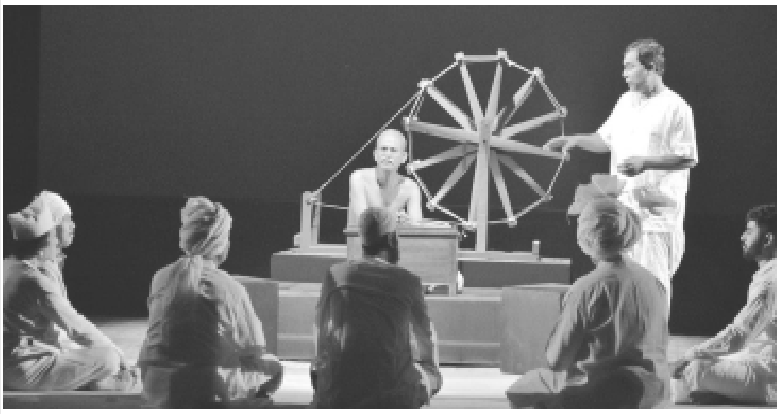

‘বাপুজী’ নাটকের একটি মুহূর্ত

‘M.I.G.A’ নাটকের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

স্মৃতির অলিন্দ থেকে

নাটক রচনায় ত্রিপুরা রাজ্যের রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য। ১৮৯৭ সাল থেকে পাশ্চাত্য রীতিতে স্টেজ বেঁধে নাটক শুরু। মহারাজা বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সংস্কৃতিপরায়ণ সুযোগ্য পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের পৃষ্টপোষকতায় "উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ" এর পরিবেশনায় নাটক "পতিব্রতা"। নাটককার মহারাজ কুমার মহেন্দ্র দেববর্মা। এটিই রাজ্যের প্রথম নাটক হিসাবে পরিগণিত এবং মুদ্রিত। পরবর্তি নাট্যানুরাগী মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নাট্যচর্চা অধিকতর সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। দেশ স্বাধীন হলে ত্রিপুরা ভারতে যোগ দেবার পর শুরু হয় আরেক অধ্যায়। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সুধন্ব দেববর্মা, ত্রিপুরেশ মজুমদার, শক্তি হালদার সহ বহু নাট্য-নিবেদিত প্রাণ নাটক লিখে এবং মঞ্চস্থ করে নাট্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যান। ষাট এর দশক পেরিয়ে এলো সত্তর এর দশক। ত্রিপুরার নাটকে লাগল আধুনিকতার ছোঁয়া। গঠিত হলো অনেক গ্রুপ এবং সৃষ্টি হলো বহু মৌলিক নাটক। নাটক লেখায় যেন জোয়ার এলো। বিশিষ্টদের মধ্যে নাটক লিখে সাড়া জাগালেন অজিত মজুমদার, নিখিল ভট্টাচার্য, কমল রায়চৌধুরী, চন্দন সেনগুপ্ত সহ অনেকে। ত্রিপুরার নাট্যক্ষেত্রে 'নক্সীকাঁথার মাঠ', 'দেবোনা তিতুন', 'সাদা পায়রার জন্য' বা ' অন্য পৃথিবী' সহ বহু নাটক রাজ্য এবং বহিরাজ্যে বিশিষ্ট নাট্যজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চমক সৃষ্টি করলো। জীবনে সমসাময়িকতার আঙ্গিকে এইসব কালজয়ী রচনা ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনকে গভীরভাবে ঋদ্ধ করলো।

তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা অতীতে সফল নাট্য রচনা করে সারা দেশে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের একটি করে নাটক ত্রিপুরা থিয়েটারের প্রতি সংখ্যায় ছাপা হবে। আমরা বিশ্বাস করি তাদের নাট্যরচনা পাঠ করে বর্তমান প্রজন্ম বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হবে। ২০২০ সাল থেকে শুরু। এবার দ্বিতীয় নাটক, কমল রায়চৌধুরীর "দেব না তিতুন" - সম্পাদক

দেব না তিতুন

কমল রায়চৌধুরী

প্রারম্ভিক দৃশ্য

মঞ্চের সামনে প্রোসেনিয়ামের কাছ ঘেঁষে একটি শহীদ বেদী। শহীদ বেদীর সামনে একজন রাজনৈতিক কর্মী ভাষণ দিচ্ছেন।

নেতা ঃ বন্ধুগণ, আপনারা জানেন রাজার আমলের নিষ্ঠুর তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই

করতে গিয়ে খোয়াইয়ের পদ্মবিলে কুমারী, মধুতি, রূপশ্রী—এই তিন কৃষক রমণী শহীদ হয়েছিলেন। আজ আমরা তাঁদের স্মরণ করতে চলেছি। এখন উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট মৌন অবলম্বন করে এই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

নেপথ্য গীত ঃ

অভাগিনী ত্রিপুরার দুঃখের কাহিনী।
দুঃখভরা এ কাহিনী আজ
শোনাতে যাই—
আমরা ত্রিপুরার নারী
স্বদেশে বিদেশিনী গো—
মোদের ঘরবাড়ি নাই।

নেপথ্যে শ্লোগান ঃ শহীদ স্মরণে আপন মরণে রক্তঋণ শোধ করো।
অমর শহীদ, তোমাদের ভুলছি না ভুলব না।
মধুতি, কুমারী, রূপশ্রী তোমাদের ভুলছি না।
শহীদের রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ।

নেতা ঃ [ইঙ্গিতে— আপনারা আসন গ্রহণ করুন] বন্ধুগণ, যে বীর মায়েদের উদ্দেশ্যে আজ আমরা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি, আসুন আমরা স্মরণ করি ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে। যে ঘটনায় তাঁরা বলি দিয়েছিলের প্রাণ, যে ঘটনা ত্রিপুরার গণ আন্দোলনে সৃষ্টি করেছিল নতুন জোয়ার— কেন তাঁদের রক্ত দিতে হয়েছিল? তাঁদের হত্যা করেছিল স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের সৈন্য বাহিনী। বলতে আমাদের লজ্জা হয়, যারা এই জঘন্য কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল, তারা আমাদের এ দেশেরই মানুষ। আর এদেশেরই সরকারের নির্দেশে তারা গুলি করেছিল এই তিন নিষ্পাপ মায়ের বুকে। তখন ভারতবর্ষ ছেড়ে ব্রিটিশ সরকার চলে গেছে। স্বাধীন ত্রিপুরা সবে যোগ দিয়েছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। মহারাজা বীরবিক্রমে র উত্তরাধিকারী কিরিটবিক্রম তখন নাবালক। ত্রিপুরায় চলছে মহারানী কাঞ্চনপ্রভার রিজেন্ট শাসন। গণমুক্তি পরিষদের ডাকে তখন ত্রিপুরাবাসী লড়াই করছিলেন গণতন্ত্রের জন্যে, স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্যে। ত্রিপুরার পাহাড়ে পাহাড়ে অরণ্য কন্দরে এই আওয়াজ উঠেছিল— ‘প্রজার ভোটে মন্ত্রী চাই। রিজেন্ট শাসন বাতিল করো। রাজতন্ত্র বাতিল করো। গণতন্ত্র কায়েম করো।’ রাজা পুরোহিত আর তাদের তল্পীবাহকদের কল্যাণে দীর্ঘকালের অচল সমাজব্যবস্থায় এখানে জমেছিল কুসংস্কার, নানা রকমের কুসংস্কার—ডাইনী মারা, জামাই ওঠা, তিতুন প্রথা—

পদ্মমোহন ঃ [দর্শকদের মধ্য থেকে] তিতুনের কথা কিছু কও কমরেড।

নেতা ঃ বলব কমরেড, বলব—

পদ্মমোহন ঃ কখন কইবেন?

নেতা ঃ এই তো বলছি, শুনুন। একটা নিয়ম ছিল ত্রিপুরার—তার নাম ছিল—তুই-তুন—অপভ্রংশ হয়ে তাই হয়েছে 'তিতুন'। রাজার সৈন্য কিংবা কোন রাজকর্মচারী গ্রামে এলে গ্রামবাসীকে বিনে পয়সায় তার সব কাজ করে দিতে হতো—তার বোঝা মালপত্তর বহন করতে হতো —এর নাম ছিল তিতুন প্রথা—এক কথায় বেগার খাটা। আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন—

পদ্মমোহন ঃ বাপরে এমনঐ, খাইতে বইলেও মাফ্ নাই, শরীর আলিস লাগলেও মাফ্ নাই?

নেতা ঃ হ্যাঁ, জ্বর, জারি অসুখ হইলেও রেহাই নেই—এরই নাম ছিল তিতুন প্রথা। রাজতন্ত্রের অন্যান্য কুফল গুলোর সঙ্গে সঙ্গে এই তিতুন প্রথা মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রাজা ও তাবেদার চৌধুরী তালুকদারদের অত্যাচারের ফলে মানুষ যতই জেগে উঠছিল, ততই তারা তিতুন দিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করছিল। পাশাপাশি সমাজ সংস্কারের কাজও চলছিল। ডাইনি বলে মেয়েদের পিটিয়ে ফেলার একটা কুৎসিত সংস্কার চালু ছিল। গণমুক্তি পরিষদ থেকে তা নিষিদ্ধ করা হলো। জামাই ওঠার মেয়াদ এক বছরে সীমাবদ্ধ করা হলো । জামাই ওঠা কি? জামাই ওঠা—

পদ্মমোহন ঃ বিয়া হইবার আগে মাইয়ার বাপের বাড়িত গিয়া থাকন লাগত পুলার—ইতারেনু কই জামাই ওঠা?

নেতা ঃ হ্যাঁ—সংক্ষেপে এই হলো জামাই ওঠা।

পদ্মমোহন ঃ আমি নিজেই খাটসি তিন বচ্ছর—আপনে জানসে নি কমরেড? অনেক বছর খাইট্যা তারপর বিয়াঐ হইত না। অনেক শ্বশুর চাইর পাঁচ বচ্ছর খাটাইয়া তাড়াইয়া দিত জামাইরে। পরিষদ যখন জনগণের কাছে আবেদন প্রচার করলেন, তরুণ সমাজ তাতে উৎসাহিত হলেন। দলে দলে তরুণ-তরুণী মুক্তি পরিষদে যোগ দিতে লাগলেন। জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে সাংগঠনিক চেতনা এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। যে চেতনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছিল 'দেবো না তিতুন'।

[নেতা বসে পড়েন]

পদ্মমোহন ঃ ভালই অইছে। আমরা একখানা পালা করছে। নাম দিছে ইতার– 'দেবো না তিতুন'। আপনারা দেখেন আর কি! ও শচীন্দ্র, যাত্রা গানের জিনিষপত্র লইয়া আস। অনেক দেরি হইয়া গেছে। (মঞ্চের উপকরণ নিয়ে সভা থেকে কয়েকজন মঞ্চে উঠে যায়। দৃশ্যানুযায়ী মঞ্চ সাজায়। মেয়েরা গুন গুন বিশ্ববাসী গানটি গাইতে থাকে। এই গানের রেশ নিয়েই আলো নেভে)।

প্রথম দৃশ্য

লক্ষ্মীচরণের টঙ ঘর।

পদ্মমোহন ঃ নমস্কার— আমরার পালাখানার নাম আপনারা শুনছেন— 'দেবো না তিতুন'। তিতুন কি তা কমরেড কইছেন। অখন আপনারা দেখেন আর কি— তিতুন কেমনে দেঅন লাগত— একদিন চৌধুরী লোক পাঠাইছে এই প্রজার বাড়িত। প্রজার নাম লক্ষ্মীচরণ। লক্ষ্মীচরণের তখন শরীর আলিস লাগছে। আমি হইতাছি লক্ষ্মীচরণ—

পদ্মমোহন যেন লক্ষ্মীচরণ হয়ে শুয়ে পড়ে কোঁকাতে থাকে। একটি লোক আসে।

লোক ঃ ও দা লক্ষ্মী, চল, চল, তাড়াতাড়ি চল। চৌধুরী ডাকছে—

লক্ষ্মীচরণ ঃ যাইতে পারত না আমি। উঠতাম যে পারি না। পাও ব্যথা, গাও ব্যথা— আলিস লাগছে।

লোক ঃ আলিস লাগলে চলত না। তিতুন দিত নানি? তশিলদার আইসে —

লক্ষ্মীচরণ এতক্ষণে উঠে বসে ।

লক্ষ্মীচরণ ঃ কিতা কইসে? তশিলদার আইসে নি?

লোক ঃ হ, তশিলদার আইসে— যাঅন লাগছে তোমার— অক্ষনই।

লক্ষ্মীচরণ ঃ আমি খাজনা দিমু কেমনে? আমার নু ধান নাই।

লোক ঃ খোরাকির থেক্যাঐ লইয়া লও— নাইলে বাঁচত না।

লক্ষ্মীচরণ ঃ চল, কিতা আর করমু—মরলে মরছে আর কি— [দুই হাঁটুর উপর কনুই রেখে মাথা চেপে ধরে] উঃ ভাই— মাথা ঘুরায়— উঠতে যে পারি না—[কঁকায়] বাড়িত কেউ নাই।

এরই মধ্যে তার বোবা ছেলে এসে ঢোকে।

হক্কলই গেছেগা জুমে। এই বোবা পুলা কুস্তা কইতঅ পারত না তারারে, আমি কেমনে যাইতাম! [বোবারে] ঐ, ইতা ভর্তি কইর‍্যা ধান লইয়া আন ঘরের থিক্যা।

বোবাকে একটি ঝুড়ি দেয়।

লোক ঃ চল ভাই— দেরি করন যাইত না। সব মালপত্র বাইন্ধ্যা লাইছে— তশিলদাররে লইয়া যাঅন লাগব সেংক্রাই বাড়ি। চল—চল—

লোকটি লক্ষ্মীচরণকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ চল্— আর কিতা করত! মরলে মরছে আর কি—

বোবা ছেলে ভেতর থেকে এক ঝুড়ি ধান নিয়ে অতি কষ্টে বেরোয়।

ঐ, তারা আইলে কইস্— আমি গেছি তিতুন দিতে।

লক্ষ্মীচরণ ও লোকটি চলে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চৌধুরী বাড়ি

চৌধুরী ঃ লক্ষ্মীচরণ তা দেখি আইল না— হারামজাদা—কুন্ সময় পাঠাইয়াসি —যে ইতারে আনতে গেছে, হেইতারও আঅনের নাম নাই।

(এমন সময় লক্ষ্মীচরণ ও লোকটি ঢোকে। ওরা চৌধুরীকে নমস্কার করে)।

অত দেরি করসে কিরে—জামাইর মতন হাইট্যা—ভাত খাই নানি?

লক্ষ্মীচরণ ঃ ঠাকুর, শরীল আলিস লাগছে ঠাকুর—

তশিলদার ঃ [জড়িত কণ্ঠে] কি কয় তারা?

চৌধুরী ঃ শরীর মইধ্যে আলিস লাগছে কই।

তশিলদার ঃ আলিস মানে? আলস্য—হা হা হা আলস্যই সকল দুঃখের মূল বুঝলা চোধরী? হালায় এই কারণেই তোমরার জাতটার কোন উন্নতি নাই।

চৌধুরী ঃ ঐ বেতা—তশিলবাবুরে লইয়া সেংক্রাই বাড়ি দিয়ে আয় যা।

লক্ষ্মীচরণ ঃ আমি পারত না। এমনেই হাটতে পারে না আমি— মাথা ব্যথা, পাও ব্যথা—

চৌধুরী ঃ হারামজাদা—ফাঁকিবাজ—বদমাইশ্—শইতান! কিতা কইলে তুই! পারত না? কাইত্যা লাইব তরে—তিতুন না দিলে কিতা হই জানে নানি তুই?

লক্ষ্মীচরণ ঃ কিরে তশিলবাবু হাইত্যা যাইত পারে নানি?

চৌধুরী ঃ তর যাঅন লাগব আমি কইসে।না গেলে জানে বাঁচত না কইয়া দিল! তশিলবাবু মাল খাইসে দেখসে নানি তুই—হারামজাদা!

লক্ষ্মীচরণ ঃ [ভেঙে পড়ে] আমি পারত না ঠাকুর—আমি পারত না।

দুহাতে মাথা চেপে বসে পড়ে।

তশিলদার ঃ ঠিক আছে— না গেলে আমি রিপোর্ট কইর‍্যা দিমু। প্রজারা কেউ কথা শুনে না– এই গ্রামে প্রজারা সব রাজদ্রোহী- চৌধুরীকে কেউ মানে না।

চৌধুরী ঃ আপনে রাখ তশিলবাবু—হে যাইব। ভালা ও কইব— যাঅন লাগব তার— ঐ বদমাইশ, যাইত নানি তুই?

লোক ঃ ও দা লক্ষ্মী—চল চল—কথা কইস না, চোধরী চেত্সে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ চল্— কিতা করন আর—মরলেওও যাঅন লাগব। চল!

চৌধুরী ঃ ঐ— মালপত্র তুল্— আর দেরি না। ঐ মহেন্দ্র, তুই দেখ হক্কলটি ঠিক মতন লইতেছেনি— আমি একটু ভিতর থিক্যা আইতাছে—ঐ তশিলবাবুরে ল তরা দোলনা কইরা।

(চৌধুরী ভেতরে যায়। তশিলদারকে দোলায় চড়িয়ে তার মালপত্র নিয়ে লক্ষ্মীচরণ অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে রওনা হয়। গ্রামবাসীরা ধানের বোঝা নিয়ে যায়। চৌধুরী দুয়ারে দাঁড়িয়ে তশিলদারকে বিদায় জানায়। যেতে যেতে সমবেত কণ্ঠে) ঃ

হায় আর পারি না— এই বোঝা টানতে
আমরা জন্মেছি শুধু কাঁদতে
এই বোঝা অনেক ভারী,
ওজন যেন পাহাড়টারই—
টানতে হবে বোঝা, পারি আর মরি
গরিব হলে—হয় সবই জানতে।

প্রস্থান।

অন্তর্দৃশ্য

লক্ষ্মীচরণ আবার পদ্মমোহন হয়ে যায়।

পদ্মমোহন ঃ রাজার বাড়িত প্রজারা গেছিল নালিশ লইয়া—তিতুন তুইল্যা দিবার লাগি। কইছিল— ঐ লক্ষ্মীচরণ বাপের আমলে—ঐ মহামুণি সর্দারের নাম শুনছেন নি আপনারা— তারা গেছিল রাজারে কইতে তিতুন তুইল্যা দিবার লিগ্যা। লগে আরও দুই তিন জন প্রজা আছিল। রাজা তারারে তিন দিন রাইখ্যা দিল শূয়রের লগে বাইন্ধ্যা। ঐ কেতা কেতা রাজা মন্ত্রী অইব আইনা কিরে!

(পদ্মমোহন গান ধরে। একে একে অন্যান্য সহকারীরা এসে ঢোকে। ওদের সমবেত নাচ ও গান)।

যাব রাজার বাড়ি (আমরা)
যাব রাজার বাড়ি।
হাতি ঘোড়া নেই আমাদের
পা আমাদের গাড়ি।
রাজা মশাই সিংহ
আর সেনাপতি বাঘ।
(আর) পুরুতমশাই ফোঁসফোঁসিয়ে
কেবল দেখান রাগ।
যাব রাজার বাড়ি ....
ভাইবোনেরা এবার দেখুন— রাজার দরবার।
কেমন ধারায় করেন শাসন দেখাটা দরকার।
যাব রাজার বাড়ি .....
রাজা মশাই কথায় কথায় ঘুরায় তরবারি।
(আর) মন্ত্রী উজির নিলে কেবল মাংস কাড়ি কাড়ি।
যাব রাজার বাড়ি ...

(নাচতে নাচতেই যার যার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ওরা সাজ পরিবর্তন করে রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি ভূমিকার জন্য তৈরি হয়)।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা। সেনাপতি, মন্ত্রী ও পুরোহিত কথোপকথনরত। ভৃত্য দন্ডায়মান।

সেনাপতি ঃ মন্ত্রী মহারাজার কুশল সংবাদ কি?

মন্ত্রী ঃ রাজাধিরাজ মন করেছেন নিবেশ সঙ্গীত চর্চায়, অতি গুণগ্রাহী তিনি। করিছেন বিহার—সুরের ঝরণায়। স্বপ্নিল জগতে—দূর দেশাগত কবি শুনাইতেছেন কবিতা তাঁহারে আজি।

ভৃত্য ঃ [দর্শকদের দিকে] কুরঙ্গিনী সম দাসী দিতেছে তাহারে সুরার অমৃত ভাণ্ড নাচিয়া নাচিয়া।

মন্ত্রী ঃ ধেৎ! ভৃত্য হয়ে স্পর্ধা, কথা বলিবারে রাজসভা মাঝে! রে রে দুর্মতি! আজিকে লইব গর্দান তোর— তরবারি দিয়া।

সেনাপতি ঃ দূর হয়ে যারে সারমেয় আমাদের সম্মুখ হতে— বামন হইয়া বাড়াস হাত চাঁদ ধরিবারে আকাশের?

পুরোহিত ঃ ধিক! শত ধিক তোরে! সাহস নহে ত কম কহিবারে চাস দেবভাষা শূদ্রবংশ হয়ে!

ভৃত্য ঃ পদে ধরি তোমাদের, পিতঃ অপরাধ করে দাও ক্ষমা! মূঢ় আমি, রাজালয়ে থাকিতে থাকিতে শিখিয়াছি রাজভাষা। ঘোরতর করিয়াছি পাপ। পরকালে, নরকে ভুগিব আমি, অসীম যন্ত্রণা, এ জীবনে কেন আর কষ্ট দাও তবে। প্রণিপাত করি আমি, আমি নরাধম। ক্ষমা করি দাও আজি এই অভাগারে।

সেনাপতি ঃ প্রায়শ্চিত্ত কর তবে নাকে খত্ দিয়া! কান মলে উঠাবসা কর শতবার!

ভৃত্য নাকে খত্ দিয়া উঠে দাঁড়ায়।

মন্ত্রী ঃ প্রভুদের কথামাঝে আর কোন দিন গলাবি নে নাক— এই মতো হুশিয়ারি করি দিনু তোরে।

ভৃত্য কান ধরে একবার বসে উঠতেই।

দ্বারী ঃ সাবধান! সাবধান! প্রজাপতি মহারাজ আগমনরত— যাঁহার করুণাপরে বেঁচে আছি মোরা অভাজন দীন দুঃখী।

মহারাজার প্রবেশ।

সকলে ঃ [পুরোহিত ছাড়া] প্রণমি চরণে ভগবন! মোরা তব পদতলে আছি প্রস্তুত সতত। তব আজ্ঞা তরে চেয়ে থাকি তব পদাম্বুজপানে নিরবধি।

মহারাজা উপবেশন করে।

মহারাজা ঃ পারিষদগণ, আজি অতি ঘোরতর সমস্যার সমাধান তরে বসাইনু দরবার। মোর কাছে আনিয়াছে বার্তা চরগণে। প্রজাকুল হয়েছে অশান্ত। চাহে না তাহারা মানিতে শাসন আর— চাহিতেছে সবে তিতুনের অবসান।

পুরোহিত ঃ এই কি দারুণ বার্তা পশিল আজিকে কর্ণে আমার। সৃষ্টি বুঝি পাইবে লোপ। দুঃসহ এই রাজদ্রোহ! হে রুদ্র জাগো! মহাকাল বাজাও দুন্দুভি তীব্রস্বরে।

ব্রাহ্মণের তেজ দিয়া করিব তাদের ভস্ম চিরতরে।

সেনাপতি ঃ মহারণডংকা বাজিতেছে আমার অন্তরে। শিক্ষা দিয়া দিব আজি বন্য মূর্খদের। সৈন্যদল পাঠাইয়া নিশ্চিহ্ন করিব তাদের বসতি— আর জ্বালাইব শস্য ক্ষেত্র।

মন্ত্রী ঃ নহে মহারাজ! এ নহে প্রকৃত পথ। বল দ্বারা নহে সোজা কার্যের পথ সাধন, ভিন্নতর পথ আজি হবে নির্ধারিত। বিদ্রোহ ভাঙিতে ভেদবুদ্ধি শ্রেয় তর। প্রজারা নারিবে তুলিতে মস্তক—যদি ঐক্যবল ভাঙে তার।পারিবেন পুরোহিত এই ভার নিতে— রাজস্বার্থে—

দ্বারী ঃ মহারাজ, দ্বারে কিছু গেঁয়ো লোক চায় দরশন।

মহারাজ ঃ রাজকার্যে ব্যস্ত অতিশয়।

সেনাপতি ঃ গিয়ে বলো, মিলিবে না দরশন।

দ্বারী ঃ অনেক বুঝাইনু তাদের, রাজন্! না শুনে তাহারা। বধিরসম শুধু হেটমুণ্ড হয়ে থাকে দাঁড়াইয়া।

পুরোহিত ঃ যাও, বলো গিয়ে, সময় নাইকো হাতে, ইতরজনের কথা শুনিবার তরে।

দ্বারী ঃ মহারাজ, সঙ্গে আনিয়াছে উপাচার নানাবিধ। রাজপদে করিবারে চায় নিবেদন।

পুরোহিত ঃ [উৎফুল্ল] মহারাজ! আজ্ঞা দিন তবে।

মন্ত্রী ঃ মনে হয় নৃপবর, আসাটাই ভাল উহাদের। রাজদ্রোহ রুধিবার তরে মনে হয় চরম সুযোগ সমাগত।

মহারাজ ঃ যাও তবে দ্বারী। বলো তাদের আসিতে। নিয়ে এসো ত্বরা করি।

দ্বারীর প্রস্থান।

মন্ত্রী ঃ মহারাজ চমৎকার সুযোগ এসেছে আমাদের হাতে। আসিতেছে যারা আজ রাজার সভায়। সুনিশ্চিত রাজভক্ত, অনুগত, বিভীষণ সম—তাদের শিরোপরে বুলাইয়া হাত— নৃপবর লাগাইব বিভেদের কাজে।

মহারাজ ঃ ধন্যবাদ! অতি উত্তম বুদ্ধি মন্ত্রীবর। নাশিতে প্রজার বিদ্রোহ এত সোজা এই পথ, নাহি পারি বর্ণিবারে।

সেনাপতি ঃ আসিতেছে ওরা।

প্রজাদের নিয়ে দ্বারীর প্রবেশ।

প্রজাবৃন্দ ঃ জয়! জয়! মহারাজ! জয় রাজ্যেশ্বর, জয় জয় ভগবান।

প্রণিপাত করে।

মহারাজ ঃ কোন হেতু আসিয়াছ রাজসভা মাঝে, পুত্রগণ করো নিবেদন। বলো দুঃখ তোমাদের। তোমাদের তরে সতত কাঁদিছে হিয়া। প্রাণ করিতেছে আনচান, শুনিবারে ব্যথা তোমাদের, জানিতে প্রার্থনা তব।

প্রজাবৃন্দ ঃ প্রভু, সব্বনাশ হইয়া গেছে প্রভু। যদি রক্ষা না কর— তাইলে বাঁচব না একদম বাবা—

মহারাজ ঃ বলো বাছাগণ, কি তব প্রার্থনা আজি? যতক্ষণ হাতে আছে এই রাজদণ্ড, চূর্ণ

করি দিব সব বিপদ-আপদ।

পুরোহিত ঃ বাঘে ছাগে করিছে বসতি এই রাজ্যে। নির্ভয়ে বলো দুঃখ তব রাজ-সমীপে।

(প্রজারা না বুঝে অপ্রস্তুত। একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। নির্বোধের মতো হাসতে থাকে)।

সেনাপতি ঃ [ওদের তাড়া দিয়ে] এই বলো! না করিয়া কালক্ষেপ আর। [সভাসদদের দিকে] কিছু না বুঝে— বন্য, মূর্খ উল্লুকেরা!

প্রজা ১ ঃ মহারাজ, মইর‍্যা যাইব একেবারে— তিতুন দিবার লাগি কইয়া তোমার কর্মচারী হইলে—মাইরা পিত্যা শেষ কইর‍্যা লাইসে।

প্রজা ২ ঃ তিতুন বন্ধ কইর‍্যা দাও মহারাজ।

প্রজা ৩ ঃ আমাদের বাঁচাও তুমি বাবা—

মহারাজ ঃ চুপ কর্! ওরে দুরাচার— কম নয় তোদের স্পর্ধা—অসভ্য পাহাড়ীর দল।

পুরোহিত ঃ উল্টে দিতে চাস তোরা— ওরে রে দুর্মতি, অনাদিকাল এই ভগবৎবিধি?

মন্ত্রী ঃ তিতুনের নীতি এই রাজধর্ম রক্ষিবারে—তুলে দিতে চায় তারে কোন্ সে অসুর! অধর্মে ছাইবে দেশ, হবে মাৎস্যন্যায়— থাকবে না প্রশাসন—

সেনাপতি ঃ আদেশ করুন মহারাজ! এক কোপে কেটে নেই মাথা নির্বোধের। সমুচিত সাজা দেই আজ।

মহারাজ ঃ অবশ্যই করিতে হবে নির্মম বিচার, সভ্যতা কাহাকে বলে শিখে যাক ওরা, বন্যরা কভু না বোঝে সহজ কথায়। প্রতিহারী ধরে নিয়ে যাও বন্যদের। অন্ধ কারাগারে রেখে দাও বন্দী করে, যতদিন এরা ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ক্লান্ত, বাক্শক্তিহারা নিস্পন্দ আনত শির ভূমিতে লুটায়, প্রহারে তারে করে দাও জরজরে—

(প্রজারা কিছু না বুঝে একে অপরের দিকে চেয়ে হাসে। যেন তারা প্রতিকার পেয়ে গেছে)।

সেনাপতি ঃ প্রতিহারী, নিয়ে যাও এইক্ষণে বেঁধে— যা ওরে দুষ্টমতি, অসহায় ভয়ার্ত আর্তনাদে করিবি বিলাপ প্রহারের চোটে— চাবুকের তলায় তোদের কান্না খুড়িয়া মরিবে প্রাণহীন প্রাসাদের অন্দরে কন্দরে রাত্রিদিন।

প্রতিহারী ওদের বেঁধে নিয়ে যেতে থাকে। ওরা কিছু বোঝে না।

প্রজাবৃন্দ ঃ বাবা মহারাজ— কিতা করসে তুমি? বাবা, আমরা কুস্তা কইত না আর। বাবা, আমরারে ছাইর‍্যা দাও বাবা—

সেনাপতি চাবুক তুলে ওদের স্তব্ধ করে দেয়।

সেনাপতি ঃ চুপ কর।

পুরোহিত ঃ ওরে পাপিষ্ঠ!

মন্ত্রী ঃ রে নরাধম!

মহারাজ ঃ চিরতরে স্তব্ধ হোক এই দুঃসাহস!

প্রজারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আলো নেভে।

অন্তর্দৃশ্য

পথ। আলো জ্বললে পদ্মমোহনকে আসতে দেখা যায়।

পদ্মমোহন ঃ রাজার কাছে নালিশ কইর‍্যা কুনু কাম হইল না। মুখ বুইজ্যা সবঐ সহ্য কইর‍্যা থাকন লাগে প্রজার। আর রাজার লগে যুদ্ধ কেমনে করত কন আপনারা? ঐ যে লক্ষ্মীচরণ তিতুন দিয়া মরে, রাজার খাজনা দিয়া তার ঘরে খোরাকই থাকে না। কত কই তারে। তবু হে উইঠ্যা দাঁড়াই না। কেমনে দাঁড়াইত? নানা রকম সংস্কারে নু হে আষ্টেপৃষ্ঠে বান্ধা। অখন আমরার পালার পরের দৃশ্য আপনারা দেখেন। জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু হইবার সময় এক যুবক আইছেন তারার গেরামে। ও কমরেড, তুমি — তুমি আও— তোমার রামকুমারের পাট করন লাগব।

নেতা ঃ বলেন কি? আমি—

পদ্মমোহন ঃ হ, হ, আপনেঐ পারবেন। আপনেত জানেঐ আমরার পালাখান। কিতা করমু কন্— এ পাটটা যে করত হে ত আইসে না—

নেতা ঃ আচ্ছা, চলুন—

পদ্মমোহন ঃ ঐ, অখন জনসভার দৃশ্য। আইয় তোমরা তাড়াতাড়ি।

সমবেত ভাবে নাচতে নাচতে ও গাইতে গাইতে ঢোকে।

গান ঃ চল চল চল / পোকা মারতে চল।
পোকায় খেল ধান
পোকায় খেল ধান।
(আর) রাজা ভুঁইয়া চৌধুরীরা মোদের খেল জান।
চল চল চল
চল চল চল
তিতুনেরে শেষ করিতে বলেছিলাম আমরা।
রাজামশাই শুনে রেগে তুলল পিঠের চামড়া।
দুঃখ মোদের বলব কারে
মুক্তি পাব কেমন করে
সবাই মিলে গাইব এবার
বিদ্রোহেরই গান।
চল চল চল ।

ওদের নাচ গান চলার মধ্যেই বুড়োরা একে একে আসতে থাকে ও বসে। রামকুমারও আসে। এক পাশে বসে। পদ্মমোহন এবার লক্ষ্মীচরণের ভূমিকায়

লক্ষ্মীচরণ ঃ কৈ কেটা আইছে, আমারে ডাকছে?

রামকুমার ঃ [দাঁড়িয়ে] আমিই ডেকেছি— আপনারা কষ্ট করে এসেছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

জনৈক ঃ চোধরী বাড়িত না ডাইক্যা এইখানে ডাকল কিরে?

রামকুমার ঃ এখানে কেন ডেকেছি, আপনারা অবশ্যই জানতে পারবেন— আমি আগে সংক্ষেপে আমার উদ্দেশ্যটা বলে নেই। শুনুন আমার শ্রদ্ধেয় প্রবীন ব্যক্তিগণ, শুনুন আমার সমবয়সী কিংবা বয়ঃকনিষ্ঠ ভাইবোনেরা— আমি এসেছি আপনাদের কাছে একটা খবর নিয়ে। আমরা সারা ত্রিপুরায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজার কাছে দাবী করছি। গ্রামে গ্রামে স্কুল করে দেবার কথা বলেছি- কিন্তু রাজা আমাদের দাবী মানেননি। আমরা তাই সারা ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলব—আর পাশাপাশি যত দিন না রাজা স্কুল করে দেয়, ততদিন আমরা নিজেরাই গ্রামে গ্রামে স্কুল গড়ে তুলব— নিজেরাই চালাব।

লক্ষ্মীচরণ ঃ কই থিক্যা আইস তুমি এই গেরামে?

জনৈক বয়স্ক ঃ বাড়ি ঘর ফালাইয়া কেরে আইসে তুমি?

রামকুমার ঃ পাশের গ্রামেই আমার বাড়ি— আমি, মানে আমরা— মানে যারা জনশিক্ষা সমিতির সদস্য, আমরা শিক্ষা প্রচারের জন্য এসেছি।

লক্ষ্মীচরণ ঃ বিয়া করসে না নি তুমি?

রামকুমার ঃ [ঈষৎ লজ্জিত, মৃদু হেসে] না, বিয়ে থা করিনি।

লক্ষ্মীচরণ ঃ বিয়া করছ না! এত বয়স হইসে—শ্বশুর খেদাইয়া দিসে নি তোমারে?

লক্ষ্মীচরণ ও অন্যান্য বয়স্করা হেসে ওঠে।

রামকুমার ঃ শুনুন দাদা, বিয়ে থা করলে আমাদের চলবে না— মানুষকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, গ্রামে গ্রামে ইস্কুল কলেজ করতে হবে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ কিতা হইব ইস্কুল কইর‌্যা?

রামকুমার ঃ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ ঐ ঠাকুর—কর্তা— রাজা-মহারাজার পুলাপানের মতন? [হাসতে হাসতে] আমরার পুলাপান লেখাপড়া কইর‌্যা কিতা করত?

রামকুমার ঃ দেখুন আমাদের সমাজটা কি অবস্থায় রয়েছে— পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ কত এগিয়ে গেছে। আর আমরা কোথায় পড়ে আছি। অন্য দেশের মানুষ এখন কলের গাড়ি বানিয়ে আকাশে উড়ছেন পাখির মতো— ঘরে বসে বসেই হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলছে— [প্রবীণরা হাসে, যুবকরা অবাক হয়] আর আমরা কোথায়—কেন আমাদের এই অবস্থা? একবার ভেবে দেখেছেন কি? আমাদের রাজা বছর বছর কেবল আমাদের ঘর থেকে খাজনাই নেন—বিনিময়ে কি দেন? কিছু দেননি—গ্রামে এসে জোর করে মানুষকে দিয়ে তিতুন দেয়ানো হয়—বেগার খাটানো হয়—মরতে মরতেও ঐ রাজা-জমিদারদের বোঝা আমাদের বইতে হয়।

লক্ষ্মীচরণ ঃ তিতুনটা খারাপই—ইটা তুইল্যা দিলেঐ ভালা হইত।

রামকুমার ঃ আপনারা কি মনে করেন রাজা ওটা তুলে দেবেন নিজের থেকে? কখনও

না। এ সমস্ত খারাপ জিনিস দূর করতে হলে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ তুমি ত কইল বাবু—কিন্তু রাজার লগে যুদ্ধ কইর‍্যা কি আমরা পারব নি?

জনৈক - রাজা হইল ভগবান।

রামকুমার ঃ এটা হল একটা ধাপ্পা—মিথ্যা কথা। একটা অত্যাচারী কখনও ভগবান হতে পারে? যুগ যুগ ধরে আমরা রয়েছি অশিক্ষার অন্ধকারে। তাই এ সব বুজরুকিতে আমরা এখনও বিশ্বাস করি। এখনও আমরা বয়স্কা মহিলাদের ডাইনি বলে সন্দেহ করে পিটিয়ে মারি—এখনও জামাই ওঠার নাম করে শ্বশুর বাড়িতে ছেলেদের খাটানো হয় পাঁচ-ছয় বছর।

লক্ষ্মীচরণ ঃ বাবু কিতা কও? জামাই ওঠা তুইল্যা দিত নি?

রামকুমার ঃ হ্যাঁ—ওই জামাই খেটে খেটে আমাদের তরুণেরা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার যৌবনটা চলে যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি জামহি খাটতে খাটতে— কবে যে উঠে দাঁড়াবে? সে লেখাপড়া শিখবে কবে? কাজেই সে যখন বুড়ো হয়—

লক্ষ্মীচরণ ঃ চাষার পুলাপান লেখাপড়া শিখ্যা কিতা করত? ভালই করছে রাজা ইস্কুল না দিয়া।

রামকুমার ঃ আমি নিজেও চাষীর ছেলে—আমি সামান্য কিছু পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছি—যে সামান্য সুযোগ আমি পেয়েছি, তার দ্বারা পৃথিবী সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান আমার হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি বিভিন্ন রকমের কুপ্রথা আমাদের জাতিটাকে পঙ্গু করে রেখেছে, আর এ সমস্ত কুপ্রথা টিকে রয়েছে শুধু অশিক্ষার দরুন।

লক্ষ্মীচরণ ঃ ধ্যুৎ! ইতা শুইন্যা আমার চলত না—আমি যাইগা।

রামকুমার ঃ শুনুন, যাবেন না। শুনুন—আমরা দেশের নতুন তরুণ সমাজ উঠে চাঁড়াতে চাই, আমাদের সাহায্য করুন।

লক্ষ্মীচরণ ঃ লেখাপড়া শিখ্যা, জামাই ওঠা তুইল্যা দিবার কথা কই—কয়দিন পরে মা-বাপরেঐ মানত না।

জনৈক ঃ ধর্ম মানে না, ভগবান মানে না—

লক্ষ্মীচরণ আর তার সঙ্গী চালে যায়।

কুমারী ঃ ঠিক আছে। তারা গেলে গিছে, আমরাঐ শুনব বাবু কিতা কয়।

নরেন্দ্র ঃ কও, কও। তুমি কও বাবু ।

রামকুমার ঃ বন্ধুগণ, প্রতি মুহূর্তে আমাদের সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়। আর সেই সংগ্রামে জয়ী হতে হলে আমাদের লেখাপড়া শিখতে হবে। আজকাল লেখাপড়া না শিখলে কোন যুদ্ধ জয় করা যায় না।

নগুরাই ঃ তিতুন তুইল্যা দেওন লাগব।

নরেন্দ্র ঃ রাজার অত্যাচার বন্ধ করন লাগব।

রামকুমার ঃ রাজার অত্যাচার বন্ধ করতে হলে আমাদের লড়াই হবে রাজার সঙ্গে। রাজার

সঙ্গে লড়াই বাঁধলে আসবে ব্রিটিশ। ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে শোষণ করছে। ঐ ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্যে ভারতের মানুষ লড়াই করছেন— সে লড়াইয়ের সঙ্গে এক হয়ে আমাদের লড়তে হবে— লেখাপড়া শেখা হলো সেই লড়াইয়ের প্রথম প্রস্তুতি।

মুংকুরুই ঃ ভালা কথা—আমরা লেখাপড়া শিখব।

রূপশ্রী ঃ আমরা ত লেখাপড়া শিখতে পারছি না— আমরার পুলা পাইনেরে শিখাইব— কইয়া দাও ইস্কুল কেমনে করে।

রামকুমার ঃ হ্যাঁ—নিশ্চয়ই বলব, নিশ্চয়ই বলব। আজ আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে দিদি! কেমন করে আমি বলব— যে প্রবল উৎসাহ নিয়ে আপনারা এগিয়ে আসছেন—বিশেষ করে মেয়েরা, তাতে আমার স্থির বিশ্বাস— আমরা জয়ী হবই।

মধুতি ঃ বুড়ারা ত গেল গা— পারবনি আমরা?

রামকুমার ঃ নিশ্চয়ই পারব। ওদের বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে আনতে হবে। আমরা বাড়ি বাড়ি যাব। সবাইকে বোঝাব, সবাইকে আমাদের সঙ্গে আনব। তারপরে ইস্কুল হবে— এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়বে। জ্ঞানের অজস্র শিখার সূর্য ক্রমে পৌঁছবে এই গ্রামে— আলোকিত হবে এই অরণ্য। অন্ধকার হবে দূর— আমরা উঠে দাঁড়াব মাথা উঁচু করে— গোটা দুনিয়াকে আমরা আমন্ত্রণ জানাব এইখানে—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই
ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই
তার ক্ষয় নাই।

সকলের হাত তালি। আলো নেভে।

চতুর্থ দৃশ্য

জুমের টিলা। পদ্মমোহন আসে। সূত্রধার হয়ে কথা বলে।

পদ্মমোহন ঃ কত স্বপ্ন কত সুন্দর পরিকল্পনা কিন্তু বুড়ারা নু রাজি হই না—ঐ লক্ষ্মীচরণ রাজি হই না—কেরে রাজি হই না হে? কারণ রামকুমারদা কইছেন জামাই ওটা বন্ধ কইরা দিবার কথা। ইতার লাগিঐ নি ক্ষেপেছে লক্ষ্মীচরণ—হেনু জামাই খাটাইছিল মুংকুরুইরে! হের মাইয়্যা হীরামতির জামাই বানাইছিল মুংকুরুইরে—

মুংকুরুই-এর ভূমিকায় যে অভিনয় করছে, সেই অভিনেতাটি ঢোকে।

অভিনেতা ঃ ঐ বিশরায় পাড়ার মুংকুরুই। তারে পাঁচ বছর খাটাইসেন তার শ্বশুর। পরে

কয় বিয়া দিত না তার লগে, বুঝসে নি আপনারা? পাঁচ বছর। উই আন্ধাইর থাকতে উঠত তারা। মুংকুরুই আর হীরামতি। মোরগ ডাকার আগে—

পদ্মমোহন ঃ ঐ বিশরায় পাড়া কইসে কিরে তুমি— মুংকুরুই বাড়ি— বিশরায় পাড়া আছিল নি?

অভিনেতা ঃ আপনে কইসে নানি যে কুনু একটা নাম কইবার লেইগ্যা।

পদ্মমোহন ঃ মধুতি, রূপশ্রী কোনখানে শহীদ হইছিল রে? পদ্মবিল নানি—তুই পদ্মবিল কইত পারছে নানি—নাইলে মনাইছড়া কইত।

অভিনেতা ঃ বাদ দাও। হক্কল গেরামঐ নু এক রকম। যে কুনু একটা কইলেই সারব।

পদ্মমোহন ঃ হ হ—কেবল মাতব্বরি হক্কলটার মইধ্যে।

অভিনেতা ঃ এর লাগিঐ তোমার দলে আমি থাকতে চায় না, কেবল ধমকাই। মুংকুরুইর পাট আমি করত পারত না।

পদ্মমোহন ঃ রাগ করছে কিরে? বাবা, ল অখন—নাটকখানা আবার শুরু করি আমরা। ঠিক আছে আমি কইতেছি। তুই ধরিস ঠিক মতন—[শুরু করে] ওই জামাই, তাড়াতাড়ি কাম সার। জুম যাইত নানি— ফর্সা হইয়া যাইতাছে— তুমি দেখসে নানি—বেতা নবাব ঐ রামকুমার, তার লগে গিয়া রাইতের বেলা মিতিং করি আর ঘুম থিক্যা উঠতে দেরি করি—

অভিনেতা ঃ আরে ইতা কুনু অখন নি? হিতানু পরের সিন। তুমি ইতা কিতা করতাসে? উলটা পা্লটা! অখন আমি একলা কইব—

লক্ষ্মীচরণরূপী পদ্মমোহন জিভ কেটে বেরিয়ে যায়।

শুনেন আপনারা— গল্পখান কই। রুজ মুংকুরুই উঠত অন্ধকার থাকতে- হে আর হীরামতি। হক্কলের লাইগ্যা ভাতটাত রাইন্ধ্যা যাঅন লাগত কামে। সারাদিন কাম কইর‌্যা আবার বাড়িত ফির‌্যা মোরগ, শূয়র ইতারে ঘরে ডাকাইয়া, জল আইন্যা লাকড়ি ফাইর‌্যা তবে তার ছুতি। সবার পরে ঘুমাইত, আবার সবার আগে উঠত। তবু শ্বশুর খুশি হই না তার উপরে—সবসময় তারে মুখ ঝামতা দিয়া কথা কই— এইভাবে ত দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, দেখতে দেখতে এক বছর, দুই বছর কইর‌্যা পাচতা বছর কাইত্যা গেল— তবু তারার বিয়া হই না। মুংকুরুই মনে মনে চিন্তা করে—

বলে অভিনেতাটি মুংকুরুই হয়ে যায়।

পঞ্চম দৃশ্য

মুংকুরুই ঃ কত বছর কাইত্যা গেল। আমার বিয়া হইত নানি। আইজঐ কইত শ্বশুররে। হয় বিয়া দাও, নইলে চইল্যা যাইব আমি। চইল্যা যাইব হীরামতি। আমারে ভালা পায় নানি? যাইত কিরে? হীরামতিরে লইয়া পালাইয়া যাইব গা। পালাইয়া গিয়া বিয়া করব। ঘর বানাইব। হ, ঘর বানাইব—

নরেন্দ্র ও নগুরাই প্রবেশ করে।

নরেন্দ্র ঃ ঐ জামাই! কবে অইত তোমার বিয়া?

মুংকুরুই ঃ অইব আর কি—অইবার দিন।

নগুরাই ঃ অ অইসে তোমার বিয়া! হীরামতির বিয়া অইব মহেন্দ্রের লগে— তোমারে কলা দেখাইব তোমার শ্বশুর—তোমারে ভাগাইব দেইখ্যনে—

নরেন্দ্র ঃ [মৃদু হেসে] ভাগাইলে আর কিতা করত? তে ভাইগ্যা যাইব।

নগুরাই ঃ ভাগাইয়া দিলে যাইবগা? ধুর্ বেতা—

মুংকুরুই ঃ [ঈষৎ উত্তেজিত] কেতা ভাগাইব আমারে? আমি পালাইয়া যাইব হীরারে লইয়া।

নরেন্দ্র ঃ হ যাইব হীরা তর লগে! মহেন্দ্ররে বিয়া করব হীরা।

নগুরাই ঃ মহেন্দ্র বেতা আছে। মহেন্দ্র বাঘ মারসে গতবার। রাজার কাছ থিক্যা বক্‌শিস্ পাইসে—হেনু চৌধরীর নাতি। অনেক জমি আছে তার।

মুংকুরুই ঃ হ, বাঘ মারছে—রাজানু মারছে ইতা—

নরেন্দ্র ঃ না—না মহেন্দ্র মারছে। তারপর রাজার লুক কইসে রাজা মারসে কইবার লাগি—

নগুরাই ঃ তারপরে নু হে কইলে— রাজা মারছে বুইল্যা, নইলে নু রাজা ফালাইয়া দিত হেরে গুলি কইর‍্যা।

নরেন্দ্র ঃ হে যদি না কই—রাজা মাইর‍্যা লাইত তারে।

মুংকুরুই ঃ হে চোধরীর নাতি হইছে ত কিতা হইছে? পারবনি হে হীরারে নিত? কাইত্যা লাইব না আমি? হীরাঐ যাইত না।

নরেন্দ্র ঃ দেখস্ না কিতা অয়।

মুংকুরুই ঃ মহেন্দ্র পারবনি আমার লগে? [চাপা গলায়] আমি লেখাপড়া শিখতাছেন — সংগ্রাম করবেন আমি। ঐ রামকুমারদা কইসে নানি লেখাপড়া শিখলে হারাইত পারে না— হক্কল যুদ্ধ জয় হই।

নগুরাই ঃ হঃ! দেখছনি ভাই, রামকুমারদা কত কথা শিখছে— কত দেশের খবর জানছে।

নরেন্দ্র ঃ আমরা কুস্তা জানে না।

মুংকুরুই ঃ আমরা নু লেখাপড়া শিকছে না।

নরেন্দ্র ঃ আমরা রামকুমারদার দলে ভর্তি হইবেন।

নগুরাই ঃ হ, রামকুমারদা কইসেন আমরারে মেম্বার করবেন।

মুংকুরুই ঃ চান্দা তুইল্যা আমরা ইস্কুল ঘর বানাইবেন।

নগুরাই ঃ [মুখে শ্ শ্ শ্ শব্দ করে] হুই উই আইসে তারা— আইসে।

নরেন্দ্র ঃ কারা আইসে?

নগুরাই ঃ হুই দেখ— হীরামতি নবলক্ষ্মী—মধুতি, রূপশ্রী—

মেয়েরা কলহাস্যে কথা বলতে বলতে ঢোকে। ওরা তাকায়।

মধুতি ঃ ঐ শুনছে নি—রামকুমারদা কইছেন, আজই সন্ধ্যায় মিতিং অইব।
কুমারী ঃ কেতা কেতা শন্ বাঁশ কাটবেন, ইতা ঠিক করবেন।
রূপশ্রী ঃ ইস্কুল ঘরত বানাইবেন।
নগুরাই ঃ আইজাকা নি মিতিং?
মেয়েরা ঃ হ।

বলে চলে যাচ্ছে।

রূপশ্রী ঃ যাইস তুমরা হক্কলে।

হীরামতি খোঁপা থেকে ফুল খুলে ইচ্ছাকৃতভারে ফেলে যায়।

নরেন্দ্র ঃ ঐ কেতা ফালাইসে রে ফুল!

ছেলেরা দেখে হাসে। ছেলেরা গান ধরে ও নাচতে থাকে।
মেয়েরাও পরে এদের সাথে যোগ দেয়।

ছেলেরা ঃ
ও মেয়েরা, মেয়েরা বলতে পার কি?
কার খোঁপা থেকে পড়েছে এই ফুল?
কার খোঁপা থেকে পড়েছে এই ফুল?
কেউ যদি তাকে আজ তুলে মাটি থেকে
হবে কিগো ভুল?
হবে কিগো ভুল?

মেয়েরা ঃ
[নাচ] ও ছেলেরা, ছেলেরা
বলতে কিগো পারো?
কার খোঁপা থেকে পড়েছে গো ফুল?
কার খোঁপা থেকে পড়েছে গো ফুল?
কে জানি আজ কাকে মনের মানুষ ভেবে
বেঁধেছিল চুল।
বেঁধেছিল চুল।

ছেলে মেয়ে ঃ
কে কাকে আজ দিয়েছে কার মন?
আমরা কেউ কি জানি গো?
আমরা কেউ কি জানি গো?
যদি কেউ জেনে থাকে গো
তুলে নাও ফুল
তুলে নাও ফুল
তার ধুলো ঝেড়ে সযতনে হৃদয়েতে রাখ গো
তুলে নাও ফুল।

'তুলে নাও ফুল' বলতে বলতে ওরা চলে যায়। চুপি চুপি মুংকুরুই ঢোকে, ও হীরামতির ফেলে দেওয়া ফুল তোলে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বুকে চেপে ধরে।

পিছে পিছে পা টিপে টিপে আসে নরেন্দ্র ও নগুরাই।

নগুরাই ঃ এই চোর, চোর—চোর ধরসে—চোর চোর—

নরেন্দ্র ঃ বেতা লুকায়ে কিরে? কস না? কেতা ফালাইসে ফুল?

মুংকুরুই ঃ না—না— আমি লইসে না—আমি—

নরেন্দ্র ঃ ঐ মিছা কথা কইস্ না। মারব তুরে।

দুজনে কপট-রাগে মারতে যায়। মুংকুরুই-এর হাত থেকে ফুল পড়ে।
নগুরাই তা তুলে দেয়। ওরা হাসতে থাকে।

নগুরাই ঃ বেতা ধরা পড়সে—

নরেন্দ্র ঃ লুকাই কিরে—বিয়া ত হইবই।

নগুরাই ঃ হীরামতির লগে কথা কইনি তুই!

নরেন্দ্র ঃ কিতা কয়। হীরামতি, কস্ না কিছু—

মুংকুরুই ঃ [কপট দুঃখে] কুস্তা কই না।

নরেন্দ্র ঃ হীরামতি তরে ভালা পায় নি?

মুংকুরুই ঃ আমি জানে না কুনু কথা—হে কথা কই না আমর লগে— পাঁচ বচ্ছর অইসে — আমি তার দিকে চাইলে হে অন্য দিকে চাই— আমি যখন বাঁশি বাজাই—

নগুরাই ঃ তুই যখন বাঁশি বাজাই কিতা হই তখন?

নরেন্দ্র ঃ কয় না কিরে?

মুংকুরুই ঃ [মৃদু হাসি, সলজ্জ] আমার দিকে চাই—আর হাসি।

আলো নিভে আবার জ্বলে।

অন্তর্দৃশ্য

পদ্মমোহন ঃ হীরার বাপ হীরার মারে কয়—ঐ হীরার মা, কিতা অইত—অখনঅ রেডি হইসে নানি—আই তাড়াতাড়ি, নইলে এই সিন্‌ঐ বাদ দিয়া লইব।

ত্রস্তপদে হীরার মা ঢোকে।

হীরার মা ঃ একখানা নাটকই লেখসে মামা—অক্ষণ রূপশ্রী হও—অক্ষণ হীরার মা হও-—একটু দম লইবারও সময় নাই। কিতা লেখসে পালা—আগামাথা নাই—রূপশ্রী কুমারী হেরা কুনু হীরার বন্ধু আছিল নি— হীরা আইল কিরে এই পালায়!

পদ্মমোহন ঃ বুঝসে নানি—হীরা আর মুংকুরুই পালাখান ঢুকাইল হেই সময় পুলাপান কেমন আছিল, কেমনে আইল তারা সংগ্রামে, কেরে আইল—ইতা দেখাইবার লাগি, জামাই উঠা মেয়াদ কেমনে কমল, লোকে জানে না।

হীরার মা ঃ তিতুনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কইর‍্যা নু তারা মরল—কুমারী, মধুতি, রূপশ্রী; তারার সংগ্রাম দেখাইত নানি?

পদ্মমোহন ঃ শুন—তিতুনও হক্কল সময়ঐ আছিল— কিন্তু তিতুন দিত না হেই কথা কখন কইল— যখন জনশিক্ষা আন্দোলন হইল তখন নু কইল— নও পার্ট কও।

হীরার মা ঃ তুমি কও।

পদ্মমোহন ঃ অ হ—

ষষ্ঠ দৃশ্য

পদ্মমোহন লক্ষ্মীচরণ হয়ে চরিত্রে প্রবেশ করে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ খেদাইয়া দিব মুংকুরুইরে—

হীরার মা ঃ বিয়া দিত নানি মাইয়ার—বাপরে কত বছর অইছে। এইবারই লাঙ্গি বানাইত— বিয়া দিত নানি—

লক্ষ্মীচরণ ঃ দিব দিব, রাজার লগে।

হীরার মা ঃ ধুর, মিছা কথা।

লক্ষ্মীচরণ ঃ হ—হ চোধরী কইছে, রাজা লইয়া যাইব— রাণী করব।

হীরার মা ঃ না—না— রাজার বাড়িত দিত না আমি মাইয়ারে। কুনুদিন দেখতে পারত না তারে— ঐ মুংকুরুইর লগেঐ বিয়া দিব মাইয়ার।

লক্ষ্মীচরণ ঃ [হুঁকো খেয়ে] ধুৎ— মাইয়ালুক কুস্তা বুঝে না। মুংকুরুইতা— রামকুমারের দলে ঢুকছে—লেখাপড়া শিখব কই— জামাই উঠা তুইল্যা দিব কই—বুড়া মানুষ টানুষ মানে না— অক্ষণঐ মানে না, যখন বিয়া অইব তখন ত মানতঐনা।

হীরার মা ঃ কেটা কই— হে খারাপ? হেরে পাচ বছর খাটাইসে তুমি— অখন কই তাড়াইয়া দিব? ইতা কুনু ধর্মের কথা হইল নি?

লক্ষ্মীচরণ ঃ চোধরী কইছে—মাইয়ারে রাজবাড়িতে দিলে আমরার খুব সম্মান বাড়ব— টাকা পইসা ধন দৌলত দিব রাজায়।

হীরার মা ঃ ইতা খান গিয়া তুমি। আমার লাগে না ইতা। হের লগে বিয়া হইত না ক ইলে মাইয়া কান্দে, মাইয়ার মনে কষ্ট দিয়া আমি সুখ পাইত না।

লক্ষ্মীচরণ ঃ ধুৎ, মর গা তাইলে। আমি জানে না কুস্তা।

প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

রাজপথ। পথে দেখা হয় চৌধুরীর সঙ্গে লক্ষ্মীচরণের ।

চৌধুরী ঃ এই লক্ষ্মীচরণ, তর মত ঠিক অইসে নি? মহারাজ ত লোক পাঠাইয়া দিব মাইয়া নিত— আগামী বুদবার।

লক্ষ্মীচরণ ঃ আমার হীরা ত রাজি হই না— মাইয়াতাও খাই না লইনা— হেই কথা

শুইন্যা খালি কান্দে, আমি কুস্তা বুঝে না।

চৌধুরী ঃ আমার নাতি মহেন্দ্র ত তোমার মাইয়ারে বিয়া করত চায়।

লক্ষ্মীচরণ ঃ কিতা জানে—

চৌধুরী ঃ শুন। মহেন্দ্ররে ক—পিতা দিত। পিতা খাইয়া ভাগাইবেন জামাই—আর আইত না তর বাড়িত। মহেন্দ্ররে ক তুই তারে জামাই করব— তারপর মুংকুরুই যখন পালাইবেন, তখন রাজার লুক আইয়া লইয়া যাইবেন তর মাইয়ারে—

লক্ষ্মীচরণ ঃ আমি পারত না তারে ইতা কইত। মিছা কথা কইত পারত না আমি। থাক্, মাইয়া যখন চাই, মুংকুরুইর লগেই বিয়া দিব মাইয়ার।

চৌধুরী ঃ হাতি কেদা দেকসে নানি– রে গাধা– পোষা হাতি দিয়া বনের হাতি ধরে— হেমুন কইর‍্যাঐ—ধরব আর কি! আচ্ছা তুই না পারলে আমি কইব আর কি মহেন্দ্ররে— বুঝসে নি গাধা, মহেন্দ্ররে কইব—তুমি মুংকুরুইরে পিতা দিয়া ভাগাই, তারপর হীরামতিরে বিয়া করব। তারপর পিতাপিতি লাগব নানি, তখন তারে ঠিক করবেন আমি। আমার কাছে আইত নানি বিচারের লেইগ্যা— তখন দেখবেন তুমি— আমি কিতা করে! আমারে চিনসে নানি তুমি? আমি চৌধুরী, এমনেঐ হইছে নিরে চৌধুরী? আরেকবার আইল নানি একখান পাঠা লইয়া দুই বেতা ঝগড়া লাইগ্যা—শেষে পাঠাখান আমি রাইখ্যা দিল, আর দুইতারে মাথায় মাথায় ঠোকাইয়া ভাগাই দিল। ঐ— শুনছে নিরে, আরেকখান কথা, ইখানে কই থিক্যা একটা পুলা আইছে— চান্দা তুইলা ইস্কুল করবার কথা কই —তুই জানছে নি কিছু?

লক্ষ্মীচরণ ঃ হ, ঠাকুর। তার নাম অইল রামকুমার। কেবল উল্টাপাল্টা কথা কই। হে কইসে ইস্কুল করবার লাগি—আমি আইয়া পড়ছে। জামাই উঠা তুইল্যা দিবার কথা কই হে।

চৌধুরী ঃ শুন– লক্ষ্মীচরণ। আমরা গেরামে থাকে চাষবাস করে, আমরার পুলাপাইন ইস্কুল পইর‍্যা কিতা করত? গেরামে হইত পারত না ইস্কুল। ইস্কুল করলে নু বাইরের বাতাস লাগব। বাইরের বাতাস লাগলে হক্কল যাইব রসাতলে। ঐ রামকুমার তারে ঠিক করমু আমি, দেখ। শুন চান্দা ফান্দা দিস্ না কিন্তু কইয়া দিল।

লক্ষ্মীচরণ ঃ না না– অইত না ইস্কুল টিস্কুল। এই গেরামে অইত না- আমি চান্দা দিত না।

চৌধুরী ঃ দেখিস, মনে থাকে যেন।

লক্ষ্মীচরণ ঃ আইচ্ছা ঠাকুর, মনে থাকব।

চৌধুরী ঃ ঐ শুন, যেই কথা কইসে— বুজছে নি জামাইতারে ভাগাই দাও। মাইয়ারে কও ভাতের লগে ছাই মিশাইয়া দিত। চোখের মইধ্যে মরিচ গুড়া দিত।

লক্ষ্মীচরণ ঃ আইচ্ছা ঠাকুর আইচ্ছা—

লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান। চৌধুরী তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে।

অষ্টম দৃশ্য

লক্ষ্মীচরণের বাড়ি। হীরামতি একা একা, জুমের গানের সুরে গান গাইছে।

হীরামতি ঃ [গান]

আ— রঙ লেগেছে আকাশে
সমস্ত বন মাতাল হল বাতাসে।।
রঙ লাগেনি আমার জীবনে।
ফুল ফুটেনি আমার বাগানে ।।
মিছেই কোকিল গান গায়।
মিছে এত রঙ, শিমূল পলাশে।।

লক্ষ্মীচরণ উত্তেজিত হয়ে প্রবেশ করে। পিছে পিছে হীরার মা।
সেও উত্তেজিত। বোবা ভাইটিও আসে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ ঐ শুন— তার ভাতে ছাই মিশাইয়া দিব তুই। তারে জামাই করত না আমি।

হীরার মা ও ভাইয়ের প্রবেশ।

হীরার মা ঃ তারে এতদিন জামাই খাটাইসে কিরে? আমি মানত না তোমার কথা। ঐ মুংকুরুই-র লগেঐ বিয়া দিব আমি।

বোবা ছেলেটি গাঁইগুঁই করে। তাকে ধমক দেয় লক্ষ্মীচরণ।

লক্ষ্মীচরণ ঃ রাজবাড়িত যাঅনঐ লাগব তর। শুন অবুঝ হইস্ না। রাজার বাড়িত গেলে কত্ত সুখে থাকব তুই– কত গয়নাগাটি, অলংকার— কুনু কাম কাইজ নাই, শুধু খাও— ঘুমাও, নাচগান কর। কত সুখ— রাজরানী অইব তুই।

হীরামতি মাকে অবলম্বন করে কাঁদতে থাকে।

চোধরী কইসে আমরা টাকা পাইব, অনেক সম্মান বাড়ব আমরার। আমরাও চোধরী অইব। তালুকদার অইব—

হীরামতি ডুকরে কাঁদতে থাকে। নেপথ্যে রামকুমারের কণ্ঠ।

রামকুমার ঃ [নেপথ্যে] লক্ষ্মীদা — ও লক্ষ্মীদা —

লক্ষ্মীচরণ ঃ কেটা?

রামকুমার ঃ এই যে আমি —

বলে ভিতরে ঢোকে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ [বিরক্ত] কিতা— কিরে আইসে তুমি আবার? আমি চান্দাও দিতে পারত না, কাজও করত না। ইস্কুলের কাম নাই, ইস্কুল কইর‍্যা কিতা অইব?

রামকুমার ঃ শুনুন, আমি—

লক্ষ্মীচরণ ঃ তুমি ইস্কুল পইরা গ্রামের মইধ্যে আইয়া পুলাপাইনেরে নষ্ট করতে চায়।

পুলাপাইনেরা কথা শুনে না অখন।

রামকুমার ঃ অচ্ছা লক্ষ্মীদা, আমাকে বকতে পারবেন কিছু পরে, আগে বলুন মেয়ে কাঁদছে কেন?

লক্ষ্মীচরণ গুম হয়ে থাকে।

হীরার মা ঃ মাইয়ারে পাঠাইয়া দিত চায় রাজবাড়ি। মুংকুরুই-এর লগে বুলে দিত না বিয়া—

রামকুমার ঃ মুংকুরুই ত অনেকদিন জামাই খাটসে আপনাদের বাড়িতে— এতদিন পরে ওকে তাড়িয়ে দেয়া—লক্ষ্মীদা, এটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

লক্ষ্মীচরণ ঃ কিতা বুঝে আপনে— লেখাপড়া শিখলেঐ অইবনি? ঐ চোধরীর উপরে কথা কইবনি কেউ? চোধরী কইসে রাজার বাড়িত মাইয়ারে দিতে অইব— না দিলে বিপদ অইব।

রামকুমার ঃ হ্যাঁ জোর করে নিতে পারে, কিন্তু আপনি নিজে থেকে কেন দেবেন? জানেন ঐ রাজবাড়িতে মেয়েদের জীবন কি হয়? সেখানে গিয়ে দাসী হিসেবে তাদের জীবন কাটাতে হয়। রাজবাড়িতে যে মেয়েরা যায় তারা সবাই রাজরাণী হয় না— রাজার বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে জীবন কাটানোর চেয়ে নিজের বাড়িতে কষ্ট করে থাকাও ভাল। শুনেছি আপনাকে নাকি অনেক টাকা পয়সা দেবে বলে লোভ দেখিয়েছে— ওই লোভে যদি আপনি ভুলেন, তাহলে ভবিষ্যতে মনে কষ্ট পেতে হবে। শুনুন তার চাইতে বরং মেয়ে জামাইকে পাঠিয়ে দিন কোথাও, বলুন ওরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। তাতে ওদের জীবনও রক্ষা পাবে, আর আপনিও রাজা কিংবা চৌধুরীর বিরাগভাজন হবেন না।

লক্ষ্মীচরণ ঃ হ— আপনে কইলেঐ হইব নি। চোধরীর কথার উপর দিয়া আমি যাইত না।

রামকুমার ঃ আপনার ভাল আপনি বুঝবেন— আমার কথা আপনি মানবেন কেন। আচ্ছা আমি উঠি, তুমি কেঁদ না হীরামতি। কেঁদে আর কি হবে— যে সমাজের পরিচালক হচ্ছে কয়েকটি অন্ধ লোক, সে সমাজে জন্মগ্রহণ করা যে কি দুঃসহ, তা আর কত ভাবে আমরা দেখব। আমি চললাম লক্ষ্মীদা।

নবম দৃশ্য

জুমের টিলায় হীরামতিরা কাজ করছে।

রূপশ্রী ঃ কিরে হীরা, বাঁশি বাজে শুনছে নি?

কুমারী ঃ না- না, হে শুনব কেমনে? অনেক দূরে নু বাজাই।

মধুতি ঃ সারাদিন ত কাম নাই, শুধু বাঁশি বাজাই। ইখান যে একজন পাগল হই— হেই খেয়াল ত নাই।

কুমারী ঃ কোন পুলা ইতা— ধইর‍্যা জেলে দাও।

হীরামতিকে ধরে

রূপশ্রী ঃ লগে ইতারেও দাও।

হীরামতি ঃ [হঠাৎ কাঁদ কাঁদ স্বরে] আমার বুধ হয়, বিয়া হইত না দিদি।

কুমারী ঃ কিতা অইসে— বাঁশিঅলাকি বেজার অইসে? এমুন কত বেজার হই আবার খুশি হই। বিয়ার আগে এমুন আমারও কত হইসে— না গো রূপসীদি?

রূপশ্রী ও মধুতি ঃ হ বেজার অইলে আবার খুশি হইব দেখিস।

হীরামতি ঃ না গো রূপসীদি, বাবা অন্য কথা কই। তারে খেদাইয়া দিব কই, আমারে রাজবাড়িত দিব কই।

মধুতি ঃ [পরিহাস করে] রাজবাড়িত গেলে নু ভালা— তুমি সুখে থাকব।

হীরামতি ঃ আমি মইর‍্যা যাইব— আমি মইর‍্যা যাইব গাছে লটকাইয়া, তবু তারে ছাইড়া আমি থাকতে পারত না।

কুমারী ঃ বুঝসে নি মধুতি, ঐ চোধরী বেতাঐ আসল শুইতান। [হীরাকে] আর কাইন্দা কিতা করব বইন? তুমি সুন্দর অইসে, ইতার লাগি নু বিপদ অইসে চোধরীর চোখ লাগছে। হে গিয়া রাজার কাছে কইসে, অখন আর উপায় নাই।

হীরামতি ঃ পুইর‍্যা লাইব— কাইত্যা লাইব আমার রূপ। মইর‍্যা মাইরব আমি, তবু আমি রাজবাড়িত যাইত না। হের লগে যদি বিয়া না হই, গাছে লতকাইয়া মইর‍্যা যাইব আমি।

রূপশ্রী ঃ রাখ, রামকুমারদারে কইব। একটা বুদ্ধি বাইর হইব তাইলে।

কুমারী ঃ ঐ রামকুমারদা কইসেন,রাজাটারে মাইর‍্যা চোধরী তালুকদারের হক্কলতারে মাইর‍্যা জামাই উঠা থুতা শেষ করবেন।

মধুতি ঃ ইতা করতে হইলেঐ লেখাপড়া শিখন লাগে, ইস্কুল বানান লাগে।

রূপশ্রী ঃ আমরা যখন কামে আইব নানি, তখন আমরার পুলাপাইন পড়ব ইস্কুলে।

কুমারী ঃ তারপর তারা বড় হইব। যুদ্ধ করব— রাজা আর চোধরীরে খতম করব।

মধুতি ঃ মন খারাপ করিস না। ল কাম্ কর।

বলে গান ধরে। পরে সকলেই গায়।

[গান] আমরা জেগেছি / ত্রিপুরার নারী।
দুনিয়ার সাথে করেছি মিতালি,
আমরা জেগেছি—
অত্যাচারে টলব না
প্রলোভনে ভুলব না—
দস্যুদের করব শেষ, শপথ নিয়েছি
আমরা জেগেছি।

ওরা কাজ করতে করতে গান করতে থাকে।

দশম দৃশ্য

বনের পথে মুংকুরুই।

মুংকুরুই ঃ [স্বগত] হুঁঃ! আমার লগে বিয়া দিত নানি— আমারে ভাগাইয়া দিব নি? রাজবাড়িত পাঠাইয়া দিব নি? রাখ পাঠাইব তুমারে! আইজকাঐ হীরারে কইয়া— দুইজনে ভাগব রাত্রে। ঐ হলংমতাইর কাছে গিয়া বিয়া করব দুইজনে, আইজকাঐ ভাগব।

মহেন্দ্র একটি হোৎকা নিয়ে ঢোকে।

মহেন্দ্র ঃ এই শুয়রের বাচ্ছা, এই পাড়া ছাইড়্যা কবে যাইত তুই? ক ।

মুংকুরুই ঃ ছাইড়্যা যাইত কিরে? আমি নু এই পাড়াত—ঐ আইজকা পাঁচ বছর। আমার বিয়া অইব হীরামতির লগে।

মহেন্দ্র ঃ [মারতে উদ্যত] মাথাখান ফাতাইয়া লাইব শালা।

মুংকুরুই ঃ আরে আমারে মারে কিরে, ঐ বেতা কাছে আই না!

মুংকুরুই টাক্কাল দিয়ে প্রতিরোধ করে। মহেন্দ্রের মাথা ফেটে যায়। মহেন্দ্র মাথা চেপে ধরে।

মহেন্দ্র ঃ রাখ শালা দেখাইব তরে।

মুংকুরুই ঃ তুই কিতা করব, কর্ গা যা। তর বাপেরে লইয়া আনগা যা— তুই চোধরীর নাতি অইসে ত কিতা অইসে? আমি ডরায় না কেউরে। কারে কইব গিয়া কগা— যা।

চলে যায়।

একাদশ দৃশ্য

চৌধুরীর বাড়িতে বিচারসভা। আহত মহেন্দ্রের মাথায় পেট্টি বাঁধা।
গ্রামের সবাই এসেছে। মুংকুরুই এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

মহেন্দ্র ঃ আমি আইতাছিল বাড়িত— হঠাৎ হে আমারে মুছ্কছা ওয়াকছা কই— আমি কুস্তা কইসে না। তারপর আমারে টাক্কাল দিয়া কুব মারসে— আমারে কইসে মাইর‍্যা লইব।

চৌধুরী ঃ ইস্ মাথাখান ফাতাইয়া লইসে! সাহসখান ত কম অইসে না— আমার নাতির মাথা ফাতাইছি? রাখ, বিয়া করাইব তুরে! এই বান্ধ তরা, হাত পা বাইন্ধ্যা মার। বিয়া করত নি আর এই গেরামে— বিয়া করাইবেন তরে!

মুংকুরুই ঃ আমার কথাখান থুরা শুন ঠাকুর, আমি—

চৌধুরী ঃ থাম সইতান, মাথা ফাতাইছি আবার কথা কই— মার তারে, বাইন্ধ্যা মার!

অন্তর্দৃশ্য

পদ্মমোহন ঃ ছারখার হইয়া গেল লক্ষ্মীচরণের সংসার। চৌধরীর কথায় মাইয়ারে হে পাঠাইসে রাজার বাড়িত! কিন্তু হে ত বাপ— মাইয়ার লেইগ্যা হের পরাণ পুড়ে। একলা

হইলে মাইয়ার কথা মনে পড়ে হের। বাড়িত গেলে ঝগড়া লাগে বৌয়ের লগে। আর ওই দিগে? রাজার বাড়িত একলা একলা বইয়া কান্দে হীরামতি— কেবল ছটফট করে হে। বাইর হইয়া গেরামে বাড়িত ফির‍্যা আইত চায়, কিন্তু কেমনে বাইরঐয়া যাইব। এতবড় বাড়ি, কুনখান দিয়া বাইরঅত—হক্কল গেইটে নু দারোয়ান— পলাইবার কুনু পথ নাই। কিতা করব হে— বইয়া বইয়া কান্দে সারাদিন। একদিন রাজবাড়ির পানিওলা হেরে দেইখ্যা কইল—

দ্বাদশ দৃশ্য

হীরামতি বসে কাঁদছে। কলসী হাতে প্রবেশ করে পানিওলা।

পানিওলা ঃ কিতা গো মা, তুমি কান্দে কিরে? কিতা অইসে? কোন গেরাম থেইক্যা আইসে তুমি? বাবার নাম কিতা তুমার?

হীরামতি ঃ লক্ষ্মীচরণ .... আমরা থাকে ঐ মগলান বাড়ি।

পানিওলা ঃ আমারে চিনসে নি— আমার বাড়িও ত তোমরার গেরামের কাছে।

হীরামতি ঃ তুমি কেটা?

পানিওলা ঃ আমি অখিরায়— রাজবাড়ির পানিওলা। আমি চাকরি করে ইখান আইজ কুড়ি বছর। কাইন্দো না— কাইন্দো না। কান্দলে আদর যত্ন পাইত না। মা বাপের কথা ভুইল্যা যাও গা।

হীরামতি ঃ আমি থাকত না ইখানে।

পানিওলা ঃ এমুন কথা কইস না— বিপদ হইব।

হীরামতি ঃ মামা, আমারে এই বাড়িতার বাইরে নিয়া দেত পারব নি? আমি বাড়িত যাইব গা— পালাইয়া।

পানিওলা ঃ চুপ কর মাইয়া—বিপদেনু ফালাইসে ইতা, নিজে ত মরবই, আমারেও মারব। কেরে কথা কইছিল ইতার লগে—

হীরামতি ঃ মামা— আমারে বাঁচাও মামা তুমি। এখান থাকলে আমি মইর‍্যা যাইব গা—

পানিওলা ঃ রাখ মাইয়্যা— কথা কইস্ না। এইখান কুনু মাইয়া আইলে আর বাইরঐত পারে না। শুন, ইখান কুনু বেতা নু ঢুকত পারে না।

হীরামতি ঃ [হেসে] তুমি বেতা নানি মামা!

পানিওলা ঃ আমি পানিওলা, আমার নু জাত নাই। ইখান শুধু সিকলা নু আইয়ে, আর পানিওলা আইয়ে।

হীরামতি ঃ আমারে লইয়া যাও বাইরে মামা।

পানিওলা ঃ কেমনে নিব তরে?

হীরামতি ঃ আমি পানিওলা অইব—পানিওলা কইর‍্যা লইয়্যা যাও আমারে।

পানিওলা ঃ ধুর মাইয়া—ইতা অইব নি? ধরা পড়লে নু আমার গলাখান কাইত্যা লইব।

হীরামতি ঃ আমারে যাদি বাইরে না নেয় তুমি, তবে আমি কইয়্যা দিব হক্কলেরে .... তুমি

আমারে ভাগাইয়া লইয়া যাইবার লাইগ্যা কইসে। তখন রাজা তুমার গলাখান কাইত্যা লইব। মামা, আমারে লইয়া যাও মামা।

পানিওলা ঃ লইব তরে, লইব... মাইয়া আমারে বিপদেঐ ফালাইছে! [এদিক ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়] ওই শুন— কালকা আইয়া তরে কাপড়-চাপড় দিয়া যাইব। তুই সাইজ্যা থাকব—পরের দিন আইয়া লইয়া যাইব। এই কেতা আইয়ে— যাইগা— আমি যাইগা—

প্রস্থান করে পানিওলা। হীরামতি খুশি হয়ে ওর গমনপথে তাকিয়ে থাকে।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

মুংকুরুই একা একা চলছে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। পথে ওর বন্ধু নগুরাই ওকে দেখে।

নগুরাই ঃ কি ভাই মুংকুরুই— কৈ চলছ?

মুংকুরুই ঃ জানি না।

নগুরাই ঃ বাড়িত যাইতে নানি?

মুংকুরুই ঃ কৈ আমার বাড়ি? আমি নু মইরাঐ রইসি। কুনখান যাইত না আমি।

নগুরাই ঃ আরে ভাই বিয়া না অইলে কিতা অইসে? এত মন খা রাপ করে কিরে? ভাত খাইসে নি?

মুংকুরুই ঃ না—ভাত খাইসে না আমি, খাইত না।

নগুরাই ঃ চল—আমার বাড়িত, ভাত খাইব, তারপর কাম যাইব।

মুংকুরুই ঃ কিতা কাম?

নগুরাই ঃ ইস্কুলের কাম, রামকুমারদা মিতিং করসে। কইসে আইজ থেইক্যা গেরামের ইস্কুল ঘর বানাইবার কাজ শুরু হইব।

মুংকুরুই ঃ না— আমি যাইত না রে নগুরাই। মদ দে আমারে— মদ খাইব।

নগুরাই ঃ না—না— চল। এমুন করিস না—শুন, আমরা দল বানাইব। যুদ্ধ শিখব, তারপর রাজার লগে যুদ্ধ কইর‍্যা লইয়া আনব হীরামতিরে। শুন—তারপর তরার বিয়া অইব।

মুংকুরুই ঃ আমারে যখন মহেন্দ্র মারছিল, তখন কৈ আছিল তরা? বিচারের সময় তরা কেরে কুনু কথা কইসে না?

নগুরাই ঃ আমরা কিতা কইব—আমরা জানে নি কুস্তা? আর কইলেঐ কিতা অইত? আমরা চৌধরী কোনু ছাড়ত নি শুনে? শুন—ঐ চৌধরীরে আর আমরা মানত না। ঐ বেতা কই ইস্কুল বানাইতে দিত না—

মুংকুরুই ঃ হে কইলেঐ হইব নি— ইস্কুল আমরা বানাইবঐ।

নগুরাই ঃ হ বন্ধু, ইতার লাগিঐ চল আইজ থেইক্যাই কাজ শুরু কইরা দিব। আগে আমরার বাড়িত গিয়া ভাত খাইব—তারপর কামে যাইব।

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মহেন্দ্র মাতাল হয়ে রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে চলে।

মহেন্দ্র ঃ শালা বুড়া—তরে পাইলে আমি ঠিক করবরে! শালা বুড়া—মুংকুরুইরে খেদাইল আমি— আর আমার লগে তবু মাইয়ার বিয়া দিল না। রাজবাড়িত পাঠাইল— ট্যাকার লোভে। বাতপার! বুড়া—ঠিক আছে! আমি যাইতেছে গা মিলিটারিত। ফিরা আইয়া দেখাইবনে তরে—বুড়া শয়তান —

নরেন্দ্র, নগুরাই ও মুংকুরুই ঢোকে।

নরেন্দ্র ঃ ঐ মহেন্দ্র দাড়া দাড়া—

মহেন্দ্র ঃ কিতা অইসে?

নগুরাই ঃ হীরামতিরে বিয়া করত নি তুই?

মহেন্দ্র ঃ বিয়াত করতই আমি, ঐ লক্ষ্মীচরণের লেইগ্যাঐ পাইল না আমি হীরারে। বেতা বুড়া! শইতান! দাদু কইছিল আমার লগে মাইয়ার বিয়া দিবার লেইগ্যা— হে পাঠাইয়া দিল আমার হীরারে— রাজার বাড়িত—

নরেন্দ্ররা হেসে ওঠে।

হাসে কিরে, হাসে কিরে! আমি মিলিতারিত যাইব। তারপর তরারে দেখাইব রে—

নরেন্দ্র ঃ কবে যাইব তুই?

মহেন্দ্র ঃ যাইব! আমি মুংকুরুইর মতন বইয়া থাকত নারে। আমি অইল বাপের বেতা আর— আর হে অইল একটা পাঠা

নগুরাই ঃ ঐ ইতা কই না।

মুংকুরুই ঃ হে ত অইল গরু—বাঘ মাইর‌্যা রাজার নাম কই।

মহেন্দ্র ঃ ঐ বদমাইশ— মাইর‌্যা লইব তরে!

মুংকুরুই ঃ যা—যা— বেতাগিরি দেখাইস না!

নরেন্দ্র ঃ একবার ফাঠছে রে মাথা—এইবার আর জানে বাঁচত না।

মুংকুরুই ঃ চল—চল, ইস্কুল ঘরের কাম করব।

নরেন্দ্র ঃ ঐ মহেন্দ্র, চল যাইব নি আমার লগে?

মহেন্দ্র ঃ যা যা— আমার পুষাইত না— আজাইরা কাম কইরা। ইস্কুল করত— কিতা অইত ইস্কুল কইরা? আমি মিলিতারি, তরার লগে যাইত কেরে রে!

নগুরাই ঃ থাকেন তাইলে পইর‌্যা— মদ খাও। আর কিতা করত!

মুংকুরুই, নগুরাই ও নরেন্দ্র চলে যায়।

মহেন্দ্র ঃ সব বেতা শইতান— সিপাই অইয়া সব বেতারে দেখাইবেন আমি।

(প্রস্থান)

পঞ্চদশ দৃশ্য

রাজ অন্তঃপুর। পানিওলা অপেক্ষা করছে হীরামতির জন্য।

পানিওলা : [গলা খাকরি দেয়।] গতকাইল কইয়া গেছে একশবার কইর‍্যা— রেদি হইয়া থাকত। চাইর প্রহর ঘন্টা যখন বাজব, তখন আমি আইমু। দেখছেনি— অখনও পাত্তা নাই! ধ্যুৎ! [অধৈর্য হয়ে ওঠে] লোকজন উইঠা গেলে তখন কুনু পারব নি পালাইতে? দারোয়ানটা ঘুমাইতেছিল-এখনই সুযোগ আছিল

পুরুষবেশী হীরামতি এলে।

আরে ইস্, আমার যদি একখান ভাইগ্না থাকত, তবে তারে আমি রাজা বানাইয়া ছাড়ত। চল্ চল্ কুনু কথা কইস্ না— শুধু আমার পিছে পিছে আয়—

এদিক ওদিক তাকিয়ে হাঁটতে থাকে। পানিওলা আর হীরামতির পথ আটকায় দারোয়ান।

দারোয়ান : এই পানিওলা ইতা কেতা রে?

পানিওলা : ইতা আমার ভাগিনা।

দারোয়ান : ভাগিনা? আমি ত জন্মেও দেখছি না ইতারে।

পানিওলা : ইতানু আইসে আইজকাঐ পুইলা—

চলে যেতে থাকে।

দারোয়ান : এই দাঁড়া আমি দেখব।

পানিওলা : দেইখ্যা কিতা করত?

দারোয়ান : হেরে আনসে কিরে তোমার লগে?

পানিওলা : আজকানু বেশি জল দেঅন লাগছে— ইতার লাগি ভাইগনারে লগে লইয়া আনসে।

দারোয়ান : লইয়া আনসে? আইবার সময় ইতারেনু—দেখসে না আমি?

পানিওলা : তুমি দেখব কেমনে? তুমি নু ঘুমাইয়া ছিল—

দারোয়ান : এই মিছা কথা কইস্ না— কাইত্যা লইব একেবারে—

পানিওলা : বেশি কথা কইবেন না—তাইলে রাজার কাছে কইয়া দিব—তুমি না ঘুমাইলে হে কেমনে গেল ভিতরে?

দারোয়ান : [চিন্তাগ্রস্ত] হ, কেমনে গেল ভিতরে! যা, যা, আর কোনদিন আনিস না— বুঝছে নি পানিওলা?

পানিওলা : না— আর কোন দিন আইত না— ইতারে লইয়া—

বলতে বলতে চলে যায়।

ষোড়শ দৃশ্য

রাজসভা। মহারাজ, মন্ত্রী, পুরোহিত ও সেনাপতি।

মন্ত্রী : কেন হেরি বিষন্ন বদন নৃপবর?
ত্রিপুরার প্রতি ধুলিকণা, বৃক্ষরাজি,

প্রাণীকুল, চতুর্বর্ণ—মানব সমাজ,
সকলি চলিছে, প্রভু তোমার ইচ্ছায়,
কেন তবু—মলিন তোমার মুখছবি?

মহারাজ ঃ এতটা অবাধ্য হবে প্রজাকুল কভু,
ভাবিনি তা আগে, কোথা থেকে পেল তারা
এতটা সাহস? এত বন্দী করিলাম,
এত প্রলোভন! এত দমন পীড়ন।
শাসন মানে না তবু! এত রাজদ্রোহ?

মন্ত্রী ঃ শিক্ষার বিলাসে নাচে বনবাসী প্রজা,
বানর যেমতি নাচে মুক্তাহার চেয়ে,
কয়টি ইস্কুল, না হয় মঞ্জুর করে
দেখা যেতে পারে প্রশমিত হয় কিনা
আবেগ তাদের মহারাজ। রুদ্রসম
ধেয়ে আসে যবে বারিধারা তীব্রবেগে,
তখন কিছুটা পথ ছেড়ে দিতে হয়
তার তরে।

পুরোহিত ঃ নহে শুভবুদ্ধি মন্ত্রীবর।
শিক্ষা পেলে মূর্খদল নবশক্তি পাবে।
ঘোর কলি এই, আপথ অইবে পথ।
শাস্ত্রবাক্য কভু কিগো মিথ্যা হতে পারে?
পদতল থেকে তৃণ তুলিবে মস্তকে!

সেনাপতি ঃ দেবদ্বিজে রহিবে না ভক্তি, রাজপদে
থাকিবে না অটল বিশ্বাস। তুচ্ছপ্রাণী
মানিতে চাহে না বশ। মানুষ শাসন
কত সুকঠিন! তার তরে কারাগারে,
তার তরে সৈন্যদল, নহে ত যথেষ্ট।

পুরোহিত ঃ ভেদনীতি, দণ্ডনীতি, মিথ্যা প্রলোভন,
তার সাতে যোগ কর পূজা আরাধনা,
জপতপ, পরকাল, ব্রহ্মভক্তি, তবে
সুরক্ষিত থাকে সিংহাসন, রাজ্যপাট।
বিদ্যালয় শোভে অরণ্য মাঝারে?

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, রাজদণ্ড পায় যদি শিশু,
কি করিবে সে? শুধু খেলিবে সে তা লয়ে।
না জানিবে প্রয়োগ তাহার। অতএব
ভুলাইতে অবোধ প্রজারে কতিপয়

পাঠশালা করিলে স্থাপন ক্ষতি কিছু
নাহি তাতে।

মহারাজ ঃ ক্ষতি নাহি তাতে? মন্ত্রীবর,
ধুলিলুণ্ঠিত হয় যদি রাজমুকুট
শিরশ্চেদ বলে তারে। নাহি হবে তাই
একটিও বিদ্যালয় তাদের তরে।

সেনাপতি ঃ মহারাজ! ভৃত্য তব প্রস্তুত রহিছে,
ব্যাঘ্র সম নখ-দন্ত মিলি।
পতঙ্গের মত ওই দীন প্রজাকুল
কাঁপিবে সভয়ে হেরি মম হিংস্ররূপ।

রাজা ঃ কভু আর নাহি ক্ষমা, সিদ্ধান্ত আমার,
দ্রুত কর অভিযান সৈন্যদল নিয়া।
অস্ত্রের বন্দনা রবে স্তব্ধ হোক যত
রাজদ্রোহ। বনস্পতি হতে চায় যত
আগাছার দল, নিশ্চিহ্ন হোক সবংশে;
আর কোন দিন যেন না তুলে সে মাথা।
গ্রামে গ্রামে উঠুক ভয়ার্ত হাহাকার।
কাঁপুক মেদিনী আজ ক্ষাত্র অশ্বক্ষুরে।

পুরোহিত ঃ আহা, রুদ্রমূর্তি ধরি যেন নৃপবর
শঙ্খ, পদ্ম, গদাচক্রধারী নারায়ণ
অনন্ত শয্যা ছাড়ি উঠিয়া মাতিলেন
প্রলয়ের রূপে জটাধারী নটরাজ।

সপ্তদশ দৃশ্য

(নরেন্দ্র, নগুরাই, মুংকুরুই, কুমারী, মধুতী ও রূপশ্রী কাজের শেষে কথা বলছে)।

নরেন্দ্র ঃ আর দুইতা দিন কাম করলেই হইয়া যাইব।
মুংকুরুই ঃ চোধরী বেতা পারব কি আটকাইত? আমরা স্কুল ঘর তুলছেঐ।
কুমারী ঃ মাস্টার কবে আইব?
মধুতি ঃ কমরেড লইয়া আনব মাস্টার।
নগুরাই ঃ মাস্টার কিতা করে?
নরেন্দ্র ঃ উমা! রামকুমারদা কইসে নানি— মাস্টার পড়ায়।
রূপশ্রী ঃ কেমনে পড়ায়?

নগুরাই ঃ কেতা জানে, কেমনে পড়ায়!

নরেন্দ্র ঃ টাউন গেছলাম একদিন—দেখছে আমি মাস্টার পড়ায়— এক অক্কে এক। দুই অক্কে দুই। তিন অক্কে তিন। আর দেখতে পারছে না, গাইল দিল মাস্টার— আইয়া পড়সে আমি—

মধুতি ঃ বই পইড়্যা—পইড়্যাঐনু—টাউনের বাবুরার বুদ্ধি হই।

কুমারী ঃ আমরা ত পড়ত পারছে না। আমরার পুলাপানে পড়ব আর কি—

রূপশ্রী ঃ তারারে আর কেউ ঠকাইতে পারত না।

মধুতি ঃ আমরাও পড়ব— অ-আ শিখব।

মুংকুরুই ঃ ইস্ যদি আর কয়টা দিন আগে শিখতে পারত!

রূপশ্রী ঃ কমরেড কইসে—লেখাপড়া শিখা খুব সোজা, আমরারে শিখাইয়া দিব কইসে।

নরেন্দ্র ঃ চল - চল। কাম বাকি রইসে অনেক, বইলে চলত না।

অষ্টাদশ দৃশ্য

(বনের পথে, পুরুষবেশী হীরামতি শ্রান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে)।

হীরামতি ঃ আর কতখানি পথ আছে, কেটা জানে, ইতা কুন জাগা !কুনু গেরাম নি আছে কাছে? কেডা কইব! আইজ তিন চাইরদিন ধইর্‌য়া খাওন নাই।আইবার সময় পানিওলা কিছু চিড়া দিয়া দিছিল—ইস্ পানিওলারে না পাইলে ত আইতে পারত না—মামা, তুমি বাইচ্যা থাইক্যো মামা—সুখে থাইক্যো। [ক্লান্তিতে এলিয়ে দেয় শরীর] মুংকুরুই! তুমি কেমন আছ মুংকুরুই! উঃ জানে না—আর নি দেখা অইব তুমার লগে!

(অবসন্ন হয়ে অবচেতন হয়ে পড়ে। মুংকুরুই কোন প্রয়োজনে এদিকে আসছিল, হঠাৎ হীরামতিরে দেখে)।

মুংকুরুই ঃ আরে ইতা কেতা? কৈ থিক্যা আইসে? কুনখানে বাড়ি? ও ভাই উঠ না—ঘুমাইসে কিরে? মনে অইতাছে জ্ঞান নাই! ও—ও—ও নরেন্দ্র—[নেপথ্যে নরেন্দ্রর উত্তর] আরে ইখানে আয়!

নরেন্দ্র ঃ কিতা অইসে?

মুংকুরুই ঃ দেখছনা তরা—ইতা কেতা আইয়া ইখানে ঘুমাইছে—মনে হয় জ্ঞান নাই।

নগুরাই ঃ জল আনগা যা—মাথায় জল দিঅন লাগব।

মুংকুরুই জল আনতে যায়, এর মধ্যে মেয়েরাও আসে।

কুমারী ঃ আরে কেতা আইসে?

রূপশ্রী ঃ কোন দেশ থেইক্যা আইল?

মধুতি ঃ কেরে আইল ইখানে?

কুমারী ঃ কেতা কইব?

মুংকুরুই বাঁশের চোঙে করে জল আনে।

নরেন্দ্র ঃ ও নগুরাই, ধর্ ধর্—মাথাখান তুইল্যা ধর তুই, জল দিব।

জল দেবার জন্য ওরা মাথার পাগড়ি খুলেই চমকে উঠে

নগুরাই ঃ আরে ইতা মাইয়া লুক—

রূপশ্রী ঃ হীরামতি নু ইতা— ঐ হীরা।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই হীরামতি চোখ মেলে।

হীরামতি ঃ আমারে ছাইড়া যাও তরা। আমি যাইব আমার গেরামে—

মধুতি ঃ ঐ হীরা গেরামে নু আইয়া পড়ছে তুই!

হীরামতি ঃ এ্যাঁ? তোমরা কেতা? — অ রূপসীদি! অ—আমি আইয়া পড়ছে। আমি আইয়া পড়ছে! [উল্লসিত হয়ে উঠে বসে] কুমারীদি, তুমরা কেমন আছে?

কুমারী ঃ তুই কেমনে আইলি?

হীরামতি ঃ কইব আমি— সব কইব—

রূপসী ঃ ঐ আইসে যে, রাজা ত তরে আবার লইয়া যাইব—গা—রে, সেপাই পাঠাইয়া।

হীরামতি ঃ একবার যখন আইয়া পড়সে—আর নিতে পারত না আমারে।

রূপসী ঃ শুন— পলাইয়া থাকন লাগব। বাড়িতে যাইত পারত না।

হীরামতি ঃ না, আমি বাড়িতে যাইব, মা বাবারে দেখব।

নরেন্দ্র ঃ চল্—বাড়িতে লইয়া চল্—

মধুতি ঃ ঐ শুন্—বুদ্ধি পাইসে, হে বাড়িত গিয়া দেখা কইর‌্যা পালাইয়া থাকব। আমারা কইব রামকুমারদার মাস্টার আইবে—

নগুরাই ঃ হের মা বাবা জানব, গেরামের আর কেউ জানত না, আমরা কইব আমরার নতুন বন্ধু আইসে— রামকুমারদার লগে—

রূপসী ঃ হঃ! ইতাঐ ভালা, চল্—চল্— লইয়া চল্

প্রস্থান।

ঊনবিংশ দৃশ্য

(মুংকুরুইয়ের প্রবেশ। এখন সে সূত্রধার)

মুংকুরুই ঃ হীরা আইল গেরামে ফিরা। অনেকদিন পর মাইয়ারে পাইয়া হীরার বাপ খুশি হইল, মা খুশি হইল। রাজবাড়ির থিক্যা পালাইয়া আইসেন কুনু সামান্য কথা নি? লক্ষ্মীচরণ তার ভুল বুছতে পারল— হে মনে মনে ঠিক করল, মুংকুরুইরে খবর দিয়া আইন্যা হীরামতির লগে হের বিয়া দিব। আর রামকুমারদার দলে যোগ দিল হে— তারার ইস্কুল প্রতিষ্ঠার দিন সভা হইসে, ঐ সভায় হে হইলেন সভাপতি। পুলাপানের লগে মিশ্যা বুড়া অখন নিজেও লেখাপড়া শিখত চাই। চোধরী খবর পাঠাইল থানাতে, পুলিশ আইল গেরামে। ইস্কুল কারা কারা করছি খুঁজ কইর‌্যা সাজা দিবার—

পদ্মমোহনের প্রবেশ।

পদ্মমোহন ঃ ওই! হীরার কথাখানও কও!

মুংকুরুই ঃ হেইখানত, কইসেঐ—

পদ্মমোহন ঃ না রাজবাড়ির থিক্যা যে খবর আইল, হীরা পালাইসে।

মুংকুরুই ঃ ও—পুলিশ আইয়া তালাস করল, হীরানি ফিরা আইল বাপের বাড়িত। ইতা না কইলেও বুঝব লুকে—লও তুমরা শুরু কর।

পদ্মমোহন ঃ চৌধরী কৈ? লগেত দারোগাও আইব—

চৌধুরী ও দারোগা প্রবেশ করে।

দারোগা ঃ বাপরে বাপ, চা খাইবারও সময় নাই— দাঁড়াও চা-টা খাইয়া লই।

চা খেয়ে মুংকরুইকে।

চৌধুরী ঃ নে কাপটা লইয়া যা। আমরা ত রেদি। ঐ তুমি দেখছে নানি—

মুংকুরুই ওদের এঁটো কাপ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

চৌধুরী ঃ লক্ষ্মীচরণ! ঐ লক্ষ্মীচরণ!

লক্ষ্মীচরণ ঃ কিতা ঠাকুর?

দারোগা ঃ [ভেংচিয়ে] কিতা ঠাকুর! ইস্কুলের মিটিংঅ পেরসিডেন্টগিরি ত করছই তুই ঐ—

চৌধুরী ঃ মাইয়া কই আছে ক?

লক্ষ্মীচরণ ঃ আমার মাইয়ারে ত তুমরা নিসে—রাজবাড়িত পাঠাইসে।

চৌধুরী ঃ রাজবাড়ির থিক্যা খবর পাঠাইসে, মাইয়া ভাগাইসেন—

দারোগা ঃ বাড়িত আইসে নি মাইয়া?

চৌধুরী ঃ ভালা অইত না কইয়া দিলেরে লক্ষ্মী, মরবি, গুষ্ঠি শুদ্ধা মরবি। মাইয়ারে আবার পাঠাইয়া দাও যদি বাঁচতে চায়!

লক্ষীচরণ ঃ মাইয়া আইসে না আমার ইখান। তুমরা মাইয়ারে কিতা করসে কেতা কইব? আমার মাইয়ারে মারসে তুমরা— খুন করসে তারে।

চৌধুরী ঃ কিতা কইল? আর কইস না তুই এমুন কথা। কাইত্যা লইব তরে। হাতি দিয়া ঘর ভাঙাইয়া দিব। রাজার সিপাই আইয়া বাইন্ধা নিব হক্কলটিরে, কইয়া দিলরে—মনে রাখিস! [অন্তরঙ্গ হয়ে] শুন লক্ষ্মী, রামকুমারদার লগে কথাবার্তা কইস না। হে আইলে ভাগাইয়া দিস্। ঐ মুংকুরুইতা নানি— হেও গিয়া ঢুকছে তার দলে? হেরা রাজারে মানে না। হেরা গেরামে ইস্কুল করছে, ভগবানেরেও মানত না হেরা— ঐতা বাড়িত আইলে মাইরা খেদাইয়া দিস্।

লক্ষ্মীচরণ ঃ ইস্কুল করলে খারাপ কিতা অইব? রাজার ক্ষতি কিতা ইস্কুল করলে? তুমরা বাধা দেই কিরে? ভালা কথা ঐ নু কইসে রামকুমার—

দারোগা ঃ শুন কথা! বেবাটের কথা হুনলে নি রাগডা উডে!

চৌধুরী ঃ দেখ শূয়র, এমুন কথা কইস না। বুড়া হইয়া তুই পুলাপানের লগে যোগ

দিছস্—

লক্ষ্মীচরণ ঃ আমি তার লগে যুগ দিমুই। আমরার নু পইর্‌যা থাকলে চলব নি, জঙ্গলের মইধ্যে রাস্তা নাই ঘাট নাই—

দারোগা ঃ হ। তুমরারে ইতান টাউন বাইয়া দিব, সোনার চান!

লক্ষ্মীচরণ ঃ আমরার পুলাপান মইর্‌যা যায় গা অযুধ না পাইয়া, আমরা বড় রাস্তা বানইব, হাসপাতাল বানাইব। ইস্কুল বানাইব আরো বড় কইর্‌যা—তুমার কথা আমি শুনত না—

উৎকণ্ঠিতভাবে হীরার মা ও তার বোবা ছেলে এসে দাঁড়ায়।

চৌধুরী ঃ কিতা কইল? আমার কথা মানত না? মাথা তুইল্যা কথা কই— বেতা, প্রজা না তুই! চোখ চাইয়া কথা কই আবার?

দারোগা ঃ ঐ শক্ত রুলার বয়াইয়া দিমু মাথায় কইয়া দিলাম।

লক্ষ্মীচরণ ঃ কইব আমি—একশবার কইব- কিতা করত পারেন করেন গিয়া। আপনের কথা চলত না আর।

চৌধুরী ঃ হারামজাদা !বদমাইশ! ঐ দারোগাবাবু, লাগাও বারি লাগাও!

দারোগা ঃ [রুলার তুলে মারে] ক? ক—নাইলে হাড্ডি গুড়া কইর্‌যা লামু—

হীরার মা ঃ ও দারোগাবাবু মাইরো না বুড়ারে, মাইয়া আইসে না ইখানে।

দারোগা ঃ তরেও দিমু ধইর্‌যা— বেডি—আবার শালিশী করত আইয়ে!
(বোবা তেড়ে যায় দারোগাকে মারতে। দারোগা পুলিশ একসঙ্গে তাকে রুলার নিয়ে আক্রমণ করে)।

চৌধুরী ঃ পিত—পিত। মাইয়া লুক তুক মাইন্যো না—পিতলেঐ কথা বাইরঐব! রাজারে না মানলে কিতা হই— দেখাই দাও—ইস্কুল করত—লেখাপড়া শিখত—বড়লুক হইত—ঐ তরার নেতা রামকুমার কৈ?

দারোগা ঃ হারামজাদারে ইস্কুলের সাধ জন্মের মতন ভুলাইয়া দিমু আইজগা! অঙ্গ লেখতে আঙ্গ ফাডে আবার ইস্কুলের পেরসিডেন্ট অইসেন!

চৌধুরী ঃ নেতাতারে খুঁইজ্যা বাইর কইর্‌যা বাইন্ধা লইয়া যাও দারোগাবাবু— তাইলেঐ গেরাম ঠাণ্ডা অইব।

লক্ষ্মীচরণ, হীরার মা ও বোবা ছেলেটিকে মারতে থাকে দারোগা ও পুলিশেরা।

বিংশ দৃশ্য

লক্ষ্মীচরণের বাড়ি। আহত লক্ষ্মীচরণ, তার স্ত্রী ও ছেলে।
রামকুমার ও অন্যান্যরা সান্ত্বনা দিচ্ছে ও শুশ্রুষা করছে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ তুমি যাওগা ভাই রামকুমার—তুমি যাওগা—তোমারে পাইলে তারা এরেস্ত করব।

হীরার মা ঃ তোমারে লইয়া গেলে আমরা কারে কইব দুঃখের কথা?

লক্ষ্মীচরণ ঃ না—না, তুমি যাওগা।

রামকুমার ঃ এই যে যাচ্ছি—আগে বেণ্ডেজটা সেরে নিই। আপনারা ভাববেন না লক্ষ্মীদা—ওরা আমাকে ধরতে পারবে না। যা দেখছি তাতে জেলের বাইরে ভেতরে ত কোন তফাৎ দেখছি না। এমন নির্মমভাবে ওরা মারতে পারে! মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে পারে! সামান্য একটা ইস্কুল করার অপরাধে গোটা গ্রাম ওরা তছনছ করে দিচ্ছে— যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই মারছে! এমন বর্বর ওরা—ওরা আবার সভ্যতার বড়াই করে—

কুমারী ঃ অখন থিক্যা আমরাই লাঠি লইব।

মধুতি ঃ দারোগা কইছে ইস্কুল ঘরখান ভাইঙা নিবার লেইগ্যা আরো সিপাই লইয়া আইব।

কুমারী ঃ আমরা হক্কলে মিল্যা দাঁড়াইব ইস্কুলের চাইর দিগে—ইস্কুল ভাঙতে আইলে আমরা তার হাত ভাইঙা দিমু।

নরেন্দ্র ও নগুরাই ছুটে প্রবেশ করে।

নরেন্দ্র ঃ দাদা— সর্বনাশ হইয়া গেছে দাদা—মুংকুরুইরে লইয়া গেছে গা পুলিশ!

রামকুমার ঃ বলে কি? কেমন করে নিল?

লক্ষ্মীচরণেরা উঠে বসে। কুমারী, মধুতিরাও ছুটে আসে।

নগুরাই ঃ রাস্তা দিয়া আইতাছিল—পুলিশে পাইয়া লইয়া গেছে গা ধইর‍্যা—

নরেন্দ্র ঃ অখন কিতা করব?

মধুতি ঃ চল, আমরা গিয়া পুলিশের থিক্যা ছুটাইয়া রাইখ্যা দিব।

রামকুমার ঃ কিন্তু ওরা এতক্ষণে কি অনেক দূর চলে গেছে?

নরেন্দ্র ঃ না, বেশিদুর যাইতে পারছে না— হেরা গুল্লি করছিল—মুংকুরুইর উপরে, লাগছিল—হের লিগ্যাঐ নু আইত পারল না।

রামকুমার ঃ এ্যাঁ, [ব্যস্ততা] চল চল—

সকলে ঃ চল চল—

তীর, ধনুক, লাঠি, টাক্কল নিয়ে ওরা ছুটে যায়।

অন্তর্দৃশ্য

মহেন্দ্র এসে আপন মনে কথা বলতে থাকে।

মহেন্দ্র ঃ পুলিশের লগে গেছে রে লাগত—টের পাবি আইজগা! কয়েকটা লাশ পড়ব। হেরার বন্দুক আছে—মুংকুরুইটা যদি আইজগা মরে তাইলে ভালা হইব—তাইলে আমিই বিয়া করব হীরারে। বুড়া যদি হের মাইয়ারে বিয়া না দেই আমার লগে, জোর কইর‍্যা লইয়া যাইবেন আমি—চিনছে নারে আমারে—

[হঠাৎ দূরে তাকিয়ে] আরে! মুংকুরুইটার পায়ে গুলি লাগছে, ইটা দেখি হাটতাছে—আবার জঙ্গল থিক্যা ওষুধ লাগায়— ঐ রামকুমার সঙ্গে আছে—বুদ্ধি পাইসি— থানাত গিয়া খবর দিয়া আইগা— না না আগে দাদুরে কইগা—

প্রস্থান।

অন্তর্দৃশ্য

পদ্মমোহনের প্রবেশ।

পদ্মমোহন ঃ জনশিক্ষা আন্দোলন কইর‍্যা মানুষ রাজারে চিনল। এই রাজা আবার শত্রু। একটা ইস্কুল পর্যন্ত বানাইত দেই না। এর মইধ্যে মহারাজ বীরবিক্রম মইর‍্যা গেলেন। রাজা মরলে কি অইব !তার লুকজন পাত্রমিত্র ত মরছে না !হেরা অত্যাচার চালাইল আরও বেশি। গ্রামে গ্রামে যায় খাজনা আদায় করার লাইগ্যা। জুলুম করে। গ্রামে মিলিতারি গেলে তারার মালপত্র বয়ায় মানুষেরে দিয়া বিনা পইসায়। মানুষ কয় রাজা মইর‍্যা গেছে গা, আবার তিতুন দিতাম কেরে। জুলুম থিক্যা বাঁচনের লেইগ্যা মানুষ জোট বান্ধল নতুন কইর‍্যা। জনশিক্ষা সমিতির নাম পাল্টাইয়া নাম রাখল ‘গণমুক্তি পরিষদ’। এদিকে রাজার দলও বইয়া নাই। রাজা বানাইছিল প্রজামঙ্গল সমিতি। তারপর বানাইল ত্রিপুর সঙ্ঘ। আরেকটা বানাইল কে.বি.আর.বি। কে.বি.আর.বি চিনছেনি আপনারা— কিরিট বিক্রম রক্ষীবাহিনী। অখন আমরার নাটকের বাকি খান দেখ আর কি! অখন ‘রাজসভা’।

প্রস্থান।

একবিংশ দৃশ্য

রাজসভা

মন্ত্রী ঃ যেমন চলিতেছিল চলিছে সকলি
শুধু নাই,রাজা নাই, সিংহাসনে বসি
নাবালক পুত্র তার।

সেনাপতি ঃ কিছু নাহি বুঝে,
শুধুই অবাক নেত্রে থাকে তাকাইয়া
যখন আমরা ব্যস্ত, রাজ্য চালনায়।

পুরোহিত ঃ ব্যক্তি কিছুই নয়, সত্য হল বিধান
ব্যবস্থাটা থাকে চিরন্তন, চিরকাল।
সিংহাসনে রাজা থাকে, থাকে পুরোহিত—
পারিষদ। পরিজন, আত্মীয় স্বজন,
রাজবংশ—অবতংশ, কর্তা, জমিদার।

সেনাপতি ঃ থাকে এই চাবুকের সভয়-আতঙ্ক

তৃণসম প্রজাদের বুকে বুকে জেগে।

মন্ত্রী ঃ হ্যাঁ, এই ত হলো চিরন্তন রাজশক্তি,
প্রজারা কাঁপিবে ভয়ে কপোতের মতো।
তাহাই থাকুক বেঁচে রাজার অভাবে
অঙ্গীকারবদ্ধ মোরা রক্ষিতে তাহারে।

সেনাপতি ঃ কিন্তু প্রজাকূল হয়েছে অশান্ত আজি,
বলে উচ্চৈঃস্বরে, 'দেব না তিতুন' আর,
চাহি অধিকার, গণতন্ত্র দিতে হবে,
চলিবে না রিজেন্ট শাসন। মন্ত্রী হবে
প্রজাদের ভোটে, নিজের শাসন ছাড়া
মানিব না কাহারো শাসন।

মন্ত্রী ঃ সেনাপতি!

সেনাপতি ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ মন্ত্রীবর! মুক্তি পরিষদ করে
জ্বালাইছে অগ্নিশিখা পাহাড়ে পাহাড়ে,
অস্ত্রের মহড়া হয় প্রতি ঘরে ঘরে
রাজশক্তি কেড়ে নেবে পাহাড়ীর বেটা
এমনি করিছে তারা গভীর চক্রান্ত!

পুরোহিত ঃ সেনাপতি, আমার যে আসিতেছে জ্বর,
ভয়ানক ঘুরিতেছে মাথা, আজি কিগো
ঘটে যাবে ভীষণ প্রলয়।

সেনাপতি ঃ শুনিতেছি
বন্ধ হয়েছে খাজনা! দেয় না তিতুন!

মন্ত্রী ঃ কি করিতে পোষা হয় এত সৈন্যদল
প্রজা দর্প যদি তারা না পারে নাশিতে!
সেনাপতি, শুরু হোক, মহারণ আজি
অবাধ্য প্রজার সাথে, লাগাও সংঘর্ষ
ত্রিপুরা সংঘকে দিয়ে, গড়ে তোল দালাল বাহিনী
'কে.বি.আর.বি' নামে। চূর্ণ হোক রাজদ্রোহ!

পুরোহিত ঃ সত্য যদি হয় ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ
তবে ভস্ম হয়ে যাক এই সব ঘোর
দুর্বিপাক। অটুট থাকুক দিব্যলোক
উদ্ভাসিত আনন্দমুখর এ প্রাসাদ।

অটুট থাকুক এই রাজন্য-বৈভব।
সেনাপতি, তোমাতেই সকল ভরসা।
যাও তবে ত্বরা করি সৈন্যদল নিয়া,
কেটে দিয়ে এসো সব উত্তোলিত মাথা।

সেনাপতি ঃ অবশ্যই যাব আমি, সর্বশক্তি নিয়া
রাজদ্রোহ চিরতবে চূর্ণ করিবারে।

মন্ত্রী ঃ মহারাণী করেছেন মনস্থির আজ
ভারতের ছত্রতলে করিতে স্থাপন
ত্রিপুরারে।

পুরোহিত ঃ বলে কিগো, স্বাধীন ত্রিপুরা
এই নাম মুছে যাবে চিরদিন তরে!
একি দুর্যোগ ঘটিতে চলিছে মহীতে!
ধর্ম আর রহিবেনা রাজকার্য মাঝে।

মন্ত্রী ঃ দ্বিজ! চরিদিক ঘিরে আছে পাকিস্তান।
এক থাবা মারি গিলিবে যবনে এই
ছোট্ট ত্রিপুরারে। পরন্তু ঢুকেছে দেশে
কমিউনিস্ট হাওয়া। ঘটে যেতে পারে
হেথা এক চূড়ান্ত বিপ্লব!

পুরোহিত ঃ কলিকাল!
ঘোর কলিকাল, আসিতেছে ঘনাইয়া।

মন্ত্রী ঃ [সন্তুষ্ট] করিয়াছে চুক্তি আজ রাজাদের সাথে
ভারত সরকার। রাজার মর্যাদা,
পারিষদ পরিজনসহ, থেকে যাবে
যেমন রয়েছে আজো। শুধু রাজদণ্ড
চলে যাবে ধনিকের বণিকের হাতে।

পুরোহিত ঃ [উৎফুল্ল] কানামামা ভাল ভাই, নাই মামা থেকে,
নাইবা রহিল আর ক্ষাত্রতেজে মিশি
ব্রহ্মতেজ। তবুও রহিবে ঠিক বাঁধা
রাজন্য ভাতার সনে ব্রাহ্মণ দক্ষিণা!

সেনাপতি ঃ অরণ্য বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র রাজত্বের
ক্ষত্রিয় বিক্রমের সাথে মিশে যাবে আজি
মহাভারতের নবোদিত ধনিকের

বিপুল সম্পদ, সিংহের বিক্রম সাথে
মিশে যাবে বোমাবাহী বিমানের ধ্বনি।

দূতের প্রবেশ।

দূত ঃ আসিয়াছে অশুভ সংবাদ মন্ত্রীবর।
প্রজাগণ হয়েছে অশান্ত। চারিদিকে
বাজিতেছে অবাধ্য মাদল নবশব্দে।

মন্ত্রী ঃ ত্বরা যাও সেনাপতি! আর নয় দেরি,
রুদ্ধ করো দাবানল ছড়াবার আগে।

সেনাপতি তরবারী উর্ধ্বে তুলে ধরে প্রস্থানোদ্যত।

সেনাপতি ঃ আজি মোর রুধিরে জেগেছে প্রতিহিংসা,
উদ্ধতের আজি নাই কোনোই নিস্তার।

পুরোহিত ঃ রাজশক্তি রক্ষা তরে তোমার বন্দুক,
গর্জিয়া উঠুক রণভূমি প্রকম্পিয়া।
নির্মম নিষ্ঠুর হাতে ঝরাইয়া খুন
করুক কণ্টকহীন কিরিট বিক্রম
সিংহাসন দলিত দূর্বাদল পরে।

পুরোহিত হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। সেনাপতি তলোয়ার উর্ধ্বে তুলে প্রস্থানের ভঙ্গিতে। অন্ধকার।

দ্বাবিংশ দৃশ্য

পদ্মমোহন ঃ মিলিতারি আবার আইল গেরামে, ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায়, মুক্তি পরিষদের মেম্বার নি আছে। তালাশি করতে গিয়া নু লুত কইর‍্যা লইয়া যায়। হাড়ি কলসী ভাইঙ্গা ফালায় লাথি মাইর‍্যা, রাজার সেপাইর সঙ্গে আছে ত্রিপুর সঙ্ঘের লোক। কে.বি.আর.বি.র লোক। আমরার গেরামের চৌধুরী ঠাকুর হইলেন কে.বি.আর.বি. কমাণ্ডার। কিন্তু তার দলে কেউ যাই নাই। দুইতা বুরবকরে জুটাইয়া লইসে ঠাকুর-সাব। দেখেন না আপনারা ঠাকুর-সাব কেমুন প্যারেদ করে।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য

চৌধুরী বাঁশিতে ফুঁ দেয়। দুটি লোককে প্যারেড করায়।

চৌধুরী ঃ এতেনশন! [ওরা বিশ্রামের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়] ওই এতেনশন কেমনে শিখাইছে নানি—এমুন করব —এমুন— [চৌধুরী দেখায়, ওরা এবার আনাড়িভাবে তারি নকল করে] —আইছা সারব— এইবার প্যারেদ করব— প্যারেদ— কদম তুল—

লেফত রাইত— [ওরা পা না তুলেই মুখে মুখে বলে] — ধ্যুৎ গাধা— মহেন্দ্রতা কই গেছে? ওইতা হইলে ভাল কইর‍্যা করাইতে পারত। [কপালের ঘাম মুছে] ওই শুন্ আইজকা আইব মিলিটারি— তারার লগে লগে গিয়া তরা তারারে ঘর চিনাইয়া দিব— মুক্তিপরিষদের মেম্বারের ঘর— বুঝছে নি রে গাধা— তারার লগে ভালা কইর‍্যা প্যারেদ কইর‍্যা হাতন লাগব।

একটি ঃ ঠাকুর আমার ভয় করে। মুক্তিপরিষদের লুক যদি কাইত্যা লই—

চৌধুরী ঃ ধুর গাধা, মিলিতারির লগে নু থাকব তরা। হুন, ঐ যে ইস্কুল ঘর করছে নানি— ঐ তার মইধ্যে আগুন লাগাইয়া দিব—

হাবিলদার ও মহেন্দ্রর প্রবেশ।

অপরটি ঃ ঠাকুর হেরা যদি ধরতে পারে— তাইলে মাইরা লইব।

হাবিলদার ঃ কে.বি.আর.বি. কমাণ্ডার চৌধুরী ঠাকুর—

সেলুট করে,

চৌধুরী ঃ [ঘাবড়ে গিয়ে] কিতা?

হাবিলদার ঃ অর্দার আছে—

বলে একখানা কাগজ বের করে দেয়।

মহেন্দ্র ঃ হে—হে—আমি লইয়া আনছে পথ দেখাইয়া—

চৌধুরী ঃ ঐ নাতি, হুন তুই তারারে লইয়া গিয়া প্যারেদ করা— ঐ হুন মিলিতারি, তারা কে.বি.আর.বি. সেপাই— তুমরার লগে থাকব। শান্তি সেনার ঘর চিনাইয়া দিব।

হাবিলদার ঃ বহুত আচ্ছা—

মহেন্দ্র ও লোক দুইটি আনাড়িভাবে সেলুট করে।

মহেন্দ্র ঃ ঐ চল্ প্যারেদ করব।

ওরা চলে যায়।

হাবিলদার ঃ অদারখান পড়েন আপনি—

চৌধুরী ঃ ধুৎ আমি কুনু পড়ত পারে নি? তুমি পড়— কিতা লেখছে।

হাবিলদার ঃ আমরা তুমার বাড়িত থাইক্যা ক্যাম্প বানাইব—খাইব।

চৌধুরী ঃ ঠিক আছে, খাই না তুমরা— কত খাইব! আইচ্ছা তোমরা বিশ্রাম কর থোরাদিন—তারপর শুরু করব—

হাবিলদার ঃ না, আমরার সময় নাই— সাত দিনের মইধ্যে সব ঠাণ্ডা করন লাগব — ননি কর্তা আইব আগামী সপ্তাহে— তার লগে ঐ ইতার নেতা ফেতা দইর‍্যা— আরেক গেরাম যাঅন লাগব।

চৌধুরী ঃ দেখ মিলিতারি— আমি কইয়া দিল তুমারে, গেরামে এক বেতাও যেমুন বাদ না যাই—হক্কল বেতা বেতি ঐ মুক্তি পরিষদে যুগ দিছে—ইস্কুল করছে—

রাজারে মানত না কইতাছে— রাজার লুক আইলে তিতুন দেই না— কুনু বেতা, এক বেতাও যেমুন বাদ না যাই—হক্কলতারে ধইর‍্যা লইয়া খতম কইর‍্যা লাইব—বুঝসে নি — কইল তুমারে— নইলে বাচত না,— তুমার রাজাও বাচত না— তুমিও বাচত না— আর আমিত মইর‍্যাঐ রইসে।

চতুর্বিংশ দৃশ্য

গভীর রাত। বনের ভেতর গ্রামবাসীদের সভা। রামকুমার ছাড়া যুবক যুবতীরা উপস্থিত।

নরেন্দ্র ঃ রামকুমারদা আইনা কিরে অখনো— কত রাইত অইছে!

নগুরাই ঃ আইব অখনই— দেরি অইত না আর— অইত দেখ না রামকুমারদার চিথি—

নরেন্দ্র ঃ কিতা লিখছে?

নগুরাই ঃ লিখছে— ক-ম-র একারে রে- ড - কমরেড - আ - মার স - অনুস্বার - অং - গয় - রফলা - আকার । ময় দিঘ্ ঘিকারে- মী - সংগ্রামী— অ - ভি- ন - ইতা কিতা লিখছে রে?

নরেন্দ্র ঃ দেখি - দইন্ত - নয় দয়আন্দ - ইতা শিখছছ নানি রে—তুই, পারতি না—দে আমারে—

নগুরাই ঃ অখন পারব— ছাড়—

ওরা কাড়াকাড়ি করে। মধুতি ছুঁ মেরে চিঠিটি নিয়ে নীরবে পড়ে। নেপথ্যে রামকুমারের কণ্ঠ ঃ

মধুতি ঃ (সরবে) আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানবেন—
(নেপথ্যে) আজ আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ মিটিং শেষ হলো। আমরা গণমুক্তি পরিষদ গঠন করে খাজনা আদায়ের জুলুম, মিলিতারির অত্যাচার ও তিতুনের বিরুদ্ধে আরও তীব্র সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এখানকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে দুদিন পরে আমি রওনা হচ্ছি পত্রবাহক কমরেড তোমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে নিজগ্রামে যাবেন। তারই মারফতে এই চিঠি পাঠালাম। আগামী ২২শে ফাল্গুন, রাত ১০টার মধ্যে অবশ্যই এসে পৌছব। লাল সেলাম।

মধুতি ঃ (সরবে) ইতি—

আপনাদের সাথী, রামকুমার দেববর্মা।

নরেন্দ্র ঃ পথে নি কুনু অসুবিধা অইল ?

মধুতি ঃ মিলিতারি যে অসভ্য— পতে যদি পায়—

কুমারী ঃ এমুন কথা কইস্ না! মিলিতারি পারত না রামকুমারদারে ধরত— বাঘ ভাল্লুকেও কুস্তা করত পারত না—

রূপশ্রী ঃ বাড়িত বাড়িত গিয়া মিলিতারি মানুষরে মারে। আর রামকুমারদা কৈ আছে— জিগ্গায়—

মধুতি ঃ গ্রামের লোক কেউ কই না—

রূপশ্রী ঃ তিতুন দেই না কেউ। মুক্তিপরিষদের কথা হক্কলেঐ মানে— মিলিতারি কেউরে কোন মাল নিবার লিইগ্যা কইলে— কেউ রাজি হই না।

হীরামতি ঃ জানে মাইর‍্যা লাইলেও কেউ মিলিতারির কাম করে না।

কুমারী ঃ মারত পারে— কিন্তু পারত না আমরার লগে—

মধুতি ঃ আমরা কেউ আর তিতুন দিত না—

রূপশ্রী ঃ (গান ধরে) না—না—না— আর তিতুন দেব না—

নরেন্দ্র ঃ ঐ গান গাইছ না— মিলিতারি যদি শুনে ইখানে আইয়া আক্রমণ করব। হামলা করব—

নগুরাই ঃ মিলিতারির বাপেও তের পাইত না— এই জঙ্গলে নি আইত মিলিতারি? লও হক্কলে গান ধর।

সকলে গান ধরে।

না—না—না—
আর তিতুন দেবনা।
আমরা সবাই রুখে দাঁড়াবো
তিতুন দেব না।
মুক্তির দিন আসে
দেখ বিশ্বজুড়ে
ঐক্য গড়েছে
কিষাণ মজুরে—
আমরাও আজ করব লড়াই
পিছু হটব না।

মধুতি ঃ আমার ইস্কুলখান বন্ধ হইয়া রইসে আইজকা অনেক দিন হইল।

নগুরাই ঃ ইস্কুল আর কেমনে করব— মিলিতারির যন্ত্রণায় গ্রামেই থাকত পারে না—

রূপশ্রী ঃ শান্তি আইলেঐ আবার করতাম আর কি ইস্কুল—

রামকুমারের প্রবেশ।

রামকুমার ঃ (শ্রান্ত) আমার খুব দেরি হয়ে গেল— কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং সেরে যতগুলো গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা হেঁটে এসেছি— সব গ্রামের অবস্থাই অবর্ণনীয়— প্রচণ্ড খাদ্যাভাব— খরায় ফসল নষ্ট হয়ে গেছে—তার উপর চলছে খাজনা আদায়ের জুলুম— পুলিশ মিলিটারি যে গ্রামেই ঢুকেছে— প্রতিটি ঘরে তারা অত্যাচার করছে— তাদের মারছে। মুক্তি পরিষদের নেতারা কোথায় আছে বলার জন্যে, কিন্তু কেউ বলছে না—কোথায় আছে বলছে না— এত অত্যাচার—এত নির্যাতন— কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না—

কুমারী ঃ মিলিতারি মারলেঐ মুখ খুলব নি? মারলেও কেউ কুস্তা কইত না—

রামকুমার ঃ মারতে মারতে আধমরা করে ফেললেও কেউ আর তিতুন দিচ্ছে না। রাজাকে আর আমরা মানব না— আমাদের মেরে ফেল—তবু আমরা আর তোমাদের মানব না।

মধুতি ঃ আমরাও মানত না রাজারে—মাইর‍্যা ফালাও তবু মানত না—

গুঞ্জন ওঠে।

রামকুমার ঃ শুনুন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ঠিক হয়েছে মিলিটারির অত্যাচার আর আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না— প্রতিটি অত্যাচারের আমরা মোকাবেলা করব— এমনিতে আমরা কোন প্ররোচনায় পা দেব না— নিজেরা গিয়ে আমরা আক্রমণ করব না— কিন্তু আমাদের আক্রমণ করলে আমরাও পাল্টা আক্রমণ করব—

নরেন্দ্র ঃ সুযোগ পাইলে বন্দুক কাইর‍্যা লইব—

নগুরাই ঃ ইতাঐ ভালা বুদ্ধি— নইলে আমরা বন্দুক কই পাইব—

রামকুমার ঃ এখন বাইরে থেকে সৈন্য আসছে— গুর্খা রেজিমেন্ট— আসাম রাইফেলস্ এসে নামছে— ত্রিপুরা ত ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তাই আমাদের দমন করতে নামানো হচ্ছে— ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ চলে গেছে— ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে— ওখানে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়েছে।

কুমারী ঃ প্রজাতন্ত্র আবার কারে কই কমরেড?

রামকুমার ঃ প্রজাতন্ত্র হলো— প্রজাদের ভোটে দেশের শাসনকার্য চলবে— রাজা থাকবেনা আর কি— মানে গণতন্ত্র—

মধুতি ঃ তাইলে আমরারে মারত কিরে— আমরাও ত কই— প্রজার ভোটে মন্ত্রী চাই—

রূপশ্রী ঃ রাজতন্ত্র বাতিল করো— গণতন্ত্র কায়েম করো—

রামকুমার ঃ এটাই এক রহস্য—ভারতবর্ষের সরকার বলছে ওরা গণতান্ত্রিক—ওরা রাজতন্ত্র দেশে রাখবে না। জমিদারি প্রথা দূর করবে—আমরাও বলছি রাজতন্ত্র বাতিল করো—ওরা সেই রাজার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের দমন করছে— আসল কথাটা হচ্ছে, ওরা যে গণতন্ত্র করতে যাচ্ছে তা হচ্ছে ধনীর গণতন্ত্র— আমরা তো গরিব— গরিবের গণতন্ত্র ওরা চায় না—জনগণকে বাদ দিয়েই ওরা গণতন্ত্র করবে— আশ্চর্য!

হীরামতি ঃ ইতা আবার কেমুন গণতন্ত্র—

রামকুমার ঃ শুনুন যে কথা বলছিলাম—এখন আমাদের সংগ্রাম আরো কঠিন হচ্ছে। আরো অনেক সাবধানী এবং মজবুত সংগঠন আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমরা পুরুষরা কেউ গ্রামে থাকব না—মিলিটারি গ্রামে এলে আমরা গ্রামের বাইরে গভীর বনে চলে যাব—

নগুরাই ঃ গ্রামে তাইলে কারা থাকত?

মধুতি ঃ আমরা থাকব আর কি।

রামকুমার ঃ আর বুড়া আর শিশুরা থাকবে।

নরেন্দ্র ঃ যদি তারার উপর মাইর ধইর করে—

কুমারী ঃ আমরাঐ আটকাইব।

রূপশ্রী ঃ হাতে যতক্ষণ টাক্কাল আছে—আমরা ডরাই না কাউরে—

রামকুমার ঃ আসুন বন্ধুগণ—মুক্তি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা এই মুহূর্তে আমাদের

কাজ শুরু করি— শুনুন আপনারা মুক্তি পরিষদের উদাত্ত আহ্বান—এই আহ্বান শুনে আমাদের শপথ নিতে হবে- জীবন দিয়ে আমরা লড়ে যাব— জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত— আমরা বলে যাব গণতন্ত্র কায়েম করো— রাজতন্ত্র বাতিল করো।

একটি কাগজ থেকে পড়ে শোনায়।

শান্তি সেনারা তৈরি হও—কদমে কদম মিলিয়ে চলো—মূল শত্রুর মুখোমুখি
হতে হবে আমাদের—শক্তিকে সংহত করো—এসো অর্জন করি নূতনতর
শক্তি। শাণিত করি আমাদের সংগঠন—এসো প্রকাশ করি তীব্রতম
ঘৃণা—মানুষের শত্রু ঐ দানবের বিরুদ্ধে— ইনকিলাব- জিন্দাবাদ!

সকলে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তোলে শপথের ভঙ্গিতে। আলো নেভে।

পঞ্চবিংশ দৃশ্য

মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হয়। রাস্তার ধারে সেপাই ও হাবিলদার বসে কথা বলে।

সেপাই ১ ঃ ঘুরতে ঘুরতে অবস্থা কাহিল, আর দুইডা দিন থাকলে খুঁইজ্যা পায়ন লাগত না আমারে।

সেপাই ২ ঃ দিন নাই, রাইত নাই, খাওন নাই—ঘুম নাই— খালি ঘুর গেরামে গেরামে— আর মাইন্‌সের বাড়িত গিয়া গিয়া খালি মার মাইন্‌সেরে—

সেপাই ১ ঃ আইজগা আবার কোন কুকাম করাই, কেতা জানব!

সেপাই ২ ঃ আর ভালা লাগে না—চাকরিঐ ছাইড়্যা দিব।

হাবিলদারের প্রবেশ।

হাবিলদার ঃ ঐ— তরা —ইখান বইয়া কিতা করসরে? ঐ শুন্ আইজগা একতা বড় অপারেশন অইব। স্বয়ং ননীকর্তা আইসেন কমান্দার অইয়া—হক্কল ফোর্স লইয়া আজকা যাইব পদ্মবিল— এই গেরামতা হইল হক্কল শয়তানের আড্ডা। আজকা বুঝাইব—বেতা হকলতি গেরামের বাইরে গিয়া থাকে— গেরামে থাকে খালি মাইয়ালুক বুড়া -আর পুলাপাইন- ভালা বুদ্ধি করসে বদমাইশের দল–আইজগা আর মাইয়ালুক-তুক মানত না- ঐ শুন্- তাড়াতাড়ি রেদি হ— রেদি অইয়া থাকবি— কোন সময় ডাক পড়ি কওন যায় না—

প্রস্থানোদ্যত।

সেপাই ১ ঃ ঐ মাইয়া লুকরে মারন নি— আমি পারত না হুজুর।

হাবিলদার ঃ চুপ কর! ইতর কাহেকা— ঘড়ে গা বউয়ের আঁচলের তলায় বইয়া থাক্‌গা — আরাম লাগব।

সেপাই ২ ঃ কিতা করত হুজুর- ভগবান সাহস থোরাখান কম দিছে তুমার থিক্যা।

হাবিলদার ঃ চুর কর! ফিল্‌দে আইলে হুজুর-টুজুর চলত না। কর্তা হুজুর কইব— বুজছে

নিরে— আমার শরীলে সাক্ষাৎ রাজরক্ত আছে— আমি ক্ষত্রিয়।

সেপাই ২ ঃ মনে নু থাকে না— দুষ মাপ কইর‍্যা দাও কর্তা হুজুর।

নেপথ্যে হুইশেল বাজে। ওরা চঞ্চল ও উৎকর্ণ হয়।

হাবিলদার ঃ না - না- ইতা আমরার না - (ঘড়ি দেখে, আমরার আরও পরে— অই শুন্ — এই গেরামের লুকতি একেবারে অবাধ্য- ইতা খাজনা দেই না— তিতুন দেই না— রাজারে মানে না— ইয়ার্কি পাইসে! ইতার লাইগ্যা– মাইয়ালুক- বুড়ালুক- পুলাপাইন— হক্কলতারে মারব– বংশ রাখত না ইতার।

সেপাই ১ ঃ ওরে বাবা— আমি পারত না হুজুর—

হাবিলদার ঃ ওই বেতা— চাকরিখান্ কতম কইর‍্যা লইব রিপোর্ত কইর‍্যা।

সেপাই ২ ঃ দোহাই কর্তা হুজুর- মহারাজ জানে মাইর‍্যা লও- তবু চাকরিখান খাইয়োনা–

সেপাই ১ ঃ চাকরি করতে করতে এক্কেবারে অকম্মা হইয়া গিছি।

হাবিলদার ঃ শুন্। গরমেন্ট অদার দিছে- মুক্তি পরিষদের লুক যদি ধরত না পারে- আগুন লাগাইয়া দিব গেরামে— সব পুড়াইয়া সাফ কইর‍্যা লইব— তখন বাইর অইব নানি— বেতা বেতি বুড়া বুড়ি- পুলাপাইন- যিতারে পাই হিতারেঐ ধইর‍্যা পিতা লাগাইব—সুইচ্ ভইরা দিব আঙ্গুলে— তারার নেতা কৈ বাইর করবার লেইগ্যা।

সেপাই ১ ঃ কিন্তু কর্তা হুজুর—ক্ষত্রিয় অইয়া—মাইয়ালুক—বুড়ালুকের উপরে হাত তুলব কেমনে?

হাবিলদার ঃ চুপ কর! ইতা তরার চিন্তা করন লাগত না—

সেপাই ২ ঃ কাজতা যখন আমরাঐ করন লাগব—আমরাঐ নু পাপ অইব।

সেপাই ১ ঃ আমরারেঐ নু গুতাইব যমদূতে—

হাবিলদার ঃ যুদ্ধ করত আইসে—যেমনেঐ হউক—জিতন লাগব। পাপ-তাপ মাইন্যা অইত না— ঐ মিলিতারির নিয়ম জানে নানি—কুনু প্রশ্ন— কুনু তর্ক করত পারত না। যা অদার করব তাই করন লাগব—

সেপাই ১ ঃ আমি পারত না।

সেপাই ২ - আমিও পারত না।

সেপাই ১ ঃ আমরার দেশের লুক নু তারা- তারার লগে আবার যুদ্ধ করত কিরে– তারা বিদেশী নি কুনু?

সেপাই ২ ঃ গেরাম জ্বালাইয়া দিব কিরে— তারার ঘর জ্বালাইয়া দিত কিরে?

সেপাই ১ ঃ কিতা করসে তারা?

সেপাই ২ ঃ কি দুষ করসে তারা? গেরামে খাঅনঐ নাই—খাজনা মুকুব চাইছে তারা– তারা নু আমরার মতন— আমরারঐ মা-বাবা-ভাই-বইন।

হাবিলদার ঃ আরে গাধা—তারা হইল তিপ্রা– তরা হইলি জমাতিয়া– তরার গাওঅ রাজরক্ত– তরা রাজার পুলা।

সেপাই ১ ঃ হ! রাজা হই না কিরে?

হাবিলদার ঃ হক্কলেই কুনু রাজা হইনি? এই পাথা, মাল খাইসে নি?
সেপাই ২ ঃ [মাথা চুলকায়] না খাইসে না—
হাবিলদার ঃ তঅলে খাইয়া ল— মাথাখান সাফ অইব— তাগদ অইব শরীরে—
সেপাই ১ ঃ না খাইত না—
সেপাই ২ ঃ আমি রাজা অইব—
সেপাই ১ ঃ আমিও অইব।
১ এবং ২ ঃ হক্কলে ই অইব—
হাবিলদার ঃ [অট্টহাসি] হা-হা-হা ঐ বুরবুক্ হক্কলে কুনু রাজা হই নি?
সেপাই ১ ঃ ইতারেনু কই গণতন্ত্র— প্রজারা রাজা হই—
সেপাই ২ ঃ 'প্রজার ভুটে মন্ত্রী চাই!' হেরা কই—
হাবিলদার ঃ অই বেইমানের বাইচ্যা-এমুন কথা কইস্ না কইয়া দিল! কমিনিস্টেরার লগে তরার যুগ আছে। কেপ্টনরে কইলে আর জানে বাচত না– একেবারে কোর্ত মার্শাল – বুজ্‌ঝছনি— এমুন কথা কইস্ না আর—

নেপথ্যে তীব্র হুইশেল।

ঐ অক্ষণই স্টাট করব— চল্ চল্—
(সেও হুইশেল বাজায়—দৌড়ে যায়। পেছন থেকে সেপাই দুটিও যায়)।
সেপাই ১ ঃ আইজগা জানি কিতা হই!
সেপাই ১ ঃ আইজগাঐ শেষ। আইজগাঐ লাস্ত্।

প্রস্থান।

ষড়বিংশ দৃশ্য

জুমের টিলায় মেয়েরা কাজ করতে করতে গান গাইছে। বোবা এসে ত্রস্তভাবে আকারে ইঙ্গিতে তাঁদের বোঝায় একটা ভয়ঙ্কর কিছু আসছে। ওর নির্দেশে ওরা সে দিকে তাকালে সেদিক থেকে লক্ষ্মীচরণ আসে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ সাবধানে থাকিস লো মা তরা—মিলিতারি ঢুকছে গেরামে– আইজগা জানি কিতা করি–মনে হয় দুইশ তিনশ অইব মিলিতারি– সবতির হাতে হাতে বন্দুক– সবতির হাতে–তরা দরাইস না লো মা- মিলিতারি আইলে পলাইয়া থাকিস্—
কুমারী ঃ তুমি চিন্তা করবেন না– তুমি যান– পলাইয়া থাকন গিয়া—
মধুতি ঃ আপনেরে পাইলে ধরবেন তারা—
হীরামতি ঃ আমরা দরাই না মিলিতারিরে—
রূপশ্রী ঃ তুমি যায় না কিরে—
লক্ষ্মীচরণ ঃ আইচ্ছা—যাইতেছে–যাইতেছে– তরা থাকিস্ ঠিক মতন–

লক্ষ্মীচরণ ও বোবার প্রস্থান। কুমারী, মধুতি, রূপশ্রী ও হীরামতি — লক্ষ্মীচরণের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে।

কুমারী ঃ বুড়া ত আমরারে কইয়া গেল, কিন্তু নিজে নি বাঁচব!
মধুতি ঃ মিলিতারির সামনে পড়লে কিতা হই কেতা জনে?
রূপশ্রী ঃ বুড়ারে ধইর‍্যা যদি মিলিতারি কিছু করি তাইলে আমরা বইয়া থাকতাম না—
হীরামতি ঃ বাবাতা ভীষণ একগুইয়া—যিতা কইব ইতা করবই—আইজকা জানি কোন্ বিপদ লাগি—
মধুতি ঃ তুই চিন্তা করিস না— কুস্তা হইলে বোবা ত আছেঐ— আইয়া খবর দিব। বুড়ারে ধইর‍্যা লইয়া যাতি দিত না আমরার গিয়া আটকাইব জান দিয়া হইলেও— চল্ চল্ কাম করি—

ওরা কাজ করতে শুরু করে। দূরে লক্ষ্মীচরণ যাচ্ছে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ উঃ! একতা ফুটা জল যদি থাকত ছড়াতার মইদ্যে! ভীষণ পিপাসা– বুকতা শুকাইয়া গিছে– এইদিগ ছাইড়াও যাইত পারে না– মিলিতারি আইয়া নি মায়াটির উপর কুস্তা করে— আগের থিক্যা গিয়া ত খবরতা দিত পারব তারারে। [নেপথ্যে মিলিটারির মার্চের শব্দ] এই দিগেই আইতেছে। যাই খবরটা দেইগা— হক্কলটি যেমুন পলাইয়া যাই—

সম্পূর্ণ উল্টো ঘুরে দ্রুত হাঁটতে থাকে। মিলিটারিরা জঙ্গীভাবে ঢোকে। লক্ষ্মীচরণ দৌড়াতে গিয়ে পড়ে যায়।

হাবিলদার ঃ হল্ত্! [কণ্ঠে পাশবিক আওয়াজ তুলে] —হ্যান্দস্ আপ্—

লক্ষ্মীচরণ ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। ওরা মারতে থাকে।

হাবিলদার ঃ ওই চল্ মালপত্র লইয়া যাঅন লাগব- ওই সেপাই ক্যাম্প লইয়া চল হে রে–
লক্ষ্মীচরণ ঃ (হাঁফাতে হাঁফাতে) আমি যাইত না— তিতুন দিত না আমি।

হাবিলদার ও অন্যান্য সেপাই লক্ষ্মীচরণকে মারতে থাকে।
বোবা দৌড়ে দিয়ে রূপশ্রীদের খবর দেয়। রূপশ্রীরা তাকিয়ে দেখেই—

রূপশ্রী ঃ আরে! দেখছ কেমন মারতাছে বুড়ারে!
কুমারী ঃ ঐ মিলিতারি— ছাইড়্যা দাও কইতাছে— ছাইড়্যা দাও।

বলে মেয়েরা টাক্কাল তুলে তীব্র বেগে ছুটে যায়।

হাবিলদার ঃ ঐ গুল্লি করব কইয়া দিল— একপাও আগ্গাইলে গুল্লি করব!
কুমারী ঃ বুড়া মানুষরে ধরছে কিরে তুমরা?

বলে এগুতে থাকে। মিলিটারিরা রাইফেল, স্টেগান তাক করে– মেয়েরা তবুও এগুতে থাকে। হঠাৎ গুলি ছুঁড়ে দেয় ওরা— মধুতির বুকে লাগে গুলি। ও পড়ে যায়— তবুও এরা এগিয়ে যায়। আবার গুলি করে, কুমারী পড়ে যায়— এভারে রূপশ্রীর গায়েও গুলি লাগে—এমন সময় দৌঁড়ে ঢোকে পুরুষরা। ওদের হাতে তীর, ধনুক এসব অস্ত্র। বোবা ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। সেপাই ও হাবিলদারের সঙ্গে ওদের কিছুক্ষণ লড়াই হয়। ওরা গাছের আড়াল থেকে এম্বুস করে তীর ছোঁড়ে। কয়েকটি সেপাই

তীরে আহত হলে ওরা পালিয়ে যায়। পেছন পেছন নরেন্দ্র, নগুরাই ছুটে যায়।

নগুরাই ঃ এই — ওই —পালাইছে–

নরেন্দ্র ঃ শইতানের দল—আয় না— কত করব গুল্লি দেইখ্যা দিব আইজগা—

নগুরাই ঃ দিছে না আমরা তিতুন—

নরেন্দ্র ঃ তরারে আর মারত না আমরা—

সৈন্যদলের পিছু পিছু ওরা ছুটে যায়।

রূপশ্রী ঃ (মুমূর্ষ চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে) রাজারে মানে না আমরা—

হীরামতি ঃ (ডুকরে কেঁদে ওঠে) ও রূপসীদি!

রূপশ্রী ঃ কান্দিস না — বইন। ক তিতুন দিত না—আমরা—তিতুন দিত না—

বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

লক্ষ্মীচরণ ঃ (কুমারী, মধুতি ও রূপশ্রীদের দেখে) — হায়—হায়! আমি আগেই কইছিলাম মিলিতারি দেখলে পলাইয়া যাইস্। মিছামিছি জান দিলি আমরার লেইগ্যা— আমি মরলে কিতা অইত! এক বুড়ার লেইগ্যা— তিনটা জুয়ান মাইয়া জান দিলিরি— কেরে জান দিলিরে, তরা? কেরে জান দিলি?

আলো আস্তে আস্তে নিভে যায়।

সপ্তবিংশ দৃশ্য

আবার সামনের আলো জ্বললে রাজনৈতিক নেতাকে প্রারম্ভিক দৃশ্যের মতো শহীদ বেদীর সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়।

নেতা ঃ এ ভাবেই শহীদ হয়েছিলেন কুমারী, মধুতি, রূপশ্রী। কিন্তু তাদের রক্তদান বৃথা যায়নি। তাঁদের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে নতুন করে সংগ্রাম হয়েছে শুরু। আজও ত্রিপুরার জনগণের প্রতিটি সংগ্রামে প্রতিটি জয়ের মুহূর্তে অন্তরে অন্তরে উচ্চারিত হয় তাঁদের নাম—'কুমারী, মধুতি, রূপশ্রী'। আজও শোষণমুক্তির প্রতিটি সংগ্রামে প্রেরণা দেয় মুমূর্ষ এই মায়েদের আপোসহীন শেষ ধ্বনি—
'দেবো না তিতুন!' 'দেবো না তিতুন!'

পর্দা পড়ে।

লেখক ঃ **কমল রায়চৌধুরী**। ত্রিপুরার প্রখ্যাত নাট্যকার। প্রথম মঞ্চায়ণ ১১ জুলাই ১৯৮২, খোয়াই টাউন হল।

প্রিয়জন

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

অনির্বাণ, ফুলি(করবী), বিপ্লব, রমেশ, টুকাই, সঞ্জয়, মুখার্জীবাবু, লোকটা, ফুলির মা, আমিনা

।। প্রথম দৃশ্য।।

একটা একতলা বাড়ীর বাইরের বারান্দায় বসে আছে অনির্বাণ, বছর ৬৭, চেহরায় তেমন ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু চোখ দুটি খুবই উজ্জ্বল। পাশের স্কুলবাড়ী থেকে সকালের প্রার্থনা সংগীত ভেসে আসছে। সংগচ্ছ সংবদ্ধ সংবো মনাংসি জ্ঞানতাম সমানো মন্তো: সমিতি সমানী, সমানাং মন সহচিত্ত মেতাম—" গানটির সঙ্গে অনির্বাণ মনে মনে গলা মেলাচ্ছেন। এমন সময় সামনের বাড়ীর থেকে একটা মেয়ে বছর ২৮ বয়স, শ্যামলা দোহারা চেহারা, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ— একটা ফ্লাস্ক ও কাপ নিয়ে এসে, অনির্বাণের কাছে দাঁড়ায়, কাপে চা ঢেলে অনির্বাণের দিকে এগিয়ে দেয়, আঁচলের তলায় কৌটো থেকে দুটো বিস্কুটও এগিয়ে দেয়।

মেয়েটি ঃ মাস্টারকাকা, তোমার চা, আর এই তোমার থিন অ্যারারুট বিস্কুট।

অনির্বাণ ঃ তুই রোজ এরকম চা করে আনিস কেন বলতো ফুলি? তোরও তো কলেজ যাবার তাড়া থাকে।

ফুলি ঃ তাই বলে তোমাকে সারাদিনে একবার চা করে দিতে পারবো না ? এতটা বিজিও হয়ে যাইনি। (হেসে বলে) ইয়ে, তোমার ভাষায় বলতে গেলে বাজারের দাস হয়ে যাইনি এখনও।

অনির্বাণ ঃ তাই, তবে শোন ফুলি, তোকে বলি, এই যে আজকাল রব উঠেছে— ক্যাপিটালিজমের মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, এটাও আসলে বোঝার সমস্যা। ক্যাপিটালিজম্ নিজেই সমস্যা। Capitalism is in crisis, এটা ঠিক নয় Capitalism is a crisis।
(বাইরের বারান্দায় অফিস যাবার পোশাকে বেরিয়ে আসে অনির্বাণের ছেলে বিপ্লব। জুতো পরতে পরতে বলে ওঠে —)

বিপ্লব ঃ ব্যাস, সকাল সকাল লেকচার শুরু হয়ে গেল তো।

ফুলি ঃ তুই অফিসে, যাচ্ছিস?

বিপ্লব ঃ হ্যাঁ।

ফুলি ঃ তোকে না ডাক্তার বারণ করেছে এখনই বেরোতে? সবে জন্ডিস থেকে উঠলি, আর ক'টা দিন রেস্ট নিয়ে তারপর জয়েন করতিস।

বিপ্লব ঃ তোর মতো সুখের চাকরী নয় ম্যাডাম করবী যে বসে বসে ছাত্র-ছাত্রীকে শুধু জ্ঞান দেবো। আইটির চাকরিতে ওসব রেস্ট-ফেস্ট কোনও কথা হয় না বুঝলি।

অলরেডি একমাস ছুটি নিয়েছি। এরপর ছুটি চাইলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। আসছি বাবা। (বেরিয়ে যায়)

ফুলি ঃ তুমি দেখলে পলুর কান্ড। এখনও সুস্থ হয়নি পুরো, ওদিকে গটগট করে চলে গেলো অফিসে।

অনির্বাণ ঃ (শান্তভাবে) দেখলাম।

ফুলি ঃ অদ্ভূতকথা তো, অফিস যখন তখন বের করে দেবে বললেই হলো না কি? অসুস্থ তো যে কেউ যে কোনও সময় হতে পারে, তাহলে তো সবাইকেই বের করে দিতে হয়, তুমিই বলো মাস্টারকাকা।

অনির্বাণ ঃ (অন্য ভাবনা থেকে বলে) হ্যাঁ রে ফুলি, এই যে প্রেয়ারে ছেলেগুলো রোজ এই স্তোত্র গাইছে, মানে বুঝে গায় তো?

ফুলি ঃ নিশ্চয়ই গায়। ওদের স্যারেরা নিশ্চয়ই মানে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অনির্বাণ ঃ হবে হয়তো।

ফুলি ঃ আমার এখনও মনে আছে সংস্কৃত পড়াতে গিয়ে তুমি প্রথম এই স্তোত্রটার মানে বুঝিয়েছিলে।

অনির্বাণ ঃ মানে টা মনে আছে তোর?

ফুলি ঃ হ্যাঁ (গ্রীবা উঁচু করে বলতে শুরু করে) তোমরা মিলিত হও, এক বাক্যে বলো, একে অপরের মনকে জানো। তোমাদের মন্ত্র এক সিদ্ধি এক চিত্ত এক হোক, তোমাদের মন এমনই সমান হোক যাতে তোমাদের মিলন সুন্দর হয়।

অনির্বাণ ঃ বাঃ বাঃ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) পলু কি করে ভুলে গেল, কে জানে?

ফুলি ঃ থাক না মাস্টারকাকা—

অনির্বাণ ঃ সেদিন পলু আমাকে বলছিল, ওর অফিসের এক কলিগ বাইক থেকে পড়ে গিয়ে একমাস মতো বেডরেস্টে ছিল। তারপর যেদিন এসে জয়েন করে, সেদিনই নাকি অফিস হাতে নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম, তোরা সবাই মিলে প্রোটেস্ট করলি না? উত্তরে কী বলল জানিস?

ফুলি ঃ কী বলল, ওসব সংঘবদ্ধ হয়ে প্রোটেস্টের যুগ চলে গেছে?

অনির্বাণ ঃ ঠিক তাই, সঙ্গে এও বলল যে, সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চিন্তাভাবনা নাকি বিদেশী গারবেজ আইডিয়া। আমাদের দেশে অচল। হ্যাঁ রে ফুলি (পূর্ণ দৃষ্টিতে) মার্কস-এঙ্গেলস এরা না হয় বিদেশী, কিন্তু ঋগ্বেদের এই স্তোত্র, সেতো এই দেশেরই। এই স্তোত্রই তো কমিউনিজমের মূল কথা, নয় কি?

ফুলি ঃ অত কিছু ভেবো না মাস্টার কাকা।

অনির্বাণ ঃ পারি নে রে ফুলি, পারি নি। পলুকেও পারিনি আমাদের ভাবনা বোঝাতে, দেশের মানুষকেও পারিনি। (বাইরে বেরোতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়) তুই এবার যারে ফুলি, তোর কলেজ যেতে দেরী হয়ে যাবে।

ফুলি ঃ হ্যাঁ আসি। চায়ের কাপটা তুলে নেয়, যেতে গিয়ে আবার ফিরে আসে)

সাম্যবাদের ভাবনা প্রচার করতে ইউরোপে কেন মারামারি-কাটাকাটি হয়েছিল, সে আমি বুঝি। ওদের কাছে এই ইনক্লুসিভনেস আইডিয়াটা ছিল নতুন। কিন্তু বেদ- উপনিষদের দেশে কেন এমন রক্তারক্তি হয়ে গেল, সেটা আমার কাছেও একটা ধাঁধা মাস্টারকাকা।

অনির্বাণ ঃ তুই তো পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়েছিস। উত্তর খুঁজে পাস না?

ফুলি ঃ খুঁজছি, উত্তর পেলে তোমাকে জানাবো। (ফুলি চলে যায়)

(অনির্বাণ বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাড়ীর সামনে দেখা হয় রমেশবাবুর সঙ্গে)

রমেশ ঃ সুপ্রভাত মাস্টার।

অনির্বাণ ঃ সুপ্রভাত, তা চললে কোথায় হে রমেশ।

রমেশ ঃ আজকের তারিখটা কি মনে আছে?

অনির্বাণ ঃ কেন? সাত তারিখ। ও, আজ তো তোমার পেনশন তোলার দিন।

রমেশ ঃ হ্যাঁ, তাই তো বেরিয়ে পড়লাম।

অনির্বাণ ঃ এত তাড়াতাড়ি?

রমেশ ঃ এই সময় গেলে ভিড়টা একটু কম থাকে। তাছাড়া ওই ক্যাশিয়ারবাবু একটু তাড়াতাড়িই আসতে বলে।

অনির্বাণ ঃ ও—

রমেশ ঃ তাছাড়া যাবার পথে ফিরিঙ্গী কালীকে একটা পেন্নাম ঠুকে যাই, খুব জাগ্রত দেবী। বুঝলে তো।

অনির্বাণ ঃ তাই বুঝি! তবে প্রাইভেট কোম্পানিতে পেনশন— এটা সত্যিই রেয়ার।

রমেশ ঃ সবই মায়ের দয়ায় ভাই। মায়ের দয়ায় ভাগ্যিস এই চাকরিটা জুটেছিল।

অনির্বাণ ঃ তোমার নিজের কোনও উদ্যোগ ছিল না বলছো।

রমেশ ঃ না তা ছিল, তবে-

অনির্বাণ ঃ তবে এই পেনশনটা সত্যিই ব্যতিক্রম। তোমাদের কোম্পানিকে ধন্যবাদ দিতেই হয় ।

রমেশ ঃ আসলে আমাদের এই কোম্পানির মালিকের বাবা ছিলেন খুবই ভালো মানুষ। প্রত্যেক এমপ্লয়ির দিকে নজর দিতেন। তিনিই পেনশন স্কিমটা চালু করেছিলেন। হালের এমপ্লয়িরা না পেলেও পুরোনো আমালের সবার ক্ষেত্রেই পেনশন স্কিমটা বজায় রেখেছে ছেলে। তাই মায়ের দয়ায় জুটে যাচ্ছে।

অনির্বাণ ঃ চলো স্টেশনের পথে তোমায় একটু এগিয়ে দিই।

(হঠাৎ দৌড়ে আসে পাড়ার ছেলে টুকাই)

টুকাই ঃ মাস্টারমশাই কোথাও যাচ্ছেন।

অনির্বাণ ঃ এই রমেশের সঙ্গে একটু হাঁটছি।

টুকাই ঃ মাস্টারমশাই দু ইউনিট ব্লাড জোগাড় করতে হবে। এ-পজিটিভ। আপনার এক ছাত্র মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে আছে বলেছিলেন না একদিন? তাকে ধরে জোগাড় করা যায়?

অনির্বাণ ঃ বলেছিলাম তো। তা ওর ফোন নম্বরটা পলু জানে, সে তো অফিসে।

টুকাই ঃ পলুকে ফোন করা যায় না?

অনির্বাণ ঃ দেখছি। তা কার লাগবে দু' ইউনিট রক্ত?

টুকাই ঃ সন্তুদার বড় মেয়ে মঞ্জরীর—

রমেশ ঃ আমি একটা ফোন করব?

টুকাই ঃ আপনি?

রমেশ ঃ হ্যাঁ, পলুকে ফোন করে ফোন নম্বর আনিয়ে, আবার ফোন করার জন্য তো অনেকটা সময় চলে যাবে, তার চাইতে আমি যদি ফোন করি।

টুকাই ঃ মাস্টারমশাই?

অনির্বাণ ঃ হ্যাঁ, রমেশ ফোন করো। কাকে করবে?

রমেশ ঃ সুহৃদকে। (পকেট থেকে ফোন বের করে ফোন করে। অনির্বাণ ও টুকাই তাকিয়ে থাকে, কথা শুরু হয়) সুহৃদ, আমি রমেশ সেন, রমেশদা বলছি। শোনো ভাই আমাদের এখানে একজনের এ-পজিটিভ দু'ইউনিট ব্লাড লাগবে—(টুকাই-এর দিকে তাকিয়ে) কোথায় আছে?

টুকাই ঃ হেলথ্ কেয়ারে।

রমেশ ঃ হেলথ্ কেয়ারে আছে, পাঠাচ্ছ? ধন্যবাদ ভাই। হ্যাঁ আমি থাকবো থাকবো—(ফোন বন্ধ করে) আধ ঘন্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে আসছে বললো।

টুকাই ঃ থ্যাংক ইউ রমেশ কাকা। আমি যাচ্ছি।

রমেশ ঃ আমাকেও যেতে হবে। সুহৃদ আমাকে ওখানে থাকতে বললো।

টুকাই ঃ আপনারা বসুন। আমি যাচ্ছি। (চলে যায়)

অনির্বাণ ঃ তুমি যাবে? পেনশন আনতে দেরী হয়ে যাবে না?

রমেশ ঃ সে না হয় একদিন হলো। তাছাড়া দেরী করে গেলে ছুটির পর পুরোনো কলিগদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারা যাবে।

অনির্বাণ ঃ সকালবেলায় একটা কথায় মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তুমি আবার মনটা ভালো করে দিলে রমেশ।

রমেশ ঃ আসলে আমারও এ - পজিটিভ। তবে আমাদের এই বয়সে রক্ত ডোনেট করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তাই সুহৃদকে ফোন করলাম।

অনির্বাণ ঃ তোমার ওই সুহৃদ, সার্থকনামা, সত্যিকারের সুহৃদ। চলো, এ-পজিটিভকে সফল করে আসি। (দুজনে এগিয়ে যায়)

।। দৃশ্যান্তর ।।

।। দ্বিতীয় দৃশ্য।।

সন্ধ্যে সাতটা। অনির্বাণদের বাড়ীটা পুরো অন্ধকার। ফুলি ঘরে আসে। বাইরের আবছা আলোয় দেখা যায় অন্ধকার ঘরে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে বিপ্লব। ফুলি আলোটা জ্বালায়।

বিপ্লব ঃ (বিরক্তি সহকারে) আলোটা জ্বালাস না। (ফুলি বিপ্লবের কাছে এগিয়ে যায়) তুই বাবার কাছে এসেছিস তো? বাবা বেড়িয়েছে। কোথায় গেছে জানিনা।

ফুলি ঃ (বিপ্লবকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়) তোর সঙ্গে কি আমার কোনো কথা থাকতে পারে না? (বিপ্লবকে খুব অসহায় দেখায়) তোর কি শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

বিপ্লব ঃ আর শরীর! এই শরীরের জন্যই শালা চাকরিটা বোধহয় গেল।

ফুলি ঃ মানে?

বিপ্লব ঃ মানে আবার কী! তিনমাসের নোটিশ ধরিয়ে দিল হাতে।

ফুলি ঃ সে কী?

বিপ্লব ঃ শালা ওই কোম্পানীর জন্য কী না করেছি। রাতে বাড়ী ফিরিনি, অফিসেই থেকে গিয়েছি, এরকম ঘটনাও হয়েছে, লাস্ট ইয়ারেও বেস্ট এমপ্লয়ীর অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল আমাকে। অ্যাওয়ার্ড ফর মাই লয়ালটি। লয়ালটি মাই ফুট। শালা কুত্তা ভাবে আমাদের।

ফুলি ঃ তোর কলিগরাও জানত তো তোর শরীর খারাপের কথা?

বিপ্লব ঃ জানবে না? শালা ভেরিফাই করতে বাড়ীতে পর্যন্ত এসেছিল।

ফুলি ঃ তা, তারা কিছু বলছে না?

বিপ্লব ঃ সব শালা স্বার্থপর।

ফুলি ঃ তুই নিজেও কি কম?

বিপ্লব ঃ (ফুলির দিকে তাকায়) তুইও কি বাবার মত লেকচার দিবি?

ফুলি ঃ ওটাই তো আমার কাজ রে। তোর যেমন, চারপাশে যা কিছু চলছে, সেসব দেখেও না দেখার ভান করে শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভাবাটা কাজ, আমার তেমনই চোখের সামনে কিছু দেখতে পেলে সেটায় রি-অ্যাক্ট করে লেকচার দেওয়াটা কাজ।

বিপ্লব ঃ ফুলি— আমাকে তোর ছাত্র ভাবলি নাকি?

ফুলি ঃ কি করব বল, পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়েছি, পড়াচ্ছি তো, স্বভাবটাই এরকম হয়ে গেছে।

বিপ্লব ঃ কি বলতে চাস কী তুই? (ফুলির মুখোমুখি দাঁড়ায়) নিজে যখন বড়লোক ছেলে পেয়ে বিয়ে করে চলে গেলি, তখন তোর লেকচারের ভাণ্ডার কোথায় ছিল?

ফুলি ঃ বিয়ে যে আমি নিজের ইচ্ছায় করিনি, সেটা তুইও জানিস। আমি তখনও কলেজে চাকরি পাইনি, কিন্তু তুই চাকরি পেয়ে গেছিস। তবু তুই নিজের গুডবয় ইমেজ ভেঙ্গে আমার মা-বাবার সামনে দাঁড়াসনি।

বিপ্লব ঃ আমিও তখন সবে চাকরিতে জয়েন করেছি। আমার পক্ষে হিরোগিরি দেখানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু, তোর মাস্টারকাকা কী করছিল? তিনি তো নাকি জেল খাটা বীরপুরুষ। তা তিনি নিজে গিয়ে তোর বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারছিলেন না।

ফুলি ঃ ছিঃ, নিজের বাবাকে সম্মান দিয়ে কথা বল।

বিপ্লব ঃ কেন সম্মান দেব? কেন এ্যাঁ—(উত্তেজিত হয়ে ওঠে) লোকটা করেছে কি আমার জন্য? শুধু বড় বড় ডায়লগ— শ্রেণীশত্রু, বুর্জোয়া। আরে তুমি নিজের ছেলেকে একটা ভালো স্কুলে পড়াতে পারো না, আর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাষণ দিয়ে বেড়াও।

ফুলি ঃ (রাগ চেপে) কাকু-কাকিমার তোর মত একটা অপদার্থ ছেলে হল কী করে কে জানে? কোনো কিছুই তুই ওদের কাছ থেকে শিখিস নি।

বিপ্লব ঃ না, শিখিনি তো, শিখলে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হত না, আর এই আই.টি.সেক্টরে জব করাও হত না। ওই টিউশন সম্বল টুলো পণ্ডিত হয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে হত। ওসব আঁতেল মার্কা শ্রেণীসংগ্রাম আমার পোষাবে না।

ফুলি ঃ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তোর লেকচার শুনছি, আমি এবার যাই— (যেতে উদ্যত হয়, বিপ্লব এসে ফুলির দু'বাহু চেপে ধরে)

বিপ্লব ঃ যাস না ফুলি, যাস না। আমার এই দুঃসময়ে আমাকে ছেড়ে যাস না, আই নিড ইয়োর সাপোর্ট।

ফুলি ঃ সে কী, তুই তো বলেছিলি ডিভোর্সি মেয়ে বিয়ে করবি না। তোর তো ফ্রেশ চাই। ছাড় আমাকে।

বিপ্লব ঃ (ফুলিকে ছাড়ে না) তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন বুঝছি যে, তোকে ছাড়া আমার চলবে না ফুলি। আমি আসলে মেন্টালি খুব উইক, তাই হঠাৎ ডিসিশন নিতে পারি না। আই সোয়্যার, আমি তখন ভুল করেছিলাম।

ফুলি ঃ (নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়) এখনও ভুল করছিস। এখনও দুর্বল মনেই ডিসিশন নিচ্ছিস। আবার জব পেলেই দেখবি ডিভোর্সি মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছে চলে যাবে।

বিপ্লব ঃ না রে, সত্যি বলছি, আই প্রমিস।

ফুলি ঃ মাস্টারকাকার আদর্শকে যে শ্রদ্ধা করতে পারে না তার সঙ্গে আমি জীবন কাটাতে পারবো না। (একটু এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়) মিলন সুন্দর হতে গেলে, সমানী হৃদয়ানি হতে হয়, একথা আমি বিশ্বাস করি। তোর সঙ্গে

আমার মিলবে না রে পলু।

বিপ্লব ঃ বাবাদের ওই খুনি আন্দোলনটাকে তুই সাপোর্ট করিস?

ফুলি ঃ পথটা সাপোর্ট না করলেও মতটা করি। অন্ততঃ যারা টাকার জোরে তোর মত ডিগ্রিধারী লোকজনকে দাসে পরিণত করে, তাদের পথ বা মতকে এনকারেজ করতে পারছি না।

বিপ্লব ঃ মানছি ক্যাপিটালিজম ইজ ইন ক্রাইসিস, তবে অবস্থা সামলে—

ফুলি ঃ (পলুর কথা থামিয়ে দেয়) ক্যাপিটালিজমটাই একটা ক্রাইসিস পলু । (ফুলি চলে যায়)

(বিপ্লব ফুলিকে নাম ধরে ডাকে, সাড়া না পেয়ে আলো নিভিয়ে আবার জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। তার কানে বাজে একটা কবিতা- যেন মনে হয় তার 'মা' বলছে—)

"কেমন করে আগলে রাখি তোকে
চারপাশে এক শ্বাপদ সংস্কৃতি
নখর ত্রাসে গ্রহণ লাগে পুরী
বিনিদ্র রাত আশঙ্কা আর ভীতি"

(বিপ্লব জানালার দিক থেকে ঘরের দিকে মুখ ফেরায়, অস্ফুটে বলে ওঠে 'মা' — আলো নেভে)

।। দৃশ্যান্তর।।

।। তৃতীয় দৃশ্য।।

বাড়ীর পথে রাস্তায় অনির্বাণ, পিছন থেকে তাকে ডাকে রমেশ।

রমেশ ঃ মাস্টার—(অনির্বাণ দাঁড়ান)

অনির্বাণ ঃ তুমি! আজ অফিস থেকে ফিরতে বেশ রাত হলো দেখছি—

রমেশ ঃ হ্যাঁ— এই পুরোনো কলিগদের সঙ্গে আড্ডাটা একটু বেশীই হয়ে গেল, তুমি?

অনির্বাণ ঃ ওই হেলথ্ কেয়ারেই ছিলাম।

রমেশ ঃ মেয়েটা কেমন আছে?

অনির্বাণ ঃ এখন একটু স্টেবল হয়েছে।

রমেশ ঃ হ্যাঁ, স্টেবল হলেই ভালো। আসলে চারপাশে সব কিছুই তো আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে।

অনির্বাণ ঃ রমেশ, সঞ্জয়দের খবর ভালো তো?

রমেশ ঃ হ্যাঁ— ভালোই তো দেখে এলাম।

অনির্বাণ ঃ ওদের ওখানে গিয়েছিলে বুঝি, তাই এত দেরী?

রমেশ ঃ হ্যাঁ— ইয়ে, মাস্টার শ্রীময়ীকে কখনো এটা বলোনা।

অনির্বাণ ঃ কেন, শ্রীময়ী কি তোমাকে এজন্য কটু কথা বলবে?—

রমেশ ঃ আসলে সঞ্জয়-এর স্ত্রী আর ওর বাচ্চাটার এখান থেকে চলে যাওয়াটা শ্রীময়ী মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। আমি, লুকিয়ে গিয়েছি শুনলে মুখে কিছু বলবে না, তবে অভিমান করবে নিশ্চিত।

অনির্বাণ ঃ সঞ্জয়রা কিন্তু হঠাৎই এখান থেকে চলে গেল। শ্রীময়ীর সঙ্গে থাকতে না পারাটা খুবই বেমানান মনে হয়। হয়েছিল কি? অবশ্য আপত্তি থাকলে বলতে হবে না।

রমেশ ঃ না, তোমাকে বলতে আপত্তি কি? মাস চারেক আগে, একদিন সকালে— (মঞ্চের অন্যদিকে আলো পড়ে। দেখা যায় রমেশের ছেলে, সঞ্জয় অফিস যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, জামার টাই বাঁধছে। এমন সময় রমেশ সেখানে আসেন)

রমেশ ঃ সঞ্জু, তোর মা'র চশমাটা পাল্টাতে দিয়েছি, আজ অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়ে আসবি? বিলটা দেবো?

সঞ্জয় ঃ দাও— তবে আজ বিকালে অফিস থেকে ফেরার পথে মঞ্জুদের বাড়ী যাবো, ফিরতে হয়ত একটু দেরী হয়ে যাবে। তখন যদি প্রেসিডেন্ট চশমা হাউজ খোলা থাকে নিয়ে আসবো।

রমেশ ঃ তবে থাক, কাল বা পরশু নিয়ে এলেও চলবে। বৌমারা কবে বাড়ী আসবে রে সঞ্জু। নাতনিটাকে না দেখে তোর মা'র , আমার দুজনেরই মন খারাপ।

সঞ্জয় ঃ বাবা— (একটু ইতস্তত করে) মানে সত্যি কথাটা হলো মঞ্জু আর তিন্নি বোধহয় এ বাড়ীতে আর পার্মানেন্টলি ফিরবে না।

রমেশ ঃ কেন রে? ফিরবে না কেন?

সঞ্জয় ঃ আসলে মঞ্জু ওর অফিস থেকে লোন নিয়ে নিউটাউনে একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিল, পরে অবশ্য ওর বাবাও বেশ কিছু টাকা দিয়েছেন। পরশু ফ্ল্যাটটা ডেলিভারী দেবে।

রমেশ ঃ তোরা এখান থেকে চলে যাবি?

সঞ্জয় ঃ ওখান থেকে মঞ্জুর অফিটাও খুব কাছে। আমারও সুবিধা হবে। তাছাড়া তিন্নিকে দিল্লী পাবলিক স্কুলে ভর্তির চেষ্টা চলছে। ওর স্কুলটাও নতুন ফ্ল্যাটের খুব কাছেই, তাই —

রমেশ ঃ এ বাড়িটা তো একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে, তোর মা—

সঞ্জয় ঃ আচ্ছা বাবা, তুমি— তোমরা কি চাও না আমি উন্নতি করি, এগিয়ে যাই?

রমেশ ঃ কি বলছিস! তোকে কি আমরা বাঁধা দিয়েছি কখনও?

সঞ্জয় ঃ তাহলে মানিয়ে নিতে পারছো না কেন? দেখো বাবা জীবন একটাই, যা করতে হবে এক জীবনেরই।

রমেশ ঃ পারছি না, তোর মায়ের কথা ভেবে। তোকে ছাড়া মা যে সারাজীবনে আর কিছু ভাবতেই পারলো না।

সঞ্জয় ঃ সে দোষ কি আমার?

রমেশ ঃ দোষ কারও নয়। বেশি ভালোবাসা যেমন দোষের নয়, সেই ভালোবাসাকে বেশি গুরুত্ব না দেওয়াও দোষের নয়। তবে সেই ভালোবাসাকে অবশ্যই সম্মান জানানো উচিৎ।

সঞ্জয় ঃ তুমি কি বলতে চাইছো? আমরা তোমাদের অসম্মান করি।

রমেশ ঃ কবে যেতে চাস?

সঞ্জয় ঃ সামনের মাসে ফাস্ট উইকে। হ্যাঁ শোনো ফ্ল্যাটের সঙ্গে একটা গাড়িও বুক করেছি। ইনস্টলমেন্ট অনেক। তাই এখন থেকে তোমাদের যে টাকাটা দিই সেটা একটু কম হবে। তাছাড়া আমরা থাকছি না তো, তোমাদের খরচও কমে যাবে। ঠিক আছে?

রমেশ ঃ সবই তো ঠিক করে ফেলেছিস, ঠিকই আছে।
(মোবাইল বাজে । সঞ্জয় ফোন কানে দেয়)

সঞ্জয় ঃ বলো ডার্লিং, হ্যাঁ এই তো অফিস বেরোচ্ছি— এ্যাঁ— এক মিনিট— (রমেশের দিকে তাকিয়ে) বাবা তোমার বৌমার ফোন।

রমেশ ঃ ওঃ হ্যাঁ, তোরা কথা বল। আমি আসছি। (রমেশ চলে যায়)

সঞ্জয় ঃ হ্যাঁ, বলো। মডিউলার কিচেন তো ফাইনাল হয়ে গেছে। বসার ঘরের দেওয়ালেও টাইলস্, ঠিক আছে? আর স্টাডিতে ওয়ালপেপার,আরে না না তোমাকে না দেখিয়ে কোনো কিছুই ফাইনাল করবো না। ঠিক আছে। দেখা হচ্ছে পাঁচটায়, আমি তোমায় তুলে নেবো। বাই বেবি! (ফোনেই চুমু দেয়)
(একদিকে আলো নেভে। অন্যদিকে আলো জ্বলে ওঠে)

অনির্বাণ ঃ ও, তুমি সঞ্জয়ের নিউটাউনের বাড়ীতে গিয়েছিলে? নাতনির জন্য মন কেমন করছিল?

রমেশ ঃ না মাস্টার। টাকাটা আনতে গিয়েছিলাম।

অনির্বাণ ঃ টাকা আনতে?

রমেশ ঃ হ্যাঁ মাস্টার। আমার এই পেনশন আনতে যাওয়াটা একটা ছল।

অনির্বাণ ঃ সে কি হে!

রমেশ ঃ তোমার কাছে সত্যিটা কবুল করি। প্রভিডেন্ট ফান্ড। গ্র্যাচুইটি আর সামান্য সঞ্চয় ভেঙ্গেই চলছিল রিটায়ারমেন্টের পর। পেনশন তো খুবই সামান্য। ওই টাকায় সংসার চলে না। সঞ্জয় চলে যাবার পর খুবই অসুবিধায় পড়েছিলাম। তাই সঞ্জয়ের বাড়ী গিয়ে ওকে সত্যিটা জানালাম। ও মাসের প্রথমে একটা নির্দিষ্ট দিনে যেতে বলেছে।

অনির্বাণ ঃ সেইদিন সঞ্জয়ের বাড়ী গিয়ে টাকা নিয়ে আসো?

রমেশ ঃ হ্যাঁ মাস্টার। তবে শ্রীময়ী কিছু জানে না। আসলে—

অনির্বাণ ঃ যে গাছকে একটু একটু করে জল দিয়েছো, সার দিয়েছো, পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ওষুধ দিয়েছো—

রমেশ ঃ তাকে কি কৃতকর্মের কথা বলা যায়? আর বললেই বা সে শুনবে কেন? সে তো বলেনি পরিচর্যা করতে।

অনির্বাণ ঃ ঠিক, পরিচর্যা তো আবেগ, কর্তব্যবোধ, স্বার্থের তো সেখানে কোনো জায়গা নেই—

রমেশ ঃ নেই কি? কে জানে!
(উল্টোদিক থেকে টুকাই-মুখার্জীবাবু নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা বলতে বলতে ঢোকে। অনির্বাণ ও রমেশ একটু থমকে যায়)

মুখার্জীবাবু ঃ তুমি তো দেখলে, ভোটাভুটিতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কার্যকরী পরিষদের বেশীরভাগ সদস্যই সিদ্ধান্তের পক্ষে, তোমরা তো মাইনোরিটি হয়ে গেলে।

টুকাই ঃ মুখার্জী কাকা, গণতন্ত্রে মাইনোরিটির মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয়। তাছাড়া বিষয়টিতে মানবাধিকারের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে—

মুখার্জীবাবু ঃ (একটা সিগারেট ধরান। জোরে একটা টান দেন; তারপর টুকাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন) টুকাই, তুমি আমার স্নেহভাজন, কিন্তু এটুকু তো বুঝবে যে ওপরের চাপ না থাকলে এমন সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হত না। (অনির্বাণ ও রমেশকে দেখে সিগারেটা নিভিয়ে দেয়) কি ব্যাপার মাস্টার মশাই, আপনারা এখনো রাস্তায়?

অনির্বাণ ঃ এই বাড়ী যাবার আগে দুজনে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করছি।

মুখার্জীবাবু ঃ আপনারা বাড়ী যান। শুনলাম নেতাজী কলোনীতে আবার গন্ডোগোল লেগেছে। এই সময় বাইরে থাকা ঠিক নয়, আমি চলি। (একুট এগিয়ে নেভানো সিগারেটটা আবার ধরান, এদের দিকে একটু টেঁরিয়ে তাকিয়ে চলে যান)

অনির্বাণ ঃ কি হয়েছে টুকাই?

টুকাই ঃ ভগবতী আশ্রমে একটা খারাপ ঘটনা ঘটেছে।

রমেশ ঃ ভগবতী আশ্রমে আবার কি খারাপ ঘটনা ঘটলো?

টুকাই ঃ ওখানে রান্না করে, এর গেরস্থালী গোছানোর কাজ করে যে আম্মু খালা, স্যার তো চেনেন—

রমেশ ঃ হ্যাঁ— আমিনা , ভালোই চিনি।

টুকাই ঃ ওনাকে নাকি আশ্রম থেকে বের করে দিয়েছে।

রমেশ ঃ সে কি? কেন?

টুকাই ঃ নতুন ম্যানেজমেন্ট ধর্মের দোহাই দিয়ে ভগবতী আশ্রমে আম্মু খালাকে রাখতে চাইছে না। মা ভগবতীর নামে যে আশ্রম সেখানে নাকি আম্মু খালার থাকা ধর্ম বিরোধী।

অনির্বাণ ঃ আরে, ওই আশ্রম তো বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীর নামে। ৯০ এর দশকে যখন ওই আশ্রমের কাজ শুরু হয়, তখন আমরা অনেকেই টাকা পয়সা জোগাড় করেছি, শারীরিক শ্রম দিয়েছি— আর ওই আমিনা — আম্মু, ও তোমাদের

কাকীমার গ্রামের মেয়ে। তোমার কাকীমাই তো ওকে ওই আশ্রমে কাজে ঢুকিয়েছিল।

টুকাই ঃ সরকারী অনুদান পেয়েছে নাকি নতুন ম্যানেজমেন্ট— তাই এই ফতোয়া—

রমেশ ঃ কি হবে তাহলে?

টুকাই ঃ আমরা কয়েকজন যাচ্ছি। আম্মু খালার রাতের একটা আশ্রয় তো জোগাড় করি আগে, কাল সকালে দেখবো অন্য কি ব্যবস্থা করা যায়—

অনির্বাণ ঃ শোনো টুকাই, তুমি চাইলে আমি তোমায় সঙ্গ দিতে পারি—

টুকাই ঃ রাত হয়ে গেছে স্যার— আপনি বাড়ি যান। বরং কাল সকালে—

অনির্বাণ ঃ কাল সকালে তো ভগবতী আশ্রমে যেতেই হবে, দেখো রাতের মত মেয়েটির জন্য একটা আশ্রয় যোগাড় করতে পারো কিনা।

টুকাই ঃ আপনি চিন্তা করবেন না স্যার— (চলে যায়)

রমেশ ঃ মাস্টার, আমাদের এখানেও কি মানবতার উপরে ধর্মীয় সংস্কার ঠাঁই পাবে?

অনির্বাণ ঃ সতর্ক থাকতে হবে ভাই, আনন্দ-ভালোবাসার সম্প্রীতি যেন ব্যথায় পরিণত না হয়। চলো- (এমন সময় দূরে কোথাও বোমা ফাটার আওয়াজ পাওয়া যায়, দুজনে একটু থমকে দাঁড়ান)

অনির্বাণ ঃ যাও রমেশ— তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও।

রমেশ ঃ হ্যাঁ, আসি মাস্টার- (চলে যায়)

অনির্বাণ ঃ মধ্য রাতে প্রাচীনকালের তোপ,
অতীত বলে, মৃত সৈনিক চোপ।
(নিজের মনে হেসে ওঠে। আলো নেভে)

।। দৃশ্যান্তর ।।

।। চতুর্থ দৃশ্য ।।

ঘরে আলো না জ্বালিয়ে বিপ্লব বসে আছে। অনির্বাণ এসে আলো জ্বালায়।

অনির্বাণ ঃ কি ব্যাপার, অন্ধকারে বসে আছো?

বিপ্লব ঃ তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এত দেরী হলো তোমার?

অনির্বাণ ঃ ওই রবীন্দ্র গ্রন্থাগারের লাইব্রেরীয়ান সুমন্ত মানে সন্তুর মেয়ের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হেলথ্ কেয়ারে আছে, ওখানেই ছিলাম।

বিপ্লব ঃ ও, জনসেবা। তা, দুপুরেও বোধহয় বাড়ী ফেরোনি। রান্নার মেয়েটা বোধহয় বিকেলে এসে ফিরে গেছে।

অনির্বাণ ঃ আমি গ্যাসে গোবিন্দভোগ চাল, আর ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ বসিয়ে দিচ্চি— এক্ষুনি হয়ে যাবে।

বিপ্লব ঃ থাক। একটা রাত পাউরুটি বা ম্যাগি খেয়ে চালিয়ে দেবো।

অনির্বাণ ঃ ও।

বিপ্লব ঃ খানিকক্ষণ আগে নেতাজী কলোনীর দিক থেকে বোমার আওয়াজ পেলাম, গোলমালও শুনলাম।

অনির্বাণ ঃ হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। এখন তো এই শুরু হয়েছে, নিজেদের মধ্যেই মারামারি, নয়ত দুই দলের ছেলের মধ্যে বোমাবাজি, ভাঙ্গাভাঙ্গি, আর ভালো লাগে না।

বিপ্লব ঃ (ব্যঙ্গ করে) তুমি বলছ একথা। এই মারামারি, বোমাবাজি, ভাঙ্গাভাঙ্গি তোমরাই তো শুরু করেছিলে।

অনির্বাণ ঃ দেখো ভাঙ্গাভাঙ্গি, মারামারি আমি কখনোই সাপোর্ট করিনা। তবে তোমায় বলি ওই মূর্তি ভাঙ্গাভাঙ্গির মধ্যে কোন স্ফূর্তি ছিল না। সময়টা তখন অন্য ছিল। মানুষের এ্যাক্টিভিটিকে বিচার করতে গেলে আগে এই সময়টাকে বুঝতে হয়।

বিপ্লব ঃ এই বললে সাপোর্ট করোনা, কিন্তু সাপোর্টেই তো কথা বলছো।

অনির্বাণ ঃ এই হলো চিরকালীন সমস্যা, মানুষ শোনে এক আর বোঝে আর এক। দ্যাখো ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্যক্তি পূজায় বিশ্বাসী নই। কিন্তু মানুষের নিজের মতটা বোঝার জন্যই কিছু সিম্বল লাগে। বিদ্যাসাগর আমার কাছে শিক্ষার প্রতীক, তাঁর মূর্তি ভাঙ্গলে আমার আদর্শেই আঘাত এসে লাগবে।

বিপ্লব ঃ তুমি বলতে চাও, বিদ্যাসাগরের মূর্তি তোমরা ভাঙ্গোনি, কিন্তু এই মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারগুলো যে বাংলার কালচারটাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছিল, সেটা তো মানবে?

অনির্বাণ ঃ সেই সময় সেই মূর্তি ভাঙ্গার কাজটা কারা করেছিল, সে সম্পর্কে আমি আজও নিঃসংশয় নই। আমরা সব কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়ে ছিলাম। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ এ কাজ করেছিল বলে তোমার মনে হয়?

বিপ্লব ঃ ইমোশনাল হয়ে এখন অস্বীকার করলেই হবে? তোমার, তোমাদের মুখে বিদ্যাসাগরের গুণগান মানায় না।

অনির্বাণ ঃ কার মুখে মানায়? তোমার মত ছেলের মুখে? যারা বিধবা কেন, ডিভোর্সি মেয়েকে পর্যন্ত বিয়ে করতে চায় না?

বিপ্লব ঃ আরে তোমার মত তো কোনও অজ পাড়াগাঁয়ের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে এনে নেক্সট প্রজন্মকে অস্বস্তিতে ফেলবো না। আমার স্কুলে পর্যন্ত সবাই জেনে ফেলেছিল যে, মা'কে ডাইনি বলে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্ধুরা আমাকে ডাইনির বাচ্চা বলে টিটকিরি দিত।

অনির্বাণ ঃ তা, তোমারও কি নিজের মা'কে ডাইনি মনে হয় নাকি?

বিপ্লব ঃ না, তা কেন মনে হবে। তবে মা বড্ড গেঁয়ো ছিল। এক বর্ণ ইংরেজি পড়তে পারতো না। বাংলাটা বোধহয় তোমার কাছে শিখেছিল।

অনির্বাণ ঃ শুধু বাংলা কেন, সংস্কৃতও শিখেছিল।

বিপ্লব ঃ আরে ধূর, সংস্কৃত শিখে হবেটা কী?

অনির্বাণ ঃ কেন, তোমার মা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিভিন্ন গল্প বাংলায় অনুবাদ করেছে। কবিতা লিখেছে। কবিতার বইও ছাপা হয়েছে। তুমি ইংরাজী শিখে কী উদ্ধার করেছো শুনি?

বিপ্লব ঃ জব বাবা জব। আমি যে লেভেলের জব করি, তাতে ভবিষ্যতে আমার ছেলেমেয়েকে অবৈতনিক স্কুলে পড়তে হবে না।

অনির্বাণ ঃ বাঃ! তোমার ভবিষ্যৎ পিতৃত্বের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। তবে অতদিন ওয়ার্ল্ড নামক চ্যাপ্টা গোলক পিণ্ডটায় মানুষ টিকে থাকলে হয়।

বিপ্লব ঃ সব টিকে থাকবে বাবা, ওই ক্লাইমেট চেঞ্জের এ্যাফেক্ট বা ভাইরাসের আক্রমণে মরবে তারা, যাদের হাতে টাকা নেই।

অনির্বাণ ঃ বলো কী? সারভাইভাল অফ্ দ্য ফিটেস্ট শুনেছিলাম। কিন্তু সারভাইভাল অফ দ্য রিচেস্ট থিওরি তো শুনিনি।

বিপ্লব ঃ তোমার আর থিওরি শুনে কাজ নেই। আজগুবি সব থিওরির পেছনে ছুটে নিজের, আমাদের সবার জীবনটা একেবারে ভেস্তে দিয়েছো। একেবারে ব্যর্থ হয়ে গিয়েও তুমি কিছুতেই স্বাকীর করো না যে তোমাদের বামপন্থা, বামপন্থী আন্দোলন একটা ডিসরাপ্টিভ মুভমেন্ট, আজকের দিনে অচল।

অনির্বাণ ঃ ডিসরাপ্টিভ! তোমার মতে প্রগ্রেসিভ কোনটা?

বিপ্লব ঃ গ্লোবালাইজেশন।

অনির্বাণ ঃ গ্লোবাইজেশন আমরাও চেয়েছিলাম, সেটা শিক্ষার, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের, বাজার-ফ্যাশনের আর পুঁজির নয়। মাল্টিন্যাশনাল চাকরি, আর গোটা বিশ্ব জুড়ে একই ব্র্যাণ্ডের পোশাক, ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করলেই গ্লোবাল সিটিজেন হওয়া যায় না। লাতিন আমেরিকার, আফ্রিকার, আমাদের এখানে দলিতদের উপর যে অবিচার, অত্যাচার হয়, সেটা বোঝো? (চশমা খুলে চোখ মোছেন) অনুভূতি ব্যাপারাটাই তোমার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

বিপ্লব ঃ সে তো তোমারও নেই বাবা। এই যে আমাকে চাকরিতে হঠাৎ নোটিশ ধরিয়ে দিল, সেই নিয়ে তুমি একবারও আমার সঙ্গে কথা বলেছো? একবারও জানতে চেয়েছো আমার ওপর দিয়ে কি যচ্ছে?

অনির্বাণ ঃ তোমার সেই কলিগকে ছাঁটাই করে দেওয়ায়, তার ওপর দিয়ে কী গিয়েছিল, তুমি জানতে চেয়েছিলে?

বিপ্লব ঃ সে তো তোমার কলিগ বাবা, আমি তো তোমার ছেলে।

অনির্বাণ ঃ আমার ছেলের চাকরি চলে গেলে আমি হা-হুতাশ করবো, আর অন্যের ছেলেমেয়ের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলেও আমি নিরুত্তাপ হয়ে বসে রইবো, সেইরকম স্বার্থবাদী চিন্তা আমার কাছে তোমার আশা করাই উচিত নয়।
(ফুলি হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ঘরে আসে)

ফুলি ঃ কি উচিৎ নয় মাস্টার কাকা? কার কী হয়েছে?

অনির্বাণ ঃ ও কিছু নয়, তুই টিফিন ক্যারিয়ার হাতে?

ফুলি ঃ মা বললো, বিকেলে রান্নার লোক ঘর বন্ধ দেখে চলে গেছে। বুঝলাম আজ রাতে বাপ-বেটার হরিমোটর। তাই পলুর ভাত, তোমার রুটি, চানা পনীর আর পাবদা মাছের ঝোল টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে নিয়ে এলাম। তোমাদের উপোসে তো রাখতে পারি না।

অনির্বাণ ঃ কী?

বিপ্লব ঃ ও বলছে যে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তাই আমাকে বিয়ে করবে না। (অনির্বাণ ও ফুলি পরস্পরের দিকে তাকায়) তোমার প্রতি শ্রদ্ধা আছে বাবা। কিন্তু তুমি সারা জীবনে যা কষ্ট পেয়েছ, সেটা না পেয়ে, আমি যদি আনন্দ করে বেঁচে থাকতে চাই—

অনির্বাণ ঃ আনন্দ, দাসত্ব করাটা তোমার কাছে আনন্দের ব্যাপার নাকি? আমি আমার জীবনে কারও দাসত্ব করিনি। জেলে বন্দী থেকেছি, তবু অন্যের ইচ্ছার পরাধীন হইনি। স্বাধীনভাবে বাঁচার চেয়ে জীবনে আনন্দের কিছুই হতে পারে না, একথা তুমি, ফুলি দুজনেই নিশ্চয় মানবে?

ফুলি ঃ স্বাধীনতা আসলে একটা পারসেপশন, তাই না মাস্টারকাকা? আসলে সবই বাহুল্য। তুমি তোমার যৌবনে যে আদর্শের পেছনে ছুটেছিলে সেটাও যেমন ছিল এক্সসেসিভ, তেমনই পলু যেভাবে টাকার পেছনে ছুটছে, সেটাও বাড়াবাড়ি। এই বাহুল্যটাকেই আমরা বোধহয় স্বাধীনতার মাপকাঠি ভেবে বসি।

অনির্বাণ ঃ চমৎকার বলেছিস কথাটা। সারভাইভালের জন্য আইডিওলজি বা টাকা কোনোটাই লাগে না।

ফুলি ঃ স্পিশিজের সারভাইভালের কথা বলছ? তার জন্য লাগে সংঘবদ্ধ বাঁচার ইচ্ছা। যেটা পলু বুঝতে চায় না।

অনির্বাণ ঃ এটাই তো সব চাইতে বড় আইডিওলজি, কেন যে এটা মানুষকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি।

ফুলি ঃ এসব কথা পরে ভেবো। এখন হাত ধুয়ে খেতে বসো।

অনির্বাণ ঃ তুই যে সেদিন বলছিলি, এদেশে সংঘবদ্ধ বামপন্থার ব্যর্থতার উত্তর খুঁজছিস? তা পেলি খুঁজে?

ফুলি ঃ পুরোটা যে পেয়ে গেছি, তা বলতে পারি না। তবে আমরা জীবন থেকে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকের কনসেপ্টটাই হারিয়ে ফেলেছি মাস্টারকাকা, তাই বোধহয় এই সার্বিক অবক্ষয়। (টিফিন ক্যারিয়ার খুলতে খুলতে) খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, আমি আবার কাল সকালে আসবো।

(ফুলি চলে যায়। বিপ্লব ও অনির্বাণ খেতে বসে)

।। দৃশ্যান্তর।।

।। পঞ্চম দৃশ্য।।

একটা চেয়ারে বসে আছে বিপ্লব।
তার সামনে এসে দাঁড়ায় এক জাঁদরেল লোক, দেখলেই বোঝা যায় তিনি খুব কর্তত্বব্যঞ্জক ব্যক্তি।

লোকটি ঃ নমস্কার বিপ্লববাবু!

বিপ্লব ঃ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন?

লোকটি ঃ আপনি সার্থকনামা হতে চাইছেন তাই।

বিপ্লব ঃ মানে?

লোকটি ঃ মানে খুব সোজা। আপনি একমাস অফিস কামাই করেছেন। কোম্পানীর প্রচুর লস হয়েছে, তাই আপনার ৪০ শতাংশ পে কাট হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আপনি এটাকে অস্বাভাবিক ভাবছেন, মনে মনে কোম্পানীর মুণ্ডুপাত করছেন।

বিপ্লব ঃ আপনি জানেন কোম্পানীর জন্য আমি কি পরিশ্রম করেছি, জান-প্রাণ লড়িয়ে দিয়েছি কোম্পানীর প্রফিটের জন্য।

লোকটি ঃ তার জন্য কোম্পানী আপনাকে ভালো ইনসেনটিভ দিয়েছে, রিওয়ার্ড দিয়েছে।

বিপ্লব ঃ দিয়েছে, কিন্তু আমার হেপাটাইটিস মানে জণ্ডিস হয়েছিল, তাই ডাক্তারের কথামত বাধ্য হয়ে ছুটি নিয়েছিলাম।

লোকটি ঃ ওখানেই তো কেস জণ্ডিস করে বসে আছেন। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী অতীত নিয়ে পড়ে থাকে না। মুনাফার পেছনে দৌড়ানো শুধু দৌড়ানো, সেখানে আপনি বাতিলের দলে চলে গছেন। পারফর্ম করতে পারলে আপনি আছে, তা নইলে নেই।

বিপ্লব ঃ নেই মানে?—

লোকটি ঃ নেই মানে, আপনার অস্তিত্ব নেই। দেখুন আপনার জন্য অনেক বড় একটা প্রজেক্ট হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে আমাদের। এদিকে কোম্পানীর লাভের হিসেব কমতির দিকে, বাজারে রিসেশন। অতএব—

বিপ্লব ঃ কর্মী ছাঁটাই হবেই—

লোকটি ঃ আপনি বুদ্ধিমান—

বিপ্লব ঃ এটা মামদোবাজী নাকি? দেশে শ্রম আইন নেই ভেবেছেন, এভাবে বরখাস্ত করা যায় না। আমরা যদি একজোট হই।

লোকটি ঃ তা যে পারবেন না, সেটা আপনি জানেন, তবু আপনার জিন, বিপজ্জনক জিন, জিন আপনাকে এসব ভাবাচ্ছে, তার উপরে আপনার উপরে আবার আপনার বান্ধবীর প্রভাব পড়েছে— তাই—

বিপ্লব ঃ তাই কী?

লোকটি ঃ আপনাকে আমরা একটা অপশন দিচ্ছি।

বিপ্লব ঃ কি অপশন?

লোকটি ঃ মন দিয়ে কান পেতে শুনুন— কিছু শুনতে পাচ্ছেন, কোনো আওয়াজ?

বিপ্লব ঃ (আওয়াজটা বাড়ে) হ্যাঁ, আওয়াজটা বাড়ছে— ওঃ অসহ্য লাগছে—

লোকটি ঃ খাঁচাটা কাছে নিয়ে এসেছে তাই।

বিপ্লব ঃ কিসের খাঁচা

লোকটি ঃ ওই খাঁচায় পাঁচ হাজার ইঁদুর ভরা আছে, ক্ষুধার্ত মানে তিন চার দিন ওদের খেতে দেওয়া হয়নি। এখন আপনার অপশন, হয় ওই খাঁচায় আপনি ঢুকবেন, নতুবা আপনার বাবা, নয়তো বান্ধবী।

(আলোতে দেখা যায়— অল্প দূরে আরো দুটো চেয়ারে অনির্বাণ আর ফুলি (করবী) বসে আছে)

বিপ্লব ঃ (চিৎকার করে ওঠে) মা— মা—

(আলো নিভে যায়, লোকটির উচ্চকিত হাসি শোনা যায়)

।। দৃশ্যান্তর ।।

।। ষষ্ঠ দৃশ্য।।

বিছানায় শুয়ে আছে বিপ্লব— ঘুমন্ত। তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলছে ফুলি।

ফুলি ঃ পলু, এই পলু, ওঠ, আর কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবি, ওঠ—

(বিপ্লব ধরমর করে উঠে বসে)

বিপ্লব ঃ ফুলি, একটা খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম—

ফুলি ঃ তাই, মা — মা — করে আমার আঁচল টানছিলি—

বিপ্লব ঃ সত্যি, বিশ্বাস কর, ভয়ানক স্বপ্ন, তোকে আর বাবাকে ইঁদুরের খাঁচার সামনে বসিয়ে রেখে, আমায় ভয় দেখাচ্ছে—

ফুলি ঃ বীরপুরুষ আমার, স্বপ্নে ভয় পেয়ে ম্যা-ম্যা— করছে, নে ওঠ, চা খেয়ে ঘুম তাড়া।

বিপ্লব ঃ কি ব্যাপার? আজ সকালে আমার জন্য হাতে চা নিয়ে দাঁড়িয়ে—

ফুলি ঃ মাস্টারকাকা, বাড়ীতে নেই, তাই তোর ভাগ্যে মাস্টার কাকার বরাদ্দ চা টা জুটে গেল। (চা দেয়)

বিপ্লব ঃ বাবা বাড়ী নেই?

ফুলি ঃ তাই তো দেখলাম, এত সকালে কোথায় গেল আবার—

বিপ্লব ঃ কোথায় যাচ্ছে? কার কাছে যাচ্ছে, কখন ফিরবে— কাউকে বলে যাওয়ার দরকার বোধ করে না।

ফুলি ঃ কাকে বলবে? তোকে? তুই তো ঘুমোচ্ছিলি—

বিপ্লব ঃ তোকে তো বলে যেতে পারতো— তুই রোজ সকালে চা নিয়ে আসিস।
ফুলি ঃ যে সময়ে বেরিয়েছেন, সেই সময়ে আমি চা নিয়ে আসিনি। আর সবসময় বলেই বা যেতে হবে কেন?
বিপ্লব ঃ হ্যাঁ, তুই তো এমনই বলবি।
ফুলি ঃ মানে?
বিপ্লব ঃ মানে? তুই যেমন বিয়েতে মত দেওয়ার আগে একবার আমাকে বলতেও পারিসনি।
ফুলি ঃ যেদিন আমি প্রদীপ্ত'র সঙ্গে দেখা করতে যাই সেদিন তোকে বলেছিলাম আমার সঙ্গে যেতে- কিন্তু তুই—
বিপ্লব ঃ অ্যাঁ! তুই যাবি তোর হবু বর-এর সঙ্গে দেখা করতে, সেখানে আমি ল্যাং ল্যাং করতে তোর পেছনে যাবো?
ফুলি ঃ আত্ম অভিমান?
বিপ্লব ঃ সে তুই যাই বল। ওটা শোভন হত না।
ফুলি ঃ হ্যাঁ, হয়ত অশোভন হত, কিন্তু তুই সঙ্গে থাকলে, আমি তোর হাত ধরে প্রদীপ্ত'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারতাম।
বিপ্লব ঃ একেবারে বঙ্কিমী হয়ে যেত।
ফুলি ঃ যাই হোক, সেই সুযোগটাই তো তুই দিলি না—
বিপ্লব ঃ এখন সুযোগ পেলে?
ফুলি ঃ দেখা যাবে— চলি—
বিপ্লব ঃ ফুলি— আমার সেদিনের কাপুরুষতাকে ক্ষমা করতে পারবি? ফুলি—
ফুলি ঃ (ফুলি ফিরে তাকায়) পারলে হয়তো ভালো হত, কিন্তু অন্ধকার সরোবরে ডুব দিয়ে পূর্বজন্মের কথা ভাবতে এখন আর সত্যি ভালো লাগে না রে পলু— (অনির্বাণ ঘরে আসেন)
অনির্বাণ ঃ "মধ্যদিনে শূণ্য হাতে ফিরে গেছ তুমি, একাকিনী
অনন্ত ফেরার পথে পেরিয়ে যাচ্ছি কত সাগর পাহাড়
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে কেবল তোমার কান্না শুনি,
কোথাও পাইনি খুঁজে ফেলে আসা ঠিকানা আমার।"(—প্রভাত মিশ্র)
বল দেখি কবিতাটা কার লেখা?
ফুলি ঃ কাকীমার—
অনির্বাণ ঃ তুই জানিস?
ফুলি ঃ তুমি কি জানো মাস্টারকাকা? কাকীমার কবিতার খাতাগুলো আমার কাছে আছে।
অনির্বাণ ঃ নিশ্চিন্তে আছে। এখানে থাকলে—
বিপ্লব ঃ ধূলোজমা-ঝূল-মাকড়সার জালে ভরা ওই কাঠের দেরাজে থাকতো—

অনির্বাণ ঃ হয়তো থাকতোই না। স্মৃতি বড় আত্মঘাতী।
বিপ্লব ঃ ভোর ভোর তুমি কোথায় গিয়েছিলে বাবা?
অনির্বাণ ঃ গিয়েছিলাম—
বিপ্লব ঃ কোথায়?
অনির্বাণ ঃ একটা জরুরী প্রয়োজন ছিল—
বিপ্লব ঃ সেই জরুরী প্রয়োজনটা কি? আমরা জানতে পারিনা?
অনির্বাণ ঃ জেনে কোনো লাভ নেই তো তোমার—
বিপ্লব ঃ বাবা—
অনির্বাণ ঃ লাভ-লোকশানের বাইরে কোনো কিছু কি তুমি জানতে চাও কখনো?
ফুলি ঃ মাস্টারকাকা, পলু বোধহয় নিজেকে একটু বদলাতে চাইছে।
অনির্বাণ ঃ ভালো—
ফুলি ঃ তুমি, কোথায় গিয়েছিলে মাস্টারকাকা?
অনির্বাণ ঃ আজ তোর কাকীমার জন্মদিন ফুলি।
ফুলি ঃ জানি তো—
অনির্বাণ ঃ এই দিনে স্টেশনের ওধারে, বড় ঝিলের পশ্চিমে অনাথ মেয়েদের ভগবতী আশ্রমের গিয়ে সারা সকলাটা কাটাতো তোর কাকীমা, তুই-পলু দুজনেই বোধহয় ভুলে গিয়েছিস। ওখানেই গিয়েছিলাম—
ফুলি ঃ হ্যাঁ মনে পড়েছে, কাকীমার সঙ্গে আমি গিয়েছি কয়েকবার, তুই ও তো অনেকবার গিয়েছিস পলু—
বিপ্লব ঃ এ মন কাঁপে প্রখর সন্তাপে
তুই যে এখন চক্রব্যূহে একা
মুক্তির পথ হয়নি শেখা তোরও
আমরা বাঁচি অভিমন্যুর দেশে
সে ব্যর্থতার দায় তো অর্জুনেরও।
পাণ্ডুলিপি আশার কথা বলে
নিদ্রিত কত মহাপুরুষের বাণী
আমরা তবু গান গাই আশাবরী
শঙ্কার মাঝে পা ফেলি সাবধানী।।
ফুলি ঃ এটা তো কাকীমার লেখা—
অনির্বাণ ঃ তোমার মনে আছে, মা'র লেখা কবিতা?
বিপ্লব ঃ বাবা, তুমি লোকজনের সামনে আমাকে যতটা খারাপ দেখাও, আমি কিন্তু ততটা খারাপ নই।
অনির্বাণ ঃ (হেসে ওঠেন) এটা একেবারে উৎপল দত্তের নাটকের ডায়লগ হয়ে গেল।
ফুলি ঃ যাক বাবা, অনেকদিন বাদে এ বাড়িতে আবার হাসির আওয়াজ উঠলো।

শোনো তোমরা বাপ-বেটা স্নান করে কাপড়জামা পাল্টে নাও। আমিও বাড়ী গিয়ে স্নান করে আসছি।

বিপ্লব ঃ মার ফটোটা—

ফুলি ঃ আমি মুছে রেখেছি। মালা আর পায়েস নিয়ে আসছি আমি এক্ষুণি- (যেতে চায়)

অনির্বাণ ঃ ফুলি, পলু আজ আমাদের বাড়ীতে একজন আসবে, থাকবে কিছুদিন—

বিপ্লব ঃ কে, আমাদের জানাশোনা কেউ?

ফুলি ঃ কে, মাস্টারকাকা?

অনির্বাণ ঃ তোমার মা'র জানাশোনা, এক প্রিয়জন—

বিপ্লব ঃ কখন আসবে?

অনির্বাণ ঃ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই—

ফুলি ঃ বেশ হবে, কাকীমার জন্মদিনটা বেশ জমে যাবে। তোমরা রেডী হয়ে নাও, আমি আসছি ঘুরে। (চলে যায়)

বিপ্লব ঃ কে আসবে বাবা?

অনির্বাণ ঃ এলেই দেখতে পাবে— যতদূর জানি সে তোমারও প্রিয়জন—

বিপ্লব ঃ আমার প্রিয়জনরা তো সবাই আমায় ছেড়ে যাচ্ছে বাবা—

অনির্বাণ ঃ ছেড়ে যাচ্ছে না, তুমি ছেড়ে দিচ্ছ?

বিপ্লব ঃ বাবা—

অনির্বাণ ঃ বাঁধনটাকে শক্ত করতে শেখো পলু- কবির কথাটা মনে নেই—

" আয় আরো হাতে হাত রেখে। আয়
আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।।

(বিপ্লব অনির্বাণকে জড়িয়ে ধরে। অনির্বাণ বিপ্লবের মাথায় হাত রাখেন)

।। দৃশ্যান্তর।।

।। সপ্তম দৃশ্য।।

বিপ্লবের মা'র ছবির সামনে একটা কাঁচের বাটীতে কিছু ফুল রাখছে ফুলি, সামনে বসে আছে অনির্বাণ, বিপ্লব, রমেশ, ফুলির মা, ভগবতী আশ্রমের সম্পাদক-মুখার্জীবাবু। অনির্বাণ ছবিতে মালা পড়িয়ে দেন।

অনির্বাণ ঃ আজ পলুর মা'র ৬৩তম জন্মদিন। জীবনের প্রথম লগ্ন থেকে চিরটাকাল দারিদ্রের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছে সে। কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি কখনও। ছেলেকে মানুষ করা, আমার মত লোকের সব কাজের পেছনে থাকা, এটা যেন ছিল তাঁর ব্রত। অনেক সময় তাঁর নিষ্ঠা, সততা আর নিঃস্বার্থ শ্রমদান দেখে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমি অবনত। আজ তাঁর জন্মদিনে তাঁকে আমার অনন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

(অনির্বাণ বসে পড়ে। ফুলি উঠে দাঁড়ায়। তার হাতে একটা খাতা)

ফুলি ঃ কাকীমা কবিতা লিখতেন, আমি কাকীমার লেখা একটা কবিতা পাঠ করে কাকীমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি—

"ঈশ্বর নিশ্চয় একজন মজদুর
তিনি যেন সর্বশ্রেষ্ঠ মিস্ত্রী একজন
গোধূলির আলোতে ঈশ্বরের চোখ লাল হয়ে ওঠে
যেন জ্বলন্ত চোখ লাল হয়ে ওঠে
যেন জ্বলন্ত উনুন
আর রাত্রি পর্যন্ত শতছিদ্র হয়ে যায় তাঁর—

(টুকাই আমিনা বিবিকে নিয়ে ঘরে ঢোকে । আমিনা একুট কুণ্ঠিত, ফুলি কবিতা পাঠ থামিয়ে দেয়)

অনির্বাণ ঃ এসো আমিনা—

বিপ্লব ঃ আম্মুমাসি-(সবাই তাকায়)

অনির্বাণ ঃ হ্যাঁ, তোমার আম্মু মাসিকে ভগবতী আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মুখার্জীবাবুরা। এই বয়সে ও আর কোথায় যাবে। তাই আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

(ভগবতী আশ্রমের সম্পাদক- মুখার্জীবাবু উঠে দাঁড়ান)

মুখার্জী ঃ দেখুন, আমাদের ওপর চাপ আছে বলেই আমরা আমিনাকে আশ্রম থেকে চলে যেতে বলেছি। অনুদানের টাকাটা বন্ধ হয়ে গেলে আশ্রম চালাবো কি করে?

অনির্বাণ ঃ আপনাকে দোষ দিচ্ছি না মুখার্জীবাবু। তবে ভাবুন, যে আশ্রমের জন্য ও সারাটা জীবন উৎসর্গ করলো, সেখান থেকে উৎখাত হরে , ও যাবে কোথায়?

বিপ্লব ঃ আম্মু মাসি আর মা একগ্রামে থাকত। মা'র ছোটবেলার খেলার সাথী।

অনির্বাণ ঃ আপনাদের আশ্রমে আমিনাকে কাজে নেবার জন্য সুপারিশ করেছিলো- অমৃতা। আশ্রম থেকে উৎখাত হলে, ওকে আমাদের বাড়ীতে ঠাঁই দেওয়াটা আমাদের দায় বৈকী।

মুখার্জী ঃ আমাকে ভুল বুঝবেন না মাস্টারমশাই। বাইরের চাপটা এতটা বাড়ছে—

বিপ্লব ঃ আসলে অনুদান, অনুশাসনের চাপে যদি আমাদের মনুষ্যত্ব বিকিয়ে যায় তবে তো আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শিখতে হবে, মুখার্জীবাবু? (অনির্বাণ – ফুলি সবাই বিপ্লবের দিকে তাকায়। বিপ্লব এগিয়ে গিয়ে আমিনা বিবির সামনে দাঁড়ায়। আমিনার হাত ধরে। আমিনার চোখে জল)

বিপ্লব ঃ এসো আম্মু মাসি। ফুলি, আজকের অনুষ্ঠান শেষে আম্মু মাসিই পায়েস দেবে। (মুখার্জীবাবু চলে যেতে চান) মা'র জন্মদিনের পায়েস, না খেয়ে যাবেন না মুখার্জীবাবু।

অনির্বাণ ঃ আমার একটা অনুরোধ রাখবে আমিনা। দিদির কাছে শেখা গানটা একবার গাইবে— (আমিনা তাকায়) দিরি ছবির দিকেই তাকিয়ে গাও না হয় —
(আমিনা প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়, তারপর অমৃতার ছবিটার দিকে তাকায়। চোখের জল মোছে, তারপর গেয়ে ওঠে—)
সংগচ্ছ সংবদ্ধ সংবো মনাংসি জানতাম্
(ফুলি আমিনার সঙ্গে গলা মেলায়)
সমানো মন্তঃ; সমিতি সমানী, সমানাং মন সহচিত্ত মেতাম—

(আস্তে আস্তে সবাই উঠে দাঁড়ায়। অমৃতার ছবির দিকে তাকিয়ে করজোড়ে নমস্কার করে)

।। সমাপ্ত।।

[নাটকটির অভিনয়সত্ত্ব সংরক্ষিত]
কৃতজ্ঞতা ঃ অমৃতা ভট্টাচার্য, বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়

লেখক ঃ **কুন্তল মুখোপাধ্যায়,** পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।

তিতাস একটি নদীর নাম

(দ্বিতীয় ভাগ)

প্রবীর গুহ

সূত্র ঃ তিতাস একটি নদীর নাম। তাঁর নানা ঋতুতে নানা রঙ, নানা রূপ। এখন বর্ষাকাল। নদীর দুই তীরে সুবজ পল্লী। মাঝখানে সাদা জল। বর্ষাকাল আগাইয়া চলে।

সূত্র ঃ আকাশ ভাঙ্গিয়া বর্ষণ হয়। সে বর্ষণ আর থামে না। তিতাসের জল বাড়িতে শুরু করে। নিরবধি কেবলই বাড়িয়া চলে।

সূত্র ঃ নদীর ঘোলাজল ঢেউ তোলে। সে ঢেউ জেলেদের নৌকাগুলিকে বড় দোলায়।

সূত্র ঃ তার চাইতে বেশী দোলায় আলুর নৌকাগুলিকে।

সূত্র ঃ আলুর কথা ইখানে কেন?

সূত্র ঃ হুন কথা ! তিতাসের পারে কি শুধুই মালোদের বাস! যারা চাষের কাজ করে হেরাও ত থাকে।

সূত্র ঃ এই যে কাদির মিয়াঁ। বংশ পরম্পরায় বিরামপুরের বাসিন্দা। এবারে সাগরকন্দ আলু ফলাইছে মাঠ জুইরা। নৌকা বোঝাই করিয়া সেই আলু লইয়া বাজারে যাইতেছে। আলু না কুমড়া! এক একখানা যা সাইজ না ! আধসের থিকা এক সের এক একটার ওজন।

সূত্র ঃ এইবার সেই আলু নিয়াই বিপত্তি। তিতাসের ঢেউয়ে বোঝাই আলুর নৌকা এই ডোবে কি সেই ডোবে।

সূত্র ঃ কাদির মিয়াঁ হতবুদ্ধি হইয়া যায়। আকাশের দিকে তাকায়। মাথায় কোন বুদ্ধি যোগায় না। অসহায়ের মত জানিতে চায় আসমানের কাছে।

কাদির ঃ হে আল্লা, এ কি গজব আল্লা আমার কপালে! এত আলুর বস্তা বেবাক বুঝি যায় রসাতলে।

ছাদির ঃ ছেলে বলে, বা-জান তুমি সাঁতার দিয়া পারে যাও। আমার যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যখন দেখুম নাও ডুবতাছে, দিমু সব আলু ঢাইল্যা তিতাসের পানিতে। তারপর ডুবা নাও পারে লাগাইয়া তুমারে ডাক দিমু।

সূত্র ঃ এমন সময় দূরে দেখা গেল এক জেলে নৌকা। চিৎকার, কান্নার আওয়াজ শুনিয়া তারাও চেঁচাইয়া উঠিল। নৌকায় ছিল মাত্র দুই জন। ধনঞ্জয় আর বনমালী।

ধনঞ্জয় ঃ অ বনমালী ঐ দেখ একটা আলুর নৌকা ডুবতাছে। তাড়াতাড়ি আগাইয়া চল।

সূত্র ঃ অমনি চটপট দুইখানা দাঁড় উঠিয়া গেল দুই যুবকের হাতে। সাপের ফলার মত নৌকা খান বাঁদিকে চির খাইয়া কাদিরের নৌকা বরাবর আসিয়া রুদ্ধগতি হইল।

বনমালী ঃ সাব্বাস ধনা, কি বুদ্ধিরে তর! বাঁচিয়া গেল এবার আলুর জান। আরেকটু দেরী হইলেই সব্বনাশ হইয়া যাইত। নে,হাত লাগা সবাই।

সূত্রধার ঃ দেখিতে দেখিতে জেলে নৌকার প্রশস্ত ডরা আলুতে ভরিয়া গেল। আর আলুর নৌকা খালি হইয়া ভাসিয়া উঠিল। কাদির মিয়াঁ বনমালিকে জড়াইয়া ধরে।

কাদির ঃ বাঁচাইয়া দিলা বাপ তুমরা দুই ভাই। আপন ভাই বুঝি!

ধনঞ্জয় ঃ লাউতলায় বিয়াইছে গাই, সেই সম্পর্কে মামাত ভাই।

কাদির ঃ ভাই ত ভাই। তা সে যেমুনই হোক। চিরকাল থাইকো এক ঠাঁই। মালোর পুত, বড় বাঁচানটাই আজ বাঁচাইলা বাপ।

বনমালী ঃ কও কি মিয়াঁ, একটা মানুষ ডুবতি দেখলি আরেকটা মানুষ তারে বাঁচাইবে না! অহন আস, পোলার হাতে নাও দিয়া আমাদের নাওয়ে আইসা বস একটু। জিরাইয়া নাও।

সূত্রধর ঃ কাদির মিয়াঁ তাহাদের নৌকায় আসিলে বনমালী লজ্জা পাইয়া কয়-

বনমালী ঃ ডাইক্যা ত আনলাম নাওয়ে, কিন্তু ছইয়ের তলায় খাওনের আর কিছু পড়িয়া নাই। ভাত, ব্যান্নন সব খাওয়া শ্যাস। কিছু খাওয়াইতে পারলাম না মিয়াঁ।

গান

এলাহি দরিমায়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা,
শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুকনায় ডুবল ভেলা।
জলের আসন, জলের বসন, দেখি নয়ন মেলি,
ভরা গাঙে নাও বাঁচাইল এ কোন বনমালী।

সূত্র ঃ কাদির বনমালীর মুখের পানে চাহিল। তাঁর গা থিকা টপটপ বৃষ্টির জল গড়াইতেছে। মাথার গামছা খুইলা কাদির মিয়াঁ বনমালীর গা মোছাইতে লাগিল।

কাদির ঃ তুমি কি 'বা-জান' আমারে চেনছ?

বন ঃ সি বার গোকনঘাট বাজারে মহরমের আয়োজন হইছিল। তখন দেখছিলাম। আমি ত তখন ছুড। তুমার লাঠির সামনে কেউ দাঁড়াইতেই পারল না। কত্ত রকম কায়দায় লাঠির প্যাঁচ দিলা। তারপর খেলা শেষ হইলে তুমি কানতে বসলা। আমি শুধাইছিলাম, 'চাচা কান্দ কেনে?'

কাদির ঃ আজ বড় দুঃখের দিন বাপ। বড়ই মন কষ্টের দিন। হাসান হুসেন রে আজই বড় কষ্ট দিয়া মাইরা ফেলাইছিল বাপ।

সত্র ঃ তারপর কাদির বালক বনমালীকে কারবালার গল্প, হাসান-হুসেনের গল্প, এজিদের নির্মমতার গল্প শুনাইছিল। বলিতে বলিতে কাদির মিয়াঁ নিজেও কাঁদিতেছিল আর বালক বনমালীকেও কাঁদাইতেছিল। কারবালার মর্ম বিদারক কাহিনী ছাড়াও পীর পয়গম্বরের কাহিনীও শুনাইছিল।

সূত্র ঃ সে সব কথা মনে পড়িতেই বনমালীর মনে হইতে লাগিল, এই কাদির মিয়াঁ, রামপ্রসাদ খুড়া, তাঁর নিজের বাপ হগলেই যেন একইরকম দেখতে। পেরানে

যেন একই রকম এস্নেহ , মায়া, আদর।

কাদির ঃ তুমার বাপ কি করেন?

বন ঃ সে ত আর নেই। দুই বছর আগে একদিন রাতের মাছ ধরা শেষে ভিজা জাল কাঁধে করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। হঠাৎ পথের মাঝে শুরু হইল তুফান। আশেপাশে কুনো বাড়ি ঘরদোর নাই। ছুটিয়া একটা গাছ তলায় আশ্রয় নিছিল। এমুনি কপাল, সে বিরিক্ষ নিজেই নিরাশ্রয় হইয়া,উৎপাটিত হইয়া আমার বাপেরে চাপা দিয়া মারিল।

গান

এতকাল পালল পাখী দুগ্ধ কলা দিয়া,
যাইবার কালে, পলাইল, কিছু না বলিয়া।
আগে যদি জানতাম রে পাখী যাবি রে ছাড়িয়া,
পাখীর চরণ বাইন্ধা রাখতাম কলহ করিয়া।

সূত্র ঃ কাদিরের পিপাসা পাইয়াছিল। আঁজলা ভরিয়া নদীর জল মুখে দিতে গিয়ে দেখে সে জল কাদাগোলা। থু-থু করিয়া ফেলিয়া দেয় সে। বনমালী কহিল—

বন ঃ থুইয়া দাও, খাইতে পারবা না । খালের বৃষ্টির জল নদীরে খাইছে। মালো পাড়ায় আমার কুটুম আছে। আলু তোলা শেষ হলে নিয়া যামু আজ তুমারে।

কাদির ঃ কুটুম! কিয়ের কুটুম! শাদী সম্বন্ধ করছ না কি?

বন ঃ না, না। ভইনের বিয়া দিছি এই গেরামে। চল, হাটের শ্যাসে নিয়া যামু ভইনের বাড়ি।

কাদির ঃ ই বার লয় বাপ। আরেকবার যাব।

সূত্র ঃ এ সব কথা অনন্ত শুনেছে অনেক পরে। তবে বনমালীর সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল সেদিনের হাটে।

সূত্র ঃ বনমালীর সাহায্য পাইয়া কাদিরের সব আলু এক দণ্ডের মধ্যে হাটে গিয়া উঠিল।

কাদির ঃ আরে সাবধানে ফেলা। নইলে আলু আর বেশীদিন ভালা থাকব না। ক বস্তা হইল রে মোট? এগার না!

সূত্র ঃ চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়ে সেই জন্যে কাদিরের ছেলে ছাদির জলো - ঘাসের ন্যাড়া বানাইয়া আলুর গাদার চারপাশে গোল করিয়া বাঁধ দিল। ছোট ছোট ভিড় লাগে আলুর গাদা ঘিরিয়া। ঘাসের বাঁধ টপকাইয়া দুচারটা ছোট ছোট আলু এপাশে ওপাশে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। সেগুলি মালিকের অধিকারের বাইরে মনে করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধরিতেছিল কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে। সব দুঃখী মানুষের পোলাপান। পয়সা দিয়া ত কিনিতে পারে না।

সূত্র ঃ কিন্তু ধমক দেয় ব্যাপারীরা। চড়চাপড় মারে, সব আলু কাড়িয়া নেয়।

ব্যাপারীঃ হেই পুঙ্গির পুত আবার আলু কুড়াস! এক্কেরে গলা টিইপ্যা মাইরা ফ্যালাম। ফেরত দে সব আলু।

ছেলে ঃ এই সব আলু তুমরার না । অন্য জায়গায় কুড়াইছি।

সূত্র ঃ শুধু তাদের থেকে নেওয়া আলু নয়, অপর জায়গা থেকে সংগ্রহ করা আলু ও কাড়িয়া লয় ব্যাপারীরা। কাদির কিন্তু ইহাদের ধমক দেয় না, কিছু বলেও না।

কাদির ঃ কত্ত আলু আছে, নিক না দু চারিটা পোলাপানেরা।

সূত্র ঃ সে ইচ্ছা করিয়া আরও দশ বিশটা আলু গড়াইয়া দেয় বেষ্টনীর বাইরে। পুত্র ছাদিরের কিন্তু দৃষ্টি এড়ায় না। ছাদির বলে-

ছাদির ঃ বা-জান কি কর! না করলাম বোয়ানি না করলাম সাইত। অখনই দিবার শুরু করলা? ঘরের ইন্দুরেই দেহি বাঁধ কাটে।

কাদির ঃ আজ এইসব এতিম ছাওয়াল মাইয়ার হাতেই পোত্থম সাইত। খাইয়া দোয়া করব। আল্লা বড় বাঁচান বাচাইছে আজ।

সূত্র ঃ বনমালী কাদিরের দিকে ফ্যালফ্যালাইয়া তাকায়।

কাদির ঃ কেউর মা নাই, বাপ নাই, লাথি ঝাঁ্যাটা খায়। কেউর মা আছে, দানা দিতে পারেনা। কেউর বাপ আছে, মা নাই। লোকে কয়, মা মরলে বাপ তালই, ভাই বনের পশু।

সূত্র ঃ ঐ দলে অনন্তও ছিল। সে কিন্তু এদের মধ্যে থাকিলেও, তার আভরণ, ব্যবহার এক্কেবারে অন্যরকম।

বনমালী ঃ একজনের যে গুরুদশা, চোখের সামনেই দেখতেয়াছি। বাপ না মা?

অনন্ত ঃ বাপের কথা জানিনা, মরছে আমার মায়।

সূত্র ঃ এই পথ্থম দেখা হইল বনমালীর সাথে অনন্তর। লম্বা, কৃশ হাড় জিরজিরা এক শিশু। সবাই যখন আলু কুড়াইতে ব্যস্ত, সে বালক তখন নীরবে দণ্ডায়মান। তার কোঁচড়ে কোন কাপড় নাই যে আলু তুলিয়া রাখিবে।

গান

ষষ্ঠি বুড়ী ষষ্ঠি বুড়ী কি কর বসিয়া,
তোমার ছাওয়াল কান্না কাঁদে দেখনা আসিয়া।
কান্দুক ছেলে রাখুক লোক ষষ্ঠির আজ্ঞায় নেইকো শোক,
নদী দিবে বাতাসে ভাসাইয়া।

সূত্র ঃ কাদির দুই মুঠা আলু তুলিয়া তার চোখের দিকে চাহিয়া বলিল-

কাদির ঃ আরে নে নে। আগাইয়া ধর, না আইলে হেরা নিয়া যাইব।

সূত্র ঃ ছেলেটা ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল মাত্র। কিন্তু, আলু নিবার কোন আগ্রহই দেখাইল না। কাদির মিয়া, বনমালীর কাছে এ বালকের চরিত্র সম্পূর্ণ অচেনা। বনমালী কাছে আসিয়া ছেলেটাকে দেখিতে থাকিল।

বনমালী ঃ এক কালে ত গায়ের রঙ ফর্সাই ছিল মনে হয়। মুখ চিন্যা বুঝি মুগের ডাল। গলায় আবার ধড়া পরা। এই কে মরছে রে তর?

অনন্ত ঃ কইলাম ত মায়।

বন ঃ তর নাম কি?

অনন্ত ঃ অনন্ত।

বন ঃ অনন্ত কি? যুগি, না পাটনি, না সাউ, না পোদ্দার?

সূত্র ঃ অনন্ত মাথা নাড়ে কারণ এ প্রশ্নের উত্তর জানা নাই তার।

বন ঃ কোন হাটি বাড়ি তোর?

সূত্র ঃ সে আঙুল দিয়া মালো পাড়া দেখায়।

বন ঃ ও জাতে তুই মালো। মানে আমার স্বজাতি।

সূত্র ঃ বালক বনমালীর স্নেহভরা চোখ চিনিতে পারে। এমন চোখ ছিল তার মায়ের। আর অখন বাসন্তী মাসীর।

বন ঃ তর বাড়িত লইয়া যাইবি আমারে?

সূত্র ঃ বালক ঘাড় হেলাইয়া সম্মতি দেয়। বনমালীর সাদাসিধা মন আনন্দে ভরপুর। অনন্তর হাতে টান দিয়া কয় -

বন ঃ চল অনন্ত, তরে বাজার ডা ঘুরাইয়া দেহাই। 'বা-জান' আজকের মত চল্লাম। কবে আবার দেখা হবে জানা নাই। ভইনের বাড়ি আইলে নিশ্চয় দেখা করার চেষ্টা করুম।

সূত্র ঃ ব্যাস। অনন্তরে লইয়া বনমালী হাটের অন্দরে পরবেশ করে। তারপর হাত হইতে পান, কাটা সুপারি, বুকে ফুল কাটা গেঞ্জি কিনিল। নাপিতের উঁচু ভিটায় বসিয়া চুল কাটাইল। নদীতে এক ডুব দিয়া নিজেদের নৌকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণে ধনঞ্জয় ও তার কেনাকাটা সেরে ফেলেছে।

বন ঃ কি এত কিনলি রে ধনা? বস্তা ত ভরে ফেলেছিস! চুঙটি বান্দির পুতের নাম সুলতান খাঁ।

ধনঞ্জয় ঃ এক ছাল গাব আর দুইডা বাঁশ কিনছি আগে। নৌকার ডরায় রাখা আছে। আর অহন এই হলুদ, লঙ্কা, লবণ, জিরা, মরিচ....... । অহন চল, এবার ফেরার লাগে।

বন ঃ ঠিক রে, বেলা গেল।, । আইজ আর ভইনের বাড়ি যামু না। হেই পুলা, তুই আমার নাওয়ে যাইবি? আমি খালে বিলে জাল লইয়া ঘুরি, মাছ ধরি, বেচি। নাওয়ে রান্ধি নাওয়ে খাই, সাতদিনে একদিন বাড়িত যাই। যাইবি তুই আমার নাওয়ে!

সূত্র ঃ অনন্ত ঘাড় কাত করিয়া জানাইল, হ্যাঁ যাইবে। তারপর নৌকায় উঠিবার জন্যে জলে নামিল। এবার কি ভাবিয়া বনমালী কহিল—

বন ঃ আরে না না। এখুনি তরে নেমুনা। তর বাড়ির মানুষেরে না জিগাইয়া নিলে, তারা মারামারি করিতে পারে।

অনন্ত ঃ না না । কেহ মারামারি করিবে না। আমারে নিয়া চল।

বন ঃ না, তুই অহন বাড়ি যা। তদের পাড়া আমি চিনি। ভইনের বিয়া দিছি তদের পাড়াতে। কোন ভাবনা করিস না, আমি আবার আসিব।

****

সূত্র ঃ মা যখন বাঁচিয়া ছিল, তখন অনন্তর মনে অনেক সাহস ছিল। মা মরিয়া গিয়া

লোকের কাছে যেন তার মাথা হেঁট করিয়া দিয়া গিয়াছে।

নদী ঃ অনন্ত! কি ভাব একলা এই ভাঙা নৌকায় বসিয়া!

অনন্ত ঃ এ ত আমার মায়ের গলা। কেডা কথা কও আমার লগে! এমন মিষ্টি করিয়া বাসন্তী মাসী এখনও কথা কয়।

নদী ঃ আমি তিতাস। এই যে তমার সামনে বহিয়া চলিয়াছি। আমি ত সবারই মা গো বাছা। শুনিয়া ভালো লাগিল, বাসন্তী তমারে পুত্র স্নেহে ভালোবাসে।

অনন্ত ঃ বাসিত, ভালোবাসিত। কিন্তু, অহন আর তার কিছু করিবার নাই। তার বুড়ী মায়ের জ্বালায় আমারে মাইরা খেদাইয়া দিয়াছে। সেইদিন থিকা এই নৌকার বুকে পাটাতনের ওপর পইড়া আছি।

****

সূত্র ঃ সুবলার বউ এর মনেও তিতাসের ঢেউ। সে নদীর উদ্দেশ্যে কয় .....

বাসন্তী ঃ বাঁচাইয়া রাইখ মা এই মা-হারা ছাওয়ালডারে। যেখানেই থাক, মরিবে না এটা ঠিক। কেউ যদি তারে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে করিয়া নিয়া মানুষ করিত। যে কেউ, যার প্রাণে দয়া আছে! যার মা নাই, দুনিয়ার সব মানুষ তার কাছে সমান।

****

সূত্র ঃ চারদিন পরে তিতাস পাড়ের শিমুল তলে এক নারীর মজলিশ বসিয়াছে। গেরামের মাইয়াদের ব্যাপার ত বুঝেন! এক নেড়ি জুটলে সাত নেড়ির সাথে দেখা হয়। সুবলার বউ ও তাদের মাঝে বসিয়া অনন্তর কথাই ভাবিতেছিল।

নারী ১ঃ অ দিদি, অনন্তর কুনো খুঁজ পাইলা? বুড়ীর হাতের মার খাইয়া কুথায় যে চলিয়া গেল!

নারী ২ঃ তবে বাসন্তী কিন্তু তাকে মায়ের থিকাও বেশী আদর দিত। সব বিপদে বুক দিয়া আগলাইয়া রাখিত। কার ছাওয়াল কে যে সামলাইত! পরের বাড়ি শাদী নাচে হারামজাদী।

(বাসন্তীর মনে পড়ে পুরাণ কথা)

বুড়ী ঃ এই যে, মাসীর কোলে ঢুইকা রইছ! তরে যে কলাম হাটের থিয়া পান কুড়াইয়া আনতে। কই সে পান?

অনন্ত ঃ পান চাইলে উয়ারা মারে, গায়ে গরম জল ছিডাইয়া দেয়।

বুড়ী ঃ তা জলে নাবিয়া দুইডা মাছ মারিয়াও ত আনতে পারতিস!

বাসন্তী ঃ আনছে ত মা! ঐ দেখ। গামছার ঘের বানাইয়া মকা আর ইচা মাছ ধরিয়া আনছে।

(বুড়ী গামছাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়)

বুড়ী ঃ আনবার কইছিলাম লাঙ্গল নিয়া আইছে গাই। কইলাম পান আনতে, হেইডা না আইন্যা মকা মাছ! ভাবখানা এমুন যেন মস্ত বোয়াল মাছ ধরছে। মরেও না।

বাসন্তী ঃ ইচা মরবে কোন দুঃখে! তাঁর আগে আমি মরি, — আমি ঘরের বার হই।

বুড়ী ঃ যাঃ, অখন আর কিছু কইলাম নি। একদিন জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ মুখে ঢোকাইয়া

পোড়াইয়া মারুম তরে। (পুরানো কথা শেষ হয়।)

নারী ১ ঃ আরেকদিন বাসন্তীর বাপ সন্ধ্যাবেলা জাল গাছটা কাঁধে নিয়া বুড়া হুকুম করিল-

বাপ ঃ হেই অনন্ত, হুক্কা চোংগা হাতে নে, আজ রাইতে তরে লইয়া জালে যামু।

নারী ২ ঃ মাসী দৌড়াইয়া আসিয়া বাধা দিল। বাসন্তী জানে, বাপ তার অত্যন্ত রাগী মানুষ। রাগ হইয়া যখন মারিতে আরম্ভ করিবে, একা নৌকোয় অনন্তরে কে তখন বাঁচাইবে! বাসন্তী তাড়াতাড়ি কয়--

বাসন্তী ঃ হাতের আগুন নিবতে না নিবতে তুমি তারে জলে নিও না বাবা। ছুড মানুষ। জলে পইড়া মরে, না সাপে খাইয়া মরে, কে কইব! অখন তারে নিও না। আরেকটু বড় হইলে নিও। আর আজ সারাদিন প্যাডে কিছু পড়েও নাই।

বাপ ঃ আচ্ছা, আজ থাকুক তবে। তৈরি থাকিস, নৌকায় তরে নিমুই। আইজ না হয় কাইল।

সূত্র ঃ বর্ষায় হু হু করিয়া বাতাস আসে। তারপর আসে ঝড়। রাইত যত বাড়ে, ঝড় ও বাড়ে পাল্লা দিয়া। অনন্তরে কোলের মধ্যে জাপটাইয়া ধরিয়া বাসন্তী ঘুমানোর চেষ্টা করে।

নারীর ঃ শিলে পাটায় ঘষাঘষি মরিচের জীবন শেষ।
কোরাস

বাসন্তী ঃ ঝড়ে আমার ডর লাগে না। ডরাই বুড়া বাপেরে। কোন ঝড়ের রাতে অনন্তরে টানিয়া লইয়া নৌকায় তুলিবে! আমি একটা মাইয়া মানুষ। বুড়া আমার কথা কানেও তুলবে না। অনন্তরে টানিতে টানিতে লইয়া যাইবে। একটা নিঃসহায় নারীর শেষ গচ্ছিত ধন অকালে নষ্ট হইয়া যাইবে। (বাবা যেন অনন্তকে টান দিয়ে ছিনিয়ে নিচ্ছে) না বাপ, না। ঝড়ে কোন গাঙের বাঁকে তোমার নাও উল্টাইয়া যাইবে, তখন তুমি ত মরিবাই, আমারেও সঙ্গে মারিবা।

নারী ২ ঃ তবুও বাসন্তী অনন্তরে তাড়াইয়া দিল। বাড়ির থিকা বাহির করিয়া দিল এক বুক অভিমানে। ছেলেটার জন্যে তার বুড়ি মা সদাই মৃত্যু কামনা করে, বুড়া বাপ তারে নৌকায় নিয়া জলে ডুবাইয়া মারিতে চায়! তাঁর নিজেরও এমুন সঙ্গতি নাই যে ছেলেডারে খাওইয়া পরাইয়া মানুষ করিবে। রাগে, অভিমানে নিজের বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে অনন্তরে মারিতে মারিতে কাঁদিয়া ফেলিল।

বাসন্তী ঃ শত্তুর, তুই বাহির হ। এই ঘরে ভাত খাস ত সাত গুষ্টির মাথা খাস। তুই অখনই যমের মুখে যা। তোর মা গেছে যেই পথে, তুইও সেই পথে যা।

সূত্র ঃ অনন্ত চলিয়া গিয়াছিল। সে গ্রামে আর ফিরিয়া আসে নাই। কিন্তু বাসন্তীর জল ঝরা চোখ, তারে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। যেখানে অনন্তর দেখা পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে, সেইখানেই ছুটিয়া গেছে। তবু, অনন্ত নিরুদ্দেশই রহিল।

সূত্র ঃ অনন্ত আসলে সবার কাছ থিকা নিজেরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। খালের

মুখে ঝোপের ধারে ছিল এক ভাঙ্গা নৌকা। ডরার মধ্যে ঢুকিয়া থাকিলে কেউ খুঁজিয়া পাবে না। আবার এইখানে থাকিয়া পশ্চিম দিকের খেয়ালও রাখা যায়। বনমালী ত এই পথেই ফিরিবে।

সূত্র ঃ ক্ষুধা পাইলে হাটের মধ্যে যায়। কেউ দয়া করিয়া ছোলা ভাজা, মুড়ি কিম্বা বাতাসা— কিছু না কিছু দিলেই, তার ক্ষুধার নিবৃত্তি। আবার চলিয়া যায় নৌকার খোলে। ডরার ভিতর শুইয়া থাকে বনমালীর অপেক্ষায়।

সূত্র ঃ অনন্ত কখনও নদীর সাথে এমন আত্মীয়তা পাতায় নি। এখন তার যেন মনে হয়- এই জল তার খুব কাছের মানুষের মত।

অনন্ত ঃ এই যে আমার কাদা জল, কও ত তুমি আমার কেডা! মা নাকি মাসি? এরা ছাড়া ত কেউ আমারে ভালোবাসেনা গেরামে।

সূত্র ঃ এমনি প্রকার জল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতেই জলের সত্য, মাছের সত্য অনন্তর কাছে নিত্য নূতন রূপে প্রকাশ পাইতে থাকিল। কুয়ার ব্যাঙ সাগরের গন্ধ পাইল।

অনন্ত ঃ দেখ দেখ, ছুড মাছের অগাধ জলে কেমন বিষম ভয়। তারা ঘাটের একদিক দিয়া দল বাঁধিয়া চলে। যে কেউ আঁচল বা গামছা পাতিয়া ধরিবার পারে তাদের। আহা রে পলাইতেও শিখে নাই। শুধু আঁচল গামছার মাঝে পড়িয়া খলখলায়। তাদের ঘর কুথায়? আদৌ আছে, নাকি আমারই মতন! যা ঃ আবার নদীর জলে সাঁতরাইয়া ঘর খুঁজিয়া মর। ওমা, খইলসা বালিকাদের শাড়ীর রং দ্যাখ! এক্কেবারে পেরজাপতির পাখনা। চাঁদার ছাওয়ালদের দেখ-যেন এক একটা চাঁদির টাকা। তবে, তোদের গায়ে বড় বিজল। ধরিলে হাতে আডাঅ্যাডা লাগে। উরে! আপনেরা কারা! শুঁড় উচাইয়া লাফাইতে লাফাইতে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন! ও! ইচা মাছের শিশুপালগণ। যতক্ষণ না কেউ ধরিয়া ফেলায় চলিতে থাকেন।

গান

মাছেতে চিনে কালাপানি, পক্ষীতে চিনে ডাল।
তিতাস জানে মাছের কাঁদন, মালো চেনে জাল।

সূত্র ঃ ধরিয়া ফেলিল। একদিন বনমালী গোকন্ন ঘাটে আসিয়া অনন্তরে খুঁজিতে খুঁজিতে ধরিয়া ফেলিল।

বন ঃ এই যে অনন্ত বাবু! তুমারে খুঁজিয়া আমি ত সারা নদীর পাড় চষিয়া ফেলিলাম। হাটের লকজনও কইতে পারেনা। শ্যাসকালে মুড়ি-বাতাসার দুকানে তুমার হদিশ পাইলাম।

অনন্ত ঃ আমিও তো তুমারে দেখার জন্যেই নৌকার খলে বসিয়া পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। আজ বোধহয় ঘুমাইয়া পড়ছিলাম।

বন ঃ হইছে । অহন চল।

অনন্ত ঃ কুথায় যাব? কেন যাব? আমি এ গেরামে থাকিবার চাইনা। তুমার সাথে তিতাসের বুকে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাই।

বন ঃ বেশ, তাই হইব। অহন চল, ভইনের বাড়ি যাই। কদিন থাইক্যা রওনা দিমু আমার গাঁয়ে।

****

(একদল রমণী ঘাটের পাড়ে শিমুলতলায় বসিয়া গল্প করিতেছে)

১ ঃ ওই ত শুনছি লইয়া যাইবে। দেখলি তো আমার কথাই সত্যি হইল।

২ ঃ কে কারে লইয়া যায় দিদি?

৩ ঃ লবচন্দ্রের বউ উদয়তারা। তাঁর দাদা বনমালী তারে বাপের বাড়ির জন্য লইতে আসিয়াছে। আমাদের দুইয়ো জনার বাপের বাড়ি একই গেরামে। পাশাপাশি ঘর।

১ ঃ আমি দেখছি, কাল রাতে লবচন্দ্রের বউ উদয়তারা অনন্তরে ভাত খাওয়াইয়া হাত ধোয়াতে আছিল।

২ ঃ এতদিন পাললি, লাললি, খাওয়াইল, ধয়াইলি- আর আজ পরে লইয়া যায়। এঙ্গ উঁচায়, বেঙ্গ উঁচায়, খলিসা পুডি কয় আমিও উঁচাই।

বাসন্তী ঃ আপদ গেছে ভালা হইছে। কার দায় কে সামলাইবে গো দিদি? আমার পেটের ও না পিঠেরও না। আমার কেনে এত ঝকমারি? মা খালি ঘরে পইড়া মরছে। কেউ নেয় না দেইখা আমি গিয়া আনছিলাম। অখন ছেরাদ্দ শান্তি চুইক্যা গেছে, যিখানে খুশি গিয়া মরুক। আমার দায় ফইরাদ নাই।

গান

তেল নাই, সলিতা নাই, কিসে জ্বলে বাতি,
কে বা বানাইল ঘর, কে বা ঘরের পতি।
উঠান মাটি ঠনর ঠন, পিঁড়া নিল স্রোতে,
তিতাস মইল জল পিপাসায়, ব্রহ্মা মইলো শীতে।

অনন্তের মা চলিয়া যাইবার পর বাসন্তী বড় একলা হইয়া যায়। কাজের ফাঁকে আনমনা হইয়া যায়। অন্য গায়ের পুরুষ মানুষ দেখলে মনে পুলক লাগে কখনও। বাসন্তীর মা মাইয়ারে চক্ষে চক্ষে রাখে। একদিন তার আবিস্কার করিল পশ্চিম পাড়ার এক ছেলে নাম যার ময়না, বাসন্তী তারে দেখলে আনচান করিয়া ওঠে। এক মাথা বাবরি চুল, গাবের কষের মত মাজা গায়ের কালো রং-বাঁশের ধনু আর মাটির গুলি লইয়া পাখী মারিয়া বেড়ায়। একদিন সে পাশের ছিটকির জঙ্গলে পাখি খুঁজিতে ছিল পক্ষী নাকি বাসন্তী! করে খুঁজিতে ছিল সে? খায় দায় পক্ষিটি, বনের দিকে চক্ষুটি। বাসন্তীও আস্তাকুড়ে জঞ্জাল ফেলার অছিলায় সেইখানে পৌঁছিল। যুবক ছেলে, যুবতী মেয়ে একে খালি তায় মৃদঙ্গের তালি।

বাসন্তী ঃ টিয়া পাললাম, দোয়েল পাললাম, পাইলাম না তো ময়নারে।

ময়না ঃ সোনামুখী দোয়েল পাললাম, আমার কথা কেউ কয়না রে।

সূত্র ঃ বাসন্তীর মা আড়াল হইতে সেসব দেখিল।

(দুজনের খুব হাসাহাসি করে কথা বলছে)

সূত্র ঃ মা নিজের চোখে এসব দেখিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে বাড়ি ফিরিয়া বুড়োর কাছে নালিশ জানাইয়াছে। মাইয়া বাড়ি ফিরতেই।

মা ঃ পচা পুঁড়ি খাইতে চায় ঘি-রুটি পিছার বাড়ি। মারিয়া দূর করিয়া দিমু। লাজ-লজ্জা মান সম্ভ্রম সকলি গেল আমাদের। এ মুখ পাড়ায় দেখামু কোন লজ্জায়! গলায় দড়ি জোটে না? না হয় গলায় কলসি বাঁধিয়া ডুবিয়া মর। 'আমার বিন্দাবনের নারী, কোন কালোচরা লড়দা গেছে মাইয়া বাঁশের বাড়ী।'

সূত্র ঃ এতোখানি বকুনি বাপের সামনে দাঁড়াইয়া শোনার পর এবার বাসন্তি'র মুখ খুলিয়া গেল।

বাসন্তী ঃ আমি ময়নার সাথে কথা কমু। তার সাথেই এই পুরীর বাইরে যামু, তোমরা কি করতে পার আমার? খাইতে দিবে না, খামু না। পরতে দিবেনা, পরুম না। কিন্তুক আমি বাহির হইয়া যামুই। তোমরার মুহে চুনকালি পড়ব, আমার কি? আমার তিনকূলে কারোর লাগি ভাবনা নাই। আমার গতরে আমি লুটাইয়া দেমু, নষ্ট কইরা দেমু, বিলাইয়া দেমু। যা মন লয় তাই করুম। তোমরা কথা কইতে পারবা না। মনে কইরা দেখো কোন শিশুকালে বিয়া দিছিলা! জানলাম না কিছু বুঝলাম না কিছু। সেই অবুঝ কালে ধমে আমারে কাঁচা রাঁড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অব্দি পোড়া কপাল লইয়া বনে বনে কাইন্দা ফিরি। তোমরাত সুখে আছ। তোমরা কি বুঝবা আমার দুঃখের গাঙ কত গহীন! আমার বুঝি স্বাদ-আহ্লাদ নাই? আমার বুঝি কিছু দরকার লাগে না?

মা ঃ চুপ কর। চুপ কর হারামজাদী, পোড়াকপালী। সবাই শুনতাছে।

গান

কালো কালো কোকিল কালো
কালো ব্রজের হরি,
ময়না পক্ষীর দেহ কালো,
মনেতে সুন্দরী।
শুইলে না আসে নিদ্রা,
বসিলে ঝুরে আঁখি,
শিথান বালিশ, পইথান বালিশ
বুকে তুইল্যা রাখি।

সূত্র ঃ কিছুদিন পর উদয়তারার হাত ধরিয়া বালক অনন্ত জীবনের প্রথম পাড়ি দিল অন্য কোন দেশে ..... রাত বাড়ে। অনন্ত পাটাতনের পর চিত হইয়া শুইয়া আকাশের তারা আর চারদিকের অন্ধকার দেখিতেছে। সে ভাবিতেছে ....

অনন্ত ঃ ইবার দেশ দেশান্তরের স্রোত মোরে ভাসাইয়া লইয়া চলিবে। কেউ জাগিয়া

থাকিবে না। শুধু তারারা, আঁধার আর জলের মাছেরা জাগিয়া থাকিবে সারা রাত। আমি ঘুমাইছি মনে করিয়া মাছেরা আমার কাছাকাছি আসিয়া একসাথে সাঁতার কাটিতে থাকিবে। দল বাঁধিয়া ভাসিয়া চলিবে এক গ্রাম থিকা আরেক গ্রামে।

গান

দয়া কর মেঘ মেঘালি ওলাত পুবাল বাও
নাইয়ররে সন্তান মানো সুবচনীর মাও।

উদয় ঃ ছইয়ের ভিতর থিকা মুখ বাহির কারিয়াই... হেই পাগলা, ছই এর ভেতরে আয়। দেহে প্রাণ থাকিতে নদীর ওপর শুইতে নাই। প্রাণপাখি উড়িয়া যখন দেহ খাঁচা শূন্য হইয়া যায়— যারা পোড়াইবার পাবেনা এই জল বিছানায় জল সই করিয়া ভাসাইয়া দেয়। যেমন দিছিল লখাই পণ্ডিতেরে।

অনন্ত ঃ তিনি আবার কন দেশের মানুষ মাসি?

উদয় ঃ চান্দ সদাগরের ছাওয়াল । কাল নাগের দংশনে মারা গিয়াছিল। তাই একটা কলা গাছের ভেলায় ভাসাইয়া দিল নদীতে। আর তাঁর বউ ভেলাইয়া সুন্দরী ধনুক হাতে লিয়া নদীর তীরে থাকিয়া ভেলার সংগে চলিল।

অন্ত ঃ ভাসতে ভাসতে তারা গেল কই?

উদয় ঃ গেল সগগে। সিখানে দেবগণের সভায় ভালাইয়া সুন্দরী নৃত্য করিল। তারপর মহাদেব আর চণ্ডী খুশি হইয়া আশীর্বাদ করিল আর মরা লখাই পণ্ডিতেরে জিয়াইয়া দিল।

অনন্ত ঃ তার মানে নদীর উজান ঠেলিয়া গেলে একদম সগগে যাওয়া যায়?

উ.তারাঃ যায় হ্যাঁ, নদীর সির্জন তো হিমাইল রাজার দেশে। সেই দেশে স্বর্গে-সংসারে মিলন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ সেই দেশে গিয়া, তারপর হাঁটিয়া সগ্গে গেল।

অনন্ত ঃ আমিও যামু হিমাইল রাজার দেশে। তারপর হাঁটিয়া সগ্গে যামু। মামী তুমি কত জান। মা, বাসন্তী মাসি, এরা এত কিছু জানতো না। তোমারে পোন্নাম উদয়তারা মাসী।

সূত্র ঃ অবশেষে বনমালীর গ্রামে আসিয়া পৌঁছাইলো অনন্ত। এমুন কপাল বনমালীর অন্য দুই বোন আসমানতারা আর নয়নতারা সেদিন আসিয়া পৌঁছাইছে ভাইয়ের বাড়ী। গাঙে গাঙে দেখা হয়, তবুও ভইনে ভইনে দেখা হয় না। অনেকদিন পর কপালের ফেরে এবার দেখা হইয়াছে। তিন বোন একসাথে এমন কলকলায় যে শ্রাবণের ভরা তিতাসের জলের ডাকও সে আওয়াজে ম্লান।

অনন্ত ঃ নয়নতারা, উদয়তারা আর আসমানতারা হগলডি ই তারা। গাঁয়ের আকাশে দিন মানে তারার মেলা।

সূত্র ঃ এতক্ষণে ঘরের কোণায় বসিয়া থাকা অনন্তের দিকে তাহাদের নজর পড়িল। নয়নতারা বলিল-

নয়ন ঃ এরে তুই কই পাইলি?

উদয় ঃ এ আমার পথের পাওয়া। মা-বাপ নাই। সুবলার বউ রাঁড়ি মানুষ করত। পরে কি গো বুঝে পরের মর্ম! একদিন খেদাইয়া দিল। বড় মায়া লাগলো আমার। লইয়া আইলাম, যদি কুন দিন কুন কামে লাগে। এমনই আমি নাচুন্যা বুড়ী, তায় পাইছি ঢুলের বাড়ী।

সূত্র ঃ নয়নতারা বয়সে ছোট হলে কি হয়, তার জামাই বেশ সরেস জেলে। আশেপাশের দশ বারোখান গায়ের মানুষ তাকে একডাকে চেনে। মাছের কারবারে মেলা পয়সা তার। সেই আহ্লাদে নয়নতারা বলিয়া ওঠে-

নয়ন ঃ আমারে দিয়া দে দিদি। আমি খাওয়াইয়া ধোওয়াইয়া মানুষ করি।

উদয় ঃ চন্দনারে চন্দনা এই কথা খান মন্দ না। আমার কথা শোনো। তোর তো দিন আছে ভইন। ঈশ্বর তোরে দিব। - কিন্তু আমারে আর কোনো কালে দিব না। এরে দিলে আমি নাচতে নাচতে লইয়া যায়।

অনন্ত ঃ মানে? মানেডা কি? আমি দোকানের গামছা নাকি সাবান? কোন সাহসে আমারে কিনিয়া নিতে চাও? আমি বনমালী দাদার সাথে থাকিব। হিমাইল রাজার দেশে যাব। সেইখানে যেখানে দেবতাদের বসবাস।

নয়ন ঃ ও; তিন তিরিশার নাথ, বুড়াগরুর দাঁত, হুইয়া পড়েন।

সূত্র ঃ পুরা শ্রাবণ মাসে রোজ রাত্রে এ গাঁয়ে পদ্মপুরাণ গান হয়। রাতের জলে যায় না। দিনের জলে যায় আর রাতে পদ্মপুরাণ গানের আসর। এক এক রাতে এক এক বাড়িতে আসর। প্রধান গায়ক বনমালী। তার গলা খুব দরাজ। হাতে থাকে করতাল।

সূত্র ঃ অনন্তর চোখে এ এক অদ্ভুত মিষ্টি গ্রাম। প্রত্যেক বাড়ীতে তুলসী গাছ ছোট বেদীর ওপর। পাশে দুই চারটি ফুলের গাছ। গোবরছড়ার সোঁদা মিষ্টি গন্ধ গ্রামের আনাচে কানাচে। মালো পাড়ার আয়তন বেশি বড় না। একদিনেই পুরাগ্রাম ঘোরা শেষ হইয়া যায়। তারপর যতদূর চোখ যায় শুধু পাট ক্ষেত।

সূত্র ঃ এরই মধ্যে রাতে এক পদ্মপুরাণের আসরে ঠিক হইল অনন্তরে গোপালখালি মাইনর স্কুলে ভর্তি করানো হইবে। আগামীতে মাছের হিসাব, মহাজনের দেনা-পাওনা, সুদের হিসাবের কাজ হইবে তাহার দ্বারাই।

সূত্র ঃ তাই উদয়তারা সাথে গোকন্ন ঘাটে আর ফিরবে না। এ গাঁয়ে শ্রাবণ মাসের শেষে মনসা পূজার সাথে জলাবিয়ার আয়োজন হয়।

কোরাস ঃ জলাবিয়া কি?

কোরাস ২ ঃ বেহুলা সতী মরা লখিন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ি ও জাদিগকে কতগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল,

বেহুলা ঃ আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে এই ধানগুলা সেদিন চারা বাহির হইবে।

কোরাস ১ ঃ যেহেতু ধানের চারা বা জালা ইহার প্রধান উপকরণ তাই এর নাম জলাবিয়া।

এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায়, আর এক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিবাহ হইতে থাকে, আর একদল নারী গীত গাহিয়া চলে।

নারী ঃ দুই বছর আগে আমারে বিয়া কইরা রাখছিলি মনে আছে? এই বছর তোরে আমি বিয়া করি। কেমুন লা উদি?

উদয় ঃ না ভইন মন চায় না।

নারী ১ ঃ তবে তুই কর আমারে

উদয় ঃ না ভইন, ভালা লাগে না।

অনন্ত ঃ বিয়ার কথায় অনন্তর আমোদ লাগিল। কয়-করো না কেন বিয়া, অত যখন কয়।

উদয় ঃ তুই কস! আচ্ছা তাহলে করতে পারি।

অনন্ত ঃ ওমা মাইয়াতে মাইয়াতে বিয়া । কি মজা! (বিয়ে হচ্ছে গান হচ্ছে)

সূত্র ঃ এবার উদয়তারা হাসিয়া ফেলে।

নারী ১ ঃ কি লা উদি হাসলি যে?

উদয় ঃ হাসি পাইল, হাসলাম। আচ্ছা আমি ত তর বর হইলাম, আমার মুখের দিকে চাইতে তোর লাজ লাগে নাই?

নারী ১ ঃ শুন কথা ! সত্যের বিয়ার বরেরই লাজ করলাম না, তুই তো আমার জালা বিয়ার বর।

উ.তারা ঃ সত্যের বিয়ার বরেরে তর লাজ করে নাই! ওমা কেনে? করল না কেনে?

নারী ২ ঃ সেই কথা এক পরস্তাবের মত।
-আমরা একথা আগেই জানি যে পরস্তাব মানে গল্প বলা বা পরিবেশন করা।

নারী ২ ঃ বর ত আমার বাপের কাছে মুনিষ খাটত। মা-বাপ কেউ আছিল না তার। সুতা পাকাইতো আর জাল বুনিত।আমার বয়স আট বছর আর হের বার বছর। সেই না সময়ে বাপে দিল বিয়া। একসঙ্গে খেলাইছি, বেড়াইছি, মাছ ধরছি, সাঁতার কাটছি- আমি নি ডরাম তারে। বিয়ার কালে ফুল ছইড়া আমার মাথায় লাগাইতে পারে না এমুন রাগ হইল-

উদয় ঃ কি করলে তখন তুই?

নারী ২ ঃ এক ভেংচি দিলাম। জিব বার কইরা এক চক্ষু বন্ধ করিয়া লম্বা এক ভেংচি।

উদয় ঃ তুই আমারে এখন কেমন করিয়া একটা ভেংচি দেনা?

নারী ২ ঃ ধ্যাৎ, তুই কি আমার সত্যের বর। তুই ত মাইয়া মানুষ! তুই আর বড় হইলি না রে উদি। যদি পুলাপান হইত, ছাওয়ালের গু-মুত কাচাইতিস- তখন বয়সটা মালুম হইত।
(উদয়তারা অনন্তকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে)

****

সূত্র ঃ উদয় তারা একাই শ্বশুড়বাড়ী ফিরিয়া গেল। অনন্ত জিদ করিয়া সাথে না গিয়া

বনমালীর কাছেই রহিয়া গেল।

সূত্র ঃ আশ্রমের বাবাজির উপদেশে গোপালখালি মাইনর ইস্কুলে অনন্ত ভর্তি হইল। মাথা তার খুব পরিষ্কার। এক বছরের মধ্যে অল্প স্বল্প ধারাপাত, যুক্তাক্ষর শিখিয়া ফেলিল। কথায় বলে, 'কালি কলম মন- লেখে তিনজন। শেখে একজন।' অনন্তের লেখাপড়া কালবোশেখীর বেগে আগাইতে থাকিল।

সূত্র ঃ এরই মধ্যে একদিন পাঠশালে তার দেখা হইল অনন্তবালার সাথে। এই পরস্তাব খানা তো আগেরবারেই দেখেছেন। মনে আছে নি ! আরো একবার দেখতে পারেন, কেমন করিয়া দেখা হইল অনন্তের সাথে অনন্তবালার। 'তিনকোনা পৃথিবী জলে যায় ভাসিয়া তুমি তারে বাঁচাইবা সিংহাসনে বসিয়া।'
(একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি)

সূত্র ঃ এই সময় তিতাসের বুকে কিসের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ছেলে-মেয়ের দল পূজা বাড়ি ফেলিয়া দৌড়াইয়া চলিল নদীর দিকে। সকলের মুখে এক কথা-

কোরাস ঃ দৌড়ের নাও, দৌড়ের নাও।

সূত্র ঃ দৌড়ের বাকি এখনো আরও কয়েকদিন। এখন তার মহড়া চলিতেছে। ঐ দেখ ময়ূর মুখা আগাইতেছে। এবার তার পাশ দিয়া সাপের মত ছুটেছে সাপ মুখা। পারাবত চেষ্টা করিতেছে প্রাণপণ। দূরে দূরে আরও নৌকা দেখা যায়। চল, চল।

****

সূত্র ঃ এদিকে কাদিরের গ্রামে সবথেকে লম্বা বাইচের নৌকা তৈরি প্রায় শেষ। এখন নৌকা কাজ করিয়া তলার দিকটা পালিশ করার কাজই যা বাকি। বড় মিস্ত্রি হুঁকা হাতে সবাইরে ডাকে।

মিস্ত্রি ঃ যদি একখান তামুক সাজো তবে একটা পরস্তাব কইতে পারি।

গান

হস্তেতে লইয়া লাঠি, কাঁন্ধেতে ফেলিয়া ছাতি , বুরুজ যায় দীঘল পরবাসে।
চৈত্র না বৈশাখ মাসে পিঙ্গুলিয়া রোদের তাপে,
লাগিল যে দারুণ জল তিয়াস।
ঘরে আছে ঘরণী ভাই, জল নি আছে খাইবার চাই,
জাতে আমি বামুনের ছাওয়াল।
আছাড় খাইয়া বরজে কান্দে, পিছাড় খাইয়া বরজে কান্দে,
জাতি গেল ভুঁই মালিয়ার ঘরে।
ফিরিয়া যাবার পথ নাই, থাকিব যে তুমার ঠাঁই,
ভুঁই মালিয়া খাইল গিলিয়া।

বুরুজ হইল বরজ মানে ব্রজ। একজনের নাম। পথশ্রমে বুরুজ ক্লান্ত হইল, বড় পিপাসা পাইল। কিন্তু, এদিকে ওদিকে না নদী বা পুষ্করিণী। সহসা চোখে পড়িল

একখানা লেপা পুছা ঘর। দুয়ারের চন্দনের ছিটা। এই বুঝি ব্রাহ্মণের বাড়ী। বুরুজ আগাইয়া হাঁকে- ঘরে আছে ঘরণীয়া, ভাই, জল নি আছে খাইতে চাই। পরবাসী পিয়াস লেগে মরি। আহ্বান ব্যর্থ হইলো না ডান হস্তের ঝারি, বাম হস্তে পানের খাড়ি যায় কন্যা জলপান করাইতে। পিপাসার জল খাইয়া শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করে- তুমি কোন জাতের মাইয়া গো? মাইয়া বলে, ‘ আমরা জাতে তে গন্ধ ভুঁইমালি। চেঁচাইয়া উঠিল, বুরুজ।

‘জাতি গেল, হায় হায়, বুরুজের জাতি গেল।’ বলিয়া কান্দিতে থাকে। রমু, কাদির মিঞার নাতি খুব অবাক হয়।

রমু ঃ তিয়াস লাগিল তাই এক গেলাস পানি খাইলো। তাই জাতি গেল?

মিস্ত্রি ঃ গেল ত!

রমু ঃ কিন্তু কেনে গেল?

মিস্ত্রি ঃ কেনে ফেনে জানি না? কিন্তু গেল।

রমু ঃ গেল যে তাই বা কে জানিতে পারিল কি করিয়া?

মিস্ত্রি ঃ সব কিছু দেখা যায় না, জানা যায় না। কিন্তুক হয়। জাতি যায়।

রমু ঃ আমার হাতের পানি খাইলে তোমার জাত যাবে?

মিস্ত্রি ঃ বড় শক্ত কথা। তবে আমার মনে হয়, ‘না’ জাত যাইবে না।

রমু ঃ আমার মায়ের হাতের পানি খাইলে?

মিস্ত্রি ঃ না:।

রমু ঃ আমার বাপের হাতের? নানার হাতের?

মিস্ত্রি ঃ না, না, না। তোমাদের সাথে জানা পরিচিতি হইয়া গেছে না!

রমু ঃ ও ! জানা পরিচিতি হইলে জাত যায় না?

মিস্ত্রি ঃ না:, কোনমতেই না।

রমু ঃ যা:। ইস, আমার হাতের পানি খাইলে যদি তোমার জাত যাইতো - বেশ হইত।

মিস্ত্রি ঃ কি রকম!

রমু ঃ তাহলে সারা জেবন তোমরা ঐ বুরুজ ঠাকুরের মত আমাদের বাড়ীতেই থাকিয়া যাইতা। আর বাড়ী ফিরতা না।

(গান)

ডাল দিব, চাউল দিব, বানিয়া রসুই খাওয়াইয়া দিব রে
শুইতে দিব, বাতাস দিব, শিয়রে জাগিয়া রে,
নিশা কালে ভাত খাওয়াইয়া, পান সুপারির বাটা সাজাইয়া,
হাসি খুশি পশাইব রজনীরে।

সূত্র ঃ এর কয়েকদিন পর তিতাসের বুকে নৌকা বাইচের তুমুল উত্তেজনা। তিন রাস্তা চার রাস্তার মোড়ে তরুণ -যুবকদের ফিসফিস উত্তেজিত আলোচনা। যে যার

নৌকায় তেল খাওয়া পাকা বাঁশের লাঠি উঠাইতেছে। কোচ ভালা হাসুয়া যাইতেছে তার সাথে। ফি বৎসর রেষারেষি, মারামারি, নৌকা-ডুবি হইবই। এবারও তাই। কাদির মিঞার ছাওয়াল ছাদিরের এই সেদিন বানান সবথেকে লম্বা নাওটার ওপরে আরেক গ্রামের নৌকা উঠাইয়া ডুবাইয়া দিল। কারা যে এ কাজ করল, ছাদিরের লোক তাদের চেনেই না। কোন মতে ছাদিরকে উদ্ধার করিয়া উঠানে আনিয়া তোলে। কেউ বলে বড় ঘরের নৌকো।

কাদির ঃ খোদা মেহেরবান বাপ, তোরে জানে বাঁচাইছে। আর সব লোকের না জানি কি গতি হইল! পাপ, শালা, জমিদার তিন নয় আপনার।

ছাদির ঃ জানি না বাপ, আমিই কি বাঁচতাম! জলে পইড়া দেখি, শত শত নাও। কোনটা গেল মাথার উপর দিয়া, কোনটা ডাইন দিয়া, কোনটা বাঁয়ে দিয়া, কোনটার লাগল ছিটাপানি, কোনটার লাগলো বৈঠার বাড়ী। শেষে আমি দুই চোক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। এমন সময় দেখলাম তারে। চিনলাম, হাত বাড়াইলাম। ঝাঁপ দিয়া পানিতে পড়ল। আমারে পাছড়াইয়া তার নাওয়ে নিয়া তুলল। ঐ সে আলুর নাও ডুববার কালে যে জন বাঁচাই ছিল - সেই জাল্লা ভাই।

সূত্রধর ঃ বনমালী

(সবাই বনমালীকে দেখে, রমু তাহার হাত ধরে আরেক দিক থেকে অনন্ত এসে বনমালীর অন্য হাত ধরে)

গান

রূপের নাহি লেখা জোখা লম্বা লম্বা কেশ,
কত দিকে কত মুরতি ধর নানা বেশ
তোমার মত মানবকুলে কে বা আছে বীর
হিন্দুকূলে হও নারায়ণ, মোমিনকূলে পীর
ও সোনা বন্ধুরে বন্ধু হইয়া থাকিয়া যাও
হেই জীবনের তরে-

সূত্রধর ঃ বনমালীরা সে রাত থাকিয়া গিয়েছিল কাদির মিঞার বাড়ী। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। রমুরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। অনন্তকে দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া উঠে রমুর মন। অনন্তরও একই অবস্থা।

অনন্ত ঃ বাছুরগুলো অমন লাফাইতে লাফাইতে দৌড়াইয়া বাহিরে আসল ক্যান!

রমু ঃ সারা রাত্র গোয়াল ঘরে আটকা আছিল ত!

অনন্ত ঃ জল অনেক বাড়ছে রমু। বাড়ির দিকের গাছগুলার অর্ধেক ডুবিয়া গেছে। ওর নিচে ছুড মাছেরা লুকাইয়া আছে।

রমু ঃ পানির নিচে মাছ দেহা যায় না। কিন্তু যেডা আমি দেখি তুমি দেখবার পাও?

অনন্ত ঃ কি?

রমু ঃ আমি দেখি রোদে মেলা কুষ্টার উপর । কুষ্টা মানে পাট। তার ওপর অনেকগুলা গঙ্গা ফড়িং,

অনন্ত ঃ ঐ ত: একটা, দুইটা, তিনটা-কত্ত!

রমু ঃ তুমি ফড়িং ধর না?

অনন্ত ঃ না:।

রমু ঃ আমার চাচাতো ভাই ধরে। গফুর। ওই বাঁশের পুল পার হইয়া হেয়ার বাড়ী। ফড়িং ধরিয়া পেছনে সুতা বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেয়। আমার কষ্ট লাগে। তুমি খুব ভালো। ফড়িং ধর না।

সূত্রধর ঃ এমন সময় রমুর মা গাদায় ফেলিবার জন্য গোয়ালঘর হইতে একঝুড়ি গোবর লইয়া যাইতেছিল। যাইবার সময় শশা গাছ হইতে টুক করিয়া একটি শশা পাড়িয়া অনন্তর হাতে দিয়া বলিল, ধর ‘বা’জি’ খাও।

রমু ঃ আমার মা।

অনন্ত ঃ মা!

(হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে। আস্তে আস্তে নুয়ে পড়ে গড় হয়ে প্রণাম করে, রমুর মা জড়িয়ে ধরে)

গান

মানুষ মারা গেলে থাকে শুধু ব্যথা,
কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে থাকে শুধু কথা

সূত্রধর ঃ অনন্তর সাথে অনন্তবালার ও দেখা হয় প্রায়শঃই। একই স্কুলে অনন্তবালা ও ভর্তি হইয়াছে। তাছাড়াও নদীর পাড়ে, মন্দিরের উঠানে তারা একসাথে কথা কয়, মজা করে। (সেদিন বাইচ দৌড় দেখার পর দু’জনায় কথা)

অনন্ত ঃ আমি যদি একটা বড় গামলা পাইতাম না! বৈঠা মাইরা সকলের আগে দৌড়াইতাম।

অ.বালা ঃ অ্যা: ! ফুটানীর মামা, তলোত নেংটি নাই উপোরত জামা। তুমি একলা পারত না কি, জিগাই? তুমি কি ঐ লোকটার মতো চালাক না চতুর? বৈঠা লইয়া হাঁ কইরা চাইয়া থাকবা দৌড়ের নাওয়ের দিকে আর পাশ থিকে আরেকখান নাও দিব ধাক্কা। ব্যস গামলা ভাঙ্গিয়া বাবু তখন নদীতে হাবুডুবু। তবে আমি থাকলে ভয় নাই। তুমি যখন একদিকে বোকার মত হাঁ করিয়া চাইয়া থাকিবা, তখন আমি গামলারে সামলামু।

অনন্ত ঃ আর যদি না পার! গামলা ভাঙ্গিয়া তুমিও যদি জলে পড়?

অ.বালা ঃ তখন তুমি আমারে সামলাইও কেমুন?

অনন্ত ঃ হ! সামলামু। আমার নাম অনন্ত।

অ.বালা ঃ উ: ! নামে গগন ফাডে। হাড়ি পাতিল কুত্তায় চাডে।

****

সূত্রধর ঃ দেখা হইলেই ঘটিবাটি, লাগবই লাগব ঠুকাঠুকি। আরেক দিনের কথা। দুইও জনায় ইস্কুলে দেখা হইছে। এই দৃশ্যটাও আপনার আগেই দেখেছেন। শুধু আরেকবার দেখলে মনে পড়ব সব।

অ.বালা ঃ আজ আমরার বাড়িতে তুমারে আমারে নিয়া কথা হইছে। নামে নামে মিল আছে। কিন্তু অত মিলও ভালা না। তুমার নাম বদলানো হইব। ত মা প্রথমে নাম দিল হরনাথ। ত ছোড খুড়ির হেইটা পছন্দ না। ত ছোট খুড়ি নাম দিল পীতাম্বর। বড় খুড়িরও হেইটাও পছন্দ না। শ্যাস-ম্যাস অনেক তক্কাতক্কির পর, তুমার নাম রাখা হইছে গদাধর।

অনন্ত ঃ এই নাম আমার পছন্দ না।

অ.বালা ঃ রাখা যখন একবার হইছে তখন তো আর বদলানো যাইব না।

অনন্ত ঃ তা নাম বদলের দরকার টা কি?

অ.বালাঃ ধুর, তুমি কী কিছুই বুঝো না। আমরার বাড়ীতে তুমারে আমারে লইয়া কথা হইছে। তুমারে কওয়া মানা তাই কমু না। তুমারে নাকি আমার লগেই মানাইবো আর কারো লগে না।

অনন্ত ঃ আর আমি যদি না থাকি?

অ.বালা ঃ জোর করিয়া রাখিবে। বাঁধিয়া রাখিবে।

অনন্ত ঃ হে ! আমারে বাঁধিয়া রাখিবে। এই গ্রাম ত এক পিঞ্জর। ইষ্টিকুটুম পাখির মতো এক জায়গায় আমি ঘোরাঘুরি করুম না। আমি ওই নীল আকাশে ওড়া সাদা বগের মত। যেখানে মন উড়িয়া যাইবো।

অ.বালা ঃ আমি আঁচলে বান্দিয়া রাখিবো জাওলা।

(আশেপাশে দুই নারী)

নারী ১ ঃ (হাসিয়া ওঠে)

নারী ২ ঃ হাস কেন দিদি?

নারী ১ ঃ পায় তাই।

নারী ২ ঃ ক্যান পায়?

নারী ১ ঃ গাঙের পাড়ের মানুষদের মনের কথাও জলের মতো কলকলাইয়া বহিয়া যায়।

নারী ২ ঃ কথাখান খানিক বুঝলাম।

নারী ১ ঃ এইবার পুরা বুঝ। আসল কথাখান কই। অনন্ত আর অনন্তবালা, নামে নামেও মিলছে, আবার মনে মনেও মিলছে। কথাখান এই।

(গান)

চান্দ পূজলাম চন্দনে, সুরজ পূজলাম বন্দনে
চান্দ পুইজা পাইব স্থান
সুরজ পুইজা মনস্কাম।

- গোকন্নঘাট গ্রামে মহিলার সংখ্যা তুলনায় বেশী। তা সব বয়সের মহিলাদেরই পাওয়া যায়। বুড়ির পেটে অনেক পুরনো কথা। সত্য-মিথ্যা মেশানো হাজারো গল্প। যুবতী বৌ-এরা আর বাচ্চা ছেলে মেয়েরা সেসকল গল্প হাঁ করিয়া শোনে। কালোর মা তেমনি একজন তারে দেখিয়া নারীর দল ডাকে।

নারী ১ ঃ আইস মাসী , বহ এহানে দু একটা পরস্তাব শুনাইয়া যাও।

বুড়ী ঃ শুনাইতে পারি। যদি বটপাতা খাওয়াইতে পার।

নারী ২ ঃ আমার কাছে আছে, খাও কত খাইবা। এই নাও এক , দুই, তিন।

সূত্রধর ঃ একসাথে তিন তিনটি পান মুখে ঢুকাইয়া আঙুলের ডগায় অনেকটা চুন মাখাইয়া অল্প অল্প চাটিতে লাগিল।

সূত্রধর ঃ বালক অনন্ত বিস্ফোরিত চোখে কালো মায়ের পান খাওয়া পর্ব দেখিতেছিল।

বুড়ি ঃ কি দেখস রে ব্যাডা অবাক হইয়া? আমি খুব বেশী বট পাতা খাই? না? আমি আর কত খাই? আমার হাউরি যা বট পাতা খাইতো!

অনন্ত ঃ বটপাতা! মানুষে খায় নাকি?

বুড়ী ঃ অ্যা:, উইড়া আসিল শ্যাখ, তার ধুমচিয়ান দ্যাখ। এরে বুঝাইয়া দে।

সূত্রধর ঃ বুড়ি অন্য মেয়েদের ইশারা করতেই এক রমণী অনন্তরে বুঝাইয়া দেয়-

নারী ৩ ঃ তাইনের হউরের নাম ছিল পাণ্ডব। পান-ডব। আগে পান আছে না! হউরের নাম নেওয়া বারণ। তাই পানেরে কয় বটপাতা।

নারী ১ ঃ ও মাসী পরস্তাব শুনাও। তোমার হউর পাণ্ডব কুমারের কথা?

বুড়ী ঃ আমার হউরের এর অনেক কিচ্ছা আছে। তুমরি খেলা জানতো। মানে তুকতাক। উঠানের দুই দিকে দুই উস্তাদ খাঁড়াইতো। একজন মন্ত্র পইরা সাপ চালান দিত, আর একজন ময়ূর চালাইয়া সেই সপ্প সংহার করত।

কোরাস ঃ হেই মন্তর জানা না থাকলেই মরণ।

বুড়ী ঃ সেইজন আবার ফিরতি চালান দিত আগুন। অন্য একজন বরুণ মন্ত্রে মেঘ নামাইয়া আগুন নিভাইতো। একজন কামরূপ - কামাখ্যা থিকা এক বাইদানী উস্তাদ আইল আমার হোউরের লগে তুমরি খেলতে। পরথম খেলা হইল গাঁওয়ের আর এক উস্তাদের লগে।

উস্তাদ ঃ দেখাও রে বাইদানী কত তোমার তুমরির জোর। আমিও হাঁ করতে আলজিহ্বার টের পাই।

বাইদানীঃ অহনই তোর বাপের বিয়া, মার সাঙা দেখাইয়া দিই।

সূত্রধর ঃ বাদানী হাতের মধ্যে সরিষা লইয়া মন্ত্র পড়িয়া গামছার খুঁটে বান্ধে, গিরার মন্ত্র ছুঁইড়া মারে ওস্তাদরে।

বাদানী ঃ দেহি কত খেমতা, বাপের ধন সাপেরে খাওয়াইব! গরিবের বাড়িতে হাতির পাড়া পড়লে কি হয় দেখ।

সূত্র ঃ বাদানী গিরার মধ্যে টিপা দেয় আর উস্তাদের নাক দিয়া গল গল করিয়া রক্ত বারাইতে থাকে। কিন্তু উস্তাদ এর পাল্টা মন্ত্র জানতনা। সে ছটফট করে কিন্তু, হাত জোড় করে না।
অপমানের বাঁচনের থাইকা সম্মানের মরণও ভালো।

বুড়ী ঃ আমার হোউর আছিল কাছেই। বাদানী রে এক ধাক্কায় ফেলাইয়া সরষা বন্ধন খুলিয়া উস্তাদের বাঁচাইল। বাদানী রাইগা আগুন।

বাদানী ঃ মার চাইয়া পোড়ে মাসী, ঝাল খায় পাড়া পড়শী। বাপের বেটা হস্ ত ঠেকা। এই মারিলাম ভিমরুল বান, বাঁচাও নিজেরে।

সূত্রধর ঃ চারিদেকে আরম্ভ হইল ভিমরুলের গর্জন। শোঁ শোঁ শব্দে মানুষের কানে তালা ধরিয়া যায়।

শ্বশুর ঃ এই নাকি তোর ভিমরুল বান! এইবার দেখ তোর কি করি! হাতে বৈঠা ঘাটে নাও অবস্থা করিয়া ছাড়িব। এই সামাল দে আমার ধূলাবৃষ্টি বান।

সূত্রধার ঃ চারদিক দিয়া উঠল ধূলোর ঝড়। হগল ভিমরুলদের কানা করিয়া ছাড়িল। তারপর এমুন পাল্টা একখান ঘূর্ণি বাউকুড়ানী বান ছাড়িল যে-

সূত্রধর ঃ বাইদানীর কাপড় মানে পিন্ধনের শাড়ি পায়েব থিকা শুধুই উপরের দিকে উইঠ্যা যায়। দুই হাতে যতই টানিয়া নিচের দিকে নামাতে চায়। শাড়ি ততই ফরাত কইরা গিয়া উপরে ওঠে। শেষে বাদানী এক দৌড়ে তার নাওয়ের ভিতরে দৌড়াইয়া পলাইয়া লাজ বাঁচাইল।
(এক মহিলা আসে)

মহিলা ঃ কিরে নিলাজ বউগুলা? সূয্যিদেব পেটে যাবার সময় হইল তবু তুমরাার গল্পের শ্যাষ নাই? হুগা মাছগুলা যে কাকে লইয়া যাইতাছে এই হুঁশটাও নাই দেখি।

কোরাসঃ ১। চল চল বেলা গেল। গাঙে চল।
২। জালের সূতা কাটার কাজও পড়িয়া আছে।
৩। চল চল কাউয়া তাড়াই, মাছ বাঁচাই।
(বাচ্চারা লাঠির মাথায় কাকের পাখনা বাঁধা আছে এমন লাঠি সবাই হাতে হাতে নেয়)
৪। হুস হুস হুস আর যদি নিস হুগগা মাছ জ্বলিবে ফুসফুস।
৫। কাউয়ার দাদী মরল,
কুলা দিয়া ঢাকল,
দূর হ কাউয়া দূর, কলস কলস জল ঢালিব
দূর-দূর- দূর।

(গান)

কাকের দল-
মাছ কেডা চায় রে কন্যা, আমরা চাই যে তরে।

গাঁয়ের মাইয়া লইয়া যাইবে, অচিন দেশের বরে।
কন্যারা-
মর মর কাউয়ার দল, হুস, হুস, হুস, হুস।
কাকের দল-
জল ভরো শান্তি কইন্যা, জল ভরো তুমি
যে ঘাটে ভরিয়া জল গো চৌকিদার আমি।
কার্ত্তিক মাসেতে শান্তি ধান্যে ধরে ক্ষীর,
তোর এই যৌবন দেখি মনে না লয় স্থির।

****

সূত্রধর ঃ নিজামত মিঞা, অনেক পথ চলিয়া হাজির হইয়াছেন কাদির মিঞার বাড়ী। নিজামত আমার সাথে আপনাদিগের আলাপ নাই। আমি নিজামত মুহুরী।
কাদির মিঞা সম্পর্কে আমার বেহাই। মানে আমার বিটি খুশির সাথে বিয়া দিছি কাদির মিঞার ছাওয়াল ছাদিরের। আমি রমুর নানা।

রমুর মাঃ আমার বাপ আদালতে মুহুরীর কাজ করে। তাই নাতিরে আদর করিয়া পেশকার বলিয়া ডাকে। বা'জান তুমি?

নিজামত ঃ হ, আমিই তো!

রমুর মাঃ ঘরে আইস 'বা-জান।'

সূত্রধর ঃ খুশির পেটে রমুর ভাই বা বোন কেহ একটা আস্তানা গাড়ছে। এই বিরাট সংসার হইতে ছুটি নিয়া কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী যাইতে চায়। বাপ এ কথা জানাইতে আসিয়াছে কাদির মিঞারে। এমুন সময় বাহির থিকা তার গলা শোনা যায়।-

কাদির ঃ ছাদির ও ছাদির মিঞা পাটের ক্ষেতে বাঘ পড়ছে বাপ।

ছাদির ঃ 'বা-জি', আমারে ডাকছ? কোন বাঘে খায় ধান? ধান না উঠলে যাইবো মান।

কাদির ঃ হ, এক বিপদের কথা কই। উজানচরের মাগন সরকার মিছা মামলা লাগাইছে। আমার নামে। মিথ্যা মামলা। বাপ দাদার আমলের জমি-জিরাত। নেয্য মতে চাইয়া খাই। দরকার হলে ধারকজ্জ করি। পাট বিক্রির পর শোধ করি। কারো ফসলের ক্ষেতে পাড়া দেই না।

ছাদির ঃ কি বলিয়া লাগাইল মামলা?

কাদির ঃ দু'বছর আগে দুইশত টাকা কজ্জ করিয়াছিলাম। পরের বৎসর পাট বিক্রি করিয়া সুদসহ দুইশত টাকা ফেরত দিলাম।
(Flashback)

কাদির ঃ এই লও তোমার সুদসহ আসল টাকা। মাগন দাদা তোমার উবগার আমি জেবনে ভোলব না। এই সময় টাকাডা না হাতে পাইলে -

মাগন ঃ কি কও কাদির ভাই। এইডা আমার জাত ব্যবসা। তোমরা যদি কজ্জ না কর, আমি বাঁচিব কেমনে? এখন চলি তবে।

কাদির ঃ আরে দুধ চিঁড়া নিয়া যাও, ক্ষুধা পাইলে খাইয়া লইও পথে।

মাগর ঃ তোমার মত মন যদি হগলের হইত-চললাম। চিন্তা কইরো না। বাড়ি গিয়ে তমসুকের কাগজ ছিঁড়া ফেলামু।

কাদির ঃ এতদিন পরে সেই কাগজ নিয়া আমার নামে নালিশ করছে।

ছাদির ঃ বা-জান, তুমি বড় কাঁচা কাজ কর। ইবার তবে সব্বনাশ। মামলা চালাবো না পেটে খাব।

সূত্রধর ঃ আদালতের গন্ধ পাইছে নিজামত। মামলার গন্ধ পাইয়া সেতো ভয়ানক উত্তেজিত। ছুটিয়া আসিয়া সকলের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নিজামত ঃ কোন তারিখে, কার কোর্টে নালিশ লাগাইছে কও?

কাদির ঃ কাদের চমকাইয়া উঠিয়া কয়-কেডা,কেডা?

নিজামত ঃ আমি গ। নিজামত মুহুরী, তোমরা বেহাই।

কাদির ঃ অ বেয়াই। আমি ত ভাবছিলাম, বুঝি কোন বহুরূপী। মাইয়ার বিয়ার গহনার দেনা মিটাইতে পার নাই আইজও।

নিজামত ঃ ধ্বনি আছি দেইখা কইতে পারলা মিঞা। বহুরূপী বইল্যা ব্যঙ্গ করলা। যা তুমি মনে কর। এই জীবনে কত বহুরূপী রে নাচাইলাম। শেষকালে তোমার কাছে নিজেই বহুরূপী সাজতে হইল।

কাদির ঃ কও কি তুমি কইতে চাও?

নিজামত ঃ ঠিক কথাই কইতে চাই। দু-একটা মামলা-টামলা ত লড়লা না মিঞা এ জীবনে। কি কইরা জানবা, আদালতে মুহুরীর কত মুরোদ?

ছাদির ঃ খুশি - কিরকম বা-জান?

নিজামত ঃ ঘুড়িরে দেই আসমানে তুইল্যা, কিন্তু লাটাই রাখি হাতে। তার উড়াউড়ি, দিক ওদিক ঘোরাঘুরি- সব এই হাতের খেলা। এই আমার হাতেই সব। জজ-ম্যাজিস্টর ত ডালপালা। গোড়া থাকে এই মুহুরীর হাতে।

ছাদির ঃ তইলে ত বাপ আমাদের চিন্তা নাই।

রমু ঃ নানা, ঘুড়ির সূতা ধরিয়া টানিয়া আনবে মাটিতে।

নিজামত ঃ কি নাম কইলা? উজানচরের মাগন সরকার না? কুন চিন্তা করিও না। দুই-চারটা সাক্ষী সাবুদ যুগাড় করিয়া রাখ। মামলা তুমারে জিতাইয়া দিমু এই গ্যারান্টি দিলুম।

ছাদির ঃ বা-জান , তুমি ডরাইয়ো না। হউরে যখন সাহস দেয় তখন জিত হইবই বা-জান।

নিজামত ঃ বেয়াই তোমার কোন ডর নাই। দেখ, আমি কি করতে পারি। মিছা মামলা লাগাইতেছে, আমিও মিছা সাক্ষী লাগামু। মামলা নষ্ট করমুই,তার ওপর তার নামে মিথ্যা গরু চুরি, খামারের ধান চুরি করার পাল্টা মামলাও দিমু। তবে

ছাড়ুম। তুমি কিছু কইর না। শুধু বইয়া বইয়া দেখ।

সূত্রধর ঃ কাদিরের মুখ আগেই কঠিন ছিল, এখন আরো কঠিন হইল। সে কারও দিকে তাকায় না। শুধু আসমান দেখে একমনে।

ছাদির ঃ বা-জান, এই মাগন সরকার লোক মোটেই ভালো নয়।

কাদির ঃ না, না, তারে আমি ডরাই না।

নিজা ঃ তবে চল আমার সাথে। দেহি, মামলার গোড়া কাটা যায় কিনা?

কাদির ঃ হ । কাইল সকালেই যামু। কিন্তুক তোমার সাথে যামু না। আর তোমার ওই আদালতেও যামু না। আমি একবার যামু তারই কাছে।

নিজা ঃ তার কাছে গিয়া কি করবা?

কাদির ঃ তার চোখে চোখ রাইখ্যা জিগামু- তার ইমানের কাছে জিগমু। আমি যে কজ্জ, বিনাখতে দিছি, সেডা তার মনে আছে কিনা?

নিজা ঃ যদি কয় মনে নাই?

কাদির ঃ পারব না। মুহুরী পারব না। আমার এই চোখের ভিতর দিয়া আল্লার গজব তারে পোড়াইয়া খাক করব।

ছাদির ঃ বা-জান, তুমি বড় কাঁচা কাম করছ। এসব কথায় এখন আর কাজ হইব না। হউরের কথা শুনাই ভালা।

নিজা ঃ পাড়া- গাঁওয়ে থাক, পাড়া গাঁইয়া বুঝ তুমার। খামোকা তোমারে উপদেশ দিয়া লাভ নাই। তোমারে কওয়া যা ধানক্ষেতে কওয়া তাই। থাক গরুর সাথে মাঠে, গরুর বুদ্ধি তো হইব তুমার।

ছাদির ঃ হেইডা আপনি কেমন কথা কন? আমার বাপের বুদ্ধি গরুর মতন?

নিজা ঃ যা কই, ঠিকই কই। আজ শুনতে হইবো হগল কথা। আমার কাছে কত লোক যায় মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শ লইতে। সব জমিজমা ক্ষেত পাখার তুমার। জীবনে দু দশটা মামলা করলা না, কিসের তুমি কুঠিয়াল? পুটি মাছের পরাণ তুমার মামলার নামে কাঁইপা উঠতাছ, নইলে দেখতাম মাগন সরকাররে তুমার সামনে নাক খত দেওয়াইতে পারি।

কাদির ঃ দেখ, নিজামত মিঞা, আমার বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া আমার সংসারের সামনে অনেক অপমান করছ। হ, আমরা চাষা, চাষ করিয়াই খাই। তুমাদের মত বাবু পাড়ায় ভুঁইয়াদের সাথে থাকি না। অত প্যাঁচগোচ ও বুঝি না। আমাদের কাছে কথা সত্যই সব থেকে বড় সত্য। চাষাদের যদি এতই অপছন্দ, মাইয়ার বিয়ার সম্বন্ধ করছিলা কেনে আমাদের সাথে?

নিজা ঃ ভুল করছিলাম। একশ বার ভুল করছিলাম। যাইচা উপগার করতে গেলে এই দশাই হয়। সবাই কও, আমি কি তারে কুন খারাপ বুদ্ধি দিলাম। থাক, আর ইখানে থাকতে মন চায় না। আমি চললাম,

আর ইহজীবন থাকিতে আসিব না।

সূত্রধর ঃ মুহুরী যাইতে উদ্যত হইলে, তাড়াতাড়ি কাদির দুইটা লাঠি বাহির করিল। মুহুরী তো হতভম্ব হইয়া গেল। কাদির একটা ছোট লাঠি নিজের হাতে লইল এবং বাকি লাঠিটা রমুর হাতে দিয়া বলিল, 'নে শালা, তোর দাদারে মার।' রাত-বে-রাতে ভাত না খাইয়া ভিটে কেমনে ছাড়ে দেখি?

সূত্রধর ঃ দুই বেয়াই-ই হাসিয়া ফেলে। সে রাত্র নিজামত শেষমেশ থাকিতে বাধ্য হইল। বাপ অন্য ঘরে শুইতে গেলে খুশি বাপের বাড়ী যাইবার বায়না ধরে। কিন্তু ছাদির চাহেনা খুশী এখন বাপের বাড়ী যাক। এক ত খুশীরে সে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। তাছাড়াও রমুরে সে এবার মুক্তবে ভর্তি করাইয়া পড়াশুনা করাবার চায়। এই নিয়া বাপ বেটায় তর্ক লাগিয়াই থাকে।

ছাদির ঃ বা-জান রমুরে ভাবতাছি কিতাব কিনিয়া দিয়া মুক্তবে পাঠামু।

কাদির ঃ না। আমি তারে পাচন পাতে দিয়া গরুর পিছে পিছে মাঠে পাঠাইব। এখন থিকাই মাঠ ঘাটের সাথে সম্পর্ক গড়িয়া ওঠাই ওর পক্ষে ভালো হইব।

ছাদির ঃ তবে ত আমাদের মত মূর্খ চাষাই থাকিয়া যাইবে। দুনিয়ার হাল অবস্থা জানতে পারিবে না। মানুষ হইতে পারিবে না। মোকদ্দমা করিয়া ঠকাইব।

কাদির ঃ আর ইস্কুলে পাঠাইলে তোর হউরের মতো মুহুরী হইতে পারিবে আর ঘুষের পয়সা গুনিতে শিখিবে। কাজ নাই বাবা অমন লেখাপড়া শিখিয়া। (বলিয়া চলিয়া যায়) (খুশী আসিয়া সামনে দাঁড়ায়)

খুশী ঃ যত দোষ বুঝি আমার বাপের! আমার বাপ ঘুষ খায়, আমার বাপ চুরি করে, আমার বাপ ফলনা করে, তসকা করে। - কি যে না করে!

ছাদির ঃ তুই থামবি?

খুশী ঃ না, থামিব না। আমার বাপ যখন এত দোষের দোষী, তখন জানিয়া শুনিয়া চোরের মাইয়া ঘরে আনিলে কেন! আর আনিলেই যদি, বুঝিবার পরে খেদাইয়া দাও নাই কেনে?

ছাদির ঃ আরে বিষমুখী তুই থামবি না চোপা বাজাইবি?

কাদির ঃ আরে হইছে থাম এ হেন। খাইয়া দাইয়া পড়লো মনে, হুক্কা রয়েছে বাঁশ বাগানে।

খুশী ঃ চোর হউক, ধাউর হোক- তারই ত আমি মাইয়া। বাপ হইয়া মার মত পালছে, খাওয়াইছে, ধোওয়াইছে- হাজার হোক তবু ত বাপ। চোর হইলেও আমারই বাপ আর কাউর বাপ না। আমি মরলে এই বাপের বুক খালি হইব আর কোন বাপের বুক খালি হইব না।

কাদির ঃ না, হইব না। চোরের মাইয়ার আবার টাসটাসাইয়া কথা! খালি হইবো না

তোরে কইলো কেডায় মুখপুরি! আমার বুকের ভেতরডা কি দেখতে পাস।
তোর বাপরে চোর বলি, ধাউর বলি তোর কি, তোর বাপের কি?

গান

যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পার হইতে কতক্ষণ।
হায় কান্দে, কান্দেরে দেওয়ান কটু মিঞার কথায়।

বনমালী ঃ এমনই ছিল গেরামের ঝগড়াঝাটি। আবার কওয়াও যায় না লাডালাডি হইতেও পারে মাথা ফাটতেও পারত।

অনন্ত ঃ তুমি এত গল্প জান কি কইরা বনমালী দাদা?

বনমালী ঃ আমি ঘুইরা বেড়াই না মাছ ধরি, মাছ বেচি। এ গাঁয়ের মাছ ও গাঁয়ে। বিরামপুরের আশেপাশের দিকে আসলেই কাদির কাকার বাড়ি একবার কাকারবাড়ি একবার যাবই যাব।

অনন্ত ঃ তারপর সেই মামলার কি হইল? কাদির কাকা মামলা লড়ল না দেখা করল ঐ মাগন সরকারের সাথে?

বনমালী ঃ দেখা করল। তার দুইদিন পরে মগন সরকার মামলা লাগাইয়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়া হইতে বাড়ি ফিরতে ছিল। তিতাস নদীর তীর ধরিয়া পথ। মন খুব খারাপ আগেরদিন রশিদ মোড়লের কাছে শুনছে দোলগোবিন্দ সা-এর মৃত্যুসংবাদ। হঠাৎ অসুস্থ হইয়া কলিকাতার হাসপাতালে ভর্তি হইছিল। কাল টেলি আসিয়াছে- সে আর নাই। মাগন সরকারের মন উদ্বেল। নদীর পারের মাঠগুলোর দিকে তাকাইয়া থাকে। তার অনেক জমি। কত যে জমি আছে তার অনেক নিজেই ঠাহর করতে পারে না। মাঝে মাঝে গোলাইয়া যায় কত জমি যে সে করিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে সারা যায়।

মাগন ঃ হায় দোল গোবিন্দ তুমিও চইলা গেলা আমারে ছাড়িয়া। তুমি, আমি, রশিদ ত সব একই ডিঙার কাণ্ডারী। একই চাকরিতে ঘুষ খাইয়া পয়সা করিয়াছি। লোকের জমি-জিরাত দেনার দায়ে নিলাম করিয়াছি। আজ তুমি মরিয়া গিয়াছ, কাল আমিও ত মরিয়া যাইব। কি হইব তখন এসব জমি জমায়। শুধু নেশায় পইরা লোকের জমি ফাঁকি দিয়া নিছি।

সূত্রধর ঃ এইসব ভাবিতে ভাবিতে সারা রাত্র কাটিল মাগন সরকারের। দুই চোখের পাতা এক করতে পারে নাই। পরের দিন আবার আদালতে দিন পড়িয়াছে। তাই সকাল হইতে মাগন গোছগাছ কইরা রওনা হইল উত্তরের দিকে শহরে। আর কাদির চলিল দক্ষিণে মাগনের সাথে দেখা করিতে। তিতাসের পারে দুই প্রৌঢ় এর দেখা হইল। কাদির কিছুই বলিল না। শুধু নির্নিমেষ তাকাইয়া রহিল অপলক, মাগন সেই দৃষ্টির সামনে মাথা নিচু করতে বাধ্য হইল।

মাগন ঃ দোহাই তোমার কাদির মিঞা। শুধু একটি বারের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো।

জীবনে সব্বনাশ তো অনেকেরই করিলাম, আর কারো এই সব্বনাশ করব না আমি কথা দিলাম। শুধু শেষবারের মত তোমার এই সব্বনাশটুকু আমায় করিতে দাও। বাধা দিও না। প্রতিবাদ করিও না, শুধু সহ্য করিয়া যাও। এই আমার শ্যাষ কাজ। দেখিও তোমারে ঠকানোর পর থিকা আমি ভালো মানুষ হইয়া যাইব। আর কাউকে ঠকাব না।

কাদির ঃ তাই হোক মাগন বাবু। আমি সহ্য করিয়াই যাইব। তোমার কোনও ভয় নাই। নির্ভয়ে মামলা চালাও তুমি। কোন সাক্ষী সাবুদ আমি খাড়া করিব না। নীরবের সব স্বীকার করিয়া লইব এবং টাকা ডিক্রি হবার পর নগদ না থাকে জমি বেচিয়া শোধ করিব। তবু তুমি ভালো হও।

সূত্রধর ঃ তারপর মাগন সরকার উত্তরে আদালতের দিকে চলিল। আর কাদির মিঞা তিতাসের নিকটা আসিয়া কহিল-

কাদির ঃ তোর মনে যা ইচ্ছা মা তাই হোক। আল্লাহরে তুই কইয়া দিস যে, কাদির আজন্ম কারও ক্ষতির চিন্তা করে নাই।

সূত্রধর ঃ তারপর সে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই ফেরৎ গেল।

****

অনন্ত ঃ বনমালী দাদা, সে মোকদ্দমা কি জিতিল মাগন সরকার? কাদির কাকা কি সব জমি জমা বিক্রি করিয়া দিল? রুমুর তবে কি হইব? তার মায়েরই বা কি হইবো!

বনমালী ঃ না:, কাদিরের কোন সব্বনাশ করেনি মাগন সরকার। সেদিন সে আর আদালতে যায় নাই। বাড়ির পথে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ফেরার পথে যে নারিকেল বাগান পরে তার সব থেকে লম্বা গাছের মাথায় চড়িল। আর সেখান থেকে ঝাঁপ দিল ভূমিতলে। বড় বীভৎস সেই মৃত্যু।

সূত্রধর ঃ এরপর আর কাদিরের সাথে বনমালীর দেখা হয় নাই। মাঝেমধ্যে খবর মিলিতেও সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন বা সময় কোনওটাই বনমালী পায় নাই। প্রতি বছর তিতাসের জল কমে, মালোদের কষ্ট বাড়ে। তিতাস তখন বিগত যৌবনা নারীর মত, বাসন্তীর মত।

গান

কেশটি পড়িল, দন্তটি লড়িল, যৌবনে পড়িল ভাটা।,
একর গেছে গিয়া, বিঘাও শেষ প্রায়, জমির মাপ শুধু কাঠা।

****

সূত্রধর ঃ সেই যে বাবাজীবন অনন্তরে স্কুলে ভর্তি করাইছিল, তারপর থিকা সে একদিনও স্কুল কামাই করে নাই। পড়িবার, জানিবার প্রতি তার গভীর আগ্রহ। 'পাঁচ বৎসরের হইতে হাতে খড়ি দিল, পড়িবারে বশিষ্ঠের স্কুলে পাঠাইল।'

সূত্রধর ঃ পাড়ার নাপিতানী বউ এরা অন্তরে ধরিয়া একদিন বুঝাইলো (আগের নাটকে

আসবে)- কিছু কি বুঝিলা সেই জানে-
ইহার পর অনন্তরে বেশি দেখা যাইতো না গ্রামে। তারপর হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে উধাও হইয়া গেল সে। কারা যেন দেখছিল তারে-

সূত্র ঃ অচেনা লোকের নৌকোয় চড়িয়া ঐ উপরের দিকে চলিয়া গেল। আমি চেঁচাইয়া ডাকছিলাম সে উত্তর দিল-

অনন্ত ঃ আমি হিমাইল রাজার দেশে পাড়ি দিলাম আর ফিরুম না।

সূত্রধর ঃ তারপর মালোপাড়ায় প্রকৃতির আপন খেয়ালে অনেক কিছু বদলাইয়া গিয়াছে। তিতাসের জল শুকাইয়া খটখটে ডাঙ্গা। চরের দখল লইয়া লাঠালাঠি, রক্তপাত, মৃত্যু।

সূত্রধর ঃ মালোরা মারপিট বেশি করে নাই, জাল ফেলাইব কুথায়! শুকনা ডাঙায় নাকি আসমানে?

সূত্রধর ঃ সবাই গাঁও ছাড়িয়া, ভিটেমাটি ফেলাইয়া ফেলাইয়া পলাইতে লাগিল। অনন্তবালার পরিবারও গাঁও ছাড়িয়া আসামে চলিয়া গিয়াছে। কয়েকটা মানুষ গাঁয়ে পড়িয়া আছে। তার মধ্যে একজন বাসন্তী। আরেকজন বনমালী।

সূত্রধর ঃ অনন্তর বাবা কয়েক বৎসর আগে একবার বনমালীরে হাত ধরিয়া বলিয়াছিল - ও বাবা বনমালী তুমি তো সবসময় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াও। একবার ত কুমিল্লা যাইবার পারো আমি খরচা দিমু।

সূত্রধর ঃ অনন্তর বাবার কথায় বনমালী কুমিল্লায় গিয়া দুইদিন হোটেলে বাস করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ছিল। হদিশ মিলে নাই।

বনমালী ঃ হদিশ মিলিয়েছিল সাত বৎসর পর। অনেক আগেই অনন্তবালা তখন ষোলো ছাড়াইয়া সতেরয় পা দিচ্ছে। মালোর ঘরে এত বড় আইবুড়ো মাইয়া! ছি: ছি: ! মাইয়ারে বুঝাইছে, অন্যত্র বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। বর আসে তৃতীয় পক্ষ কিংবা চতুর্থ পক্ষ। তার ওপর মূর্খ দেখিতে কদাকার। মাইয়া আত্ম-হননের চেষ্টাও করিয়াছিল। তারপর ত সপরিবারে আসাম দেশে চলিয়া গেল।

সূত্রধর ঃ এত চেষ্টা করিয়াও বনমালী কুনদিন অনন্তের দেখা পায় নাই। এখন বনমালী রোজ কুমিল্লা যাতায়াত করে রেলগাড়ি চড়িয়া।
(Flashback)
(একদল মানুষের জটলা, তিতাসের পারে একখানা নৌকা আসে)

কমল ঃ শুন ভাইয়েরা- আমার নাম কমল সরকার। চট্টগ্রাম থিকা আইলাম। তোমাদের দুর্দশার কথা লোক মুখে খুব শুনছি। ভাবলাম একবার দেখা করিয়া যাই সবার সাথে। তোমাদের মাছের ব্যবসা এখন কেমুন?

সূত্র ঃ কই আর ব্যবসা বাবু, হুগ্গা জমিতে কি মাছ পাওয়া যায়? জমিতে ফসল হয়, মাছ হয় না।

কমল ঃ গ্রামে তো অনেক পুকুর আছে, পোনার চাষ করিতে পার।

সূত্র ঃ হে, ত অনেক মূলধনের ব্যাপার। এত পয়সা আমরা হগলে মিলিয়া ও যোগাড় করতে পারব না।

কমল ঃ তইলে পয়সা আমি ঢালি। তোমাগো পুষ্করিণীতে আমি মূলধন খাটাইয়া পোনা ফেলামু। তোমরা সেই পোনা রোজ হাঁড়ি করে রেলে চড়ে কুমিল্লার বাজারে দিয়া আসিবা। আমার লোকজনের কাছে মাল দিলে তোমার খালাস। রোজ এক টাকা করিয়া পাইবা। সাথে চিঁড়া গুড়। আর এক টাকা পাইবা রেলের ভাড়া বাবদ। কি কও রাজী?

সূত্রধর ঃ রাজি না হইয়া মালো গোষ্ঠীর উপায় কি! এর আগেই ত কত লোক গাঁও ছাড়া হয়েছে পেটের টানে। এ তবু গাঁয়ের মানুষ গাঁয়ের থাকিবে। কিছুদিন পর মালিক বলে-

কমল ঃ দেখ, আমি ভাবি কি' একটু পয়সা বেশী হইলে ভালো হইত। কি কর তুমরা?'

কোরাস ঃ আপনে ভগবান বাবু। আপনে আমাদের কষ্ট বুঝেন।

কমল ঃ হক কথা তবে আমিও ত আর ঘরের পয়সা দিমু না। কাল থিকা তোমাদের রোজ আরেক সিকা বাড়ান হইল। মানে এখন তোমাদের রোজ হইলো গিয়া এক টাকার বদলে পাঁচ সিকা। খুশি ত! তবে কাইল থিকা তুমরা আর রেলের ভাড়া পাইবা না। অসুবিধা হইব না। পরনে ছেঁড়া গামছা, কাঁধে ছেঁড়া গামছা, মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি, মাথায় পাখির বাসার মত রুখু চুল- এক্কেরে ভিখারির মত দেখায়। চেকারবাবু টিকিট দেখবারই চাইব না। দু'পক্ষেরই কিছু পয়সা বেশী হইল।

****

বনমালী ঃ আজ সাত বৎসর হইল, পোনার হাঁড়ি ঘাড়ে চাপাইয়া রোজ কুমিল্লা আসি। একদিন হইছে কি! গাড়ি যখন ইস্টিশনে লাগিল-এদিক দিয়া চেকার উঠিল। আমি ওদিক দিয়া নামিয়া গেলাম কাঁধে পোনার ভার। দৌড়াইতে পারি না। ইস্টিশনের পশ্চিমে একটা ময়দান। সিখানে অনেক লোক। আমি ছুটিয়া গিয়া ঐ মানুষের মধ্যে মিলিয়া গেলাম। হাঁফ ছাড়িতেয়াছি, হঠাৎ দেখি অনন্ত। ময়দানে বসিয়া তিন বন্ধুর সাথে তর্ক জুড়েয়াছে। ফর্সা ধুতি, ফর্সা জামা, পালিশ করা জুতা।

****

সূত্র ঃ যতদিন দেশে স্বাধীনতা না আসিবে মানুষের অভাব শেষ হইবে না।

অনন্ত ঃ তোমরা দেখছি স্বপ্নের জগতে বাস কর। এটা কোনও ম্যাজিক নাকি! স্বাধীনতা আসলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

সূত্র ঃ যেমন স্বাধীনতা পাবার জন্য লড়াই চলছে, পরে সে স্বাধীনতার ধরে রাখারজন্য

লড়তে হবে।

অনন্ত ঃ আরে আজ যারা ইংরেজদের গোলামী করে আমাদের অত্যাচার করে ধনী হয়েছে, কাল এরাই আবার নতুন সরকারের প্রতিনিধি হয়ে একই রকম অত্যাচার চালিয়ে যাবে।

সূত্র ঃ তবে হ্যাঁ শাসকের নাম বদলাবে আর অত্যাচারের ধরনও বদলাবে।

সূত্রধর ঃ বনমালী অনন্তকে চিনিতে পারিয়াছে। কাছে আসিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কাজ হয় না। এবার সে অন্য পথ ধরিল।

(অনন্ত দের কথাবার্তার মাঝখানে আসিয়া বনমালী কাঁদিতে থাকে)।

বনমালী ঃ কেউ কি আপনারা অনন্ত নামের কারও কথা জানেন? সে তিতাসের দেশ থিকা আসিয়াছে। সে কি জানে তিতাস শুকাইয়া গেছে। মালোরা জল ছাড়া মীনের মত অবস্থায় রহিয়াছে। খাইতে পায় না, পরনে কাপড় নাই। অনন্ত লেখাপড়া শিখেছে। সে গরমেন্টের এর কাছে একটা চিঠি লিখিয়া মালোদের একটা উপায় করিয়া দিতে পারে। নইলে কেন শিখল ল্যাখাপড়া।

(অনন্ত এগিয়ে আসে চিনিতে পারে)

অনন্ত ঃ বনমালী দাদা। (বুকে জড়াইয়া ধরে) এ তোমার কি চেহারা হয়েছে?

বনমালী ঃ তবু ত আমি বাঁচিয়া আছি ভাই। প্রথম মালো মরিয়াছে। কতক ত শহরেই মজুরী করে। নদীতে মাছ নাই, ঘরে খাবার নাই, দলে দলে গাঁও ছাড়িয়া যায় মানুষ।

অনন্ত ঃ সব কথা শুনব বনমালী দাদা। এখন তুমি আমার বাসায় চল। রাতভর তুমার গল্প শুনব।

****

অনন্ত ঃ বনমালী দাদা কি চেহারাখানা বানাইছ তুমি! কিবা তুমার বয়স! একেবারে বুড়োদের মত দেখাইতেছে।

বনমালী ঃ আগে স্বাধীনভাবে জাল ফেলিতাম, মাছ তুলতাম। এখন করি পরে গোলামী। পোনার ভার বহিতে কাঁধে কড়া বান্ধিয়াছে, কোমরও কুঁজা হইয়া আসিতেছে।

অনন্ত ঃ আমার বাসন্তী মাসির খবর কও। উদয়তারা দিদি! আর যেন গায়ের কারা আছিল-হগলের কথা মনেই নাই।

বনমালী ঃ সুবলার বউ এতদিন সারারাত সুতা কাটিয়া অশক্ত বাপ-মার আর নিজের অন্ন যোগাইতে ছিল। অহন আর সুতা কিনিতে আসে না। এখন আমার ভইন উদয়তারারে লইয়া গাওয়ালে যায় পান-সুপারি আর পোড়া মাটির জিনিস বিক্রিতে তবে এখন বুড়া বুড়ী দুইজনে মরিয়া তাহারে মুক্তি দেছে।

অনন্ত ঃ গাঁয়ের আর মানুষেরা!

বনমালী ঃ তুমাদের ঘরের পশ্চিমে থাকিত জয়চন্দ্রের কথা মনে আছে? সে ত কিছুদিন আগে মারা গেল। তার বউ এখন ভরা যুবতী। হাতে যা ছিল পোড়াইতে খরচ

করিয়াছে। এখন একটা শিশু বুকের দুধ টানে, আর একটা শিশু সারাদিন খাই খাই করে। দূরের দূরের গেরামে গিয়া ভিক্ষা করে। তার দেখাদেখি অন্য বউ মাইয়ারাও রাস্তায় বারাইছে, কেউ কেউ হারাইয়া গেছে আন্ধারে।

অনন্ত ঃ চুপ যাও, চুপ যাও বনমালী দাদা। আর শুনাইও না আমারে। বুক ফাটিয়া যায়।

বনমালী ঃ তোমার কথা শুনাও অনন্ত বলতো বিয়া-থা করলানি?

অনন্ত ঃ হইল কই আর ! কলেজে পড়ার সময় এক মাইয়ারে ভালো লাগছিল, তারও ভাল লাগছিল আমারে। তার বাপ মাও খুব ভালোবাসত, যত্ন করত। তারপর কন্যার বাপ মা একদিন মাইয়ারে বুঝাইলো-

গান

দেড় দিনের পিরীতির লাগি, পুরুষ বধের হইবি ভাগী,
শেষে বলবি কুথা যাই, নরকেও না হইব ঠাঁই।

মা ঃ দেখ মা অনন্ত ছেলে হিসেবে খুব ভালো। দেখতে সুন্দর।

বাবা ঃ ব্যবহার ও খুব ভদ্র। মেধাবী ছাত্র। হয়তো আরো উচ্চ শিক্ষাও করিবে। কিন্তু একটা জায়গায় ঠেকিয়া গেল।

মা ঃ ও মালোর ঘরের ছেলে। জাতিতে জেলে। ওই ঘরের সাথে আমাদের কোন সম্বন্ধ সম্ভব না। আত্মীয়-পরিজন ত আছে। তুমি ওই ছেলের কথা ভুলিয়া যাও।

বনমালী ঃ ব্যাস, সেই মাইয়া সব ভুলিয়া গেল?

অনন্ত ঃ গেল। যেদিন শুনেছিলাম, তারপর থেকে আর দেখা করিনি। সে অনেকদিন হল। এখন সব ভুলেও গেছি।

বনমালী ঃ আচ্ছা, আমাদের গাঁয়ের সেই মেয়েটার কথা মনে আছে? খুব ঝগড়া করত তোমার সাথে!

অনন্ত ঃ না; উদয়তারা দিদি আর বাসন্তী মাসীর কথাই শুধু মনে আছে।

বনমালী ঃ গেরামের জন্য কিছু করবার পার না?

অনন্ত ঃ করব দাদা। আমরাও বন্ধুরা মিলা ভাবছি। চান্দা উঠাইতাছি। আর ছয়ডা মাস। বি.এ পরীক্ষাটা দিয়াই আমরা গ্রামে আসুম। বাসন্তী মাসী আর উদয়তারা দিদির জন্য এই শাড়ী দু'খানা দিলাম। ছয় মাস পরে আমি গ্রামে আসবোই। কথা দিলাম দাদা।

সূত্রধর ঃ সে কথা রাখিয়াছিল অনন্ত। তবে অনেক দেরি হইয়া গেল। ছয় মাস পর এক বড় নৌকায় মালপত্র লইয়া কয়েকজন বন্ধুদের সাথে গেরামে পৌঁছাইল। প্রথম যখন সে আসিল কেউ তারে চিনিল না। বিরামপুরের ঘাটে মানে কাদির মিঞার গাঁয়ের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া ছিল। বলিয়াছিল-

অনন্ত ঃ এ গাঁয়ের লোকের কি কষ্ট? আমরা শহর থেকে এসেছি। নৌকা ভরা খাবার আছে।

সূত্রধর ঃ কাদির মিঞা বলিয়াছিল-

কাদির ঃ আমরা চাষা। ক্ষেতের ধান ঘরে আনিয়াছি, আমাদের কোন কষ্ট নাই। কষ্টে পড়িয়াছে মালো গোষ্ঠি। গাঙ শুকাইয়া গেছে, হেরাও শুকাইয়া গেছে।

সূত্রধর ঃ কেউ তারে চিনিল না। চিনিল কেবল রুমুর মা। আগাইয়া আসিল-

মা ঃ বা-জি, তোমারে আমি চিনি। তোমার নাম অনন্ত। বনমালীর নৌকাতে তুমি ছুডবেলায় আমার বাড়িতে আসিয়াছিলা। আমার রমুর সাথে খেলা করিয়াছিলা। আমার বাড়িতে আস। এক বেলা ভাত খাইয়া যাও।

সূত্রধর ঃ অনন্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে নাই। দুপরে খাওয়ার পর রুমু ছুডিয়া আসিয়া খবর দিল-

রমু ঃ বনমালী দাদা আমাদের বাড়ির দিকে আসতিছিল। কোথা হইতে জানা নাই। শুধু মুখে তার এক বুলি- অনন্ত, অনন্ত। কথা রাখছ আমার অনন্ত। কিন্তু পারিল না। ক্লান্ত অবসন্ন শরীলডা টানিয়া লইয়া আসিতে পারে না এ পর্যন্ত । পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

সূত্রধর ঃ কাদির মিঞা , অনন্ত বাকী গ্রামের লোকেরা বনমালীর পড়িয়া থাকা দেহখানা দেখিতে গেল। কাদির মিঞার বুক ফাটিয়া গেল।

গান

পাখিরে বুঝাব কত, হয় না পাখি মনের মত।
পাখি ইদিক সিদিক ঘুরিয়া বেড়ায় শিকলি কাটা টিয়ার মত,
কারো মন না বুঝিয়া, উড়িয়া পলায়।

কাদির ঃ এই লোক আমার কত উপকার করিয়াছে। আজ না খাইয়া মারা গেল। এই আমার ধানের গোলা খুলিয়া দে। বাবুরা আমার ধান-চাউল লইয়া মালোদের বিতরণ করো। আমার পরম বন্ধু না খাইতে পাইয়া মরিয়া গেল! হে আল্লা একি গজব তোমার।

সূত্রধর ঃ অনন্তর নৌকা পরেরদিন গোকন্ন ঘাটে গিয়া লাগিল। লোক কই? তবু যদি থাকে! তাই বড় হাঁড়িতে ভাত রাধিয়া বাবুরা বিতরণ করতে শুরু করিল।

সূত্রধর ঃ বুড়া রামকেশব একটা মাটির সরা লইয়া টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইতে অনন্ত সরা ভরিয়া ভাত দিল। সুবলার বৌও কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া থালা পাতিল। ভাত পড়িল কি না পড়িল পাছে চিনিয়া ফেলে এই ভয়ে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

অনন্ত ঃ এই গাঁয়ে আমার বাসন্তী মাসি থাকিত। কেউ কি তাহার খবর দিতে পারো আমায়! বাসন্তীর হাত থেকে জলের ঘটিটা পড়িয়া যায়। বাসন্তীও পড়ে যায়। অনন্ত ছুটে আসে, বাসন্তীকে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্ট করে। কোলে মাথাটা তুলে

নেয়। ঘটি থেকে জল ঢেলে দেয় মুখে। কিন্তু সে জল মুখে যায় না আর। বাসন্তী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

অনন্ত ঃ এই মহিলার মৃত্যু হইয়াছে। এইবার তোমরা এর সৎকারের ব্যবস্থা কর।

(সবাই সৎকারের সামগ্রী আনিয়া বাসন্তীকে দাহ করে।)

সূত্রধর ঃ জনম গেলো আধপেটা কিংবা না খাইয়া, আর এখন যাওয়ার কালে মাইয়ার কত কদর। খাইল না, বিলাইল না ধন, তবু চলিয়া গেল নারীর যৌবন।

গান

তৈল সিন্দুর পানগুয়া বাটা করি গন্ধ চুয়া,
আম দারিম্ব ফল কাঁচা,
পাটে ভরে নিল খৈ ঘড়া ভরা ঘৃত দই,
সাজায় শয়নে যায় গো বাছা।

লেখক ঃ **প্রবীর গুহ**, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।

অনন্ত-র-অপেক্ষা

শিবংকর চক্রবর্তী

চরিত্র ঃ অনন্ত, শিলা, অম্বর, সুশান্ত, একজন লেবার

[মঞ্চ] [নিম্নবিত্ত পরিবারের একটা ঘর প্রায় ফাঁকা - শেষ আসবাব একটা টেবিল একজন লেবার একাই তুলে বাইরে নিয়ে যেতে চায় - মঞ্চে এখন অনন্ত এবং সেই লেবার।]

অনন্ত ঃ আরে আরে পারবে না- একা পারবে না- আমি ধরি?

লেবার ঃ এ কাজ আপনের না কত্তা- অন্যমাল গুলানের মতোন এটাও একাই ট্রলিতে তুলি নেবো।

[টেবিলের ভিতর ঢুকে যায়। মাথায় তুলে নেয়। এগিয়ে চলে লেবার - মাথায় টেবিল]

অনন্ত ঃ আরে-আরে- দেখতে না পেয়ে উল্টে পরবে তো।

লেবার ঃ পরবো না কত্তা। পরবো না। আমি পড়লে যে আমার সংসারটাই মুখ থুবরে পড়বে। ঘরে বৌ-ছেলে- বিয়ের যুগ্যি মেয়ে - তাদের বইতে হবে তো? আপনের এ টেবিল নাচতে নাচতে মহাজন এর ঘরে ঠিক পৌঁছে যাবে। গরীব মানুষ তো — কতার খেলাপ হবে না গো কত্তা।
মাথায় টেবিল নিয়ে একটা লোকজ গান (বেসুরে গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়। মঞ্চে এসে ঢোকে শিলা।

অনন্ত ঃ বেঁচে দেবার মতো আর কিছুই রইল না ঘরে।

শিলা ঃ কেন— এই চুরি দুটো—

অনন্ত ঃ না-না- ওটা বেচা চলবে না।

শিলা ঃ না-খেতে পেয়ে মরলেও না?

অনন্ত ঃ না।

শিলা ঃ কেন?

অনন্ত ঃ গলায় দড়ি দিয়ে মরার পর অনেক হ্যাপা-পুলিশ, কাটাছেঁড়া, তারপর তুমি তো মানবে না- ছেরাদ্দ একটা করবেই। ওটা জমিয়ে রাখো।

শিলা ঃ এখনই মরার কথা ভাবছো?

অনন্ত ঃ উপায় কি? ভিক্ষে করতে পথে তো নামতে পারবো না।

শিলা ঃ গলায় দড়ি দেওয়ার চেয়ে ভিক্ষে করা অনেক ভালো।

অনন্ত ঃ দুটোই সমান-হেরে যাওয়া । শুধু হাত পাতার চেয়ে আত্মহত্যা একটু

হলেও সম্মানের।

শিলা ঃ এতোটা নেগেটিভ কেন ভাবছো?

অনন্ত ঃ ভাববো না? প্রথমে বল্লো একুশ দিন সব বন্ধ। লেদ মেশিন চলা কারখানায় ম্যানেজারী -ভাবলাম ঠিক আছে- একুশটা দিন ঠিক টেনে দেবো। সেই একুশ দিন আজ প্রায় তিন মাসে ঠেকলো। কারখানাটা আজও বন্ধ একটা টাকাও পাইনি মালিকের কাছ থেকে।

শিলা ঃ বে রোজগেরে কি তুমি কি একা? আমার গানের টিউশানি সব বন্ধ। আগে ঘরে এসে শিখতো - জায়গা দিতে নাজেহাল হতাম- এখন নিজে গিয়ে শিখিয়ে আসবো বলার পরও কোনোও গার্জেন রাজী নয়। আমাদের ছেলেটা অমু- এম.কম এ ফার্স্ট ক্লাস - C.A-র ফার্স্ট পার্ট পাশ করে একটা চার্টার্ড ফার্ম এর সাথে সব কিছু ফাইনাল- কিন্তু ট্রেন বন্ধ- যেতে পারছে না- কাজ কিছুই এগুচ্ছে না। ছেলেটা আমার এখন ডিপ্রেশানে চলে যাচ্ছে। গলায় দিতে গেলে তো অন্তত: তিন গাছা দড়ি লাগবে। সেটা কেনার পয়সাও যে এখন এ সংসারে নেই।

অনন্ত ঃ বা: বেশ বলেছো তো? তিন গাছা দড়ি। কিন্তু তিন গাছা কেন? আমাদের ছেলেটাকে বাদ দাও। ওর সামনে অনেক জীবন পড়ে আছে।

শিলা ঃ কিন্তু সেই জীবনটা তো কোনও লাল কার্পেট বিছানো রাস্তা নয়। চাকরীটা হতে হতেও হলো না।

অনন্ত ঃ এটা না হলে আর একটা হবে। ও কি আমার ম্যাদামারা ছেলে? কি Bright কেরিয়ার।

শিলা ঃ কিন্তু যে মানুষটা এতোটা আশাবাদী তার মরার ইচ্ছে কেন?

অনন্ত ঃ কারণ আমি জানি লক্‌ডাউন উঠে গেলেও -মালিক আমাকে আর কাজে নেবে না।

শিলা ঃ তোমার মতো সৎ ম্যানেজার আর একটাও খুঁজে পাবে?

অনন্ত ঃ মালিক ম্যানেজার রেখেছিল কেন? কাজের চাপ এতো বেশী একা সামলাতে পারছিল না বলে তো? এখন লক্‌ডাউন উঠে গেলেও কে আসবে গ্রীল বানাতে? কে আসবে আলমারীর অর্ডার দিতে? সবার অবস্থাই তো আমাদের মতো। ঊনিশ - বিশ-।

শিলা ঃ তাই যদি বোঝ তবে মরার কথা ভাবো কেন? সব মানুষের যা হবে তোমার আমারও তাই হবে। তোমার ঐ অনুপদার লেদ মেশিনের কারখানা না ডাকলে- অন্য কিছু করবে।

অনন্ত ঃ এখন আর কি করবো। যখন সময় ছিল তখন কেরিয়ারের কথা ভাবিনি। ছাত্র রাজনীতি, সমাজসেবা। তখন কি ভেবেছি নিজের জীবনেও বেঁচে থাকাটা এতো কঠিন হবে? এখন বয়েস পঞ্চাশ পার- হাতে শুধু একটা

বি.এস.সি পাশের ডিগ্রি। এখন এই বাজারে কে দেবে আমাকে একটা চাকরী ?

শিলা ঃ চাকরী না করেও রোজগার করা যায়।

অনন্ত ঃ হ্যাঁ- যায়- চুরি করে, ডাকাতি করে এখনকার নেতাদের চামচা হয়ে দাদাগিরি করে- কিন্তু এর কোনটাই আমি করতে পারবো না।

শিলা ঃ সব্জী বেচতে পারবে তো ? ট্রলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ? কিম্বা ফিনাইল, ব্লিচিং, হ্যান্ডওয়াশ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে ?

অনন্ত ঃ আমি ?

শিলা ঃ কেন নয় ? তুমি কি এমন লাটের বাঁট ?

অনন্ত ঃ তুমি বুঝতে পারছো না। এই শহরে আমার একটা পরিচিতি আছে। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন C I T U এর সাথে আমি যুক্ত- আমি যাবো মানুষের দোরে দোরে ট্রলি ঠেলে সব্জী বেচতে ?

শিলা ঃ ইগোতে আটকাবে ? এতো আত্মসম্মানবোধ ভিতরে পুষে রেখে বাম রাজনীতি করছো ?

অনন্ত ঃ বাম রাজনীতি মানেই কি ছেঁড়া পাঞ্জাবী আর কাপড়ের ব্যাগ কাঁধে ঝোলানো ?

শিলা ঃ না বাম রাজনীতি মানে struggle for existence- দেখো না- তোমাদের মিছিলে শ্লোগান দেয় লড়াই লড়াই -লড়াই চাই- লড়াই করে বাঁচতে চাই। তাহলে এই অসময়ে তুমি যদি নিজেকে বাঁচাতে, সংসারকে বাঁচাতে ট্রলিতে করে তরকারি বেচতে মানুষের দরজায় পৌঁছে যাও- সেটা কি- তোমারই আদর্শের একটা পথ হবে না ?

অনন্ত ঃ শিলা—

শিলা ঃ জানো তো- আমার কাগজ পড়ার খুব নেশা। না তোমাদের গণশক্তি নয়- পাতি আনন্দবাজার। লক্‌ডাউনের শুরুতে কাগজ আসাই বন্ধ হয়ে গেল- তারপর যখন চালু হলো- তুমিই খরচের ভয়ে আর নিতে চাইলে না। কিন্তু নেশা তো সামলাই কি করে ? তাই সময়ে অসময়ে পাশের সুনন্দাদির বাড়ি যাই - কাগজটা উল্টে দেখি - সেখানেই পড়লাম - কোলকাতায় এক নাট্যদলের এক অভিনেতা - নাম মনে নেই - দলের সঙ্গে নাটক করতে বিদেশও গেছে - সে এখন বারাসাত বাজারে মাছ বিক্রি করে।

অনন্ত ঃ সমস্যাটার সরলীকরণ করো না শিলা। এভাবে সবাই তরকারি , মাছ , স্যানিটাইজার বিক্রি করতে শুরু করলে কিনবে কে ? তাছাড়া সব্জী বাজারে -মাছের বাজারে যারা বছরের পর বছর ব্যবসা করে চলেছে তাদের ব্যবসা তো লাটে উঠবে।

শিলা ঃ এটা প্রতিযোগিতার যুগ। বাঁচতে গেলে তোমাকে আমাকেও একসাথে সব্জীর ট্রলি নিয়ে পথে বেরোতে হবে। আমরা কম লাভে দেবো। যে আনাজ পাইকারী বাজারে কুড়ি টাকা কিলো- সেটা পঞ্চাশ টাকায় না বেচে তিরিশ টাকায় বেচবো।

অনন্ত ঃ ভাবনাটা ভালো - কিন্তু তিনদিন পরেই আর সব সব্জীওয়ালারা আমাদের ট্রলি ধরে টান মারবে। কেউ কি তার লাভের অংশটা ভাগ করে নিতে রাজী হয়?

শিলা ঃ তুমি মানুষটা অদ্ভুত। কখনো এমন আশার কথা শোনাও যে মনে হয় ক'দিন বাদেই এসব মারণ রোগ কমে যাবে- আমরা আবার আগের জীবনে ফিরে যাবো। আবার মাঝে মাঝেই এমন হতাশা তোমার কথায় ফুটে ওঠে যে মনে হয় সামনে শুধু অন্ধকার শুধুই অন্ধকার।

অনন্ত ঃ কি করি বলো তো- আমি তো একটা আস্ত মানুষ- যে রাতে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমায় আর সকালে সূর্যের বাস্তব আলোটা চোখে পড়লেই কপাল চাপড়ায়।

শিলা ঃ ঠিক আছে- আপাতত: কপাল চাপড়ানোটা বন্ধ রেখে নতুন কিছু ভাবি- চেয়ার টেবিল, সোফা বেচে কতো হাতে এলো? তাই দিয়ে — [হঠাৎই অম্বর মঞ্চে ঢোকে]

অম্বর ঃ মা- মা - এতো বেলা হলো - আমাকে এখনো খেতে দিলে না? আমি তো চান করে জামা প্যান্ট পড়ে ready - ওমা - ভুলে গেলে - আজ কোলকাতায় আমার প্রথম চাকরীর final interview!

অনন্ত ঃ স্বপ্ন দেখতে উঠে এলি নাকি রে অমু?

অম্বর ঃ না - না - স্বপ্ন কেন হবে। ফার্মের ম্যানেজার এর সাথে Final কথা তো আগেই হয়ে আছে। আজ তো তিরিশে মে just একটা Interview - তারপর জুনের ১ তারিখ থেকে চাকরীতে Join ।

অনন্ত ঃ ঠিক আছে আজ যাবি কিভাবে? আর সত্যিই চাকরিটা হলে তখনই বা যাবি কি করে?

অম্বর ঃ কেন Local Train এ-

শিলা ঃ ও বাবু- একটু আমার দিকে তাকা। বাবুরে আজ তিরিশে মে নয়-। এখন লক্‌ডাউন চলছে - সব কিছু বন্ধ- অফিস-কারখানা-। আর কোলকাতাতে যাবিই বা কি করে- লোকাল ট্রেনই- তো বন্ধ।

অম্বর ঃ তাই তো- সবই তো বন্ধ- কমপ্লিট লক্‌ডাউন - আমার বর্তমান আমার ভবিষ্যত। শরীরটা - না মাথাটা কাজ করছে না। একটু বসবো- চেয়ার- সোফাটা- ও: মা- [অম্বর চলে যায়। শিলা ওকে ধরে]

শিলা ঃ বাবু—

অম্বর ঃ ঘুম পাচ্ছে- ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমাকে সোফাটাতে শুতে দাও।

অনন্ত ঃ আর সোফা। সে এখন—। বুঝতে পারছো শিলা আমাদের ছেলে - আমাদের ভালোবাসার কেরিয়ারিস্ট ছেলে পুরো ডিপ্রেশানে চলে গেছে- এটা হ্যালুসিনিয়েশানের মধ্যে হাঁটা চলা করছে। আমরা সাদা কথায় যাকে বলি দিবাস্বপ্ন। এখন তুমি কি করবে শিলা ?

শিলা ঃ গলায় দেবার জন্যে দড়ি কিনতে বাজারে ছুটবো না। একজন মা বিপদের সময় ছেলেকে যেভাবে আগলায় তাই করবো। বাবু- চল্ তোর ঘরে চল। তোর টেপ রেকর্ডারটা খারাপ হয়ে গেছে বলছিলি না ? দেখ না সেটা যদি আবার সারিয়ে তোলা যায়। ছোট বেলায় তো নিজের খেলনাগুলো খুলে আবার জোড়া দিতিস্। সেটাই ছিল তোর খেলা। আজ এই অসময়ে চল না বাবু আমরা তিনজনে মিলে দেখি তোর টেপ্‌টা সারিয়ে তুলতে পারি কিনা ?

অম্বর ঃ কি হবে ? কোন গান শুনবো ? গান শুনতে আমার যে এখন একটুও ইচ্ছে করছে না।

শিলা ঃ কেন তোর মায়ের গান- রবীন্দ্র সংগীত-শুনতে মন চায় না ?

অম্বর ঃ মা—

শিলা ঃ [গেয়ে ওঠে] ঢেউ ওঠে ভাঙে কাদায়-
সম্মুখে ঘন আঁধার-
পার আছে -গো- পার আছে-
পার আছে -কোন দেশে
কি আছে শেষে - পথের-

[রবীন্দ্রসঙ্গীত শিলার গলায় চলতে থাকে। আলো নেভে] [আলো জ্বলে-একই মঞ্চ-! হয়তো সেদিনই -অথবা দু'দিন পর। আসলে এই লক্‌ডাউন পর্বে - সোম আর শনির মধ্যে তো কোনও পার্থক্য নেই। দিনের আলো- মঞ্চে অনন্ত- সামনে সুশান্ত]

সুশান্ত ঃ অন্তু কাকু-অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছেন। মানুষের হাতে কাজ নেই- পেটে ভাত নেই। সরকার বিনি পয়সায় চাল দিচ্ছে। চাল কি সবাই চিবিয়ে খাবে ? তাই আমাদের পার্টির - যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে কাল একটা ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের পকেটে তো সরকারী ত্রাণের টাকা নেই- রেশনের চুরি করা চালও নেই। তাই চেয়ে চিন্তে—

অনন্ত ঃ দারুণ-দারুণ কাজ হবে। এনে কি কি দেবে ?

সুশান্ত ঃ আলু-সয়াবিন-সরষের তেল-নুন-হলুদ-লঙ্কার গুঁড়ো আর একটা করে হাত ধোয়ার সাবান।

অনন্ত ঃ বাঃ কিন্তু যাই করো টাকা তো লাগবে ?

সুশান্ত ঃ ঐ যে বল্লাম চেয়ে চিন্তে—

অনন্ত ঃ তার মানে আমার কাছেও এসেছো চাইচে- কিন্তু সুশান্ত-তুমি তো আমার অবস্থা জানো। সবটাই জানো। তাই বেশী কিছু দিতে পারবো না। ঘরের সোফা, টেবিল, চেয়ার বেচে যা পেয়েছি তার থেকে এই নাও একশো টাকা।

সুশান্ত ঃ এ বাবা- না - না-। অন্ত কাকু আপনাদের সবটাই আমরা জানি। আমাদের ঘরোয়া মিটিং এ আপনাদের মতো ফ্যামিলিদের নিয়েও আলোচনা হয়। আমাদের সিনিয়ররা আপনাদের কথা উদাহরণ হিসেবে বার বার উল্লেখ করেন। তাই —

অনন্ত ঃ তাই— ?

সুশান্ত ঃ আপনার কাছে টাকা চাই না- চাই শুভেচ্ছা। আর একটা ত্রাণের কুপন-আপনাকে দিয়ে গেলাম। আপনি গেলে আমরা খুব খুশি হবো।

অনন্ত ঃ না- না- আমাকে ত্রাণের কুপন দিয়ো না। হ্যাঁ আমি মানছি আমি খুব চাপে আছি- কিন্তু আমার চেয়েও অনেক বেশী কষ্টে আছে অনেক মানুষ- তাদের দরকারটা অনেক বেশী।

সুশান্ত ঃ তার মানে আপনি কুপনটা নেবেন না ?

অনন্ত ঃ নেবো না মানে তোমাদের কাজটাকে অসম্মান করছি না। কিন্তু তুমি বলো তো- তুমি নিজেও নিজেকে সাচ্চা কমিউনিষ্ট বলে দাবী করতে পারো না- আমিও পারি না-কিন্তু একজন কমিউনিষ্ট এর ন্যূনতম যে দাবী - ভিক্ষে চাই না- না পেলে কেড়ে খাবো।
ক্ষমতায় কুলোলে না খেয়ে মরবো। তুমি জানো সে কথা ? আমি কিন্তু জানি।

সুশান্ত ঃ হয়তো আপনার ব্যাখ্যাটাই ঠিক। কিন্তু এই অসাম্যের সময়ে-এই বাজার সভ্যতার আগ্রাসনের সময়ে- আমাদের বাম আদর্শের দেওয়ালে পিঠ ঠেকার সময় এ আমাদের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখাটাই আমাদের কাছে এখন প্রাথমিক লড়াই। আমরা না বাঁচলে তো আদর্শটাই মরে যাবে ? সেটা হতে দেবেন ? আপনার মতো একজন লড়াকু কমরেড ?

অনন্ত ঃ তাই বলে ত্রাণের লাইনে দাঁড়াবো ? আমার পকেটে তো এখনও আমার টেবিল - সোফা বেচার একশো টাকা আছে। আমার বৌ এর হাতে তো এখনও দু'গাছা চুরি - হ্যাঁ সোনার চুরি আছে। এরপরেও আমি ত্রাণের লাইনে দাঁড়াবো ? কেন ? আমি তো কেড়ে নিতে পারি না, উপসি মানুষের থালার ভাত। আমি যে মালিক নই।

সুশান্ত ঃ না- আপনি আমাদের অগ্রজ- আমাদের মশাল বাহক। বাম আদর্শের আদর্শ উদাহরণ। সম্ভব হলে যাবেন- ত্রাণ না নিলেও আমাদের অনুষ্ঠানে যাবেন। কুপনটা রেখে যাচ্ছি। কোথায় রাখবো ? টেবিল চেয়ার কিছুই তো নেই। আমার অনুরোধ আমাদের প্রচেষ্টার সমর্থনে আপনি এটা নিন্। না- না- ডান

হাত ওঠাতে হবে না- চাঁদ সওদাগরের মতো বাঁ হাতেই এটা ধরুন। বাঁ হাতটাই তো আমাদের সবার হাত। সেই হাতটা বাড়িয়ে একবার- না- না- কোনও শ্লোগান নয়- শুধু বেঁচে থাকার এই অসম লড়াই এ আমাদের পাশে দাঁড়ান-

অনন্ত ঃ বেশ দাও- বাঁ হাতেই কুপনটা নিই। এটাই তো আমাদের লড়াই এর হাত। দাও— কোথায় যেতে হবে?

সুশান্ত ঃ আগামী কাল বিকেলে আমাদের ভেঙ্গে দেওয়া এরিয়া কমিটির অফিসের সামনের মাঠে। [সুশান্ত কুপনটা এগিয়ে দেয়। অনন্ত বাঁ হাতে নেয়। ঠিক যেভাবে বাঁ হাত তুলে একজন কম্যুনিষ্ট অভিনন্দন জানায় সেইভাবে হাত তোলে-নেপথ্য আবহে গণ সঙ্গীতের সুর, আলো নেভে]

[আলো জ্বলে । একই দৃশ্য- অনন্ত একা পায়চারী করছে- ভেতর থেকে এসে ঢাকে শিলা]

অনন্ত ঃ এখন কেমন আছে?

শিলা ঃ বেশী সময় তো ভালোই থাকে। একশো ভাগ ভালো মানুষ। হঠাৎ যে কি হয়।

অনন্ত ঃ মনের ভিতর একটা লড়াই- প্রতি মুহূর্তে -বাস্তবকে -মানতে চায় না তবু মেনে নিতে হয়। আর সেটা মানতে গিয়েই আসে হতাশা - তবু- depression- সেটা যখন বাড়ে তখন নিজেকে নিজের থেকে সামাল দিতে পারে না- তখনই বে-সামাল হয়ে পড়ে।

শিলা ঃ ঠিক তোমার মতো-

অনন্ত ঃ ঠিক বলেছো। এখন যেমন আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না- যাবো কি যাবো না।

শিলা ঃ কোথায়? কেন?

অনন্ত ঃ সুশান্ত এসেছিল। কাল-

শিলা ঃ হঠাৎ-? আবার কোনও পার্টি প্রোগ্রাম?

অনন্ত ঃ হ্যাঁ- আজ বিকেলে?

শিলা ঃ তোমাকে যেতে বলেছে তো?

অনন্ত ঃ হ্যাঁ—

শিলা ঃ তুমি যাবে না। না- যাবে না। এই অবস্থায় কে আক্রান্ত কে আক্রান্ত নয়- কেউ জানি না। না হচ্ছে ঠিক মতো টেস্ট না হচ্ছে ঠিক মতো চিকিৎসা। শেষে অতো লোকের মধ্যে গিয়ে তোমার যদি কিছু হয়ে যায়?

অনন্ত ঃ ঠিক- আমিও ভাবছি- আমি যাবো না- কিন্তু সেটা অন্য কারণে।

শিলা ঃ মানে?

অনন্ত ঃ সুশান্তরা আজ বিকেলে পার্টি অফিসের সামনে ত্রাণ বিলি করবে- সেখানে আমাকে যেতে বলেছে।

শিলা ঃ ত্রাণ দেওয়ার জন্যে? মঞ্চে উঠবে? হুঁ- নিজের ঘরের চাল ফুটো-অন্যের ঘরে খড় নিয়ে যায়। ত্রাণ বিলির সময় মনে হবে না- ক'টা দিন পর- আমরা কি খাবো?

অনন্ত ঃ ত্রাণ তো তাদেরই পাওয়া উচিত যারা কাল বা পরও খায় নি- আজও কোথা থেকে খাবার জুটবে জানে না। আমাদের তো-

শিলা ঃ অবস্থা অনেক ভালো - তাই না? প্রায় আদানি-আম্বানীর কাছাকাছি। তাই অন্যের হাতে ত্রাণ তুলে দিয়ে গণশক্তিতে কালকের কাগজে ছবি হবে। কিন্তু তোমার দু'দিন বাদে কি ভাবে চলবে তা ভাববে না- তাই তো?

অনন্ত ঃ না সমস্যাটা আমার সেখানে নয়। ওরা আমাকে ত্রাণ দেওয়ার জন্যে মঞ্চে তুলবে না। ওরা চাইছে আমি ত্রাণ নেওয়ার জন্যে সবার সাথে লাইনে দাঁড়াই।

শিলা ঃ সে তো খুব ভালো কথা- সত্যিই তো আমাদের ত্রাণের এখন দরকার।

অনন্ত ঃ হ্যাঁ দরকার। কিন্তু আমাদের চেয়েও অনেক বেশী দরকার যে মানুষগুলোর তাদের সংখ্যা হাজার। তাই —

[পকেট থেকে কুপনটা বার করে]

এই কুপনটা হাতে নিয়ে আমি ত্রাণের লাইনে দাঁড়াবো কি দাঁড়াবো না সেটাই কাল থেকে ভাবছি।

শিলা ঃ কেন?

অনন্ত ঃ আমার মনে হচ্ছে এ ত্রাণ নেওয়ার অধিকার আমার নেই।

শিলা ঃ তাই কি? নাকি সমস্যাটা ইগো'র?

অনন্ত ঃ ইগো—? আমার-? হাঃ হাঃ হাঃ

শিলা ঃ ছোট কারখানা - হাতে গোনা লেবার-তবু ম্যানেজার তো? সেই ম্যানেজার এর ইগোতে লাগছে আর পাঁচটা মানুষের সাথে ত্রাণের লাইনে দাঁড়াতে - তাই না?

অনন্ত ঃ এই হতাশ গোমরা মুখো সময়েও হাসি পাচ্ছে। হ্যাঁ ভীষণ হাসি পাচ্ছে। দুটো কথা যদি আমি বলি শোনার মতো একটু সময় তোমার হাতে আছে কি?

শিলা ঃ দিতে পারতাম না- কিন্তু আমাদের আদুরে ছেলে নিজে আজ বাসন মাজতে লেগেছে। ভালোই হয়েছে- কিছু একটা করুক। তাই তোমার কথা শোনার মতো সময় আগে যেমন ছিল - এখনও আছে। বলো-

অনন্ত ঃ আমি মার্কসবাদ ঘেঁটে তা করিনি। কম্যুউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহারের একটা লাইনও আমি পড়িনি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে ত্রাণ মানে ভিক্ষে। সেটা সরকারেরই হোক বা আমার পার্টির। এতো দিনের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে থাকা এতাদিনের আমার কমরেডদের দুঃখ কষ্ট দেখে

আমার মনে হয় - আজ আর ভিক্ষে চাওয়ার কোনও মানে নেই - সময় এসেছে - কেড়ে খাওয়ার।

শিলা ঃ কিন্তু এখন যে দুঃসময়-

অনন্ত ঃ দুঃসময়টাই আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষের সু-সময়। পার্টির কি উচিৎ ছিল কি উচিৎ ছিল না এ সময়ে এর ওর কাছ থেকে হাত পেতে কিছু টাকা নিয়ে কিছু মানুষকে ত্রাণ দিয়ে হিরো না সেজে - কেড়ে খাওয়া - একটা কেড়ে খাওয়ার লড়াই- আগেও তো আমরা করেছি- আর আজও সেটাই আমি চাই। তাই ত্রাণের লাইনে আমি দাঁড়াতে চাইছি না।

শিলা ঃ তার মানে ত্রাণ নিতে তুমি যাবে না?

অনন্ত ঃ না, যাবো না।

শিলা ঃ আজ বাদে কাল তোমার সংসারটা কিভাবে চলবে- তোমার বৌ, তোমার ছেলের মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে পারবে না জেনেও তুমি যাবে না?

অনন্ত ঃ না- যাবো না।

শিলা ঃ অদ্ভুত। নিজেই বলো অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লড়াই। লড়াই কি শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে - মুক্তির সংগ্রামে।

অনন্ত ঃ নিজের পেট ভরাতে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়াটাও লড়াই নয়- না বামপন্থীদের কাছে নয়।

[মঞ্চে ঢোকে অম্বর]

অম্বর ঃ মা - তোমার কাল রাতের এঁটো বাসন সব মেজে দিয়েছি মা। হাঁড়ি, কড়াই-থালা-

শিলা ঃ সত্যি— !

অম্বর ঃ কিছু একটা তো করি।

শিলা ঃ তোর মতো মেধাবী ছেলে কিছু একটা করার জন্য ঘরের বাসন মাজবি?

অম্বর ঃ তাহলে কি করবো? বাড়ির বাজারটা করতে পারি। কিন্তু বাজার করতে যে টাকা লাগে সেটা আমার কাছে তো নেই-ই তোমাদের কাছেও নেই। ঘরের সামনে পিছনে একটু জমিও নেই যেখানে লঙ্কা, পটল, কুমড়ো কি লাউ এর চাষ করবো। তবে করবো টা কি?

শিলা ঃ সত্যিই তুই কিছু করতে চাস?

অম্বর ঃ হ্যাঁ, মা- চাই-চাই- বসে থেকে থেকে ঘর থেকে বেরুতে না পেরে আমি আর পারছি না। কিছু একটা না করতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাবো— নয়তো গলায় দড়ি দেবো।

শিলা ঃ বাবু—

অম্বর ঃ ভাবো মা- এক বছর- দু বছর- এই অতিমারি বিদায় নেবে কিন্তু আমাদের কি হবে? আমরা যারা চাকরি খুঁজছি তারা তো বাতিল হয়ে যাবো-যে ছলেমেয়ে গুলো আজ আমার মতো লেখাপড়া করে বড় হতে চায় তারা কি করবে?

স্কুল কলেজ বন্ধ- কোচিং বন্ধ-পরীক্ষা বন্ধ-সে যে যোগ্য সেটা তারা কি ভাবে প্রমাণ করবে?

অনন্ত ঃ তবু তো ওদের হাতে অনেক সময় আছে— তোর হাতেও আছে। কিন্তু আমার কথা ভাব। আমাদের মতো মানুষদের কথা ভাব। নতুন কিছু করবো সে বয়েস নেই- নতুন কোনও চাকরীর সুযোগ নেই। এমন কি- ট্রলি ঠেলে মাছ বা সব্জী বিক্রি করবো শরীরের সে জোরও নেই।

শিলা ঃ তাহলে সিদ্ধান্তটা কি! শেষ সিদ্ধান্ত। তিনটে শক্ত দড়ি?

অম্বর ঃ আত্মহত্যা? না- না- আমি বাঁচতে চাই-

শিলা ঃ কিন্তু কিভাবে? ঘরে খাবার নেই- সংসারের কোনও রোজগার নেই। সামান্য দুটো মোটা চালের ভাত- একটা রুটি - না পেলে বাঁচবো কি করে- আমরা- আমরা সবাই।

অম্বর ঃ পথ নিশ্চয়ই আছে- সেটা খুঁজে বার করতে হবে।

শিলা ঃ সেই পথ খোঁজার সময়টাতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সামাজিক কিছু সাহায্য যদি হাতে আসে সেটা আমরা নেবো না?

অম্বর ঃ মানে?

শিলা ঃ আজ বিকেলে আমাদের পার্টির যুব দল থেকে ত্রাণ দেবে। আমাদের বাড়িতে পার্টির পক্ষ থেকে ত্রাণ নেওয়ার জন্যে একটা কুপন দিয়েও গেছে- সেই ত্রাণ আনতে তুই যাবি?

অম্বর ঃ আমি?

শিলা ঃ কেন নয়? তুই তো কাজ খুঁজছিলি- এটাও তো কাজ - পরিবারকে বাঁচাতে।

অম্বর ঃ ঠিক-ঠিক-এ কাজটা আমি করবো, কিন্তু ত্রাণে কি দেবে? চাকরী? লেখাপড়ার আরও সুযোগ?

অনন্ত ঃ না- ডাল-সয়াবিন-তেল-সাবান-আরো কিছু।

শিলা ঃ ওগুলোই তো এখন সবচেয়ে দরকার। যা বাবা - যা-।

অম্বর ঃ হ্যাঁ, যাবো- নিশ্চয়ই যাবো। পাড়ায় সবার সাথে দেখা তো হবে। কিন্তু মা যাবোটা কোথায়?

অনন্ত ঃ আমাদের দলের এরিয়া কমিটির ভেঙে দেওয়া অফিসের সামনে - খেলার মাঠে।

অম্বর ঃ সেটা যেন কোথায়? এ.জে.সি. বোস রোডে - যেখানে আমার ইন্টারভিউ হওয়ার কথা ছিল। না- না- ছিল কেন, আছে তো, ট্রেন চালু হলেই-। আচ্ছা বাবা একটা গাড়ি ভাড়া করা যায় না? টোটো - কিম্বা অটো। আমার সব পরীক্ষার দিনগুলোতে তো তুমি ভাড়া করে দিতে কোনও একটা গাড়ি।

শিলা ঃ সে সব পড়ে হবে- এখন যা তো বাবু- ব্যাগ দিচ্ছি - ত্রাণের জিনিষগুলো নিয়ে আয়।

অম্বর ঃ হ্যাঁ, যাবো তো- কিন্তু কোথায় যাবো- কিভাবে যেন যাবো?

অনন্ত ঃ দেখো শিলা- আমার মনে হয় না- একে ওকে পাঠানোটা ঠিক হবে। ও যদি পথ হারিয়ে ফেলে?

শিলা ঃ তুমি সঙ্গে যাও —

অনন্ত ঃ আমি?

শিলা ঃ ছেলে যদি পথ হারায়-বাবারই তো দায়িত্ব তাকে পথটা চিনিয়ে দেওয়া।

অনন্ত ঃ হা-রে-শেষমেশ-আমাকে তুমি ত্রাণের লাইনে পাঠাবেই- তাই তো?

শিলা ঃ বুঝেছি। থাক— তোমাদের কাউকে যেতে হবে না- আমি একাই যাবো।

অম্বর ঃ না- মা- তুমি গেলে আমিও যেতে পারবো।

শিলা ঃ এই বয়সেও মায়ের আঁচল ধরবি? লজ্জা করবে না?

অনন্ত ঃ তাই বলে তুমি একা?

শিলা ঃ কেন? আমার প্রিয় কবিই তো বলেছেন- [গেয়ে ওঠে]
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে- [গান চলতে চলতেই]

অনন্ত ঃ সত্যিই তুমি পারো- এই সংকটেও গান?

শিলা ঃ ক্ষতি কি বেসুরো তো গাইছি না-[আবার গানটা শুরু করে... একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে]

অম্বর ঃ মা-

শিলা ঃ বল বাবু—

অম্বর ঃ আমিও যাই না- তোমার সাথে- না হাত ধরবো না পাশে পাশে যাবো- মা আর ছেলে- দুজন মিলে তো আমরা একই-। তাই দুজনে এক সাথে গেলেও তো আমরা দু'জনে মিলেই গাইতে পারি-
" যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে ....
[অম্বরের সাথে শিলা- সুর মেলায় এই গানে প্রাসঙ্গিক অংশ যেটা এ নাটকের সাথে মিলে যায়। গান চলতে চলতেই - কোনও নেপথ্য আবহ ছাড়াই আলো নেভে- নেপথ্যে গানটা চলতে থাকে]
[আলো জ্বলে- সন্ধ্যের আলো-মঞ্চে একা অনন্ত]

অনন্ত ঃ অদ্ভুত। সেই বিকেলে গেছে এখনও ফেরার সময় হলো না। কতো লোককে ত্রাণ দিচ্ছে এরা? কতো হাজার জনকে যে সেই বিকেলে বেড়িয়ে এখনো ফিরতে পারলে না। এইদিকে একটু চা- সন্ধ্যেবেলার অভ্যেস। সে খেয়াল তেনার আছে? [নেপথ্য আবহ]
[অনন্ত নিজের মনেই বলে] এই এই অনন্ত - আচ্ছা মাল তো তুমি। নিজে একটু চা করে খেতে পারো না আর বড় বড় কথা বলো। বড্ড বড়ো বড় কথা - কেড়ে কারো লড়ে যাবে। যাও লড়ে যাও- একদিন অন্তত এক কাপ চা নিজের জন্য বানিয়ে এটা প্রমাণ করো যে ইচ্ছে করলেই যেকোনও

অবস্থাতে - যেকোনও খারাপ সময়েও তুমি সময় এর সাথে লড়াই করার জন্যে তৈরী। হোঃ কিচ্ছু পারবে না কিচ্ছু না- ভিক্ষে করতেও পারবে না- কেড়ে খেতে তো পারবেই না। তাহলে তোমার শেষটা কি ? এক গাছা দড়ি, না লড়াই এর ময়দান! অনন্ত বলো- কথা বলো। নয়তো মরো- হ্যাঁ মরো- মরেই তো আছো- জন্মের পর দিন থেকেই তো মার আছো- তুমি, তোমার মতো গরীব হাভাতে মানুষগুলো যারা শুধুই স্বপ্ন দেখে যায় - কাজে কিছুই করতে পারে না। তোমার সবই ভালো হে অনন্ত- তোমার মরাই ভালো- তুমি মরলে তবেই বাঁচবে। [একটু সময় নিয়ে - যেন মরার প্রস্তুতি নিচ্ছে] কিন্তু ওরা ঘরে নেই - ওরা না আসা পর্যন্ত আমাকে তো অপেক্ষা করতেই হবে। কেন এতো দেরি হচ্ছে ওদের ? কোনও বিপদ আপদ হয়নি তো ? হতেই পারে-তাহলে আমি কি বেরিয়ে দেখবো ? [হেসে ওঠে] হাঃ হাঃ হাঃ অনন্ত একটু আগেই তো মরার চিন্তা করছিলে- মরে গেলে বৌ এর কি হলো - দেশের কি হলো - সে সব মাথায় আসে বলো ? আসলে তুমি মরতে পারবে না। অনন্ত এখনও তোমার মনের মধ্যে বৌকে নিয়ে চিন্তা- ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা। না- তোমার মরণ নেই- অপেক্ষা তোমাকে করতেই হবে অনন্ত- তোমাকে জেগে থাকতেই হবে। কিছুটা সুদিন এ সংসারে না এলে তুমি মরতে কোন আহ্লাদে ? এদের বাঁচিয়ে রাখার দায় তোমার নয় ? ওহে অনন্ত তুমি কি একা ? আত্মসুখী হয়ে মরতে চাও ? নাকি সবাইকে সাথে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে চাও ? নিজেকে বামপন্থী ভাবো আবার পালিয়ে বাঁচতে মরতে চাও ? তোমার লজ্জা করে না ? এরপরেও তুমি বলবে তুমি সত্যিই এখনও বেঁচে আছো ? অনন্ত- ? মঞ্চে গান গাইতে গাইতে ঢোকে শিলা আর অম্বর গান রবীন্দ্র সঙ্গীত

আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলো
আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো-

অম্বর ঃ [একা] নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি ?

শিলা ঃ উঁহু- হলো না- সুরটা ঠিক তোর গলায় এলো না ? এটা হবে — [গেয়ে ওঠে]

নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি ? দেখতে
তোমায় না যদি পাই- নাই বা দেখি—

[এবার অম্বর-শিলা কোরাসে]

ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া

ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া
বজ্রশিখার এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা - কালো-
আগুন জ্বালো - আগুন জ্বালো-

[উল্লসিত শিলা-অম্বর। অম্বর যেন আগের নিজেকে খুঁজে পেয়েছে]

অনন্ত ঃ বন্ধ করো তোমাদের আহ্লাদ। এই অসময়ে এতো উল্লাস তোমাদের আসে কোত্থেকে- বুঝি না।

শিলা ঃ আমাদের উল্লাস- আমাদের আনন্দ থেকে।

অনন্ত ঃ আনন্দ? এই অন্ধকারে- এই বদ্ধ ঘরে?

শিলা ঃ আনন্দ কি পায়ে হেঁটে ঘরে ঢোকে? তাঁকে খুঁজে এনে আদর করে ঘরে বসাতে হয়।

অনন্ত ঃ এতো কাব্যি আমার মাথাতে আসে না। ত্রাণ পেয়েছো? এতো দেরী হলো যে- অনেক মানুষ এসেছিলেন- তাই না?

শিলা ঃ মানুষ মানে— ! মেলা। যারা ত্রাণ দেবে তারা এসেছে- যারা নেবে তারা- আর এসেছে সেই সব মানুষ যারা আমাদের ভালোবাসে— আমাদের পার্টিকে ভালোবাসে।

অনন্ত ঃ তুমিও গ্যাস খেয়ে ওদের সাথে মেতে গেলে তো? এদিকে আমি ঘরে বসে টেন্‌শান করছি। কোথায় গেলো- এতো দেরি হচ্ছে কেন? সঙ্গে আমাদের অম্বর— সে অসুস্থ।

অম্বর ঃ না বাবা আমি আর অসুস্থ নই—আজ থেকে আমি পুরোপুরি সুস্থ।

অনন্ত ঃ ঐ ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে —নাকি একসাথে অনেক মানুষকে দেখে?

শিলা ঃ না-মা-বেটাতে আজ একটা কান্ড ঘটিয়েছি- আর তারপর থেকেই-
[গেয়ে ওঠে] [অম্বর গলা মেলায়]

ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া-
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া-

অনন্ত ঃ এতো পুলক কেন? অনেকদিন পর ঘরে একটু ডাল-সয়াবিন-তেল এসেছে বলে?

শিলা ঃ একদম না- এই দ্যাখো আমাদের ব্যাগে কিচ্ছু নেই।
[ব্যাগটা দেখায়]

অনন্ত ঃ পথে এসো- তোমরাও আমার মতোই শেষমেশ বুঝেছো যে একদিনের ত্রাণটা কোনও সমাধান নয়।

শিলা ঃ না আমরা ত্রাণ নিয়েছি। অনেক বড় লাইন ছিল। ছিল কোভিডের হুমকি- লক্‌ডাউনের ভয়- তাই সাদা গোল গোল বৃত্তের মধ্যে একটা একটা করে দাগ

পেরিয়ে কখনো আমি-কখনো অম্বর- পৌঁছে গেলাম ত্রাণের টেবিলের কাছে। ত্রাণ নিলাম ব্যাগ ভর্তি করে নিলাম- কিন্তু —

অন্ত ঃ কিন্তু—?

অম্বর ঃ না মা— তুমি বলবে না। আমি বলবো- শেষটুকু আমি বলবো।

শিলা ঃ তাই? তো বল্।

অম্বর ঃ ত্রাণ নিয়ে আমি আর মা ফিরছি-ফেরা পথে হঠাৎ দেখি সৌম্য জেঠু - বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে চেয়ে- মা বল্লো-

শিলা ঃ সৌম্য দা - একা একা এভাবে বারান্দায় বসে?

অম্বর ঃ সৌম্য জেঠু বল্লো- কি করি বলো তো শুধু চাল চিবিয়ে পেট ভরে না। তোমাদের দলের মতো আমাদের দলে তো এসব ত্রাণের কোনও গল্প নেই। থাকবে কি করে? সবাই তো— ছেড়ে দাও- মেয়ে আর বৌ গেছে কাউন্সিলারের কাছে। যদি এই গত্ত তিনটে বোজানোর জন্যে চাল ফোটাবার কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

শিলা ঃ এরপরেও চুপ থাকা যায়? জানি না তো ওদের ঐ কাউন্সিলার হয়তো এখন আর ওদের চিনতেই পারবেনা। তাই—

অম্বর ঃ তাই মা আমাদের ত্রাণটা পুরোটাই জ্যেঠুকে দিয়ে এসেছে।

শিলা ঃ ভালো করিনি বলো? দল বড়ো না ক্ষিধে বড় বল?

অনন্ত ঃ ঐ সৌম্য মালটাকে নিজেদের লাইনে দাঁড়িয়ে এতো কষ্ট করে নিয়ে আসা ত্রাণ দিয়ে দিলে? ওকে তুমি চেনো না? সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের মতো মানুষদের আদ্যশ্রাদ্ধ না করে ও জলটা পর্যন্ত মুখে দেয় না।

শিলা ঃ নাই দিতে পারে — তুমি ট্রেড ইউনিয়ান করতে- তুমি জানো না—? বেশীরভাগ মানুষই কারখানায় বামপন্থী আর ভোটের সময় দক্ষিণপন্থী। তাও তো সৌম্যদাকে চেনা যায়। সাদামাটা মানুষ- কোনও মুখোশ পড়ে তো থাকে না।

অনন্ত ঃ তাই বলে—

অম্বর ঃ ছাড়ো না বাবা— বেঁচে থাকার ইচ্ছে যদি থাকে। ঠিক বেঁচে থাকা যায়। আনন্দেই থাকা যায়। আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে- কিভাবে এই সংকটে সৎভাবে দু'চার টাকা রোজগার করা যায়।

শিলা ঃ তিনজনে একসাথে চেষ্টা করলে নুন ভাতের ব্যবস্থা করতে পারবো না? আমাদের বুদ্ধি দিয়ে- আমাদের পরিশ্রম দিয়ে।

অনন্ত ঃ তোমাদের মতো এতোটা আশাবাদী আমি হতে পারবো না।

শিলা ঃ পারবে না কারণ আশা করার মতো সাহস তোমার নেই। অথচ তুমি নিজেকে বলো বামপন্থী— এক সময় তো চিৎকার করে বলতে আমি কমিউনিষ্ট।

অনন্ত ঃ সে আমার ছাত্রজীবনে। যখন সত্যিই স্বপ্ন দেখার মতো সাহস আমার ছিল।

অম্বর ঃ সেই সাহসটা আজ আমাদের আবার ফিরিয়ে আনতে হবে বাবা।
হেরে গেলে তো হেরেই গেলাম-মরেই গেলাম।

শিলা ঃ ঠিক— (গেয়ে ওঠে)
স্বপ্ন দেখার সাহস করো-
স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচে কি? (শুভেন্দু মাইতি)

অনন্ত ঃ ইচ্ছে তো করে- চেষ্টা তো করি স্বপ্ন দেখতে। নতুন দিনের স্বপ্ন। কিন্তু কে যে আমার সব স্বপ্নকে ভেঙে চুরে শেষ করে দিয়ে যায়। (চিৎকার করে) এই শালা অনন্ত তোর লজ্জা করে না - তুই স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছিস? আরে যে ব্যাটা, যে মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে না সে তো মানুষই নয়- সে - সে—

শিলা ঃ বহুদিন আগে মরে যাওয়া একটা মানুষের কঙ্কাল।

অম্বর ঃ আমরা তোমাকে মরে যেতে দিতে পারি না বাবা।

অনন্ত ঃ কিন্তু বাঁচাতেও পারবি কি?

শিলা ঃ পারবো- একা পারবো না- সবাই মিলে পারবো।

অনন্ত ঃ সবাই? কোথায় সেই সব- সবাই। কেউ আর নেই।
(নেপথ্যে সুশান্ত অন্তু কাকু - অন্তু কাকু , আসবো?

শিলা ঃ সুশান্ত - এসো- এসো- ঘরে কিচ্ছুই নেই- তাই দরজা বন্ধ করারও কোনও বালাই নেই। চলে এসো- (সুশান্ত এসে ঢোকে)

অনন্ত ঃ সরি, সুশান্ত— তোমাদের ত্রাণের আসরে আমি যেতে পারলাম না। জানি না আমার ইগো'তে বাধলো নাকি আমার ব্যক্তিগত মতবাদ আমাকে আটকালো।

সুশান্ত ঃ আমি তো শুধু আপনাকে চাইনি। চেয়েছিলাম আপনাদের মতো প্রতিবাদী মানুষগুলোকে পাশে পেতে। সেটা তো হয়েছে কাকীমা গিয়েছেন- আমার অম্বর ভাই গিয়েছে।

অনন্ত ঃ গিয়ে কি লাভ হলো? লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিলো—

সুশান্ত ঃ হ্যাঁ- আমরা ইচ্ছে করেই কাকীমা আর অম্বরকে লাইনে দাঁড় করিয়েছি- যাতে সবাই --- আমাদের পার্টির কাছে সবাই সমান। সেখানে আমাদের কাছের মানুষ- আমাদের পার্টির কাছের মানুষ এসব কোনও ফেক্টরই নয়।

অনন্ত ঃ কিন্তু সেই ত্রাণ নিয়ে এনারা ঘরে এলেন কি? ফেরার পথেই তো—

সুশান্ত ঃ জানি- এটাও জানি- ফেরার পথে কাকীমা সব ত্রাণটাই আমাদের বিরোধী শিবিরের মানুষ কট্টর দক্ষিণপন্থী দলের সমর্থক সৌম্যদেববাবুকে দিয়ে এসেছেন। তো ক্ষতি কি? আমরা তো রং দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই না। ওনার কাছে ত্রাণ পৌঁছানো মানে তো ঠিক জায়গায় ত্রাণটা পৌঁছে যাওয়া। তাই না?

অনন্ত ঃ এই সময়ে ভালো মানুষ সাজা? কে বলেছে ওকে?

শিলা ঃ বলেছো তুমি- বলেছে আমাদের আদর্শ।

সুশান্ত ঃ ঠিক- আমরা কমিউনিষ্ট আমাদের আদর্শকে কেউ পাল্টে দিতে পারে না। আমরা কমিউনিষ্ট - তাই আমাদের কোনও অর্থ দিয়েই কেনা যায় না।

অনন্ত ঃ আমরা কমিউনিষ্ট - তাই না খেয়ে মরে গেলেও আমরা ভিক্ষে করতে বের হই না- যদি ক্ষমতা থাকে কেড়ে খাই।

সুশান্ত ঃ আপনার কি মনে হয় আমাদের এই ত্রাণ দেওয়া মানুষের কষ্টে তার পাশে থাকার চেষ্টা - এটা ভিক্ষে দেওয়া?

অনন্ত ঃ নিজের পরিশ্রমের বাইরে যা কিছু পেতে চাওয়া সে তো ভিক্ষেই—।

সুশান্ত ঃ এবার অন্য কথা বলি-। এই ত্রাণের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সংগঠনের মধ্যেও বিতর্ক আছে। আমাদের মতো যারা সিনিয়র- পার্টির মধ্যে- পার্টির সংগঠনে- এইভাবে- একদিনের জন্যে ত্রাণ না দিয়ে অন্য কিছু ভাবতে চাইছেন অনেকেই।

অনন্ত ঃ ভাবাই তো উচিৎ-।

অম্বর ঃ এবং ভাবনাটা নতুন হতে হবে।

সুশান্ত ঃ ঠিক। আপনি জানেন কাকীমা - আমরা আমফানের পর মানুষের কাছে গিয়েছি - দেখেছি মানুষ এখন আর ব্যবহার করা পুরোনো জামা প্যান্ট নিতে চায় না। তারা একটা হলেও নতুন জামা চায়- কারণ-

শিলা ঃ কারণ সেটা তার দাবী - স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে দাবী-। একটা নতুন জামা-এক মুঠো গরম ভাত।

অম্বর ঃ এবং সেই স্বাধীন দেশের যুব সমাজের একজন প্রতিনিধি হয়ে আমি বলতে চাই - ভিক্ষে চাই না- অধিকার চাই- নিজের যোগ্যতায় রোজগার করে বাঁচতে চাই।

সুশান্ত ঃ ঠিক তাই- এটাই আজ আমাদের লক্ষ্য- আর তাই কাল থেকে আর কোনও ত্রাণ শিবির আমরা করবো না।

অনন্ত ঃ এ বাবা তাহলে না খেতে পাওয়া মানুষগুলো?

সুশান্ত ঃ গতর খাটিয়ে খাবে। ত্রাণ বলুন - ভিক্ষে বলুন- মানুষকে অলস করে দেয়। তাই এবার থেকে ত্রাণ বন্ধ - শুরু হবে আমাদের নতুন ভেঞ্চার- শ্রমিক ক্যান্টিন।

শিলা ঃ মানে?

সুশান্ত ঃ আমরা আমাদের ওয়ার্ডে একটা ক্যান্টিন চালু করবো- আগামী পরশু থেকে- আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর বলিদান দিবসে।

অম্বর ঃ তাই ?

সুশান্ত ঃ আমাদের ক্যান্টিনে পাওয়া যাবে-ডাল-ভাত- সব্জী-মাছ কিম্বা ডিম- যদি

আমাদের কাজে ঠিক মতো সারা পাই তাহলে চিকেনও। তবে বিনে পয়সায় নয়- ভিক্ষে নয়- ত্রাণ নয়-মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে পেট ভর্তি ভাত খাওয়া। দুপুরে- রাতে।

অনন্ত ঃ তার মানে ভর্তুকি ? এতো টাকা জোগাবে কে?

সুশান্ত ঃ আপনারা।

শিলা ঃ আমরা- কিভাবে?

সুশান্ত ঃ একটা লড়াই এ শুধু তো অর্থ-ই সব নয়- শ্রমটাও লাগে- লাগে সদিচ্ছা। এই ক্যান্টিনের ম্যানেজার - আমাদের ওয়ার্ড কমিটি ঠিক করেছে - কাকিমা— আপনি আর কাকু।

শিলা ঃ দারুণ-দারুণ- আমি রাজী।

অনন্ত ঃ আর আমাদের গত্ত বোজানোর সে দায় কে নেবে?

সুশান্ত ঃ দু'বেলাই আপনাদের পরিবারের খাবার জোগাবে আমাদের শ্রমিক ক্যান্টিন। কোনও টাকা ছাড়াই - সেটাই হবে আপনাদের পারিশ্রমিক আর আপনাদের মতো প্রবীণ বামপন্থীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। কি অন্ত কাকু- ? মন কি বলছে- এটা ভিক্ষে?

অনন্ত ঃ দারুণ- এ এক নতুন লড়াই। আমি সব সময় থাকবো।

অম্বর ঃ কিন্তু আমি? আমাকেও তো কিছু করতে হবে। নইলে আবার সেই অন্ধকার।

সুশান্ত ঃ পাগল- আমরা আলোর পথযাত্রী- কাউকে- যে কোনও একজনকেও অন্ধকারে ঠেলে দিতে তো আমরা পারি না। তুমি ঘরে বসে পা নাচাবে- আর দু'বেলা তোমার খাবার ঘরে পৌঁছে যাবে তা কি হয়? কাকুর কথামতো কেড়ে খেতে না পারলেও রোজগার করে তো খেতে হবে।

অম্বর ঃ রোজগার-করবো- আমি?

সুশান্ত ঃ হ্যাঁ-তুমি-তুমি চার্টার্ড এ্যাকাউন্টটেন্ট পাশ করা ছেলে। নিজের শিক্ষাটাকেই তোমাকে কাজে লাগাতে হবে। তুমি এই শ্রমিক ক্যান্টিনের সমস্ত হিসেব রাখবে। এতো মানুষ টাকা দেবে চাল- ডাল- সজ্জী কনট্রিবিউট করবে- তার পাকা হিসেব রাখতে হবে না? না রাখলে আমাদের বিরোধীরা প্রচার শুরু করে দেবে- আমরা এইসব করে রোজগার করছি। তাই হিসেবটা ঠিক মতো রাখতে হবে- আর সে দায়িত্ব তোমার।

অনন্ত ঃ দারুণ- ভিক্ষে নয়- রোজগার- নিজের যোগ্যতা অনুসারে রোজগার- তাতে সেদ্ধভাত হলেও আমরা খুশি।

শিলা ঃ একটু ডালও হতে পারে।

অম্বর ঃ একটু মাছ হতেই বা ক্ষতি কি ? ভিক্ষে তো নয়- রোজগার।

শিলা ঃ ঠিক— এই দুঃসময়ে স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই তো আসল লড়াই- আর দেখো-

সে লড়াই এ আমরা জিতবো- হ্যাঁ জিতবোই- আমাদের সঙ্গে আমাদের -

সুশান্ত ঃ অম্বর রা আছে না- তাই আমরা জিতবোই।

অনন্ত ঃ শিলা!

শিলা ঃ (গেয়ে ওঠে)

স্বপ্ন দেখার সাহস করো-
স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচে কি?
স্বপ্ন ছাড়া কেমন করে
(গান চলতে থাকে) গান গাইবে পাখী?

(নির্দেশকের ভাবনা মতো শেষ দৃশ্য তৈরী হয়)

।। **পর্দা** ।।

লেখক ঃ **শিবংকর চক্রবর্তী,** পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যকার।

সুবলের কড়চা

শেখর দেবরায়

[পর্দা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে কীর্তন করছে, মূখ্যত সুবল ও শামু আনন্দে নামকীর্তন করবে।]

আলো আবহে পরিবর্তন

[নিম্নবিত্তের ঘরের। আভাস। সুবল দেহতত্ত্বের গান ধরে পাশেই তার প্রিয় খোল করতাল]

সুবল ঃ কান্দো কেন মন। কান্দিয়া কান্দিয়া যায় রে আমারও জীবন কান্দো কেন মন পাগলা রে।
দুঃখ - সুখের দুইটা ধারা বইছে নদীর জল
কে বাইবরে তোমার তরী কে এমন সুজন।
ভবতরী বাইমু আমি- তোমার ঠিকানায়
কান্দিয়া কান্দিয়া যায় রে আমার দুঃখেরও জীবন......
কই গো সন্টুর মা- আমার নীল রং এর সার্টটা পাইরাম না। কিতাগো, শুনরায় নি। শালা ফাটা সার্টের মত ফুটা জীবন। যেদিকে যাও হকল দিকে লাথ মুড়া।
(গানটা আবার গেয়ে উঠে)

কমলা ঃ অউ আবার শুরু করি দিলায় নি সংকীর্তন। কাজকর্ম কিচ্ছু নাই খালি কলকী ফুকানি আর যত ছোটলুকের লগে গুলবাজি।

সুবল ঃ ছোটলুক আবার কে? আমি যারার লগে থাকি তারা মনের দিক দিয় বহুত বড়লুক গো -----

কমলা ঃ আর লেকচার মারিও না- দিন -রাইত জান খাটাইয়া একলা সন্টুয়ে আর কতটা সামলাইত। হে যদি দুইমুট ভাতের ব্যবস্থা না করত তেইলে কিতা হইল নে একবার ভাবছ নি। (সুবল আবার গান ধরতে যায়।) চুপ কইলাম-ইতা দেহতত্ত্বের গান শুনাইয়া আমার মেজাজ চিড়াইও না (কমলার হঠাৎ যেন মাথা ঘুরায়)
আ: আ: মা- মাগো- (মাটিতে বসে পড়ে)

সুবল ঃ আরে- আরে কিতা হইল! মাথা ঘুরাইছে নি !! ইস্ - কতদিন কইছি ডাইবেটিক রুগী হইয়া অত মাথা গরম করিও না গো ---- নেও-একটু জল খাও -

কমলা ঃ (জল খায়) কিতা গো, তুমি কিতা কিচ্ছু বুঝলানি- সবে যে তুমারে কয় .... অন্যের কাছে অত ছোট হইরায় কেনে .....

সুবল ঃ অয় আমি হইলাম হক্কলের কাছে একটা বেকামা মানুষ..... অখন এই শরীর লইয়া কিছু করতেও পারি না, পুলাটার উপরে ভর করিয়া টিকি রইছি, আমার চায়ের দুকানটাও হাতছাড়া হই গেল, অখন কীর্তনেরও ডাক পাই না- আমি নু নার্ভের

রুগী, হাত কাঁপে। অখনও বার বার মন পরে-এই সুবলের চা সিঙ্গারা- আর কীর্তনের খোল-করতাল সব যেন আমার জীবনে একাকার হইয়া থাকত -- (কাশতে কাশতে বসে পড়ে)

কমলা ঃ ইস্- দেখোচেই ... কিতা যে করি তুমারে লইয়া। শুন- দুঃখের কথা কইয়া আমারে বুঝাইতে পারবায়... কিন্তু সবরে কেমনে বুঝাইবায় ......।

(কমলা সুবলের পাশে যায়, দুজনের অঙ্গরঙ্গতা ধরা পরে। এমন সময় সুবলের বন্ধু শামু প্রবেশ করে)

শামু ঃ সুবলদা! এ রাম- বেটাইমে আই গেছি! আইচ্ছা অখন যাই, পরে আইমু নে ....

(প্রস্থানোদ্যত)

সুবল ঃ (কমলার হাত ধরে তুলতে যায়, কিন্তু কষ্ট হয়) উঠগো .... উঠ ......

শামু ঃ (কমলার দিকে এগিয়ে গিয়ে) - বৌদির কিতা হইছে?

কমলা ঃ (ধমকের সুরে) না - ধরতে লাগতো না। আমি নিজেই উঠতে পারি। .... (আস্তে আস্তে কমলার প্রস্থান)

শামু ঃ কিতা হইছে বা সুবলদা? কুন গড়বড় হইছেনি? আইজ দেখি বৌদি অত গরম।

সুবল ঃ তোর বউয়ের ডাইবেটিস্ আছে নি?

শামু ঃ না!

সুবল ঃ তাইলে বুঝবে কেমনে? শুন .... সুগার .... মানে

শামু ঃ চিনি!

সুবল ঃ দুর বেটা, ইতা তোর দোকানের চিনি না ..... ইতারে কয় ব্লাড সুগার .... রক্তে সরকরা ... বুঝচ।

শামু ঃ না।

সুবল ঃ দূর শালা— তোরে বুঝাইতে আমার কম্পাউন্ডার হইতে লাগব।

শামু ঃ কম্পাউন্ডার কেনে হইতায়। তুমি হইলায় এই তল্লাটের এককালে সেরা সুবল কীর্তনীয়া। (খোলের বোল বলে বুঝতে চাইবে) ধা - ধা- ধিনা, ধিন-ধিন-ধিনা (একসাথে দুজনে হাসতে থাকবে।)

কমলা ঃ (নেপথ্যে) - শুন, আর যদি কীর্তনো যাও তাইলে তুমার একদিন কি আমার একদিন ..... শামুরে কও, ভালো চায়তে যাইত গিয়া। নাইলে মুশকিল হইব।

সুবল ঃ নেও .... হইলোনি বর্ত .... বুঝ ঠেলা .... অখন কীর্তনের উপরেও লক্ডাউন হইগেছে।

শামু ঃ লক্ডাউন তো উঠি গেছে বা সুবলদা ......

সুবল ঃ হায়রে মাকাল, ইতা হইল সংসারী পেছর লক্ডাউন।

শামু ঃ সংসারী পেছ !!

সুবল ঃ বুরবক -মাথা মুটা। বেটা আধা বুঝছ—
আধা বুঝছ না।

শামু ঃ দেখবা — আওয়ার পর থাকিয়া খালি তেড়াবেড়া কথা কইরায়— আগে আমার কথা শুন (ভিতরের দিকে তাকায়)

সুবল ঃ ওই বেটা কিতা উকিঝুকি মারচ্, কিতার লাগিয়া আইছ্চ্ ইতাতো কইতে।

শামু ঃ দেখো- আমরার অখিলদার তো করোনা হইছে, চৌদ্দদিন বাড়ীত থাকিয়া বার হইতে পারত নায়। ইদিকে দুইটা নাম কীর্তনের ভালা বায়না পাইছি । - তুমি হইলায় আমরার পুরানা মানুষ। যদি ইবার আমরার লগে যাও তেইলে ভালা পেমেন্ট পাইবায় --- বুঝছনি।
(সুবল কোন উত্তর দেয় না) বেশীদূর যাইতে লাগত নায়। বাজারের প্রেসিডেন্ট এর বাড়ী- আর একটা সুনীল পালের বাড়ীত - শ্রাদ্ধ শান্তির হরি নাম কীর্তন.....।

সুবল ঃ অ....... দত্তবাবুর দুই নম্বরী চেলা অতার বাড়ীত ......

শামু ঃ নম্বরী দিয়া আমরার কিতা হইত। কীর্ত্তনের এড্ভান্সও দিলাইছে, তুমার টেকা পাইতায় দিয়া কথা।

সুবল ঃ না -হইত না। ইতার বাড়ীত আমি যাইতাম নায়। আমারে বাদ দে, শরীরও ভালা না, রাইত হইলে তোর বৌদি গরম হই যাইব। বুঝছ নানি- ডাইবেটিস্ নু ....।

শামু ঃ বৌদির কিতা রাইত হইলে ডাইবেটিস্ বারি যায় নি?

সুবল ঃ দূর বেটা... তোরে বুঝানি আমার বাপেরও সাধ্য নাই। যা- যা- অন্য কেউরে লই লা ....

শামু ঃ ইতা কর কেনে! কীর্তন করিয়া যদি দুইটা পয়সা রুজী কর তেইলে দুষের কিতা। ঘর-বাইরে কেউ তো তুমারে বেকামা কইত নায়।

সুবল ঃ (রাগত: স্বরে) কিতা কইলে? আবার - ক- ?

শামু ঃ (সহজভাবে) - বেকামা .... মানে যার কুন কাজ নাই....

সুবল ঃ অই শালা .... তুই আমারে কিতা কইলে ..... বেকামা .... !!!

শামু ঃ এরে - এরে ... তুমি দেখি ঠিকউ গরম হইগেলায়....

সুবল ঃ (চিৎকার করে উঠে) - তে কিতা করতাম। (মিউজিক)
দিন যায়- রাইত ফুরায় - অউ শ্মশানর চুলার দিকে চাই থাকি ..... জগৎ সংসার ছাড়ার আগে তোরা হক্কলে মিলিয়া আমারে ....।
(গলা ধরে আসে, শরীরে কাঁপুনি ধরে)
অই দেখ- ওখনো খোল-করতাল বাজাইতে পারি ....

শামু ঃ সুবল দা !!

সুবল ঃ চা-সিঙ্গারা সব বানাইতে পারমু- ওউরকম সব্জী দিয়া সিঙ্গারার পেছ দিতে পারি.....
(হাত কাঁপতে থাকে। কান্নায় গলা ধরে যায়।)
পারি- পারি- আমি সব পারি ....।

শামু ঃ সুবলদা একটু শান্ত হও। (ধরতে যায়)

সুবল ঃ না .... কেউর কোন সাহায্য লাগত না। আমি ওখনো সব- সব - সব- পারি .....!

(কমলার প্রবেশ)

কমলা ঃ কিতা হইছে গো তুমার.... ইরকম কররায় কেনে? মাথা ঠান্ডা করিয়া ইকানো বও।

সুবল ঃ না .... কেউর কিছু করতে লাগত না .....
আমি বুলে ..... বেকামা (কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান। মিউজিক)

শামু ঃ সুবলদার মনটা একদম ভাঙ্গি গেছে। যেদিন থাকিয়া দুকানটা হাতছাড়া হইছে-এরপর থাকিয়া যেন ....

কমলা ঃ ঠিক কইছ ভাই ..... । কত বছরের পুরানা চার দুকানটা আছিল। তাইনের হাতর চা-সিঙ্গারার কত কদর। অখন দত্তবাবু তারা ই জেগাত মল -মার্কেট বানাইরা। তুমার সুবলদারে একদিন দত্তবাবুয়ে ডাকিয়া কইলা — ই মার্কেটো যদি দুকান ঘর লাগে তেইলে কয়েক লাখ টেকা সেলামী দিতে লাগব। যদি পার তে কও - নাইলে জায়গা খালি করতে লাগব।
আইচ্ছা কও ..... আমরা অত টেকা কই পাইতাম। — শেষ -মেষ জায়গা খালি করতে লাগল- । পুরানা অউ স্মৃতি লইয়া দুঃশ্চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একদিন রাত্রে স্টোউক্ হই গেল। এরপর ঠাকুরের দয়ায় কুনমতে জানটা বাঁচল ...... কিন্তু হাত কাঁপানিটা আর ভালা যেন হইল না। (কান্নায় গলা ধরে আসে)

শামু ঃ ওয় বৌদি - সব হইল বিধির লিখন .... । দুঃখ আমরার লগ ছাড়তো চায় না। কিন্তু সব কিচ্ছুর পরেও যেন আমরা সায়- সম্মানে বাঁচতে পারি। ইটাউ দয়াল ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা।
আইজ যাই গো - যদি কিচ্ছু প্রয়োজন পরে তেইলে আপন ভাবিয়া খবর দিও।
(ভিতরের দিকে তাকিয়ে)
সুবলদা .... না থাউক........... । আই গিয়া ....

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে গান ভেসে আসে। কমলা ছেঁড়া শার্ট ভাজ করবে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সন্টুর প্রবেশ।)

সন্টু ঃ মা-বাবা কইগো। দেখো কিরকম ঝামেলা লাগাইছইন --।

কমলা ঃ ঝামেলা !! কিতা হইছে কইতে তো !

সন্টু ঃ বাবায় কিতা করছইন জানোনি...। কথা নাই- বার্তা নাই দত্তবাবুরে রাস্তাত পাইয়া উমা-ধূমা গাইল লাগাইছইন। তাইনরে বুলে পথ বওাইয়া আইচ্ছা কওচেই - ইটা একটা কথা হইল নি—
যে যার জেগাত -মার্কেট বানাইত না পুকুর কাটিয়া মাছ চাষ করত -তে তুমি ইতা কেমনে আটকাইবায়। দত্তবাবুর লগে যুক্তি -তর্ক করিয়া কুন সমাধান হইব নি। টেকার উপরে ঘুমাইন— তারা হইলা বড়লোক মানুষ ....
(পিছন থেকে সুবলের প্রবেশ)

সুবল ঃ না-সন্টু-না- তাইন হইলা বাটপার, - সুদকুর-ফপর দালাল। দয়ামায়া নাই, একজন ছোট মনের মানুষ—

সন্টু ঃ কেনে বাবা— অযথা গালিগালাজ করিয়া নিজের শরীর মনের যন্ত্রণা দেও। ইতা করিয়া কিতা তুমার দুকানের জায়গা ফিরাইয়া পাইবায় নি?

সুবল ঃ কিচ্ছু পাই না পাই— বেইমান রে অভিশাপ তো দিতাম পারমু।

কমলা ঃ কেনে দিতায় দত্তব্াবুর দয়া ছাড়া কিতা আমরা বাঁচিয়া থাকতে পারতাম না নি.....

সন্টু ঃ শোন বাবা - যেমন তেমন হউক টুকটাক করিয়া তো সংসার চালাইয়ার। বড় ডাক্তার- দামী দামী ঔষধ-পথ্য হয়ত কিনতে পাররাম না- তবুও তো কষ্ট করিয়া চলিয়া যাইয়ার। জানো মা-একটা ইন্সুরেন্স পলিসির লাগিয়া দত্তবাবুর কাছে গেছলাম— তাইনও কথা দিছলা আমার কাছে করবা—। কিন্তু বাবার এই ঝামেলার লাগিয়া তাইনও মুখ ফিরাই লাইছইন। কেনে বাবা—ইসব পুরানা স্মৃতি লইয়া অযথা কষ্ট পাইরায়?

কমলা ঃ দেখলায় তো তুমার লাগিয়া ছেলেটার কতবড় ক্ষতি হইল। শুন-আর যদি কুনদিন দত্তবাবুর ইদিকে যাও-তেইলে কিন্তু .....

সুবল ঃ (চিৎকার করে উঠে) যাইমু — আমার মন টানলে আমি আবার যাইমু— তুমরা কেউ আমারে আটকাইতে পারতায় না --- (রাগে - অভিমানে বাইরে চলে যায়)

দৃশ্যান্তর

(কোন রাস্তার মোড়ে, দুইদিক থেকে দত্তবাবু ও লালুর প্রবেশ)

লালু ঃ নমস্কার দত্তবাবু— অত হন্তদন্ত হইয়া কই যাইরা।

দত্ত ঃ আর কইছ না — এই লিফ্লেট বাটাইয়া মানুষ জুগাড় করাত বারহইছি। তরারে লইয়াই তো আমার কাজ। শুন লালু- জানছতো হক্কলতারে বাইর করতে লাগব। চুরি-ডাকাতি- ধর্ষণ-জমিদখল, করিয়া করিয়া আমরার মত নিরীহ মানুষরারে দেওয়ালো পিঠ লাগাই দিছে। ইদিকে বিরোধীপক্ষ হক্কলে একের পর এক মিটিং-মিছিল করের। কিন্তু সরকারের হাত শক্ত করার লাগিয়া আমরাও মিছিল বাইর করতাম-। শালা হিতা হকলে দেশ ছাই গেছে। অখন ঠেংগাইয়া ইতারে বাংলাদেশ পাঠাইতে লাগব। ভুলি গেলেনি - আমরানু খেদাখাইয়া শরণার্থী। বাপ-দাদার কষ্টের কথা মন রাখিছ। আর সামনাসামনি দাঁড়াইতে লাগব। আমরা আর কতদিন মুখ বুজিয়া সহ্য করতাম।

লালু ঃ দত্তবাবু আমি হইলাম ছোটখাটো মানুষ। বক্কর-চক্কর করিয়া দুইটা কামাই করিয়ার-তে অখন যদি দেশ গোলমাল শুরু হয়-তেইলে কিতা হইব.....

দত্ত ঃ দূর বেটা— বেবুঝ হইছ না। যেতা কইছি ইতাই কর। শুন লগে লগে থাকিছ তেইলে তোরারও লাভ হইব রে .... (হাসি) হে:-হে:-হে: - সরকারী ঋণ, পাক্কা ঘর পাইতে গেলে কিছু কাজ দেখাইতে লাগব- বুরবক যেদিকে পাল্লাভারী হিদিকে

থাকিছ— আইচ্ছা লালু-সুবলরে দেখছনি?

লালু ঃ ইদিকে মাঝে মধ্যে দেখা যায়। যেদিন থাকিয়া আপনে তার দুকান উঠাইদিছইন এরপরের থাকিয়া তার শরীরও ভালা যার না।

দত্ত ঃ হু- শুনছি সুবলের বুলে স্টোক্ হইগেছিল ....। আইচ্ছা - তুই ক আমি আর কিতা করতাম। টাউনের মধ্যে অত খালি জায়গা থাকলে প্রমোটারের তো চউক্ পড়ব। নাম করা এক প্রমোটার নিজে যাচিয়া আইয়া এগরিমেন্ট করলো- চাইরতলা বিল্ডিং সর্বমোট বেয়াল্লিশটা দুকানঘর। নানানি-বিনানি শোরুম খুলব। আইচ্ছা কচাই ইসবের লগে সুবলের টংগী চা -সিঙ্গারা দুকান মানাইব নি? তবুও তারে কইছলাম - পাঁচ - দশ লাখ টেকা জোগাড় কর- তেইলে একটা কুনাত কুনমতে বন্দোবস্ত করা যাইব। মাটির মালিক আমি- কিন্তু মার্কেটর মালিক তো প্রমোটার।

লালু ঃ ইতা আর কইয়া কিতা করতা। সুবলদার কপালো যেতা লেখা আছিল ইটাইতো হইল—।

দত্ত ঃ কিন্তু তার ছেংগা গুসা অখনও গেছে না। দেখলেউ বড় টেংরা টেংরা মাতে। আইচ্ছা নে ধর— লিফলেট ইটা ভালা করিয়া পড়িছ— আর বাটিয়াও দিছ। শুন লগে থাকিছ কিছু টেকাকড়ীও পাইবে। সরকারের সমর্থনে বাস ভর্ত্তি করিয়া গ্রাম-বাগান থাকিয়া হাজার হাজার মানুষ আইব, হতারে ইবার শায়েস্তা করার সময় আইছে। (লিফ্লেট গুলো লালুর হাতে দিয়ে) — কাইল একবার বাড়ীত আইছ—(প্রস্থান)

(লালু কাগজগুলো ভাল করে পড়বে, মনে মনে সমর্থন করার ইঙ্গিত)

শামু ঃ কিতা বা লালুদা! কিতা অত মন দিয়া পরবায়— দেখি দেখি — " হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, হিন্দু ছাড়া গতি নাই।" অঃ - বুঝছি দত্তবাবু আইছলা নানি? আইচ্ছা লালুদা একটা কথা কউচাই আমরার সুবলদা কিতা হিন্দু আছলা নানি? তারে কেনে বেঘর করলা! আসল কথা হইল মাল বানাইবার সময় হিন্দু- মুসলমান - ভাই ভাই - কুছ পরোয়া নেহী। তখন খালি টেকার রং দেখলেই হয় .....।

লালু ঃ আইচ্ছা শুন, দত্তবাবুয়ে কইছইন সরকারের সমর্থনে মিছিল বার হইব, লগে থাকলে লাভ হইব।

শামু ঃ কিতার লাভ?

লালু ঃ কত শত সরকারী স্কীম আইব — বৃদ্ধভাতা, কিষাণভাতা, পাক্কাঘরবাড়ী- আরোও আছে ....

শামু ঃ বুঝছি .... স্বপ্নের কারবারী হকলে তুমার মাথাতও ঢুকাইছে নানি?

লালু ঃ দত্তবাবুয়ে কইছইন — ইলেকসন আর। অখন একটু সরকারের লাগিয়া কাজ-কর্ম দেখাইতে লাগব। মানে একটু তারার লগে লগে আওয়া-যাওয়া করতে লাগব।

আমরা হইলাম, গরীব-গুব্বা মানুষ, লগে থাকলে লাভ হইব রে বেটা ....।

শামু ঃ বুঝছি- তুমি দত্তবাবুর জালো পুরা ফাসি গেছো। বেশী লুভ করিও না, পরেনু মাথাত থাবরাইবায়।

লালু ঃ দূর বেটা- তোর লগে মাতলেউ খালি বেড়াবেড়ি করছ। আরে দাঁড়া- আরেকটা কথা শুন- সুবলদার তো অখন কুন কাজ-কর্ম নাই। ভাবছি আমরার লগে সুবলদারে লইলাইমু।

শামু ঃ নিজের মাথা ঢুকাইছ অখন সুবলদার মাথাটাও খাইতায়নি ?

লাল ঃ তোর হইল লম্বা লম্বা মাত। কীর্তন করিয়া কতই আর রুজি করছ। অই দেখ দত্তবাবুয়ে লিফ্‌লেট দিয়া বুঝাইয়া গেছইন।

শামু ঃ সব বুঝছি- নেও অখন তারার লগে কাউয়ার মত কা-কা-কর। খালি মনে রাখিও ইতা লইয়া কারা বাটপারী করে —।

লালু ঃ বাটপারী ! ! বাদ দে বা — আমারে কিতা অতউ আউয়া পাইচুচনি— কুনদিকে থাকলে লাভ হইব ইতা আমিও কিছু বুঝি।

শামু ঃ তুমি কিতা বুঝ-ইতা আমিও বুঝি বা লালুদা। দত্তবাবুয়ে তুমারে স্বপ্ন দেখাইছইন - আর- আমি তুমারে বাস্তবটা কইলাম। অখন তুমি জানো - কার লগে থাকলে লাভ- না- লুকসান হইব। সময় আইলে সব বুঝবায়। — তবে একটা কথা — সুবলদারে আর কষ্ট দিও না। মানুষটা বড় অশান্তিত আছে রে বা—। অখন আই-
(লিফ্‌লেটগুলো লালুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে প্রস্থান করে)

লালু ঃ দূর শালা— উল্টাপাল্টা মাতিয়া মেজাজটা ছিড়াই দিলো। (দূরের দিকে তাকিয়ে) বাপ দাদা হকলে লাথমুড়া খাইয়া শরণার্থী হইছিল। অখন হতার হাত থাকিয়া দেশটা বাঁচাইচে লাগব .... [Music]
(লালুর উপর গোলাকার আলো পড়বে। পথচারী যাওয়া আসা করছে। লালু সবাইকে লিফলেট দিচ্ছে। কেউ পড়ছে - কেউ ফেলে দিচ্ছে।)
অইরে- অখনও বুঝতায় না- যেদিন ঘর ঢুকিয়া মারব, হেইদিন বুঝবায় রে মরার দল। নিজের ধর্ম বাঁচলে তুমি বাঁচবায় রে মরার দল । নিজের ধর্ম বাঁচলে তুমি বাঁচবায় - মনে রাখিও ....।
(একজন পথিক লালুর কথায় উৎসাহী হলে বলে উঠবে)

পথিক ঃ অয় দাদা- অউতো ঠিক কথা কইছইন। আমি আছি দাদা। খালি আওয়াজ দিবা- দল বল লইয়া আই যাইমু ......।

লালু ঃ সাব্বাস বাঘর বাইচ্চা। অউনেও ধর- ইতা লিফ্‌লেট তুমার এলাকাত বাটিয়া দিও। দত্তবাবুরে লইয়া যাইমু। তাইন আরো ভালা করিয়া বুঝাই দিবা। খালি মনে রাখিও -ইলেকসন আর - ইতারে যদি টাইট না দেও তেইলে সরাজীবন আফসুস করবায়।

পথিক ঃ হইব দাদা- আমরা আছি- লাভত নৌকাত চড়িয়া ছলাত ছলাত করিয়া। জুড়ছে বইঠ্যা বাইমু। হেইয়া ... হেইয়ারে ... হেইয়া ... হেইয়ারে ......

লালু ঃ জয় হউক.....। (দুইজন দুইদিকে প্রস্থান)

(আলো -আবহের পরিবর্তন, সুবল হতাশ মন নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ)

(সুবল একমনে গান ধরে)

সুবল ঃ তুমি সুজন কাণ্ডারী, নৌকা সাবধানে চালাও
মহাজনে বানাইছে ময়ূরপঙ্খী নাও।
বাঁইচা বাঁইচা পাইক খুলিয়া, নাওখানি সাজাও
চউক বুঝিয়া ছাড়ো নৌকা
সুযোগ যদি পাও।।
তুমি সুজন .... ময়ূরপঙ্খী নাও।।

কুনদিকে গেলে যে দিশাধারা পাইমু কিচ্ছু বুঝি না। মনের ভিতরে উচাটন লইয়া কেমনে এই জীবন কাটাইতাম ...... কাটা গায়ে লবণ দেওয়ার মত- চিনাজানা মানুষেও কয় আমি বুলে বেকামা ...... (MUSIC)

[এমন সময় রিক্সাওয়ালার সাথে একজন ভদ্রলোকের ঝগড়া শুরু হয়]

রিক্সা ঃ কিতা হইল বাবু! চল্লিশ টেকার ভাড়া বিশ টেকা দিলে কেমনে হইব। বাকী টেকা দিয়া যাইন তে ---

আকাশ ঃ বললাম আর একটাকাও দেব না ব্যস।

রিক্সা ঃ কেনে দিতানা। আমার ন্যায্য ভাড়া দিতানা কেনে?

আকাশ ঃ টুকটুকিতে কুড়ি টাকা নেয়- তোকে কেন বেশী দেব?

রিক্সা ঃ তেইলে টুকটুকি দিয়া আইলা না কেনে?

আকাশ ঃ পাইনি বলে তোরটায় উঠেছি।

রিক্সা ঃ শুনইন টুকটুকি চলে ব্যাটারি দিয়া,আমরা নু গতর দিয়া চালাই। কত আপ টানিয়া আইছি। দেইনবাবু- কেচাল করবা না।

আকাশ ঃ কি বল্‌লি! আমি কেচাল করছি। তোর এতবড় সাহস। জানিস্ আমি কে?

রিক্সা ঃ আপনে যেই হইন না কেনে- আমার নায্য ভাড়া দিয়া যাইতে লাগব।

আকাশ ঃ এক থাপ্পর লাগাব- হুস্ ঠিকানায় এসে যাবে-

রিক্সা ঃ এরে মুখো লাগাম দিয়া কথা কইবা - আমি আপনের কিনা গুলাম নায় - আর তুই -তুকারি করইন কিতা? রিক্সা চালাই করিয়া গাঙ্গে দিয়া ভাইস্যা আইছিনি?

আকাশ ঃ তবে রে ছোট লোক- (হাত তুলতে যাবে)

রিক্সা ঃ থামলা কেনে? মারিয়া দেখইন না - এরপরে - কিতা হয়। গরীব হইছি দেখিয়া আমরা কিতা মানুষ নানি?

আকাশ ঃ (বাধ্য হয়ে মাটিতে কুড়ি টাকা ছুড়ে দেয়) যা- ভাগ এখান থেকে-।

সুবল ঃ শুনইন দাদা - টেকাটা ভদ্রভাবে তার হাতো তুলিয়া দেইন। ইটা তার ন্যায্য পাওনা।

আকাশ ঃ ওরে বাবা এ দেখছি আরেক মাতব্বর- তুমি আবার কে হে

সুবল ঃ আমি যেই হই না কেনে- কাজটা কিন্তু ভালা করছইন না। কিতা হইল টলার মত আ-করিয়া চাই রইছইন কেনে-দেইন কইছি -

(আকাশ বাধ্য হয়ে টাকা তুলে দেয়)

আকাশ ঃ হু- আচ্ছা- তোদের চিনে রাখলাম, মামাকে বলে এমন চাটনী খাওয়াব- তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল।

সুবল ঃ মামা !! কে তাইন! কোন্ এলেকার জমিদার?

আকাশ ঃ বিধূ দত্ত- চিনিস্ উনাকে?

সুবল ঃ অ---- বেইমান বাটপার দত্ত.......... গরীবর পেটো লাথ মারিয়া বড়লুকি দেখায়–। যা - যা কইছ গিয়া -চাওয়ালা সুবল কির্ত্তনীরে ভালা করিয়া চিনে...।

আকাশ ঃ সুবল কির্ত্তনী! হু নামটা খুব ভাল করে মনে থাকবে। (গজ গজ করে বেরিয়ে যাবে)

রিক্সা ঃ দাদা! আমার লাগিয়া কেনেই বা ঝামেলা ডাকিয়া আনলা। অখন যদি কিচ্ছু একটা হয় তেইলে বড় কষ্ট পাইমু।

সুবল ঃ ডরাই গেলায় নি বা ....। তুমার কথা শুনিয়াই তো আগ বাড়লাম। দত্তবাবু (তীক্ষ্ম হাসি) আমারে দেখলেই কয় বেকামা সুবল কির্ত্তনী ......। জানো নি ভাই “ এই কথাটা শুনলেই আমার রক্ত চড়ি যায়। যে বেটায় আমার রুজি রোজগারের পথ বন্ধ করি দিল- তারে কিতা ইজ্জত করা যায় নি - তুমি কও?

রিক্সা ঃ ঠিক কইছইন দাদা- মান-সম্মান ইতা খালি টেকা দিয়া কিনা যায় না। নিজের আচার ব্যবহার দিয়া বানাইতে লাগে।

আপনার কথা মনো থাকব। যাই দাদা— আবার নিশ্চয় আপনের মত মানুষরা লগে কুন দিন কুন পথর মুড়ো দেখা হইব— ভালা থাকবা ...... (প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

(দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ কমলা ঘরে বসে উৎকণ্ঠা। আলো-আবহ পরিবর্তন)

কমলা ঃ সকাল থাকিয়া মানুষটা যে গেল, খাওয়া নাই-দাওয়া নাই-কিতা যে করতাম– সন্টু তাইনের একটু খবর কর.....। দুকানটা হাতছাড়ার পর থাকিয়া হাসিখুশি মানুষটা যেন কিরকম হই গেছে .....। মাঝে মধ্যে বড় দু:শ্চিন্তা হয় .... অসুস্থ শরীর লইয়া কিতাই বা করতা ....।

সন্টু ঃ তাইন কিতা কেউর কথা শুনইন নি ---- জল থাকিয়া কুম্ভিরের লগে লড়াই করা যায়।

কমলা ঃ ইতা কথা অখন রাখ। অইজ ডাইন চোখের পাতাটা বড় লড়ের ---- কোন কিচ্ছু হইল নি-------।

সন্টু ঃ যাইয়ার- আরে আমার মোবাইল আর সাইকেলের চাবিটা কই রাখলাম। আমারবেগটা দেখছ নি --

কমলা ঃ (বেগটা এনে দেয়)- নে ধর । একটু ভালা করিয়া খবর করিছ। দূর্গা - দূর্গা - মা বিপদনাশিনী - রক্ষা করিও গো মা —

দৃশ্যান্তর

(দত্তবাবু একটা Zonelight এ বসে আছেন। পাশে উনার ভাগ্না আকাশ সবকিছু বুঝিয়ে যাচ্ছে)

দত্ত ঃ কিতা নাম কইলায় ভাইগ্না?

আকাশ ঃ সুবল কির্ত্তনী ---- ইস্ তোমার নাম করে অভদ্রভাষায় যা খুশী কথা বললো। একটা আস্ত গোঁয়ার। ছোটলোক

দত্ত ঃ সুবল কির্ত্তনী ! দাঁড়া আজকেই তারে শিক্ষা দিতে লাগব। বড় বাড়ি গেছে -- । কম থাকতেই ইতারে সুন্দিবেতের মত মুচরাইয়া সুজা করতে লাগব। এক আনার মুরাদ নাই দশ আনার ডাক মারে। শালা বেকামার বাইচ্ছা।

আকাশ ঃ এখন তাহলে কি করবে মামা?

দত্ত ঃ ডেকা গরুয়ে বাঘ চিনছে না — কিন্তু অখন তো চিনতেউ লাগব। কালু (হাক দিয়ে ডাকবে। কালুর প্রবেশ)

কালু ঃ কইন কর্তাবাবু?

দত্ত ঃ শুন-অউ-সুবল কির্ত্তনীর করতালটা বাজাইতে লাগে আর, হারামী শামুর হারমোনিয়ামের ঘাট ইতাও একটু বেসুরা করি দিবে।— পারবে তো?

কালু ঃ আপনের হুকুম তালিম করাই তো আমার কাজ—। কইন কিতা করতে লাগব? (দত্ত বাবু কালুকে ইশারা করে মারার ভঙ্গি করবে। কালুও সম্মতি জানায়)

দত্ত ঃ আসলে আমরা একটা চেইন মানে - সিস্টেম মানিয়া চলি। কিন্তু কেউ যদি ইতা নষ্ট করিয়া দেয় তেইলে তো বিপদ। সাপে ফণা তুলার আগে-ইতার বিষ দাঁত ভাঙ্গতে লাগে। সুনীল পাল রে যেরকম টাইট করিয়া লইনো আনছি অখন তারারেও আনতে লাগব। আমরা যেমন উপরের আদেশ মানিয়া কাজ করি - ইরকম তারারেও করতে লাগব। এক কথা- এক বিচার। ইকান থাকতে হইলে ঘাড় কাইত করিয়া চলতে লাগব।
শুন সভাপতি সাহেবে কইছইন- ইলেকসনের পরেই তোর লাগিয়া পাক্কাঘর মঞ্জুর হইব। কিন্তু শেষ কথা হইল চেইন মানিয়া চলতে লাগব। আমার তো গুরুভক্তি দেখাইতে লাগে -তেইনা প্রসাদ পাওয়া যায়---- (হাসি)
হে-হে-হে শুন সাবধানে কাজটা করিছ। নে ধর (টাকা দেয়) হাত কাঁপে কেনে? ডরাছ নি?

লালু ঃ না কর্ত্তাবাবু- ইতা তো আমার বাউ-হাতর খেল্- হে-হে-হে-

দত্ত ঃ কাজ করতে পারলে বাকী সবতা পাইবে। মনো রাখিও সুবল আর তার সাকরেদ শামু সংকীর্ত্তনী হকলের নাম গানের ঢোলটা (আওয়াজ করে বলে উঠে) ব-ট- করিয়া ফাটাইয়া আইবে। হে-হে-হে-

লালু ঃ প্রণাম কর্তা-(প্রস্থান) (MUSIC)

দৃশ্যান্তর

(বিষাদগ্রস্থ মন দিয়ে গান গেয়ে ধীরে ধীরে সুবলের মঞ্চে প্রবেশ)

সুবল ঃ বিষদরে দংশন করে
ব্রহ্ম তালুতে-
তাগাবান্দি কুথায় বন্ধু
মাথায়-পায়ে-না-হাতে।

শামু ঃ সুবলদা- এরে!! সইন্ধ্যা হইয়ার-ইখানো একলা বইয়া কিতা কররায়-।

সুবল ঃ নারে ভাই- কিচ্ছু যেন ভালা লাগের না। ঘর-বাইর- করিয়াও কুন শান্তি পাইয়ার না। কুনকুন সময় মনে হয় সবতা ছাড়িয়া-ছুড়িয়া বিবাগী হই যাইতাম।

শামু ঃ ইতার লাগিয়া তো কইছি- আইজ রাইত কীর্ত্তনো চল। মনটা ভালা লাগব। একটু ভোলানাথর সিদ্ধি লইলে মন আরো চাঙ্গা হই যাইব।

সুবল ঃ মনের জুর না থাকলে শরীর চলে না। বড় উচাটন রে ভাই। আইচ্ছা রে শামু- মানুষ অত বেইমান হই যায় কেমনে?

শামু ঃ বেইমান- হে:-হে:-হে:(হাসি)। জানো সুবলদা তুমার কাছেই একটা গান শুনছিলাম—
" থাকিলে ডুবাখানা হবে কচুরী পানা
বাঘে-হরিণে খানা একসাথে খাবে না
বলি স্বভাব তো কখনো যাবে না—

সুবল ঃ আবার কিছু কিছু মানুষের অত সায় সম্পত্তি থাকতেও তারা আরও চায় কেনে?

শামু ঃ " জলের স্বভাব যেমন ধারা নিম্নে দিকে ধায়
আগুনের স্বভাব যেমন সবকিছু পুড়ায়
বিড়ালের স্বভাব যেমন হাঁড়ির পানে চায়
কখন শিকে পড়বে ছিড়ে
তারই লালসায়।"

সন্টু ঃ বাবা তুমি ইকানো! আর আমরা সারাদিন তুমার চিন্তায়— উফ্!! চল বাড়ীত চল। শামুকাকু তুমিও কিতা বা বাবারে একটু বুঝাইতে পারোনানি! বাবা একটা কথা কও চাই— তুমি জুর করিয়া নিজেরে অত দুঃখী সাজাও কেনে? আমি কিতা তুমারে খাওয়াইয়া রাখতে পাররাম না নি? যেতা হাত থাকিয়া গেছে গিয়া ইতার লাগিয়া আফসুস্ করিয়া কি লাভ। দত্তবাবুরে তো তুমি ভালা

করিয়া জানো— টেকার লাগিয়া তাইন কিতা না - করতে পারইন্। এর তুমার হার্টের কন্ডিশনটাও ভালা না-। অখন যদি কিচ্ছু আরেকটা হয় তেইলে আমি সামলাইমু কেমনে?

সুবল ঃ ঠিক কইচছ বাবা— সামলাইবে কেমনে ----- আমি যে সবের কাছে একটা বেকামা মানুষ ----।

সন্টু ঃ বাস্তবরে অস্বীকার করা যায় না বাবা ------। নেও অখন ঘর চল। - মায়ে সারাদিন কিচ্ছু- খাইচইন না।

সুবল ঃ (রূঢ়ভাবে) না আমি অখন যাইতাম না।

সন্টু ঃ (রাগ করে) তে কই যাইতায়----

সুবল ঃ কীর্ত্তনো যাইমু।

সন্টু ঃ না- তুমি আর কুন কীর্ত্তনো যাইতে পারতায় না---। তুমার নু ---- (বলেই থেমে যায়) সুজা আমার লগে ঘর চল।

সুবল ঃ (রাগমিশ্রিত অভিমানী মন) না - নু- কইছি। আমার যেখানো মন চাইব আমি ইকানো যাইমু। আমার চিন্তা তোরার আর করতে লাগত নায়।

সন্টু ঃ খালি বড় বড় কথা কইতে জানো------- শুন বাবা দুনিয়াটা অত সুজা না। দেখ গিয়া লালু কাকু তারা দত্তবাবুর লগে লগে থাকিয়া কিরকম মাল কামার— আর তুমরা দুইজন --------

(শামু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল কিন্তু সন্টুর কথায় রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে)।

শামু ঃ সন্টু!! অত সময় ধরিয়া চুপ করি রইছি। তার মানে এই না যে আমরাও লালু তারার মত দত্তবাবুর চেলা হইয়া টাউটি শুরু করতাম।

সন্টু ঃ (প্রত্যুত্তর দেয়) আমি আমার বাবার লগে মাতরাম— তুমি আবার মাঝখান দিয়া ফুড়ন কাটো কেনে? জানো নি — ইতার লাগিয়াউ তো মানুষে তুমরারে বেকামা কয়।

সুবল ঃ (রাগান্বিত হয়ে) মুখো লাগাম দিয়া মাতিছ। কাটাগায়ো লবন ছিটাস্ কেনে ------। আমারে - আমারে- কে বেকামা বানাইছে? (কেঁদে ফেলে)

শামু ঃ বাদ দেও বা সুবলদা — অবুঝ ভাবিয়া ইতা কথা ছাড়ি দেও----।

সন্টু ঃ ছাড়তায় কেনে? ? আমারে বুজাও। কেনে তারা তোমরারে ইতা কয়।

সুবল ঃ সন্টু (গর্জে ওঠে) চুপ কর—। আর একটা কথা কইলে বিপদ হইব----। (মারতে উদ্যত)

সন্টু ঃ (আঁতকে উঠে)— বাবা!!

শামু ঃ সুবলদা— মাথা ঠান্ডা কর- বও ইখানো। যা বাবা- ঘরো যা- তোর বাবার লাগিয়া দুশ্চিন্তা করিছ না। জানিয়া রাখিছ সন্টু— আমরা আমরার জগৎ লইয়া ভালাউ আছি। তবে দত্তবাবু তারার মত বাটপারী করতে পারতাম

নায় -----।

সন্টু ঃ (তাচ্ছিল্যের সুরে) হুঃ- থাক তোমরা- যে রকম মন চায় -

সুবল ঃ (দীর্ঘশ্বাস) — লালু তারা কামের মানুষ!! আর আমরা হইলাম তারার কাছে বেকামা ----। হায়রে নিজের সন্তানেও আমারে চিনলো না !! দিনে দিনে হাওয়া বদলী যায় রে শামু ----। কে আপন কে পর ইতাও যেন ধূয়াশা লাগে---। জীবন তরীর খাটো বইয়া অন্তর থাকিয়া কান্দিয়া উঠে ---

" বন্ধু এর লাইগ্যা রে -
আমার তনু জরোজর
মনে লয় ছাড়িয়া যাইতাম থইয়া বাড়ীঘর
বন্ধু তোর লাইগ্যারে—
সৈয়দ সামুরের কান্দইন নদীর পার বইয়া
পার হইমু পার হইমু করিয়া দিন তো যায় চলিয়া
বন্ধু তোর লাইগ্যারে——"

(পা-টিপে টিপে পেছন থেকে কালু প্রবেশ করে)

কালু ঃ কিতারে গাঞ্জুরী হকল--- ইখানো বইয়া কিতা তাউপেছ কররায়---- তুমরার লাগিয়া কিতা অখন ভদ্রমানুষে রাস্তাত চলাফিরা বন্ধ করি দিতনি?

শামু ঃ কিতা হইছে কালু ভাই?

কালু ঃ ভাই মারাইছ না বেটা—। সুবলরে জিগা কিতা করছে?

শামু ঃ কিতা বা সুবল দা— কিতা হইছে? কিচ্ছু কও না দেখি?

কালু ঃ হে আবার কিতা কইত? যেতা করার তো করি লাইছে? অখন মজা টের পাইত।

শামু ঃ কিতা তেরা তেরা মাতবা? যেতা কওয়ার সুজাসুজি কইতে পারো নানি?

কালু ঃ তুইও তো সিয়ানা কম না- দত্তবাবুরে লইয়া অত ঠেস্ দিয়া মাতস্ কেনে? মুরব্বি মানুষের লগে কিলা কথা কইতে লাগে ইতা জানস্ নানি? অত দেমাক দেখাস কিতা। শুন আমরা একটা সিস্টেম মানে চেইন মানিয়া চলি। যেখানো লাভ হয়- তারার লগেউ তো থাকতে লাগব—।

শামু ঃ শুন বা কালুভাই — তুমি তুমার মত চলো আমরা তো কুন বাধা দিছি না। কিন্তু আমরা কেনে দত্তবাবুর কথায় চলতাম? আমরা কিতা চোউক -কান বন্ধ করিয়া রাখছি নি। — শুন - তাওপ্যাচ আমরাও বুঝি—

কালু ঃ হু— কার লগে থাকলে লাভ হইব ইতা বুঝবে কেমনে? সাপে ফণা তুলার আগে বিষ দাঁত ভাঙ্গতে লাগে—আসলে তোরা হইলে এক একটা বেকামা-।

সুবল ঃ (গর্জে উঠে) অই বেজন্মার বাইচ্ছা— কিতা কইলে আবার ক ----

কালু ঃ একশবার কইমু---মারার কুন কাম নাই- তারারে কয় বেকামা -। [MUSIC] (সুবল কালুর গলা চেপে ধরে। শামু আটকাকে গেলে কালু একটা পাথর দিয়ে

শামুর মাথায় আঘাত করে। শামু ছিটকে পড়ে যায়। তারপর সুবলের তলপেটে লাথি মারে। শামু-সুবল দুইজন আহত। কালু যেন যুদ্ধজয় করে-- মুখে তীর্য্যক হাসি -শেষে ওদের উপর থু-থু ছিটিয়ে বেরিয়ে যাবে।

আলো -আবহের পরিবর্ত্তন। [MUSIC]

শামু ছট-ফট করতে থাকে। সুবলের সার্টেও রক্তের দাগ পড়বে।

সুবল ঃ শামু উঠ- চউখ খুল- তোর কিচ্ছু হইতে দিতাম না- কথা ক- শামু ----। (আর্তনাদ করে ডাকবে) -কেউ আছ নি বা --- একটু সাহায্য কর।

এমন সময় সন্টু আসে।

সন্ট ঃ বাবা! কিতা হইছে- তুমি কানরায় কেনে?

সুবল ঃ দেখ রে সন্টু - আমারে বাঁচাইতে গিয়া শামুয়ে মাইর খাইলো।

সন্টু ঃ কে মারছে?

সুবল ঃ বাটপার দত্তবাবুর দালাল - কালু।

সন্টু ঃ কালু !!

সুবল একটু উঁচু জায়গায় উঠে চিৎকার করে জানান দেবে।

সুবল ঃ (জাইন্যা রাখ রে ফফর দালালের বাইচ্ছা-। যতকিছু করছ না কেনে- তবুও আমরারে তোরার জালো ফাসাইতে পারতে না ---। আমরা নু তরার মত বিকি কাইছি না বে---

(শামুকে জড়িয়ে ধরে) - শামু উঠ ---- কথা ক ভাই -----

সন্টু চিন্তিত হয়ে একটু দুরে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুবল ঃ সন্টু - দুঃসময়ে দূরে থাকিছ না - একটু হাত বাড়া বাপ---

(শামুকে একা তুলতে যেন কষ্ট হচ্ছে)

সন্টু ঃ দাঁড়াও তুমি একলা পারতায় না-----

(শামু দু-জনের কাঁধে ভর করে বেরিয়ে যাবে) [MUSIC]

আলো আবহের পরিবর্তন।

শামুর মাথায় বেন্ডিস বেঁধে ধরাধরি করে সুবলের ঘরে নিয়ে আসে।

সন্টু ঃ মা — মা— বাবা তারা আইছইন—। শামুকাকু যন্ত্রণাটা একটু কমছে নি?

(শামু কথা বলে না। শুধু ইশারায় দেখায় -জল খাবে)

সন্টু ঃ মা- একটু জল দিয়া যাও-

কমলা ঃ (জল নিয়ে ঢুকবে) এ্যাঁ--- শামুর কিতা হইছে- ইস্ ইস্- কেমনে অইল? তুমার সাটো অত রক্ত কিতা? - সন্টু - কিতা হইছে- কথা কছ না কেনে?

সন্টু ঃ কইয়ার - আগে একটু শান্ত হও (জল এনে শামুকে দেবে) - ইদিকে আও শুন (একটা পাশে মাকে নিয়ে যাবে) বাবা তারা এক লগেউ আছলা— এমন সময় দত্তবাবুর সাকরেদ্ কালুর লগে কথা কাটাকাটি শুরু হয়- তারপরে হাতাহাতি—

[MUSIC] (মাইম করে মাকে সব বলতে থাকে)

সুবল ঃ আমরারে কয় বেকামা। - ধরছিলাম তার ঘেটিত- কিন্তু মনের জুর থাকলেও শরীরের জুর নাই গো— শেষ মেষ আমার তলপেট লাথ মারিয়া এক ধাক্কায় ফালাই দিল— আর শামুরে পাথরের টুকরা দিয়া (কান্নায় ভেঙে পড়ে)।

সন্টু ঃ বাবা ! যারা দিনরে রাইত করে, তারার লগে কিতা আমরা পারমু নি? পর্দার পিছে বইয়া যারা চাল চালায় তারারে তো ধরা যায় না ----।
মা তারা সারাদিন খাইচইন না - কিছু খাওয়ার দেও।- আমি একটু আইরাম — (বেগ কাঁধে নিয়ে প্রস্থানদ্যোত)

কমলা ঃ অখন কই যাইতে?

সন্টু ঃ (দৃঢ়ভাবে বলবে) দত্তবাবুর লগে একবার দেখা করতাম -----

কমলা ঃ না বাবা। তাইনের কাছে গিয়া আর কি লাভ। যেতা কান্ড ঘটাইবার ইটাতো ঘটাই লাইছইন্।

সুবল ঃ আইজ তারে যাইতে দেও, আটকাইও না -----

সন্টু ঃ (ধীরে ধীরে বাবাকে জড়িয়ে ধরে) আমি আইরাম —

কমলা ঃ (সন্টু বেরিয়ে যাওয়ার পর) তুমরা একটু বও--- (কিছু একটা আন্দাজ করে ভিতরে খাবার আনতে চলে যায়)

লেখক ঃ **শেখর দেবরায়,** শিলচর তথা উত্তর পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট নাট্য-ব্যক্তিত্ব।

শ্রুতিনাটক ঃ খেলাঘর

(মূল কাহিনি - সমরেশ বসু)

অনুপ রায়

[Loco passenger এর একঘেয়ে চলার শব্দ/ Cut to কণ্ঠ]

অভয় ঃ অবশেষে ছেড়ে আসতে হলো।আমার মতো লোকের পক্ষে এমনটাই স্বাভাবিক। স্রোতের টানে চলা তারপর ভাঁটির টান শেষে জমাট ফেনা, শ্যাওলার মতো স্থির— তিরতির করে নড়াচড়া। আমিও এমনি থমকে গিয়েছিলাম কিছুদিন। থমকে না, ইলাসটিকের বাঁধনে জড়িয়ে যাওয়া। জীবনটাকে দেখছিলাম আরেক চোখে। ভালো না মন্দ, উচিত বা অনুচিত এইসব প্রশ্ন ছাড়িয়ে ভালোটাই যখন আলো হয়ে উঠছিল— তখনই ট্রান্সফার। জানি একটা দূরত্বে গেলে ইলাসটিকও ছিঁড়ে যায় - হয়তো ছিঁড়ে যাবে আমার ক্ষেত্রেও। তবু-এই 'তবু'ই কি তবে মানুষের স্মৃতি? অতীতের কাছে বার বার ফেরা?

[Cut to বস্তির কথা]

ভেলো ঃ কি বলো মিলিটারিম্যান পিছিয়ে পড়লে কেন?

অভয় ঃ (দূর কণ্ঠ) আসছি— (আঘাত লাগার শব্দ) আর!

ভেলো ঃ কি হলো লাগলো তো? ভায়া এখানে মানুষের কুঁজো হয়ে চলার জন্যেই চালগুলো নিচু করে তৈরী। তোমার উচিত মাথাটাকে হাতে নিয়ে চলা। (হাসি)

অভয় ঃ কিন্তু ভেলো খুড়ো-

ভেলো ঃ বল।

অভয় কোথায় নিয়ে যাচ্ছো বলতো?

ভেলো ঃ বস্তির হাল দেখে ভাবছো বস্তিতে গুঁজে দিতে চলেছি?

অভয় ঃ তুমি মিথ্যা কথা বলার লোক না তা আমি জানি।

ভেলো ঃ মিলিটারি ট্রাক ড্রাইভারের গন্তব্য কি আগে থেকে মাপা যায়?

অভয় ঃ আমার পা বলে তো কোনো বস্তু আছে? কদ্দূর তোমার সেই প্রাসাদ?

ভেলো ঃ কষ্ট করলে কি পাওয়া যায়?

অভয় ঃ সেটা পাওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই। ফোস্‌কা পড়ার দশা।

ভেলো ঃ এই তো এসেই পড়েছি। ভাবছো কেন, পাকা বাড়ি, ইটের গাঁথনি- খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিও আমার কথা। তবে একটু সাবধানে থাকতে হবে এই যা।

অভয় ঃ কেন বিপদ আছে নাকি?

ভেলো ঃ নেই আবার? আইবুড়োর বিপদ পথে পথেই।
অভয় ঃ মতলবটা কি ভেঁজেছো? বলো তো খুড়ো। আমাকে ঝুলিয়ে দেবার ইচ্ছে?
ভেলো ঃ পারলে তো ভালোই হতো।
অভয় ঃ নিজের পাঁচটা এন্ডাবাচ্চা নিয়ে জ্বালাটা বুঝতে পারছো না বুঝি
ভেলো ঃ আলো দেখলেই বাদলা পোকা আসে। সে কি জানে সেখানে তার হরিণ বাঁধা?
অভয় ঃ তার মানে আমাকে মারার ইচ্ছে?
ভেলো ঃ চটলে ভায়া। ওটা ছিল কথার কথা। যেখানে যাচ্ছো সেখানে তো পেত্নী নেই যে ঘাড় মটকাবে। তবে মানুষ বলে কথা।
অভয় ঃ মানুষ! ওসব ছিলাম এককালে। এখন যন্ত্রের মতো— ওসবের বালাই নেই। (বিরতি) বাপরে! এ কোথায় নিয়ে এলে!
ভেলো ঃ আচ্ছা লোক দেখছি তুমি। মানুষের জঙ্গলে মানাতে পারবে না গাছগাছালিও পোষাবে না- থাকবে কোথায় আকাশে?
অভয় ঃ এ যে সুন্দরবনকেও টেক্কা দেবে। আতপুরের মতো জায়গায় এমনি জঙ্গল? রাতবিরেতে ফেরা-সাপেখোপে কাটলে?
ভেলো ঃ না-না, সাপের লেখা থাকতে পারে বাঘের কোনো দেখা মিলবে না। নাও, এসে গিয়েছে তোমার বাড়ি। সঙ্গে বোনাসও আছে, পুকুর।
অভয় ঃ হুঁ, ফুলবাগানও দেখছি।
ভেলো ঃ বলতে বাধলো নন্দনকানন। ভেবো না, অপ্সরীদের দেখাও পাবে। বলো, কেমন লাগছে।
অভয় ঃ কবিও না। গাইয়েও না বলি কিভাবে? তবে এ অজ্ঞাতবাস পোষাবে না, আমার টিনের চালাই ভাল।
ভেলো ঃ থাকতে থাকতেই মন বসে যাবে। কলকারখানা, বস্তির চাপাচাপি থেকে মুক্তি।
অভয় ঃ [চাপা স্বরে] খুড়ো।
ভেলো ঃ আবার কি হলো।
অভয় ঃ ঐ যে ওদিকে।
ভেলো ঃ তাইতো! বিনু ভাইঝি যে! ঝোপের আড়াল থেকে দেখা হচ্ছে কাকা ভেলো ও রাক্ষসখোক্কস নিয়ে এলো কিনা? (হাসি)
বিনু ঃ এই তোমার নতুন ভাড়াটে বুঝি?
ভেলো ঃ আমার নাকি, তোদের। বাবাকে একবারটি ডেকে দে তো মা, সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে যাই।

বিনু ঃ বেশ- যাচ্ছি।

অভয় ঃ খুড়ো, এ যে একেবারে বিয়ের যুগ্যি!

ভেলো ঃ শুধু যুগ্যি? নাঃ, তুমি বোধহয় মেয়েদের দিকে চোখ তুলে দেখইনি। সময়ে পার হলে গন্ডাখানেকের মা হয়ে যেত। এইটি শুধু নয়, নিচেও আছে একজন। তবে বিয়ে কে দেবে বলো। বাপের সময় থাকতে বিয়ে হয়নি। এখন তো ভাতই জোটে না। মা ষষ্ঠী দিলে তো দিলে, দুটোই মেয়ে।

[বাঁশির আবহ]

অভয় ঃ সত্যি বলছো, মেয়েদের জীবনের অভিশাপ যেন ঘোচার না। বাড়িতে দেখছি তিনবোনকে বর্ষার আগাছার মতো বেড়ে উঠতে। ওদের ভবিষ্যতও এমনিভাবে- খুড়ো, এখানে আমার থাকা হয়ে উঠবে না।

ভেলো ঃ কেন ওরা কি তোমায় মন্দ করে ফেলবে নাকি? দেখেশুনে বলে একটা বামুনের ছেলে নিয়ে এলাম এই অভাগীদের ঘরে। মেয়ে দুটো একা একা থাকে, বাপের তো দুচোখেই ছানি। একটু সাহস পেলে বেঁচে যায়। তারপর তুমি তোমার- ওরা ওদের।

[বৃদ্ধের কাশি]

বৃদ্ধ ঃ কে রে ভেলো নাকি?

ভেলো ঃ হ্যাঁ দাদা। একা নই, তোমার ভাড়াটেকেও এনিছি। এই মিনি, বল না বাবাকে দেখতে শুনতে কেমন রাজপুত্তুরের মতন?

বিনু মিনি ঃ দেখেছো বাবা- খুড়োটা যে কি-

বৃদ্ধ ঃ রাজপুত্তুর হলেই বা কি এসে যায়। সোনারকাঠি রূপোর কাঠিতো নেই- ছুঁইয়ে দিলেই ব্যস, (হাসি)

ভেলো ঃ এই বয়সে ওসব স্বপ্নও দেখ নাকি?

বৃদ্ধ ঃ শুনিতো এককালে এ বাড়িটা প্রাসাদই ছিল। ওসব না হোক হতভাগীরা পার হলেও ঘাড় থেকে পাহাড় নেমে যেত। আমার জ্বালা কেইবা বোঝে। হ্যাঁরে, বাঙালিতো?

ভেলো ঃ তোমার কি কাবুলি হলে হচ্ছে।

বৃদ্ধ ঃ কি লম্বা চেহারা! চোখের মাথা খেয়েছি, ঠাহর হয় না। তো বেশ, এসেছো যখন থাকো। ঘর বেশ বড়সড়ই তবে পুরনো এই যা। যা তো মিনি, ঘরটা খুলে দে। চলো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বামুনের ছেলে।

ভেলো ঃ এসো অভয়, থাকাটা যখন সমস্যা তখন মাথা গোঁজার ঠাঁই জুটলেই হলো।

অভয় ঃ চলো

[বাঁশির আবহ]
[দরজা খোলার শব্দ]

ভেলো ঃ বাঃ, এ তো পেল্লায় ঘর! চু- কিতকিত খেলা যায়। চারিধার, তকতক করছে মেঝেটাই যা ক্ষয়ে যাওয়া। সামনেই পুকুরঘাট, আর কি চাই?

বৃদ্ধ ঃ আমরাই থাকতাম, সরে গেছি পেছনে। ভাড়াটে বলে তো কষ্ট দিতে পারি নে।

ভেলো ঃ তাহলে? এবার আমার দায়িত্ব শেষ। এবার তোমার যতো গোছানোর পালা। জানলার ধারে কি দেখছো পরি-টরি?

অভয় ঃ দেখছি নে গন্ধ নিচ্ছি- কি মিষ্টি? কি ফুলের গন্ধ খুড়ো? (মিনির হাসি)

বৃদ্ধ ঃ এই মিনি হারামজাদি! হাসির কি হলো? যা দূর হয়ে যা এখান থেকে । (বিরতি) কিছু মনে করোনা, ওর ধাতটাই এমনি। ওঠা বাতাবিলেবু ফুলের গন্ধ; বসন্তকাল যে এটা।

ভেলো ঃ এইকালটা থাকুক তবে অনেকদিন ধরে। আমি চলি। ভাড়ার কথা বলা আছে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ ঃ ভেলোটা বড় পরোপকারী। ওই পুকুরে নাইতে কোনো অসুবিধে নেই-খাবে কোথায় হোটেলে না রেঁধে?

অভয় ঃ না-না, ওসব ঝামেলা বাইরে চুকিয়ে আসাই ভালো।

বৃদ্ধ ঃ খাবার জলের ইঁদারা কিন্তু ভেতরে। লাগবে তো বালতিটাক জল। বিনি-মিনির একজনকে বললেই দিয়ে যাবে।

অভয় ঃ কাউকে বলতে হবে না, আমি নিজেই পারবো।

বৃদ্ধ ঃ তুমি আমার সহায় হলে।

অভয় ঃ সহায়? মানে?

বৃদ্ধ ঃ চারদিকে কত উপদ্রব।

অভয় ঃ কিন্তু আমার ফেরার ঠিক থাকবে না।

বৃদ্ধ ঃ তবু মিলিটারির লোক বলে কথা। ভাবি আমি মরে গেলে ও দুটোর কি দশা হবে! (বিনির কন্ঠ)

বিনি ঃ বাবা খাবে এসো—

বৃদ্ধ ঃ দেখেছো- কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল। তোমার তো খাওয়া হয়নি— ঠিক তো?

অভয় ঃ আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

বৃদ্ধ ঃ আমি কি ভাববো বলো। সব ভাবনা এখন ঐ দুটো অভাগীকে নিয়ে। আমি— [আবহ]

অভয় ঃ এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। এমনিভাবে চললে কারো কোনো ক্ষতি হতো না। আবার কাজ ড্রাইভারি, বিনি-মিনির ঠোঙা বেঁধে ভাত জোটানোর লড়াই। জীবনের ছোটো ছোটো খোপে আমাদের বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু খোপের মধ্যে সারাজীবন একটা পোকাও থাকতে পারে না। তাকে বার হতেই হয়। আমার তাই হলো। সবে গরম পড়তে শুরু করেছে। রাতের ভাতটা ঘরেই ফুটিয়ে নেবার অভ্যেস করছি এমন সময় একদিন-
(চেঁচামেচি)

বিনি ঃ (দূর কণ্ঠ) মিনি এই মিনি, দেখতো কি হলো?

মিনি ঃ (দূরে) আমি পারবো না।

বিনি ঃ আচ্ছা বেয়ারাতো তুই! লোকটা চেঁচাচ্ছে কেন- দেখে আসতে কি হয়

মিনি ঃ অত যদি আদিখ্যেতা নিজে যেতে কি হয়?

বিনি ঃ অসভ্য কোথাকার! তুই যেন যাস না ও ঘরে?

মিনি ঃ যাই। সে দিনের বেলায়। (চেঁচামেচি-বিনির হাসি)

বিনি ঃ বেশ তবে আমিই যাচ্ছি!

অভয় ঃ এই এই ভেতরে ঢুকো না।

বিনি ঃ কেন কি হয়েছে চৌকির ওপর দাঁড়িয়ে কার ওপর বীরত্ব ফলানো হচ্ছে?

অভয় ঃ সাপ!

বিনি ঃ কোথায় সাপ? বিছানায়?

অভয় ঃ না ওখানে।

বিনি ঃ দেখি তো। ওহো, লাঠিটা এদিকে ছুঁড়বেন তো।

অভয় ঃ তোমাকে দেখতে হবে না — কামড়ে দিলে?

বিনি ঃ দিলে আর কি? অন্যের উপকার করতে গিয়ে মরলে স্বর্গবাস হবে।
(হাসি) দিন। (লাঠির শব্দ)
হায়রে, এই সাপটাকে ভয়! (হাসি)

মিনি ঃ কি হয়েছে রে দিদি।

বিনি ঃ ঐ দেখ সেই জলঢোঁড়াটা ঢুকেছে।

অভয় ঃ কামড়ায় না?

মিনি ঃ জলঢোঁড়া কামড়ায়! (হাসি)

বিনি ঃ গরম পড়েছে বলে ঠান্ডা ঘরে ঢুকেছে। এই মিনি, লাঠিটা ঠুকে ঠুকে তাড়া দেখি ওটাকে। (শব্দ)

অভয় ঃ না মানে, এ রকম অবস্থায় তো কখনো পড়িনি।

মিনি ঃ এই দিদি-

বিনি ঃ কেন?

মিনি ঃ ভাত পুড়ছে যে।
অভয় ঃ আমি নাড়িয়ে নেব খন।
বিনি ঃ সরুন— সরুন। চারদিকে ফ্যান পড়ে একশা (নামানোর শব্দ) এমা, কি করলাম বলুন তো!
অভয় ঃ কোথায় কি করলে?
বিনি ঃ ছুঁয়েদিলাম তো।
অভয় ঃ দিলে-দিলে, তাতে কি?
মিনি ঃ বারে, আপনার জাত যাবে না? (হাসি)
অভয় ঃ ও। আমার এই দড়িটাকে এত ভয়? ঠিক আছে কাল থেকে এটা -- রাখবো না। (আবহ)
অভয় ঃ (গান ....পথ হারবো বলে এবার.........) কে? বিনি?
বিনি ঃ আজ ফিরতে তে যে এতো রাত হলো?
অভয় ঃ এখনো শোওনি তুমি?
বিনি ঃ একটা লোক বাইরে -ভাবনা হয় না বুঝি?
অভয় ঃ আরে আমি তো কেউকেটা নই- ভাববে কেন?
বিনি ঃ না-না, কোন বিকেলের করা রান্না। এতক্ষণে জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।
অভয় ঃ তাই বলো। কত রাত শুধু জলেই কাটিয়েছি।
বিনি ঃ সেসব রাতের সঙ্গে এখনকার রাতের কি তফাৎ থাকতে নেই? (রাতজাগা পাখির ডাক)
অভয় ঃ তোমার বাবা ঘুমিয়েছে?
বিনি ঃ কখন?
অভয় ঃ মিনি?
বিনি ঃ ওটা তো বিছানায় পড়লেই কাদা।
অভয় ঃ আলোটা জ্বালি?
বিনি ঃ হ্যাঁ। আজ বোশেখী পূর্ণিমা।
অভয় ঃ ও। তাই রহস্যময়ী লাগছিলো বাগানটা । আর পুকুরের জলে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে মনে হচ্ছিলো স্বপ্নপুরী।
বিনি ঃ হুঁ! স্বপ্নপুরী না প্রেতপুরী।
অভয় ঃ আমারও প্রথম প্রথম অমনিধারা মনে হতো। কিন্তু এখন — কি দেখছো বিনি?
বিনি ঃ তোমাকে।
অভয় ঃ আমাকে?
বিনি ঃ শুধু জাতই মারলাম। তবু তোমার শরীরটাকে ভালো করে তুলতে পারছি কই।

অভয় ঃ তোমার দিনরাত ঐ কথাই। আরো কত করবে? ড্রাইভার কি দুধগোলা পুরুষ হবে?

বিনি ঃ কেন হতে নেই? তবে আমার এত করার কি মানে?

অভয় ঃ বিনি!

বিনি ঃ বলো।

অভয় ঃ কি হয়েছে তোমার?

বিনি ঃ তুমি না থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।

অভয় ঃ সত্যি? আর?

বিনি ঃ না- না, আর কিছু না। হাত-পা ধুতে হবে না। ড্রাইভার বলে কি খিদে লাগে না? (আবহ সেতার)
(কয়েকদিন পর)

বৃদ্ধ ঃ অভয় ঘরে আছো?

অভয় ঃ আসুন।

বৃদ্ধ ঃ কামাই দিলে যে আজ, শরীর খারাপ?

অভয় ঃ সামান্যই।

বৃদ্ধ ঃ সামান্য বলছো কি? বিদেশ বিভুঁয়ে একা একা।

অভয় ঃ সেরে যাবে দুদিনেই।

বৃদ্ধ ঃ হ্যাঁ, আমাদের ঘরে কি অসুখকে পোষ মানানো যায়। না সারলেও, সারিয়ে তোলার ভান করতে হয়। বলো যদি ভেলোকে দিয়ে বাড়িতে খবর পাঠাই।

অভয় ঃ না- না, তার দরকার নেই। সে আর এক বিপদ, বাড়িতে সকলে ছোটো - তারপর বিধবা মা। এই তো বেশ আছি। তাছাড়া বিনি-মিনি তো আছেই।

বৃদ্ধ ঃ আছে মানে ? ওরা তো হাতে চাঁদ পেয়েছে। হতচ্ছাড়ি গুলোর জীবনদুটোতে তুমি যেন যাদুকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছো।

অভয় ঃ এসব কি বলছেন! আমি উপলক্ষ মাত্র এরাই যেন সব। সাজানো, গোছানো, রাঁধা বাড়া পাল্লা দিয়ে করে। যেন এটা ওদের খেলাঘর।

বৃদ্ধ ঃ কি জানি। ওরা কি আর ছোটো আছে। খেলাঘর বাঁধতে বাঁধতেই—

অভয় ঃ কি?

বৃদ্ধ ঃ মানুষের বিচিত্র স্বভাব। আজকাল ঠোঙা বাঁধাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। আমি চোখে দেখিনে।

অভয় ঃ সে কি কেন? ওই করেই তো চলা।

বৃদ্ধ ঃ আগেও কি চলতো ছাই— এখনো চলছে না।

অভয় ঃ তবে তো ওদের এসব করতে বারণ করা উচিত।

বৃদ্ধ ঃ ওদের পাথরচাপা বুক নিংড়ে তবুতো একটু হাসি বার হয়। তাও বন্ধ করে দেবে? [আবহ সঙ্গীত "আকাশ প্রদীপ জ্বলে ......]
(মিনির উচ্ছ্বল হাসি)

অভয় ঃ মিনি- এই মিনি হাসছো কেন? আচ্ছা তো। একটা ছুঁতো পেল কি না পেল অমনি হেসে লুটোপুটি। ঠিক পাগলির মতো।

মিনি ঃ বারে, পাগলের কান্ড দেখে কে না হাসে?

অভয় ঃ অ! পাগল? কে শুনি।

মিনি ঃ উল্টো জামা পরে যে?

অভয় ঃ কই? তাই তো! তুমি দেখিয়ে না দিলে কি লজ্জায় পরতাম বলোতো।

মিনি ঃ চুলেওতো তেল পড়েনি কতকাল।

অভয় ঃ মনেই থাকে না ভুল হয়ে যায়।

মিনি ঃ কোথায় থাকে মন?

অভয় ঃ কি করে জানবো।

মিমি ঃ আমি জানি।

অভয় ঃ তুমি? আরে আরে করছোটা কি? এত তেল কেউ মাথায় দেয়- আমি কি কলু নাকি?

মিনি ঃ কোনো কথা শুনছি নে। আজ আমি যা করবো মাথা পেতে নিতে হবে।

অভয় ঃ ধেৎ, ড্রাইভার আবার ভদ্রলোক হয় কবে?

মিনি ঃ কেন ড্রাইভার বুঝি মানুষ নয়?

অভয় ঃ আমাকে মানুষ মনে হয়?

মিনি ঃ কেন হবে না? এরকম চেহারা কজনের হয়?

অভয় ঃ আর তোমার হাসিটা ? কি রকম জানো? মনে হয় পাথরের ফাটল ভেঙে বেরিয়ে আসা ঝর্ণাধারা।

মিনি ঃ ও তাই? (হাসি) একটু আগেই পাগলি বলা হয়েছিলো কেন? একি এটা কি হলো?

অভয় ঃ ঘোমটা দিলে তোমায় কেমন লাগে দেখছি।

মিনি ঃ (স্বর বদলে যায়) কেমন লাগছে?

অভয় ঃ মনে হচ্ছে বসে বসে দেখি। থাক পড়ে, ড্রাইভারি, ঘরবাড়ি।

মিনি ঃ কি জানি ছাই এ ঘরে এলেই আমারও কেমন হয়ে যায়। চুন বালি খসা ঘরটা বদলে যায়।

অভয় ঃ তবে এ বাড়ি ছেড়ে একদিন অন্য বাড়িতে যেতে হবে তো।

মিনি ঃ অন্য বাড়ি! কে নিয়ে যাবে?

অভয় ঃ কেন বিয়ে হলেই যাবে।

অভয় ঃ বিয়ে ? আমার! (হাসি)

অভয় ঃ হবে- হবে দেখো।

মিনি ঃ আমরা যে শঙ্করি।

অভয় ঃ মানে?

মিনি ঃ প্রবাদটা জানা নেই? নিজের না জুটলে কে ডাকবে আমাদের?

অভয় ঃ ঠিক ডাকবে। একদিন কোনো এক রাজপুত্র এসে দাঁড়াবে এই দরজায় (মিনির কান্না) একি কাঁদছো কেন মিনি? আমি তোমায় আঘাত দিয়েছি? মিনি (বাসনপত্র ফেলার শব্দ) ও কি- কি করছো!

মিনি ঃ না-না, কেউ আসবে না- আসতে পারে না। আমরা দু'বোন আছি প্রেত-- মতো- এভাবেই থাকতে হবে চিরকাল। কেউ আমাদের কেউ উদ্ধার করতে আসবে না।

অভয় ঃ মিনি শোনো— যেও না। (আবহ)

।। দিন কয়েক পর।।

অভয় ঃ মিনি—মিনি—

বিনি ঃ (দূর কণ্ঠ) আসছি — আসছি—

মিনি (দূরে) এত তাড়া কিসের যুদ্ধে যেতে হবে নাকি?

অভয় ঃ শিগগির শুনে যাও তোমরা।

মিনি ঃ কেন কি হয়েছে? একি দিদি তুই যে ভিজে কাপড়ে। যা কাপড়টা পাল্টে আয়— আমি তো আছি।

বিনি ঃ তুই থাম দেখি। কি হয়েছে ?

মিনি ঃ গোলাগুলি ছুঁড়ে এখন চুপ যে! (হাসি)

অভয় ঃ আঃ মিনি হেসো না।

মিনি ঃ বেশ হাসবো না। কিন্তু কি রাজকাজে ডাকা হলো শুনি।

বিনি ঃ বলবে তো কি হয়েছে। দুপুরেই ফিরে এলে- বাড়ির খবর ভালো তো?

অভয় ঃ হ্যাঁ, ভালো।

দুজনে ঃ তবে?

অভয় ঃ আমি — আমি—

দুজনে ঃ তুমি কি?

অভয় ঃ ট্রান্সফার হয়ে গেছি। (যন্ত্র সংগীত)

দুজনে ঃ ট্রান্সফার! কোথায়?

অভয় ঃ পানাগড়। রাতেই বেরুতে হবে।

দুজনে ঃ আজই?

অভয় ঃ আমি অনেক চেষ্টা করেছি। মিলিটারির কাজে হ্যাঁ-কে না করা যায় না।

বিনি ঃ ও- তাই।

মিনি ঃ আমি বলিনি তোকে পাথরচাপা কপাল আমাদের। এই অন্ধকূপে পথে মরা ছাড়া কোনো উপায় নেই। (বিনির কান্না)

অভয় ঃ তুমি কাঁদছো বিনি?

মিনি ঃ এই দিদি-দিদিরে। ও এতটা বয়স অব্দি দাঁড়িয়ে থেকে আজ একটা দমকা ঝড়ে পড়বি লুটিয়ে? এই দেখ- দেখ না আমাকে- আমি কাঁদছি নে- (হাসি) হাস আমার মতো হাস

[দুজনের কান্না - আবহ cut to ট্রেনের)]

অভয় ঃ আমিও যদি তখন কাঁদতে পারতাম-ভেতরটাকে ছিঁড়েখুড়ে ওদের দেখাতে পারতাম! কিন্তু পারিনি। অসহ্য লাগছিলো বাড়িটা। কী বা ছিল- গুছিয়ে নিতে সময় লাগলো বড় জোর এক ঘন্টা। না কেউ এল না বিদায় দিতে - আমিও পারিনি ওদের ডাকতে । ঘর ছেড়ে গলি, পুকুর বাগান পেরিয়ে দেখি- বিনি-মিনির দুটি ব্যথিত মুখ- বিচ্ছেদে কাতর দুটি শরীর একে অপরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে— আমাকে যেতে হচ্ছে একা—
[গাড়ির তীব্র হুইসেল]

লেখক ঃ **অনুপ কুমার রায়,** নাট্যকার ও নির্দেশক, কাঁচরাপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

খনন কথা

আর্থার মিলার অনুসরণে

মৈনাক সেনগুপ্ত

সাবেক মফস্বল শহরের একটি পুরোনো বাড়ি। প্রচুর অব্যবহৃত আসবাব পাশের ঘরে ডাই করে রাখা আছে। বসার ঘর যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানেও যে কেউ দীর্ঘদিন বাস করে না বোঝাই যাচ্ছে। একটি আরাম কেদারায় বসে একটা গড়গড়ায় টান দিচ্ছে সুজিত। পরনে বাইরের পোশাক, তার সামনে একটা গোল টেবিলে একখানা আধভাঙ্গা এয়ারগান রাখা। ঘরে গৃহকোণে একটা সাবেক সোফা ও টেবিলের পাশে একটা পুরনো কাঠের চেয়ার। সুজিতের মাথার পিছনে তাঁর বাবা সুধীররঞ্জনের একখানা বড় ছবি। সুজিত আরাম কেদারায় বসে চোখ বন্ধ করে দোল খেতে খেতে গড়গড়ায় টান দিচ্ছে। ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তার স্ত্রী আরতি। আরতির পায়ের আওয়াজে সুজিত চোখ খোলে। কিন্তু বাকি হাবভাবের কোন পরিবর্তন হয় না।

আরতি ঃ (অবাক হয়ে) --- হুঁকো!

সুজিত ঃ গড়গড়া, বাবা খেতেন দেখ নি।

আরতি ঃ টান দিয়ে যাচ্ছ, ধোঁওয়া তো বেরুচ্ছে না!

সুজিত ঃ কারণ তামাক নেই।

আরতি ঃ তাহলে

সুজিত ঃ (উত্তর না দিয়ে আরও একটা টান দেয়। ধোঁওয়া ছাড়ার ভাব করে) ভেতরটা দেখে এলে?

আরতি ঃ দেখলাম।

সুজিত ঃ কিছু সরিয়ে রাখার হলে এখনি সরিয়ে রেখে দাও, কিছু পেলে?

আরতি ঃ তেমন কিছু নয়, দু'একটা শাড়ি, খুব সুন্দর আজকের দিনে পয়সা ফেললেও পাওয়া যাবে না।

সুজিত ঃ রেখেছ?

আরতি ঃ হুম, বের করে রেখেছি।

সুজিত ঃ ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখ, তাড়াতাড়ি।

আরতি ঃ ঠিক আছে, কিন্তু ....

সুজিত ঃ আবার কিন্তু কী?

আরতি ঃ দেরাজটা খোলা, চাবি লাগানো নেই

সুজিত ঃ চাবি হারিয়ে গেছিল, অনেকদিন-ই ......

আরতি ঃ কয়েকটা গিনি, বোধ হয় ....

সুজিত ঃ ছিল (আরতি কিছু বলতে যায়) বাবার শেষদিকে তো ওগুলো ভেঙ্গেই......

আরতি ঃ ও ! কতদিনের স্মৃতি কোন ঠিক নেই .... তোমার সেই লোক কখন আসবে ?
সুজিত ঃ (পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখে) যেকোন সময়ে এসে পড়বে।
আরতি ঃ লোক ঠিকঠাক তো.....
সুজিত ঃ কী করে জানব, এই মফস্বল শহরে পুরনো জিনিস কেনাবেচার লোক পাওয়া গেছে, এই অনেক।
আরতি ঃ কোত্থেকে পেলে ? কোন্ পুরনো বন্ধুর কাছে ?
সুজিত ঃ (হাতের মোবাইলটা তুলে) আজকাল তো সবার একটাই বন্ধু।
আরতি ঃ সুহাসকে ফোন করেছিলে ?
সুজিত ঃ (ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে)
আরতি ঃ কী বললো ?
সুজিত ঃ ধরে নি।
আরতি ঃ তাহলে তুমি ধরে নিলে কী করে , ও আসবে ?
সুজিত ঃ দ্বিতীয়দিন ফোন করায় ওর সেক্রেটারী বলল,'স্যার প্রোগ্রামটা কনফার্ম করেছেন।'
আরতি ঃ প্রোগ্রাম ! কনফার্ম নিজের দাদার কাছে আসবে সেটাও রাজি হলে সেক্রেটারী করবে ! ছেলে না মেয়ে !
সুজিত ঃ মানে ?
আরতি ঃ বলছি, সুহাসের সেক্রেটারী ছেলে না মেয়ে ?
সুজিত ঃ জানি না।
আরতি ঃ দু'দিন গলা শুনেও বুঝতে পার নি ?
সুজিত ঃ বোঝার চেষ্টাও করি নি। কি হবে বুঝে ?
আরতি ঃ তুমি সত্যি পাল্টালে না।
সুজিত ঃ সবাই পাল্টায় না।
আরতি ঃ অথচ তোমার মায়ের পেটের ভাই............
সুজিত ঃ সুহাসটা ছোটবেলায় একদম মায়ের মতো ছিল।
আরতি ঃ তোমার মাকে আমি বেশীদিন পাইনি, আমার বিয়ের মাস ছ'য়েক পরে ......
সুজিত ঃ হুম.......
আরতি ঃ আমাকে খুব ভালোবাসতেন।
সুজিত ঃ সব কথা তোমার মনে আছে আরতি ?
আরতি ঃ কিচ্ছু ভুলিনি।
সুজিত ঃ জন্ম থেকে এই বাড়িটায় বেড়ে ওঠা।
আরতি ঃ আমিও বিয়ের পর বেশ কিছু বছর কাটিয়েছি এই শহরটায় ।
সুজিত ঃ আমাদের ছোটবেলায় এই জায়গাটা পুরোপুরি শহর ছিল না।
আরতি ঃ এখনও নয়।

সুজিত ঃ কলকাতার সঙ্গে তুলনা করো না। রেললাইনের দু'দিকে ছোট ছোট শহরগুলোর নিজস্ব চরিত্র আছে।

আরতি ঃ আচ্ছা, সুহাস কি এগুলো বিক্রি করতে রাজী হবে?

সুজিত ঃ ছোটবেলা থেকে আমার কোনো কথার বিরোধিতা করেনি।

আরতি ঃ ছোটবেলা থেকে নয়, ছোটবেলায়। দীর্ঘদিন তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই।

সুজিত ঃ পয়লা বৈশাখ আর শুভ বিজয়ায় ফোন করি ......

আরতি ঃ ব্যাস, ওইটুকু। আজ ও কোথায়, আর তুমি কোথায়। ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মরতে বসেছিলে, একবার আসা তো দূরের কথা, ফোন করে খবরটুকু নেয় নি।

সুজিত ঃ আমি খবর দিই নি।

আরতি ঃ ও এখন মস্ত নেতা। সব শহরের সব পাড়ায় ওদের পার্টি অফিস, চাইলে খবরটা নিতে পারতো।

সুজিত ঃ আমার এখনকার পাড়া, শহর বা ক'দিন আগে অবধি যে স্কুলে পড়িয়েছি, সেখানে কাউকে আমার ভাইয়ের রাজনৈতিক পরিচয় জানাই নি।

আরতি ঃ তুমি ওর রাজনীতির বিরোধী বলে?

সুজিত ঃ স্টুডেন্ট লাইফের পর সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনীতিই করিনি, চাকরি বাঁচাতে গেলে একটা শিক্ষক সংগঠনে নাম লেখাতে হয় বলে লেখানো। তখন যেমনটা দস্তুর ছিল।

আরতি ঃ তাহলে ?

সুজিচ ঃ ক্ষমতাবান মানুষদের এড়িয়ে চলি।

আরতি ঃ সুহাস তোমার ভাই।

সুতিজ ঃ ক্ষমতার কোনো বাবাও থাকে না, ভাইও জন্মায় না।

আরতি ঃ আমার একটা কথা বারবার মনে হয়, আগেও হয়েছে, আজও হচ্ছে।

সুজিত ঃ কী?

আরতি ঃ সুহাসকে যদি তখন একবার বলতাম তাহলে টুবানকে চাকরি করতে বাইরে যেতে হতো না, এখানেই কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিত। সুজিত আবার গড়গড়ার নলটা তুলে নেয়।

আরতি ঃ আজ একবার বলে দেখব?

সুজিত ঃ না, সুজিত রঞ্জন চৌধুরী কখনও কারোর কাছে হাত পাতে নি ।

আরতি ঃ আমি বলব তো আমার দেওরকে।

সুজিত ঃ তারপর? বাকি জীবনটা কৃতজ্ঞতার বোঝা মাথায় নিয়ে বাঁচতে হবে। বাইরে থেকে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়।

আরতি ঃ সুহাস এলো বোধহয় .....

সুজিত ঃ (তখনই মোবাইল বেজে ওঠে। সুজিত ফোনে কথা বলে)— বেড়িয়ে পড়েছে, এখানেই আসছে? ও কে!

সুজিত ফোন কেটে দেয়। আরতি ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুজিত ঃ মেয়ে

আরতি ঃ মানে?

সুজিত ঃ সুহাসের সেক্রেটারী......

দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ হয়। আরতি দরজা খুলতে যায়। সুজিত গড়গড়ায় টান দিতে দিতে সামনে রাখা এয়ারগানটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। আরতি দরজা খুললে প্রবেশ করে অক্ষয়। চেহারা ও পোশাক দুটো'র-ই খুব বয়স হয়েছে। অক্ষয় ঢুকেই আবার একটু পিছিয়ে যায়।

অক্ষয় ঃ (এয়ারগানটা দেখিয়ে) চলে?

সুজিত ঃ চলতো ....

অক্ষয় ঃ (গড়গড়টা দেখিয়ে) ওটাও বোধহয় তাই?

সুজিত ঃ আপনি তো বাতিল, পুরনো জিনিসের কারবার করেন?

অক্ষয় ঃ করতাম। আমায় চিনলেন কী করে?

সুজিত ঃ এই সময়ে এখানে অক্ষয় কুমার দাস ছাড়া অন্য কারুর আসার কথা নয়।

অক্ষয় ঃ বাধ্য হয়ে আসতে হলো ....

সুজিত ঃ এটাই তো আপনার কাজ!

অক্ষয় ঃ ছিল।

সুজিত ঃ বুঝলাম না ....

অক্ষয় ঃ এখন আর এসবের কদর কে করে? আমাদের ছোট্ট শহরেও বড় বড় বাড়িগুলো ভেঙ্গে পায়রার খোপের মতো ফ্ল্যাট। বড় বড় পরিবারগুলো ভেঙ্গে ছোট ছোট করো। আর এসব ফার্নিচার কিনবেই বা কে? আর রাখবেই বা কোথায়? আর আজকালকার ফার্নিচারগুলো দেখবেন ... এমনভাবে বানানো আট-দশ বছরের বেশী টেকে না। আর ফ্ল্যাটের রুমগুলোও দেখবেন ... ঐ আট বাই দশ।

সুজিত ঃ তাহলে আপনার ব্যবসা চলছে কি করে?

অক্ষয় ঃ চলছে আর কই? বন্ধ করে দিয়েছি এক বছর।

সুজিত ঃ তাহলে ফোন নাম্বারটা?

অক্ষয় ঃ অনেক আগে আমার ছেলে কম্প্যুউটারে তুলে দিয়েছিল। ওখান থেকে দেখে লোকেরা মাঝে মাঝে ফোন টোন করে। কখনও যাই, কখনও যাই না।

আরতি ঃ (বিরক্ত হয়ে) তাহলে এখানে এলেন কেন?

অক্ষয় ঃ অনেকদিন বাড়িতে বসে আছি , ভাবলাম । যাই দেখে আসি একবার।

আরতি ঃ মানে সময় কাটাতে।

অক্ষয় ঃ এটা একটা কথা হলো ম্যাডাম! এই ব্যবসাটা আর পাঁচটা ব্যবসার মতো নয়, প্রতিটি আসবাবের আলাদা আলাদা ইতিহাস আছে, গন্ধ আছে।

সুজিত ঃ তার মানে আপনি গন্ধ শুঁকতে এসেছেন?

অক্ষয় ঃ এসেছিলাম হয়তো .... কিন্তু আসার পরে মনে হচ্ছে , না এলে ভুলই করতাম।

সুজিত ঃ এমন মনে হওয়ার কারণ?

অক্ষয় ঃ (আরাম কেদারাটার হাতলে হাত দিয়ে) এরকম একটা জিনিস দেখলাম, এসব ব্যতিক্রম! আজকাল আর কোথায়?

সুজিত ঃ (হাতটা আলতো করে সরিয়ে দিয়ে) এটা কিন্তু বিক্রি করবো না।

আরতি ঃ তার মানে? জিনিসপত্র কেনার জন্যই তো ওকে ডাকা...

সুজিত ঃ সব জিনিস আমি বিক্রি করবো না আরতি।

আরতি ঃ কোথায় রাখবে?

সুজিত ঃ সে দেখা যাবে।

অক্ষয় ঃ (গড়গড়টা দেখিয়ে) এঠাও বোধহয় বিক্রি করবেন না।

সুজিত ঃ ঠিক ধরেছেন।

(অক্ষয় বেরতে যায়।)

সুজিত ঃ চললেন কোথায?

অক্ষয় ঃ আমার তো মনে হয় আপনারই টাইম-পাস করার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সুজিত ঃ (রেগে গিয়ে) ওরকম বদ-রসিকতা করার অভ্যেস চৌধুরী বাড়ির কারো নেই।

অক্ষয় ঃ (দাঁড়িয়ে গিয়ে) আপনার তাই মনে হলো তাহলে যা শুনেছিলাম, ঠিকই শুনেছিলাম....... না,

সুজিত ঃ কী শুনেছিলেন জানতে পারি?

অক্ষয় ঃ আপনার বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কাছাকাছি একটা মনোহারি দোকানে খোঁজ নেওয়াতে একজন বয়স্ক দোকানদার বললেন .... না থাক।

সুজিত ঃ কী বললো? দেখুন হেঁয়ালি বা রসিকতা কোনটাই আমি পছন্দ করি না।

অক্ষয় ঃ বলেছিলেন যে, সুজিত চৌধুরিকে এই পাড়ার পুরনো বাসিন্দা সবাই চেনে। মানে এই শহরে যে সব পুরনো এখনও রয়ে গেছে আর কি!

সুজিত ঃ কিন্তু মনে রাখলো কোথায়? কি বললো?

অক্ষয় ঃ বলছিলেন, আপনি নাকি এক সময়ে মফস্বল শহরে বেশ নেতাস্থানীয় ছিলেন আপনার কম বয়সে .....

সুজিত ঃ (লজ্জা ও হাসি নিয়ে) ঐ আর কী, কম বয়সে যেমন হয়। পাড়ার পুজোর সেক্রেটারী-

আরতি ঃ দূর্গা থেকে শীতলা।

সুজিত ঃ সবাই চাইত, কী আর করা যাবে!

আরতি ঃ দু'একবার ওই দেবাশিস না শুভাশিস ঐ ছেলেটা....

সুজিত ঃ দূর দূর! ওর যোগ্যতা ছিল নাকি? আমার এক ডাকে পঞ্চাশ-ষাটটা ছেলে যোগাড় হয়ে যেত।

অক্ষয় ঃ ওই এলাকার দাদাগোছের লোকজন যেমন হয় তেমনটা বোধহয়। আমি তাহলে এখন আসি।

সুজিত ঃ যাবার আগে ভেতরের ঘরটা একবার দেখে গেলে পারতেন।

অক্ষয় ঃ কি আছে।

সুজিত ঃ আপনাকে যে শুধু শুধু ডাকি নি তার প্রমাণ। কি আছে?

অক্ষয় ঃ বেশ , এদ্দুর এই বুড়ো হাড়ে এলামই যখন একবার দেখেই যাই।

সুজিত ঃ চা খাবেন নাকি?

অক্ষয় ঃ ওটাও কি ভিনটেজ মডেল এর কেট্‌লে....

সুজিত ঃ (একটু হেসে ফেলে) না, না, টী পট .... আর টী ব্যাগ নিয়ে এসেছি। চা ছাড়া আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারি না।

অক্ষয় ঃ আমার বিশেষ অভ্যেস নেই, যদি আপনার জন্য বানান, দেবেন না হয় .... চিনি দু'চামচ।

সুজিত ঃ চিনি তো ....

অক্ষয় ঃ আনেন নি? তবে থাক, আপনাদের খেতে দেখে যদি ইচ্ছে হয় তখন না হয় বাইরে গিয়ে খেয়ে আসব। (ভেতরের ঘরে চলে যায়)

সুজিত ঃ ইন্ দ্যাট কেস, পয়সাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। এটা চৌধুরিদের প্রেস্টিজের ব্যাপার (আরতিকে) চিনি আনলে না কেন?

আরতি ঃ আমরা বোধহয় অক্ষয়বাবুকে চা খাওয়াবার জন্য কলকাতা থেকে এতদূর আসিনি।

সুজিত ঃ কতক্ষণ লাগবে, সুহাসই বা কখন আসবে?

আরতি ঃ খিদে পাচ্ছে।

সুজিত ঃ পেলেই বা কী!

আরতি ঃ সঙ্গে পরোটা-তরকারী নিয়ে এসেছি।

সুজিত ঃ কখন বানালে।

আরতি ঃ সকালে উঠে। দেব ....

সুজিত ঃ সুহাস আসুক

আরতি ঃ ওইসব খাবার সুহাসের রুচবে?

সুজিত ঃ সে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাবে। অদ্দুর থেকে আসছে, বরং একটু চা-ই বানাও।

আরতি ঃ (চা বানাতে বানাতে) তোমার কী মনে হয়?

সুজিত ঃ কিসের?

আরতি ঃ এই যে এই লোকটা, অক্ষয় না কী যেন নাম বললে, ও ওই জিনিসগুলোর দাম বুঝবে?

সুজিত ঃ আগে তো জিনিসগুলো দেখুক।

আরতি ঃ সে কথা বলিনি, লোকটাকে দেখে তো মনে হলো না অতগুলো টাকা দিয়ে জিনিসগুলো কিনতে পারে বলে। ভেতর থেকে অক্ষয় বেরিয়ে আসে।

অক্ষয় ঃ চেহারা দেখে আন্দাজ করলে দেখবেন, বেশিরভাগ সময়ই ভুল হয়ে যাচ্ছে।

সুজিত ঃ (প্রচন্ড রেগে গিয়ে) আপনি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন নাকি?

অক্ষয় ঃ না স্যার .....

সুজিত ঃ তাহলে?

অক্ষয় ঃ আসলে আপনি ওই চা খাওয়ানোর বানানোর কথা বললেন না ম্যাডামকে, তখনই আমার ভেতরটা কেমন আনচান করে উঠল। আমাকে চিনি ছাড়াই দিন ম্যাডাম, চালিয়ে নেব।

(আরতি কী করবে বুঝতে না পেরে সুজিতের দিকে তাকায়। সুজিত ইশারায় চা দিতে বলে। আরতি একটা কাগজের কাপে চা এগিয়ে দেয়।)

অক্ষয় ঃ (চা নিতে নিতে) স্যারের.....

আরতি ঃ (সুজিতকে চা দিতে দিতে) আপনাকে ভাবতে হবে না।

অক্ষয় ঃ (চেয়ারে বসে আরাম করে চায়ে চুমুক দেয়) চা পাতাটা চমৎকার -------। এই বয়সে নুন চিনি কম খাওয়াই ভালো।

সুজিত ঃ আপনার কাজ কী শেষ?

অক্ষয় ঃ কী যে বলেন স্যার, আমার পরে কত ছোকরা এই লাইনে এলো, কেউ টিকতে পারলো না। এই কারবারে তাড়াহুড়ো করেছ কী মরেছ। হয় নিজে ঠকে গেলে না হয় পার্টিকে ঠকিয়ে ফেললে।

সুজিত ঃ আপনি কাউকে কখনও ঠকান নি?

অক্ষয় ঃ নিজেও ঠকিনি। অন্তত জ্ঞানত নয়। প্রতিটা আসবাবের, পুরনো জিনিসের আলাদা আলাদা চরিত্র আছে সেটা বুঝতে হবে, তারপর বাজারে সেটার কদর জানে এরকম মানুষের খোঁজ রাখতে হবে। তারপর ধরুন কী রকম দাম দিলে পার্টির লস্ না হয়, আমারও কিছু থাকে, সেটা ঠিক করতে হবে।

সুজিত ঃ তার মানে, আপনার কাজ মনে হচ্ছে আজকের মধ্যে শেষ হবে না।

অক্ষয় ঃ হয়ে যাবে স্যার, বেশিক্ষণ টাইম নেব না। জিনিসগুলোকে একবার করে চোখের দেখা দেখেছি, একটিবার গায়ে হাত বুলিয়ে নিই .... কাজটা এতক্ষণে খানিকটা এগিয়েও যেত, রাস্তায় খামোকা পুলিশ আটকে দিল।

আরতি ঃ (অবাক হয়ে) পুলিশ? কেন?

অক্ষয় ঃ শহরে কোন্ নেতা না মন্ত্রী এসেছে, কিসের যেন মিটিং ছিল। গাড়ি তো ছেড়ে দিন স্যার, পায়ে হেঁটেও আসতে দিচ্ছিল না। (কাপটা রাখে) চা টা বেশ ভালো হয়েছিল। ম্যাডাম, চিনি ছাড়া মন্দ লাগলো না। আর একবার বানালে বলবেন, আমি বরং

সুজিত ঃ হ্যাঁ, আপনি বরং ভেতরে গিয়ে তাড়াতাড়ি আপনার কাজটা সারুন। (অক্ষয় ভেতরে যায়)

আরতি ঃ (নিচু গলায়) এতো আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লাম।

সুজিত ঃ ওরকম ফিস ফিস করে কথা বলছো কেন?

আরতি ঃ আড়ি পেতে শুনছে কি না!

সুজিত ঃ ওই লোকটাকে ভয় পাবার কী আছে? তুমি নিজের বাড়িতে বসে কথা বলছ।

আরতি ঃ আমার শ্বশুরমশাইয়ের শ্বশুর।

সুজিত ঃ অল দ্য সেম্.......

আরতি ঃ (নিচু গলাতেই) আমার কিন্তু সত্যি ভরসা হচ্ছে না। কতক্ষণ লোকটা এসেছে, একটা মোটামুটি এস্টিমেট এখনও পর্যন্ত দিতে পারলো না। কাজের চেয়ে বকবক বেশী করছে।

সুজিত ঃ বললাম তো আমার হাতে অপশন বিশেষ ছিল না।

আরতি ঃ ওই ও-এল-এক্স না কি যেন বলে না, টুবানরা জানে।

সুজিত ঃ প্রথমত ওসব আমি ভালো বুঝি না, দ্বিতীয়ত টাকাটা আমার প্রয়োজন আর সেটা ইমিডিয়েটলি।

আরতি ঃ সুহাস যদি বিক্রি করতে রাজি না হয়, ওর তো টাকার প্রয়োজন নেই।

সুজিত ঃ টাকার প্রয়োজন কখনও কারুর ফুরোয় না।

আরতি ঃ যদি কোনো কারণে বেঁকে বসে, তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো।

সুজিত ঃ সেটা পারবো না। আজ একটা সিনেমা দেখব ভাবছিলাম!

আরতি ঃ সিনেমা? তুমি? হঠাৎ?

সুজিত ঃ আসবার সময় একটা মলে দেখলাম অমিতাভের একটা বই হচ্ছে।

আরতি ঃ হঠাৎ?

সুজিত ঃ ইচ্ছে হলো। একটা সময় অমিতাভের একটা বইও ছাড়তাম না। মনে হলো সব যদি ঠিকঠাক মিটে যায় তাহলে ফেরার সময় নাইট শো-এ একটা সিনেমা দেখে ফিরবো।

আরতি ঃ বিয়ের পর তো একটাও দেখাওনি।

সুজিত ঃ দেখেছিলাম, তুমি ভুলে গেছ।

আরতি ঃ দেখতে গিয়েছিলাম, আর্দ্ধেকটা দেখেই বেরিয়ে আসতে হয়েছিল, মনে আছে?

সুজিত ঃ স্কুল মাস্টারদের এই এক সমস্যা, সব জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীরা হাজির।

আরতি ঃ হলের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস তারপরে টিপ করে প্রণাম।

সুজিত ঃ আসলে ওই জায়গাটা তখনও পুরোপুরি কলকাতা হয়ে ওঠে নি। সিনেমা হলের যাওয়ার কথা ভাবলে আমারই অস্বস্তি হতো। সব জোড়ায় জোড়ায় বসে।

আরতি ঃ তারপরে সময়ই বা কোথায় সকাল-বিকেল টিউশনি

সুজিত ঃ শখ করে করিনি, উপায় ছিল না। নতুন বাড়ির জন্য লোন শোধ, টুবানকে বোর্ডিং -এ টাকা পাঠানো ....

আরতি ঃ ওই একটাই শখ ছিল আমার।

সুজিত ঃ কারণ তোমার দিদির ছেলে.....

আরতি ঃ আরও কিছু কারণ ছিল ...

সুজিত ঃ কী?

(হঠাৎ অক্ষয় ভেতর থেকে খুব ভয় পেয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে।)

সুজিত ঃ কী হলো?

(অক্ষয় ভেতর থেকে আঙুল দেখায়, কিছু বলতে পারে না।)

সুজিত ঃ কী হলো বলবেন তো?

অক্ষয় ঃ চোখ! চোখ! দুটো চোখ.....

আরতি ঃ সে তো সবারই থাকে। সম্ভবত...

অক্ষয় ঃ না, না সে নয় ভেতরের ঘরে।

সুজিত ঃ অতীতের জিনিস নিয়ে কারবার করতে গেলে ভূতে বিশ্বাস করতে হয় নাকি?

অক্ষয় ঃ ওসবে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু দুটো অদ্ভূত চোখ দেওয়াল থেকে।

সুজিত ঃ বেশ চলুন তো দেখি ....

সুজিত অক্ষয়কে নিয়ে জোর করেই ভেতরে ঢোকে। আরতি এক কোণে রাখা গ্রামোফোনটায় রেকর্ড চালানোর চেষ্টা করে ... চলে না। সুজিত আর অক্ষয় বেরিয়ে আসে। সুজিতের হাতে একটা স্টাফ্ড প্যাঁচা।

সুজিত ঃ (হাসতে হাসতে) স্টোররুমের দেওয়ালে ঝোলানো ছিল ভুলেই গিয়েছিলাম!

অক্ষয় ঃ এরকম বিদ্‌ঘুটে জিনিস আমি আমার এতদিনের জীবনে খুব কম দেখেছি। এরকম জিনিস কেউ শখ করে বাড়িতে রাখে নাকি?

সুজিত ঃ (ছাদের দিকে আঙুল তুলে) ওই দেখুন ....

অক্ষয় ঃ (ওপরদিকে তাকিয়ে) কী?

সুজিত ঃ দেখুন ছাদের একটা জায়গায় চট্‌লা ওঠা, রঙ করার সময়ও ওটা বাদ দিয়ে রঙ করতে বলেছিলাম।

অক্ষয় ঃ চট্‌লা-র সঙ্গে এই প্যাঁচা-টার কী সম্পর্ক?

সুজিত ঃ (এয়ারগানটা তুলে নিয়ে) ছাদেরটা হাত ফসকে, আর (প্যাচাটাকে দেখিয়ে) এটা টিপ্ করে। প্রথম যৌবনের স্মৃতি, স্টাফ করে রেখে দিয়েছিলাম, আজ আপনার চোখে পড়ল বলে সব আমার সামনে যেন ভেসে এলো।

আরতি ঃ (গ্রামোফোনটা দেখিয়ে) এটা আর সারানো যাবে না, না?

অক্ষয় ঃ এটাও বিক্রি করবেন না?

আরতি ঃ যদি সারানো যেত....

অক্ষয় ঃ যাবে বোধহয়। এদিকে নেই, কলকাতার দিকে এখনও হয়ত দু'একজন মিস্ত্রী বেঁচে-বর্তে আছে। তবে ইদানিং এগুলোর বেশ কদর হয়েছে।

আরতি ঃ চলবে কী না ঠিক নেই, মিস্ত্রী পাওয়া যাবে, কী না তারও খোঁজ নেই .... তবু কদর!

অক্ষয় ঃ ওই কিছু টাকা দিয়ে এক কোণে অল্প জায়গায় বেশ বনেদীয়ানা কিনে রাখা যায় কী না ....

(আরতি গ্রামোফোনটার গায়ে হাত বোলায়)

অক্ষয় ঃ এটা বিক্রি করতে হবে না ম্যাডাম। কোথায় কীভাবে সারানো যায় আমিই না হয় খোঁজ দিয়ে দেব- (প্যাঁচাটাকে দেখিয়ে) আর ওটা স্যার ফ্রী-তে দিলেও নেব না।

সুজিত ঃ এতদিন পরে পেলাম যখন রেখেই দি।

অক্ষয় ঃ কিছু মনে করবেন না স্যার, তাহলে ওটা আপাতত একটু চোখের আড়ালে রেখে আসুন। যাতে ঘরের ভেতরের আসবাবগুলোর কাছে গেলেও ওই চোখ দুটো যেন চোখে না পড়ে।

সুজিত ঃ বেশ, এবার কাজের কথায় আসা যাক...

(অক্ষয় করুণভাবে হাত দিয়ে প্যাঁচাটাকে দেখায় ...)

সুজিত ঃ ওকে, ওকে! (ভেতরে যায়)

অক্ষয় ঃ ভেতরের ঘরে একটা হারমোনিয়াম দেখছিলাম যেন ....

আরতি ঃ ভালো করে দেখেন নি,খালি বাক্সটা রয়েছে। (সুজিত ভেতরে থেকে বেরিয়ে আসে। অক্ষয় ভালো করে ওর হাত দুটো দেখে নেয়)।

অক্ষয় ঃ বেশ, এবার বলুন...

সুজিত ঃ বলবেন তো আপনি।

অক্ষয় ঃ মোটামুটি দেখলাম, বলছিলাম কী এই যে জিনিসগুলো দেখলাম... এর কোন কাগজপত্র আছে?

সুজিত ঃ না, নেই। এতো পুরনো আসবাবের যে রসিদ রাখা সম্ভব নয়, সেটা নিশ্চয়ই আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বোঝেন।

অক্ষয় ঃ এতগুলো জিনিস একটা-দুটো তো নয়.....

সুজিত ঃ সব কিছুই লেখাপড়া করেই হবে। আমিই মালিক।

অক্ষয় ঃ আপনার কোন ভাইবোন? কোন আইনী ওয়ারিশ?

সুজিত ঃ এক ভাই আছে। তবে আশা করি কোন অসুবিধে হবে না।

অক্ষয় ঃ তিনি যদি পরে কোন ফ্যাকড়া তোলেন? আসলে কম দিন তো হলো না... আচ্ছা আপনি ঠিক কী করেন? মানে কিছু মনে না করলে ব্যবসা, চাকরি, মাস্টারি.....

সুজিত ঃ স্কুলে পড়াতাম। সদ্য রিটায়ার করেছি।

অক্ষয় ঃ দেখলেন, ঠিক আন্দাজ করেছি। মানে আপনার আর আমার কারবারটা মোটামুটি এক রকম, মানুষ নিয়ে, আপনার নতুন নতুন মানুষ ... আর আমার প্রায় বাতিল হওয়া, কিন্তু হয়তো দামী।

সুজিত ঃ পরিস্কার করে বলবেন?

অক্ষয় ঃ বয়স হয়েছে তো যেটা বলছিলাম, অনেক দেখেছি, এক ভাই সব বিক্রি করে দিল, হঠাৎ আর এক ভাই এসে ফ্যাচাং খাড়া করে দিল।

সুজিত ঃ চিন্তা নেই আমার ভাই আজই আসবে, হয়তো একটু পরেই।

অক্ষয় ঃ তাহলে আশা করা যায় হুজ্জত কম। একবার কী ঝামেলা, সামান্য শ'পাঁচেক টাকা দামের একটা স্যু-র‍্যাক, হ্যাঁ... সামান্য অন্যরকম একটা ডিজাইন ছিল, তাই নিয়ে দু'ভাইয়ের কোর্ট-কাছারি..... অধিকার বুঝলেন, অধিকার।

সুজিত ঃ আমাদের এই জিনিসগুলো পুরনো। কোনো কোনোটা অনেক পুরনো, কিন্তু খুব মজবুত। একটা পালিশ দিয়ে নিলে বয়স বোঝা যাবে না।

অক্ষয় ঃ আর আসবাবের ডিজাইন দেখুন, ওই ডিজাইনগুলোই বয়সটা ধরিয়ে দেবে। সবগুলোর নয় অবশ্য।

সুজিত ঃ তার মানে আপনি বেছে নেবেন? আমি আপনাকে বলেছিলাম নিলে সবগুলোই নেবেন, না হলে একটাও না। বাড়িটা ভাঙা হবে সুতরাং আমাদের হাতে সময় বেশী নেই।

অক্ষয় ঃ আমায় সবগুলো নিতে বলছেন, অথচ কিছু কিছু জিনিস আপনি বিক্রয়যোগ্য নয় বলে আপনি সরিয়ে রাখছেন।

সুজিত ঃ মালিক হিসেবে ওইটুকু সুবিধে আমার প্রাপ্য বোধহয়।

অক্ষয় ঃ হুম! যেমন ওই গ্রামোফোনটার ওপর আমার লোভ হচ্ছিল, এর আগেও যতবার হাতে এসেছিল বিক্রি করে দিয়েছিলাম .... পয়সার জন্য। একসময় আমিও একটু-আধটু গান গাইতাম, শুনতাম (আরতিকে দেখিয়ে) এই ম্যাডামের মতো।

সুজিত ঃ (আরতিকে) - তুমি!

অক্ষয় ঃ না, না, উনি কিছু বলেন নি। কেনই বা বলবেন ... ওই যে বললাম, মানুষ নিয়ে কারবার।

সুজিত ঃ দামগুলো বলবেন?

অক্ষয় ঃ অসাধারণ সব জিনিস সব, পয়সা ফেললেও পাওয়া যাবে না

সুজিত ঃ তাহলে বলছেন?

অক্ষয় ঃ এ সব জিনিসের জন্য পয়সা ফেলার লোকও খুব বেশী পাওয়া যাবে না।

সুজিত ঃ তার মানে?

অক্ষয় ঃ আমার সন্ধানে এখনও কিছু অন্যরকম মানুষ আছেন, তবে ...

সুজিত ঃ তবে কী?

অক্ষয় ঃ ওই ফার্নিচারগুলোর চেহারা দেখলে, গন্ধ পেলে, অন্য যে কোনো ব্যবসায়ী আর উৎসাহ প্রকাশ করবে না।

সুজিত ঃ বুঝেছি টাকা কমাতে চাইছেন?

অক্ষয় ঃ না।

সুজিত ঃ তবে?

অক্ষয় ঃ এগুলো অক্ষয়, অমর। ঠাকুর্দা, বাবা, ছেলে সব পটাপট মরে যাবে। অথচ এগুলোর লয়-ক্ষয় কিছু হবে না। আপনি সবে রিটায়ার করেছেন বললেন?

সুজিত ঃ হুম!

অক্ষয় ঃ আপনার বৈবাহিক জীবন নিশ্চয়ই অনেকদিনের?

সুজিত ঃ যাঃ বাবা! আসবাবের দামের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

অক্ষয় ঃ না, সরাসরি নেই। আসলে আমি এই মাত্র কিছুদিন হলো বিয়ে করেছি। এখন মনে হয় এই যে এত বয়সে সারাদিন ধরে ঠোকাঠুকি করে, গায়ে হাত বুলিয়ে গন্ধ নিয়ে, এক একটা জিনিসের দাম ঠিক করবো, খদ্দের খুঁজে বিক্রি করবো, দুটো পয়সা হয়তো লাভও করবো , ... তারপর?

সুজিত ঃ তারপর.....

অক্ষয় ঃ তারপর হয়তো দুম করে টেসে যাবো। আর যে মহিলাকে পাঁচবছর অগেও চিনতাম না, তিনি সবটা ভোগ করবেন।

আরতি ঃ অক্ষয়বাবু!

অক্ষয় ঃ বলুন ম্যাডাম.....

আরতি ঃ আপনি যখন পুরনো জিনিস কেনেন, বিক্রিও করেন নিশ্চয়ই।

অক্ষয় ঃ নইলে চলবে কী করে?

আরতি ঃ একটা ভালো হারমোনিয়ামের সন্ধান থাকলে আমায় বলবেন। স্কেল চেঞ্জার। (সুজিত তাকায়) আমার জমানো কিছু টাকা আছে। (সুজিত কিছু বলতে যায়) টুবান পাঠায় মাঝে মাঝে....

সুজিত ঃ অথচ ......

অক্ষয় ঃ চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, স্যারের নাম্বার তো আমার কাছে আছে, সন্ধান পেলেই জানাবো।

সুজিত ঃ আপনি সত্যিই মাত্র কিছুদিন আগে বিয়ে করেছেন?

অক্ষয় ঃ শেষ বিয়েটা।

সুজিত ঃ মানে?

অক্ষয় ঃ মানে, যে যে বয়সে বিয়ে করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছে, সবগুলোতেই একবার করে করে নিয়েছি। অবাক হচ্ছেন? মানুষ যেকোনো বয়সেই মরতে পারে, পঁয়ষট্টিতেও পারে পনেরোতেও। সে ভেবে বিয়ে না করার কোনো মানে হয় না।

সুজিত ঃ জিনিসগুলো?

অক্ষয় ঃ প্রাণ ফিরে পাচ্ছি জানেন? সেই কম বয়সটা... এক সঙ্গে এমন ঝাঁক ঝাঁক পুরনো গন্ধ কতোদিন পাইনি কে জানে? আপনার বাবা বেশ সৌখিন মানুষ ছিলেন।

আরতি ঃ আমার শ্বশুরমশাইয়ের শ্বশুরমশাই...

অক্ষয় ঃ ও .... সুজিত কিছু বলতে যায়, আরতি যেন খেয়াল করে না।

আরতি ঃ আবার শ্বশুরমশাই তিনি একটার পর একটা ব্যবসা করার চেষ্টা করেছেন...

অক্ষয় ঃ এবং একটাও দাড়ায়নি।

সুজিত ঃ (অবাক হয়ে) আপনি ....। আপনার জ্যোতিষ শাস্ত্রে দখল আছে দেখছি।

অক্ষয় ঃ আরে না না, এসব খবর বাড়ির দেওয়ালে পুরনো চুনকাম দিয়ে লেখা থাকে। যেমন আমার বাড়ির দেওয়ালে, ছাদে একটাই কথা লেখা আছে....

আরতি ঃ কী?

অক্ষয় ঃ আমার মেয়েটা, আমার একমাত্র মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে....

সুজিত ঃ আগের পক্ষের?

অক্ষয় ঃ সন্তান পক্ষপাতশূন্য হয় স্যার ....

. আরতি ঃ আহা রে!

সুজিত ঃ দেখুন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ সবার থাকে, আপাতত আমরা দরদস্তুরটা সেরে নিই।

আরতি ঃ ওনাকে একটু সামলে নিতে দাও...

সুজিত ঃ কাজকর্মের সময় আবেগ-টাবেগ দূরে সরিয়ে রাখা উচিত।

অক্ষয় ঃ আপনি বোধহয় আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না, না! ভাবছেন এসব কথায় ভুলিয়ে আমি আপনাদের ঠকাতে চাইছি।

সুজিত ঃ কী মুশকিল! এ কথা তো আমি বলিনি।

অক্ষয় ঃ বলেন নি, ধরে নিয়েছেন। পারস্পরিক ভরসাটুকু বিশ্বাসটুকু যদি চলেই যায় তাহলে আর কী থাকে বলতে পারেন? চলে যেতে চায়

সুজিত ঃ অক্ষয়বাবু........

অক্ষয় ঃ আমার দরকার নেই। এসব ব্যবসা থেকে অনেকদিন নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলাম, আপনার ফোন পেয়ে হঠাৎ যে কী হলো।

সুজিত ঃ হুম্! আমার ফোন পেয়ে আপনি স্বেচ্ছায় এসেছিলেন।

অক্ষয় ঃ এই আসবাবগুলো আমার না কিনলেও চলবে, কিন্তু আপনার এগুলো বিক্রি করতেই হবে।

সুজিত ঃ আপনি পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাইছেন, সে ক্ষেত্রে আমি এগুলো বিক্রি করবো না যেমন আছে, থাকবে।

অক্ষয় ঃ আগেও বলেছি, লোক ঠকানো আমার পেশা নয়।

সুজিত ঃ তাহলে এবার একটা দাম বলুন!

অক্ষয় ঃ সবগুলো এক সাথে? না কী আলাদা আলাদা করে

সুজিত ঃ অত সময় হবে না। মোট একটা থোঁকা দাম বলুন।

অক্ষয় ঃ তারপর তো বলবেন, ওটা বিক্রি করবো না, এটা বিক্রি নেই- (হঠাৎ ঘরের ভেতর দিকে আঙুল তোলে) ওঘরে একটা পালঙ্ক আছে না?

সুজিত ঃ ওটা বিক্রি করবো।

অক্ষয় ঃ (একটা ফিতে বের করে) ওঠা আর একবার মেপে আসি।

সুজিত ঃ একবার তো মেপেছেন।

অক্ষয় ঃ দ্বিতীয়বার দেখতাম, যদি দু'এক ইঞ্চিও কম হয় ।

সুজিত ঃ কী সব উল্টো পাল্টা বকছেন?

অক্ষয় ঃ অসাধারণ জিনিস স্যার, কিন্তু মাপটা বড্ড বেখাপ্পা (সুজিত কিছু বলতে যায়) ঘাটের নয় স্যার ফ্ল্যাটের। আজ কালকার ফ্ল্যাটের ....

সুজিত ঃ আবার দাম কমানোর ফিকির?

অক্ষয় ঃ আমি কিন্তু স্যার এখনও কোনো দাম বলিনি। আসলে বড্ড লোভ হচ্ছে। এই জিনিসগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, রোজ রোজ একটু একটু করে। ভালবাসা না থাকলে এই পেশায় আসা যায় না স্যার, আবার ভয়ও হচ্ছে যদি ঠিকঠাক খদ্দের না পাই তখন?

সুজিত ঃ তাই যতটা কম দামে সম্ভব আপনি এগুলো বাগিয়ে নিতে চান।

অক্ষয় ঃ দর প্রথমে যা ভেবেছিলাম এখনও মোটামুটি সেটাই।

সুজিত ঃ সেটা কতো দয়া করে যদি বলেন।

অক্ষয় ঃ আপনি অখুশী যা গররাজি হতে পারেন এমন কিছু বলবো না। খুব খিদে পেয়েছে দাঁড়ান একটু খেয়ে আসি।

সুজিত ঃ তার মানে আরও কিছুক্ষণ সময় নষ্ট!

অক্ষয় ঃ পেটের জন্যই তো এতকিছু স্যার, এই যাবো আর আসবো। (বেরুতে গিয়ে আবার ফিরে আসে) দুপুরবেলা, মফ:স্বল শহর, তার উপর আজ আবার মন্ত্রী-সান্ত্রী এসেছে, দোকান খোলা থাকবে কী না কে জানে। এদিকে খালি পেটে থাকলেই আমার আবার গ্যাসের প্রবলেম, আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই কিছু খাবার-দাবার আছে।

সুজিত ঃ আবার আড়ি পেতেছিলেন?

অক্ষয় ঃ ঠিক তা নয়, এতদিনের অভিজ্ঞতা। সারাদিনের জন্য বাইরে থেকে এসেছেন, এখানকার রাস্তাঘাটের খাবার খাবেন না নিশ্চয়ই। কিছু হবে না কি ম্যাডাম? (আরতি কী করবে বুঝতে না পেরে সুজিতের দিকে তাকায়) সে না হয় বললে এই আসবাবগুলোর দামের সঙ্গে জুড়ে নেবেন।

সুজিত ঃ অপমান করছেন? জানেন একসময় এই বাড়িতে কত জনের পাত পড়তো?

অক্ষয় ঃ ছিঃ! ছিঃ! স্যার, কী যে বলেন! আমার একটু খিদে পেয়ে গেল, মাথাটা ঠিকঠাক কাজ করে না, সে টুকুই খালি বললাম।

সুজিত আরতিকে ঈশারা করে আরতি একটা প্লেটে খাবার দেয় অক্ষয়কে।

অক্ষয় ঃ (খেতে খেতে- প্রায় গোগ্রাসে) নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছি যেন।

আরতি ঃ রান্নাটা ভালো হয়েছে?

অক্ষয় ঃ সে তো হয়েইছে, জানেন আমার জিভটা যেন ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া মা-এর স্বাদকে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে, তবে তার চেয়েও বড় কথা হলো---

আরতি ঃ (উৎসাহ নিয়ে) কী?

অক্ষয় ঃ আবার যেন হারানো সময়টাকে ফিরে পাচ্ছি কাজ করার উৎসাহটাই হারিয়ে ফেলেছিলাম, আপনারা আবার আমায় পুরনো দিনের গন্ধের মাঝখানে এনে ফেললেন। আমি যেন আমার মেয়েটার মুখটা দেখতে পাচ্ছি। লক্ষ্মীঠাকুরকে কেমন দেখতে তা তো জানি না, কিন্তু কেন জানি না ....

(হঠাৎ-ই কথা শেষ করে খাবারে মন দেয় অক্ষয়।)

সুজিত ঃ মেয়ে যদি বেঁচে থাকতো.. বড় হতো ... আপনাকে কী মনে রাখত? (অক্ষয় অবাক হয়ে তাকায়) আমার ছেলেটা, অনেক দূরে থাকে বিশেষ যোগাযোগ রাখে না, ফোনও করে না। কেবলে টাকার দরকার হলে......

অক্ষয় ঃ সবটা একরকম নয় হয়তো ... জানি না।

সুজিত ঃ আমিও না। বাবার তখন শেষ অবস্থা, আপ্রাণ চেষ্টা করছি বাবাকে বাঁচিয়ে রাখার, সুস্থ করার, আমার ছোটভাই রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত, মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠিয়ে দায় সারতো।

অক্ষয় ঃ (খাওয়া শেষ করে হাত চাটতে চাটতে) আপনার কোন্ কোন্ জিনিস বিক্রি করবেন না তা বুঝে ফেলেছি, বাদবাকি জিনিসগুলোর একটা দাম ঠিক করে ফেলেছি.... তেতাল্লিশ হাজার সাতশো।

সুজিত ঃ মাত্র!

অক্ষয় ঃ আপনি বাজার যাচাই করে নিন।

সুজিত ঃ আপনি ভালো করেই জানেন সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু এরকম একটা অদ্ভুত এমাউন্ট কেন?

অক্ষয় ঃ আমি ঠকতে বা ঠকাতে ভালবাসি না। যে আইটেমের যা দাম হওয়া উচিত সেভাবেই হিসেব করেছি, তবে আপনি চাইলে আমি কম টাকার রসিদ দিতে পারি। আপনি না হয় তার অর্দ্ধেক ভাইকে দেবেন।

সুজিত ঃ (একটু ভেবে। নাহ! সেটা ঠিক হবে না, ও যাই করে থাকুক, ও আমার ছোট ভাই, ওর ভাগের টাকাটা আমি মেরে দিতে পারবো না। (ঘড়ি দেখে) কিন্তু সুহাস তো এখনো এসে পৌঁছল না। (আরতিকে) কী করবো বলতো? এই কাজটুকুর জন্য কী আবার কাল আসতে হবে?

আরতি ঃ আমি! আমি কী বলবো? তবে আজ যখন এলো না কাল কী আসবে?

সুজিত ঃ (অক্ষয়কে) কি করা যায় বলুন তো? আপনি কী কাল একবার আসতে পারবেন?

অক্ষয় ঃ আপনার ভাইকে একবার ফোন করে দেখুন ...

সুজিত ঃ যদি ফোন ধরে তাহলে তো....

অক্ষয় ঃ আপনার কী দর পছন্দ হয় নি?

সুজিত ঃ একবার ভাই-এর সঙ্গে কথা বলে নিতে পারলে ভালো হতো।

অক্ষয় ঃ আপনি কিন্তু এতক্ষণ বলছিলেন ....

সুজিত ঃ আমি বরং আজ রাতে অথবা কাল সকাল সকাল আপনাকে একটা ফোন করবো।

অক্ষয় ঃ যদি পারি ধরবো।

সুজিত ঃ মানে?

অক্ষয় ঃ পেট ঠাণ্ডা হলো, মাথাটাও। তারপর যখন নেব ঠিক করলাম, আপনি কিন্তু কিন্তু করছেন। দর বাড়াতে চাইলে বলুন, আমি বড় জোর আর আঠেরোশো টাকা বাড়াতে পারি, অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, আসবাবগুলোও অন্যরকম, একটু ঝুঁকি নেওয়াই যায়। (বাইরে থেকে হুটারের আওয়াজ পাওয়া যায়।)

আরতি ঃ ওই হলো বোধহয় .....

(আরতি ও সুজিত দৌড়ে দরজার কাছে যায়। প্রবেশ করে সুহাস।)

বিরতি

দ্বিতীয় অর্ধ

সুহাসের মন্ত্রীসুলভ পোশাক-আশাক। তাকে দেখই অক্ষয় ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সুহাস পিছনে ঘুরে বলে-

'ভেতরে আসার দরকার নেই, আপনারা বাইরেই অপেক্ষা করুন'

সুহাস ঃ (সুজিতকে) বডিগার্ড! সব সময়, সব জায়গায়! মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। (হঠাৎ অক্ষয়কে খেয়াল করে) আপনি ঐভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? বসুন।

অক্ষয় ঃ মানে স্যার! আপনাকে স্যার! ... এখানে স্যার!

সুহাস ঃ এখানেই ছোটবেলার অনেকটা সময় কাটিয়েছি।

সুজিত ঃ আমার ছোটভাই।

অক্ষয় ঃ কী সৌভাগ্য স্যার! আপনাকে কাগজে দেখি, টিভি-তে দেখি, দেওয়ালে দেখি ... অথচ জানতামই না .....

সুহাস ঃ আমি এই শহরের .....

অক্ষয় ঃ হ্যাঁ স্যার।

সুহাস ঃ এই পাড়ায় বা এই শহরে আমার কোনো পরিচিতি ছিল না, হাতে গোনা কয়েকজন চিনতো, তারাও ডাকনামে।

আরতিঃ তোমার চেহারাতেও কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে....

সুহাস ঃ অনেকগুলো বছর তো মাঝখান থেকে পেরিয়ে গেল। তোমার চেহারাতেও অনেক বদল এসেছে।

আরতিঃ বদল নয়, বয়সের ছাপ। স্বাভাবিক!

সুহাস ঃ তো তোমার লেখালেখি কেমন চলছে বৌদি?

সুজিত ঃ লেখালেখি? কার? তোমার?

সুহাস ঃ (অক্ষয়কে) ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, বসুন। (সুজিতকে) তুমি বোধহয় জানতে না বৌদি খুব ভালো লিখতো। বেশ ভালো। অনেক পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। আমি পোস্ট করে আসতাম, লুকিয়ে।

সুজিত ঃ অনেক পত্রিকাতে! অনেক গুলো সাহিত্য পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক ছিলাম।

সুহাস ঃ ছদ্মনামে পাঠাত! -------------- কী যেন বোধ হয়।অন্য নামে পাঠাত।

আরতিঃ এতদিন পরে, থাক না এসব কথা। কেমন আছো বলো?

সুহাস ঃ কেমন আছি ভাবার সময়টুকু ইদানিং আর পাই না।

সুজিত ঃ ফোন ধরার সময়ও বোধহয় ইদানিং পাস না? তোর নাম্বারে বারে বারে ফোন করে আল্‌টিমেটলি তোর সেক্রেটারির নাম্বার খুঁজে বের করে ফোন করলাম।

সুহাস ঃ পুরণো নাম্বারটা রিঙ হয়ে গেল তো ....

সুজিত ঃ হুম !

সুহাস ঃ ওটা এখন আর ব্যবহার করি না। পড়ে আছে কোথাও....

সুজিত ঃ আর নতুন নাম্বার?

সুহাস ঃ ওটা হাতে গোনা কয়েক জনের কাছে আছে । (সুজিত কিছু বলতে যায়) সেক্রেটারির মাধ্যমেই যখন যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে, তখন আর অসুবিধে কী! (অক্ষয়কে) এই ভদ্রলোক কে?

সুজিত ঃ অক্ষয়! অক্ষয় দাস, পুরনো জিনিস কেনাবেচা করেন।

সুজিত ঃ তোর সেক্রেটারি বোধহয় আমার মেসেজটা দেয় নি।

সুহাস ঃ ও হ্যাঁ বলেছিলো মনে হচ্ছে কী সব বিক্রি-টিক্রি করবে।

অক্ষয় ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আপনার দাদাকে সব মিলিয়ে চল্লিশ হাজার দাম দিয়েছি।

(সুজিত কড়া চোখে তাকায়) ও হ্যাঁ, শেষমেষ তো বাহান্ন হাজারে ঠিক হলো।

সুজিত ঃ বাহান্ন হাজার .....

অক্ষয় ঃ স্যারের অনারে একটু বাড়িয়ে দিলাম, ওনার বাড়ির ফার্নিচার বললে ভালোই দাম পাবো।

সুহাস ঃ আমাকে এসবের মধ্যে কেন জড়াচ্ছো দাদা

সুজিত ঃ একটা পারিবারিক সিদ্ধান্ত! তোর মতামত নেব না?

সুহাস ঃ আমি কোনোদিনও দিইনি, চাওয়াও হয় নি বোধহয়।

অক্ষয় ঃ আইনত আপনারা দুজনেই যখন উত্তরাধিকারি

সুজিত ঃ আপনি বরং একটু ভেতরের ঘরে গিয়ে বসুন।

সুহাস ঃ থাকলে আমার অন্তত কোন অসুবিধে নেই।

আরতি ঃ তোমার কি মনে হয় দামটা ঠিক বলছে?

সুহাস ঃ আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না বৌদি?

আরতি ঃ এর আদ্ধেক ভাগ তো তোমার প্রাপ্য।

সুহাস ঃ যখন প্রয়োজন ছিল , তখন প্রস্তাবটা পেলে হয়ত দু'বার ভাবতাম, এখন সত্যি দরকার নেই।

আরতি ঃ সত্যি বলছ?

সুজিত ঃ আগে দামটা ঠিক হোক, তারপর না হয় এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

সুহাস ঃ অতীত নিয়ে নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই দাদা।

সুজিত ঃ আমরা সবাই অতীতের সন্তান।

সুহাস ঃ এবং ভবিষ্যতের পিতা। বাই দ্য ওয়ে টুবান তো এখন ব্যাঙ্গালোরে? কেমন আছে?

আরতি ঃ তুমি কি করে জানলে?

সুহাস ঃ আমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে।

সুজিত ঃ তোর সঙ্গে?

সুহাস ঃ হ্যাঁ, আমিই যোগাযোগ করেছিলাম। আজকের ফেসবুক, হোয়াট্স অ্যাপের যুগে চাইলে যোগাযোগ করাই যায়।

সুজিত ঃ হুম্! চাইলে।

সুহাস ঃ কোথায় যেন ওর সঙ্গে একটা মিল পাই নিজের (পকেট থেকে একটা দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে। সুজিত বিস্মিত হয়) তোমার বয়স যখন দশ ছিল, আমার পাঁচ। এখন আর তুমি আমার দ্বিগুণ বয়সী নও। অনুমতি দিতেই পারো। (নিজে একটা সিগারেট ধরায় আর একটা সুজিতের দিকে বাড়িয়ে দেয়)

সুজিত ঃ না থাক।

(অক্ষয় লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।)

সুজিত ঃ খাবেন নাকি?

অক্ষয় ঃ এত লম্বা!

(সুজিত সুহাসের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে অক্ষয়কে দেয়।)

অক্ষয় ঃ আপনাদের সামনে খেতে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।

সুজিত ঃ ভেতর বা বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে আসুন।

অক্ষয় ঃ দামী তামাকের সঙ্গে পুরনো আসবাবের গন্ধ মিলেমিশে কেমন হয় দেখে আসি বরং। (ভেতরে ঢুকে যায়)

আরতি ঃ একটা কথা বলি সুহাস

সুহাস ঃ ওরকম কিন্তু কিন্তু করছ কেন?

আরতি ঃ আসলে এখন তোমায় তো অনেক দূরের মানুষ মনে হয় ....

সুহাস ঃ বলে ফ্যালো।

আরতি ঃ বাড়ি থেকে সামান্য একটু খাবার বানিয়ে এনেছিলাম। সারাদিন থাকতে হবে।

সুহাস ঃ কতদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি। বাড়ির রান্নাও।

আরতি ঃ সত্যিই তো বিদিশার তো এখন রান্না করার কথাও না।

সুহাস ঃ করে হয়ত। আমি জানি না।

আরতি ঃ মানে?

সুহাস ঃ অনেকদিন-ই ও আমার সঙ্গে থাকে না। কিংবা আমি ওর সঙ্গে।

আরতি ঃ সে কি কেন? হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

সুহাস ঃ না, না, তেমন কিছু না। মিলছিল না, কিছুতেই মিলছিল না।

আরতি ঃ না মিললেই আলাদা থাকা যায়?

সুহাস ঃ একসাথেও থাকা যায় হয়তো, আমরা চান্স নিতে চাইনি।

আরতি ঃ কোথায় আছে বিদিশা?

সুহাস ঃ কলকাতাতেই একটা স্কুলে পড়ায়। চাকরিটা আমিই করে দিয়েছিলাম। সেটা ছাড়তে পারেনি যদিও।

সুজিত ঃ আর তোর মেয়ে কী যেন নাম? সেই মুখেভাতে দেখেছিলাম।

সুহাস ঃ পলা, ইউ.এস.এ-তে পাঠিয়ে দিয়েছি। পড়ছে।

আরতি ঃ মন খারাপ করে না?

সুহাক ঃ কেন? কিসের জন্য? বিদিশার জন্য? ভাবি নি, আসলে এক সঙ্গে থাকা না থাকা দুটোই এক একটা অভ্যেস।

আরতি ঃ আমি পলার কথা বলছিলাম।

সুহাস ঃ দ্যাখো, ওসব সেন্টিমেন্ট আমার নেই। কোনদিন ছিল কিনা সেটা আমার চেয়ে দাদা-ই বলতে পারবে। যে যেখানে যেভাবে ভাল থাকে, থাক না, আমাদের দেশে আছেটা বা কী যে পড়ে থাকবে!

সুজিত ঃ তোর তো অনেক ক্ষমতা, তুই চাইলে তোর মেয়েটাকে এখানেও যে কোন ভালো জায়গায় ঢুকিয়ে দিতে পারতিস।

সুহাস ঃ পলা যদি পড়াশুনো শেষ করে এখানে ফিরে আসতে চায়, তখন দেখা যাবে, আশা করা যায় তখনও একেবারে ক্ষমতাহীন হয়ে যাবো না।

সুজিত ঃ তখন তোর দল যদি ক্ষমতায় না থাকে?

সুহাস ঃ তুমি এখনো সেই পুরনো ভাবনা-চিন্তা আঁকড়ে বসে আছো। আমি আমার দলের কথা বলিনি, আমার কথা বলেছি। আমার যেমন একটা দল প্রয়োজন, এই দলগুলোরও আমার মতো মানুষদের দরকার। আমার প্রচুর অনুগামী ছড়িয়ে রয়েছে গোটা রাজ্যে, তারা কোনো দল বোঝে না। তাদের কাছে সুহাসদা শেষ কথা।

সুজিত ঃ একটা সংগঠনের চেয়ে ব্যক্তি বড়?

সুহাস ঃ যদি কোন দলে এমন কী পরিবারেও ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা এসব অজুহাত খাড়া করে ব্যক্তি-ই মুখ হয়ে ওঠে তখন অসুবিধে হয় না।

সুজিত ঃ কী বলতে চাইছিস?

সুহাস ঃ বাদ দাও অনেক দিন পরে দেখা হলো, বৌদি কী যেন খাওয়াবে বলছিলে...

আরতি ঃ তোমরা যেভাবে কথায় মত্ত, আমিও শুনতে শুনতে বে-খেয়াল হয়ে গেছিলাম। (আরতি দু'টো প্লেট বের করে। সুহাস একটা প্লেট নেড়ে চেড়ে দ্যাখে।)

আরতি ঃ বুঝতে পারছি এখন এরকম প্লেটে তোমার খাওয়ার অভ্যেস নেই। কী করি বলো তো?

সুহাস ঃ (কিছু বলতে গিয়ে একটু ভেবে চুপ করে যায়। তারপর বলে) ... একটা দিন তো, দাও। জল আছে তোমাদের সঙ্গে।

আরতি ঃ হ্যাঁ, বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি। ফিল্টারের জল।

সুহাস ঃ কিছু মনে কোরো না, ওই জলটা আমি খাবো না। নানা জায়গায় ঘুরতে হয় তো বট্‌লড ওয়াটার ছাড়া খাই না।

আরতি ঃ না না মনে করবো কেন? যার যেমন অভ্যেস! সুহাস ব্যাগ থেকে একটা জলের বোতল বের করে এক কোণে গিয়ে সেটা দিয়ে হাত ধোয়।
আরতি প্লেট এগিয়ে দিয়ে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আরতি ঃ ভালো লাগছে?

সুহাস ঃ ফাইভ স্টার হোটেলের খাবার খেতে খেতে মুখে চড়া পড়ে গেছে। অন্যরকম তো বটেই, অন্যরকম।

সুজিত ঃ তোর মায়ের হাতের রান্না মনে আছে!

সুহাস ঃ খুব বেশী নয়, আসলে পুরনো কথা ততোটাই মনে রাখার চেষ্টা করি যতোটা আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পেছনের দিকে টেনে ধরবে না।

সুজিত ঃ আজকাল বিশেষ কাগজ পড়া হয়ে ওঠে না, বলা ভালো পড়ি না, কোনো ভালো খবর তো খুঁজে পাই না, তুই যেন কোন দপ্তরে আছিস?

সুহাস ঃ টিভি-টাও দ্যাখো না বোধহয়

সুজিত ঃ রিমোট-টা আরতির হাতে থাকে।

সুহাস ঃ জীবনে অন্তত একটা রিমোট হাতে পেয়েছে। (সুজিত কিছু বলতে যায়) এখন ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, যেকোনো নিউজ চ্যানেল খুললেই দেখতে পাবে। এর আগে ছিলাম ক্ষুদ্র শিল্প আর তার আগে সেচ।

সুজিত ঃ এগুলোর তো একটার সঙ্গে আর একটা বিন্দুমাত্র মিল নেই, চালাস কি করে

সুহাস ঃ চালায় তো আমলারা, সামনে একটা মুখ দরকার। যেমন আমাদের পরিবারেও মুখটা ছিল বাবার, চালাতে তুমি।

সুজিত ঃ (উত্তেজিত হয়ে) তুই শুধু আমাকে নয় বাবাকেও অপমান করছিস সুহাস।

সুহাস ঃ আমি শুধু সত্যটা বললাম দাদা। তুমি আমাদের বলতে এটা করতে হবে, ওটা করা যাবে না। আমরা কখনও সামান্যতম দ্বিমত পোষণ করলেই তুমি বলতে বাবার ইচ্ছে। অমান্য করা যাবে না। আমরা মেনে নিতাম।

সুজিত ঃ তুই তোর কথা বল। আমরা মানে?

সুহাস ঃ আমি, মা (আরতির দিকে তাকায়, আরতি মুখ নামিয়ে নেয়)

সুজিত ঃ (আরতির দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে) তোদের যখন এতটাই অবিশ্বাস ছিল, বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতিস না কেন?

সুহাস ঃ কারণ বাবার কাছে যাবার অগে তোমাকে টপকে যেতে হতো। তাও যে কখনও যাইনি তা নয়, বাবার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারতাম না, জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু অর্থহীন উচ্চারণ।

সুজিত ঃ অর্থ উদ্ধার করতে হলে মানুষটাকে ভালবাসতে হতো, সে দায় তোদের কারো ছিলো না।

সুহাস ঃ মায়েরও ছিলো না বলছ? না মা ভয় পেত, আগে তো পেত-ই মাঝ বয়সে বাবা যখন অসুস্থ, কথাও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে..... দিন দিন, তখনও মা ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

সুজিত ঃ মানুষটাকে সুস্থ করার কোনো দায় কি কোনোদিন নিয়েছিলি? আমি প্রথমদিকে টিউশনির টাকায় চিকিৎসা করিয়েছি। তারপরে চাকরি পেলাম, বেশীরভাগ টাকা খরচা হয়ে যেত বাবার চিকিৎসার পিছনে।

সুহাস ঃ বাবা যতদিন আছেন, সংসারে তোমার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কেউ নেই। বাবাকে বাঁচিয়ে রাখাটা তোমার দায় ছিল।

সুজিত ঃ তোর দায়িত্ব ছিল না, হবু শ্বশুরের দৌলতে তো তখন একটা ভাল চাকরি জুটিয়েছিলি, পাশাপাশি প্রমোটারি ব্যবসা।

সুহাস ঃ তখন আমি এ বাড়ি, এমন কী এই শহর ছেড়েও চলে গেছি, তবুও টাকা পাঠাতাম প্রতি মাসে।

সুজিত ঃ প্রতি মাসে নয়, কখনও কখনও দু'তিন মাসও বাদ পড়ে যেত, আর যে টাকাটা পাঠাতিস সেটা পাঠানো না পাঠানো সমান।

সুহাস ঃ আমি তো বাবাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলাম।

সুজিত ঃ বাবা নিজের ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে চান নি।

সুহাস ঃ ভিটেটা বাবার নয়, বাবার শ্বশুরমশাই-এর। বাবা পুরুষাঙ্গ বন্ধক রেখে এই জমি- বাড়ি-আসবাব ইত্যাদির মালিক হয়েছিলেন। (সুজিত প্রচণ্ড রেগে কিছু বলতে যায়) উঁহু, উত্তেজিত হয়ো না, তোমার বয়সটা ভাল নয়, সত্যিটা সত্যিই। বাবা বলে বলা যাবে না... এমন দিব্যি কে দিয়েছে?

সুজিত ঃ সব সত্যি স্বীকার করতে পারবি তো?

সুহাস ঃ কী বলতে চাইছো বলো।

আরতি ঃ কী আরম্ভ করলে তোমরা? এতদিন বাদে দু'ভাইয়ের দেখা হলো।

সুহাস ঃ না বৌদি, এতদিন বাদে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মুখোমুখি কথা বলছে, বোধহয় প্রথমবার। ঝগড়াঝাঁটি করার ইচ্ছে আমার নেই, বোধহয় দাদারও। বলো দাদা কী বলতে চাইছো? আমি কী ভাবে চাকরি জোটালাম, ব্যবসা শুরু করলাম... সে কথাই তো? (সুজিত যেন খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে) মিথ্যে বলবো না বিদিশার সঙ্গে সম্পর্কটা প্রেম-ই ছিল। প্রথম প্রেমে অন্ততঃ কোনো ছল থাকে না। প্রথম যেদিন ওদের বাড়িতে গেলাম ...সেদিন থেকে মাথায় একটা হিসেব করতে শুরু করলো।

সুজিত ঃ বাকি জীবনটা সেই হিসেব করতে করতে ....

সুহাস ঃ না, এখনও ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছতে পারি নি, তবে আজ অবধি হিসেবগুলোয় কোনো গড়মিল হয় নি। শেষ হিসেবটাও যদি মিলে যায়।

সুজিত ঃ তোর কোনো বন্ধু আছে? যাকে ভরসা করে প্রাণের -মনের দুটো কথা বলা বলতে পারিস!

সুহাস ঃ তোমার আছে দাদা? যার সামনে অবলীলায় ছোটবেলায় শেখা দুটো খিস্তি আউড়ে দিতে পারো, কিংবা যার বুকে মাথা রেখে চোখের জলে ভিজিয়ে দিতেপারো... (সুজিত চুপ করে থাকে) নেই, থাকার কথাও নয়। আসলে ক্ষমতার সিঁড়ি দিয়ে মানুষ যখন ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করে সে ক্রমশঃ একা হয়ে যায়।

সুজিত ঃ আমি নিতান্ত ছাপোষা একজন মাস্টারমশাই। প্রথম জীবনটা বাবার সেবা করতে করতে আর তারপবে ছেলের চাহিদা আর সংসারের খাই মেটাতে মেটাতে শেষ হয়ে গেছে। বে-হিসেবি জীবন যাপন করিনি বলে এখনও শরীরটা ঠিক

আছে। বাকি জীবনটা নিজের মতো উপভোগ করতে চাই। তার জন্য টাকা দরকার। আর পাঁচটা মধ্যবিত্তের যেমন দরকার। ক্ষমতার থেকে বহু দূরে আটপৌরে গেরস্থ জীবন।

সুহাস ঃ পরিবারের মধ্যে ক্ষমতা ভোগ করাও কিন্তু ক্ষমতাই, তার অন্য কোনো নাম হয় না।

সুজিত ঃ ওটা ক্ষমতা ভোগ নয় সুহাস, তুই পালিয়ে গেছিলি, আর আমি হাল ধরেছিলাম।

সুহাস ঃ নৌকা যখন টলমল করে, তখন যে হাল ধরে সে যারা দাঁড় টানে তাদেরও পরামর্শ নেয়। তুমি কোনো দিন কারোর কথা কানে তুলেছ?

সুজিত ঃ এতো যে বড়ো বড়ো কথা বলছিস, তুই সেই সময় ছিলি আমার পাশে?

সুহাস ঃ ছিলাম না, কারণ থাকতে চাই নি।

সুজিত ঃ বাহ! চমৎকার। তারপরেও তুই আমাকে দোষ দিচ্ছিস?

সুহাস ঃ আমি না থাকি, মা তো ছিল-ই

সুজিত ঃ মা কবে কোন ব্যাপারে মুখ খুলেছে মনে করতে পারিস?

সুহাস ঃ কোনো বিষয়ে মায়ের মতামত চাওয়া হয়েছে.... এমন কথাও মনে করতে পারি না।

সুজিত ঃ মা নিজের রান্নাঘর আর ঠাকুরঘর নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, ভাল থাকতেন।

সুহাস ঃ বৌদি?

সুজিত ঃ বৌদি? মানে? শোন্ সুখে দুঃখে বত্রিশটা বছর আমরা কাটিয়ে দিয়েছি, মতের অমিল হয়েছে বলে আলাদা হয়ে যাইনি।

সুহাস ঃ আসলে বৌদি কখনও মত প্রকাশ-ই করেনি।

সুজিত ঃ তোর কাছে করত বুঝি?

সুহাস ঃ টুবানের সঙ্গে শেষ কবে কথা হয়েছিল তোমার?

সুজিত ঃ হঠাৎ?

আরতি ঃ আমার সঙ্গে রোজই একটু-আধটু কথা হয় ফোনে, না হলেও হোয়াট্সঅ্যাপে।

সুহাস ঃ আমার সঙ্গেও , প্রায় রোজই ......

সুজিত ঃ তোর সঙ্গেও!

সুহাস ঃ ওর ওখানে ভালো লাগছে না, কলকাতায় আসতে চায়। আমাকে বলেছে ব্যবস্থা করতে।

আরতি ঃ আমায় তো বলেনি!

সুজিত ঃ ও কলকাতায় আসতে চায়, তবে তোমাদের বাড়িতে নয়।

সুজিত ঃ অদ্ভুত! আজকালকার ছেলেমেয়েদের কেবল বাপ-মায়ের টাকা পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক। কোনো দায়িত্ববোধ নেই। শোন্ ওকে বলে দিস, সুজিতরঞ্জন চৌধুরি কোনোদিন কারুর মুখাপেক্ষি থাকেনি, থাকবেও না। ওর যেখানে ইচ্ছে সেখানে

থাকুক... দ্যাটস্ নন্ অফ মাই বিজনেস্।

সুহাস ঃ ঠিক, ঠিক এই কারণেই ও বোর্ডিং স্কুলে চলে গেছিলো।

সুজিত ঃ ও বোর্ডিং -এ গেছিলো ওর মায়ের ইচ্ছেয়।

সুহাস ঃ ওর ইচ্ছার কথাটাই খানিক ঈর্ষার মোড়ক দিয়ে তোমার কাছে পেশ করেছিল বৌদি। ও পালিয়ে যেতে চেয়েছিল... যেখানে প্রাণ খুলে হাসা যায় না, কথা বলা যায় না ... সেখানে একটা জ্যান্ত মানুষ বেশীদিন থাকতে পারে না।

সুজিত ঃ তুই পড়েছিলি কেন ?

সুহাস ঃ উপায় ছিল না বলে, যখন প্রথম সুযোগ পেয়েছি .... চলে গেছি। মা ঠাকুরঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, আর বৌদি ....

সুজিত ঃ তখন থেকে বৌদি বৌদি করছিস কেন?

সুহাস ঃ কারণ বৌদি যখন বিয়ে হয়ে এ বাড়ীতে আসে, তখনও কলেজের থার্ড-ইয়ার আর আমি ফার্স্ট ইয়ার। প্রায় সমবয়সি। বাইরের ছেলেদের সঙ্গে তুমি আমাকে মিশতে মানা করেছিলে। অথচ ওই বয়সে মানুষের একজন বন্ধু প্রয়োজন হয়।

আরতি ঃ সব বয়সেই বন্ধু প্রয়োজন হয় সুহাস। তুমি আস্তে আস্তে আমাদের মাপ ছাড়িয়ে অনেকটা বড় হয়ে গেলে..... তাই সমস্ত অতীতটা এক ঝটকায় মুছে দিতে পারলে।

সুহাস ঃ এক ঝটকায় পারি নি বৌদি, সময় আমারও লেগেছে। যতদিন গেছে রিয়ালাইজ করেছি অতীতের পিছুটান অস্বীকার করতে না পারলে, সামনের দিকে এগোনো যায় না। আর আমার হাতে সময় খুব কম, একবার পিছন ফিরে দেখা মানেই আমার দু'পাশে যারা দৌড়চ্ছে তারা অনেকটা এগিয়ে যাবে। আসলে তো আমরা বাঁচি ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। কেবলমাত্র নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

সুজিত ঃ সেই কথাটা আলোচনা করার জন্যই তোকে আজ এখানে আসতে বলেছিলাম। বাড়িটার শরিকি ডিসপিউট্ মিটে গেছে। তবে ওদের একটা লামসাম্ টাকা দিতে হবে। বাড়িটা ভেঙ্গে জমি বিক্রি করে দেওয়া হবে। তবে আসবাবগুলোর মালিক কেবল তুই আর আমি।

সুহাস ঃ টাকার আজ আমার তেমন দরকার নেই দাদা।

সুজিত ঃ হ্যাঁ , পয়সা প্রতিপত্তি কোনোটাই তোমার কম নেই।

সুহাস ঃ যতদূর জানি, পয়সার প্রয়োজন তোমারও খুব একটা নেই।

সুজিত ঃ জানার প্রয়োজনটাই বোধ করোনি। কিছুদিন আগেও আমি অসুখে পড়েছিলাম। জানো না বোধহয়?

সুহাস ঃ টুবানের কাছে শুনেছিলাম।

আরতি ঃ তাও একবার খোঁজ নাও নি?

সুহাস ঃ তোমরাও তো কোনো খবর দাও নি বৌদি। আমি তো তাও টুবানের কাছ থেকে

খবার নেবার চেষ্টা করেছি, নিয়েছি।

সুজিত ঃ তাহলে তো এটাও নিশ্চয়ই জানিস, গত দশ বছরে আমার দুটো অ্যাটাক হয়ে গেছে। স্টেন্ট বসাতে হয়েছে। এবং তোদের না হয় গাঁটের কড়ি খরচা করতে হয় না, কিন্তু আজকের দিনে বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ সম্পর্কে নিশ্চয়ই ধারণা আছে?

সুহাস ঃ আছে, অনেকেই এসে ধরাধরি করে। আমরা বলে দিলে খানিকটা কম হয়।

আরতি ঃ তোমার দাদার বেলায় আমি বলেছিলাম একবার তোমায় ফোন করার জন্য।

সুজিত ঃ আমিও বলেছিলাম কখনও আমি কারো অনুগ্রহ নিই না।

সুহাস ঃ অনুগ্রহের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে! এটা তো আমার কর্তব্য। হ্যাঁ তুমি বলতেই পারো, অনেক কর্তব্য-ই আমি পালন করি নি। কিন্তু সেসব অতীতের ব্যাপার। অতীত নিয়ে আমি ভাবি না। কত জনের কত কাজ করে দিতে হয়, নিজেরই তো দাদা....

আরতি ঃ তোমার দাদার অসুখের কথা টুবান বলে নি তোমায়?

সুহাস ঃ টুবানও অতীত নিয়ে বিশেষ কথাবার্তা বলে না বৌদি। বর্তমানে বাস করে। ভবিষ্যতের কথা ভাবে.... আমার-ই মতো। ভেতর থেকে অক্ষয় বেরিয়ে আসে।

অক্ষয় ঃ বয়েস হওয়ার সব চেয়ে অসুবিধা কী জানেন? যখন-তখন ঘুম পায়। অনেকদিন কাজের মধ্যেও নেই, সময় কাটে না, ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমোনোর আবার একটা সুবিধেও আছে প্রচুর স্বপ্ন দেখা যায়।। ঘুম তো আবার সময় অসময় বোঝে না। পেলেই হলো। আজ এতদিন বাদে খানিক মনের মতো কাজের মুখ দেখলাম.... আর তখনই ...

সুহাস ঃ আর একটা সিগারেট খাবেন তাই তো?

অক্ষয় ঃ হ্যাঁ, কী করে বুঝলেন?

সুহাস ঃ (সুজিতের দিকে তাকিয়ে) লোকের না বলা কথা বুঝে নেওয়াটাই আমাদের কাজ। (দুটো সিগারেট বের করে অক্ষয়কে দেয়) দুটোই রাখুন। বার বার চাইতে লজ্জা করবে (অক্ষয় হাত বাড়িয়ে সিগারেট নেয়)

অক্ষয় ঃ এক কাপ চা হলে সিগারেট-টা জমতো ভালো। (আরতিকে) না, না, আপনাকে আর কষ্ট দেব না এটুকু কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। এতক্ষণে দোকানপাট খুলেছে নিশ্চয়ই... বন্ধ ঘরে আর দূষণ ছড়িয়ে লাভ নেই। বাইরে থেকে ঘুরে আসি ... (বেরতে যায়)

সুজিত ঃ ফিরে আসবেন তো?

অক্ষয় ঃ আপনারা কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না কেন বলুন তো?
কেউ না। কাউকে না। আপনাদের দোষ দিয়েই বা কি হবে! আমার মেয়েটা, একমাত্র মেয়েটাই আমাকে বিশ্বাস করতে পারলো না। (বেরতে গিয়ে আবার

থেমে যায়) নিশ্চিন্ত থাকুন আসব। না এসে আমারও উপায় নেই। (চলে যায়)

সুজিত ঃ (সুহাসকে) আমাকে একটা সিগারেট দিবি?

সুহাস ঃ (আরতির দিকে) তোমার হার্টের প্রবলেম বললে না?

সুজিত ঃ খাই না অনেকদিন-ই। আজ একটু ইচ্ছে করলো।

সুহাস ঃ বৌদি

(সুজিত প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নেয়।)

আরতি ঃ আমার মতামত জানতে চাইছিলে?

(বাইরে থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়)

নেপথ্যে ঃ ..... স্যার আপনার ফোন ...

সুহাস ঃ তোমাকে তো বলাই আছে, আজ আমি কোনো ফোন ধরবো না

নেপথ্যে ঃ বার বার আসছে, মনে হয় কোনো ইম্পর্ট্যান্ট ফোন হবে।

সুহাস ঃ প্লিজ, ডোন্ট ক্রশ ইয়োর লিমিট। তেমন ইম্পর্ট্যান্ট কোনো ফোন এলে সেটা আমার পারসোন্যাল নম্বরে আসবে। হ্যাঁ, দাদা কী যেন বলছিলে?

আরতি ঃ আসলে তোমার দাদার তিনবার হাসপাতালে বড় বড় ধাক্কা। আমারও এখন অনেক রোগজ্বালা, ডাক্তারের প্রচুর খরচা। টুবানকে বরাবর বাইরে রেখে পড়ানো...

সুজিত ঃ এখনও টুবানকে নিয়মত পয়সা পাঠাতে হয়। সংসার করে ফেলেছে, অথচ তেমন রোজগার করে না। হ্যাঁ, আমিও চাকরির পাশাপাশি প্রচুর টিউশানি পড়িয়েছি। আয় তো কম করি নি। কিন্তু সঞ্চয় করতে পারি নি তেমন। খরচের অভ্যেসটা তো রয়েই গেছে। ইদানিং বোধহয় সাধ্য কমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাধও বাড়ছে।

সুহাস ঃ এই বাহান্ন হাজার টাকায় কী হবে? কতদিন চলবে?

সুজিত ঃ বাবান্ন নয়, ছাব্বিশ।

সুহাস ঃ আমার ভাগটা নেব না দাদা।

সুজিত ঃ আমার প্রয়োজন নেই।

সুহাস ঃ তোমাকে তো দিচ্ছি না। বৌদিকে দেব।

(সুজিত অদ্ভুত ভাবে তাকায়)

সুহাস ঃ তোমার যখন বিয়ে হয় আমি তখন কাঠ বেকার। তারপর যখন দেওয়ার মতো হলো তখন দূরত্বটা এতটাই বেড়ে গেছে যে— প্রথম প্রথম কোথাও বেড়াতে গেলে বৌদির জন্য টুকটাক জিনিস কিনতাম। টুবানের জন্যও। জমতে থাকত। দেওয়া হতো না, তারপরে অন্য অনেক পুরনো অভ্যেসের মতো ওটাকেও ছেঁটে ফেলেছিলাম।

আরতি ঃ তাহলে আজ আবার হঠাৎ?

সুহাস ঃ ইচ্ছে হলো। আমার তো আর পকেট থেকে দিতে হচ্ছে না, না কোর না।

সুজিত ঃ হুম! ওদের তো আবার না শোনার অভ্যেস নেই।

সুহাস ঃ 'না' শুনতে কেউই পছন্দ করে না দাদা। কেউ কখনও সেটা বলার অবস্থায় থাকে, কখনও থাকে না। এই বাহান্ন হাজারে কতদিন চলবে?

সুজিত ঃ বাড়িটাও বিক্রি হবে।

সুহাস ঃ এই জায়গাটা খুব একটা ডেভেলপ করেনি। (সুজিত তাকায়) আমরা গত ক'বছরে চেষ্টা করেছি। তবে বোঝই তো যতোই চেষ্টা করো, এই বাড়িটার যা ভৌগলিক অবস্থান, খুব একটা দাম উঠবে না। জমিও অনেকটা আছে তা নয়। পুরনো আসবাবের তাও হয়তো খদ্দের আছে, কিন্তু কিছু জিনিস পুরনো হয়ে গেলে কেউ কিনতে চায় না—যেমন বাড়ি। খদ্দের পেলেও কতো দাম পাবে ঠিক আছে? তার মধ্যে থেকে আবার শরিকদের দিতে হবে। সব মিলিয়ে যতোটা সময় খরচা হবে তত টাকা ঘরে আসবে না।

সুজিত ঃ তাহলে তুই কী বলিস?

সুহাস ঃ একটা চাকরি করবে?

সুজিত ঃ চাকরি? আমি? এই বয়সে? কে দেবে?

সুহাস ঃ যদি আমি দিই।

(অক্ষয় আসে।)

অক্ষয় ঃ কতো দেওয়া যায়, বলুন তো?

সুজিত ঃ আপনি তো হিসেব করেই ফেলেছেন।

অক্ষয় ঃ গন্ডোগোল হয়ে যাচ্ছে।

সুজিত ঃ আবার দাম কমাবার ফিকির করছেন?

অক্ষয় ঃ আপনি আবার অবিশ্বাস করছেন? কিছু কিছু জিনিস ঠিক দাম দিয়ে মাপা যায় না। আপনাদের এই ঘরটায় এমন অনেক জিনিস আছে, যেগুলো আমি নিয়ে যাবো, উপযুক্ত দাম দিইে নিয়ে যাবো। কিন্তু বিক্রি করতে পারবো না।

সুজিত ঃ খদ্দের পাবেন না, বিক্রি করতে পারবেন না,, তাহলে কিনবেন কেন? আপনি মশাই ব্যবসাদার।

অক্ষয় ঃ আপনি কী মশাই পুরোটাই মাস্টার? গোটা মানুষটাই! (একটু থেমে) ও ঘরে একটা কাঠের ঘোড়া আছে।

সুহাস ঃ ওটা আমার। ছোটবেলার।

সুজিত ঃ আমিও চেপেছি ছোটবেলায়।

সুহাস ঃ আসলে ওটাও বোধহয় বাবার শ্বশুর বাড়ির সূত্রে পাওয়া।

অক্ষয় ঃ আমার মেয়েটারও ছোটবেলায় এমন একটা কাঠের ঘোড়ার শখ ছিল। নিয়ে যাই। দেখি .... এখন তো ওই কাঠের অমন জিনিস পাওয়া যায় না। কেউ যদি

সাংঘাতিক দাম দিয়ে ফেলে, জানি না তখন হয়তো বিক্রিও করে ফেলতে পারি। সেও হয়তো তার মেয়ের জন্য কিনবে। আর একবার ভিতরে যাই, ...বুঝলেন।

সুহাস ঃ (অক্ষয়কে) আপনি ফাইনাল প্রাইস্ কী সেটেল করলেন?

অক্ষয় ঃ কেন? বললাম তো বাহান্ন হাজার।

সুহাস ঃ অনেকটাই লাভ রাখবেন মনে হচ্ছে।

অক্ষয় ঃ লোকসান করার জন্য কেউ কোনো পেশায় আসে না। কিছু মনে করবেন না, আপনি যে কাজটা করবেন, সেটা কী নিজের ক্ষতি হবে জেনে করেন?

(উত্তেজিত হতে গিয়েও সুহাস নিজেকে সামলে নেয়)

সুহাস ঃ একটা কথা বলি অক্ষয়বাবু, এটা বিপণণের যুগ। আপনি কী বিক্রি করছেন সেটা বড় কথা নয়, কীভাবে করছেন সেটাই আসল, আপনি কোন্ পরিবারের , কাদের ব্যবহার করা জিনিস বিক্রি করছেন সেটাকে হাইলাইট করুন।

অক্ষয় ঃ জানি স্যার, আপনাদের পরিবারের, আপনাদের ব্যবহার করা জিনিস জানলে কিছু ক্রেতা বাড়তি আগ্রহ দেখাবে।

সুহাস ঃ একজক্ট্যালি।

অক্ষয় ঃ এবং সেটাকেই যদি আমি বিজ্ঞাপন করি, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমার জিনিসগুলো বিক্রি করে ফেলতে হবে।,

সুহাস ঃ তার মানে?

অক্ষয় ঃ শেয়ার মার্কেটের মতো স্যার, কোন্ নামের দাম কবে চড়ে, কবে পড়ে বলা খুব মুশকিল। রাগ করবেন না স্যার, এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলো বললাম। যদি অনুমতি দেন তাহলে আর একটা কথা বলি।

সুহাস ঃ বলুন।

অক্ষয় খুবই ব্যক্তিগত প্রশ্ন হয়তো, তবুও ... আসলে অনেকদিন ধরে শরিকি জিনিসপত্র কিনছি তো তাই ....

সুহাস ঃ অযথা ভূমিকা না করে বলে ফেলুন।

অক্ষয় ঃ আপনাদের যৌথ মালিকানা , কাল আপনি ফ্যাচাং তুলতেই পারেন, কিন্তু একটু আগে আপনি বোধহয় বললেন আপনি এসবের ভাগ নেবেন না ...

সুহাস ঃ হুম! বলেছি তো।

অ.ক্ষয় ঃ তাহলে স্যার, আপনি দাম আরও বাড়াতে চাইছেন কেন?

সুহাস ঃ কারণ আমি চাই না কেউ ঠকে যাক।

অক্ষয় ঃ আমিও চাই না স্যার, তবে নিজেকেও ঠকতে চাই না। তবু আপনার মতো মানী লোক যখন চাইছেন, আমি আর একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আসি শেষ-মেষ কতো তে দাঁড় করাতে পারি।

(ভেতরে চলে যায়)

সুহাস ঃ তাড়াতড়ি করুন আমার হাতে বেশী সময় নেই।

সুজিত ঃ আমারও।

সুহাস ঃ সেই কথাই তো বলছি দাদা, এই আসবাবের ভাগবাঁটোয়ারার হিসেব করতে আমি আসিনি। ততোটা সময় বা প্রয়োজন কোনোটাই আমার নেই। বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম তোমাকে ফোন করবো। তার মধ্যেই আমার সেক্রেটারির কাছে জানলাম তুমি ফোন করেছিলে।

সুজিত ঃ যা বলার পরিস্কার করে বল।

সুহাস ঃ বললামই তো আমি একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই। পরবর্তীতে একটা প্রকাশনা সংস্থা খোলারও ইচ্ছে আছে এবং তোমার হাতে সেই দায়িত্বটা ছাড়তে চাই।

সুজিত ঃ সাহিত্য ইত্যাদিতে তোর কোনো উৎসাহ ছিল বলে তো কোনোদিন জানতে পারিনি।

সুহাস ঃ এক মিনিট! দেখি খুঁজে পাই কিনা। যত্ন করেই তো রেখেছিলাম — (সুহাস ভেতরে যায়)

আরতি ঃ সুহাস তো ভাল প্রস্তাবই দিচ্ছে।

সুজিত ঃ ওর পত্রিকা-র দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাবটা তোমার ভালো মনে হচ্ছে?

আরতি ঃ তুমি তো রিটায়ার করার পর বাড়িতেই বসে আছ। আজকাল টিউশনও পড়ানো হয় অনেক আধুনিকভাবে। পাওয়ার পয়েন্ট না কী সব বলে যেন। আজকাল ছাত্র-ছাত্রীও তো বিশেষ আসে না। দুটো পয়সা বাড়তি রোজগার হলে ক্ষতি কি?

সুজিত ঃ বাড়তি দুটো পয়সার জন্য সুহাসের কাছে হাত পাততে হবে?

আরতি ঃ তোমাকে হাত পাততে বলিনি। প্রস্তাবটা তো সুহাস-ই দিল। তুমি শুধু রাজি হবে।

সুজিত ঃ ও প্রস্তাব দিলেই আমাকে রাজি হতে হবে! বাবার সঙ্গে শেষ জীবনে ও কী করেছে ভুলে যাবো! দিনের পর দিন ও আমাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে সেটাও মনে রাখব না। কেবল ও হঠাৎ করে আমাকে একটা কাজ দিল ... আর আমি দু'হাত বাড়িয়ে লুফে নিলাম! সব কিছু ভুলে গিয়ে ... অদ্ভুত!

আরতি ঃ সারাটা জীবন অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকলে। একটু সামনের দিকে তাকাও। আর তুমি তো বিচক্ষণ মানুষ। সুহাসকে দেখে, ওর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে না, ও অতীতকে ভুলে সামনের দিকে তাকাতে চাইছে।

সুজিত ঃ ও অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, এ কথা আমার অন্তত মনে হচ্ছে না।

আরতি ঃ ভুলে না গেলেও, ও অন্তত ভুল শোধরানোর চেষ্টা করছে। আর টাকাটা সত্যিই আমাদের দরকার। একটা সম্মানজনক প্রস্তাব যখন দিচ্ছে, মেনে নাও।

সুজিত ঃ সবটা তুমিও বোধহয় বুঝবে না।

আরতি ঃ কবে আর তুমি আমার কোন্ কথাটা শুনেছ?
(সুহাস ভেতর থেকে আসে। একটা জীর্ণ খাতা সেটা সুজিতের হাতে দেয়।)

গত জন্মের শ্যাওলার পরত
আমার সারা শরীরে
আমি ক্রমশ শীতল হয়ে যাচ্ছি
সূর্যস্নান পিয়াসী আমি
ছুঁতে চাই অনন্ত নক্ষত্রের দ্বীপ
ইতিহাস নির্দিষ্ট কক্ষপথের
বাইরে যে রঙীন মহাকাশ
দুরন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে চাই
তার বুক চিরে—
যদিও সাত জন্মের শ্যাওলার গন্ধ
আমার প্রতিটি রোমকূপে

সুহাস ঃ আমিও একসময় সাহিত্যচর্চা করতাম দাদা, গোপনে। ছোটগল্প, কবিতা ... খাতাটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। পেয়ে যাবো ভাবিনি, দ্যাখো।
(সুজিত খাতাটা নিয়ে দু'এক পাতা উল্টে অবহেলা ভরে সুহাসের হাতে ফেরত দেয়।)

সুজিত ঃ এতদিন পরে হঠাৎ?

সুহাস ঃ তুমি তো সারা জীবন শিক্ষকতা করেছ দাদা। স্কুল-টিউশন মিলিয়ে কতো ছাত্র। তারা যতদিন পৃথিবীতে থাকবে, তুমি বেঁচে থাকবে দাদা। আমি আজ আছি, কাল নেই।

সুজিত ঃ অমর হতে চাইছিস?

সুহাস ঃ আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে। পত্রিকাটা সাহিত্য পত্রিকা-ই হবে। কিন্তু আমাকে যেন একটু আলোকিত করা হয়। তারপরে আর কয়েকটা বই । আমার লেখা বা আমাকে নিয়ে লেখা পুরো দায়িত্বটা আমি তোমাকে দিতে চাইছি।

সুজিত ঃ আমার টাকার দরকার জেনে আমাকে অবলাইজ করতে চাইছিস? তুই এখন এমন জায়গায় আছিস চাইলেই অনেক নামী-দামী সম্পাদক জুটিয়ে নিতে পারবি।

সুহাস ঃ আমি তোমাকেই চাইছি।

সুজিত ঃ পত্রিকা সম্পাদনার কোনো অভিজ্ঞাতা আমার নেই।

সুহাস ঃ তোমার আণ্ডারে বেশ কিছু অভিজ্ঞ লোক থাকবে।

আরতি ঃ সুহাস তো মন্দ কিছু বলছে না। ঘরে বসে বসে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

সুজিত ঃ তুমি বুঝতে পারছ না আরতি, সুহাস ওর ক্ষমতা দেখাতে চাইছে। ওর যদি সত্যিই আমাদের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছে থাকতো, তাহলে আজ নয়, বাবার অসুস্থতার সময় দাঁড়াতে পারতো।

সুহাস ঃ তখন আমার তেমন ক্ষমতা ছিলো না ... তুমি জানো দাদা।

সুজিত ঃ ইচ্ছেটা ছিল?

সুহাস ঃ না ছিলো না। আমি তখন মুক্তি চাইছিলাম। নিজের একটা আইডেনটিটি তৈরী করতে চাইছিলাম। তা সত্বেও যখন যেমন পেরেছি টাকা পাঠিয়েছি। কিন্তু এ বাড়িতে আর আসতে চাই নি। নতুন জায়গায় নোঙর বাঁধতে গেলে শেকড়টা ছিন্ন করতেই হতো।

সুজিত ঃ নোঙর বাঁধতে পেরেছিস, না ভেসেই বেড়াচ্ছিস?

সুহাস ঃ সারাটা জীবন এক জায়গায় কাটিয়ে দিলে গায়ে শ্যাওলার পরত পড়ে যেত দাদা। জীবনের প্রায় প্রতিটা অলি গলি ঘোরা হয়ে গেছে। এখন অনেক উঁচু থেকে পৃথিবীটাকে দেখছি।

সুজিত ঃ মানুষ যতো উঁচুতে ওঠে, তার পড়ে যাওয়ার ভয়ও ততোটাই বাড়তে থাকে। আশেপাশের কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আর সেই কারণেই তুই চাইছিস তোর পাশে একজন নিজের লোক থাকুক।

সুহাস ঃ রক্তের সম্পর্ক ছিল ঠিক-ই। তবে তুমি কী কোনোদিন আমাকে নিজের লোক ভেবেছ?

সুজিত ঃ কোন কর্তব্যটা করিনি, বল।

সুহাস ঃ হুম্! কর্তব্য বলতে পারো। দায়ও। কিন্তু কোনোদিন কাছে ডাকোনি। মনের কথা জানতে চাওনি। পুরো সম্পর্কটা ছিল একতরফা। তুমি বলেছ, আমরা (থেমে গিয়ে) আমি শুনেছি।

সুজিত ঃ এখন যেমন তুই বলিস, আর তোর আশপাশের লোকজন শোনে

সুহাস ঃ বলতে পারো।

সুজিত ঃ আমাকেও তাদের মধ্যে ফেলতে চাইছিস?

সুহাস ঃ তুমি অহেতুক জটিল করে দেখছো দাদা। সময় বদলে যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বদলে নিতে হয়।

সুজিত ঃ আর যারা বদলাতে পারে না?

আরতি ঃ তাদের বোধহয় কেউ মনে রাখে না।

সুহাস ঃ ভেবে দ্যাখো দাদা, আজই বলতে হবে এমন নয়। দুদিন সময় নাও।

(অক্ষয় বেরিয়ে আসে।)

অক্ষয় ঃ আপনারা কি বাড়িও বিক্রি করবেন ভাবছেন?

সুজিত ঃ আপনি কী পুরনো বাড়িরও কারবার করেন নাকি?

অক্ষয় ঃ না, বাড়িটা কিনলে আর বিক্রি করবো না। থেকে যাবো, শেষ কটা দিন। না স্যার, ভ্যালুয়ারকে দিয়ে দেখিয়ে নেবেন। টাকা কম দেব না। (সুহাসকে দেখিয়ে) ওনাকে কম টাকা দিয়ে মুশকিলে পড়ব নাকি ! বাড়ির টাকার ভাগ আপনি নেবেন তো?

আরতি ঃ না, না! ও তো বললো, ওর কিছু লাগবে না।

অক্ষয় ঃ সে তো আসবাবের কথা বলেছিলেন। তাই না সুহাসবাবু শরিক-টরিককে দিয়েও খুব একটা মন্দ টাকা হবে না। আমার চেহারা দেখে ভুল বুঝবেন না। ভগবানের দয়ায় টাকা পয়সা কম জমাই নি।

সুজিত ঃ তুই টাকা না নিলেও, তোর নো অবজেক্শন-টা কিন্তু লাগবে।

সুহাস ঃ না মানে, সামনে ইলেকশন্। পত্রিকাটাও অনেকটা সেই কারণে বের করতে চাইছিলাম। কিছু টাকাপয়সা পেলে মন্দ হয় না।

অক্ষয় ঃ আমি কিন্তু আসবাবসহ পুরো বাড়িটাই কিনবো। স্যারের তো অনেক চেনাশুনো। একটু খোঁজখবর নিন। কত দাম হতে পারে? ন্যায্য দামই দেব। (সুজিতকে) কেবল একটাই শর্ত স্যার, ওই ইজিচেয়ারটা শুদ্ধু কিনবো। (সুজিত কিছু বলতে যায়) কোনো তাড়া নেই স্যার, আপনারা ভাবুন। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। ছোট স্যার টাকা নেবেন কিনা? নিলে তার থেকে বৌদিকে ভাগ দেবেন কী না?

আরতি ঃ আপনি আড়ি পেতে সব কথা শুনেছেন?

অক্ষয় ঃ দরকার হয় না ম্যাডাম! এই পেশায় থাকতে থাকতে চোখ -কান দুটোই বেশ তীক্ষ্ম হয়ে যায়। আপনারা ভাবুন স্যার, আলোচনা করে জানান। আমি বরং আধঘন্টা একটু ঘুরে আসছি, (সুহাসকে) একটু সিগারেট হবে নাকি স্যার......
(সুহাস সিগারেটের প্যাকেটটা প্রায় ছুঁড়ে দেয়। অক্ষয় একটা সিগারেট নিয়েপ্যাকেটটা টেবিলে রাখে।)

অক্ষয় ঃ ম্যাডাম .... আপনার হারমোনিয়ামের দায়িত্ব কিন্তু আমার।
(অক্ষয় বেরিয়ে যায়। বাকি তিনজন চুপচাপ বসে থাকে)।

পর্দা

লেখক ঃ **মৈনাক সেনগুপ্ত,** জনপ্রিয় নাট্যকার,পশ্চিমবঙ্গ।

স্বপ্নচোর

শ্যামল ভট্টচার্য

(মাঙন লক্ষ্মী যুধিষ্ঠির গায়েন ২য় ব্যক্তি কবিয়াল নরেন সদাশিব মুখার্জি মানিক মহিলা কোরাস।)

একটা মানুষ অন্ধকার পথে দৌঁড়াচ্ছে। হাতে একটা ব্যাগ আছে। ঢোলের বোলে ছুটে চলার দ্রুত লয়ে আবহের সাথে ছুটন্ত পা দুটির উপর আলো পড়ে। লোকটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক— দূরে কুকুরের চিৎকার। লোকটি ছুটে চলে। কিছুক্ষণ পর মোরগের ডাক শোনা যায়। লোকটি অদৃশ্য হয়। মঞ্চের বাঁদিকে ম্লান আলোয় দেখা যায় একজন চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছুটন্ত মানুষটিকে দেখা যায় একটা অদৃশ্য দরজা সন্তর্পণে খুলে ঘরে ঢুকছে। মাটিতে বসে ঘুমন্ত মানুষটিকে নাড়া দেয়। বেশ কয়েকবার নাড়া দেওয়ার পর চাদর তুলে সে উঠে বসে। একজন মহিলা। ঘুমের জড়তা কাটিয়ে প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকায়। মানুষটার মুখ গামছায় ঢাকা। সে ব্যাগটাকে মহিলার মুখের সামনে দোলাতে থাকে। মহিলাও ব্যাগটা ধরতে ছটফট করে। একটু পরে লোকটির হাত থেকে মহিলা ব্যাগটি কেড়ে নেয়। মানুষটি মুখ থেকে গামছা সড়ায়। নিঃশব্দে হাসে। মহিলা এবার ব্যাগ খুলে ভেতরে দেখার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ উপুর করে ধরে। সাসপেন্স মিউজিক চলে। ব্যাগ থেকে অনেক টাকা উড়তে উড়তে ছড়িয়ে পড়ে মঞ্চে। দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঝে থেকে টাকাগুলো কুড়োতে থাকে।

মহিলা ঃ এতটাকা?
পুরুষ ঃ হুঁ।
মহিলা ঃ কত হবে?
পুরুষ ঃ গুনিচি নাকি?
মহিলা ঃ গুনি?
পুরুষ ঃ গোন। (দুজনেই কোলের কাছে নোটগুলো জড়ো করে গুনতে থাকে আর বলতে থাকে-)
মহিলা ঃ সব পাঁচশো।
পুরুষ ঃ উঁহু! দু'হাজারও আছে মনে হচ্ছে।
মহিলা ঃ এই হল ছয় হাজার। (ব্যাগে ঢোকায়)
পুরুষ ঃ এই হল সাত হাজার। (ব্যাগে ঢোকায়)
মহিলা ঃ (গুনতে গুনতে) এ হল গিয়ে চার হাজার (ব্যাগে রাখে)
পুরুষ ঃ এখানে হল তিন
মহিলা ঃ এগনে সব্বমোট থালি কত হল?
পুরুষ ঃ ঐ তো তোর ছয়ে আমার সাতে হল তেরো- তাপ্পরে চারে সতেরো-

মহিলা ঃ এবার এই তিন যোগ দিলি-

পুরুষ ঃ কুড়ি হাজার??(ঠাস করে উল্টে পড়ে।)

মহিলা ঃ কু..কু..কুড়ি... মানে তোর বিশ হাজার? সব্বোনাশের মাথায় বাড়ি। এত ট্যাহা একসঙ্গে পালি কুতায়?

পুরুষ ঃ আছে—আছে— হুঁ হুঁ বাব্বা। ক'দিন ধরে খালি হাতে ফিরে আসছি--- শালা মাথায় আজ জেদ চেপে গেলো। ঘরে নেই দানাপানি, নেই ফুটো পয়সার আমদানি। তক্কে তক্কে ছিলাম, বুইচিস? শালা, একখান বড় দাঁও মারতি হবে। যে করিই হোক, আজ আর খালি হাতে ফেরব না।

মহিলা ঃ তাপ্পরে?

পুরুষ ঃ তাপ্পরে আর কি? মাথায় ঘুড়তি লাগলো, কুতায় গেলি একসঙ্গে অনেক টাকা হাতানো যাবে! বেশি ঝামেলায় যেতি হবে না নে। এক ধাক্কায় মারি তো গণ্ডার- লুটি তো ভাণ্ডার!

মহিলা ঃ (সোৎসাহে) তাপ্পরে?

পুরুষ ঃ তাপ্পরে আর কি? ঝপ করে মনে পড়ি গেল, ঐ মাধবের সাথে একবার আপিসি গিছলুম। সেখেনে দেকিচি বাণ্ডিল নোট সিন্দুকি ঢুকুচ্চে বার কচ্চে, ঢুকুচ্চে বার কচ্চে। লোহার গারদ ঘিরা ঘর। ইয়া ব্বড় ব্বড় তালা।

মহিলা ঃ আঃ! মরণ দশা !! তাপ্পরে?

পুরুষ ঃ ওঃ, তোর ধয্যি নেই মোটে। শুনবি তো বিত্তান্তডা আগে। তা হইয়েছে কি— আম্মোও ভাবলাম, শালো এই তালাগুনোর যদি ব্যবস্থা করতি পারি, তালি আমারে আর পায় কিডা। ব্যাস্! নেগি পড়লাম। হইয়ে গেল। এ দুনিয়ায় এমন কোন তালা নেই যা এই মাগুন খুলতি পারবে না। একদিন যাই-দু'দিন যাই,– তিন দিন যাই— ঘন ঘন যাই— আর তালাগুনোর মাপ দেখি— কোন কুম্পানির তালা, , তাও খোঁজ পেলাম— ব্যাস্ হইয়ে গেল—!!

মহিলা ঃ ওরে যমের অরুচি, তাপ্পরে কি হল বলবি নাকি সারাক্ষণ ঘাই মারতি থাকবি? আমার আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। আমি কিন্তু এরপরে কাপড়ে মুতে ফ্যালবো।

পুরুষ ঃ (ধমক দেয়) এ্যাঃই । কচি খুকি নাকি? (ভেংচে) 'কাপড়ে মুতে ফ্যালব।' এটু ধয্যি ধরি শোন না। কল বানালাম।

মহিলা ঃ (গদ গদ কণ্ঠে) কল বানালি?

পুরুষ ঃ হুঁ-উ-উ-উ— মোক্ষম। এমন কল নিজি হাতে বানালাম যে কেউ কল্পনাও করতি পারবে না। এই মাগুন হল গে দুনিয়ার সব্বছেষ্ঠ সিঁধেল চোর। চুরির কমিপিটিশন হলি না, বুইচিস, আমিই পেথম পুরস্কারডা পাবো। আমি বুক ঠুকে বলতি পারি, হ্যাঁ।

মহিলা ঃ কেউ দেকি ফ্যালেনি তো? নজর করিছিলি?

পুরুষ ঃ পাগোল? কেউ দেকি ফেললি আমি এতক্ষণ এখেনে বসে তোর সাথে গল্প করতি পারতাম।? কেউ দেখেনি। কেউ না। গেটের দারোয়ান ছিল বুইছিস? তার আবার নাইট ডিউটি!

মহিলা ঃ সব্বোনাশ, তারপরে?

পুরুষ ঃ সে তো ঘরের মদ্যি চাদর-মুড়ি দিয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ফ-র্-র্-র্ ফস্... ফ-র্-র্-র্-ফস্ নাইট ডিউটি দেচ্ছে! তার ঘরের সামনে কান খাড়া করি শুনলাম। তারপর কট-কট-কট-কট-

মহিলা ঃ কট-কট-কট-কট-

পুরুষ ঃ হুঁ! তারপরে গট-মট-গট-মট, গট-মট-গট-মট। সোজা লোহার গারদ ঘরে। হুই দোতলায় উঠি গেলাম— ওখেনেই ক্যাশঘর। তারপরে একেবারে ঘচাং কচ্-ঘচাং-কচ্-ঘচাং-কচ্-সিন্দুক খুলে হাতের সামনে যতগুলো বান্ডিল পালাম, ব্যাগ ভর্তি করে নিলাম।

মহিলা ঃ আর ছিল না?

পুরুষ ঃ হাতের কাছে আর ছিল না। যা ছিল সবই নিচ্ছি। তারপরে, পা টিপে টিপে....

মহিলা ঃ পগার পার ......হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আঃ! কতদিন পর বল দিনি সকলে গরম গরম জিলিপি আর কচুরী খাবো!

পুরুষ ঃ শ্-শ্-শ্-শ্-চুপ। খবরদার। এখন যেমন আছিস থাক। যা খাচ্ছিস তাই খা। কোন ইদিক উদিক করবি নে। মান্সি সন্দেহ করবে।। একদম মুখি কুলুপ— তুই মেয়েছেলে, পেটে কথা থাকে না।

মহিলা ঃ না- না- আমি অতো কাঁচা মেয়েছেল্ না, আজ সাত ববছর তোর মতুন চোরের সঙ্গে ঘর করিচি- আমি জানি কখুন কুনডা চেপি যেতি হয়। সে কথা থাক, বলতিছি, কুড়ি হাজার ট্যাকা!! একটা কতা বলবো?

পুরুষ ঃ তা বল না, আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে?

মহিলা ঃ বলি? আবার রাগ করবি নে তো?

পুরুষ ঃ আবার ছেনালি করে? যা বলতি চাস বলি ফ্যাল।

মহিলা ঃ এবার কিন্তু আমি এক জোড়া কা-কা-কান পাশা নেবো বলি দেলাম। ঐ মালতীর মতন— ঐ যে যুধিষ্ঠিরের বৌ—

পুরুষ ঃ ঔ কবিয়াল যুধিষ্ঠির? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ওর বৌ যে কানপাশা পরিছে ঐরকম?

মহিলা ঃ (আগ্রহে মাথা ঝাঁকায়) হ্যাঁ হ্যাঁ ঐরকম!

পুরুষ ঃ ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ তোর মতুন মুখ্যু মেয়ে মানুষ আমি দুটো দেখিনি। ঐ কানপাশা দুটো সোনার না রে। রোল গোল—রোল গোল—

মহিলা ঃ কি গোল?

পুরুষ ঃ রোল গোল—রোল গোল—

মহিলা ঃ সিডা আবার কি?

পুরুষ ঃ ঐ সোনার মতুন দেকতি, কিন্তু সোনা না।

মহিলা ঃ ওমা! সে কি? মালতী যে বললো যুধিষ্ঠির স্যাকরার কাছ থিকে গড়াইয়ে আনিছে?

পুরুষ ঃ ঢপ দেছে। ঢর—ঢপ। তা কি করবে বল। আমি নিজি চোখি তো দেখিছি, যতবার আমরা পালাগান করতি যাব ততোবার ঐ মালতী যুধিষ্ঠিরের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করবে— এবার আমার জন্যি ঝুমকো আনা চাই, পাশা চাই, ইটা আনা চাই, উটা আনা চাই, বলে মাথা খারাপ করি দেবে। যুধিষ্ঠিরদাদা ভালো মানুষ। কবিগান গেয়ে ক'ট্যাকা মেলে যে মালতীর জন্যি নিত্যি নিত্যি সোনার গয়না বানাবে?

মহিলা ঃ ওমা সে কি কতা? উডা নকল সোনা?

পুরুষ ঃ হুঁ—! আসল সোনার ঐরাম একজোড়া কানপাশার দাম কত জানিস? মেলা টাকা! এতো টাকা যুধিষ্ঠির পাবে কুথায়? কবিগান গেয়ে, সৎপথে পেট চালায়। আমার মতুন নাকি? কবিগানে কাঁসর বাজাই আবার মাঝে মাঝে সিঁদ কাটি। সবই করি পেটের জ্বালায়— নাকি বল?

মহিলা ঃ সে তো নিচ্চই, সে তো নিচ্চই। এখন দুটো পেট— আবার একজন আসতিছে; তিনটে পেট চালাতি গেলি সিঁদ না কাটলি চলে?

পুরুষ ঃ তবে? তুই কত তাড়াতাড়ি বুঝিস- এই জন্যি তোরে আমার এতো ভালো লাগে—

মহিলা ঃ থালি হবে তো?

পুরুষ ঃ কি?

মহিলা ঃ বড় ভয় করে রে!

পুরুষ ঃ ভয়? কিসির ভয়?

মহিলা ঃ এই যে রাত বিরেতে সিঁদ কাটতি যাচ্ছ যন্ত্রপাতি নিয়ে, যদি কুনোদিন ধরা পড়ি যাও— (নিজেই আঁতকে ওঠে) সব শেষ। পুলিশ কিছু করার আগে পাড়ার লোকে রাই পিটোইয়ে মারবে। কুথায় যাব তখন? কি হবে এই পেটের মদ্যি যেডা এট্টু এট্টু করে বড় হচ্ছে—

পুরুষ ঃ আঃ! চুপ কর দিনি। যত অলুক্ষুণে কথা। বেলা হয়ে গেছে। এই ব্যাগডা চালের হাঁড়ির মধ্যে চেপে রাখ। এখুনি আমার বেরুতি হবে।

মহিলা ঃ কেন? এখুনি কুথায় যাবা?

পুরুষ ঃ আরে আজ মণ্ডল পাড়ায় কবিগান আছে না? বায়না দিয়ে গেছে, না গেলি চলে?

মহিলা ঃ আম্মোও যাব। আমারে নে চলো।

পুরুষ ঃ ফাগোল হইছিস? ঘরে এতগুলো ট্যাকা রেখে কার ভরসায় যাবি শুনি? আর তাছাড়া আজ তোর বাইরি না বেরুনোই ভালো।

মহিলা ঃ কেন? ঘরে তালা দে যাব, তাতে ভয়ডা কিসির শুনি? তাছাড়া তোমারে তো আর কেউ দেখেনি। বুক টান করি হাঁটবো রাস্তার উপর দিয়ে- ভয় কি?

তোমার থেকে অনেক বড় বড় চোরেরা যেমন মাথা উঁচু করে চলে—

পুরুষ ঃ ওরে তারা পয়সায়ালা চোর— নির্ভয়ে হাঁটতি পারে। আমাদের মতুন নাকি?

মহিলা ঃ অতশত জানি নে বাপু। চোর বলে কি মানুষ না? আজ আমি কবিগানে যাবই। আমার হাতেও এট্টা খঞ্জনী দিয়ো, বাজাব।

পুরুষ ঃ তুই যখন কুনো কথাই শুনবি নে, তখন চল। আসরে বসে গান বাজনা করলি মনডা ভালো হয়ে যায়। নে— তাড়াতাড়ি কর। এখুনি বেরুতি হবে। (মহিলা গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নেয়।)

মহিলা ঃ চলো, আমি যাচ্ছি। (দু'জনে হাত ধরে পথে নামে। তক্ষুণি শুরু হয় ঢোলের বোল। মঞ্চে আলো বাড়ে। দেখা যায় ডানদিকে কবি গানের আসরে হারমোনিয়াম/ঢোলসহ গানের দল। এই দলের অধিকারী যুধিষ্ঠির এগিয়ে এসে কথা বলে। তার কথার মাঝখানে মাঙন আর তার বৌ লক্ষ্মী প্রবেশ করে। মঞ্চের বাঁদিক অন্ধকার।)

অধিকারী ঃ নমস্কার, নমস্কার। উপস্থিত মা ভাই বোনেদের, বড়, মেজো, ছোট দাদা দিদিদের আর পরবীণ নাগরিক মহাশয়দের ছিচরণে পরণাম জানাই। তারপরে শুরু করি বঙ্গলক্ষ্মী সঙ্গীত সমাজের পালাগান। গাঁয়ে গঞ্জে হাটে, মাঠে, পুজো-আচ্চা, পালা-পাব্বণে আসর জমানোই আমাদের পেশা বুয়েচেন না? হিঁদু, মোচলমান, খেরেস্টান সব্ব ধর্ম্মের উঠোনে আমাদের পালা গাইবার ডাক আসে। ভক্তবিন্দ ছেদ্দাভক্তি নিয়ে পালা শুনে আমাদের খাতির যত্ন করে। তা একবার হৈল কি, ঢোল গোবিন্দপুর এক ফকিরি গানের আখড়ায়, ওহো। ঢোল গোবিন্দপুর বুয়েছেন তো? ঐ বসিরহাট যেতি বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া এক গেরাম। মেলা বাউল ফকিরির আড্ডা সে গাঁয়ে। তা আমরাও গিচি। কী বলবো বাবুমশাইরা, সে বিত্তান্ত মনে পড়লি একনো গয়ে কাঁটা দেয়। সবে রমজান মাস শুরু হইয়েছে, এক ফকিরবাবার দালানে আসর বসাইচি। সবে ধরেন গে, পীরবাবার জন্মমাহাত্ম্য শেষ করিচি আর কারবালার কাহিনী শুরু করিচি কি করি নি, হঠাৎ চর্তুর্দিকি হাঁক ডাক, চিৎকার-চেঁচামেচি— আসর একেবারে তছনছ। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার? আসর ফেলে বাইরে আসতেই দেখি— হাতে নাটি, মাথায় ঝাঁকরা চুল/কানে তাদের গুঁজা গাঁদাফুল/আমায় দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো। হা-রে-রে-রে-রে/হিঁদুর বাচ্চা কারবালার গান ধরে?/ টুকরো করে ভাইস্যে দেব লাশ/ ফের যদি ঐ কারবালার গান গাস/কী বলবো মা জননী, ভয়েই সবাই কাঁপে/প্রাণ বাঁচাতি ঘরের কোণে ইষ্টনাম জপে/এই গানের দলে আমিই হলাম পোধান অধিকারী/আমি কি আর দল ছেড়ে পলায় যেতি পারি?/হেসে বললাম —বাবাসকল—শোন বলি ভাই/ কাঁটাতারের বেড়া কিন্তু গানের মধ্যি নাই/ গানের ধম্ম ভালোবাসা, জাতি বিদ্বেষ নয়/ সব ধম্মের গানের ভাষা প্রেমের কথাই কয়/সেই প্রেমের গানে মাতোয়ারা আল্লা হরি সবাই/ধৈর্য্য ধরে বোস যদি, একখান প্রেমের গান গাই/এই মতো

কথা শুনে যে ছিল যেখেনে/লাফ দিয়ে বসলো এসে আসরের মাঝখানে/ধরো গান, ধরো গান, কৈ হে অধিকারী।/এমন ডাকে আমি কি আর চুপ থাকতি পারি?/গায়েনের হাত ধরে কাছে আনি ডাকি/বলি ভয় নাই, এবার গান গেয়ে আসর মাতাও দেখি/ ব্যাস্, আর যাবে কৈ?/ ঢোল আর কাঁসির যুগলবন্দী উঠলো বেজে ঐ। (ঢোলের তালে গায়েন গান ধরে—)

গায়েন ঃ বসন্ত বাতাসে সই গো, বসন্ত বাতাসে—
বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে, সই গো।।
বন্ধুর বাড়ির ফুলবাগানে নানান বনের ফুল, হায় রে—
ফুলের গন্ধে মন আনন্দে ভ্রমরা আকুল, সই গো বসন্ত বাতাসে।।
বন্ধুর বাড়ির ফুলের কুঞ্জ বাড়ির পূর্ব দ্বারে, হায় রে—
সেথায় বসে বাজায় বাঁশি প্রাণ নিলো তার সুরে, সই গো....।।
মন নিল তার বাঁশির গান, রূপে নিল আঁখি, হায় রে—
তাই তো ফাগোল আব্দুল করিম আশায় চেয়ে থাকি, সই গো।।

(হঠাৎ এক ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে সামনে আসে। এ একজন কবিয়াল।)

কবিয়াল ঃ এই যে অধিকারী মশাই, বলি এখেনে ঐ প্যানপ্যানে পীরিতির গান গাইবার জন্যে তোমাদের বায়না করিছি নাকি? পীরিত মারাতি এসেচো? কবিগান গাও, কবিগান। ঐসব বুজরুকি দিয়ে আমাদের ভোলাতে এসো না। কবিগান আমরা জানি।

যুধিষ্ঠির ঃ এ তো আনন্দের কথা। বায়নাদার যদি নিজেই কবিয়াল হয়, তবে তো আসর জমে যাবে গো কত্তা।

২য় ব্যক্তি ঃ শুধু জমে যাবে না। জমে একেবারে ক্ষীর হয়ে যাবে।

যুধিষ্ঠির ঃ সে তো বটেই। সে তো বটেই—

কবিয়াল — তোমার তো এখনও দুধটাই গরম হয় নি গো অধিকারী। দুধ মরে ক্ষীর হতে তো ভোর হয়ে যাবে হে।

২য় ব্যক্তি ঃ কী আরোশ্চর্য! তোমারে চ্যালেঞ্জ দেচ্ছে অধিকারী।

যুধিষ্ঠির ঃ না, না, এতে আশ্চর্য্যির কি আছে? কবিয়াল হল গে সাধক মানুষ। তা কত্তা, বলছি আপনিই না হয় বন্দনাডা ধরি দ্যান। তারপরে আমরা না হয়—

ব্যক্তি ঃ বন্দনা? ও বন্দনা? তা মন্দ না। তবে অনেকদিন হল আসরে নামিনি তো। তাই এট্টু... হঠাৎ বললে কি আর দুম করে আসরে নামা যায়?

যুধিষ্ঠির ঃ না, না, তাতে কি হইয়েছে? কবিয়াল মানুষ আপনি। হাঁ করলিই গান বারুবে। নেন ধরেন, ধরেন—

কবিয়াল ঃ নরেন, ইদিকি আয়, বন্দনা তো একা হবে নে। তুই গলা দিস।
(নরেন এগিয়ে আসে।)

নরেন ঃ সে গলা লাগবে না। তুমি ধরো! আমরা আছি। (আরও দু'জন এগিয়ে আসে।)

কবিয়াল ঃ ধম্মতলার মাচায় কবিগান করে মেডেল পেলুম। তারপরে আর কেউ ডাকে না। তাই তোরা বললি যখন কথাটা ফেলতে পারলুম না। তাইলে শুরু করি?

নরেন ঃ শুরু করো ওস্তাদ, শুরু করো—(কবিয়াল কোমড়ে গামছা বাঁধে। বাজনার তালে হাততালি দিতে দিতে নেচে ওঠে কাঁধে বাঁক নিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাওয়ার ছন্দে ছন্দে হাঁটে)

কবিয়াল ঃ ভোলে বাবা পার করেগা।।
ভোলে বাবা পার করেগা।।
যাচ্ছি কোথায় বাবার কাছে।।
বাবা কোথায় উঁচু মাথায়।।
মাচা কোথায় পঞ্চায়েতে।।
মাচা কোথায় পৌরসভায়।।
মাচা কোথায় বিধানসভায়।।
মাচা কোথায় লোকসভাতে।।
মাচা কোথায় স্কুল কলেজে।।
মাচা কোথায় সিন্ডিকেটে।।
যাচ্ছি কেন মাল কামাতে।।
যাচ্ছি কেন মাল কামাতে।।
যাচ্ছে কারা বাবার চ্যালা।।
আসছে কারা বাবার চ্যালা।।
করছে টা কি যার যা খুশি।।
এই তো সময় গুলিয়ে দেবার।।
এই তো সময় লুটে খাবার।।
(আরে) এই তো সময় চেটে খাবার।।
এই তো সময় বদলা নেবার।।
এই তো সময় বদলা নেবার।।
(পাগলা) এই তো সময় ফুঁসলে নে।।
এই তো সময় তুলে নে।।
(পাগলা) পাবি কোথায় ঘরে ঘরে।।
পাবি কোথায় ঘরে ঘরে।।
পাবি কোথায় স্কুল কলেজে।।
পাবি কোথায় ঝোপে ঝাড়ে।।
(পাগলা) খাবি কোথায় যেথায় সেথায়।।

	মা মাসি কোন	হোগলাবনে।।
	মা মাসি বোন	নদীরচরে।।
	মা মাসি বোন	ফাঁকা ঘরে।।
	মা মাসি বোন	ত্রাণ শিবিরে।।
বল	ভোলে বাবা	ঝান্ডা ধরে।।
	পার করেগা	ঝান্ডা ধরে।।
	ক্লাবে ক্লাবে	ঝান্ডা তুলে।।
	স্কুল কলেজে	ডান্ডা মেরে।।
বল	ব্যোম ব্যোম	তারক ব্যোম।।
	ব্যোম ব্যোম	তারক ব্যোম।।
	ব্যোম ব্যোম	তারক ব্যোম।।

(শেষ লাইনটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করে। অধিকারী যুধিষ্ঠিরসহ অন্যান্যরা হেসে ওঠে।)

যুধিষ্ঠির ঃ হেঃ হেঃ হেঃ !! এইডা আপনি কী করলেন কবিয়াল? এ তো বাবার মাথায় জল ঢালার গান? এ তো বন্দনা হল না। দশ দিশি দশ দেবতার স্মরণ করি, তারপরে নদ নদী, আকাশ বাতাস, সাগর পর্বত, মায় ধরিত্তির পূজো পাঠ করার নাম হলে গে বন্দনা গান। কিন্তু আপনি এ কোন বন্দনা শুনালেন কবিয়াল?

কবিয়াল ঃ না, না অধিকারী মশাই, ওসব বন্দনা এগনে আর চলে না। দেব দেবতার বন্দনা করে আসরে আসরে অনেক হাততালি পেইচি। কত লোক গলায় মালা দেচে। মন্তিরি মশাই মেডেল দেচে। আর তারপরে! তারপরে একদিন আমার মেয়েটা লুঠ হয়ে গেল (চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে) সাধ করে নাম রেখেছিলাম মাধবীলতা— হাঃ ! হাঃ !! আঃ— উপড়ে ফেলে দিলো আমার বাগানের ঐ একটা মাধবীলতা— আঃ—আঃ— (নরেন এসে জড়িয়ে ধরে)

নরেন ঃ চুপ করো ওস্তাদ, চুপ করো। বুকের পাঁজর ভাঙা দুঃখের কথাগুলো এই হাটের মাঝে বোল না। ওনারা একহাতে মেডেল দ্যান, আর এক হাতে মা বোনেদের ইজ্জৎ কেড়ে নেন।

কবিয়াল ঃ গলায় মেডেল পড়িয়ে, হাতে নগদ টাকা দিয়ে শহরে কত শিল্পী-কবি-নায়ক গায়ক- কিনে ফেলা যায়। আমার মতোন এক গ্রাম্য কবিয়াল-গরীব মজুর-আমার ঐ একরত্তি মাধবীলতারেই সস্তায় পাওয়া গেল বুঝি? কেন? আইন আদালত কিনবার মতো পয়সা আমাদের হাতে নেই বলে?— তাই?—

নরেন ঃ ওস্তাদের মেয়েটারে যখন পশুরা ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ইছামতীর পাড়ে ফেলে রেখে গেল, তখন আমরা গাঁ শুদ্ধ মানুষ থানার দারোগাবাবুরে কতবার বললুম, পায়ে ধরে কাঁদলুম, ঐ শয়তানগুলোর যাতে শাস্তি হয় সেই ব্যবস্থা করুন। উনি কোন কথাই কানে তোলেন নি। বললেন, ময়নাতদন্তের আগে কোন কেস

নেওয়া যাবে না। কত করে বুঝালাম, ঐ ফুলের মতো মেয়েটা, অতো সোন্দর গলায় গান গায়, তার ক্ষত বিক্ষত উলঙ্গ শরীলডা দেখেও আপনার প্রাণ কাঁদে না? আপনিও তো বাবা দারোগাবাবু। আপনারও তো ঘরে ঐ মাধবীলতার মতো দুটো মেয়ে আছে।

কবিয়াল ঃ ব্যাস্! দারোগাবাবু একেবারে আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়লেন। বললেন, ঐ জন্যেই তো কেসটা নেওয়া যাবে না রে শুয়োরের বাচ্চা। তোর মাধবীলতার ডেডবডিতে আমার অলকা আর সনকার ছায়া দেখতে পাই। তোর ঘরে আগুন নেভাতে গিয়ে আমার নিজের ঘরে আগুন লাগাব? আমায় গান্ডু পেয়েছ শালা? পুলিশকে পুলিশের কাজ করতে দে।

যুধিষ্ঠির ঃ আইন আইনির পথে চলবে .... তাই বলিছে তো?

কবিয়াল ঃ হ্যাঁ, এই কথাটাই বাবুরা বললেন তো। আইন আইনের পথে চলবে। এ দেশে আমার মাধবীলতার জন্যে কোনও আইন নেই অধিকারী, তাই না? আজ আমার ঘরের মান-সম্মান আমি বাঁচাতে পারিনি। যার জন্ম দিলাম তার জীবনটাও রক্ষা করতে পারি না। কেমন হবে অধিকারী, আমিও যদি ওদের মতো নষ্ট বাবা হই? এ নষ্ট সংসারে সবাই নষ্ট। মন্ত্রী নষ্ট, কবি নষ্ট, শিল্পী নষ্ট, নেতা নষ্ট, এই নষ্ট দুনিয়ায় তাই তো আমি এই নষ্ট সমাজের বন্দনা গান গাই অধিকারী। এ নষ্ট সমাজের বন্দনা গান । আইন তো আইনের পথেই চলবে বলো, ঠিক বলিনি, বলো সবাই, আইন আইনের পথে চলবে... আইন আইনের পথে ..... (আপনমনে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যায়। নরেন সহ অন্যান্যরা ডাকে, কিন্তু কবিয়াল ফেরে না।)

২য় ব্যক্তিঃ কবিয়াল, কবিয়াল ফিরে এসো, একা যেয়ো নি গো কবিয়াল—

যুধিষ্ঠির ঃ থাক ভায়া, যে যেতি চায় তারে যেতি দাও। জোর করি কাউরে রাখা যায় না। ঐ কবিয়াল যেদিন ওর প্রাণের মাধবীলতার জন্যি একটা নিরাপদ বাগান খুঁজে পাবে। সেদিনও আপনিই ফিরে আসবে—। (হঠাৎ মাঙনের স্ত্রী লক্ষ্মী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—)

লক্ষ্মী ঃ এ তোমাদের কেমন বিচার? এটা কি জঙ্গল নাকি? এতোবড় অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার দেখেও তোমরা নিশ্চিন্তে গান গাইবা? পালা গান? নিকুচি করি তোমাদের পালা গানের। তোমরা কি মানুষ? তোমাদের ঘরে মা-বুন নেই? ছিঃ ছিঃ ছিঃ— [সবাই হতচকিত হয়ে পড়ে]

মাঙন ঃ (উৎকণ্ঠা নিয়ে লক্ষ্মীকে শান্ত করার চেষ্টা করে) এই, চুপ কর, চুপ করে বোস। এই জন্যিই তোরে আনতে চাই নি কো। এ তো রিহাস্যাল হচ্ছে— রিহাস্যাল! রিহাস্যাল বুঝিস? —মহড়া-মহড়া , মানে প্র্যাকটিস হচ্ছে বুয়িছিস? তুই ভেবেছিস সত্যি সত্যি। তাই এমন ক্ষেপে উঠলি বোধায়!

লক্ষ্মী ঃ রিহাস্যাল হচ্ছে? মহড়া? ঐ যে কবিয়াল এমন কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে হারানোর হুতোশে চলে গেল— ওকি কাঁদা প্যাকটিশ করছে?

মাঙন ঃ ওরে বাবা হ্যাঁ —হ্যাঁ। এখেনে হাসি-কান্না সবই প্র্যাকটিশ কত্তে হয় বুয়িছিস? (যুধিষ্ঠির সহ সকলে হাসতে শুরু করে সমস্বয়ে- হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!!)

লক্ষ্মী ঃ আ মোল যা, সবাই অমন পাগলের মতন হাসছে কেন?

মাঙন ঃ বুজলি নি? হাসি প্র্যাকটিস করছে— হাঃ হাঃ হাঃ— [আচমকা একজন আগন্তুক প্রবেশ করে]

আগন্তুকঃ এই এখেনে মাঙন হালদার কে আছে? মাঙন হালদার ? এটা যুধিষ্ঠিরের আখড়া তো?

যুধিষ্ঠির ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই যুধিষ্ঠির। কি ব্যাপার? আপনারে তো ঠিক চিনলাম না। মাঙনকে দরকার?

আগন্তুকঃ দরকার আছে বলেই তো আসা। আমি কে সেটা না জানলেও চলবে। আপাতত মাঙন হালদারকে বের করে দিন, তাকে নিয়ে যাবো। [মাঙন ভীত সন্ত্রস্ত চোখে নিজেকে আড়াল করার বৃথা চেষ্টা করে]

যুধিষ্ঠির ঃ হ্যাঁ সেটাই তো জানতি চাচ্ছি। আপনাকে চিনি না, জানি না, হঠাৎ আমার আখড়ায় এসে আমাকে হুকুম করছেন মাঙন হালদারকে বের করে দিন— অমনি বের করে দেব?

আগন্তুকঃ (ধমকে ওঠে) হ্যাঁ দেবেন।

যুধিষ্ঠির ঃ কার হুকুম

আগন্তুকঃ এম.এল.এ. সদাশিব সাহার হুকুম।

যুধিষ্ঠির ঃ এম.এল.এ. সদাশিব সাহা? মাঙনরে একা ছেড়ি দেয়া যাবে না। আমরাও যাব। চলো সবাই।

(সকলে উঠে দাঁড়ায়। আলো নেভে। আবহ। বাঁদিকের জোনে আলো। বিধায়ক সদাশিব এবং ব্যাংক ম্যানেজার মিঃ মুখার্জি কথা বলছে।)

সদাশিব ঃ খুব সাবধানে পা ফেলবেন মিঃ মুখার্জী। আপনি এই ব্যাংকের ম্যানেজার। আপনার স্টেটমেন্টের উপর সব কিছু নির্ভর করছে।

মুখার্জী ঃ হ্যাঁ স্যার। আপনি এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান। আমাদের কোঅপারেটিভ ব্যাংকের মত এত বড় ব্যাংক এই জেলায় আর একটাও নেই। এই আড়াই হাজার গ্রাহক-কোটি কোটি টাকার ট্রানজাকশন-এই কো-অপারেটিভ ব্যাংকের বিরাট গুড-উইল সম্ভব হয়েছে আপনার জন্য।

সদাশিব ঃ না, না, আমি আর কীই বা করেছি। লোনের সুদ কমিয়েছি আর ডিভিডেন্ড এর পার্সেন্টেজ বাড়িয়ে দিয়েছি বলে লোন নেবার জন্য লাইন লেগে গেছে এদিকে ডিপোজিট বলুন আর শেয়ার বলুন হু হু করে বেড়েছে। এ তো

সাধারণ অঙ্ক-সবাই বোঝে। যাক গে, আসল কথায় আসুন। গতকাল যে ডাকাতিটা হল ব্যাংকে-সে ব্যাপারে কাউকে মুখ খুলতে বারণ করেছিলাম— সবাইকে এলার্ট করে দিয়েছেন তো

মুখার্জী ঃ হ্যাঁ স্যার, কোন স্টাফ মুখ খুলবে না। সবাইকে বলে দিয়েছি।

সদাশিব ঃ ক্যাশরুম

মুখার্জী ঃ নতুন তালা লাগিয়ে দিয়েছি। সব স্টাফকে বলেছি আমি না আসা পর্যন্ত কেউ ঢুকবে না।

সদাশিব ঃ কাল নাইট ডিউটিতে যে সিকিউরিটি গার্ড ছিল—

মুখার্জী ঃ তাকে বসিয়ে রেখেছি। আমার অর্ডার ছাড়া সে বাইরে যাবে না।

সদাশিব ঃ গুড। একটা নোটিশ—

মুখার্জী ঃ হ্যাঁ স্যার। নোটিশ মেন গেটে ঝুলিয়ে দিয়েছি— অনিবার্য কারণবশতঃ আজ ব্যাংক পরিষেবা বন্ধ থাকবে।

সদাশিব ঃ ভেরি গুড। আসলে এত বড় ডাকাতি এই ব্যাংকে কখনও হয়নি তো! তাই ন্যাচারালি আমাদের খুব ভেবেচিন্তে প্রতিটি স্টেপ ফেলতে হবে।

মুখার্জী ঃ অবশ্যই স্যার। অবশ্যই। স্টেটমেন্টটা যদি কাইন্ডলি—

সদাশিব ঃ হ্যাঁ, স্টেটমেন্টটা রেডি করছি। তার আগে আমাদের চিফ ক্যাশিয়ার এলেই বলবেন কাউন্টারে বসার আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যান। ইট ইজ ভেরি আর্জেন্ট।

মুখার্জী ঃ অফকোর্স স্যার, আমি এখনই বলে দিচ্ছি।

সদাশিব ঃ ইয়েস, দ্যাটস গুড। নাউ স্টেটমেন্ট। যেটা বলব সেটাই প্রেসে দেবেন। আর থানায় ডায়েরি লেখাবার সময় সেটা আমিই, হ্যাঁ, আমি নিজেই যাব।

মুখার্জী ঃ ইয়েস স্যার, ও. কে.।

সদাশিব ঃ লিখুন— সঞ্চয় কোঅপারেটিভ ব্যাংকে, স্মরণাতীত কালের মধ্যে ঘটে গেল এই জেলার বৃহত্তম ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা। সিন্দুক ভেঙে আঠার লক্ষ টাকা নগদ এবং প্রায় দশ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার গহনা লুঠ করে নিয়ে গেল ডাকাতদল। ঋণ প্রদানের জন্য নগদ আঠের লক্ষ টাকা এবং ঋণ শোধ করে বন্ধকী গয়না প্রত্যার্পণের জন্য লকার থেকে আনিয়ে রাখা হয়েছিল সিন্দুকে। ডাকাতদলের কাছে আগে থেকে খবর ছিল কিনা, কিম্বা ব্যাংকের কোন কর্মীর সাথে ডাকাতদলের যোগাযোগ আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই অপরাধের মূল চক্রীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন প্রশাসনের কাছে। ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নতুন করে সাজানোর আশ্বাস দিয়েছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ও.কে.? দ্যাটস্ অল। একবার পড়ুন তো মিঃ মুখার্জী।

মুখার্জী ঃ ইয়েস স্যার। পড়ছি। কিন্তু বলছিলাম যে স্যার, মানে আঠের লক্ষ টাকা? দশ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার অলংকার? ইয়ে মানে—

সদাশিব ঃ কি হল? অমন ফাম্বল্ করছেন কেন? ইয়ে মানে, ইয়ে মানে— হোয়াটস্ রং উইথ ইউ? এতো ঘামছেন কেন?

মুখার্জী ঃ না স্যার, মানে বলছিলাম—

সদাশিব ঃ এ্যামাউন্টটা কম হয়ে গেল বলছেন? আর একটু বাড়িয়ে দেব?

মুখার্জী ঃ এ্যাঁ ? না— না— সেকথা বলছি না। ইন ফ্যাক্ট এত ক্যাশ আর অর্নামেন্ট আমরা কোনদিন—

সদাশিব ঃ কী আমরা কোনদিন? রাগত কণ্ঠে বলুন।

মুখার্জী ঃ সিন্দুকে রাখি না। ডেলি পেমেন্টের জন্য—

সদাশিব ঃ তার মানে আপনি জানতেন, গত কাল ভল্টে কত টাকা ছিল? আপনি জানতেন ঠিক কতটা অর্নামেন্টস—

মুখার্জী ঃ ইয়েস স্যার। মানে নো স্যার। ইন ফ্যাক্ট আমি জানতাম মানে—

সদাশিব ঃ মানে জেনে শুনেই খবরটা অ্যাডভান্স্ আপনিই তাহলে?

মুখার্জী ঃ এ ... আপনি ... কি.... বলছেন... স্যার...? আমি? আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম প্রতিদিন ওপেনিং ব্যালান্স আর ক্লোজিং ব্যালান্সের হিসাবটা আমাকে রাখতেই হয় স্যার—ইট ইজ মাই অফিসিয়াল ডিউটি। মানে আমার .... এটা আমার দৈনন্দিন রুটিন ওয়ার্কের মধ্যে পড়ে। তাই ....।

সদাশিব ঃ তাই আপনাকেই সব থেকে স্টেডি থাকতে হবে- ইজ দ্যাট ক্লিয়ার

মুখার্জী ঃ ই... ইয়েস স্যার! আমাকে তো স্টেডি থাকতেই হবে। কিন্তু বলছিলাম কি স্যার —

সদাশিব ঃ আপনি কিছুই বলবেন না। যদি চাকরিটা বাঁচাতে হয়, সম্মানের সঙ্গে এই ব্যাংকে কাজ করতে হয় তাহলে মুখে ল্যুকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখবেন। আর যদি কোথাও কিছু বলতেই হয়, তাহলে সেটুকুই বলবেন, যেটুকু আমি আপনাকে বলতে বলব— গট ইট?

মুখার্জী ঃ হান্ হান্ হানড্রেড পার্সেন্ট স্যার, হানড্রেড পার্সেন্ট। তবে ইয়ে, মানে বোর্ড অব ডিরেক্টর যদি—

সদাশিব ঃ ওটা আমি সামলাবো। বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এর মিটিংটা আমিই করে নেব। আপনি শুধু ফিগার দুটো মনে রাখবেন। নগদ আঠের লক্ষ টাকা আর দশ লক্ষ টাকার সোনার গয়না- রাইট?

মুখার্জী ঃ ইয়েস স্যার— ইয়েস স্যার। আমি শুধু ইয়ে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে মানে, চোর কি ধরা পড়েছে? মানে পুলিশ কি — ইয়ে—

সদাশিবঃ (প্রচন্ড ধমক) স্টপ ইট। স্টপ ইট মিঃ মুখার্জী । আপনার ঐ ‘ইয়ে’ আর ‘মানে’ —ওগুলো বন্ধ করুন। (একটু থেমে) ওয়েল মুখার্জীবাবু,আপনার তো একটাই

ছেলে না?

মুখার্জী ঃ ইয়ে ইয়েস-স্যার।

সদাশিবঃ কি যেন নাম?

মুখার্জী ঃ সাত্যকি— সাত্ সাত্ সাত্যকি মুখার্জী।

সদাশিবঃ সাত্যকি। হ্যাঁ হ্যাঁ সাত্যকি। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেছিল। মেডিকেলে পড়ার ইচ্ছে ছিল।

মুখার্জী ঃ হ্যাঁ, মানে র‌্যাংকিং অনেক পিছনে ছিল। তাই—

সদাশিবঃ তাই আপনি ইউ.পি.তে একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ছেলেকে ভর্তি করতে চলেছেন— ডাক্তার হবে সাত্যকি।

মুখার্জী ঃ হ্যাঁ স্যার। আমাদের সেরকমই স্বপ্ন, জানি না কি হবে।

সদাশিবঃ এডমিশন ফিশ লাগবে দশ লক্ষ টাকা। তারপর প্রতি সেমিস্টারের আগে দু'লক্ষ করে চার বছরে আটটা সেমিস্টার ষোল লাখ এবং তারপর এক বছর ইনটার্নশিপের জন্য কশান মানি চার লাখ- সব মিলিয়ে কুড়ি লাখ প্লাস ঐ অ্যাডমিশন ফি দশ লাখ—টোটাল ত্রিশ লাখ টাকা— কি? ঠিক বললাম তো?

মুখার্জী ঃ ইয়েস স্যার, হান্-হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক। কিন্তু স্যার আপনি কি করে—

সদাশিবঃ জানলাম তাই তো?

মুখার্জী ঃ হ্যাঁ না মানে—

সদাশিবঃ মানে এই মুহূর্তে আপনার অনেক টাকার প্রয়োজন মিঃ মুখার্জী। আর সেই জন্যে আপনি—

মুখার্জী ঃ (আৎকে উঠে) স্যার! কি বলতে চাইছেন আপনি...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না — মানে বিশ্বাস করুন আমি কিন্তু—

সদাশিবঃ ওঃ হো! আমি বলতে চাইছি— এই মুহূর্তে আপনার অনেক টাকার ভয়ঙ্কর প্রয়োজন— আর সেই জন্য আপনি খুব টেনশনে আছেন, হ্যাঁ কি না?

মুখার্জী ঃ ইয়ে, হ্যাঁ স্যার, সেটা ঠিকই (হঠাৎ সদাশিবের মোবাইল বেজে ওঠে)

সদাশিবঃ জাস্ট এ মিনিট (কানে ফোন ধরে) হ্যাঁ সদাশিব সাহা স্পিকিং... সে কি? সুইসাইড?

(মঞ্চের অপরদিকে ফোনে কথা বলা মানিকবাবুকে আলোকবৃত্তে দেখা যায়)

মানিক ঃ হ্যাঁ স্যার বুঝতেই পারছেন, কিছুতেই স্বীকার করছিল না। সেই জন্য একটু কড়া ট্রিটমেন্ট করতে হল, বাট—

সদাশিবঃ বাট? বাট কি?

মানিক ঃ বাট ঐ একই কথা বলে যাচ্ছে- ' আমি চুরি করিনি', ' আমি চুরি করিনি'।

সদাশিবঃ ছেড়ে দিলেই পারতেন তো। ও সত্যিই চুরি করেনি। আমার কাছে খবর আছে বাংলাদেশের একটা গ্যাং আজ বছর কয়েক ধরে এপারে অপারেশন চালাচ্ছে।

এটা তাদেরই কাজ। এরা এখানকার নাগরিকই নয়, এ বাংলায় ডাকাতি করে ওপার বাংলায় পালিয়ে যায়। এরা সব মাইগ্রান্ট ডাকাত।

মানিক ঃ অথচ সি সি টি ভি ফুটেজে পরিস্কার দেখা গেছে—

সদাশিবঃ হ্যাং ইয়োর সি সি টি ভি। ওটা নষ্ট করে দিন।

মানিক ঃ কিন্তু জেরার সময় বেটা স্বীকার করেছে যে টাকাটা ঐ চুরি করেছে। তারপর ওর বাইড় গেছিলাম সার্চ করতে । সেখানে চালের হাঁড়ি থেকে কুড়ি হাজার টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু বাকি টাকা আর গয়নাগুলোর কেন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুতেই মুখ খোলাতে না পেরে—

সদাশিবঃ মেরে ফেললেন?

মানিক ঃ না স্যার, সেরকম কিছু না। একটু হার্ড ট্যাক্‌ল এসব ক্ষেত্রে করতেই হয়। আর তারপরে দেখলাম—

সদাশিবঃ মারা গেছে তাই তো?

মানিক ঃ হাঁ স্যার। ব্যাপারটি ঐ রকমই। লক আপের মধ্যেই—

সদাশিবঃ ঠিক হয়নি কাজটা। এখন তো পুলিশ লক আপে পিটিয়ে খুন' বলে পাবলিক চেঁচামেচি শুরু করবে। তাতে বিপদ আরও বাড়বে। শুনুন, ডক্টর আইচকে ইমিডিয়েট ফোন করে বডি পোষ্টমর্টেম করতে পাঠান। আত্মহত্যা নয়, আসামী হার্টফেল করে মারা গেছে— ডক্টর আইচকে একথাটা জানিয়ে দেবেন। বলবেন আমি বলেছি— হার্ট ফেল। বোঝা গেল? আর হ্যাঁ, ডক্টর আইচ যেন আমাকে ফোন না করেন— কোন অবস্থাতেই না।

মানিক ঃ হ্যাঁ স্যার, সব বুঝেছি। ডক্টর আইচকে নিয়ে প্রবলেম হবে না। ধরে নিন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে অন্য জায়গায়।

সদাশিব ঃ আবার কোথায় সমস্যা হল? যত তাড়াতাড়ি পারেন থানা থেকে রিমুভ করুন।

মানিক ঃ সেটাই তো হচ্ছে না স্যার। চেষ্টা করেও পারছি না। ঐ একদল লোক গান টান গায় আর কি— ওদের দলের একজন পান্ডা ঐ যুধিষ্ঠির না কি যেন নাম— দল বল নিয়ে থানার সামনে বসে গেছে— বলছে ঐ আসামী মাগুন হালদারকে না নিয়ে ওরা যাবে না।

মুখার্জী ঃ আমি কি এখন তাহলে স্টেটমেন্টটা টাইপ করতে চলে যাব স্যার?

সদাশিব ঃ (ফোনে হাত চাপা দিয়ে) ও মাই গড। আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? যান-যান-মুভ।

মুখার্জী ঃ ও. কে. স্যার! (মুখার্জী প্রস্থানে উদ্যত)

সদাশিব ঃ মনে আছে তো? আঠের লক্ষ টাকা ক্যাশ আর প্রায় দশ লক্ষ টাকার গয়না। ফাইভ পার্সেন্ট আপনার। চিন্তা করবেন না- এবারে লম্বা তদন্ত হবে। আইন আইনের পথে চলবে—! (মুখার্জী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। আলো

নেভে। প্রচন্ড শব্দে দ্রিম-দ্রিম ধ্বনি শুরু হয়। আলো জ্বললে দেখা যায় সেন্টার স্টেজে যুধিষ্ঠির ক্ষুব্ধ গলায় মনসা মঙ্গলের সুরে গান গাইছে। দোহার কন্ঠ দিচ্ছে কবিয়াল, নরেন, ২য় ব্যক্তি)

যুধিষ্ঠির ঃ সুজলা সুফলা দেশে মরি অনাহারে— শুন সুধী জনে।।
সুজলা সুফলা দেশে মরি অনাহারে— শুন সুধী জনে।। (দোহার)
ফসল ফলায় চাষী তারা আত্মহত্যা করে— শুন সুধী জনে।।
ফসল ফলায় চাষী তারা আত্মহত্যা করে— শুন সুধী জনে।।
হাত আছে কাজ নাই অভাব ঘরে ঘরে — শুন সুধী জনে।।
হাত আছে কাজ নাই অভাব ঘরে ঘরে— শুন সুধী জনে।। (দোহার)
ঘরে ঘরে কন্যা শিশু কান্দে গুমরিয়া — শুন সুধী জনে।।
ঘরে ঘরে কন্যা শিশু কান্দে গুমরিয়া — শুন সুধী জনে।। (দোহার)
শৈশব নেয় কাড়িয়া এই নির্দয় সমাজে— শুন সুধী জনে।।
শৈশব নেয় কাড়িয়া এই নির্দয় সমাজে— শুন সুধী জনে।।
দেশনেতায় চুরি করে ভালো মানুষ জেলে— শুন সুধী জনে।।
দেশনেতায় চুরি করে ভালো মানুষ জেলে — শুন সুধী জনে।। (দোহার)
ভুখা লোকের খাদ্য জমে ধনী লোকের ঘরে — শুন সুধী জনে।।
ভুখা লোকের খাদ্য জমে ধনী লোকের ঘরে— শুন সুধী জনে।।
প্রতিবাদী মানুষ দেখ গুলি খাইয়া মরে — শুন সুধী জনে।।
প্রতিবাদী মানুষ দেখ গুলি খাইয়া মরে — শুন সুধী জনে।। (দোহার)
আমার জমি আমার মাটি স্বদেশ বলি যারে— শুন সুধী জনে।।
আমার জমি আমার মাটি স্বদেশ বলি যারে— শুন সুধী জনে।।(দোহার)
স্বদেশ আমার লুঠ করিতে ষড়যন্ত্র করে— শুন সুধী জনে।।
স্বদেশ আমার লুঠ করিতে ষড়যন্ত্র করে — শুন সুধী জনে।।
পেটের জ্বালায় গরীব মানুষ বন্দী শালায় মরে — শুন সুধী জনে।।
পেটের জ্বালায় গরীব মানুষ বন্দীশালায় মরে—শুন সুধী জনে।। (দোহার)
বড় বড় চোরেরা সব বুক চিতাইয়া চলে— শুন সুধী জনে।।
বড় বড় চোরেরা সব বুক চিতাইয়া চলে— শুন সুধী জনে।। (দোহার)
আজ মাঙনের মুক্তি চাই শ্লোগান প্রতিবাদে— শুন সুধী জনে।।
আজ মাঙনের মুক্তি চাই শ্লোগান প্রতিবাদে—শুন সুধী জনে।। (দোহার)
অমানিশার কালো রাত্রি যায় ঘুচে প্রভাবে—শুন সুধী জনে (দোহার)।।২।।

(নেমে আসে মৃত্যু শীতল নীরবতা। দেখা যায় একটি সাদা কাপড়ের সামনের দুই প্রান্ত দু'জন, পেছনের দুই প্রান্ত দু'জন মৃতদেহ বহন করে আনার ভঙ্গিতে ধরে নিয়ে ধীর গতিতে সামনে চলে এসে কাপড়টি মাটিতে শুইয়ে দেয়। এই চারজনের

পিছনে লক্ষ্মী আসে-- বিধ্বস্ত চেহারা -- খোলা চুল --শাড়ির আঁচল লুটিয়ে মাটিতে। সে একবার যুধিষ্ঠির, একবার অন্যদের অব্যক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে--)

লক্ষ্মী ঃ যুধিষ্ঠির দাদা, ও কি সত্যি সত্যিই মরি গেছে, নাকি রিহাস্যাল দেচ্ছে, বলো না, আমি কি এখন কাঁদব? বলো, আমি কাঁদব কি করে, আমি প্যাকটিশ করি নি যে, আমি কাঁদব কি করে, আমার প্যাকটিশ নেই যে--

(হঠাৎ বসে মৃতদেহে হাত বোলায়, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃতদেহটাকে নাড়তে থাকে। মৃতদেহ সাড়া দিচ্ছেনা দেখে মাথা উঁচু করে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে চায়। কিন্তু কণ্ঠ থেকে কোনও শব্দ বেরিয়ে আসে না। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃতদেহের উপর। নেপথ্যে সদ্যজাত শিশুর সুতীব্র কান্না ভেসে আসে। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে মাথা তুলে সামনে দু হাত প্রসারিত করে দেয়, যেন একটা মৃত্যুর বিনিময়ে নবজন্মকে স্বাগত জানাচ্ছে। সকলেই লক্ষ্মীকে অনুসরণ করে দর্শকদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় একটা নতুন প্রজন্মকে আহ্বান জানাতে। শিশুর কান্না বাজতেই থাকে। ক্রমে পর্দা নামে।)

।। ঋণ স্বীকার ঃ শাহ আবদুল করিম।।

লেখক : **শ্যামল ভট্টাচার্য,** পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব। কলকাতা থেকে প্রকাশিত নাট্যপত্র "গণনাট্য" এর সম্পাদক।

অন্তরাগ

শংকর বসু ঠাকুর

বৃদ্ধাশ্রম বললে ভুল হবে "ব্রজধাম" হচ্ছে এমন একটি নিবাস যেখানে বাস করেন তিনজন মানুষ যাঁরা আত্মীয় নন কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পরস্পরের উপর নির্ভর করে শেষ জীবনটা নিরুপদ্রবে কাটিয়ে দিতে চাইছেন। অশেষবাবুর বাবা ব্রজবাবু ছিলেন একজন নামজাদা উকিল। শহরতলির এই ছোট্ট বাড়িটি তিনি তৈরী করেছিলেন অবকাশ যাপনের জন্য। তিনি গত হয়েছেন, তাঁর একমাত্র ছেলে অশেষ বন্ধুদের জুটিয়ে এনে একত্রে বসবাস করছেন এই ব্রজধামে, সবাই তার মত অকৃতদার। কোনো পিছুটান নেই।

নাটকের শুরু এক সকালে .....

অশেষবাবু চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন। একটু দূরে নির্মলবাবু গালে ক্ষুরের শেষ টান দিয়ে গামছায় মুখ মুছছেন। সুপর্ণবাবু একটা থালায় তিন কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করলেন। ঘটনা ঘটছে বাড়ীর সামনের উঠোনে। বেড়া দেওয়া বাগান, একটা ফুলের গাছ, বসার জায়গা, ইত্যাদি............

সুপর্ণ ঃ নাও হে, চা-টা খেয়ে নাও—

অশেষ ঃ এখন আবার কষ্ট করে চা করতে গেলে কেন সুপর্ণ। সকাল থেকে তো দু'বার হয়ে গিয়েছে ।

সুপর্ণ ঃ কেন দাদা, জল খাবার শেষ করে তুমি তো এক কাপ খাও-

নির্মল ঃ আরে বাবা এটা বলতে হয় বললো, সব কথায় কান দিতে নেই— (তিন জনে হেসে উঠে)

অশেষ ঃ শোন হে আমার একটা প্রস্তাব আছে—

সুপর্ণ ঃ কোনো নতুন রান্নার ফরমাস করবে না-

নির্মল ঃ একান্তই যদি কোনো নতুন পদ খেতে ইচ্ছা করে তাহলে তুমি নিজে বানাবে আমরা খেয়ে তোমাকে উদ্ধার করবো।

অশেষ ঃ সব কথা না শুনে, প্রস্তাবটা কি, না জেনে হইচই শুরু করলে, খুবই বিরক্তিকর। একেবারে টিপিক্যাল বিরোধীপক্ষ।

সুপর্ণ ঃ আরে রাগ করছো কেন, কি প্রস্তাব আছে পেশ করো।

নির্মল ঃ তুমি চা-এ একটু বেশী মিষ্টি দিয়েছো হে সুপর্ণ, চিনির হাত কমাও।

সুপর্ণ ঃ দেখলে অশেষ দা, একদিন ভুলেও প্রশংসা করতে শুনলাম না।

নির্মল ঃ (হাত তুলে সুপর্ণকে নিরস্ত্র করে) তারপর- কই অশেষদা তোমার প্রস্তাবটা শুনি।

অশেষ ঃ আমি বলছিলাম এবার চলো গয়ায় গিয়ে নিজেদের শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডদান সেরে আসি।

সুপর্ণ ঃ খামোখা এসব করতে যাব কেন!
নির্মল ঃ তাছাড়া আমি ঐসব পিন্ডি-ফিন্ডি-তে বিশ্বাস করি না।
অশেষ ঃ আমি করি ভাই, তাই এই কাজটি আমি সেরে রাখতে চাই। তোমরা করবে না, কিন্তু আমার সাথে চলো, কয়েকটা দিন বেড়ানোও তো হবে।
নির্মল ঃ এত জায়গা থাকতে গয়াতে বেড়াতে যাবো কেন?
সুপর্ণ ঃ ফালতু খরচা-
অশেষ ঃ ওরে বাবা খরচা আমার তোরা শুধু আমার সাথে চল।
নির্মল ঃ সব খরচা তুমি করবে?
সুপর্ণ ঃ আমাদের পকেটে হাত দিতে হবে না?
অশেষ ঃ একদম না। তোরা শুধু ডালভাত খাবি, ভাল জায়গায় থাকবি, ঘুমোবি আর আমি যখন ঐ সব পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করবো সেই সময় শুধু আমার পাশে থাকবি। আমাকে শান্তনা দিবি—
সুপর্ণ ঃ কেন! শান্তনা দেবো এ কথার মানে কি?
অশেষ ঃ আরে বাবা শোকার্ত হয়ে আমি যদি কেঁদে ফেলি-
নির্মল ঃ যদি কেঁদেই ফেলো তাহলে নিজের পিন্ডি চটকাতে অত দূর যাচ্ছ কেন
সুপর্ণ ঃ কারেক্ট- তুমি কাঁদবে, কি না কাঁদবে সেটা uncertain, ব্যাপার সেজন্য এতগুলো টাকা খরখরচা করে আমাদের নিয়ে যাবে—
অশেষ ঃ uncertain বলছিস কেন, আমি নিশ্চই কাঁদব- (হঠাৎ আবেগ প্রবণ হয়ে) এই দেখ, এখনই আমার গলাটা কিরকম ধরে আসছে, বুকের মধ্যে কিরকম একটা চাপ-চাপ ভাব।
সুপর্ণ ঃ এত তেল-ঝাল খাও হজমের গন্ডগোল তো হবেই হবে।
নির্মল ঃ (সুপর্ণকে) এই জন্যই তোকে বলি অশেষদার কথা মতো রিচ রান্না করবি না আর তুই আমাকে ভুল বুঝিস।
সুপর্ণ ঃ (চিন্তিত) কি গো খুব অস্বস্তি হচ্ছে, বুকটা ডলে দেবো। ওখানে গিয়ে একবার চেষ্টা করবে নাকি-
অশেষ ঃ ওরে subline situation , মানে ভাব-গম্ভীর-অনুভুতিকে গুবলেট করে দিস না। কাল রাতে হঠাৎ বাবা-মা-কে দেখলাম। অনেকক্ষণ কথা বললাম।
সুপর্ণ ঃ ব্রজেন উকিল একা আসেননি, মাসিমাকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন।
অশেষ ঃ Yes উনারা জোড়ে এসেছিলেন। ওহো-হো- কি স্বর্গীয় উপস্থিতি........
নির্মল ঃ ব্রজেনবাবু তোমাকে মাঝে মঝে দেখা দেন একথা তুমি আগেও বলেছো, কিন্তু হঠাৎ করে মাসিমাকে সাথে করে নিয়ে এলেন কেন?
সুপর্ণ ঃ এটা কোনো ওকালতি প্যাঁচ নয় তো-
অশেষ ঃ হ্যাঁ রে, তোদের কি কোনো মাত্রাজ্ঞান নেই, আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি, ফাজলামি করিস ঠিক আছে কিন্তু আমার স্বর্গত বাবাকে নিয়ে ছ্যাবলামি। ঐরকম

ডাকসাইটে উকিল এ তল্লাটে ক'টা ছিলো বল দিকিনি—

নির্মল ঃ ক'টা কিগো, ওঁর সাথে কারও তুলনা চলে।

সুপর্ণ ঃ দেওয়ানি, ফৌজদারি দুটো ফিল্ডেই একেবারে মার- মার , কাট-কাট। উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন আমাদের এসব অঞ্চলে কত বড় বড় অপরাধ ঘটেছে বল, খুন, জখম, রাহাজানি, ধর্ষণ ....

নির্মল ঃ কারণ সব অপরাধী জানতো ব্রজেন উকিল আছে ঠিক খালাস করে নিয়ে আসবে।

সুপর্ণ ঃ আর দেওয়ানী মামলায় সম্পত্তি এ হাত- ও হাত করা তো ছিল ব্রজেন উকিলের কাছে নস্যি।

অশেষ ঃ (কাতর কণ্ঠে) ওরে তোরা থাম রে। ঐ মহাত্মাকে আর টেনে নিচে নামাস না। পক্ষাঘাতে তোদের মুখ বেঁকে যাবে রে, বাক্ শক্তি রহিত হবে।

নির্মল ঃ ঠিক আছে বাবা, এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

অশেষ ঃ কোনো দরকার নেই, তোদের যেতে হবে না। আমি একাই গয়া যাব।

সুপর্ণ ঃ পাগল নাকি! আমরা তোমাকে একলা ছাড়তে পারি, ওসব জায়গা ভাল নয়, অনেক ধান্দাবাজ ঘুরে বেড়ায়। তুমি কোনো বিপদে পড়লে তখন কি হবে।

অশেষ ঃ কিন্তু তোরা কেউ খুঁটিয়ে জানতে চাইলি না কেন আমি হঠাৎ গয়া যেতে চাইছি।

সুপর্ণ ঃ বারে, বললে তো পিন্ডি দিতে।

অশেষ ঃ কেন হঠাৎ পিন্ডি দিতে চাইছি-

সুপর্ণ ঃ বল নির্মল, কেন হঠাৎ অশেষদা পিন্ডি দিতে চাইছে-

নির্মল ঃ আমি জানি কিন্তু বলবো না।

অশেষ ঃ তুমি কিস্যু জানো না। ফাজিল ছেলে, প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছো।

সুপর্ণ ঃ দেখলি নির্মল একটা পবিত্র বাতাবরণ তুই কিভাবে নষ্ট করে দিস।

নির্মল ঃ না বুঝে যদি কোনো অন্যায় করে থাকি তার জন্য আবার তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

সুপর্ণ ঃ আচ্ছা আমি শুরু করি। তখন শেষ রাত, মায়ের আদরের মতো ঘুমটা জড়িয়ে ধরেছে, ঠিক সেই সময় বাবা এলেন-

নির্মল ঃ তোর বাবাও এসেছিলেন!!

সুপর্ণ ঃ আমার নয়, অশেষদার বাবা।

অশেষ ঃ তুই কি করে জানলি আমার বাবা শেষ রাতে এসেছিলেন?

সুপর্ণ ঃ যা বাবা, শেষ রাতের স্বপ্ন সত্যি হয় তাই বললাম।

নির্মল ঃ একদম ফালতু কথা বলবি না। তুমি বলতো অশেষদা মেশোমশাই, মাসিমা জোড়ে কখন এসেছিলেন।

অশেষ ঃ প্রথমে আসেন বাবা। তখন রোজকার মত আমি সাড়ে বারোটা নাগাদ

বিছানায় গা দিয়েছি ....

সুপর্ণ ঃ যা বাবা, বিছানায় গা দিয়েই ঘুমিয়ে পড়লে?

নির্মল ঃ ঘুম না ব্ল্যাক আউট—

সুপর্ণ ঃ তার মানে তুমি মেশোমশায়ের ভূত দেখেছো? স্পষ্ট করে বলতে হয় ব্রজেন উকিল প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

নির্মল ঃ আর এই ভয়েই তুমি গয়ায় পিন্ডি দিয়ে ভূতের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে চাইছ।

অশেষ ঃ (কড়জোড়ে) ওরে ভাই তোরা আমার বাবাকে আর কত নীচে নামাবি। ভূত-প্রেত নয়, তবে বলতে পারিস পবিত্র বিদেহী। আর হঠাৎ করে তো তিনি আসেন নি, মাঝে মাঝেই আসেন। আমাকে শাসন করেন, আক্ষেপ করেন—

সুপর্ণ ঃ ভূত হয়েও মেশোমশায়ের স্বভাবটা পাল্টালো না।

নির্মল ঃ ঠিকই বলেছিস, উনি চিরকাল অশেষদাকে ছেলে মানুষ ভেবে ট্রিট করে গেলেন।

অশেষ ঃ (উদাসভাবে) জ্যান্ত হোক আর মৃত হোক, বাবারা একই রকম রে। সন্তান সম্পর্কে ওদের দুশ্চিন্তা কখনো যায় না।

নির্মল ঃ এবার ব্যাপারটাকে ছোটো করে খুলে বলো, কাল উনি দর্শন দিলেন কেন—

অশেষ ঃ এই এতক্ষণে তুই একটা উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করলি “দর্শন”। A -Vision, ফসফরাসের দ্যুতি মাখা সেই আত্মা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, কলকাতার বিষয়-সম্পত্তি নাকি ঠিকমত দেখ-ভাল করা হচ্ছে না। আদি ভিটেতে কূলদেবতা ঠিক মত পূজিত হচ্ছেন না আর আমি বদ সংগে পড়ে ওনার ভজনা আশ্রম এই ব্রজধামে বসে ফিচলেমি করছি।

সুপর্ণ ঃ আমরা হলাম বদ সংগ?

নির্মল ঃ তার মানে ঐ ভদ্রলোক আমাদের চোখে চোখে রেখেছেন। কোনো রাতে যদি রাগের মাথায় আমাদের ক্ষতি করে বসে। না রে সুপর্ণ Risk নেওয়া ঠিক হবে না .....

সুপর্ণ ঃ অশেষদার সাথে গয়ায় গিয়ে পিন্ডি চটকে আসি।

অশেষ ঃ আধখানা কথা শুনে ওরকম ফড়ফড় করবি না তো। ভদ্রলোক বিদেহী হতে পারেন। অবিবেচক নন। যত রাগ আমার উপর, তোদের কোনো ক্ষতি হবে না। তোদের উনি মানুষ বলেই মনে করেন না।

নির্মল ঃ একেই বলে ভৌতিক দৃষ্টিভঙ্গী।

সুপর্ণ ঃ তুমি এই সব কথা বলে ব্যাপারটা হালকা করে দিতে পারো কিন্তু আমি খুব অপমানিত বোধ করছি। চলো অশেষদা, আজই বেরিয়ে পড়ি কাল গয়ায় পৌঁছেই পিন্ডদানম সমাপয়েৎ।

অশেষ ঃ ভালবাসাও কি কম ছিল আমাদের জন্য —

সুপর্ণ ঃ আমাদের না খাইয়ে কোনো জিনিষ মুখে তুলতেন না। সারা বছর কত কি কিনে দিতেন, জামা, কাপড়, সেন্ট— (হঠাৎ কান্না ভেজা গলায়) কি মহান বিদেহী আত্মা।

অশেষ ঃ থাক—থাক—থাক। এত ভালো কথা শুনলে বাবার অশরীরি পেটও খারাপ হয়ে যাবে।

নির্মল ঃ সুপর্ণ-র সব বিষয়ে বাড়াবড়ি। যাক বলো তো অশেষদা উনি আর কি বললেন?

অশেষ ঃ খুব লজ্জা করছে সেই সব কথা উচ্চারণ করতে।

সুপর্ণ ঃ এই মাত্র তুমি বললে ওনার সব কথা না ধরলেও চলে।

অশেষ ঃ হ্যাঁ, তাই তো বলেছিলাম, কিন্তু এসব কথাগুলো সব অশ্লীল। রেগে-মেগে বাবা বললেন, আমি নাকি কূলের কয়লা।

নির্মল ঃ কুলাঙ্গার?

অশেষ ঃ আরও খারাপ কথা বলেছেন।

সুপর্ণ ঃ হ্যাঁ, মেশোমশায়ের খিস্তীর স্টক খুব সমৃদ্ধ ছিলো। ফৌজদারী উকিল ছিলেন তো, একেবারে পালিশ করা মুখ।

নির্মল ঃ তুই থামতো। ও অশেষদা, উনি আর কি বলেছেন গো?

অশেষ ঃ (কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে) মহাত্মা আমাকে বললেন, আমি নাকি নপুংসক! (বাকি দু'জন জোরে হেসে ওঠে)
আমি প্রতিবাদ করে বললাম, বাবা এ সমস্ত আপত্তিকর কথা বলবেন না। দু'জনে খুব ঝগড়া হলো।

সুপর্ণ ঃ কই আমরা তো কিছু শুনতে পাইনি—

নির্মল ঃ শুনলে তুই কি করতিস, ঝগড়া থামাতে যেতিস—

সুপর্ণ ঃ অশেষদাকে সাপোর্ট করতাম। প্রতিবাদ করে বলতাম, অশেষদা নপুংসক হলে আমরাও তাই কারণ আমরাও বিয়ে করিনি।

নির্মল ঃ ছাড়তো তুই (অশেষকে) হ্যাঁ গো, তারপর কি হলো?

অশেষ ঃ হঠাৎ দেখি মহাত্মা উধাও। অল্প কিছুক্ষণ পরে একেবারে মা-কে নিয়ে হাজির। ওহো-হো, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে মাকে ।

সুপর্ণ ঃ (অশেষকে নকল করে) বুঝলাম। তোমার বাবা-ও তো ঐ একই জায়গায় রয়েছেন, কিন্তু ওনার মুখ তো দূষণ মুক্ত হলো না।

অশেষ ঃ হ্যাঁ রে, তুই কি আমার কথার মাঝে মাঝে এইভাবে বাধা দিয়ে যাবি? শেষ করতে দিবি না?

সুপর্ণ ঃ মাসিমা কেন তোমাকে দর্শন দিলেন? এর আগে তো উনি কখনো আসেন নি।

অশেষ ঃ এই কথাটি আমি মাকে নিবেদন করে বললাম, মাগো, সেই কবে তুমি গত

হয়েছো কিন্তু আজ হঠাৎ এই ছেলেকে মনে পড়লো?

নির্মল ঃ উত্তরে মাসিমা কি বললেন?

অশেষ ঃ মা বললেন, তোমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না খোকা, কারণ ছেলে হিসেবে তুমি কোনো কর্তব্যই পালন করোনি। আমি কাতর গলায় বললাম মাগো, একি অন্যায় অভিযোগ করছো! মা বললেন, এই যে তোমার বাবাকে রেখে আমি চলে এসেছিলাম তারপর থেকে ওনার ঠিকমত দেখ-ভাল তুমি করেছো—

সুপর্ণ ঃ ঠিক- এই বুড়ো বয়সেও মেশোমশাইকে তোমার খেয়াল রাখতে হতো।

নির্মল ঃ আর তুমি বগল বাজিয়ে, গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছো।

অশেষ ঃ ওরে যা করেছি তোদের নিয়েই করেছি। আর বাবা কি আমাকে কোনো কিছু করতে দিতো। এরকম বিস্ফোরক বাবা ক'জনের হয়?

সুপর্ণ ঃ এই সব কথা বলে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। মাসিমা-র তো দুঃখ হতেই পারে। একমাত্র Husbandকে তোমার জিম্মায় রেখে গেল তুমি তার খেয়াল রাখো নি—

অশেষ ঃ তুই থাম তো। মা ঐসব সাধারণ দেখাশোনার কথা বলেন নি। উনি এমন একটা গুগলি ডেলিভারী দিলেন না যে আমি একেবারে Puzzled হয়ে গেলাম।

নির্মল ঃ মেশোমশাই তখন কি করলেন?

অশেষ ঃ মাকে এগিয়ে দিয়ে বাবা একেবারে চুপ।

সুপর্ণ ঃ ঝানু উকিলতো দেখলেন জুনিয়র ভাল plead করছে নিজের বলার দরকার কী।

নির্মল ঃ তা হ্যাঁ গো, মাসিমা কি গুগলি দিলেন?

অশেষ ঃ মা বললেন, তোমার বাবা বেঁচেছিলেন বলেই ঘটা করে আমার দান সাগর শ্রাদ্ধ হয়েছিলো। আর তুমি তোমার বাবার কাজটা নমো নমো করে সেরে দিলে। ভদ্রলোকের সে কি আক্ষেপ। আমাকে বলেছিলেন দেখো 'রাজেশ্বরী' কি ছেলে রেখে এলাম। বিয়ে-থা করলো না, সন্তান উৎপাদন করলো না, তর্পণ পর্যন্ত করে না, এর কি হবে। আমি বললাম, মাগো খুব ভুল হয়ে গেছে—

সুপর্ণ ঃ এসব শুকনো ভুল স্বীকার করে কি লাভ। মাসিমা তোমার Apology Accept করলেন -

নির্মল ঃ ছেলের উপর মা-বাবা কি রাগ করে থাকতে পারে।

অশেষ ঃ না রে খুব রেগে আছেন। মায়ের কথার খেই ধরে বাবা বললেন- গয়া বলে একটা জায়গা আছে পারলে সেখানে গিয়ে আমাদের পিন্ড দান করে এসো সংগে নিজের পিন্ডি-ও চটকে দিও, কারণ তুমি তো আঁটকুড়ো।

নির্মল ঃ কি সাংঘাতিক কথা মাইরি-

সুপর্ণ ঃ আমাদেরও তো একই অবস্থা। চলো গো, বিশ্বাস করি আর নাই করি কাজটা সেরে আসি।

নির্মল ঃ অশেষদা, তুমি গুল মারছো না তো?

অশেষ ঃ বাব, মা-কে নিয়ে কেউ মিথ্যে কথা বলে। তোদের মতন তরল চরিত্রের লোক আমি।

(ইতিমধ্যেই একজন মহিলা উঠোনে ঢুকে পড়েছেন। তার এক কাঁধে কিটস্ ব্যাগ অপর কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। ফিটফাট সাজ, দেখতে সুন্দরী— নাম প্রমীলা)

সুপর্ণ ঃ এই যে কে আপনি! কাকে চান?

মহিলা ঃ আচ্ছা এটা তো ব্রজধাম তাই না-

নির্মল ঃ বাইরে বাড়ীর গায়ে আপনি ফলক দেখেন নি? বেশ বড় করে লেখা আছে।

মহিলা ঃ দেখেছি, বেশ বড় করেই লেখা আছে, শ্বেত পাথরের ফলক।

সুপর্ণ ঃ তবে জিজ্ঞেস করলেন কেন?

মহিলা ঃ কিছু একটা বলে তো আলাপ শুরু করতে হবে।

নির্মল ঃ আপনার নামটা কি?

মহিলা ঃ আমার নাম প্রমীলা, প্রমীলা রায়। আচ্ছা এই বাড়ীর কর্তা আছেন— ?

সুপর্ণ ঃ (প্রত্যেককে দেখিয়ে) কর্ত্তা, কর্ম, ক্রিয়া তিনজনেই উপস্থিত আছেন।

প্রমীলা ঃ নমস্কার। (অশেষকে) আপনার নামটা জানতে পারি-

অশেষ ঃ আমি অশেষ, অশেষ চ্যাটার্জী।

প্রমীলা ঃ আপনার বাবা বড় উকিল ছিলেন তাই না-

সুপর্ণ ঃ Yes, খুব-খুব- নামকরা উকিল । এই তো কাল রাতে এসেছিলেন।

প্রমীলা ঃ এসেছিলেন।

নির্মল ঃ আবার চলেও গেছেন, জোড়ে এসেছিলেন তো-

প্রমীলা ঃ কোথায় গেছেন? ওনারা থাকেন কোথায়?

সুপর্ণ ঃ পরলোকে।

প্রমীলা ঃ তার মানে ওনারা ভূত! এটা কি ভূতের বাড়ী?

অশেষ ঃ দেখুন, আপনি এদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না তো। বাবা, মা আমাকে মাঝে মাঝে দর্শন দেন, সেটা স্বপ্নও হতে পারে সত্যিও হতে পারে। Infact এটা আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি ....

প্রমীলা ঃ আমার না খুব ভূতের ভয়।

সুপর্ণ ঃ (গলে যাওয়া ভঙ্গীতে) এ মা ভূতের ভয় তো বাচ্চারা পায়।

প্রমীলা ঃ আমি তো বাচ্চাই আছি-

নির্মল ঃ যদি কিছু মনে না করেন আপনার বয়সটা জানতে পারি?

প্রমীলা ঃ ফিফটি টু- বাহান্ন-

সুপর্ণ ঃ (মজা পেয়ে) আরিব্বাস, বাহান্ন বছরেও আপনি ছোটো আছেন!
প্রমীলা ঃ হ্যাঁ মানে আপনাদের তুলনায়- আছি তো । কিন্তু কি জানেন চাটুয্যে মশাই, আমার না রাতে একলা থাকতে খুব ভয় লাগবে।
সুপর্ণ ঃ স্বাভাবিক। বাচ্চা মেয়ে ভয় তো পাবেনই।
নির্মল ঃ আপনি যেখানে থাকেন সেখানে আর কেউ নেই?
অশেষ ঃ আপনার Husband নাইট ডিউটি করে নাকি যে আপনাকে একা থাকতে হয়- (সুপর্ণ ও নির্মল কিছু বলতে যায়, অশেষ ধমকে থামিয়ে দেয়) চোপ, আমি যখন Interact করছি, তোমরা তার মধ্যে কোনো কথা বলবে না। (সুর নরম করে) এই যে, মানে— কি দেবী যেন-
নির্মল ও সুপর্ণ ঃ প্রমীলা- প্রমীলা রায়-
অশেষ ঃ আবার তোরা কথা বলছিস! শুনুন মিসেস রয় ....
প্রমীলা ঃ (বাধা দিয়ে) আমি মিসেস্ নই আমি মিস্ -
সুপর্ণ ঃ এই সেরেছে, ও অশেষদা এ যে আমাদের মতো আঁটকুড়ো গো থুড়ি আঁটকুড়ি-
নির্মল ঃ কি অসভ্যতা হচ্ছে সুপর্ণ-
প্রমীলা ঃ সত্যি, আপনি খুব অসভ্য কথা বলছেন।
অশেষ ঃ আমি আপনার কাছে কি বলে ক্ষমা চাইব বুঝতে পারছি না। এই ছেলে দুটোকে নিয়ে আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকি কখন কি গোলমাল বাধিয়ে বসবে।
প্রমীলা ঃ ছেলে বলবেন না, এরা তো পাকা লোক হয়ে গেছে।
সুপর্ণ ঃ শুনুন মিস্ রায় আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। কাল মেশোমশাই দেখা দিয়ে আমাদের সবাইকে বলে গেছেন আঁটকুড়ো, কারণ আমরাও আপনার মতো বিয়ে করিনি।
প্রমীলা ঃ (ভয়ে) আচ্ছা, আপনার বাবা, মা কি প্রায়ই আসেন?
অশেষ ঃ মা কাল প্রথম এলেন। ইদানীং বাবা একটু বেশী দেখা দিচ্ছেন।
সুপর্ণ ঃ আসল ব্যাপারটা হচ্ছে মিস্ রয় ব্রজেন উকিল মানে মেশোমশাই এই অশেষদার উপরে খুব খেপে রয়েছেন; তাই মাঝে মাঝেই চলে আসছেন। আর আজে- বাজে খিস্তী থুড়ি মন্তব্য করছেন।
(অশেষ চলে যেতে উদ্যত)
নির্মল ঃ ও অশেষদা, তুমি যাচ্ছো কোথায়?
অশেষ ঃ তোরা যা অসভ্যতা করছিস লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।
প্রমীলা ঃ আপনি যাবেন না চাটুয্যে মশাই। লজ্জা পাবার কি আছে? আমাকে আপনাদের একজন বলে ভাবুন না।
সুপর্ণ ঃ বললেই তো আপনাকে আমাদের একজন বলে ভাবতে পারি না।
অশেষ ঃ থাক ওসব কথা। আচ্ছা মিস্ আপনি কি জন্য এই ব্রজধামে পদার্পণ করলেন

তা তো জানতে পারলাম না-

প্রমীলা ঃ আমি তো এখানে থাকতে এলাম।

সকলে ঃ থাকতে এলেন মানে!

অশেষ ঃ কে আপনাকে পাঠিয়েছে?

প্রমীলা ঃ আমি নিজেই খোঁজ খবর করে চলে এলাম।

নির্মল ঃ চলে এলেন। একবারও ভাবলেন না তিনজন unmarried man মানে ব্যাচেলার এখানে থাকেন....

সুপর্ণ ঃ নিজের নিরাপত্তা নিয়ে একটু ভাবলেন না-

প্রমীলা ঃ বারে, আপনাদের মতো চরিত্রবান পুরুষদের ভয় পাবার কি আছে।

নির্মল ঃ (খুশী) এটা আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা হচ্ছি স্বচ্ছ চরিত্র ....

সুপর্ণ ঃ নির্ভেজাল ব্রহ্মচারী। এই ব্রজধাম হচ্ছে আমাদের লীলাক্ষেত্র আর এই কলিযুগের ভীষ্ম অশেষদা হচ্ছেন আমাদের গুরুদেব (দু'জনে প্রণাম করে)

অশেষ ঃ (ভাবগম্ভীর) কল্যাণ হোক।। ব্রহ্মচর্য্য পথে তোমাদের মতি অবিচল থাকুক।

প্রমীলা ঃ (হাত জোড় করে) গুরুদেব, আমার ঘরটা দেখিয়ে দেবেন-

অশেষ ঃ আপনাকে তো আমি দীক্ষা দান করিনি অতএব ঐ গুরুদেব, ফুরুদেব আমাকে বলবেন না।

সুপর্ণ ঃ তোমাকে বলছে থাকবার ঘর দেখিয়ে দিতে—

নির্মল ঃ কি সাংঘাতিক কথা ব্রজধামের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে ......

প্রমীলা ঃ থামুন, থামুন তো। শুনুন চাটুয্যে মশাই যে ঘরটা আমাকে দেবেন সেখানে যেন কানেক্টিং ডোর থাকে যাতে ভয় পেলে আমি ফুড়ুৎ করে আপনার ঘরে চলে যেতে পারি।

অশেষ ঃ কি ভয়ংকর কথা রে! বাবা দেখতে পেলে আমার ঘাড় মটকে দেবে ....

নির্মল ঃ শুনুন প্রমীলা দেবী, এখানে থাকা আপনার চলবে না।

প্রমীলা ঃ আমি এখানে থাকবই- থাকব-

সুপর্ণ ঃ আপনি কথাটা এত জোর দিয়ে বলছেন কি করে;

প্রমীলা ঃ তবে আমি যাব কোথায়?

নির্মল ঃ সেটা আপনার সমস্যা, আমাদের নয়।

সুপর্ণ ঃ কেন, এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন? সেখানে চলে যান।

নির্মল ঃ সেখানে তো নিশ্চয়ই আপনার নিজের লোক আছে। সেখানে যান, তাদের সাথে মানিয়ে গুছিয়ে থাকুন।

প্রমীলা ঃ আমার নিজের লোক বলে কেউ নেই আর যেখানে ছিলাম সেই জায়গাটা ভাল নয়। তাই স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে এখানে চলে এলাম।

নির্মল ঃ দুম করে স্বেচ্ছা অবসর নিতে গেলেন কেন!

সুপর্ণ ঃ তাছাড়া এই ব্রজধামের খবর আপনাকে কে দিলো?

প্রমীলা ঃ গোলাপ যদি জঙ্গলেও ফোটে তার সুগন্ধ ঠিক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অশেষ ঃ অহো- কি চমৎকার উপমা দেখ-

নির্মল ঃ সত্যি-কথাটা কিন্তু বেশ গুছিয়ে বলেছেন।

সুপর্ণ ঃ এই রকম কথা আমি আগে কতবার বলেছি তোমরা কখনো কানে তোলোনি। আর একজন মেয়েছেলে যেই বলল-

প্রমীলা ঃ (বিরক্ত) ঐ শব্দটা ব্যবহার করবেন না। অন্তত মহিলা বলুন।

অশেষ ঃ এইসব তুচ্ছ কথায় মন ভারী করবেন না। যে মুক্তো আপনি ছড়িয়েছেন সেটা আমাদের আহরণ করতে দিন। ওহে সুপর্ণ, নির্মল আমাদের ব্রজধামকে উনি সুরভিত গোলাপের সাথে তুলনা করেছেন- ও - হো -হো আমি শ্লাঘা বোধ করছি। খুলে দাও, দুয়ার খুলে দাও। এই সাক্ষাৎ কালীদাসীকে অন্দরে প্রবেশ করতে দাও।

প্রমীলা ঃ এমা ! কালীদাসী নয়, আমার নাম প্রমীলা।

অশেষ ঃ প্রমীলা- অবশ্যই প্রমীলা। সেইজন্যই কালীদাসের স্ত্রীলিংগ হচ্ছে কালীদাসী উপমা কালীদাসস্য। ওরে তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ওনাকে ভেতরে নিয়ে যা, আমার পাশের ঘরটা দিয়ে দে, কানেক্টিং ডোর আছে।

সুপর্ণ ঃ (চাপা গলায় অশেষকে) মামার বাড়ী পেয়েছো, এতদিন ব্রহ্মচারী থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রমীলা শামুকে পা কাটবে।

অশেষ ঃ (আঁতকে) ওরে তুই কি অসভ্য কথা বলছিস-

প্রমীলা ঃ আপনাকে খারাপ কথা বলছে বুঝি? এই ভদ্রলোকের মুখ একদম ভালো নয়।

সুপর্ণ ঃ এই যে দেবী, আপনি এবার আসুন-

প্রমীলা ঃ (খুশী হয়ে) হ্যাঁ তাই চলুন-

সুপর্ণ ঃ আরে বাবা আসুন- well come নয় এটা হচ্ছে আসুন please go out-

অশেষ ঃ শোন শোন মাথা গরম করিস না। আমাকে ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় সামলাতে দে। শুনুন ম্যাডাম, এই নির্মল আর সুপর্ণ হচ্ছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু এরা আমার ছোট ভায়ের মতো-

নির্মল ঃ মতো নয়, সত্যিই ছোট ভাই।

সুপর্ণ ঃ হ্যাঁ মায়ের পেটের ভায়ের মতো।

অশেষ ঃ ঠিক আছে , ঠিক আছে, মায়ের পেটের ভাই তাই হলো। এখন জানেন ম্যাডাম এই বাড়ীটি "ব্রজধাম" আমার বাবা নির্মাণ করেছিলেন শহরের কোলাহল ছেড়ে একান্তে কিছুটা সময় কাটাবার জন্যে-

প্রমীলা ঃ ওমা, কি ভাল Idea, আমাদের কত সুবিধা করে দিয়ে গেছেন।

নির্মল ঃ (রেগে) এই মশাই, আপনি এর মধ্যে আসছেন কি করে?

সুপর্ণ ঃ আমাদের মাঝে আপনি নিজের নাক গলিয়ে দেবেন না, সাবধান করে দিচ্ছি।

প্রমীলা ঃ (আহত) দেখছেন চাটুয্যে মশাই, কিভাবে এরা আমাকে বকছে—

অশেষ ঃ ওদের হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি (বন্ধুদের কাছ থেকে জোরালো প্রতিবাদ আসে) ওরে থাম রে ভাই থাম। এরকম অসহিষ্ণু আচরণ করলে চলে। আমি যেন কোথায় থেমেছিলাম ম্যাডাম।

সুপর্ণ ঃ ব্রজধামে আটকে রয়েছে।

অশেষ ঃ এই ব্রজধাম, জানেন ম্যাডাম এই ব্রজধাম শুধু একটা ইট- কাঠের বাড়ী নয়। এটি হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান, যার সাথে জড়িয়ে আছে- জড়িয়ে আছে (থেমে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে) কি জড়িয়ে আছে রে?

প্রমীলা ঃ আপনারা ওকে একটু Help করুন Please .

সুপর্ণ ঃ বলো আবেগ জড়িয়ে আছে।

অশেষ ঃ Yes, চমৎকার! চমৎকার বললি ভাই 'আবেগ', (প্রমীলাকে) কথাটাও ভাল বলেনি ম্যাডাম?

প্রমীলা ঃ (হেসে) খুব ভাল বলেছে, 'আবেগ'—

অশেষ ঃ এই বেগটা হচ্ছে আসল। জানেন ম্যাডাম এটা ঠিক থাকলে-

সুপর্ণ ঃ কথাটা অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে, ছোট করো-

অশেষ ঃ এই তো ভাই একেবারে ছোট করে দিচ্ছি। জানেন মিস্ রয় .....

প্রমীলা ঃ আমাকে প্রমীলা বলুন না—

নির্মল ঃ সময় মতো বলবে এখন ওকে শেষ করতে দিন।

সুপর্ণ ঃ নাও শুরু করো-

অশেষ ঃ আমাদের তিন জনের মধ্যে না একটা আবেগের সম্পর্ক একেবারে কংক্রীটের মতো জমাট বেঁধে আছে। আমার বাবা এটা খুব Appreciate করতেন। যদিও তিনি মনে করতেন এবং এখনও করেন যে এদের জন্যেই আমি সংসারী হতে পারিনি।

নির্মল ঃ আপনি বলুন তো ম্যাডাম নিজের ছেলে বিয়ে করলো না এর জন্য আমাদের দোষটা কোথায়।

প্রমীলা ঃ (নির্মলকে) আপনি বিয়ে করেছেন?

সুপর্ণ ঃ আমরা তিনজনেই বিয়ে করিনি।

প্রমীলা ঃ খুব ভাল করেছেন, এবার থেকে আমরা চারজনে মিলে মিশে ....

অশেষ ঃ (বিগলিত) সাধু, সাধু, উত্তম প্রস্তাব। চারে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

সুপর্ণ ঃ (আঁতকে উঠে নির্মলের কাছে গিলে বলে) সর্বনাশ, এই ভদ্রমহিলা কলির দ্রৌপদী হতে চাইছে রে!

(এদের কথার ফাঁকে প্রমীলা অন্দরের দিকে হাঁটা দেয় নির্মল দেখতে পেয়ে)

নির্মল ঃ (বাধা দিয়ে) একি, আপনি ভেতরে যাচ্ছেন কেন?

প্রমীলা ঃ থাকব বলে যাচ্ছি। আর আমি নিজেই দেখে নেবো কোন ঘরটা আমার পছন্দ।

সুপর্ণ ঃ আপনাকে বারণ করা হচ্ছে আপনি যাবেন না।

প্রমীলা ঃ (ঘাড় ঘুরিয়ে) আমি যাচ্ছি। বাধা দেবার চেষ্টা করলে চেঁচামেচি করবো। (প্রস্থান) (অশেষ গদগদভাবে প্রমীলার গমন পথের দিকে চেয়ে আছে।)

নির্মল ঃ কি গো, তুমি তো কোনো কথাই বললে না।

সুপর্ণ ঃ কাকে বলছিস। দেখছিস না কিরকম গদগদ হয়ে আছে-

অশেষ ঃ একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তোরা এত চেঁচামেচি করছিস কেন বলতো। একজন অতিথি এসেছেন। দু'চারদিন থাকবেন, চলে যাবেন।ওরে বাবা, এই ব্রজধামে ঘরের সংখ্যা তো কম নেই।

নির্মল ঃ (সায় দিয়ে) ঠিক, থাকুক না। বুঝলে অশেষদা, আমি একবার গিয়ে দেখে আসি ওনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। হাজার হোক অতিথি ......

অশেষ ঃ যা ভাই যা, Make her feel at home. (নির্মলের প্রস্থান । সুপর্ণকে-) কি রে, মনে হচ্ছে তুই একটা অনমনীয়ভাব নিয়ে চলতে চাইছিস-

সুপর্ণ ঃ ছ্যা-ছ্যা, এটা কি হচ্ছে বলতো? আমাদের একটা ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলো একটা বাইরের মেয়ে।

অশেষ ঃ ওরে ভাই নিয়ম কঠিন হলে জীবনের নমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। চিন্তা কর দেখিনি আমার মাতৃদেবী গত হবার বহুদিন পরে এই ব্রজধাম নির্মিত হয়। বাবা আসতেন, আমরা আসতাম। কিন্তু বল,আজ এই প্রথম একজন কমপ্লিট মহিলা পা রাখলেন অন্দর মহলে।

সুপর্ণ ঃ (রেগে) বাজে কথা বলো না তো। প্রতিদিন আমাদের কাজের মাসী আসেন না? এই তো আজ সকালেও কাজ করে গেলেন।

অশেষ ঃ সুপর্ণ ওরে তিনি হচ্ছেন পরিযায়ী পাখী, মাইগ্রেটারী বার্ড। রোজ এসে ঠুং-ঠাং, থুপ-থাপ, তারপরেই ধুপ-ধাপ করে চলে যান।

সুপর্ণ ঃ আমি অবাক হচ্ছি তোমার মত একটা মানুষ কি করে এত সহজে বদলে গেল।

অশেষ ঃ সুপর্ণ, বৈচিত্র্যই হচ্ছে জীবনের মশলা। রগড় দেখ না, ঐ ভদ্রমহিলা ভাবছেন আমাদের সংগে থাকাটা খুব মজার-

সুপর্ণ ঃ আচ্ছা অশেষদা, এটা তোমার মনে হচ্ছে না, যে কোথা থেকে হঠাৎ করে কেন এই প্রমীলা দেবী ব্রজধামে উপস্থিত হলেন।

অশেষ ঃ আমার তো ভাই নিরেট মস্তিস্ক নয়, তোমার সন্দেহ হচ্ছে আর আমার হচ্ছে না এটা তুমি ভাবলে কি করে। ব্রজেন উকিলের ছেলে অশেষ উকিল।

সুপর্ণ ঃ (চাপা গলায়) হ্যাঁ গো, কোনো চক্রান্ত নয় তো?

অশেষ ঃ হতে পারে—

সুপর্ণ ঃ আমাদের বদনাম করার জন্য একটা অপচেষ্টা নয় তো—

অশেষ ঃ (নির্বিকারভাবে) হতে পারে—

সুপর্ণ ঃ তুমি এরকম নির্লিপ্তভাবে কথা বলে যাচ্ছ কেন বলতো—

অশেষ ঃ মনের দরজা খোলা রাখতে হয়, তাহলে দেখবে তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রমাদের অবকাশ কম থাকবে। যা ভেতরে গিয়ে দেখ, নির্মলটা ঠিকমত সামলাতে পারছে কিনা।

সুপর্ণ ঃ আমি পারবো না তুমি যাও।

অশেষ ঃ এই দেখ আবার রাগ করে। হ্যাঁ রে ঘরে মাছ-টাছ সব আছে তো? একজন বাইরের লোক খাবেন, নইলে আবার বাজার যেতে হবে।

সুপর্ণ ঃ কালকেই তো বাজার করলাম। ফ্রীজভর্তি মাছ, মাংস, ডিম রয়েছে। ঝুড়ি ভর্তি আনাজ রয়েছে। এর উপরে যদি কিছু লাগে তুমি নিজে গিয়ে বাজার করে নিয়ে এসো।

অশেষ ঃ এত কিছু রয়েছে যখন তখন আবার বাজারের কি দরকার। চল, আমি আজ তোদের সাথে রান্নার কাজে হাত লাগাবো—
(উৎফুল্লভাবে নির্মলের প্রবেশ)

নির্মল ঃ কাউকে কিচ্ছু করতে হবে না গো, ও নিজেই সব কিছু দেখে নিচ্ছেন।

অশেষ ঃ না, না, একি কথা। আমাদের সংসারে বাইরের লোক হাত লাগাবে কেন—

নির্মল ঃ ও কি কোনো কথা শুনবে। আমি তো বারণ করেছিলাম।

সুপর্ণ ঃ (নির্মলকে) এই তুই তখন থেকে ও-ও- করছিস কেন রে?

নির্মল ঃ তবে কি বলবো?

সুপর্ণ ঃ কেন ? উনি, মিস রয় এসব বলতে পারছিস না।

অশেষ ঃ সুপর্ণ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে মস্তিস্ককে চাপের মধ্যে রেখো না।

সুপর্ণ ঃ আমি বাপু আদিখ্যেতা পছন্দ করি না।

(প্রমীলার প্রবেশ। তার সাজের বদল হয়েছে)

প্রমীলা ঃ ওমা! আপনারা এখনও বাইরে বসে আড্ডা দিচ্ছেন—

অশেষ ঃ আড্ডা নয় ম্যাডাম,আমরা যখনই সময় পাই আধ্যাত্মিক আলোচনায় নিজেদের ঋদ্ধ করি।

প্রমীলা ঃ চমৎকার! এবার থেকে এই ধরনের আলোচনায় আমাকে ডেকে নেবেন।

সুপর্ণ ঃ আপনি মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন।

প্রমীলা ঃ ওমা, চলে যাবো কেন!

অশেষ ঃ এসব কি তিক্ত কথা বাদ দিয়ে এখন বলুন আমাদের এই ব্রজধাম কি রকম লাগছে।

প্রমীলা ঃ চমৎকার! বাড়ীটা যেমন সুন্দর আর পিছনের বাগানটা যেন আরও বেশী সুন্দর। কত রকমের গাছ —

নির্মল ঃ অনেকটা আশ্রমের মত তাই না-

প্রমীলা ঃ এত ভাল বৃদ্ধাশ্রম এর আগে আমার নজরে পড়ে নি।

সুপর্ণ ঃ এই যে দিদিমণি, কে আপনাকে বললো এটা বৃদ্ধাশ্রম!

নির্মল ঃ (হতাশ) আমাদের দেখে আপনার বুড়ো বলে মনে হচ্ছে?

অশেষ ঃ দেখুন মিস্ রয়, আমরা নিশ্চয়ই প্রবীণ তবে বৃদ্ধ নই। I am fifty six , নির্মল তিপান্ন আর সুপর্ণ ....

সুপর্ণ ঃ আমি সবে একান্নয় পা দিয়েছি। আচ্ছা আপনি নিজেকে খুব খুকি ভাবছেন না কি-

প্রমীলা ঃ খুকী নই বলেই আপনাদের দলে ভিড়তে চাইছি।

অশেষ ঃ মিছে তর্ক-বিতর্ক করছিস ভাই। যেটুকু সময় আমরা একসাথে আছি ....

নির্মল ঃ একটু হাসি, খুশী, আনন্দ ....

সুপর্ণ ঃ হাসি-মস্করা করতে হবে তাই তো। তোমরা তাই করো, আমি গিয়ে রান্না ঘরে ঢুকি।

প্রমীলা ঃ সে কাজটা আমিই করবো। সব গুছিয়ে রেখে এসেছি। আপনারা স্নান করে পূজো পাঠ সারুন-

[প্রমীলার প্রস্থান]

সুপর্ণ ঃ কি রকম অ্যাডামেন্ট মহিলা দেখেছো, আমাদের কোন পাত্তাই দিচ্ছে না।

অশেষ ঃ তুমি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করবে না সুপর্ণ। একটা অচেনা -অজানা মহিলা এই অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে কিরকম এই ব্রজধামে মানিয়ে নিয়েছে দেখো। এই যে ওর ভেতরে একটা (হাত নাড়তে থাকে) স্বত:স্ফূর্ততা -

নির্মল ঃ সত্যিই মিলার মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক পাওয়ার আছে।

অশেষ ঃ মিলা-টা কে রে?

নির্মল ঃ আরে মিলা মানে প্রমীলা।

সুপর্ণ ঃ কলা, প্রমীলা থেকে মিলা, কেস হলো বিলা—

কালক্ষেপ— পরের দৃশ্য

[বাগান। রাত্রি। প্রমীলা আবিষ্ট হয়ে গান গাইছে। (চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে) গানের মাঝে চাদরে নিজেকে ঢেকে নির্মল প্রবেশ করে। গান শেষ হয়]

নির্মল ঃ (মোহিত) বাঃ বাঃ, কি সুন্দর গলা আপনার।

প্রমীলা ঃ (চমকে) কে? কে ওখানে?

নির্মল ঃ আমি নির্মল। দোহাই আপনার চেঁচাবেন না। সবাই জেগে উঠবে।

প্রমীলা ঃ মাগো, আমি কি ভয় পেয়েছিলাম। এত রাতে আপনি এখানে ঘুরঘুর করছেন কেন বলুন তো?

নির্মল ঃ আপনার গান আমাকে টেনে নিয়ে এলো।
আপনার গান ম্যাগনেট আর আমি যেন একটা প্যারেক।

প্রমীলা ঃ আপনি বেশী বাড়াবাড়ি করছেন। এমন কিছু আহামরি গানের গলা নয় আমার।

নির্মল ঃ জানেন না কি অসাধারণ গুণের অধিকারিণী আপনি।

প্রমীলা ঃ ঠিক আছে, আপনি এখন যান কেউ দেখে ফেললে যা- তা ভাববে।

নির্মল ঃ ভাবুক। ভাবতে দিন। এবার আর আসবে না। এ চাঁদ আর আসবে না। মিলা, চাঁদ নিয়ে আর একটা গান গাও। ঐ যে - সেই গানটা ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে ......

প্রমীলা ঃ দুর, আপনি বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। আমি যাই— [প্রস্থান]

নির্মল ঃ মিলা— যাবেন না শুনুন- [প্রস্থান]

(মঞ্চে প্রশে করেন ব্রজেন উকিলের প্রয়াত স্ত্রী 'রাজেশ্বরী'। চওড়া লাল পাড় শাড়ী। নাকে নথ। কপালে বড় টিপ)

রাজেশ্বরী ঃ হায়- হায়, ব্রজধামকে একেবারে বৃন্দাবন বানিয়ে দিল। আমার বাড়ী, আমার বাগান আর আমারই ছেলে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আর ফায়দা লুটছে অন্য লোকের ছেলে! কর্তা ঠিকই বলে, 'রাজেশ্বরী' তোমার ছেলে আর কোনোদিন মানুষ হবেনা (তারপর চিৎকার করে ডেকে ওঠেন) পটা এই পটা, আয়-একবার বাগানে শুনে যা। এখন বুঝতে পারছি এই কাঁছা খোলা ছেলেকে নিয়ে কত্তা কত ভুগেছেন, আর আমি খামোকা ওনাকে ভুল বুঝেছি, রাগ করেছি। কি ছেলে! খালি খাওয়া, ঘুম আর আড্ডা। মক্কেল, আদালত সব লাটে তুলে দিয়েছে। এই তো গতকালও ওকে বুঝিয়ে গেলাম কিন্তু কোনো ফল হয়নি। পটা এই পটা — আর মরার মতো কতো ঘুমোবি। ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না—

(ঘুম ভরা চোখে অশেষ ওরফে পটা-র প্রবেশ পরণে লুঙ্গি ও ফতুয়া।)

অশেষ ঃ কে- কার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। মনে হলো যেন মা আমাকে ডাকছে। মা-মাগো , কোথায় তুমি—

রাজেশ্বরী ঃ এই যে বাছা আমি এখানে।

অশেষ ঃ আজও তুমি কষ্ট করে এলে মা। কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি?

রাজেশ্বরী ঃ তুমিই তো একটা মূর্তিমান সমস্যা বাবা। নতুন আর কি ঘটবে?

অশেষ ঃ কেন আমি কি করেছি!

রাজেশ্বরী ঃ সেটা বোঝার ক্ষমতা তোমার থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে না যে তুমি কি করেছো। হ্যাঁ রে পটা, তুই কি কোনোদিন মানুষ হবি না? চিরকাল গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটাবি।

অশেষ ঃ (অভিমানে) বাবা আসেন নি?

রাজেশ্বরী ঃ না, ওনার মন - মেজাজ ভাল নেই। বসে বসে কপাল চাপড়াচ্ছেন।

অশেষ ঃ তাই বাবার হয়ে বকা-ঝকার কাজটা তুমি করতে এলে তাই না মা। আমি কি এমন করেছি, যার জন্যে তোমাকে রাত-বিরেতে ছুটে আসতে হলো।

রাজেশ্বরী ঃ শোন পটা, তোর বাবা একবার এসেছিলেন, সব দেখে গেছে। তারপর থেকেই তার শরীর খারাপ। বুক ধড়ফড় করছে।

অশেষ ঃ মাগো, ভৌতিক অবস্থাতেও হার্ট এ্যাটাক হতে পারে নাকি! ওখানে ডাক্তার, বদ্যি আছে তো—

রাজেশ্বরী ঃ বেঁচে থাকতে আমাদের জন্য চিন্তা করোনি তুমি, এখন এসব নিয়ে ভেবে কি লাভ। যদি কোনো ক্রাইসিস আসে আমাকেই সামলাতে হবে। আমার Husbandতো।

অশেষ ঃ বারে আমারও তো বাবা। আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

রাজেশ্বরী ঃ থাক, থাক। এসব কথা বলে আর আমার মাথা গরম করে দিও না। একটা কথা শুনে রাখো পটা, তোমার এই ছন্নছাড়া জীবন যাত্রার জন্যেই কখনো আমি আসিনি। কিন্তু তোমার বাবার তো ছেলে, ছেলে করে আদিখ্যেতা। ছুতোয়, নাতায়, হুট-হাট তোমার কাছে চলে আসতেন আমার বারণ শুনতেন না।

অশেষ ঃ খুব বকাবকি করেন, খারাপ, খারাপ কথা বলেন।

রাজেশ্বরী ঃ বেশ করেন। এই রকম মস্তিস্কহীন ছেলেকে ঠ্যাঙান উচিত। হ্যাঁরে, আপন বুঝতো পাগলেও বোঝে। তোর সেই জ্ঞানটুকুও নেই।

অশেষ ঃ ওরে বাবা খুলে বলোনা কি করেছি আমি।

রাজেশ্বরী ঃ ঐ যে মেয়েটা এসেছে—

অশেষ ঃ প্রমীলা, প্রমীলা রায়-

রাজেশ্বরী ঃ ঐ প্রমীলা হচ্ছে তোর বাবার বন্ধু বেনারসের হরেন ঠাকুরপো-র মেয়ে।

অশেষ ঃ তা আমি কি করে জানবো-

রাজেশ্বরী ঃ না জেনে-শুনে একটা মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দিলি কেন?

অশেষ ঃ বারে ঢুকে গেলো তো-

রাজেশ্বরী ঃ ঢুকে গেলো তো, এইরকম ন্যাকা, ন্যাকা কথা বলবি না পটা। একটু Matured-হ—

অশেষ ঃ ঠিক আছে না আর বকা-ঝকা করোনা, এক্ষুণি ঐ মহিলাকে মানে প্রমীলাকে ঘুম থেকে তুলে সব Information নিয়ে নিচ্ছি।

রাজেশ্বরী ঃ কাকে ঘুম থেকে তুলবি। তিনি তো এতক্ষণ এখানে বসে চাঁদের হাসির বাঁধ ভাঙ্গছিলেন আর ওর সাথে সঙ্গত করছিলো তোর বন্ধু নির্মল।

অশেষ ঃ বা: ! এতো দারুণ ব্যাপার। আমাকে ডাকলো না কেন, আমিও গান গাইতাম।

রাজেশ্বরী ঃ এটা কি ছাগল রে! ওর জন্যে পাতা দই অন্য জনে খাবার ধান্দা করছে সে বিষয়ে খেয়াল নেই।

অশেষ ঃ বিশ্বাস করো মা তোমার কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না।

রাজেশ্বরী ঃ এখানে উপস্থিত থাকলে এমন একটা ভারী গাল পাড়তো না যে তোর নিজের বাবার নামটাই ভুলে যেতিস। আরে বাবা, তোকে চার দিতে হলো না, ছিপ ফেলতে হলো না, মাছ নিজেই লাফ মেরে পাড়ে চলে এলো সেটা একটু কষ্ট করে ধরে ঝোলায় পুরবি সে সাধ্যও তোর নেই।

অশেষ ঃ সুপর্ণ বললো ফ্রীজে অনেক মাছ রয়েছে তাহলে কেন মাছ আনতে যাবো—

রাজেশ্বরী ঃ (চেঁচিয়ে) ওগো শুনছো—

অশেষ ঃ (ভয়ে) আবার বাবাকে ডাকছো কেন?

রাজেশ্বরী ঃ তোকে আদর করবার জন্যে ডাকছি। খচ্চর ছেলে।

অশেষ ঃ ছি: মা, তুমি আমার মা, রাজ- রাজেশ্বরী।

রাজেশ্বরী ঃ জানি শোভা পায় না। সেই জন্যেই কত্তাকে ডাকছিলাম।

অশেষ ঃ থাক, থাক। আর ডাকতে হবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি যা বলবে তাই শুনবো।

রাজেশ্বরী ঃ শোন, কত্তার সাধ ছিলো হরেন ঠাকুরপো-র মেয়ের সাথে তোর বে দেন। কিন্তু তুমি এমনই বজ্জাত ছেলে বাপের সেই ইচ্ছেটা মর্যাদা দিলে না। ওরে বংশ রক্ষা বড় ধর্ম রে।

অশেষ ঃ আমি কি করে জানবো এই মেয়েটাই সেই মেয়ে। আর ব্রজেন উকিল তো কোনোদিন পরিস্কার করে কিছু বলতেন না।

রাজেশ্বরী ঃ বা-বা-বা, ছেলের কি উন্নতি হয়েছে, বাপের নাম ধরে ডাকছে!

অশেষ ঃ (কান ধরে) ভুল হয়ে গেছে মা। ঐ সুপর্ণ, নির্মল হালকা চালে ব্রজেন উকিল, ব্রজেন উকিল বলে ডাকে তো তাই আমার মুখ দিয়েও ফস্ করে বেরিয়ে গেল।

রাজেশ্বরী ঃ ঐ বজ্জাত ছেলে দু'টোর সাথে তোর কিসের এত ঢলাঢলি রে? লোকে যে বাজে সন্দেহ করবে।

অশেষ ঃ তুমি ভীষণ রেগে আছো মা। সেই ছেলেবেলার থেকে একসাথে বড় হয়েছি, যাকে বলে নোদের পোদের বন্ধু।

রাজেশ্বরী ঃ ত্যাগ করো, ত্যাগ করো, বদ সংগ ত্যাগ করো। এই জন্যেই কথায় বলে 'বদ সংগে সর্বনাশ, সৎসঙ্গে কাশী বাস।" বাপের কথা যদি শুনতিস তাহলে তোর কাশীতে শ্বশুর ঘর হতো, বজরা করে গঙ্গা বিহার করতে করতে সিদ্ধির শরবতে চুমুক দিতিস—

অশেষ ঃ কাশী এমন কিছু ভাল জায়গা নয় মা, যে, ওখানে থাকার জন্য আমাকে বিয়ে করতে হবে।

রাজেশ্বরী ঃ ওরে এমন মেয়ে লাখে একটা মেলে। চেহারায় চটক আছে, বিদ্যেধরী, গুণবতী ....

অশেষ ঃ সে সময় মতো যখন হয়নি এখন সে নিয়ে আপশোষ করে কি হবে মা জননী।

রাজেশ্বরী ঃ সেই কনে এখন যখন এই ধামে এসে পা রেখেছে তখন ঝুলে পড় পটা, ঝুলে পড়...... জামানত জব্দ হবার আগে আঁটকুড়ো নাম ঘোচা।

অশেষ ঃ মাগো, তুমি এমন ভোকাল টনিক দিচ্ছো না যে আমি উজ্জীবিত হয়ে পড়ছি। আমার এখনই কিছু করে ফেলতে ইচ্ছা করছে।

রাজেশ্বরী ঃ থাক বাছা, থাক। দড়ি ছেঁড়া ছাগলের মতো খাই-খাই না করে ঠান্ডা মাথায়

বাপের ইচ্ছে পূরণ কর।

অশেষ ঃ থাক- থাক মা। এখন বলো দেখি ঐ মহিলা হঠাৎ এখানে উদয় হলেন কেন?

রাজেশ্বরী ঃ তা বলতে পারবো না বাছা, তবে কত্তা মনে করছেন আমাদের ঐ কাশীর সম্পত্তির ব্যাপারে কিছু একটা বলতে এসেছে।

অশেষ ঃ তাই তো, বেনারসে আমাদের তো একটা বড় সম্পত্তি রয়েছে। হরেন কাকা-ই তো দেখাশোনা করতেন।

রাজেশ্বরী ঃ তোর কথা শুনে আমার চাপকাতে ইচ্ছে করছে। কোথায় কোন সম্পত্তি আছে তার কোনো খবর রাখিস। কত্তা দেহ রাখার পর পাঁচ ভূতে সেসব লুটে পুটে খাচ্ছে।

অশেষ ঃ আমি কি করে জানবো কোথায় কি আছে। বাবা কোনোদিন আমাকে কিছু জানিয়েছেন।

রাজেশ্বরী ঃ তুই কোনোদিন জানবার চেষ্টা করেছিস। এখন একটা কথা বলি বাপ, মেয়েটাকে বরণ করে নে। কত্তা শান্তি পাবে আমিও স্বস্তি পাব।

অশেষ ঃ তাহলে আমি যাই মিস্ রয়কে সব কথা বলি—

রাজেশ্বরী ঃ এ কে রে! এখন ঘুম থেকে তুলে মেয়েটাকে সব কথা বলবি। ভোর হতে দে, তারপুর সুযোগ বুঝে নিজের মনের কথাটা বলবি।

অশেষ ঃ মেয়েটা বলেছে মা, সে এখানে থাকতে চায়।

রাজেশ্বরী ঃ তোর সাথে থাকতে চায় বলেছে?

অশেষ ঃ আমার পাশের ঘরে থাকতে চেয়েছে। বলেছে ভয় পেলে আমার ঘরে চলে আসবে। কি মজা..........

রাজেশ্বরী ঃ ও রে বলদ রে তুই আমার কথাটা মন দিয়ে শোন বাছা।

অশেষ ঃ তুমি আবার আমায় গাল দিলে মা—

রাজেশ্বরী ঃ ভুল হয়ে গেছে লক্ষী সোনা। এবার যা, যা বলছি সেগুলো পালন করে মেয়েটাকে এই বাগানে নিয়ে আসবি। ভাল করে সাজবি, বেশ একটা মন ভেজানো গান গাইবি....... আমি যা বললাম সব ঠিকমতো করবি।

অশেষ ঃ তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, একচুলও এদিক ওদিক হবে না।

রাজেশ্বরী ঃ (কপালে হাত ঠেকিয়ে) জয় বাবা ভূতনাথ।

অশেষ ঃ যাঃ বাবা, ভূতের মুখে রামনাম!

কালক্ষেপ, পরের দৃশ্য

(সময় সকাল। নির্মল পায়চারী করছে। প্রমীলার প্রবেশ)

প্রমীলা ঃ আপনি এখানে, আর আমি ওদিকে আপনাকে খুঁজে মরছি।

নির্মল ঃ (মুগ্ধ) সকালটা এত ভাল লাগছে না; তাই ঘুরছি।

প্রমীলা ঃ আগে কোনদিন সকাল দেখেননি—

নির্মল ঃ এত সুন্দর সকাল আগে কোনদিন দেখিনি। জানেন মিলা, এই সকালটাও না আপনার গানের মতো সুন্দর।

প্রমীলা ঃ একদম দুষ্টুমি করবেন না। আমি তো মাষ্টারি করতাম, দুষ্টু ছেলেদের কি করে ঠান্ডা করতে হয় আমি খুব ভাল করে জানি।

নির্মল ঃ আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আসলে ভালো গান শুনলে না আমি নিজেকে ঠিক control করতে পারি না।

(সুপর্ণর প্রবেশ)

সুপর্ণ ঃ ও প্রমীলাদি, আপনি এখানে এসে জমে গেলেন। বাজারের ফর্দটা করে দেবেন বললেন, কি হলো-

প্রমীলা ঃ এই তো আমার হাতেই ফর্দ রয়েছে (ফর্দ দেয়) আমি নির্মলদাকে খুঁজতে এসেছিলাম।

সুপর্ণ ঃ ঠিক আছে, তাহলে বাজারটা সেরে আসি, আপনি ভেতরে যান, অশেষদা আপনাকে খুঁজছে।

প্রমীলা ঃ কি জন্যে খুঁজছে জানেন কি?

সুপর্ণ ঃ কারণটা জানি না কিন্তু খুঁজছে এইটুকু জানি। হয়তো আপনার উপর খুব মায়া পড়ে গেছে।

প্রমীলা ঃ ধ্যাৎ— আপনারা খুব দুষ্টু— [প্রস্থান]

নির্মল ঃ আমারও না কি রকম একটা মায়ার মতো মায়া পড়ে গেছে।

সুপর্ণ ঃ এই ভদ্রমহিলাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম রে। ওর মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ ভাব রয়েছে।

নির্মল ঃ ঠিক বলেছিস অন্তরঙ্গ ভাব।

সুপর্ণ ঃ এমন ভুল আর করো না। আবার বলছি ফাউল হয়ে যাবে। এখন চলো বাজার যাই।

[উভয়ে প্রস্থান উদ্যত] [অশেষের প্রবেশ]

অশেষ ঃ ওরে ভাই দাঁড়া আমিও তোদের সাথে যাবো —

(সুপর্ণ ফিরে আসে)

সুপর্ণ ঃ আমরা সবাই গেলে উনি একা বাড়ীতে থাকবেন নাকি। তুমি গৃহকর্তা, বাড়ী ছেড়ে গেলে চলে।

আমরা এক্ষুণি ফিরে আসব। [প্রস্থান]

অশেষ ঃ কি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। যতবার ঐ মহিলার মুখোমুখি হচ্ছি গলা দিয়ে ভাল করে স্বর পর্যন্ত বেরোচ্ছে না।

(প্রমীলার প্রবেশ)

প্রমীলা ঃ এই যে স্যার, আপনি নাকি আমাকে খুঁজছেন?

অশেষ ঃ না- না আমি আপনাকে খুঁজবো কেন। এই কথাটা কে বললো আপনাকে।

ক

প্রমীলা ঃ কেন সুপর্ণদা।

অশেষ ঃ শুনুন মিস্ রয়, আপনি ওদের কথায় বেশী কান দেবেন না। ফিচলেমি করাটা ওদের স্বভাব।

প্রমীলা ঃ আপনি যখন বলছেন তখন ওদের কথায় কান দেবো না।

অশেষ ঃ Very Good. আমার খুব ভালো লাগছে যে আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন- এই যে আপনার বাবা হরেন কাকা.........

প্রমীলা ঃ বারে আমার বাবার নাম আপনি কি করে জানলনে! আমি তো তাঁর কথা এখনো আপনাদের বলিনি।

অশেষ ঃ বারে মা বলে গেল যে-

প্রমীলা ঃ কার মা !

অশেষ ঃ (বিব্রত) এই রে, এতো মামলা গুবলেট হয়ে গেল। এখন মায়ের কথা একে কি করে বুঝিয়ে বলি।

প্রমীলা ঃ কি হলো - কি ভাবছেন-

অশেষ ঃ কত কথা মনে আসে, সব কি গুছিয়ে বলা যায়। কত কথা যে আমার বাবা ঈশ্বর ব্রজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, আপনার বাবা হরেন্দ্রলাল রায়.....

প্রমীলা ঃ হরেন্দ্র -লাল নয় - কুমার-

অশেষ ঃ Yes, কুমার। কে কি কথা বলেছিলেন, আপনি কি জানেন।

প্রমীলা ঃ বারে আমি কি করে জানবো-

অশেষ ঃ আমি কিন্তু জানি।

প্রমীলা ঃ আমি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছিনা। আপনি কি করে আমার পরিচয় জানতে পারলেন।

অশেষ ঃ জানবেন, জানবেন আপনিও সব জানতে পারবেন প্রমীলা। আমি সব আপনাকে বলবো।

প্রমীলা ঃ সত্যি বলবেন! কখন বলবেন?

অশেষ ঃ বলবো। আজ রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, শুধু দুষ্টু চাঁদটা জেগে থাকবে আকাশে। ঠিক তখন আপনি আসবেন এই বাগানে। আমি বলবো আমার মনের কথা আপনার কানে কানে।

প্রমীলা ঃ ধ্যাৎ-আপনি না খুব অসভ্য—(প্রস্থান)

অশেষ ঃ প্রমীলা আপনি যাবেন না। এখনো আমার কথা শেষ হয়নি। মা- মাগো আমার রাজ রাজেশ্বরী মা মামলা বোধহয় কেঁচিয়ে ফেলেছি গো, এবার বাবা নিশ্চই ঘাড় মটকে দেবে।

[পরের দৃশ্য- নিশীথ রাত্রি। বাগান। রাজেশ্বরীর আবির্ভাব।]

রাজেশ্বরী ঃ পটা- আরে এই পটা। এই হতচ্ছাড়া ছেলেকে নিয়ে আমি কি করবো। মরেও শান্তি পাচ্ছি না। ওদিকে ওর বাবা আমাকে ঠেলে ঠুলে পাঠালো নজর রাখতে

ছেলে ঠিক মতো মেয়েটাকে বাগে আনতে পারছে কিনা। এদিকে আমার ছেলেটারই পাত্তা নেই। ওরে এই পটা - একটু বিছানা ছেড়ে ওঠ বাপ, (চেঁচিয়ে) পটা -এই পটা- এতবার করে ডাকছি কথাটা কানে তুলছিস না, কত্তা কে ডাকবো—

[হন্তদন্ত হয়ে অশেষের প্রবেশ, পোষাক বদলেছে। একেবারে ফিট উকিলের পোষাক। হাতে নথি। এক হাতে চিরুনিতে চুল আঁচড়াচ্ছে—]

অশেষ : মা গো, এতো তাগাদা দিলে চলে, একটু তৈরী হতে সময় দেবে তো—

রাজেশ্বরী : এতোক্ষণ কোন রাজ-কাজ করছিলে যে তৈরী হবার সময় পাওনি।

অশেষ : নির্মল, সুপর্ণ জেগে ছিলো তো—

রাজেশ্বরী : তাই বলে তুই এই মক্কেলের ট্যাঁক কাটার পোষাক চাপিয়ে চলে আসবি। একটা ধুতি, পাঞ্জাবি পরতে পারলি না—

অশেষ : ওসব তো আমার নেই। বাইরে বেরোলে উকিল আর বাড়ীর ভেতরে লুঙ্গি কিম্বা প্যান্ট, ব্যস খাসা আছি।

রাজেশ্বরী : ওগো শুনছ।

অশেষ : (চমকে) আবার বাবাকে ডাকছো কেন। এসে এমন গালমন্দ করবে যে শুভ কাজটাই ভেস্তে যাবে।

রাজেশ্বরী : তোর কপালে শুভ কাজ লেখা নেই রে পটা ....

অশেষ : ফতুয়া পরে আসবো - মা

রাজেশ্বরী : থাক, থাক, অনেক হয়েছে আর তোকে গিরগিটির মতো রূপ বদলাতে হবে না। হ্যাঁ রে, হাতে আবার নথি রেখেছিস কেন ? কোন মামলা লড়বি তুই-ওগো শুনছো—

অশেষ : আবার তুমি বাবাকে ডাকছো। শোনো, না মা, এই নথি-টা হাতে থাকলে বেশ confidence পাওয়া যায়। মামলাটা ভাল ভাবে প্লীড করতে পারবো। শেষ সুযোগ দিয়ে দেখো-

রাজেশ্বরী : ঠিক আছে, এখন যা ওকানে বসে গান ধর আর মেয়েটা এলে— হ্যাঁ রে ওকে আসতে বলেছিস তো নাকি আমি ঝুঁটি ধরে টেনে আনবো।

অশেষ : ওসব করতে যেও না মা ভয় পেয়ে একটা কেলেংকারি কান্ড বাঁধিয়ে দেবে। এবার তুমি যাও আমি পরিস্থিতি ঠিক সামাল দিয়ে দেবো।

রাজেশ্বরী : আমি এখানে থাকলে তোর কি অসুবিধে হবে রে—

অশেষ : বারে মায়ের সামনে সব কিছু করা যায় নাকি—

রাজেশ্বরী : করবি কি রে ! আজ শুধু বলবি। বোস্ ঐখানে গিয়ে বোস, আর তারপরে গান ধর, জমিয়ে গাইবি। আমি তোর বাবার Breakfastটা দিয়ে আসছি।

[রাজেশ্বরীর প্রস্থান। অশেষ গান ধরে, কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করে প্রমীলা। গান শেষ হয়—গান- চঞ্চলও ময়ূরী - এ রাত বধূ যেতে দিও না।]

অশেষ ঃ মা গো, গান তো শেষ হয়ে গেল — (সুরে) সে তো এলো না, এলোনা-মামলা জমলো না, কেন জানি না—

প্রমীলা ঃ বারে— এই তো আমি এসেছি—

অশেষ ঃ (লাফিয়ে) মা-গো, এসেছে, এসেছে—

প্রমীলা ঃ এ কি - আপনি এতো লাফাচ্ছেন কেন?

অশেষ ঃ আনন্দে-আনন্দে - মা দেখলে খুব খুশী হতো।

প্রমীলা ঃ আপনার মায়ের কথা খুব মনে পড়ে না—

অশেষ ঃ মনে পড়ে কি প্রমীলা, বাধ্য হই, যাকে বলে ঠ্যালার নাম বাবাজি।

প্রমীলা ঃ এই মাঝ রাতে বাগানে ডেকে এনে হেঁয়ালি করবেন না তো-

অশেষ ঃ (আবেগে) মিলা-হেঁয়ালি আছে বলেই তো জীবনটা এতো সুন্দর।

প্রমীলা ঃ বা: এই এতক্ষণে আপনার মুখে এই ডাকটা ভারি মিষ্টি লাগছে।

অশেষ ঃ আমি একটা ময়রার দোকানের মতো, হরেক রকম মিষ্টির মতো আমি হরেক রকম মিষ্টি কথা জানি। সইয়ে-সইয়ে, রসিয়ে-রসিয়ে বলবো। জানো আমার বাবার ইচ্ছে ছিলো হরেনকাকার মেয়ের সাথে আমার ইয়ে হয়।

প্রমীলা ঃ জানি তো। আমার বাবা বলেছিলেন সে কথা কিন্তু ব্রজেন কাকার ছেলেটা রাজী হয়নি তাকে বিয়ে করতে। তাই এই শেষ বেলায় জানতে এসেছিলাম কেন সে.......

অশেষ ঃ ভুল করেছিলাম মিলা, ভুল করেছিলাম। জীবনের চলার পথে মানুষ ভুল করে ঠিকই কিন্তু পথের কোনো একটি বাঁকে সেই ভুল মিষ্টি-মধুর সত্য হয়ে অন্তরে নতুন বোধের জন্ম দেয়। মিলা, আমাদের জীবনের সূর্যটা হেলে পড়েছে ঠিকই কিন্তু অস্তরাগের ছোঁয়া রাঙিয়ে দিয়েছে আমাদের মনের আকাশ। আসবে, তুমি আমার জীবনে।

মিলা ঃ [হাত বাড়ায়] আসবো তো—

[রাজেশ্বরীর প্রবেশ]

রাজেশ্বরী ঃ ওগো শুনছো, কেস জমে গেছে। আমাদের পটার গতি হয়েছে।

লেখক ঃ **শংকর বসুঠাকুর,** চুঁচুড়া (পশ্চিমবঙ্গ) এর জনপ্রিয় নাটককার।

চেক-মেট

সঞ্জয় আচার্য

[একটি লো সাসপেন্স মিউজিকের তালে পর্দা ওঠে। মঞ্চটি একটি বার এর অংশ বিশেষ। সেন্টার স্টেজে এক মধ্য বয়সী ভদ্রলোক দাবা খেলছে। তাঁর নাম অনিরুদ্ধ। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। ভদ্রলোকটি একাই দাবা খেলছে। এটাই ওনার নেশা। হঠাৎ বাইরে একজনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সাথে সাথে দরজায় ঠকঠক আওয়াজ।]

নেপথ্যে ঃ ভিতরে কেউ আছেন? দরজাটা খুলুন প্লিজ। বাইরে খুব ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি চলছে। প্লিজ দরজাটা খুলুন।

[দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হয় অনিরুদ্ধ দরজায় হওয়া শব্দে বিরক্ত হয়। খেলা থামিয়ে, পেগে একটা চুমুক দেয়। তারপর অনিচ্ছা সহকারে উঠে গিয়ে দরজা খোলে। বাইরে থেকে কালো রেনকোট পরিহিত এক ব্যক্তি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে। ব্যক্তিটি অনিরুদ্ধর পূর্ব পরিচিত নয়।]

অজ্ঞাত ঃ থ্যাঙ্কস। ঘন্টায় একশো কিমির থেকে বেশী জোড়ে হাওয়া বইছে।

অনিরুদ্ধ ঃ নর ওয়েস্টার। কালবৈশাখী। ওয়েদার ফোরকাস্ট পাননি? ঘরে টিভি নেই? নিদেন পক্ষে স্মার্ট ফোন? এখন তো পাঁচদিন আগে থেকেই খবর পাওয়া যায়।

অজ্ঞাত ঃ খবর পেলেও কাজ ফেলে তো আর ঘরে বসে থাকা যায় না। তাই বর্ম নিয়ে [রেনকোট দেখায়।] বেরিয়ে পড়তেই হয়।

অনিরুদ্ধ ঃ বর্ম যখন আছেই, এখানে ঢুকলেন কেন?

অজ্ঞাত ঃ কি আশ্চর্য এটা তো একটা ওপেন বার। যে কেউ, যখন তখন আসতে পারে।

অনিরুদ্ধ ঃ নো ব্রাদার। আজকের জন্য ওপেন নয়। এই বারের মালিক আমি। প্রতি সপ্তাহে আজকের দিনটা আমি সকলের জন্য ওপেন করি না। আজকের দিনটা আমার, ওনলি চেস খেলার দিন।

অজ্ঞাত ঃ জানি।

অনিরুদ্ধ ঃ মানে!!!

অজ্ঞাত ঃ মানে আপনি দাবা খেলা যে পছন্দ করেন, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। দাবার বোর্ড পাতা রয়েছে। খুঁটি সাজানো। কয়েক দান খেলেও ফেলেছেন বোধহয়।

অনিরুদ্ধ ঃ এই তুমি কি আমার পূর্ব পরিচিত?

অজ্ঞাত ঃ না, একেবারেই নয়। কস্মিনকালেও আমাদের দেখা হয়নি কোথাও। আপনার কাছে আমি একজন অজ্ঞাত কুলশীল। জাস্ট নো ওয়ান।

অনিরুদ্ধ ঃ এখানে আসার পিছনে তোমার কোনোও মতলব নেই তো?

অজ্ঞাত ঃ এই আপনাদের মত বড়লোকদের একটাই দোষ জানেন তো? সাদা জলের

মধ্যেও আপনারা বিষ খুঁজে বেড়ান। আসলে ছক কেটে কেটে জীবনের হিসাব-নিকাশ মেলাতে চান তো, তাই স্বাভাবিক সব কিছু আপনাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে।

অনিরুদ্ধ ঃ এই অস্বাভাবিকতা আছে বলেই তো জীবনটাকে এনজয় করতে পারি ব্রাদার। জীবনে যদি থ্রিল, চার্ম, অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ নাই থাকল, তাহলে আর কিসের জীবন? এই তুমি দাবা খেলতে পারো?

অজ্ঞাত ঃ ওই একটু আধটু আর কি।

অনিরুদ্ধ ঃ তাতেই চলবে। নাও নাও বসে পড়ো। দাঁড়াও, আমি তোমার জন্যও একটা পেগ বানিয়ে নিয়ে আসি।

অজ্ঞাত ঃ আরে আমার কাছে অত টাকা নেই।

অনিরুদ্ধ ঃ আরে ধ্যাত। এটা ফ্রি। আমার খেলার সঙ্গী হওয়ার জন্য। [একটা পেগ বানিয়ে নিয়ে এসে, টেবিলে রাখে।] আমি সাদা। তুমি কালো। নাও এবার খেলাটা শুরু করা যাক।

অজ্ঞাত ঃ [পেগে একটা চুমুক দিয়ে, পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে, অনিরুদ্ধর দিকে তাক করে।]শুরু কি বলছেন? এক চালেই খেলাটা শেষ করে দিচ্ছি, মি. অনিরুদ্ধ বাগচী।

অনিরুদ্ধ ঃ অবশেষে বেড়ালটা ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়ল, মি. নো ওয়ান?

অজ্ঞাত ঃ আর একটা কথা বললে, মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

অনিরুদ্ধ ঃ বেশ কথা বলছি না। কিন্তু কিছুই না জেনে খুন হয়ে যাওয়াটা তো ভালো কথা নয়। তা জানতে পারি কি, কে সুপারি দিল আপনাকে?

অজ্ঞাত ঃ কেন? আমি নিজে আসতে পারি না?

অনিরুদ্ধ ঃ না। পারেন না। ওই যে তুমি বললে না, আপনি নো ওয়ান আমার কাছে অজ্ঞাত কুলশীল। তাই তুমি আমার শত্রু নও। আমার শত্রুদের আমি চিনি। আমার ওয়াইফ। তাই তো?

অজ্ঞাত ঃ [রিভলবার নামিয়ে নেয়] । আপনার তারিফ করতেই হয়। আচ্ছা কি করে বুঝলেন?

অনিরুদ্ধ ঃ এর আগেও অ্যাটেমপ্ট নিয়েছিলো। তাই আবার আক্রমণের পিছনে যে আমার ওয়াইফেরই হাত থাকবে, সেটা বুঝতে পারছি । এই যে কপালে সেলাইয়ের দাগ দেখছো, ইট ওয়াজ নট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। ওটা ছিল একটা অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডার। একটা বুনো লরি ধাক্কা মারে আমার গাড়িতে। আমি গেট খুলে লাফিয়ে পড়েছিলাম। পাশে ছিল, হাই ড্রেন। মি. নো ওয়ান, আমার কাছে তোমার উপস্থিতির কারণটা পরিস্কার।

অজ্ঞাত ঃ আপনাকে হত্যা করার পিছনে তার যথেষ্ট কারণ আছে।

অনিরুদ্ধ ঃ কারণ আর কি? আমার অর্থ আছে। ওর সেই অর্থ চাই। সমস্ত অর্থ। এই তো

কারণ।

অজ্ঞাত ঃ আপনার বয়স?

অনিরুদ্ধ ঃ বাহান্ন।

অজ্ঞাত ঃ আপনার স্ত্রী'র?

অনিরুদ্ধ ঃ বাইশ।

অজ্ঞাত ঃ [(জিভে চুক চুক শব্দ করে।]) কারণটা তো সহজবোধ মি. বাগচী।

অনিরুদ্ধ ঃ [পেগে চুমুক দেয়]। শুধুই কি জৈবিক তাড়না? নাকি আরও অন্য কোনোও কারণও আছে? আমি ভেবেছিলাম বছর খানেক কি, বছর দুয়েক অন্তত ও থাকবে। তারপর ডিভোর্সের মামলা আনবে। একটা মোটা খোরপোশের দাবি জানাবে। তাই বলে একেবারে খুন?

অজ্ঞাত ঃ আপনার স্ত্রী সুন্দরী। কিন্তু লোভী। আপনি এ বিষয়ে আগে নজর দেননি দেখে অবাক হচ্ছি মি. বাগচী।

অনিরুদ্ধ ঃ জামা পাল্টানো বোঝো ক্যানডি? নতুন জামা আসলে, পুরোনো জামা ফেলে দেওয়া। আমরা ঠিক তাই। জীবনটাকে চূড়ান্ত ভোগ করতে জানতে হয়। এনজয়, এনজয়, এনজয়িং, ইয়োরসেলফ ক্যানডি। তা ...... এর আগে খুন টুন করেছো তো?

অজ্ঞাত ঃ কি যে বলেন?

অনিরুদ্ধ ঃ খুন করতে বেশ ভালোই লেগেছে। তাই তো?

অজ্ঞাত ঃ একটা বিকৃত আনন্দ বলতে পারেন। তবে পিস্তল দিয়ে ঠাঁই করে গুলি চালিয়ে মেরে দেওয়াতে সেইরকম কোনোও মজা নেই। যতটা মজা পাই, ধারালো একটা ছুরি দিয়ে গলার নলী কেটে দিতে। কিম্বা দুটো হাত দিয়ে আপনারা জীবনটাকে ভোগ করেন, সেই হাত দুটোকে একটু একটু করে পিস পিস করে কেটে ফেলতে।

অনিরুদ্ধ ঃ এ তো পৈশাচিক উন্মাদনা। এক ধরনের পাগলামি।

অজ্ঞাত ঃ উন্মাদনা আর উন্মত্ততা দুটো শব্দই খুব কাছাকাছি জানেন তো মি. বাগচী? খুন করার সময় আমার মধ্যে এক ধরনের উন্মত্ততা কাজ করে। হ্যাভস নট এর দল আমরা। পোকার মত খুঁটে খেয়ে বড় হয়েছি। তাই আপনাদের মত হ্যাভসদের খতম করতে পারলে, নিজের ভিতরে একটা অদ্ভূত শ্লাঘা বোধ হয়। মস্তিস্কে তড়িৎ গতিতে পাগলামির পোকাগুলো কিলবিল করে ওঠে। এক অদ্ভূত উন্মাদনা হয়।

অজ্ঞাত ঃ আর সেই উন্মাদনাই আমাকে আবার নতুন নতুন করে ক্লায়েন্টদের কাছে নিয়ে যায়। জানেন মি. বাগচী মার্কসের জন্মের এটা দুশো বছর পূর্তি। অথচ উদ্বৃত্ত মূল্যের তলানিটুকুও তো আমরা প্রলেতারিয়েতরা আজও পেলাম না।

অনিরুদ্ধ ঃ জাগে জাগো জাগো সর্বহারা অনশন ও বন্দি ক্রীতদাস,

শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া, উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।

অজ্ঞাত ঃ মুক্তির আশ্বাস!! এখন তো সবই মহাকায় মার্কেট মেকানিজম-এর হাতের মুঠোয়। পলিথিন কিম্বা পলিটিক্স। ভাগাড় কিম্বা সাবাড়। সিরিয়া কিম্বা আসিফা

অনিরুদ্ধ ঃ অনায়াসে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

অজ্ঞাত ঃ ইভেন দ্য লাইট অফ হেভেন ইজ ভেনাল। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে স্বর্গের আলোও।

অনিরুদ্ধ ঃ আর আমাদের জীবন আপনাদের হাতের ঘেরাটোপে ধড়ফড় করতে থাকা ফড়িং, যার উড়ান ও মৃত্যু আপনাদের হাতের এক খেয়াল মাত্র। বিশ্বাস করেছিলাম মার্কসের আদর্শই ফিরিয়ে দিতে পারে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া তাবৎ অঙ্গীকার। তাবৎ খোঁজ। কেননা সেই মতাদর্শের এক অমোঘ উপস্থিতি আমাদের জানান দিচ্ছিল, এই আলোক সভ্যতার গভীরে থাকা এক অনিঃশেষ অন্যায়। আমাদের পারিপার্শ্বের গা খুলে হাসতে থাকা নীল সন্ধ্যা.... তার ওভার ব্রীজ আর ওয়ান্ডার ল্যাণ্ড। সভ্যতার গভীরে কান পেতে শুনেছিলাম, পৃথিবীর সকল বিপর্যস্ত মানবতার আর্তি, সার সার পরাজিত ন্যুব্জ ক্যারাভানের কান্না আস্তিগোনে থেকে অহল্যার নিঃশব্দ হুইপল্যাশ। এক নিরালোকিত যন্ত্রণা।

অনিরুদ্ধ ঃ পাষাণী অহল্যা, ওগো যত রাজপথ,
কান পেতে কী আমার আগমণী শোনো?
আমিও তো কান পাতি
কোথায় সমুদ্র গর্জে তরঙ্গে উত্তাল......

অজ্ঞাত ঃ " আমার গভীরতম বিশ্বাস ছিল, এই আধুনিকতা, এই যুক্তিবাদ, সমস্ত লজিক পণ্যায়নের বাইরে। বিশ্বাস ছিল, সব ন্যাক্কার, অন্ধকার আর অপরাধের বাইরে। বিশ্বাস করতাম, কমিউনিস্টরা সামনে এসে দাঁড়ালে, অন্ধকার সরে যাবে। অপরাধ সরে যাবে। অরণ্য সরে যাবে।"

অনিরুদ্ধ ঃ "ধনের অদেয় কিছু নেই, সেই সবই জানে
এ খণ্ডিত রক্তবণিক পৃথিবী।"
... মার্কেটাইজেশন, মনোপলি, ম্যাক্সিমাইজেশন। মার্কস মরে ভূত হয়ে গেছে কবে। তবুও তার প্রেতাত্মা তোমার মধ্যে ভর করে রয়েছে মি. নো ওয়ান। স্পেক্টর অফ মার্কস। হ্যাঁ, আমরা এই পণ্য সভ্যতারই সন্তান। আমাদের অনেক আছে। কিন্তু আরোও অনেক ছিল। সেগুলো কেড়ে নিয়েছো সবাই তোমরা। কই আমরা তো তোমাদের কিছু করতে যাইনি। ক্ষমা করে দিয়েছি।

অজ্ঞাত ঃ হয়ত আত্মগ্লানি থেকে বা অনুশোচনা থেকে।

অনিরুদ্ধ ঃ তোমরাও তো সেই গ্লানি থেকে ক্ষমা করে দিতে পারো আমাদের।

অজ্ঞাত ঃ সেই গ্লানিটা আছে বলেই তো, মাত্র এক সেকেন্ডে শেষ করে দিচ্ছি আপনাকে। পিস পিস করে কেটে ফেলছি না আপনার দুটো হাত। যাতে আপনি বেশী কষ্ট

না পান।

অনিরুদ্ধ ঃ তুমি এখানে এসেছ দশ মিনিটেরও বেশী হয়ে গেছে। আর আমি কিন্তু এখনও বেঁচে আছি।

অজ্ঞাত ঃ আমার কোনোও তাড়া নেই মি. বাগচী। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার বেশ ভালই লাগছে।

অনিরুদ্ধ ঃ আমার তো মনে হচ্ছে অন্য কিছু। তুমি খুন করতে করতে হয়ত ততটা আনন্দ পাও না। যতটা আনন্দ পাও খুন করার অগে শিকারকে খেলাতে।

অজ্ঞাত ঃ আপনার অন্তর্দৃষ্টি আছে মি. বাগচী।

অনিরুদ্ধ ঃ তার মানে,তোমার সঙ্গে আমি যতক্ষণ সময় কাটাতে পারব, সে যেভাবেই হোক না কেন? ততক্ষণই আমি বেঁচে আছি তাই তো?

অজ্ঞাত ঃ তারও একটা সময় থাকবে অবশ্যই।

অনিরুদ্ধ ঃ সে-তো নিশ্চয়ই। আর একটু পান করবেন নাকি মি.?

অজ্ঞাত ঃ মি. বাগচী, আমি চাই না শেষ সময়টায় আপনার কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যাক। হয়ে যাক একটু। তবে তার আগে আমাকে দেখতে হবে, আপনি পানীয়টা কিভাবে বানিয়েছেন? যদি কিছু মিশিয়ে থাকেন.........

অনিরুদ্ধ ঃ এটা অবশ্যই নয় যে, আপনি আসবেন জেনে আমি বিষ নিয়ে বসে থাকবো?

অজ্ঞাত ঃ তা বটে। তবে সম্ভাবনা থেকে যায় মি. বাগচী।

অনিরুদ্ধ ঃ তুমি মৃত্যুকে এত ভয় পাও? তোমার এই প্রফেশনে আসা উচিৎ হয়নি।

অজ্ঞাত ঃ জীবনকে যে যত ভালোবাসে সে তত বেশী ভয় পায়। আমি জানি আমি একজন ভাড়াটে খুনি। আমি কাউকে মারার জন্য কখনো সুপারি পাই। আবার আমাকে মারার জন্য কেউ .... আমার হাতে খুন হয় কেউ। আবার আমিও খুন হয়ে যেতে পারি কারো হাতে। এই সম্ভাবনার মধ্যেই তবু আমরা বেঁচে থাকি। বেঁচে থাকার তীব্র আকুতিটা টিকে থাকে। ওই যে আছে না ....“ তবুও তো প্যাঁচা জাগে, গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দু মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে ..... আর একটি প্রভাতের ঈশারায়.......” পড়েছেন তো? মি. বাগচী, আপনাদের আরও একটা সমস্যা কি জানেন? আপনারা সম্পূর্ণ রূপে স্বপ্ন বিরোধী। সুখ, আরাম, প্রতিপত্তি, যশ, এর কোনোওটাই স্বপ্নভূমির সন্তান নয়। টার্গেট পূরণের চক্করে আপনারা বুঝতেই পারেন না যে, আপনারা নিজেরাই কখন টার্গেট হয়ে যান।

অনিরুদ্ধ ঃ কোন স্বপ্নে নিশ্চয়তা খোঁজো মি. নো ওয়ান? মানুষ এক অদ্ভুত জীব জানো তো? সবার থেকে আলাদা। অনিশ্চয়তা তার সর্ব সময়ের সঙ্গী। [পেগটা এগিয়ে দেয়] নাও। বিষ টিষ কিছু নেই।

অজ্ঞাত ঃ আপনাকে বিশ্বাস করা যায় মি. বাগচী।

অনিরুদ্ধ ঃ বিশ্বাস না করে উপায় কি বলো? মাংস খাচ্ছো, সেটা ভাগাড়ের পচা বিড়াল কিম্বা থ্যাঁতলানো কুকুরের মাংস কিনা, কে বলতে পারে? কিন্তু বিশ্বাস করে

খেতে হচ্ছে যে তুমি মটনই খাচ্ছো।

অজ্ঞাত ঃ এটা আপনাদের সমস্যা। ম্যাকডোনাল্ড নাকি ডমিনোজ? পিজা নাকি বার্গার? হট ডগ নাকি মাঞ্চুরিয়ান? এইগুলো আপনাদের ডিকশনারির শব্দ। আমাদের ফুটপাতের ধারে সস্তার ঘুগনি পাউরুটি যুগযুগ জিও।

অনিরুদ্ধ ঃ ফুটপাতের দোকানও কি এর থেকে বাইরে ভাবছ ভায়া? পচন আজ সর্বত্র।

অজ্ঞাত ঃ এটা যে পচন,আমি আপনি ঠিক করার কে? হয়ত এটাই দরকার ছিল। মানুষ যখন কিছুই দেখতে পায় না, কিছুই শুনতে পায় না, তখন একটা ঝাঁকুনির দরকার পড়ে অনিরুদ্ধবাবু। আপনার এই বারের বাইরেটায় তাকিয়ে দেখুন, বয়ে চলেছে, সারি সারি নুয়ে পড়া মানুষের নিঃশব্দ ক্যারাভান। আমাদের সামনে কোনোও পরিত্রাতা নেই মি. বাগচী। কোনো গড নেই আমাদের সামনে।

অনিরুদ্ধ ঃ " আমরা অপেক্ষাতুর
কালো সাগরের পাড়ে
মাইলের পর আরও অন্ধকার
ডাইনি মাইলের পাড়ি দেওয়া পাখিদের মত।" জীবনানন্দ আমাদের শিখিয়ে গেছে অনেক। বলো? আচ্ছা, আমার স্ত্রী এখন কোথায় আছে জানো?

অজ্ঞাত ঃ একটা পার্টিতে । এক ডজনেরও বেশী লোক সাক্ষী দেবে যে, খুনের সময় উনি ওখানেই ছিলেন।

অনিরুদ্ধ ঃ তাহলে পুলিস জানবে যে, কোনো অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ী বা চোরই আমাকে গুলি করেছে। তাইতো?

অজ্ঞাত ঃ ঠিক তাই।আপনাকে খুন করার পর আমি এই গ্লাসটা ভালো করে ধুয়ে মুছে ঐ লিকার ক্যাবিনেটে রেখে দেবো। আর যেই সব জায়গায় আমার হাতের ছাপ আছে, সমস্ত চিহ্ন মুছে রেখে যাবো। নিখুঁত কাজ হবে মি. বাগচী।

অনিরুদ্ধ ঃ একটু বেশী ঝুঁকি হয়ে যাবে না? চোর বা আগন্তুকের গল্পটা দাঁড়াবে তো? কারণ জিনিষপত্র তো এখানে সব ঠিকঠাকই থাকবে।

অজ্ঞাত ঃ ওটা কোনোও ব্যাপারই নয় মি. বাগচী। পুলিস ভাববে যে,চোর আপনাকে খুন করার পর ঘাবড়ে গিয়ে, কিছু না নিয়েই পালিয়েছে।

অনিরুদ্ধ ঃ তোমার পিছনে যে ছবিটা টাঙানো আছে, তার দামই দশ লক্ষ টাকা। তুমি জানো?

অজ্ঞাত ঃ [ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয়।] খুবই লোভনীয় ছবি মি. বাগচী। কিন্তু আপনার সঙ্গে ক্ষীণতম সম্পর্ক আছে, এমন কোনো কিছুই আর দরকার নেই। আমি ছবি ভালবাসি ঠিকই। কিন্তু বেশী ভালবাসতে গিয়ে, জেলে পচে মরতে চাই না। আপনি কি অত দামি ছবিটা আমাকে দিতে চাইছেন? আপনার জীবনের বিনিময় মূল্য?

অনিরুদ্ধ ঃ সেইরকমই ভাবছিলাম। আর কি।

অজ্ঞাত ঃ আমি দুঃখিত মি. বাগচী। আপনি তো শুনলেন, আমি কতটা পিউরিটান। আদর্শবাদীও বলতে পারেন। আর আমি এই কাজের জন্য টাকা নিয়েছি। এখন তাই আর কথার খেলাপ করতে পারবো না। এটা পেশাদারিত্বের প্রশ্ন।

অনিরুদ্ধ ঃ মি. নো ওয়ান তুমি কি কখন আমি ভয় পাবো তার জন্য অপেক্ষা করছ?

অজ্ঞাত ঃ একদম ঠিক।

অনিরুদ্ধ ঃ আমি ভয় পেলেই আমাকে খুন করবে?

অজ্ঞাত ঃ ঠিক তাই।

অনিরুদ্ধ ঃ কিন্তু আমি তো ভয় পাবো না।

অজ্ঞাত ঃ এ এক বিড়ম্বনা, তাই না মি. বাগচী? এই যে ভয় পেয়েও সাহসের ভান করে থাকা।

অনিরুদ্ধ ঃ তুমি কি মনে করো, তোমার শিকারেরা তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে?

অজ্ঞাত ঃ হ্যাঁ। তারা চায়। কোনো না কোনো ভাবে চায়।

অনিরুদ্ধ ঃ তারা নিশ্চয়ই অনেক টাকাও দিতে চায়? তাই তো?

অজ্ঞাত ঃ হ্যাঁ, প্রায় সব ক্ষেত্রেই দিতে চায়।

অনিরুদ্ধ ঃ সেই সব ক্ষেত্রে তাদের আবেদনে নিশ্চয়ই কোনোও লাভ হয় না?

অজ্ঞাত ঃ ঠিকই ধরেছেন।

অনিরুদ্ধ ঃ তারপর তারা তোমাকে মানবিকতার দোহাই দেয়।, তাই তো?

অজ্ঞাত ঃ হ্যাঁ। কিন্তু সেই সবকিছুই বিফলে যায়।

অনিরুদ্ধ ঃ তারপর তারা তোমার হাত পা ধরে। তীব্র আকুতি করে। প্রাণভিক্ষা চায় ....

অজ্ঞাত ঃ ন্যাচারালি সেটাইতো স্বাভাবিক।

অনিরুদ্ধ ঃ আমি তো এইসব কিছুই করব না। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না, তুমি জানো সেটা? " মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম.........."

অজ্ঞাত ঃ এই রাবীন্দ্রিক আদিখ্যেতা গুলো বন্ধ করুন দেখি।

অনিরুদ্ধ ঃ রাবীন্দ্রিক আদিখ্যেতা?

অজ্ঞাত ঃ সবকিছুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে টেনে এনে দাঁতলামো করা আমার জাস্ট ইরিটেটিং লাগে। ওনার লেখাগুলো সব অতি নাটকীয়তা আর ন্যাকামোতে ভরা। এই একটা লোককে আমি জাস্ট ঘৃণা করি। বাঙালি জাতটাকে নপুংসক করে দিয়েছে। "মনেরে আজ কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যরে লও সহজে।" কোনটা সত্য? মহারাষ্ট্রের চাষী ঋণের দায়ে রোজ আত্মহত্যা করছে, এটা সত্য? সিরিয়া সত্য? রোহিঙ্গারা সত্য? কালবুর্গী, দাভালকার, আখলাক সত্য? কোন সত্যগুলো সহজে মেনে নিতে বলেন উনি? ডিসগাস্টিং। তুমি কোনো আলিসান ফ্ল্যাটের এ.সি বেডরুমে বিরিয়ানি আর ওয়াইন খেতে খেতে, আর বাংলা সিরিয়াল দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথ কপচানো অনেক সহজ। রাস্তায় নেমে আসল সত্যের সামনে দাঁড়ান, ভয়ে কুঁকড়ে যাবেন।

অনিরুদ্ধ ঃ ভায়া একমাত্র আসল সত্য মৃত্যু। সেটাই হল একমাত্র গন্তব্য?

অজ্ঞাত ঃ হ্যাঁ মৃত্যু হতে পারে আমাদের আলটিমেট ডেস্টিনেশন। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পথ কোথায়? পুরো পথ জুড়েই দ্বিধা আর কনফিউশন। কাফকা পড়েছেন তো?

অনিরুদ্ধ ঃ তুমি বার্গম্যান দেখেছো? সেভেন্থ সিল? মৃত্যু রোজ আমার কাছে আসে। আমি তাকে আটকে রাখি। আমি তাকে দাবা খেলায় ইনভাইট করি। সে এসে আমার উল্টোদিকে বসে। আমি চাল দিই। ও পাল্টা চাল দেয়। এন পাশা —আমি ওর একটা বোড়ে খাই। ও আমার একটা বোড়ে খায়, আমি চাল দিই বিশপ, ও রুক। কখনো কখনো ঘোড়ার আড়াই চালে ওকে নাস্তানাবুদ করে দিই। মৃত্যুও ছাড়ে না। ও আমাকে ক্যাসলিং করে রাখে। আমিও করি মাঝে মাঝে ও আমাকে হারাতে পারে না। আমিও ওকে হারাতে পারি না কখনো। খেলা অমীমাংসিত থেকে যায় রোজ। হাল ছেড়ে মৃত্যুও চলে যায় এক সময়।

[পুরো ঘটনাটি একটা জোনে হবে। অনিরুদ্ধ কথা বলতে বলতে একটা জোনে যাবে। মৃত্যুও কালো ঢাকা পোষাক পড়ে এসে অনিরুদ্ধ-র সাথে দাবা খেলবে। তারপর চলে যাবে। জোন ভেঙ্গে অনিরুদ্ধ অজ্ঞাত-র কাছে চলে আসবে।]

অনিরুদ্ধ ঃ এই ছবিটার নীচে একটা সিন্দুক আছে দেখতে পাচ্ছো?

অজ্ঞাত ঃ হ্যাঁ, তাতে কি?

অনিরুদ্ধ ঃ এই সিন্দুকে পাঁচলাখ টাকা আছে।

অজ্ঞাত ঃ ও হো হো অনেক টাকা মি. বাগচী!!!

[অনিরুদ্ধ টেবিল থেকে একটা ফাঁকা গ্লাস নিয়ে সিন্দুকের দিকে এগিয়ে যায়। পাসোয়ার্ড মিলিয়ে সিন্দুকটা খোলে। সিন্দুকের ভিতর থেকে একটা বাদামী রঙের খাম বের করে আনে। গ্লাসটা সিন্দুকের ভিতরে রেখে দিয়ে, পাসোয়ার্ড দিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে, টেবিলের কাছে ফিরে আসে]

অজ্ঞাত ঃ খামটার মধ্যেই টাকাগুলো আছে তাই তো? আপনি কি ভাবছেন— এটা দিয়ে আপনি আপনার জীবন বাঁচাতে পারবেন?

অনিরুদ্ধ ঃ [একটা সিগারেট ধরায়] তোমাকে পরখ করছিলাম মি. নো ওয়ান। নাঃ বলতেই হচ্ছে, তুমি সম্পূর্ণ দূর্নীতিমুক্ত।

অজ্ঞাত ঃ তাও আমাকে আপনি এটা দিতে চাইছেন?

অনিরুদ্ধ ঃ এতে কোনোও টাকা পয়সা নেই। কিছু পুরোনো রসিদ আছে। যা তোমার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

অজ্ঞাত ঃ [অসহিষ্ণু হয়ে] তাহলে এটা বের করে আনলেন কেন? কি লাভ হল আপনার?

অনিরুদ্ধ ঃ এটার নাম করে সিন্দুকটা খুলে, তোমার গ্লাসটা ভিতরে ভরে ফেললাম। এটাই লাভ।

অজ্ঞাত ঃ [টেবিলের উপর রাখা গ্লাসটা দেখে নেয়] ওটা আপনার গ্লাস। আমার নয়।

অনিরুদ্ধঃ ওটা তোমার গ্লাস মি. নো ওয়ান। আমি জানি, পুলিস ওই সিন্দুকে একটা ফাঁকা গ্লাস দেখে অবাক হয়ে যাবে। আর এইরকম একটা মার্ডার কেসে আমি আশা করবো, পুলিস ওটার আঙুলের ছাপ নেবে। সেটুকু বুদ্ধি তাঁদের আছে।

অজ্ঞাত ঃ অসম্ভব। আমি এক মুহূর্তের জন্য ও আপনার উপর থেকে চোখ সরাইনি। কাজেই গ্লাস আপনি পাল্টাতেই পারেন না।

অনিরুদ্ধঃ কমপক্ষে দু'বার তুমি ওই ছবির দিকে তাকিয়েছো।

অজ্ঞাত ঃ কিন্তু সে তো বড়জোড় এক কি দু'সেকেণ্ডের জন্য।

অনিরুদ্ধঃ সেই সময়টুকু কি যথেষ্ট নয়?

অজ্ঞাত ঃ [শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়] না। যথেষ্ট নয়। এ অসম্ভব কখনোই হতে পারে না।

অনিরুদ্ধঃ তবে আর কি? ওই আনন্দেই থাকো। তবে পুলিস তোমাকে ধরলে অবাক হয়ো না যেন। আর খুনের কেস মানেই যাবজ্জীবন কিম্বা ফাঁসি। তোমার শিকারেরা মরার আগে মৃত্যুর সম্পর্কে বেশী চিন্তা ভাবনা করার সময় পায় না। তুমি অন্তত তাদের থেকে কিছুটা সময় বেশী পাবে।

অজ্ঞাত ঃ একদম ওপর চালাকি করবেন না।

অনিরুদ্ধঃ চালাকি বললে চালাকি, আর বোকামি বললে বোকামি। যা খুশি বলতে পারো। হাঃ—হাঃ—হাঃ!!

অজ্ঞাত ঃ হাসছেন? ট্রিগারটা টিপে দিলেই হাসিটা থেমে যাবে।

অনিরুদ্ধঃ আমি ভাবছি জেলে তোমার দিনগুলো কিভাবে কাটবে? ফাঁসির দিনই বা কি করবে খুব সম্ভবত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তুমি এমন একটা ভাব দেখাবে, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু মনে হয় না শেষ পর্যন্ত তুমি শান্ত থাকতে পারবে।

অজ্ঞাত ঃ সিন্দুকটা খুলুন নয়ত, সত্যি সত্যি গুলি করবো।

অনিরুদ্ধঃ তুমি চেষ্টা করে দেখো, খুলতে পারো কিনা?

অজ্ঞাত ঃ পাসোয়ার্ডটা বলুন।

অনিরুদ্ধঃ তুমি বোধহয় জানো না, আমার স্মৃতি বড় নড়বড়ে। ভুলে গেছি।

অজ্ঞাত ঃ আমার সাথে কোনো খেলা করতে যাবেন না। পাসোয়ার্ডটা বলুন। তাড়াতাড়ি বলুন। সময় নেই হাতে।

অনিরুদ্ধঃ [হাসে] হাঃ—হাঃ—হাঃ........ এরকম বিপদে আগে কোনোওদিন পড়োনি তাই তো?

অজ্ঞাত ঃ বাজে কথা ছাড়ুন........ তাড়াতাড়ি বলুন।

অনিরুদ্ধঃ আসলে সত্যি কথা বলতে কি মি. নো ওয়ান, এখন আমার দুজনেই জানি, আমি সিন্দুকটা খুললেই তুমি আমাকে গুলি করবে। তাই সিন্দুকটা যতক্ষণ না খুলবে, ততক্ষণই আমি নিরাপদ।

অজ্ঞাত ঃ [অস্থির হয়ে বসে পড়ে।] আচ্ছা, কাম অন, স্পিক উইথ মি। গ্লাসটা দিয়ে আপনি কি করতে চান?

অনিরুদ্ধ ঃ তুমি যদি আমাকে খুন না করো ... যদিও জানি এখন তুমি সেটা করবে না। আমি গ্লাসটা নিয়ে সোজা চলে যাবো, কোনোও প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সীতে। তাদের কাছ থেকে তোমার হাতের ছাপটা নেবো। তারপর সেটা ভরবো একটা সিল করা খামে। অবশ্যই খামের মধ্যে এ প্রসঙ্গে সবকিছুই জানিয়ে একটা নোট থাকবে। আর অবশ্যই আমার নির্দেশ থাকবে যে, যদি আমার সন্দেহজনক ভাবে মৃত্যু ঘটে, এমনকি দুর্ঘটনাও হয়, তবে যেন সিল করা খামটা পুলিসের কাছে পাঠানো হয়।

অজ্ঞাত ঃ [কিছুক্ষণ চুপ থেকে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।] তার আর দরকার হবে না। আমি চলে যাচ্ছি। আপনি কখনও আমাকে দেখতে পাবেন না।

অনিরুদ্ধ ঃ প্ল্যানটা ভালোই করেছি। কি বলো? এটা আমার ভবিষ্যতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

অজ্ঞাত ঃ আচ্ছা, আপনি ওটা নিয়ে সোজা পুলিসের কাছে যাবেন না কেন?

অনিরুদ্ধ ঃ কারণ আছে মি. নো ওয়ান। ক্রমশ প্রকাশ্য।

অজ্ঞাত ঃ [রিভলভার পকেটে রাখে।] আপনার ওয়াইফ কিন্তু .... সহজেই অন্য কাউকে ভাড়া করতে পারেন, আপনাকে খুন করার জন্য।

অনিরুদ্ধ ঃ হ্যাঁ তা পারে।

অজ্ঞাত ঃ অথচ তারজন্য আমি দায়ী হবো। আমি জেলে যাবো।

অনিরুদ্ধ ঃ এসবই ঠিক মি. নো ওয়ান। যদি না .....

অজ্ঞাত ঃ যদি না ....

অনিরুদ্ধ ঃ যদি না সে অন্য কাউকে ভাড়া করার সুযোগ পায়।

অজ্ঞাত ঃ কিন্তু বাজারে তো অন্তত হাফ ডজন ভাড়া করা খুনি আছে।

অনিরুদ্ধ ঃ আমার স্ত্রী কি তোমায় বলেছেন, তিনি এখন কোথায় থাকবেন?

অজ্ঞাত ঃ বাইপাসের ধারে, কোনোও এক ফাইভ স্টারে। ওখান থেকে রাত বারোটায় বেরোবেন বলেছেন।

অনিরুদ্ধ ঃ ও বুঝেছি, ও কোথায় আছে। রাত বারোটা তাই তো? এখনো অনেক সময়। আজকের রাতটা খুবই অন্ধকার। ঝোড়ো হাওয়া হয়ত এখনো বইছে। আমি ক্যাবের গাড়ি বুক করে দিচ্ছি। তুমি তপসিয়ার দিকটা চেনো তো?

অজ্ঞাত ঃ চিনি। ওই মাঝে মাঝে ....

অনিরুদ্ধ ঃ ওতেই হবে। গাড়ি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে তোমাকে।

অজ্ঞাত ঃ কিন্তু আমি ওখানে গিয়ে কি করবো?

অনিরুদ্ধ ঃ আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু নিজের নিরাপত্তার জন্য, এই কাজটা করতেই হবে।

অজ্ঞাত ঃ কি কাজ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!! [অনিরুদ্ধ কোটের বোতাম

আটকে উঠে দাঁড়ায়] একি! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

অনিরুদ্ধ ঃ টাইম ইজ ওভার মি. ওয়ান। আমাকে বেরোতে হবে এখন। কিচ্ছু চিন্তা করো না। রাত বারোটার সময় সম্ভবত আমি আমার ক্লাবে আমার পাঁচ ছ'জন বন্ধু মিলে তাস খেলতে ব্যস্ত থাকবো। আর বন্ধুরা সবাই তখন নিঃসন্দেহে আমাকে সমবেদনা জানাবে। কারণ, তখন ওদের সামনেই আমি খবরটা পাবো যে, এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে আমার স্ত্রী গুলিতে নিহত ।

অজ্ঞাত ঃ মানে!!!

অনিরুদ্ধ ঃ আমি সুপারি দিলাম তোমাকে। জাস্ট স্যুট হার। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দাও ওর বুক।

অজ্ঞাত ঃ কি নৃশংস!!!!!

অনিরুদ্ধ ঃ মি. নো ওয়ান, তুমি যত না ঘৃণা করো রবীন্দ্রনাথকে, আমি তার থেকে বেশী ঘৃণা করি আমার ওয়াইফকে।

অজ্ঞাত ঃ "এই জগতে প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ সব মিথ্যা। শুধু ঘৃণাটাই সত্য।"

অনিরুদ্ধ ঃ আরে তুমিও তো রবীন্দ্রনাথ আওড়াচ্ছ !!!! বিসর্জন।

অজ্ঞাত ঃ একটা দিন, কোনোও একটা মুহূর্তের জন্যও ভালোবাসেননি ওনাকে?

অনিরুদ্ধ ঃ [টেবিল থেকে একটা পাথরের মূর্ত্তি তুলে নেয়] এটা যখন কিনেছিলাম, তখন এটা আমার খুব প্রিয় ছিল। এখন আর টানে না আমায়। পৃথিবীটাকে দেখতে শেখো মাই ডিয়ার। বেঁচে থাকার নিত্য নতুন রঙীন রসদ ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। প্রচুর বিকল্প, আর ততোধিক সম্ভাবনা। চেটেপুটে স্বাদ নাও সবকিছুর। আদর্শবাদী হলে, কুড়ে কুড়ে শেষ হবে। চুকলিবাজ হও। চালাক হও। জীবনটাকে তুড়িতে নাচাও। সু-সময়কে কাজে লাগাও নিজের স্বার্থে। তুমি তোমার এই প্রফেশনের জন্য নিতান্ত ছেলেমানুষ।

অজ্ঞাত ঃ আমি কখনোই ওনাকে মারতে পারবো না।

অনিরুদ্ধ ঃ তাহলে নিজে মরো। তোমার কাছে দুটো সম্ভাবনা। যেকোনো একটা বেছে নাও। হেড অর টেল।

অজ্ঞাত ঃ আমি কিছুতেই পারবো না মারতে। আর সব কাজেই একটা একটা নিজস্ব এথিক্স আছে। আমি স্বীকার করছি এই প্রফেশনে আমি নিতান্তই কাঁচা। ক্ষমা করুন আমাকে।

অনিরুদ্ধ ঃ বললাম তো একটাই পথ। যেকোনো একটা বেছে নাও তুমি। দেরী করো না। ক্যুইক ক্যুইক।

অজ্ঞাত ঃ " কোনো পথ খোলা নাই।
নেই কোনো পরিত্রাতা। কোনো পরিত্রাণ।
পলাশের রঙে বিশ্বাস ছিল।
সেই ছেলেটার চোখে দীপ্ত রোখ।

ঠোঁটে ক্রুদ্ধ তেজের ঝলক।

অজ্ঞাত ঃ ও হাতে রাইফেল তুলে নেবার স্বপ্ন দেখছে।
আমি ওর মধ্যে দেখেছি আমার কৈশোরের স্বপ্ন।
ব্যর্থ হয়েছি, হেরে গিয়েছি বার বার।
আদর্শের কাছে, দারিদ্রতার কাছে, জীবিকার কাছে।
হাংরি কবিরা ব্যর্থ। সত্তর দশক ব্যর্থ।
এ আঁধার কাটবে, দূর হবে জীবনের ভয়
এ বাঁধন ভাঙবে সুনিশ্চয়।
"আঁধারই তো আরো জাপটে ধরেছে এখন।
চারিদিকে শূন্য বুদবুদ"।.......... কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না । ঘনিষ্ঠ আকাশ, বিকীর্ণ জীবনের স্বাদ আমিও তো নিতে চেয়েছিলাম, আমার মত করে। হ্যাঁ আমি আজ ভাড়াটে খুনি। প্রতিদিন, প্রতি রাতে আপনার মত একেক জন লোক, আয়নার সামনে আমার মুখোমুখি দাঁড়ায়। আমি তাকে হত্যা করি রোজ। কিছুতেই করবো না পেশার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা । চলি মি. বাগচী।
(দরজার দিকে এগিয়ে যায়)
" ভাবনা শুধুই ভাবনা থেকে।
গুঁড়িয়ে গেছে দিন।
প্রজন্মকেই শুধতে হবে, প্রজন্মের এই ঋণ)
আকাশ পানে মুখ তুলে চাও।
ঘনায় দেখো মেঘ।
সেই সুযোগে স্বাপদ হাওয়া বাড়ায় গতিবেগ।" .... চেক মেট।

(অজ্ঞাত পকেট থেকে দ্রুত রিভলবার বের করে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করে। গুলির শব্দের সাথে আলো কাটে। অন্ধকার নেমে আসে । নিস্তব্ধ চারদিক)।

ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।

লেখক ঃ **সঞ্জয় আচার্য,** পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের জনপ্রিয় নাটককার।

জলই জীবন

মৃণাল দে

(চরিত্র - পাগল ভাই, পথচারি- ১,২,৩, কারখানা কর্মী- ১, ২, বিজ্ঞানমনস্ক কর্মী- ১,২)
(রাস্তার দৃশ্য। একজন প্রায় পাগল মানুষ জোরে জোরে আপন মনে গান করছে। পরনে ময়লা ছেঁড়া জামাপ্যান্ট, বড় বড় চুল-দাঁড়ি। গান করতে করতে কখনো বসছে। কখনো আকাশের দিকে হাত ছুড়ে, পা তুলে নাচছে। পরিচালক সুবিধামত একজনকে দিয়ে একাধিক চরিত্র করাতে পারেন।)

পাগলভাই ঃ (গান) কালী মেঘা ... কালী মেঘা ... পানি তো বর্ষাও
হঠাৎ তাঁর নজরে আসে কারখানা থেকে প্রচুর নোংরা জল নদীতে পড়ছে। (দর্শককে বোঝাতে হবে উংসের পিছনে ঘটছে) খুব যন্ত্রণা পায়, চিৎকার করতে থাকে ।
না- না- উ- উ-না-জল-জল-নোংরা জল। না- না-না- বন্ধ- বন্ধ- বন্ধ ....।
(কয়েকজন পথচারি (দাঁড়িয়ে পড়ে দেখে।)

পথচারি ঃ আরে আরে কি হয়েছে, ও ভাই।

পাগলভাই ঃ জল, জল-

পথচারি ২ ঃ কি জল খাবে?

পাগলভাই ঃ না, জল-জল- নোংরা জল-নদী-নদী।

পথচারি১ ঃ হ্যাঁ, কারখানার নোংরা জল নদীতে পড়ছে।

পাগলভাই ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ-।

পথচারি১ ঃ তাতে তোমার কি হয়েছে?

পাগলভাই ঃ না-না- বন্ধ-বন্ধ-।

পথচারি২ ঃ আরে ছাড়ুন তো দাদা, যতসব পাগলের উৎপাত, পাগলে দেশটা ভরে গেল।

পাগলভাই ঃ (ইট ছুড়ে মারতে থাকে- উংসের বাইরের দিকে চিৎকার করে বলে বন্ধ-বন্ধ-বন্ধ-

পথচারি ১,২ ঃ আরে আরে কি করছে, কারো গায়ে ইট লেগে একটা কান্ড ঘটবে
(পথচারি ৩ এর প্রবেশ)

পথচারি ৩ ঃ ওই পাগলটা এখানে কি করছে? ওই দেখো কারখানার ভিতরে ইট ছুড়ছে কেন? একটা বিপদ ঘটে যাবে তো,

পথচারি ১,২,৩ ঃ আরে ইট ছুড়ো না, থাম থাম, তোমার কি হয়েছে বল।

পাগলভাই ঃ জল-জল-নোংরা। বন্ধ-বন্ধ-।

পথচারি ১ ঃ কি যে বলতে চায়, বুঝতে পারছি না।

পথচারি ২ ঃ বুঝতে পারছেন না, বর্ষাকাল চলে যাচ্ছে, তবুও বৃষ্টির দেখা নেই, প্রকৃতি তেতে আছে, আর গরমে পাগল তো ক্ষেপবেই।

পথচারি-৩ ঃ কিন্তু তিন-চারদিন আগে মনে হচ্ছে ওকেই দেখেছি জানেন হেলা-বটতাল মন্দিরের পাশেই যে কলটা আছে তাতে সারাদিন ধরে জল পড়ে যাচ্ছে। মন্দিরে কত লোক আসে, কারো নজর নেই। ও রাস্তা থেকে একটা কাঠের টুকরো নিয়ে পাইপের মুখে ঢুকিয়ে জল বন্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু মন্দিরের লোকেরা কাঠের টুকরোটা ফেলে দেয়। একে নোংরা পাগল তারপর রাস্তার কাঠের টুকরো, আবার যদি করে, কল ধরে তবে লাঠি পেটা করবে বলে শাসায়। ও হাল ছাড়ে না, মন্দিরের সামনে বসে সারাদিন ভিক্ষা করে, একটা কল কিনে রাতের অন্ধকারে লাগিয়ে দিয়ে যায়।

পথচারি-২ ঃ ওই দেখুন কারখানার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে।

পথচারি- ১ ঃ গালাগালি দিচ্ছে নাকি, হতেও পারে, হয়ত কারখানার কারো উপর রাগ আছে।

পথচারি-২ ঃ এই রে আবার ক্ষেপে গেল, এবার একটা বিপদ ঘটবেই।

পথচারি-১,২,৩ ঃ থাম-থাম-। একটা কিছু ঘটলে তোমায় মেরে ফেলবে।
(বিড় বিড় করে কি যেন বলতে বলতে ইট মারতে থাকে। কারখানার দু'জন লোক এসে নিঃশব্দে হাতমোড়া করে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়। পাগলভাই হাতের বাঁধন খোলার জন্য ছটফট করতে থাকে। বিড় বিড় করতে থাকে।)

কারখানা কর্মী-১ঃ পাগলটা কারখানার ভিতরে ইট মেরে যাচ্ছে আর আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

পথচারি-১ ঃ ওকে আমরা বহুবার বলেছি। কথা না শুনলে আমরা কি করতে পারি?

কারখানা কর্মী-২ঃ তাই বলে ও ইট মেরে যাবে। একজন কর্মী অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। যদি মাথায় পড়তো, কি হতো বলুন তো?

পথচারী-৩ ঃ দেখুন আপনারাই তো বললেন ও পাগল। পাগল কি কারো কথা শোনে।

পথচারি-২ ঃ আমরা বোঝার চেষ্টা করছিলাম- কারখানার প্রতি ওর এত রাগ কেন?

পথচারি-১ ঃ শুধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে বলছে - জল-জল-নোংরা জল, নদী-নদী-। মনে হলো কারখানার নোংরা জল নদীতে পড়ছে। এটা নিয়ে কিছু বলতে চাইছে।
(বিজ্ঞান মঞ্চের দুই কর্মী মঞ্চে প্রবেশ করে)

বিজ্ঞান কর্মী ঃ হ্যাঁ ও বলতে চায়। বলতে চায় ওই কারখানা থেকে যে জল নদীতে এসে পড়ছে তা আসলে বিভিন্ন ধরনের অজৈব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে ভরা। ওই পদার্থ নদীর জলে মিশে মাছ, উদ্ভিদ কণা, প্রাণী কণা প্রভৃতি জীবজগতকে রোগগ্রস্ত দূর্বল করে দিচ্ছে এবং ধ্বংস হতে হতে বিলুপ্তির পথে এগোচ্ছে।

পথচারি-১ ঃ তাহলে তো নদীর মাছের মাধ্যমে আমরাও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ খাচ্ছি।

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ খাচ্ছেন। আর ও সেটারই প্রতিবাদ করছে।

কারখানা কর্মী-২ ঃ আরে মশাই শুধু কারখানার জলই দেখছেন। নদীতে মলমূত্র ত্যাগ করছে, ঠাকুর বিসর্জন দিচ্ছে, শ্মশানের আবর্জনা, সব মানুষের ময়লা জল, মৃত জন্তু ও অর্ধেক পোড়ানো মানুষের মৃতদেহ নদীতে ফেলছে তাতে নদী নোংরা হচ্ছে না, অপবিত্র হচ্ছে না?

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ ঠিক, একদম ঠিক। আর একথাগুলোই তো আমাদের সবার কথা হওয়া উচিত।

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ তাহলে আসুন আমরা সবাই নিজেদের ঘর থেকেই শুরু করি। আপনারা কারখানার কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে শুরু করুন;কারখানার বিষাক্ত নোংরা জল নদীতে ফেলা যাবে না।

কারখানা কর্মী-১ ঃ না না তা হয় নাকি, তাহলে তো দুদিনেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।

কারখানা কর্মী-২ ঃ প্রায় দেড় হাজার কর্মী বেকার হয়ে যাবে, এবং তাদের পরিবার চলবে কি করে; না খেতে পেয়ে, মারা যাবে।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ তুমি কয়েক হাজারের কথা বলছ। কিন্তু এই বিষাক্ত পদার্থ যদি সরাসরি বা অন্যভাবে আমাদের দেহে ঢোকে তাহলে এই রাজ্যবাসী বা দেশবাসীও আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

কারখানা কর্মী-২ ঃ নদীর দু'পারে এত কারখানা যুগ যুগ ধরে চলছে , ওই জলে কারো কিছু হয়নি, আর এইসব ফালতু কথা বলে সবাইকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ যদি বাস্তব অবস্থাটা বুঝে আপনাদের ভয় লাগে তবেই ভয় পান এবং ভয়কে কাটাবার জন্য আমাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে যা যা করণীয় তা করার চেষ্টা করি।

কারখানা কর্মী-২ ঃ দেখুন আমরা বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মী, তাই আমাদের আবেদন-

পথচারি -১ ঃ এক মিনিট ভাই, বহু মানুষ কারখানায় কাজ করে বেঁচে আছে। ওই নোংরা দূষিত জল কারখানাকে তো ফেলতেই হবে।

কারখানা কর্মী-২ ঃ না, আমরা বলব- ওই নোংরা জল ফেলবেন না। বৈজ্ঞানিকভাবে ওই জল পাত্রে রাখুন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নোংরা বিষাক্ত জল থেকে

নোংরা ও বিষটা তুলে নিন এবং পরিষ্কার জলকে পুনরায় কারখানায় ব্যবহার করুন।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ আমি এই প্রকৃতির ক্রোড়ে জন্ম নিয়েছি, লালিত হচ্ছি আমার দায়িত্ব পরিমিতভাবে, সুচিন্তিতভাবে ভোগ করা। যাতে এই প্রকৃতির কোন ক্ষতি না হয়, লক্ষ কোটি বছর ধরে সমগ্র জীব জগত যেন এই প্রকৃতিকে ভোগ করতে পারে।

বিজ্ঞানকর্মী ১ ও ২ঃ " এই পৃথিবীর যাহা সম্বল
বাসে ভরা ফুল রসে ভরা ফল
সুস্নিগ্ধ মাটি সুধাসম জল
পাখির কন্ঠে গান
সকলের এতে সম অধিকার
এই তার ফরমান...."
(পাগলভাই এই কবিতার সাথে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলা মেলায়, কবিতা বলতে বলতে বিজ্ঞানকর্মী ১ ও ২ পাগলভাই এর বাঁধন খুলে দেয়)

পাগলভাই ঃ এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল্ ছলছল্-
ভেদ করো কঠিনের ক্রুর বক্ষতল কলকল্ ছলছল্।।
এসো এসো উৎস স্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে
এসো হে নির্মল কলকল্ ছলছল্।।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ ও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছে। বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা ছাড়া আমাদের বাঁচার পথ নেই। কিছুক্ষণ বৃষ্টি হবার পর সেই জল সংগ্রহ করুন। বৃষ্টির জলই সবচাইতে পরিষ্কার নিরাপদ পানীয়।

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ ১০০ বর্গমিটার ছাদ থেকে ৭৬,৮০০ লিটার ভাল জল সংগ্রহ করা যেতে পারে।

কারখানা কর্মী-১ঃ কিন্তু কেন এত ঝামেলা করে জল ধরে রাখতে হবে কেন?

কারখানা কর্মী-২ঃ দেখুন ভাই এসব উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না, আমাদের গভঃমেন্ট তো বলে নি আর কলে জল সাপ্লাই করবে না।

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ কিন্তু না থাকলে দেবে কি করে?

কারখানা কর্মী-১ঃ নেই মানে? পুকুর, নদী নালা, খাল-বিল, সরকারের সাপ্লাই জল, সবই আছে, ঠিকঠাক চলছে।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ চলছে, কিন্তু আমরা যদি সচেতন না হই, ঠিকমত জলের ব্যবহার না করি, অপচয় বন্ধ না করি, তাহলে আর চলবে না।

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ অনুমান ২০৩০ সালের মধ্যে এই জলের চাহিদা যোগানের থেকে ৪০ শতাংশ বেড়ে যাবে। ২০১৫ সালে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম জলের

অভাবকে আগামী দশকে পৃথিবীর সবচাইতে বড় সংকট হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ আমাদের এটাও জানা দরকার- ভবিষ্যতে পারমানবিক বা রাসায়নিক যুদ্ধের সম্ভাবনা কম, কিন্তু যুদ্ধ হবে জলের জন্য।

পথচারি-১ ঃ যুদ্ধ! জলের জন্য যুদ্ধ! কি বলছেন, এত ভয়ঙ্কর অবস্থা?

পথচারি-২ ঃ এতদিন শুনে এসেছি খনিজ তেলের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ আর এখন জলের জন্য যুদ্ধ।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ ভাবুন, প্রকৃতির দান এই জল এতকাল ছিল সহজলভ্য , মাটির উপরিতলের জল ছিল সকলের অধিকার, আর মাটির নীচের জল তার; যার হাতে আছে অর্থ, পাম্প ও বিদ্যুৎ অর্থাৎ যার হাতে আছে ক্ষমতা, ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল। নির্বিচারে মাটির নীচে চালিত হলো ডিপ টিউবওয়েল, স্যালো, পাম্প, দেদার ব্যবসা। তাই ৩০ বছরের মধ্যে জলভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবেই।

বিজ্ঞানকর্মী-৩ ঃ দেখুন ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি- পৃথিবীর তিন ভাগ জল, আর এক ভাগ স্থল। এরপরেও বলছেন জল ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ হ্যাঁ, কারণ তার পরিমাণ মাত্র ২.৫ শতাংশ। এই মিষ্টি জল রয়েছে দুই মেরুপ্রদেশের বরফের চাদরে, পর্বতের হিমবাহে, ঝর্ণায়, নদীতে, হ্রদে, বাঁধে, জলাশয়ে, জলাভূমিতে, আবহাওয়া মণ্ডলে এবং মাটির নীচে। বেশীরভাগ মিষ্টি জল রয়েছে বরফ হয়ে অথবা মাটির নীচে। কেবলমাত্র পৃথিবীর উপরিভাগে তরল অবস্থায় রয়েছে মাত্র ০.৩ শতাংশ।
(পাগলভাই কাঁদতে থাকে)

বিজ্ঞানকর্মী-১,২ ঃ কি হলো, কি হলো পাগলভাই কাঁদছ কেন, কি হয়েছে?
(পাগলভাই কেঁদেই চলে, বাকিরা সবাই ওর কাছে আসে শান্তনা দেয়।)

পথচারি-৩ ঃ তোমার কি হয়েছে, তুমি যদি না বল বুঝব কি করে?

কারখানার কর্মী-১ ঃ তুমি কিছু খাবে। ক্ষিদে পেয়েছে?
(পাগলভাই ‘না’ বোধক মাথা নাড়ায়)

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ আসলে ওর ভিতের যখন যন্ত্রণা হয়, কষ্ট হয় তখন ও কেঁদে ওঠে।

পথচারি-১ ঃ কিসের কষ্ট ওর?

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ তীব্র সংকট আসন্ন তবুও মানুষ জল অপচয় করছে, অপরিমিত অযৌক্তিক ব্যবহার করে যাচ্ছে। আর ও কিছু করতে পারছে না এটাই ওর যন্ত্রণা।

পাগলভাই ঃ Water Water everywhere but not a single drop to drink.

কারখানার কর্মী-২ ঃ ও কি বলতে চাইছে?

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ ও বলতে চাইছে- জলের আর এক নাম জীবন। সেই জীবন আজ বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। পানীয় জল প্রায় নেই।

কারখানার কর্মী-২ ঃ কে কে বিষাক্ত করছে?

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ সুসভ্য মানুষ। কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য নদী, খাল, বিলে ফেলছে। জমিতে কেমিকেল সার, কীটনাশক ব্যবহার করছে। সেই সার, কীটনাশ, পুকুর, খাল, বিল, নদীর জলকে দূষিত করছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ক্ষেপনাস্ত্র সমুদ্রের তৈলাধারগুলোতে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা করল, পারস্য উপসাগরে, আরব সাগর দূষিত হলো, জাপানে ফুকুশিমায় পরমাণু চুল্লিতে বিস্ফোরণ-তেজস্ক্রিয়তার মিশল প্রশান্ত মহাসাগরে। এ ঘাটের জলে বিষ দিলে ও ঘাটের জলও বিষাক্ত হবে।

পথচারি-২ ঃ জীব জগতের সকল প্রাণীই তো সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করে। সভ্য -শিক্ষিত মানুষের দায় ছিল এটাকে রক্ষা করার। উল্টে আমরাই নির্বিচারে একে বিষাক্ত করছি?

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ এই কথাটাই পাগলভাই বোঝাতে চাইছে, আমরা বোঝাতে চাইছি।

পথচারি-১ ঃ তাহলে এখন আমাদের করণীয়?

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ জল-জঙ্গল-মাটিকে রক্ষা করতে হবে, ব্যবসার নামে প্রকৃতিকে ধর্ষণ, লুন্ঠন হতে দেওয়া যাবে না।

পথচারি-১ ঃ আচ্ছা ভাই আমার একটা কথা পরিস্কার হচ্ছে না। আপনারা বলছেন ৩০ বছরের মধ্যেই ভূগর্ভস্থ জলের ভাঁড়ারে টান পড়বে, সংকট দেখা দেবে। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠ থেকেই জল চুঁইয়ে ভূগর্ভে সঞ্চিত হচ্ছে, তাহলে কমবে কেন?

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ সঞ্চয়টা হয়েছে হাজার লক্ষ বছর ধরে। আর মাত্র তিন দশকে ভূগর্ভের জল উত্তোলন বেড়েছে কয়েকশো গুণ নগরায়নের দাপটে শুধু কংক্রিট আর কংক্রিট; কোথাও মাটি নেই। বড় বড় জলাভূমি থেকে পরিস্রবণ হতো, রিফিল হতো। জলাভূমি বুজিয়ে হাউজিং -রিয়েল এস্টেট । উত্তোলণ বাড়লো, রিফিল কমলো।

কারখানা কর্মী-১ ঃ আপনার কথা অনুযায়ী তো বিজ্ঞান আমাদের ভয়ঙ্করভাবে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পাগলভাই ঃ না-না-না-।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ কি হলো পাগলভাই, কথাটা ভাল লাগল না।

পাগলভাই ঃ হু-হু।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ দেখুন ওর অভিব্যক্তি। প্রকৃতির নিয়মগুলো সম্যক উপলব্ধি ও

অনুধাবন করার নাম বিজ্ঞান। আমরা নিয়ম জেনেও নিজেদের কবর খুঁড়ছি। কারণ এই গ্রহটাকে রক্ষা করা নয়। বরং কত দ্রুত এর রূপ রস নিংড়ে নেওয়া যায় তার প্রতিযোগিতা চলছে— বিজ্ঞান আজ পুঁজির কারাগারে বন্দী।

কারখানা কর্মী-১ ঃ কিন্তু বাঁচার জন্য নতুন নতুন ভাবনা, সৃষ্টি সে তো বিজ্ঞানের দান। তার কোন মূল্যায়ন নেই।

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ আছে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কি জানেন- ধরুন পাথরের রুক্ষতার মধ্যে শিকড় চালিয়ে কচি সবুজ পাতার কুঁড়ির দেখা মেলে-সেখানে থাকে জাদু, বিস্ময়, ঘোর। আর সেই জানার নেশায় সেই সবুজ পাতায় কুড়িকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করি, শিকড় সমেত কচি গাছটা টেনে বের করি, পাথর সরিয়ে দেখতে চাই কোথায় লুকানো আছে প্রাণ সুধারস, তখন সুন্দরের মৃত্যু ঘটে। মাতা বসুমতীকে বিবস্ত্র করে চলে জ্ঞানের মহোৎসব। (পাগলভাই হাততালি দিয়ে নাচতে থাকে)

পথচারি-১ ঃ ওই দেখুন পাগলভাই হাততালি দিয়ে নাচছে।

পথচারি-২ ঃ আপনার কথা ওর ভালো লেগেছে তাই ওর এত আনন্দ।

পথচারি-৩ ঃ কোথায় যেন প্রাণের ছোঁয়া পেয়েছে তাই ও আজ বাধন হারা।

কারখানা কর্মী-১ ঃ আজ আমরা বুঝেছি জল পৃথিবীর সবচাইতে মূল্যবান পদার্থ।

কারখানা কর্মী-২ ঃ জল অপচয় ও জল দূষণ বন্ধ করতেই হবে।

ঐ পাঁচজন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ- জল অপচয় ও দূষণ বন্ধ করতেই হবে।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ যাক, তোমরা অন্তত: এটুকু বুঝতে পেরেছ, এরজন্য ধন্যবাদ।

কারখানা কর্মী-২ ঃ ধন্যবাদ নয়, আপনাদের আরো কিছু বলার থাকলে বলুন।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ কিন্তু আপনাদের কাজ-কর্ম-কারখানা?

পথচারি-১ ঃ একদিন একটু সমস্যা হয় হোক, তবুও বলুন একথাগুলো আমাদের সকলের শোনা উচিত। আপনারা সবাই কি বলেন?

পথচারী ও
কারখানা কর্মীরা ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ- বলুন, বলুন, শুনতে চাই।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ আমাদের কৃতকর্মের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ফলে মিষ্টি জলের ভাণ্ডার বরফ গলে যাচ্ছে। বরফগলা জল নানাভাবে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের লবনাক্ত জলে মিশছে।

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অন্তত: ১০০ কোটি মানুষ পরিশ্রুত পানীয় জল পায় না। ফলে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের জলবাহিত রোগ। শুধুমাত্র এই জলবাহিত রোগেই সারা পৃথিবীতে প্রতিবছর অসুস্থ হয় পঞ্চাশ কোটি মানুষ।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ জলবাহিত পেটের রোগে প্রতিবছর পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেয় পঞ্চাশ লক্ষ শিশু। আর আমাদের দেশে শুধু ডাইরিয়াতেই মারা যায় পনেরো লক্ষ শিশু।

বিজ্ঞানকর্মী-২ ঃ মাটির নীচের জলে বহুক্ষেত্রেই আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড পাওয়া গেছে। আর্সেনিক দূষিত জল খেলে শরীরে কালো ছোপ ও সমস্ত হাতে পায়ে গুটি দানা দেখা দেয়।

বিজ্ঞানকর্মী-১ ঃ পৃথিবীতে এখন ১১ শতাংশ মানুষ চরম জলাভাবে রয়েছে। আর আমাদের দেশে ৪.৫% অর্থাৎ ৪ কোটি ১১ লক্ষ গ্রামবাসী নিরাপদ পানীয় জল পাচ্ছে না।

বিজ্ঞান কর্মী-২ ঃ বেশী মানুষ জল পায় না এমন দেশের তালিকায় পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের মধ্যে রয়েছে ভারতবর্ষ।

বিজ্ঞান কর্মী-১ ঃ পশ্চিমবঙ্গে ৭৮ লক্ষ মানুষ নিরাপদ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। এর উপরেই রয়েছে রাজস্থান। ৮২ লক্ষের বেশী মানুষ.....।
(পাগলভাই কেঁদে ওঠে। সবাই পাগলভাইকে ধরে শান্তনা দেয়।)
আমারই ভুল হয়েছে। পাগলভাই যে রাজস্থানবাসী ভুলেই গিয়েছিলাম।

পথচারি-১ ঃ ও কি নিরাপদ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত?

বিজ্ঞান কর্মী-১ ঃ ঠিক ও নয় ওর পরিবার। পাঁচ পাঁচটা মানুষ জলবাহিত রোগে ছ'মাসের মধ্যে মারা যায়। ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে দেখে পরিবারের কেউ নেই, ওর গাঁয়ের প্রায় ৪০০ লোক মারা গেছে।

পথচারি-২ ঃ ইস্ ,এতবড় বিপর্যয়।

পথচারি-৩ ঃ তারপর থেকেই বোধহয় কিরকম হয়ে গেছে?

বিজ্ঞান কর্মী-১ ঃ অফ্‌সেসিভ কম্পালসিভ ডিস্‌অর্ডার -এর সিমটম দেখা যায়। জল নোংরা হচ্ছে, জল অপচয় হচ্ছে দেখলেই রেগে যায়, চিৎকার করে, মার খায় তবুও থামে না। ভাবে পাগল অথচ উনি ছিলেন একজন প্রফেসর।

কারখানা কর্মী-১ঃ ছি, ছি এত গুণী মানুষকে আমরা পিঠ মোরা করে বেঁধেছি।

কারখানা কর্মী-২ঃ আমরা তো ওরকম চুল দাড়ি পোশাক দেখে ভেবেছি এটা পাগল।

পথচারি-১ ঃ উত্তরপ্রদেশের জি. ডি.আগরওয়াল গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে , গঙ্গার নাব্যতাকে বাঁচাতে কতবার অনশন করেছেন। প্রশাসন কথা দিয়েও কথা রাখেনি। শেযে অনশন করতে করতেই মারা যান।

বিজ্ঞান কর্মী-২ ঃ তবু লড়াই চলেছে, চলবে। পাগলভাই লড়াই করছে আমরা আপনারা এ লড়াইতে যুক্ত হই, নাহলে আমরা কেউ বাঁচব না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিয়ে যেতে পারব না সুস্থ সুন্দর পৃথিবী।

বিজ্ঞান কর্মী-১ ঃ আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে জলের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য। একদল গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর , এক রাজ্যের সাথে অন্য রাজ্যের, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যুদ্ধ ভবিতব্য।

বিজ্ঞান কর্মী-২ ঃ তাই আসুন জল রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হই, জনসচেতনতা আন্দোলন গড়ে তুলি।

বিজ্ঞান কর্মী-১ ঃ জলই জীবন, জল অপচয় বন্ধ করুন।

বাকিরা ঃ বন্ধ করুন, বন্ধ করুন।

বিজ্ঞান কর্মী-১ ঃ "জল ধরুন,জল ভরুণ"- বৃষ্টির জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করুন।

বাকিরা ঃ ব্যবহার করুন, ব্যবহার করুন।

বিজ্ঞান কর্মী-১ ঃ জল প্রকৃতির দান, জল নিয়ে ব্যবসা বন্ধ করুন।

বাকিরা ঃ বন্ধ করুন, বন্ধ করুন।

স্লোগান নিচু স্বরে চলতে থাকে।

বিজ্ঞান কর্মী-১ ঃ গ্রীষ্মের খর দহনের পর পূবালি হাওয়ায় আকাশে মেঘ জমেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। তবুও মেঘ হতে জল ঝরছে না। সব শুকিয়ে গেল, পৃথিবী বন্ধ্যা হয়ে রইল।

পাগলভাই ঃ কালী মেঘা ... কালী মেঘা... পানী তো বর্ষাও....

সবাই গান গাইতে শুরু করে। বৃষ্টি পড়ে। পাগলভাইকে নিয়ে নাচতে শুরু করে।

লেখক : **মৃণাল দে,** জনপ্রিয় নাটককার, পশ্চিমবঙ্গ।

নতুন শ্রাবণ

সংগীতা চৌধুরী

(পর্দা খুললে দেখা যায় স্টেজ ডাউনে শুধু আলো। দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইসেল শোনা যায়। ট্রেনটা এগিয়ে আসার আবহ। হঠাৎ একটা মেয়ে, বয়স উনিশ কুড়ি মঞ্চের মাঝখান থেকে দৌড়ে এসে মঞ্চ থেকে ঝাঁপ দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন মধ্যবয়স্ক লোক ঝাঁপ দিয়ে মেয়েটাকে দর্শকের দিকে সরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি ট্রেন চলে যাওয়ার আবহ। ট্রেনের আলো দর্শকের মধ্যে দিয়ে এমনভাবে যায় মনে হয় ট্রেনটা দর্শক আর মঞ্চের মাঝখান দিয়ে চলে গেলো। লোকটা উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটার হাত ধরে।)

মেয়ে ঃ What the hell, কী চাইছেন টা কী আপনি? How dare you touch me? কোন সাহসে ছোন আমায়? Now speak up, Say something.চুপ করে আছেন কেন?

[ভদ্রলোক ওঠেন। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটি ভয় পায়] কী হল । ওইভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? কী চান আপনি? What the hell? Do you want to rape me? Say something.

[ভদ্রলোক ঘুরে ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে যায়, মেয়েটি দেখার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না উনি কী চান। লোকটি কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসে।]

আপনি কোনো কথা বলছেন না কেন? কী চান আপনি? বলুন। কেন বাঁচালেনআমায়?

(মেয়েটি ভদ্রলোকের দিকে তেড়ে যায়। ভদ্রলোক মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়)

এবার কিন্তু আমি চিৎকার করব। লোক জড়ো করব।

নগেন ঃ করো চিৎকার। এখানে তোমায় বাঁচাতে কেউ আসবে না। তবে তোমার চিৎকার শুনে পুলিশ মামা আসতে পারে। তারপর কী হবে তুমি নিশ্চয়ই জানো। তখন কিন্তু তোমায় আমি বাঁচাতে পারবো না।

মেয়ে ঃ চাইও না আমি বাঁচতে। আপনি কেন বাঁচালেন আমায়। আমি মরতে চাই।

নগেন ঃ বেশ। মরতে যদি চাও তো আমার সাথে থাকো।

মেয়ে ঃ জল।

নগেন ঃ আবার জল। দিচ্ছি। এরপর আবার খাবার টাবার চেয়ো না কিন্তু। দিতে পারবো না। তাছাড়া আর তো কয়েকটা ঘন্টা।

মেয়ে ঃ কিসের?

নগেন ঃ মরার। সকাল ছ'টার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দেব।

মেয়ে ঃ তাহলে এখন নয় কেন?
নগেন ঃ কারণ তোমাকে এখন আমার খুব দরকার। খুব।
মেয়ে ঃ আমাকে?
নগেন ঃ হ্যাঁ, তোমাকে। তোমাকেই তো বোধহয় আমি খুঁজে চলেছি।
মেয়ে ঃ আমাকে খুঁজছেন।
নগেন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে। না ঠিক তোমাকে নয়। তোমার মতো একজনকে যে এক্ষুণি মরতে চায়। এই তোমার কেসটা জেনুইন তো?
মেয়ে ঃ মানে?
নগেন ঃ মানে, তোমার এই মরতে চাওয়ার ইচ্ছেটা, জেনুইন তো?
মেয়ে ঃ ১০০% জেনুইন। আমি আর এক মুহূর্তও এই পৃথিবীতে থাকতে চাই না।
নগেন ঃ গুড।
মেয়ে ঃ হ্যাঁ?
নগেন ঃ তোমার এই চাওয়াটা, গুড। এটাকে জিইয়ে রাখো। আর তো কয়েক ঘন্টা। ভোর সাড়ে পাঁচটায় একটা সুপার ফাস্ট ট্রেন যায় এখান দিয়ে। ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণে ছোট্ট একটা লাফ। ব্যাস। তোমার শরীরটা থেতলে মেতলে, এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে-মাথায় ঘিলু-টিলু রক্তে কাদায় মিলে-মিশে।
মেয়ে ঃ আহ। চুপ করবেন।
নগেন ঃ চুপ।
মেয়ে ঃ বাজে না বকে, আমাকে আপনার কী দরকার সেটা বলুন।
নগেন ঃ আমার একটা উপকার করতে হবে মা।
মেয়ে ঃ shut up. মা'টা বাদ দিয়ে কী করতে হবে বলুন।
নগেন ঃ একটা সামান্য কাজ।
মেয়ে ঃ সামান্য কাজ। সামান্য যখন, নিজেই করুন।
নগেন ঃ পারবো না। কারণ আমি যে বাঁচতে চাই।
মেয়ে ঃ মানে?
নগেন ঃ মানে, আমার মতো ভীরু কাপুরুষ মানুষ কোনো দিন কোনো ভাল কাজ করেছে? তার জন্য দরকার তোমাদের মত মানুষ। যাদের কাছে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য।
মেয়ে ঃ কী করতে হবে সেটা বলুন।
নগেন ঃ বলছি। অতো তাড়া নেই। ভোর সারে পাঁচটা পর্যন্ত টাইম আছে তো। দাঁড়াও দেখি মামা জেগে আছে কিনা।
মেয়ে ঃ একটু জল চেয়েছিলাম।
নগেন ঃ ওহ। সরি সরি। (জল আনতে যায়। মেয়েটা বসেই থাকে) এই নাও, খাও।
মেয়ে ঃ আপনি এখানেই থাকেন?

নগেন ঃ আমি কোথায় থাকি জেনে কী হবে? জল তো পেয়েছো। আমি দেখে আসি মামা ঘুমালো কিনা।

মেয়ে ঃ ওদিকে কারা কথা বলছে যেনো।

নগেন ঃ ও কিছু না। নাইট গার্ড। রেলের মামা।

মেয়ে ঃ না। সাথে দুজন আছে। এদিকেই আসছে।

নগেন ঃ তো, কী হয়েছে?

মেয়ে ঃ কী হয়েছে বুঝতে পারছেন না? আমাকে এতো রাতে এখানে দেখলে নিয়ে যাবে। হয়তো আমাকেই খুঁজতে এসেছে, আমি আর বাঁচতে চাই না। প্লিজ কিছু করুন। আমাকে বাঁচান।

নগেন ঃ চিন্তা করো না, কাল সকাল ছটার মধ্যেই তোমার বাঁচার পথ আমি দেখিয়ে দেবো সুপার ফাস্ট ট্রেন। শুধু একটা শর্ত।

মেয়ে ঃ যে কোনো শর্তে আমি রাজি।

নগেন ঃ কথা দিচ্ছো, মরার আগে আমার কাজটা করে দেবে?

মেয়ে ঃ কথা দিচ্ছি, প্রমিস।

নগেন ঃ ঠিক আছে যাও। আমার দোকানের ভিতরে ঢুকে যাও। একটাও শব্দ করবে না। এদিকটা আমি সামলাচ্ছি। (একটা পুলিশ ঢোকে)

পুলিশ ঃ কাকা, একটা মেয়েকে দেখেছো?

নগেন ঃ একটা কেন, কতো মেয়েই তো দেখলাম।

পুলিশ ঃ আরে ধূর, মাঝ রাতে খিল্লি মেরো না তো। আধঘন্টার মধ্যে কোন মেয়েকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছো এখানে?

নগেন ঃ না । এই এখানে হাত ধুবি না। যা কলে ধুয়ে আয়। যা ।

পুলিশ ঃ আরে একটু মনে করে দেখো না।

নগেন ঃ আরে না। বললাম তো দেখিনি। লাস্ট ট্রেন যাওয়ার পর এখানে কোন ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে, কাউকেই দেখিনি। কেসটা কী?

পুলিশ ঃ আরে যতো উটকো ঝামেলা। বড়ো লোকের আদুরে মেয়ে কোথায় না কোথায় ফূর্তি মারাবে, তা মারানা কে বারণ করেছে- তা বলে যা। রাত্রিবেলা এই লাফরা শালা। সাতটা প্যাঁচা মরলে একটা পুলিশ জন্মায় বুঝলে। (বাইরের চলে যায়) ও দাদা, এখানে নেই।

নগেন ঃ (রানী হাত ধুতে যায়) এই এখানে হাত ধুবি না । যা কলে ধুয়ে আয়। যা। (একজন ছেলে ও ভদ্রমহিলা ঢোকেন)

বন্ধু ঃ ও নগেনকা সন্ধ্যের পর কোনো মেয়েকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ নাকিগো?

নগেন ঃ নারে

বন্ধু ঃ নাগো কাকিমা ওখানে কেউ নেই।

মা ঃ নেই

পুলিশ ঃ ওই দেখ কাকিমা আবার ... কাকিমাকে সেই কখন থেকে বলছি নেই নেই।

বন্ধু ঃ কাকিমা তুমি একটু এখানটায় বোস তো। কাকা তুমি একটু মনে করে দেখো না ।

মা ঃ (মোবাইল বের করে দেখায়) একে এখানে কোথাও দেখেছেন? একটু দেখে বলুন না প্লিজ।

নগেন ঃ দেখি (দেখে) নাহ।

মা ঃ একটু ভালো করে দেখুন। যদি মনে পড়ে। কত লোক তো আসে এখানে,তাই-

পুলিশ ঃ সত্যি মাইরি, মাথাটা কী একেবারেই গেছে আপনার। এটা কী বাড়ির উঠোন মশাই? এটা স্টেশন, স্টেশন। প্রতিদিন কতো লোক যাতায়াত করে, কোনো আন্দাজ আছে আপনার? একটা মোবাইলের ছবি দেখিয়ে বলছে দেখেছে কী না। আরে মোবাইলে সবাইকে ফিল্মস্টার লাগে বুঝেছেন, কারুর বাপের ক্ষমতা নেই চেনার, যত্তসব। আর কাকা এখন দোকানদারি ছেড়ে মেয়েছেলে দেখে বেড়াক।

বন্ধু ঃ আমি কথা বলছি তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো না। বলছি কি লাস্ট ট্রেন যাওয়ার পর প্ল্যাটফর্মে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছো কাকা?

পুলিশ ঃ কী কাকা, দেখেছো নাকি কাউকে ঘোরাঘুরি করতে। শালা এটা স্টেশন নাকি পার্ক।

বাবা ঃ বলছি কী দাদা, আপনি তো এখানেই থাকেন, কেউ ঝাঁপ-টাপ দেয়নি তো? (মা কেঁদে ওঠে)

নগেন ঃ নানা, সত্যি আমি কাউকে দেখিনি। আর ঝাঁপ দিলে সেটা কী চাপা থাকে?

বন্ধু ঃ এক কাজ করি আমি বরং প্ল্যাটফর্মের ওই দিকটা একছুটে দেখে আসি।

পুলিশ ঃ দাঁড়াও। এক ছুটে দেখে আসি। গিয়েই তো একটা সেলফি তুলবে, তারপর ফেসবুকে পোস্টাবে, ব্যাস কালকেই ভাইরাল হয়ে যাবো- 'যুবতি মেয়ের খোঁজ না করে সারা রাত ঘুমালো পুলিশ'। লাইক-কমেন্ট-শেয়ার-শালা। থাক আপনাদের আর উঠতে হবে না। বসে থাকুন এখানে। এতো রাতে খালি হাতে কাজ হয়। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবেন না।

মা ঃ না, আমরাও যাব।

পুলিশ ঃ লে হালুয়া। এ তো মহা ঝামেলা। পুলিশকে পুলিশের কাজ করতে দিন। মেয়েছেলে মানুষ বসে থাকুন এখানে।

বন্ধু ঃ কাকিমা তুমি এখানে বসো, আমি যাচ্ছি। লনগেনকা খুব ভালো মানুষ। আমরা রোজ চা খাই এখানে। কাকা একটু দেখো হ্যাঁ। এক ছুটে যাব আর আসব।

পুলিশ ঃ এই এতো ছুটোছুটি কর কেন গো? হাঁটতে টাটতে পার না। সরকারি কর্মীরা কেউ ছুটে ছুটে কাজ করতে পারে না, শরীরটা দেখছ না, হেঁটে হেঁটে চলো। (দুজনে চলে যায়)

নগেন ঃ জল খাবেন?

মা ঃ হু?

নগেন ঃ জল? দেব একটু ? খাবেন?

মা ঃ না। আপনি ঠিক দেখেছেন?

নগেন ঃ কী?

মা ঃ না মানে, কাউকে দেখেননি তো?

নগেন ঃ মেয়ে?

মা ঃ হু।

নগেন ঃ বয়স কতো?

মা ঃ কুড়ি। (রানী হাত ধুয়ে আসে) ও কে?

নগেন ঃ ভয় পাবেন না । ও আমার মেয়ে। (রমণীকে বলে) শুয়ে পড়। গায়ে চাদর দিয়ে নিবি।

মা ঃ ও আপনার মেয়ে?

নগেন ঃ হম।

মা ঃ আপনার নিজের মেয়ে?

নগেন ঃ নিজের মনে করলেই নিজের।

মা ঃ মনে করলেই কী নিজের হয়?

নগেন ঃ হয় বইকি।

মা ঃ হয় না। হয় না। আমার স্বামী আমাকে বলেছিল, হয় না। আমি বিশ্বাস করতাম না। ও বলেছিল সব বলে দাও, আস্তে আস্তে। আমি ভয় পেতাম। হারানোর ভয়। এখন কী হলো।

নগেন ঃ আপনার মেয়ে হয়তো কোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে।

মা ঃ আচ্ছা, বাবা যদি ‘A পজিটিভ হয় আর মা ‘ AB পজিটিভ’ , তাহলে তাদের মেয়ে কী কোনভাবেই ‘O পজিটিভ’ হতে পারে না? কোনভাবেই?

নগেন ঃ হতেও পারে।

মা ঃ পারে না। পারে না। ‘A পজিটিভ বা ‘ B পজিটিভ’ হবে। মেডিকেলের স্টুডেন্ট কী ভুল জানবে? সত্যিই হতে পারে না।

নগেন ঃ আপনার মেয়ে ডাক্তারি পড়ছে?

মা ঃ হ্যাঁ। ফার্স্ট ইয়ার।

নগেন ঃ ওর বন্ধুদের ফোন করেছেন?

মা ঃ করেছি। কোথাও নেই।

নগেন ঃ তাহলে ওর পিসির বাড়ি, মাসির বাড়ি বা কাকা জ্যাঠার বাড়ি?

মা ঃ নেই নেই। কেউ নেই।

নগেন ঃ লোকাল হাসপাতালে?

মা ঃ ভয় করছে।

নগেন ঃ তাহলে আপনারা এখানে এসেছেন কেনো? ও কি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে কলেজে যেতো?

মা ঃ না আমাদের গাড়ি আছে। ও ডাক্তারিতে চান্স পাওয়ার পর ওর বাবা গাড়ি কিনে দেয়। কলেজে যাওয়ার জন্য।

নগেন ঃ তাহলে এখানে খোঁজ করেছেন কেনো?

মা ঃ আমি জানি, ও নিজেকে শেষ করে দেবে। ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেওয়াটাই সহজ পথ।

নগেন ঃ কিন্তু কেনো?

মা ঃ হ্যাঁ?

নগেন ঃ ঝাঁপ দেবে কেনো?

মা ঃ ও যে জানতে পেরেছে ও আমাদের মেয়ে নয়।

নগেন ঃ সত্যি?

মা ঃ কী?

নগেন ঃ ব্যাপারটা? ও কি সত্যি আপনাদের নয়?

মা ঃ জন্ম দিলেই সত্যি। আর ছোট্ট থেকে ভালবেসে বড়ো করাটা মিথ্যে? সব মিথ্যে?

নগেন ঃ জানলো কী করে?

মা ঃ আমার কপাল। ডাক্তারি পড়ছে তো। তো কাল এসে বলল, আমার ব্লাড গ্রুপ 'O পজিটিভ' আমার স্বামীর ' AB পজিটিভ' তাই আমাদের সন্তান 'O পজিটিভ' হতেই পারে না। ওর ব্লাডগ্রুপ 'O পজিটিভ'। এরকম যে হয় আগে কখনো শুনিনি।

নগেন ঃ তরপর?

মা ঃ সব বললাম। মনে হয় বুঝলো। রাতে আমি নিজে হাতে খাইয়ে দিলাম। সকালে ঠিকই ছিলো। একটু থমথমে। তারপর ফোনে কার সাথে যেনো কথা বললো, অনেকক্ষণ, দরজা বন্ধ করে। বিকেলে ওর বাবা ফ্যাক্টরি গেলো। আমাদের রেডিমেড গারমেন্টের ফ্যাক্টরি আছে । আমি সোফায় বসেই ছিলাম। বসে বসেই চোখটা লেগে গিয়েছিল, সারা রাত ঘুম নেই। সন্ধ্যাবেলা একগ্লাস দুধ নিয়ে ওর ঘরে গিয়ে দেখি, ঘরে নেই। ঘরে নেই, ছাদে নেই, কোথাও নেই।

নগেন ঃ আপনার মেয়ের ছবি সাথে থাকলে দিয়ে যান। এখানে যদি আসে আমি চিনতে পারবো। আর আপনাদের ফোন নম্বরটা।

মা ঃ ট্রেনে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম জানেন। একটা নোংরা কাঁথার মধ্যে। পাঁচ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর ওর মা বাবা হলাম আমরা। এই এত্তটুকু থেকে বুকে করে

এতবড়ো করার পর 'A পজিটিভ' ' B পজিটিভ' 'O পজিটিভ' বড়ো হলো, ভালবাসা নয়।

নগেন ঃ ভেঙে পড়বেন না। বাচ্চা মেয়ে, অভিমান হয়েছে। ঠিক ফিরে আসবে।

মা ঃ আসবে বলছেন।

পুলিশ ঃ না বৌদি, কোথাও কোন সুইসাইড কেস নেই।

মা ঃ উনি তোমার ফোন নম্বরটা আর মামনের একটা ছবি চাইছিলেন।

বাবা ঃ (কার্ড দেয়) এতে আমার ফোন নম্বর আছে। যদি দেখেন একটা ফোন করবেন প্লিজ।

নগেন ঃ এভাবে কেন বলছেন, অবশ্যই করবো।

পুলিশ ঃ কোন কলেজে পড়তো মেয়ে?

বন্ধু ঃ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ।

পুলিশ ঃ তোমার কাছে জানতে চেয়েছি? ওখানকার-বন্ধু-টন্ধু কে ফোন করেছেন?

মা ঃ হ্যাঁ। ওরা কিছু বলতে পারছে না।

পুলিশ ঃ অঃ। তা কোনো বয়ফ্রেন্ড-টয়ফ্রেন্ড ছিল নাকি?

বন্ধু ঃ বয় ওর ফেস দেখতে তো ফ্রেন্ড হবে। ফেস তো always book- এ ঢাকা-- book মানে বই। মেডিকেলে হেব্বি rank করেছে।

পুলিশ ঃ তাই? বেশ। তা তোমার সাথে ওর সম্পর্ক?

বন্ধু ঃ ছোটোবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি। পাশাপাশি বাড়ি। মাঝে শুধু একটা পাঁচিল।

পুলিশ ঃ তা দিনে ক'বার টপকাতে পাঁচিল?

বন্ধু ঃ কী বলতে চাইছেন আপনি?

পুলিশ ঃ ন্যাকামি হচ্ছে? থানায় রুলের গুঁতো খেলে না, সব ন্যাকামি পিছন দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

মা ঃ আপনি ভুল ভাবছেন। ছোটন ওইরকম ছেলে না।

পুলিশ ঃ আপনি জানেন না কাকিমা এখনকার ছেলেদের।

বন্ধু ঃ আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি কি আমাকে ওর বয়ফ্রেন্ড ভাবছেন? একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মধ্যে এছাড়া আর কোনো সম্পর্ক ভাবতে পারেন না, তাই না?

পুলিশ ঃ তা আর কী কী সম্পর্ক হয় শুনি?

মা ঃ আমিতো আপনাকে বলছি ছোটন ভাল ছেলে, পাড়ার যে কোন সোশ্যাল ওয়ার্কে ও থাকে। আপনি আমার মেয়েটাকে একটু খুঁজে দিন please. (ছোটন মোবাইলটা বের করে ফোন করার জন্য)

পুলিশ ঃ এই এই মোবাইল বের করবে না। ঢোকাও ঢোকাও। এই এক হয়েছে

মোবাইলে ক্যামেরা যাচ্ছেতাই (মা কে) কোন স্কুল থেকে H.S পাশ করেছিল মেয়ে?

মা : H.S না ISC 12th Exam, ICSC Board। সেন্ট স্টিফেন স্কুল।

পুলিশ : কো-এড

মা : হুম।

পুলিশ : ব্যস। বৃন্দাবনে ভর্তি করিয়েছিলেন তো। রাধা-কেষ্ট একসাথে। কেষ্টর সাথেই পালিয়েছে কনফার্ম।

বন্ধু : সুইসাইড অ্যাটেমপ্ট-ও-তো করতে পারে।

পুলিশ : তা পারে। তবে সেটাও ঐ বয়ফ্রেন্ডের কারণেই।

বন্ধু : সে যে কারণেই হোক, একটু ভালো করে খুঁজে দেখা-তো আপনাদের দায়িত্ব।

পুলিশ : দায়িত্ব! পুলিশকে দায়িত্ব শেখাচ্ছো খোকা। নাক টিপলে-তো এখনো দুধ বেরবে। রাতে ষ্টেশনে ঘুরলে ফাটকে পোরা যে আমার দায়িত্ব সেটা জানো?

মা : দেখুন আমরা বাধ্য হয়ে এসেছি। ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। আমার মেয়েটাকে দেখুন please.

পুলিশ : দেখুন বৌদি মেয়েছেলেরা সুইসাইড করতে হয় গলায় দড়ি দেয় বা বিষ খায়। যা করার বাড়িতেই করে স্টেশনে আসে না। History নেই। ও পালিয়েছে কনফার্ম। যাই হোক এটা লোকাল থানার কেস, ডাইরি করেছেন?

বন্ধু : হ্যাঁ। কাকু আর আমার বাবা থানায় গেছে।

পুলিশ : আর তুমি বেড়েপাকা মাঝরাতে একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আমার পোঁদে পোঁদে ঘুরছো। কিছু হয়ে গেলে সামলাতে পারবে।

মা : আসলে আমরা খুঁজে দেখছিলাম। বোঝেনই তো বদনামের ভয়।

পুলিশ : আমার আবার চাকরির ভয়। গোটা দুনিয়াটা ভয়ে ছেয়ে গেলো মাইরি। চলুন চলুন আমার চাকরিটা খাবেন দেখছি, এত রাতে স্টেশনে থাকা যায় না। কাল সকালে এসে যত খুশি থাকবেন আর কাকার চা খাবেন।

মা : একটু দেখবেন দাদা। কাল সকালে আমি আবার আসবো।

পুলিশ : আরে ধুর শালা চলুন না। চলুন চলুন।

(ওরা চলে যায়। নগেন দেখে তারপর মেয়েটাকে ডাকে)

নগেন : বেরিয়ে এসো। ওরা চলে গেছে।

(মেয়েটা বেরিয়ে আসে। দর্শকের দিকে পিছন করে বেঞ্চে বসে)

নগেন : খাবে কিছু?

মেয়ে : না। না।

ন্নগেল : নাম কী তোমার?

মেয়ে : বাস্টার্ড।

নগেন : কী ? কী নাম?

মেয়ে ঃ বাস্টার্ড। বাস্টার্ড। শোনেননি কখনো?
নগেন ঃ বাপের জন্মে না।
মেয়ে ঃ তাহলে ডাকনামটা বলি? বেজন্মা।
নগেন ঃ কী?
মেয়ে ঃ বেজন্ম। বেজন্মা। এটা তো শোনা উচিৎ। নাকি ঘেন্না করছে? আরও শুনবেন, ওই যে ভদ্রমহিলা আপনার সাথে গল্প করছিলেন, ওই ভদ্রমহিলা একজন মিথ্যেবাদী।
নগেন ঃ জানি।
মেয়ে ঃ জানি মানে?
নগেন ঃ জানি মানে জানি। বুঝতে পেরেছি।
মেয়ে ঃ কী বুঝতে পেরেছেন?
নগেন ঃ ওই মিথ্যেবাদী ভদ্রমহিলা তোমার মা।
মেয়ে ঃ জেনেও আপনি কিছু বললেন না?
নগেন ঃ না বললাম না। এবার বুঝতে পারছেন তো আমি কতটা জেনুইন? আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারো। ভোর সাড়ে পাঁচটার সুপার ফাস্ট ট্রেনে-
মেয়ে ঃ ঠিক আছে। ঠিক আছে। এখন তিন'টে বাজে, আরও আড়াই ঘন্টা আমাকে সহ্য করতে হবে। অবশ্য আপনি আমাকে ঘেন্না করতেই পারেন, আমি নিজেকেই নিজে ঘেন্না করি।
নগেন ঃ আমি যে ভালোবাসতে ব্যস্ত মা। সময় কোথায় ঘেন্না করার।
মেয়ে ঃ ওয়াসরুম টা কোথায়?
নগেন ঃ কী? ওয়াসরুম হাঃ হাঃ হাঃ
মেয়ে ঃ পেচ্ছাপ করার জায়গাটা কোথায়? পেচ্ছাপ পেয়েছে?
নগেন ঃ ওহ। সে তো এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাথার দিকে আছে।
নগেন ঃ (কিছু না বলে যেতে থাকে) আরে দাঁড়াও, টর্চ নিয়ে যাও।
মেয়ে ঃ মোবাইলে আছে।
নগেন ঃ চল দেখি আমি যাই তোমার সঙ্গে।
(মেয়েটা রাগী রাগী চোখে তাঁকায়, তারপর চলে যায়। নগেন পিছন পিছন যায়। দুজন লোক ঢোকে। ওরা লুকিয়ে সব দেখছিল)
১ মঃ ঃ দেখে আয়তো বুড়োটা কোথায় গেলো।
২ য় ঃ মাগীটাকে নিয়ে ঝোপে গেল। । শালা, বিড়াল বলে মাছ ছোবো না।
১ মঃ ঃ এদিকে ভাবখানা এমন যেন সাধু সন্যিসি। হিমালয় থেকে এই ল্যান্ড করলেন।
২ য় ঃ ও সব দেখানো বুঝলি। শালা পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। শালা।

১ ম ঃ বাদ দে। শোন ঝোপে গেছে যখন তখন তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে মনে হয় না।
২ য় ঃ ট্যাম লাগবে গুরু ট্যাম। গুরু আমি কাজ শুরু করি।
১ মঃ ঃ খুব সাবধানে বাচ্চাটা ট্যা করে উঠলেই হলো।
২ য় ঃ কোন্ন চিন্তা করো না গুরু।
১ মঃ ঃ বেশি বাতেলা ঝারিস না তো। শোন তুই যেভাবেই হোক রানীকে সরা আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে কেটে পরবো। বুড়ো খচ্চরটা আসার আগে কাজ হাসিল করতে হবে । যা।
২ য় ঃ (যায়) রানী। রানী (চলে আসে) ধুর শালা বাচ্চাটাকে তো জাপটে ধরে শুয়ে আছে।
১ মঃ ঃ তো কী তোমায় জাপটে ধরে শুয়ে থাকবে, চাঁদু। খাজা মাল একটা। সর, আমি দেখছি।
২ য় ঃ এরম বলো না গুরু। একবার হুকুম করো মেয়েছেলেটার মাথায় বাড়ি মেরে বাচ্চাটাকে এনে দিচ্ছি।
১ মঃ ঃ চুপ মাথামোটা। গোবিন্দদা শুনলে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে দেবে।
২ য় ঃ ওর যে কী দরদ এই মেয়েছেলেটার ওপর বুঝিনা বাপু।
১ মঃ ঃ সোনার ডিম দেওয়া মুরগী চাঁদু। গোল্ড গোল্ড।
২ য় ঃ অমন মুরগী অনেক পাওয়া যায়।
১ মঃ ঃ এমন হাবা-ক্যাবলা মুরগী পাবে না চাঁদু। আর বাচ্চাগুলো? রাস্তার মেয়ে-ছেলেদের ওমন তাগরা বাচ্চা বিয়েতে দেখেছিস? আগেরটা ওই হারামি বুড়োটার জন্য ফসকে গেছে।
২ য় ঃ এটা ফস্কাবে না গুরু। ম্যায় হু না। দাঁড়াও। (রানীর কাছে যায়) রানী। রানী। কী দেখছিস অমন করে। তুই আর আমাকে ভালবাসিস না। চল যাবি না আমার সাথে। আদর করবি না। রানী। আমার রানী-
(নগেন ও মেয়েটা ঢোকে)
নগেন ঃ কে? কে ওখানে? (ওরা পালিয়ে যায়)
মেয়ে ঃ ওরা কারা?
নগেন ঃ চুপ। দোকানের ভিতর যাও। যাও। (পুলিশটা ঢোকে)
পুলিশ ঃ কী হলো আবার?
নগেন ঃ কিচ্ছু না।
পুলিশ ঃ কিচ্ছু না তো চেচাচ্ছিলে কেন? সবে দু'চোখের পাতা এক করেছি অমনি শুরু হয়ে গেল। দাও, বিড়ি দাও একটা।
নগেন ঃ নেই।
পুলিশ ঃ নেই। তাহলে যাই। (বেঞ্চে মেয়েটার ব্যাগটা দেখে থমকে দাঁড়ায়।) এটা কী? কী হলো, চমকে উঠলে যেনো?

নগেন ঃ চমকাবো কেন?
পুলিশ ঃ অ। এটা এখানে এলো কোত্থেকে?
নগেন ঃ আমি কী করে বলবো! কেউ ফেলে গেছে হয়তো।
পুলিশ ঃ আজকাল সবাই গাজা টেনে ঘোরে নাকি। ষ্টেশনে ব্যাগ ফেলে চলে যাচ্ছে। (ব্যাগটা নিতে যায়)
নগেন ঃ থাক। যার ব্যাগ সে নিশ্চয় খোঁজ করতে আসবে।
পুলিশ ঃ আসবে বলছো?
নগেন ঃ নিশ্চয় আসবে।
পুলিশ ঃ তোমাকে বলে গেছে নাকি?
নগেন ঃ আমাকে? কেন?
পুলিশ ঃ না এতো রাত হলো তাও জেগে আছো?
নগেন ঃ রাত হলেই তো শেয়াল কুকুরের উৎপাত বাড়ে। মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে না?
পুলিশ ঃ ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছি , অফিসে জমা দিয়ে দেব। কেউ আসলে অফিসে গিয়ে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নিয়ে আসতে বলো। (রানীকে জ্বালাতন করতে যায়)
নগেন ঃ আহ ওকে আর জ্বালিও না। (পুলিশ চলে যায়। মেয়েটা বেরিয়ে আসে)
মেয়ে ঃ আমার ব্যাগটা নিয়ে গেল।
নগেন ঃ হুম।
মেয়ে ঃ যাকগে। ওটা দিয়ে আমার কী হবে। (বাচ্চা কেঁদে ওঠে) ওখানে কারা? আপনার কে হয়? (নগেন কোনো উত্তর না দিয়ে দুধ আনতে দোকানের ভিতর চলে যায়)
মেয়ে ঃ ঘুমিয়ে পড়েছে?
রানী ঃ
মেয়ে ঃ দেখি একটু।
রানী ঃ
মেয়ে ঃ বাহ, খুব সুন্দর তোমার মেয়ে।
রানী ঃ
মেয়ে ঃ কী? ও বড়ো হবে? হ্যাঁ হবে তো। অনেক বড়ো হবে।
রানী ঃ (রেগে)
মেয়ে ঃ বুঝতে পারছি না তো। আচ্ছা আর একবার বলো- ঠিক করে বলো। হ্যাঁ-
রানী ঃ তুমি? তোমার মেয়ে? ও এবার বুঝেছি, আরও মেয়েরা? না? আচ্ছা-আচ্ছা
রানী ঃ
নগেন ঃ আরে দিদিমণি বুঝতে পারছে নাতো। রাগ করলেই হবে? (মেয়েটাকে বলে)

সবার কাছে ছেলের গল্প করা চাই।
(রানীকে বলে) নে খেয়ে নে। আমি দিদিমণিকে সব বুঝিয়ে বলছি।

মেয়ে ঃ ওটা ওর ছেলে? আমি ভাবলাম মেয়ে।

নগেন ঃ না না । ঠিকই ভেবেছো তুমি। এটা ওর মেয়ে। আমার ফুলপরী।

মেয়ে ঃ তাহলে ছেলের গল্প?

নগেন ঃ গল্প নয় সত্যি। একটা ছেলেও আছে ওর। ওই ওখানে। অনেক দূরে। কিন্তু আছে।

মেয়ে ঃ কি হেয়ালি করছেন বলুন তো?

নগেন ঃ হেয়ালি নয়। সত্যি। একটা ছেলে। সত্যি। একটা মেয়ে। সত্যি। তবে পেটেরটা কী, সেটা বলতে পারবো না।

মেয়ে ঃ এরকম চললেও ও বাঁচবে কী করে?

নগেন ঃ মরার উপায় নেই বলে।

মেয়ে ঃ কে বললো উপায় নেই। অনেক উপায় আছে।

নগেন ঃ তার জন্য বুদ্ধি লাগে। ওর যে সেটাও নেই।

মেয়ে ঃ কী হবে ওর?

নগেন ঃ জানি না।

মেয়ে ঃ ও এখানে এলো কী করে?

নগেন ঃ গল্প শুনতে চাও? কটা বাজে এখন?

মেয়ে ঃ সাড়ে তিন'টে।

নগেন ঃ তার মানে এখনো দু'ঘন্টা হাতে আছে। হয়ে যাবে।

মেয়ে ঃ কী হয়ে যাবে?

নগেন ঃ সাড়ে পাঁচ'টার আগেই সব হয়ে যাবে। ওর নাম কী, আমি জানি না। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এক রাতে, এই ধরো সাতটা কী আটটা, অফিস টাইমের ভীড়ে ওকে আমি আবিষ্কার করি ওখানে। এত্তবড়ো একটা পেট নিয়ে কিছুতেই এগোতে পারছিল না। অফিস ফেরতা মানুষ সবাই ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছিল, বাড়ি ফেরার তাড়া। আমি এগিয়ে যাই-

Flash back

নগেন ঃ এই, এই মেয়ে, এখানে কী করছো তুমি? পড়ে যাবে তো। এদিকে এসো। বসো এখানে । লোকজন একটু হালকা হোক তারপর যেয়ো।

Reality

নগেন ঃ এই এইখানটায় বসেছিলো ও। অনেকক্ষণ। আমি আমার দোকানের লোক সামলাতে ব্যস্ত হয়ে যাই। রাত দশটা নাগাদ দোকান থেকে বেরিয়ে দেখি, ও তখনও বসে আছে। কাছে গেলাম -

Flash back

নগেন ঃ তুমি যাওনি এখনও ?
রানী ঃ
নগেন ঃ নাম কী তোমার ?
রানী ঃ
নগেন ঃ কোথায় থাকো ? বাড়ি কোথায় ?
রানী ঃ
নগেন ঃ তোমার বরের নাম কী বাবা মা নেই ?
রানী ঃ
নগেন ঃ ঠিকানা লেখা কোনো কাগজ টাগজ আছে ?
রানী ঃ (ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা ছবি বের করে দেয়)
নগেন ঃ এটা কার ছবি ? বোঝা যাচ্ছে না তো ? তোমার বরের ?
রানী ঃ
নগেন ঃ ঠিক আছে। ঠিক আছে। তুমি এক কাজ করো, ওই বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ো। না থাক। চল আমার দোকানের পাশে চাদর পেতে দিচ্ছি, শুয়ে থাকো। সকালে দেখি কী করা যায়।

Reality

নগেন ঃ ওখানে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও ঘুমিয়ে পড়লো। আস্তে আস্তে কেমন করে জানি এই জায়গাটা ওর হয়ে গেল। ওর চাওয়াগুলোও আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারতাম। লিকলিকে চেহারার অতটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের পেটে আর একটা বাচ্চা ! মায়ায় জড়িয়ে গেলাম। ওর একটা নাম দিলাম আমি, মহারানী। বিধাতার মুখে থাপ্পড় বোধহয়একেই বলে। মহারানী। এইভাবেই চলছিল। একদিন দুপুরবেলা একটা বীভৎস চিৎকার ওই রেললাইনের ওদিক থেকে। ছুটে গেলাম। দেখি রক্তে মাখামাখি। আশেপাশের মহিলারা এসে অবস্থাটা সামাল দিল। আর রেললাইনের পাশের জঙ্গলে জন্মেও বেঁচে গেল ওর ছেলে। ছেলেকে কোল ছাড়া করতো না রানী।

Flash back

(দুটো ছেলে ঢোকে। রানীকে বিরক্ত করে)
১মঃ ঃ কীরে রানী। তোর ছেলে তো পুরো রাজপুত্তুর। রাজা কোথায় ?
রানী ঃ
২য় ঃ ঃ দে না, রাজার ছেলেকে একটু ঘুরিয়ে আনি।
রানী ঃ
১ম ঃ ঃ রানী তোর রাজপ্রাসাদটা কিন্তু ঝাক্কাস।
২য় ঃ ঃ মহারানী কি এখন আইসক্রিম খাবেন। এই দেখ তোর জন্য এনেছি। আয়। আয়। (রানী উঠে যায়। আর একটা ছেলে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়)

১মঃ ঃ এই দ্যাখ, তোর ছেলে এখন আমার।

রানী ঃ (ছুটোছুটি করে কেড়ে নেয়)

Reality

নগেন ঃ এইভাবেই চলছিল। আমার কাছে ছাড়া কারুর কাছে বাচ্চা দিত না রানী। বাচ্চাটার যখন বছর খানেক বয়স, একজন ওকে দত্তক নিতে চায়। এক নিঃসন্তান দম্পতি। ভদ্রলোক ডেলি প্যাসেঞ্জার ছিলেন। প্রথমে রেগে গেছিলাম, না করে দিয়েছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম এখানে থাকলে তো চোর ছ্যাচ্চড় বা ওয়াগন ব্রেকার হবে। খবর নিয়ে দেখলাম মানুষদুটো ভাল। ওরা সব আইনি ব্যাপার সামলে নেবে বললো। আমার রাজপুত্রের এখন পাঁচ বছর। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। কিন্তু যেদিন রাতে ওকে দিয়ে দিলাম পরেরদিন সকালে-

Flash back

(দেখা যায় রানী পাগলের মতো চিৎকার করছে)

নগেন ঃ কী জানো মা, আমি তো মানুষের মন নিয়ে পড়াশোনা করিনি কিন্তু জীবন থেকে যা শিখেছি তার ব্যাখ্যা কিভাবে আমি তোমায় দেবো জানি না। তুমি আমার মেয়ের মতো, কী ভাবে যে বলি। তবু তুমি তো ডাক্তারি পড়ছো তাই হয়তো কিছুটা হলেও বুঝবে। রানী মানসিক ভারসাম্যহীন, লোকে বলে পাগল। কিন্তু পাগলেরও একটা শরীর আছে, আর পাঁচটা মানুষের মতো তারও শরীরে ক্ষিদে আছে। একটা পুরুষ মানুষের আদর ভালবাসা পাওয়ার জন্য ও কিভাবে পাগল হয়ে উঠতো, তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। এমনই একদিন-

(দেখা যায় রানী নগেনবাবুকে আর পাঁচটা পুরুষমানুষের মতো ভেবে পাগলামি করছে, নগেনবাবু সমানে বলে চলেছে 'আমি তোর বাবা রে')

Reality

মেয়ে ঃ একটু জল খান।

নগেন ঃ আমি ওকে আগলে রাখার চেষ্টা করতাম কিন্তু পারিনি। মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যেতো। বেশ কিছুদিন বাদে ফিরে আসতো। নকল ভালবাসা, আদরে ভুলিয়ে ভোগ করে ছেড়ে দিত। আর কী অদ্ভুত দেখো, ও কিন্তু ঠিক এখানেই ফিরে আসতো। আমার কি মনে হয় জানো, ও ঠিক বুঝতো যে এরপরেই একটা ছোট্ট পুতুল পাবে ও। যেটা ওর নিজের। বাচ্চা যতদিন ওর কাছে থাকে ততদিন ভালই থাকে ও। কিন্তু তা আর ক'দিন। আমিও আর পারছি না। ভীষণ ক্লান্ত আমি।

মেয়ে ঃ আপনি এখানে বসুন।

নগেন ঃ ক'টা বাজে?

মেয়ে ঃ চার'টে কুড়ি।

নগেন ঃ তাহলে তো আর বেশি সময় নেই। তুমি আমার কাজটা করে দিও মা।

মেয়ে ঃ আমি অতটা খারাপ নই যে আপনার জন্য একটা কাজ করে দিতে পারবো না।

নগেন ঃ নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি আমায় বাঁচালে। একটু দাঁড়াও আমি আসছি। ও বলছিলাম কি তোমার ফোনটা স্মার্ট ফোন?

মেয়ে ঃ হ্যাঁ। আইফোন।

নগেন ঃ আছে তোমার কাছে?

মেয়ে ঃ হ্যাঁ। এই তো। সুইচড অফ করা।

নগেন ঃ সুইচ অফ করেছো, তা ফেলে দাওনি কেনো?

মেয়ে ঃ কী জানি। সত্যিই তো ফেলে দিলেই হতো।

নগেন ঃ যাকগে ভালো করেছো না ফেলে। বলছি কি ওটা আমাকে দেবে? তুমি তো মরেই যাবে। আমারটা দেখো। একটু ফেসবুক করতাম। ওই তোমরা যা করো।

মেয়ে ঃ নিন। সিমটা খুলে ফেলে দেবেন।

নগেন ঃ ঠিক আছে। দাঁড়াও একটু। আমি আসছি। (নগেনবাবু দোকানে ঢুকে যায়। মেয়েটা রানীকে দেখতে থাকে। নগেনবাবু দোকান থেকে বেরিয়ে আসে, হাতে একটা ইনজেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ) এই নাও ধরো।

মেয়ে ঃ কী এটা?

নগেন ঃ ডাক্তারি পড়ছো আর এটা চেনো না?

মেয়ে ঃ চিনবো না কেনো? কিন্তু কী করবো এটা দিয়ে?

নগেন ঃ আমি শুনেছি, ঠিক জানি না তবে শুনেছি- সিরিঞ্জ দিয়ে বেশী পরিমাণ হাওয়া যদি শিরায় ইনজেক্ট করা যায় তাহলে নাকি হার্ট ব্লকড হয়ে মানুষ মারা যায়। এটা কি সত্যি?

মেয়ে ঃ সেটা জেনে আপনি কী করবেন?

নগেন ঃ করতে পারলে কী আর তোমায় বলতাম। আমি পদ্ধতিটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মেয়ে ঃ কী করতে চান আপনি?

নগেন ঃ আমি না। আমি না। তুমি করবে, তুমি। তাকিয়ে দেখো কেমন মরার মতো ঘুমিয়ে আছে। কড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি খাবারের সাথে। তুমি শুধু সিরিঞ্জটা দিয়ে হাওয়া ভরে দাও। বাই চান্স জেগে গেলে আমি মুখ চেপে ধরবো। আমি থাকবো তোমার পাশে। কী হলো?

মেয়ে ঃ আপনি আমাকে খুন করতে বলছেন?

নগেন ঃ হ্যাঁ। দেখো আমি খুন করলে জেল হবে, ফাঁসিও হতে পারে। কিন্তু তুমি এক্ষেত্রে একদম নিরাপদ।

মেয়ে ঃ অসম্ভব।

নগেন ঃ কেন? অসম্ভব কেন?

মেয়ে ঃ আপনাকে আমি একজন ভালো মানুষ ভেবেছিলাম।

নগেন ঃ ঠিকই ভেবেছিলে। আমি সত্যিই ভালো মানুষ।

)মেয়ে ঃ আপনি একটা খুনি।

নগেন ঃ সে তো তুমিও।

মেয়ে ঃ আমি? মোটেও না।

নগেন ঃ নিজেকে খুন করতে চাও না তুমি?

মেয়ে ঃ খুন নয় । আত্মহত্যা।

নগেন ঃ হত্যা তো?

মেয়ে ঃ আমি পারবো না।

নগেন ঃ তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে।

মেয়ে ঃ না জেনে দিয়েছিলাম।

নগেন ঃ এখন তো জেনেছো। একটুও কি করুণা হয় না তোমার? কী অসহায় মেয়েটা আমার, বোঝেই না কোনটা আদর কোনটা ধর্ষণ। প্রতিদিন অপমানিত হচ্ছে ওর নারীত্ব অথচ বোকা মেয়েটা আত্মহত্যাও করতে জানে না।

মেয়ে ঃ তবুও প্রতিটা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

নগেন ঃ যার জন্মের ঠিক নেই তার আবার অধিকার।

মেয়ে ঃ তার মানে আপনি বলতে চান আমারও বেঁচে থাকার অধিকার নেই?

নগেন ঃ না নেই।

মেয়ে ঃ কেন নেই? আমি তো নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসি নি। যে কাজ আমি করিনি তার শাস্তি আমি কেন পাবো?

নগেন ঃ তাহলে কাজটা যে করেছে তাকে শাস্তি দাও। তাকাও একবার, দেখতে পাচ্ছো, শুয়ে আছে ঠিক যেন তোমার মা, আর বুকের কাছে ছোটো পুটলিটা তুমি। হ্যাঁ দেখো,তুমি। দেখো, সেই মা, যে তোমাকে আস্তাকুঁড়েতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। দেখতে পাচ্ছো? এবার এটা ধরো। শেষ করে দাও ওদের। প্রতিশোধ নাও। ধরো। এগিয়ে যাও।

মেয়ে ঃ না .....

নগেন ঃ আবার কী হলো?

মেয়ে ঃ ও তো কোনো দোষ করে নি।

নগেন ঃ তুমি কি নিশ্চত তোমার মা কোনো দোষ করেছিলো? সেও হয়তো কোনো পরিস্থিতির স্বীকার। হয়তো এই মুহূর্তে কোথাও কোনো অন্ধকার কোণে বসে তোমার জন্য চোখর জল ফেলছে। যাকগে বাদ দাও। এসব তুমি বুঝবে না। তবে মরার আগে একটা কথা শুনে রাখো, তুমি কিন্তু দুটো খুন করবে।

নগেন ঃ আমি।

মেয়ে ঃ হ্যাঁ তুমি। কাল সকালে তোমার অন্য ব্লাড গ্রুপের বাবা মা যখন তোমার ডেডবডিটা দেখবে, তখন তারা বেঁচে থাকবে বলে মনে হয় তোমার? দুটো

খুন তো করবেই, চারটে হলে একটু উপকার হতো আমার আর কী। যাকগে আমি আমার কথা রাখবো তুমি বসো আমি দেখি পটলা উনুন ধরালো কি না, একটু চা খেতে হবে, মাথাটা বড্ড ধরেছে। তুমি খাবে?

মেয়ে ঃ হুম। আমার মোবাইলটা একটু দেবেন? (নগেন ফোন দিয়ে চলে যায়। মেয়েটা কিছুক্ষণ ফোনটা ধরে থম মেরে বসে থাকে। রানীর কাছে যায়। তারপর ফোনটা অন করে। এই সময় নগেন ফিরে আসে মেয়েটা খেয়াল করে না।)

নগেন ঃ বলছি চা টা কী চিনি দিয়ে, না, না দিয়ে-

মেয়ে ঃ ঋষি, তোর জন্য এটা আমার লাস্ট মেসেজ, এরপর আমার নামটা ডিলিট করে দিস। আমিও ব্লক করে দেবো। তুই ঠিকই বলেছিস, আমার আর বেঁচে থাকা উচিৎ নয়। আমি মরে গেছিরে, আমাদের চার বছরের সম্পর্কটার মতো। তবে আজ নতুন এক শ্রাবণের জন্ম হয়েছে যার তোকে কোনো প্রয়োজন নেই। সে বাঁচবে, প্রাণ ভরে বাঁচবে। ভাল থাকিস।

নগেন ঃ চিনি দিয়ে?

মেয়ে ঃ আপনি বড্ড চালাক, জিতে গেলেন। তবে আমিও বোকা নই। ধরে ফেলেছি আপনাকে।

নগেন ঃ চিনি না দিয়ে?

মেয়ে ঃ বাঁচাতেই চেয়েছিলেন তো মা বাবাকে বলেননি কেনো, আমি এখানেই আছি।

নগেন ঃ তাহলে তোমাকে বাঁচাতে পারতাম না। আমার মেয়েটাকেও যে পারিনি। প্রথমবার ধরে ফেলি, বকাঝকা করি, বোঝাই। দ্বিতীয় বার আর কোনো সুযোগই দেয় নি। এইখান থেকে এক লাফ। ওর মা'রও দশদিনের মধ্যে ম্যাসিভ হার্ট এ্যাটাক, শেষ।

মেয়ে ঃ কেন? কেন এমন করলো?

নগেন ঃ সব কেনোর কি উত্তর হয়? হয় না। তোমার কাছে আছে উত্তর? মুহূর্তের আবেগে তোমরা-

মেয়ে ঃ কতটুকু জানেন আপনি আমার সম্বন্ধে, যে মুহূর্তের আবেগ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন?

নগেন ঃ না, কিছুই জানি না।

মেয়ে ঃ না জেনে কিছুই বলবেন না। ঋষি আমাদের চার বছরের সম্পর্কটাকে এক মুহূর্তে শেষ করে দিলো। আমি তো ওর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলাম। জন্ম পরিচয় জানার পরেও আমি ভেঙে পড়ি নি। ছুটে গিয়েছিলাম ওর কাছে, সত্যিটা বলবো বলে। আমার সব থেকে কাছের, সব থেকে ভালবাসার মানুষটা কী বললো জানেন, যার জন্মের ঠিক নেই তাকে ওর বাবা মা মেনে নেবে না। আমি বললাম 'আর তুই'? ওর নাকি কিছু করার ছিলো না।

নগেন ঃ আর তুমি, ঋষির কথায় নিজেকে শেষ করে দেবে ঠিক করলে, ২০ বছরের সম্পর্কটার কথা একবারও ভাবলে না। তোমরা সবাই স্বার্থপর। আমার মেয়ে, তুমি, সব।

মেয়ে ঃ স্বার্থপর বলার আগে, আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার ভাবুন তো-আমি কোনোদিন ভাবিনি ঋষি আমাকে- আমি যে ওকে খুব ভালোবাসতাম। আপনার মেয়েও হয়তো-

নগেন ঃ হয়তো নয়। আমার মেয়েরও ঋষি ছিলো। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে লেখা ছিল।

মেয়ে ঃ রিপোর্টে লেখা ছিল?

নগেন ঃ Uterus এর তিন মাসের ভ্রূণের গায়ে লেখা ছিল কোনো এক ঋষির নাম। ভাষাটা ছিলো দুর্বোধ্য তাই নামটা জানা যায় নি। আর জেনেই বা কী করতাম। তারপর থেকে রোজ রাতে এখানে আসতাম যদি মেয়েটার দেখা পাই-প্রশ্নটা করতাম-নামটা জানতাম। আস্তে আস্তে কি ভাবে যেন সব ছেড়ে এখানেই থেকে গেলাম। একটা দোকান নিলাম। তবু কিছুতেই মন বসতো না। নিজেকে শেষ করে দেব ভাবছি, এমন একদিন রানী এলো। ব্যাস সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেলো। এই বোকা মেয়েটাকে ফেলে রেখে কী করে মরি বলোতো? ও যে মরতেও পারে না, বাঁচতেও জানে না। ও এইভাবেই বার বার মা হবে আর আমি কিচ্ছু করতে পারবো না। শুধু দেখবো আর-

মেয়ে ঃ না হবে না। আপনি ভয় পাবেন না। আমি বাঁচবো, ওদের জন্য বাঁচবো।

নগেন ঃ এক মুহূর্তে ভাবিস মরবো আবার এক মুহূর্তেই ভাবিস বাঁচবো। পাগলি মেয়ে। অত দায়িত্ব নিতে হবে না, আগে মা'কে একটা ফোন করো। আমি চা নিয়ে আসি।

(মেয়েটা মা'কে ফোন করে কাঁদতে থাকে। সেই শব্দ শুনে রানী ঘুম থেকে উঠে ওর কাছে আসে। ও ফোন রেখে রানীকে ধরে টুলটায় বসিয়ে দিয়ে নিজে মেঝেতে বসে ওর কোলে মাথা রাখে। নগেনবাবু চা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ভোর সাড়ে পাঁচ'টার ট্রেনটা চলে যাবে।)

লেখিকা : **সংগীতা চৌধুরী,** ইছাপুর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নাটককার।

প্রি-পেইড হোটেল

পার্থ মজুমদার

চরিত্রলিপি

জগন্নাথ/জগু (বয়স-৪০), হরি (৪০), পার্বতী (৩৫), হাসিখুশি (৭৫), শিবু (৩০), শমীক (৬০), লক্ষী (২৫), হরনাথ (৩০), ছোট জগু (১৪-১৫), কানু (মস্তান) (৩০), রুমকি (২৫), ঝুমকি (২২), যুবক শমীক (৩৫), নীলাঞ্জনা (৫৫), সুনীল (৩০), কোরাস/দোকানদার/খদ্দের-১০ জন বিভিন্ন বয়সের

(পর্দা খুললেই দেখা যাবে কোন গ্রাম্য বাজার/হাটের দৃশ্য - হৈ চৈ - ছোট চা-এর দোকান থাকতে পারে। এক কোনায় দেখা যাবে "প্রি পেইড হোটেল" নামক একটি সাইনবোর্ড। সব্জি-বাসনপত্র, দা, খুন্তি সব কিছুই থাকবে। বিভিন্ন দোকানদার বিভিন্ন সুরে খদ্দেরকে আকর্ষণ করবে। কেনাকাটার ভীড় থাকবে।)

দোকানদার-১ : তিনশ দশ -পাঁচশ পনের (৩ বার) আসুন বাবু- আসুন - জলের দরে বিক্রি করছি- সব অর্গানিক সব্জি - সার পাবেন না- তাজা তাজা — গোটা গোটা (সুরে) আসেন বাবু- আসেন—

দোকানদার- ২ : মাত্র চল্লিশ (৩বার) একবার খরচ করলে সারা জীবন বসে বসে কাটাতে পারবেন— মাত্র চল্লিশ (৩ বার) দেখা যাবে জলচৌকি বা পিড়ি যাতীয় কিছু বিক্রি করছে)

খদ্দের-১ : (একজন খদ্দের আরেকজনকে) দেখলেন দাদা বিক্রি করার কি স্টাইল?

খদ্দের-২ : এটাইতো ক্রেডিট— ভালো সেলস্ ম্যান হলে টাক মাথাওয়ালার কাছে চিরুনীও বিক্রি করে আসতে পারে।

খদ্দের -৩ : (পাখা বিক্রেতাকে) ভাই পাখা কতো করে?

পাখা বিক্রেতা : দেখেন বাবু, সততা হচ্ছে আমার পুঁজি, মিথ্যা কথা বলবো না—হাতে নাড়ানো পাখা তিরিশ টাকা আর মাথা নাড়ানো পাখা দশ টাকা-

খদ্দের : বুঝলাম না-

বিক্রেতা : বুঝলেন না- পাখা হাতে নিয়া নাড়াইয়া নাড়াইয়া বাতাস খাইতে হইলে তিরিশ টাকা করচ করবেন (অভিনয় করে দেখাবে) আর পাখা স্থির রাইখ্যা মাথা নাড়াইয়া বাতাস খাইতে হইলে দশ টাকা খরচ করলেই হইব।

খদ্দের : বুঝলাম, হাতে নাড়াইয়া খামু—এমনই একটা দাও—আর মাখা নাড়ানোর গুলি তোমার কাছেই রাখ।

বিক্রেতা : (দিতে দিতে) বাবু আমার কাছে রাখন লাগদ না। বাজার-অ যখন লইয়া

আইছি কম আর বেশী বেচা হইবই— আমরা তো নিজেরারেও বেচনের লেইগ্যা বইয়া থাকি— আপনে-আমি— সবাই সুযোগ পাইলেই বেইচ্যা দেই আমরার আদর্শ-চেতনা-মূল্যবোধ সব—

খদ্দের : তুমি বেশ ভালো কথা বলতে পার তো?

বিক্রেতা : মুখটাও তো একটা পুঁজি (বলেই আবার সুর করে খদ্দের ধরতে ব্যস্ত হয়ে পরে— কোন চানাচুর বিত্রেতা কোন এক খদ্দেরকে চানাচুর বিক্রি করতে চাইছে—খদ্দের নেবে না—চানাচুর বিক্রেতাও নাছোড়বান্দা)

বিক্রেতা : বাবু ভালো চানাচুর— একবার খাইলে— বার বার খাইবেন—বাজার করবেন আর ভুন্দার চানাচুর খাইবেন—

খদ্দের : ভুন্দার চানাচুর?

বিক্রেতা : ঐ-মানে- আমার নাম - ভুন্দা।

খদ্দের : ঠিক আছে— এবার অন্য কাস্টমার দেখ—আমি খাব না (বিক্রেতা পেছন পেছন চলতে থাকে)

বিক্রেতা : লগে এক্সট্রা বাদাম দিমু—

খদ্দের : না—

বিক্রেতা : আদা ফ্রী—

খদ্দের : আহ - মহা মুশকিল তো — যাও এখান থেকে—

বিক্রেতা : আপনার এই রাগের ওষুধ এই ভুন্দার চানাচুর—একবার খেলে—রাগ গলে জল—একবার ট্রাই করে দেখেন—

খদ্দের : তুমি যাবে এখান থেকে?

বিক্রেতা : (হাসি) আপনে রাগলেও আমি রাগতাম না— আমি রোজ এই চানাচুর খাই— এই চানাচুর ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রনে রাখে— একবার খাইয়া দেখেন— মাত্র ১০ টাকা— দিমু?

খদ্দের : না—

বিক্রেতা : বীট লবনও দিমু— লঙ্কার কথা কওয়নঐ লাগদ না— এমনেই ফ্রী—

খদ্দের : মহা যন্ত্রণা তো— দাও- দাও— খাই আর না খাই— চানাচুর নিয়ে তোমাকে বিদেয় করি (চানাচুর দেয়- টাকা নিয়ে যাবার সময় -)

বিক্রেতা : ব্যবসা করুম— রাগ করলে হইব? (হাসি দিয়ে আবার সুর ধরে বিক্রি করতে চলে যায়)

[প্রি-পেইড হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে জগু কাস্টমার ডাকছে]

জগু : বাবু— আসেন - আসেন— গরম গরম ভাত— ফ্রেস সব্জি—মাছ-মাংস-সব পাবেন—পেটে খাইলে পিঠে সয়— বাবু আসেন - আসেন— পেট শান্তি তো জগত শান্তি— মনের চাহিদা মিটাইতে পারুম না বাবু— তবে পেটের চাহিদা মিটাইয়া দিমু— ১০০% গ্যারান্টি— আসেন—আসেন—(দেখা যাবে

২/১ জন ভাত খেতে হোটেলে প্রবেশ করে, হঠাৎ পুলিশের হুইসেলের শব্দ—সব দোকানদার দোকান গোটাতে ব্যস্ত হয়ে পরে)। (লাইট অফ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সময় সন্ধ্যা, হোটেলের সামনের জায়গায় আড্ডার পরিবেশ)

জগন্নাথ : ভাই দে না— ২০ টাকা দে— প্লীজ দে—

হরি : ভাগ্ শালা— রোজ রোজ এক বায়না — টপকাতে পারিস না?

জগন্নাথ : টপকাব - টপকাব - একদিন দেখবি জলভর্তি মাটির কলসী হঠাৎ করে ফেটে গেলে— জল যেভাবে বেরিয়ে যায়— কলসী আবার মাটি হয়— তেমনি আমিও মানুষ টু মানুষ ভায়া অমানুষ হয়ে যাব ।

হরি : মানে?

জগন্নাথ : মানে- ছিলাম মানুষ - হলাম নেশাখোর - অমানুষ - যেদিন টপকে যাব — তখন আবার সবাই বলবে - আমি ছিলাম ভাল মানুষ । ঐ মাটি টু মাটি ভায়া কলসী।

হরি : তোকে মরার পরও কেউ ভাল মানুষ বলবে না— তুমি যেই একখান মাল চাঁদু।

জগন্নাথ : যাই হই না কেন— জানিস এই পৃথিবীতে কে সবচেয়ে বেশী সম্মান পায়—

হরি : সাধু- সন্ন্যাসী- ডাক্তার- ইঞ্জিনীয়ার অনেকেই পায়—

জগন্নাথ : তোমার বিদ্যার ঘট এতটুকু— তুমি আর কি জানবে— সবচেয়ে বেশী সম্মান পায় একটা ডেডবডি। ডেডবডি যখন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায় চেনা-অচেনা, পরিচিত-অপরিচিত সবাই একবার নমস্কার করে। আমি যেদিন টপকাব—দেখবি তুইও আমায় নমস্কার করছিস। এখন বাদ দে সেসব কথা— যা তোকে আমি ডিস্কাউন্ট দিলাম।

হরি : মানে?

জগন্নাথ : মানে—আমার ডেডবডিকে তোর প্রণাম করতে হবে না— এখন ২০টা টাকা দিয়ে দে ভাই— প্লীজ—

হরি : (টাকা বের করে) নে শালা নে– যা ভাগ্ এখান থেকে –ছাইপাশ গিলে আয়-

জগন্নাথ : (হরিকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে বড় করে চুমু খেয়ে) ছাইপাশ নয়- প্রসাদ- প্রি-পেইড প্রসাদ (দৌঁড়ে বেড়িয়ে যায়, হরি ধূপ দেবার প্রস্তুতি নেয়। সময় সন্ধ্যা। হোটেল বন্ধ করার আগের প্রস্তুতি। কাজের ফাঁকে গান ধরে)

হরি : (গান) হরিবোল মন রসনা /মানব দেহের গৈরব কইর না ...... (হরির দজ্জাল বৌ পার্বতী-র প্রবেশ। দুইহাত কোমরে দিয়ে কিছু সময় গান শোনে..)

পার্বতী : এই যে কিশোর কুমারের বর-পুত্র—গান শেষ হয়েছে - হোটেল লাগানোর সময় হয় নি? (হরি গান ধরে)

হরি : (গান) ভবে আইছ একা / যাইবা একা ....

পার্বতী : হের কারবারটা দেখ— আমি যে কথা বলতেছি— মনে হয় কানে No entry বোর্ড লাগানো। গান গাইয়াই চলছে—(হরিকে ধাক্কা দিয়ে) কি হলো শুনছ না?

হরি : শুনলাম – দিনের শেষে ঠাকুরের নাম নিচ্ছিলাম– এখনই লাগাচ্ছি- যাও—

পার্বতী : দেরি হলে আজগে খবর আছে— তাইনে রাতি দশটা অব্দি দোকানদারি কইরা শিল্পপতি হইবেন-আম্বানি- আদানি হইবেন–স্বপ্ন দেখে– (গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে গিয়ে আবার প্রবেশ) আজকেও যদি আড্ডাত বও– খবর আছে কইয়া গেলাম। (প্রস্থান)

হরি : (দর্শককে) মিসকল– মিসকল– না হলে কি এই মহিলার নাম হয় পার্বতী? হওয়ার কথা ছিল আমফান, ফনী নয়তো আয়লা (এক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ : কি ব্যপার হরি? এই ভরসন্ধ্যেবেলায় সব ঝড়ের নাম? আবহাওয়ার কোন পূর্বাভাস আছে নাকি?

হরি : পূর্বাভাস– পশ্চিমাভাস-উত্তর-দক্ষিণ সব আভাষই আছে– আসেন –দাদা– আজকে দেরি করলে আমার ডোজ পরবে কড়া।

বৃদ্ধ : ও তাই সব ঝড়ের নাম (হাসি) কি আর করবে বল? তুমি তো আর আমি না– আমি তো আর তুমি না– তা আমার জগু কোথায়? দেখছি না যে?

হরি : আর কি!

বৃদ্ধ : ও (হাসতে হাসতে বসে) তা সারাদিন ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন হল?

হরি : আগামীকালের জন্য হয়ে যাবে– (জগন্নাথের প্রবেশ– গান করছে–পা টলছে -)

জগু : (গান) এক টানেতে যেমন তেমন / দুই টানেতে রুগী / তিন টানেতে রাজা উজির/ চার টানেতে সুখী / পাঁচ টানেতে– না– পাঁচ টান দেওয়া যাবে না– দিলেই মাটি ছেড়ে শুন্যে– মাটি ছেড়ে তো যাওয়া যাবে না– কি আর করবেন– আপনি তো আর হরির মত SLR না– আমার মতো– না এইকূল– না ওইকূল— স-ব নাইকূল।

বৃদ্ধ : তাইতো ভাই তোমরা আমার নাম দিয়ে দিলে হাসিখুশি— প্রি-পেইড নাম ছিল অভিমণ্যূ– হয়ে গেলাম হাসিখুশি—

হরি : প্রি-পেইড নাম? দাদা ব্যাপারটা বুঝলাম না—

জগু : ঐ তোর প্রি-পেইড হোটেলের মত আর কি– অভিমণ্যূ– মানে হাসিখুশিবাবু উনার মা-র পেটে থাকতেই উনার বাবা এই নামটা ঠিক করে রেখেছিল আর কি

বৃদ্ধ : exactly, জগন্নাথ– ইউ আর জিনিয়াস– এক্সট্রা টেলেন্টেড—

হরি : হুম– টেলেন্টেড দেখেই তো আজ আমার ঘাড় মটকায়–

বৃদ্ধ : তা জগন্নাথ কেমন আছ?

জগু : (গান ধরে) কী আনন্দ - কী আনন্দ / এসে গেছে কোকাকোলা / গেছে সব দেনার

দায়ে / বাকী আছে কাপড় খোলা (গানের সাথে সাথে শার্ট খুলতে থাকে– হরি দৌঁড়ে এসে ওকে আটকায়)

হরি : আরে রাখ–রাখ– শার্ট পর্যন্তই থাক– আর খুলিস না ভাই– এটা আমার দোকান– তোর উপর কোন বিশ্বাস নাই–

বৃদ্ধ : তা জগন্নাথবাবু– আজ কি চার টানের বেশি হলো নাকি? পা যে টলছে—

জগু : নো—নো– নেভার– জগু কোনদিন পাঁচ টান দেবে না– পাঁচ টানে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠা যায়– জগু মাটি ছাড়বে না– জেনে রাখুন হাসি - খুসি বাবু।

হরি : তোর আজকের টানগুলো তবে বড় ছিল– নয়তো তোর পা টলছে কেন?

জগু : এটা আর্থিং– আর্থিং– দেখবি যখনই কোন নেশাখোর হাঁটে, পা টলে কিন্তু সাইকেল বা বাইকে একবার উঠে বসে গেলে ঠিক চালিয়ে চলে যেতে পারে।

বৃদ্ধ : নেশা– বৃষ্টি– ভাই তুমি কিসের সঙ্গে কিসের যোগ করছ?

জগু : বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে নামার আগে দেখবে এক দু ফোটা আগে নামে– মাটির গন্ধ শুঁকে নেয়– তারপর মাটির গন্ধ পেলেই সব এক সঙ্গে নেমে আসে– ঐ আর্থিং এর প্রভাব না থাকলে এরা সারাজীবন পরিযায়ী হয়েই থাকতো– (গলা ধরে আসে, হরি গিয়ে জগুকে ধরে)

হরি : মারব শালা এক লাথ– তোকে কোনদিন আমি কিছু বলেছি—

জগু : বলবি কি শালা— I was a much more better student than you in our childhood, So, how dare you to say something to me? (শিবু নামে জগু-র বয়সী লোকের প্রবেশ– প্রবেশের আগে বড় টর্চ লাইটের আলো সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত হয় জগুর মুখে–)

জগু : এই শালা আলো নেভা– আলো চাই না– অন্ধকারে স্বপ্ন আসে– আলো থাকলে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়– (শিবু টর্চ নিভিয়ে হাসতে হাসতে প্রবেশ করে)

শিবু : প্রি-পেইড জগু স্বপ্ন দেখে— হা-হা-হা

বৃদ্ধ : এই শিবু ওকে তুমি খেপাচ্ছ কেন?

জগু : বাংলা শুনতে চায় না— ইংরেজি শুনতে চায় আর কি—

হরি : মানে?

জগু : বিবাহিত মানে প্রকারান্তরে মৃত (নচিকেতার গান) তাই আমি তোর মত মৃত মানুষকে বলবো না–বলব— শিবুকে– না শালা ও ওতো মৃত– বলব হাসিখুশিবাবুকে– হ্যা–আপনাকেই বলবো আমি– আপনি যে প্রি-পেইড জীবিত।

(পার্বতী প্রবেশ করে– প্রচণ্ড রেগে আছে– হরিকে উদ্দেশ্য করে–)

পার্বতী: কী? ব্যাপারটা কী? কি বলেছিলাম? (হরি তাড়াতাড়ি হোটেলের কোন কাজ করার বাহানা দেখায়) নাটকে করতে হবে না– রোজ দিন আড্ডা– পেয়েছটা কি? সংসারটা কি শুধু আমার–

জগু : (বৌদির কাছে গিয়ে) আঃ বৌদি তুমি রাগ কর কেন? রাগ করলে তোমারে দুর্গা দুর্গা লাগে।

পার্বতী: থাক থাক জগুদা–তোমাকে কিছু বলছি না– তোমার বন্ধুকে বোঝাও—

জগু : বন্ধু (দীর্ঘশ্বাস) না বৌদি– বন্ধু-বাবা-মা-গার্জিয়ান–সব তো তোমরাই (কান্না)

পার্বতী: আঃ আবার এমন করছ– আমি কি তোমাকে কোন দিন কোন খারাপ কথা বলেছি? এই যে রোজ রাত্রে নেশা কর– তারপরও কি কোনদিন—

জগু : এই জন্যই তো বলি– তুমি তো আমার বৌদি না– আমার মা– (কান্না) আসল মা কি ছিল– আর নকল মা কি পেলাম– বুঝি না এই সংসারে আসল-নকল কিছুই।

পার্বতী : হয়েছে, হয়েছে– বুঝলাম– এখন তুমি তোমার বন্ধুকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠাও– আর নিজেও খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাও– (শিবু ও বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে (তাচ্ছিল্য) হু! বাড়িতে কোন কাজ নেই– (প্রস্থান)

জগু : (তীব্র হাসি হরিকে) এই শালা ভগবানের বাচ্চা হরি– দ্যাখ তো বন্ধু কেমন নাটক করলাম– তোর বউটা দজ্জাল হলেও মনটা খুব ভালো রে শালা– তুই বুঝতে পারিস না– নাহলে আমার মত এমন অপদার্থকে এতো বছর সহ্য করল –

বৃদ্ধ : বাদ দাও এই প্রসঙ্গ– তা কি বলছিলে বল—

জগু : কি বলব–কি বলব– ভুলে গেছি–

শিবু : ঐ ইংরেজি–

জগু : হ্যা, হ্যা টাওয়ার সিগন্যাল ক্যাচ করেছে– জানেন হাসিখুশিবাবু আমরা বেশিরভাগ বাঙালিরা যদি স্বাভাবিক থাকি তখন মুখোশ পরে থাকি– হরির মতো– কাস্টমার এর সঙ্গে ভুলভাল শুদ্ধ অশুদ্ধ বাংলা বলতে থাকে– কিন্তু দেখবেন বাড়িতে গিয়ে যখন বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করবে–তখন বাংলার একদম শ্রাদ্ধ করে ছাড়বে। রেগে গেলে বলবে ইংরেজি– shut up - get out. ইংরেজি পারুক আর না পারুক। আর যখন আনন্দে থাকে তখন মুখে চলে হিন্দি–

হরি : যেমন?

জগু : ঐ ভালো একটা গান শুনলে– বা ক্রিকেট মাঠে বিরাট কোহলি একটা সুন্দর শট মারলে– চিৎকার দিয়ে উঠে ক্যায়া বাত, ক্যায়া বাত, বহৎ খুব– এইসব বলে– কিন্তু সবসময় বাংলাটাকে ধরে রাখা সেটাই পারে না—

শিবু : এই হল আমাদের জগু– এক্সট্রা টেলেন্টেড– তাই তো আমি তোর মুখে সবসময় আলো ফেলি— (টর্চের গোল আলোয় শুধু জগুর মুখ দেখা যায়— বাকি মঞ্চ অন্ধকার– জগু গান ধরে)

গান : স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে / স্মৃতিটুকু মনে আছে (আর.ডি. বর্মন) অথবা একা একা কথা বলা / একা একা পথ চলা (নচিকেতা)

হরি : এবার তোর গান থামিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমা– আমারও দেরী হচ্ছে– (বৃদ্ধকে) দাদা

এবার যে উঠতে হয়— পার্বতীর রূপটা আজ বেশি ভালো দেখলাম না– বাড়ি গেলে বুঝব-

জগু : ফ্রি অব কস্ট ও উপদেশ দেয় মাস্টারমশাইরা, জগন্নাথ– থুক্কু– এই নামটাও তো প্রি-পেইড– পোস্ট পেইড নাম তো জগু– শুনতে হলে বিড়ি ছাড়ুন–

বৃদ্ধ : (হরিকে) হরি– হরি দাও— দাও ওকে একটা প্যাকেট বিড়ি দাও— আমি কাল তোমাকে পয়সা দিয়ে দেব। (হরি বিড়ি দেয়) (জগু বিড়িতে টান দিয়ে—)

জগু : আপনি সবসময় হাসিখুশি থাকেন– তাই সুস্থ জীবন কাটাচ্ছেন– তাই আপনার হাসিখুশি মনকে প্রি-পেইড করেছেন জীবনের কাছে— আমি নেশা করছি–সুখে জীবন কাটাচ্ছি– আমি নেশাকে প্রি-পেইড করেছি জীবনের কাছে– তাই আমরা দু'জনই প্রি-পেইড জীবিত।

শিবু : আর উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের জীবন কিভাবে প্রি-পেইড?

জগু : তোকে বলব কেন? তুই কি বিড়ি খাইয়েছিস?

শিবু : নে যা কালকের জন্য ২০ টাকা তোকে অগ্রিম দিলাম– এবার বল–

জগু : (টাকাটা দেখে) আজ ব্যবসা করে হরি কালকের ভাতের জোগাড় করে ফেলেছে– আর আমি কথা বেচে কালকের নেশার জোগাড় করে ফেলেছি (গান) জীবনে কী পাব না / ভুলেছি সে ভাবনা...... (গান থামিয়ে) অচ্ছা যারা বুদ্ধি বেচে তারা বুদ্ধিজীবি হলে যারা সত্য মিথ্যা কথা বেচে চলে তাদের কথাজীবি বলা যায় না?

বৃদ্ধ : ভাই তোমার কথার গভীর ব্যঞ্জনা আমি বুঝি না– কথা বেচে আবার কে সংসার চালায়?

জগু : ঐ যে আমার মত কিছু নেশাখোর – কেউ আমার মত জ্ঞান বেচে, কেউ মিথ্যা কথা বেচে আর বেশিরভাগ রাজনীতিবিদরা - তাদের কথাজীবি বলা যায় না?

শিবু : এখন এই প্রসঙ্গ বাদ দে– ঐ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের প্রি-পেইড জীবন নিয়ে বল–

জগু : আজ the end এই ২০ টাকা দিয়ে তুই একটা প্রি-পেইড ভাউচার নিয়ে গেলি–কাল যদি জীবিত থাকি আমার কথা শুনতে পাবি এই ভাউচার দিয়ে। আজ হরির যাবার সময় হয়েছে– নয়তো (হরিকে ঘিরে ঘিরে গান ধরে) (গান) বৌ-পাগলা ব্যাটারে / ঝাঁটা তুই আজ খাবিরে / পরলে- নেশাখোরের চক্করে মারা পরবি অঘোরে / জীবনে পারবে বাঁচতে / যদি পারো / প্রি-পেইড ভাবনা ছাড়তে। (গান করে হরি বৃদ্ধকে বের করে দেয়)

হরি : (নেপথ্য থেকে) হোটেলের দরজা-জানালা ভাল করে বন্ধ করে দিস—

জগু : হ্যা, হ্যা— চিন্তা করতে হবে না (গান) জীবনে কি পাব না/ ভুলেছি সে ভাবনা/ ... নকল সোনা (গান করতে করতেই চোখ পড়বে শিবুর উপর। শিবু বসা) এই শালা

ভাগ এখান থেকে– আমার এখন স্বপ্ন দেখার সময়– আমি এই সময় আমার মনের দরজায় no entry board লাগিয়ে দেই– যা—

শিবু : দাঁড়া, তোর no entry লাগাচ্ছি (বলেই টর্চের আলো ওর মুখে ফেলে আস্তে আস্তে পিছিয়ে বেরিয়ে যায়। আলো মুখে কেন্দ্রীভূত হয়)

জগু : আঃ আলো নেভা– আমি আলো চাই না– আমি স্বপ্ন দেখবো এখন– স্বপ্ন (মুখের আলো নাচতে শুরু করে– মুখে দু'তিন রঙ এর আলোর রেখা স্পষ্টভাবে মুখে পড়ে মাকড়সার জালের ছবি ফুটিয়ে তুলবে। জগু ধীরে ধীরে স্থির হয়)

দৃশ্যান্তর

(ফ্ল্যাস ব্যাক)

(জগুর ছোটবেলার দৃশ্য, মঞ্চের এককোনে জগুকে দেখা যাবে আলো আঁধারিতে। দৃশ্য এগিয়ে যাবে জগুর নির্বাক শারীরিক যন্ত্রণাবিদ্ধ শরীরের বিভিন্ন মোচড় দেখা যাবে। আনুষঙ্গিক আবহ, হঠাৎ একটি গাড়ী ব্রেক কষার শব্দ– হইচই– বড় ধরণের কোন অ্যাক্সিডেন্ট হবার আবহ— একজন ধোপ-দুরস্ত লোক, নাম শমীক ভয়ার্তভাবে প্রাণে বাঁচার তাগিদে প্রবেশ করবে। দৌঁড়ে জগুর বাড়ির সামনে এসে–)

শমীক : (ভয়ার্ত) হরনাথ - হরনাথ - ঘরে আছো? তাড়াতাড়ি এসো– হরনাথ– (ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অল্পবয়সী একজন বৌ– হরনাথের স্ত্রী - লক্ষী-)

লক্ষী : কাকে চাই?

শমীক : হরনাথ আছে? ওকে তাড়াতাড়ি আসতে বলো (পেছন পেছন হরনাথ আসে)

হরনাথ : আরে স্যার, আপনি? আমার বাড়িতে? লক্ষী- লক্ষী উনি আমার স্যার– আমি উনারই গাড়ি চালাই– স্যার ঘরে আসেন– আরে আসেন

শমীক : না ভাই এখন আসব না– আমি খুব বিপদে পড়েছি– তুমি আমাকে বাঁচাও

লক্ষী : এ কেমন কথা বাবু– ঘরে না এসে গেলে যে আমাদের অকল্যাণ হবে—

হরনাথ : সব শুনব স্যার– আপনি আগে ঘরে আসেন– (সবার ঘরে প্রবেশ)

শমীক : হরনাথ, ভাই আমি খুব বিপদে পড়েছি (ছোট জগু প্রবেশ করে– লক্ষী বেরিয়ে যায়)

হরনাথ : জগন্নাথ, বাবা এদিকে এসো– প্রণাম করো– আমার স্যার (জগন্নাথ প্রণাম করে)

শমীক : থাক, থাক– বাবা তুমি একটু ঐ ঘরে যাও– আমরা একটু কথা বলব (জগন্নাথ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে) হরনাথ, আমি আজ ছুটির দিন তাই নিজে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলাম– কিন্তু তোমার বাড়ির সামনে ঐ মোড়টায় হঠাৎ একটা লোক কোত্থেকে এসে আমার গাড়ির সামনে পড়ল– আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওকে চাপা দিয়ে দেই– মনে হয় মরে দেছে– লোকে তাড়া করছিলো– কোন ভাবে পালিয়ে তোমার এখানে (লক্ষী হাতে ট্রে-তে করে জল-চা নিয়ে প্রবেশ করে। শমীক তাড়াতাড়ি সবটা জল খেয়ে নেয়)

হরনাথ : স্যার, কেউ দেখেনিতো আপনি যে আমার বাড়ি এসেছেন?
শমীক : না—
হরনাথ : ঠিক আছে আপনি এখানেই থাকুন– আমি মোড়টায় গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আসি।
শমীক : না - না- তার জন্য নয় - আমি নিজেই থানায় যাব– তোমাকে নিয়ে–
লক্ষী : থানা? পুলিশ– বাবু আপনি ?
শমীক : (লক্ষীকে) বোন আমার– তুমি কোন চিন্তা করো না- আমি আছি– শোন হরনাথ আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই– তাই যদি বলি আমি এক্সিডেন্ট করেছি তাহলে সমূহ বিপদ– তাই বলছি– থানায় গিয়ে বলব– তুমি গাড়ি চালাচ্ছিলে– তোমার লাইসেন্স আছে– তোমার বেশি শাস্তি হবে না (জগুর শরীর বিন্যাসে যন্ত্রণা ফুটে উঠেবে– তখন মাকড়সার জাল এর ছবি মুখে থাকবে না)
লক্ষী : এ আপনি কি বলছেন? না - না - এটা কিভাবে হয়?
শমীক : বোন আমার– আমি আছি– আমার তো পয়সার অভাব নেই– তোমাদের ভরণ-পোষণ সবকিছুর দায়িত্ব আমার– বড়জোর শাস্তি হলে হরনাথের ৬ মাসের জেল হবে– (হঠাৎ হরনাথের পা জড়িয়ে ধরে) ভাই আমি তোমাকে প্রচুর টাকা দেব– আমার এই উপকারটা করে দাও (পকেট থেকে একগুচ্ছ টাকা বের করে লক্ষীর হাতে দেয়) আপাতত এইটা রাখ—
হরনাথ : শমীকবাবু আমি আপনার নুন খেয়েছি। আপনার বিপদে তো আমার দাঁড়ানো দরকার– কিন্তু
লক্ষী : না - না- তুমি এইসব কি বলছ? জগু ছোট– আমাদের সংসার, জগুর পড়াশুনা কিভাবে চলবে?
শমীর : আমি আছি তো বোন– টাকা পয়সার কোন চিন্তা করো না– সব ড্রাইভারই কোন না কোন সময় অ্যাক্সিডেন্ট করে – আর যেহেতু লাইসেন্স আছে বড়জোর ছয় মাস– আমি টাকা দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনব– আমি জগুর পড়াশোনা– তোমার ভালো থাকা, সব দেখব – অনেক অনেক টাকা দেব– (লক্ষীর পায়ে ধরে) আমাকে এ যাত্রায় বাঁচাও বোন।
লক্ষী : আঃ আঃ এ আপনি কি করছেন? আমি কিচ্ছু জানি না—
শমীক : আগামীকাল বোন তোমার হাতে হরনাথের আগামী এক বছরের বেতন অগ্রিম দিয়ে যাব। আর জেল থেকে আসার পর হরনাথের বেতন দ্বিগুন করে দেব—
হরনাথ : লক্ষী– স্যার এর টাকা দিয়ে আমি এতদিন সংসার চালিয়েছি– আজকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলে ভগবান আমাকে ক্ষমা করবে না—
শমীক : ভাই তুমি বাঁচালে– চল চল (জগু দৌড়ে বেরিয়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে)
হরনাথ : বাবা তুমি কয়েকটা দিন মা-র সঙ্গে থাক– আমি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসছি– ভালভাবে পড়াশুনা করবে।

জগু : (কান্না) বাবা– আমি যে তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না—

শমীক : বাবা কালকে তোমার জন্য অনেক খেলনা নিয়ে আসব– ক্রিকেট সেট– VDO Game – আরো অনেক কিছু—

হরনাথ : (জগুকে ছাড়িয়ে) চলুন স্যার (প্রস্থান) (লক্ষী হাতে টাকা নিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে– জগু মা-র হাত থেকে টাকা নিয়ে মা-র গায়ে ছুড়ে মেরে তীব্র চিৎকার দেয়– আঃ আঃ আঃ সঙ্গে সঙ্গে বড় জগুর গগণ বিদারী চিৎকার– শ-মী-ক)
[হরনাথের বাড়ির আলো নিভে যায়]
(জগুর মুখে তখন মাকড়সার জাল ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে– জগুর যন্ত্রণা বাড়ছে– আনুষঙ্গিকআবহ, হরনাথের বাড়ির জোনে জেলের কুঠুরি তৈরি হবে—কুঠুরির ভেতরে হরনাথ– বাইরে লক্ষী ও জগু– লক্ষী কাঁদছে)

জগু : বাবা তুমি কবে বাড়িতে আসবে?

হরনাথ : (উদাস) হু—

জগু : বল না কবে বাড়িতে আসবে? জান বাবা আমি এবার ফাইভে থেকে সিক্স-এ উঠতে ৩টা বিষয়ে ক্লাসে সবচেয়ে বেশী নাম্বার পেয়েছি—
(হরনাথ কুঠুরির বাইরে হাত বাড়িয়ে জগুকে ধরে কেঁদে ফেলে)

লক্ষী : তুমি কেমন আছ?

হরনাথ : ভালই, চোখটাতে একটু সমস্যা, শমীক স্যার টাকা দেয় তো?

লক্ষী : গত দুমাস ধরে দেয় না– এর আগে চার-পাঁচবার যাওয়ার পর দিয়েছে। তোমার কাছে আসে কি?

হরনাথ : যেদিন যাবজ্জীবন সাজা হল– সেদিন লাস্ট এসেছিল– তারপর আর আসেনি– সুনীল আসে তো? আমি ওকে বলেছি তোমার খেয়াল রাখতে—

লক্ষী : হ্যা, সব সাহায্য সুনীলদাই করছে (হরনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই জোনে আলো নিভে। জগুকে ধীরে ধীরে কিছু মুখোশ ঘিরে ধরে – আনুষঙ্গিক আবহ)

মুখোশ-১ : জগন্নাথ এই বয়সে এসে কি বোঝ?

মুখোশ-২ : আমি শমীক

মুখোশ-৩ : আমি সুনীল-

মুখোশ-৪ : আমি লালসা- লোভ-

মুখোশ-৫ : আমি তোমার মা-

জগু : (চিৎকার দিয়ে) না- না- না– আমার কোন মা নেই– মা একজন– যে আজ সুনীলের বৌ– আমি জগন্নাথ– একা– জগন্নাথ - জগু– স্বর্গীয় হরনাথ চক্রবর্তীর একমাত্র সন্তান– তোমরা এখন যাও—

মুখোশ কোরাস : (হাসি) হা - হা - হা - সমাজটাকে দেখো- বাস্তব আর স্বপ্নের ফারাকটা বোঝো! – জীবন্ত কুঁড়ি ঝড়ে যায় বিষক্রিয়ার ফলে-ফুলের দেখা মিলবে কি

আর? - (কোরাস প্রস্থান, আলো স্বাভাবিক হয়)

জগু : [একদম স্বাভাবিক– গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। কোন জায়গা থেকে মদ বের করে গলায় ঢালে] আহ্- প্রি-পেইড– জগন্নাথ চল- এবার আমরা ঘুমাই– পেটে ওষুধ দিয়ে দিয়েছি - ঘুমের জন্য প্রি-পেইড ইনভেস্টমেন্ট– আর চিন্তা নেই– আবার আমি একপাশে আমার স্বপ্নকে কোলবালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব– এখন আমি জগন্নাথ টু জগু– ক্লাসের সেকেন্ড বয় থেকে– হোটেলের বয় (বিদ্রূপাত্মক হাসি) কোন ব্যাপার নয়– চল- জীবন যেমন– সেভাবেই দেখি– মাটিতে থাকতে হবে তো?— এবার ঘুম– কাল সকালে আবার ২-এ দুটো ভাত, ৩-এ মাছ, ১-এ সব্জি (হাসি) হা- হা- হা- জীবন চলবে– সবটাই প্রি-পেইড, সাধুরা বলে ভাগ্যলিখন। "পৃথিবীটা বড় রঙিন/ ভাবছে একথা খোকন .... (নচিকেতা) (গানের পরে আবার মুখোশেরা আসে– জগু প্রায় ঘুমিয়ে গেছে-)

মুখোশ-১ : জগু -

মুখোশ-২ : ঘুমিয়ে গেছো?

মুখোশ-৩ : আমরা তো তোমাকে ঘুমোতে দেব না

মুখোশ-৪ : ভাব - ভাব - ভাব

মুখোশ-৫ : তোমার বাবা- মা- শমীক - সুনীল

জগু : আঃ আঃ আঃ (মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে, আলো-আবহ আনুষঙ্গিক) আমি বাঁচতে চাই– তোমরা যাও।

মুখোশ-১ : কোথায় যাবো?

মুখোশ-২ : তুমিই তো আমি

জগু : আমাকে মুক্তি দাও– কেন তোমরা বার বার আস?

মুখোশ-৩ : তুমি যেভাবে জীবনকে দেখছো তা সবাইকে সেভাবে দেখাতে

মুখোশ-৪ : জগু, তুমি আত্মহত্যা কর

মুখোশ-৫ : এই সমাজে তোমার কি কিছু দাম আছে?

জগু : না- না- না নেই– নেই আমার কোন দাম– তবুও– আমি মরতে চাই না "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে – মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

মুখোশ কোরাস : (তীব্র হাসি)

মুখোশ-১ : তুমি তো জগু– এখন ক্লাস নাইনে নও—

মুখোশ-২ : ক্লাস নাইনে ছিলে জগন্নাথ — এখন তো জগু

মুখোশ-৩ : তারপরও তুমি বাঁচতে চাও?

জগু : হ্যা - হ্যা - হ্যা আমি বাঁচতে চাই–যুদ্ধ করেই বাঁচব– যতদিন বাঁচব– ততদিন সমাজের সামনে আমি আয়না (দর্পণ) হয়ে থাকব– সমাজ নিজেকে দেখতে পাবে আমার মধ্যে।

মুখোশ-৫ : বাঁচতে পারছো তো জগন্নাথ?

জগু : না- আমি এখন জগন্নাথ নই— জগন্নাথ মরে গেছে, বাবার যেদিন জেল হয়েছে সেদিনই – শমীকের তেজে জগন্নাথ-হরনাথ মরে গেলো

মুখোশ-১ : শমীকদের এত তেজ? কিসের জগন্নাথ– না না জগু?

জগু : শমীক একটা জাতি– এই সমাজের এক তেজোদ্দীপ্ত জাতি– যাদের তেজে সূর্য দেবতাও সানস্ক্রীন লোশন মেখে উদিত হয়– আর আমরা তো কোন ছাই

মুখোশ-২ : তারপরও কেন ছেড়ে চলে যাচ্ছ না জগু?

জগু : আঃ (বিরক্ত) তোমরা এখন যাও তো– রোজ রোজ এই এক কথার জবাব আমি দিতে পারব না– আমি বাঁচবো - জগু হয়েই বাঁচবো

মুখোশ কোরাস : (গান) চল যাব তোকে নিয়ে / এই শহরের অনেক দূরে/ ... মিথ্যে কথার মেকী শহরের সীমানা ছাড়িয়ে (নচিকেতা-র গান)

(গানের পর) (জগু স্থির হয়ে শুয়ে আছে। আবার একটু মদ ঢালে গলায়– শুয়ে শুয়েই চিৎকার করে উঠে– "হে ঈশ্বর পরের জন্মে যদি পাঠাও আমাকে মানুষ করে পাঠিও না– ভালো কোম্পানির কুত্তা বানিয়ে পাঠিও– জগুর থেকে ভালো কোম্পানির কুত্তারও ভালো জীবন কাটায়" লাফ দিয়ে উঠে বসে "থুঃ থুঃ– সমাজ - তুই শুনে রাখ - আমি আজ ৪০ বসন্ত- না বসন্ত না বর্ষা, হ্যাঁ ৪০ বর্ষা পার করা জগু - তোর উপর থুকছি– তুই আমাদের ভালো হতে বলছিস– তুই কবে ভালো হবি? কবে ভালো হবি? বল– বল (কান্না) পারবি কি আর জগুকে আবার জগন্নাথ বানাতে?" (কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে)

আলো নিভে

তৃতীয় দৃশ্য

(হোটেলের ভিতরের দৃশ্য। হরি ধূপ দেখাচ্ছে– (গান) ভবে আইছ একা/ যাইবা একা/ ... দিন যায় চইল্যা (ভক্তিগীতি)

হরি : জগু সব রেডি তো?

জগু : হ্যা - সব রেডি

হরি : পার্বতী - জগ গুলোতে জল দাও - আর বাটিগুলোতে নুন- লেবু/ পেঁয়াজ দিও না– কাস্টমার চাইলে তবেই দিও - পেঁয়াজের যেই দাম (গান - ভবে আইছ একা ....) (ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে বসে - একজন লোক আসে - কথা বলে টাকা দেয় - খেতে বসে - জগু ভাত-সব্জি এইসব দিচ্ছে - এইভাবে হোটেলের একটা পরিবেশ তৈরি হবে– যারা আসবে - সবাই টাকা দিয়ে খেতে বসছে - একজন আসবে মস্তান ধরণের– টাকা আগে না দিয়ে বসে যায়)

মস্তান : জগুদা ভাত দাও– আমার তাড়া আছে– আর সঙ্গে মাংস লাগাও—

হরি : কোন কিছুই লাগবে না– যতক্ষণ না টাকা দিবি

মস্তান : মানে?

হরি : আগের খাতাটা খুলব? কি খাবি বল– তারপর টাকা দে– সব পাবি

মস্তান : হরিদা ভালো হচ্ছে না কিন্তু বলে দিচ্ছি

হরি : তুই আমাকে কি বলবি? তুই কেমন মস্তান আমার জানা আছে– সত্যি সত্যি বেটা হলে বৌ-কে দিয়ে তাড়াতাড়ি রান্না করিয়ে খেয়ে আসলি না কেন? বৌ-এর সঙ্গে বুঝি পারিসনি– তাই আজ হরির হোটেলে এসে মস্তানি? সব জানি– (মস্তান অনেকটা নরম হয়ে যায়)

মস্তান : হরিদা - আমি কি টাকা দেবনা নাকি? বল আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে কানু কারোর টাকা মেরে খেয়েছে?

হরি : টাকা মেরে খাবি কেন? খাওয়ার পর টাকা মের দিস– যেমন আমার– দিবি না কেন– আমি সব হিসেব জীবনবাকি-র খাতায় লিখে রেখেছি। উপরে গিয়ে হিসেব দিবি– তাই এখন হরির হোটেল "প্রি-পেইড হোটেল" আগে টাকা – তারপর খাওয়া।

কানু : বুঝেছি-বুঝেছি- এখন জগুদাকে বলো খাবার দিতে।

হরি : আজই লাস্ট– জগু দেখ কি লাগবে (জগু খাবার দেয়- ভাত মুখে দিতে গিয়ে কানু উঠে দাঁড়ায়– ক্যাশ কাউন্টারে যায়)

কানু : নাও - ১২০ টাকা - শুধু তোমার হোটেলে খেতে আসি শুধু তুমি দু'নম্বরি করনা বলে (একজন-দুজন করে প্রবেশ করবে– টাকা দেবে– টেবিলে বসবে- জগু পার্বতী খাবার দিচ্ছে– আনুষঙ্গিক কথাবার্তা চলবে) (নেপথ্যে একটি গাড়ি থামার শব্দ– দেখা যাবে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার প্রবেশ করছে)

মেয়ে-১ : ছিঃ এখানে খাবো?

মেয়ে-২ : রাখতো, খুব ক্ষিদে পেয়েছে– মনে হয় ভালোই হবে

বাবা : ভালো খাবার বুঝি না– এখানে একটাই হোটেল– ক্ষিদে পেয়েছে এখানেই খেতে হবে– আরো তিন ঘন্টা রাস্তা বাকি

স্ত্রী : তোরা না জেনে শুনে এই হোটেলকে ঘেন্না করছিস কেন বলতো? খাওয়াতো ভালোও হতে পারে– আগে চল না গিয়ে দেখি—

(হোটেলের মুখে - হরি এগিয়ে আসে - হাত জোড় করে ওদেরকে নিয়ে বসায় - দামি কাস্টমারকে তোষামোদ করার ভঙ্গিমায় জগু পার্বতীকে আদেশ দেয়– অ্যাডভান্স টাকাও নেয় না)

হরি : স্যার- স্যার আসুন -বসুন-বলুন আমি কি সেবা করতে পারি? ম্যাডাম ওখানে জল আছে– হাত-মুখ ধুয়ে নিন (সবাই খেতে বসে) স্যার কি দেব?

কানু : হরিদা পেঁয়াজ দাও (আরো এক-দুজন আসে - হরিকে টাকা দিয়ে গিয়ে খেতে বসে - জগু তাদের খাবার দিতে ব্যস্ত থাকে)

বাবা : কি আছে?

স্ত্রী : মাংস ভালো হবে তো?

কানু : (উঠে যেতে যেতে) হরিদার হোটেলে দু'নম্বরি নেই ম্যাডাম, নিশ্চিন্তে খেতে পারেন– আপনাদের শহরের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়– আমি তো কাজের জন্য শহর-গ্রাম ঘুরি– তাই বললাম।

স্ত্রী : ধন্যবাদ ভাই (কানুর প্রস্থান)

মেয়ে-১ : মটন হবে?

হরি : খাঁটি পাঠার মাংস পাবেন দিদিমনি।

মেয়ে-২ : মাংসটা খাঁটি? না পাঠাটা খাঁটি? কোনটা? (হাসি)

হরি : (নিরাশ হয়ে) কি বলবো দিদিমনি– (জগু মাঝে মাঝে তাকায়– ওদের পছন্দ করছে না বোঝা যায়)

বাবা : ঠিক আছে ভাই– দু'প্লেট মটন দিয়ে দাও– এক প্লেট চিকেন– আর মাছ কি আছে?

হরি : লোকাল কাতল আর চারাপোনা—

বাবা : ঠিক আছে আমাকে কাতল দাও—

হরি : পার্বতী বাবুদের থার্মোকলের প্লেইট দাও - ক্যাশ-এ আছে-
(পার্বতী ক্যাশ থেকে থালা বের করে তাদের দেয় — হরি নিজ গলায় গামছা ঝুলিয়ে ওদের নিজ হাতে খাবার দিতে থাকে– ওরা নিজেরা গল্প করতে করতে খেতে থাকে (কোন একজন কাস্টমার ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে - "হরিদা মৌরির বাটিটা কোথায়?")

হরি : দাঁড়াও দিচ্ছি (ক্যাশ কাউন্টারে যায় - কোন একজন মেয়ে স্যালাড চায়)

পার্বতী : শশা হবে দিদিমনি - দিচ্ছি - জগুদা দু'নম্বরে শশা আর লেবু দাও (জগু শশা নিয়ে আসে - চোখ যায় মেয়েদের বাবার দিকে - চমকে উঠে - থমকে দাঁড়ায়)

মেয়ে-১ : কি হলো দিন - দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছেন কি? (জগু দিয়ে চলে যায় - আবার ফিরে আসে - মেয়েদের বাবার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ায় - চোখে চোখ-চোয়াল শক্ত)

জগু : শমীক ব্যানার্জী?

শমীক : হ্যা ভাই, কিন্তু তোমাকে তো চিনলাম না—

জগু : চিনলেন না? চিনবেনইবা কিভাবে? হরনাথ চক্রবর্তী —মনে পড়ে? (শমীক চমকে উঠে- কিছু লুকোচ্ছে– তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে যায়– জগু স্থির)

স্ত্রী : কী হলো? উঠে পড়লে যে?

শমীক : না—আমি আর খাবো না। নীলাঞ্জনা তাড়াতাড়ি কর– অনেকটা পথ যেতে হবে– (শমীক হাত ধোয় - মেয়েদের তাড়া দেয় -) এই তোরা তাড়াতাড়ি কর– রাস্তায় না হয় কিছু টিফিন করে নিবি –

নীলাঞ্জনা: (মেয়েদের) এই ওঠ - আর খেতে হবে না– শুনলি না বাবা কি বলছে? (সবাই উঠে পড়ে– হাত ধোয়– শমীক টাকা দেয়– জগু শমীকের পেছন পেছন ঘুরছে)

শমীক : তুমি আমার পেছন পেছন ঘুরছো কেনো?

জগু : (দৃঢ়ভাবে) এটা প্রি-পেইড হোটেল– কিন্তু আমার মালিক আপনাদের পোষাক-আসাক দেখে অ্যাডভান্স টাকা নেয়নি– তাই ঘুরছি– যদি টাকা না দিয়ে পালিয়ে যান?

মেয়ে-২: এ্যাই অসভ্য– তুই কি বলছিস?

জগু : (দৃঢ়ভাবে) আমি অসভ্য? ঠিক আছে।

শমীক : আপনার কত হলো?

হরি : ৫৮০ টাকা (শমীক ৬০০ টাকা দেয়) আমার কাছে তো খুচরো নেই স্যার

শমীক : রেখে দাও - লাগবে না - এ্যাই আমি গাড়িতে যাচ্ছি - তোমরা তাড়াতাড়ি এসো

জগু : মাত্র ২০ টাকা এক্সট্রা দিয়ে গেলেন স্যার? বাকীটা? গাড়িটা কি নিজেই চালাচ্ছেন?

নীলাঞ্জনা: (হাত ধুয়ে এসে) ভাই ব্যাপারটা কি? কিছুই বুঝলাম না তো?

জগু : আপনার স্বামীকে জিজ্ঞেস করবেন।

মেয়ে-১ : তুই বলতে পারিস না? Bloody bustard?

জগু : (প্রচণ্ড রেগে) Don't talk like this - bloody bustard? Who is bloody bustard ? First of all you have to lern how to behave with anybody. Is it your education?

মেয়ে-২: ওমা - এ যে ইংরেজি ঝাড়ছে রে (নেপথ্য থেকে শমীক ডাক দেয় - ওরা সবাই বেরিয়ে যায় - জগু রাগে কাঁপতে থাকে)

পার্বতী : জগুদা কি হলো? (জগু ক্ষিপ্রভাবে বেরিয়ে যায়– নেপথ্য থেকে)

জগু : বৌদি আজ হোটেলটা তুমি একটু দেখো– আজ আমি আর পারবো না (সবাই নির্বাক)

আলো নেভে

চতুর্থ দৃশ্য

(সময় সন্ধ্যা - হোটেলের সামনে হাসিখুশিবাবু– শিবু- হরি সবাই বসা - গল্প করছে– জগু নেই)

হাসিখুশিবাবু : হরি আজকে জগু কোথায়?

হরি : দুপুর থেকেই পাত্তা নেই– এই পাগলকে নিয়ে যে আমি কি করি?

শিবু : আর কি মাল টানছে নিশ্চয়ই—

হরি : শিবু যা জানিস না সে বিষয় নিয়ে কথা বলবি না– তুই কি জানিস জগু সম্পর্কে?

হাসিখুশি : জগু কিন্তু একটা রহস্যময় চরিত্র—

হরি : আপনারা বুঝবেন না— একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি— বড় হয়েছি— কোনদিন কোন দুঃখের কথা সে আমাদের বলত না— সবসময়ই বলত যখন যেমন তখন তেমন (নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসে – জগুর গলা - "কবে যে কোথায়/ কি যে হলো ভুল/ জীবন জুয়ায় হেরে গেলাম— শিবু বের হয়ে দিয়ে জগুকে ধরে নিয়ে আসে - চূড়ান্ত মাতাল)

হাসিখুশি : কি ব্যাপার জগুবাবু? আজ কি পাঁচ-ছয়-সাত টানও হয়ে গেছে নাকি? (জগু নিশ্চুপ নেশার ঘোরে বলছে দাঁত-দাঁত)

শিবু : কি বলছিস জগু দাঁত-দাঁত?

জগু : দাঁত

হাসিখুশি : আরে ভাই রোজ সন্ধ্যাবেলায় আসি তোমার কথা শুনতে— আর তুমি বলছ - দাঁত- বিষয়টা খুলে বলবে তো?

হরি : (জগুর গালে চড় দেয়- কিছুটা জল দিয়ে মুছিয়ে দেয় - এই পার্বতীকে ডাকব? (পার্বতীর নাম শুনে জগু সোজা হয়ে বসে-মাটিতে মাথা ঠোকায়) আমার মা-বৌদি না- please don't do this- বৌদি আসলে কিছু বলতে পারব না।

শিবু : ঠিক আছে— বৌদি আসবে না— দাঁতের বিষয়টা একটু খুলে বল-

জগু : দাঁত-দাঁত শরীরের এমন একটা অঙ্গ যে নাকি মুখের সৌন্দর্য বাড়ায় - কিন্তু কাজ? কাজ হচ্ছে ধ্বংস করা - সব কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিজেকে অপরিহার্য করে দেখাতে চায় - সমাজেও এমন কিছু লোক আছে - দাঁতের মত- শমীক ব্যানার্জী

হাসিখুশি : (কিছু বুঝতে না পেরে) আজকে কয় টান হয়েছে জগুবাবু?

জগু : জগন্নাথ ওরফে জগু কোন দিন পাঁচ টান দেবে না -তবে হাসিখুশিবাবু মিথ্যে বলব না— আজ আমি চার পেগই খেয়েছি তবে বড় বড় করে— তবুও কিন্তু চার পেগের বেশি খাইনি - কারণ আমি যে

হরি : তবে কেন এমন খেলি?

জগু : (তন্দ্রাচ্ছন্ন) শমীক ব্যানার্জী

শিবু : তুই তো কোনদিন এমন করিস না— আজ কি হলো বার বার শমীক ব্যানার্জী- শমীক ব্যানার্জী করছিস - কে এই শমীক ব্যানার্জী - আবার বলছিস দাঁত - কিছুই তো বুঝতে পারছি না (জগু প্রচণ্ড রাগে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে কিন্তু টাল খেয়ে পড়ে যায়)

জগু : দাঁত - শরীরের সৌন্দর্য বাড়ায় কিন্তু করে সব কাজ ধ্বংসের - শমীক ব্যানার্জী - এমনই এক লোক যে নাকি সমাজে যশ-প্রতিপত্তি-সম্মান সব পেয়ে আসছে - সমাজের সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে— কিন্তু (জগু হাউ হাউ করে কেঁদে দেয় - হরি ও হাসিখুশি এগিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয় - জগু কাঁদতে কাঁদতে -) ক্লাসের সেকেণ্ড বয় - ক্লাস নাইন - বাবা জেলে - চোখ অন্ধ - মা-মা- পালালো সুনীলকাকুর সঙ্গে

- আর এই জগন্নাথ- জগন্নাথ চক্রবর্তী? হয়ে গেলাম জগু - পড়ে রইলাম সমাজ নামক ডাস্টবিনে (রাগ) কেন? কেন? বাবা মরল জেলে– মা-র আর কোন খোঁজ পেলাম না– পড়াশুনা ছেড়ে আজ এই গ্যারেজে– কাল ঐ বাইকের ওয়ার্কশপ-এ শেষে হরি (হরিকে ধরে প্রচণ্ড কান্না) হে - হে আমার বন্ধু না - আমার বাবা - বৌদি আমার মা - ওরা যদি আমাকে না ধরত– তবে আজকে আমি এই পৃথিবীতেই থাকতাম না (মাতালের মতো হরিকে পায়ে ধরে প্রণাম করে)

হরি : শিবু, দাদা আপনারা আজকে চলে যান— আমি দেখছি– ওর অবস্থাটা আজ বেশি ভালো না।

হাসিখুশি : (দীর্ঘশ্বাস) বুঝলে হরি- আজ বয়সের শেষ প্রান্তে– কিন্তু এখনো সমাজটাকে বুঝলাম না– চল শিবু (দু'জনের প্রস্থান। জগু স্থির হয়ে বসে থারে - হরি ভেতরে চলে যায় - জগু গান ধরে)

জগু : (গান) কবে যে কোথায়/ কি যে হলো ভুল/ জীবন জুয়ায় হেরে গেলাম (গানের মাঝখানে হরি পার্বতীকে নিয়ে প্রবেশ করে - পার্বতী জগুর কাছে গিয়ে বসে- অত্যন্ত স্নেহশীলা)

পার্বতী : জগুদা চল - আজ আমাদের সাথে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে - আজ হোটেলে খাবারও নেই - সব শেষ হয়ে গেছে—

জগু : (কেঁদে দেয়) বৌদি তুমি বল– আমার কি দোষ ছিল? কি ভুল আমি করেছিলাম? আমার বাবা গরীব ছিল– এই তো? মালিকের নুন খেয়েছে বলে ছলনা বুঝতে পারল না– শমীক ব্যানার্জী টাকার জোরে বেঁচে গেল– বেইমানি করল আমাদের সঙ্গে– মা-ও লোভ আর লালসায় অন্ধ হয়ে আমাকে ভুলে গেল– আর আমার বাবা জেলে পচে মরল– আর আজ আমি মরছি– তিলে তিলে– বৌদি তুমি বল আমার কি দোষ ছিল?

পার্বতী : সব তো জানি জগুদা– কেন এমন করছ? আমরা আছি না? এখন ঘরে চল - খাবে- খেয়ে একটু ঘুমাও– সব ঠিক হয়ে যাবে– (হরিকে) এ্যাই তুমি একটু জগুদাকে ধর– (সবার প্রস্থান)

আলো নেভে

পঞ্চম দৃশ্য

(সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ঘর - আর্থিক প্রাচুর্যতার ছাপ স্পষ্ট - ভেতর থেকে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে শমীক ব্যানার্জী-স্ত্রী নীলাঞ্জনা-দুই মেয়ে রুমকি-ঝুমকির প্রবেশ)

নীলাঞ্জনা : না-না- আমরা কোন কথা শুনছি না– তোমাকে বলতেই হবে– কেন তুমি হোটেল থেকে পালিয়ে আসলে?

রুমকি : কে এ্যাই হরিনাথ চক্রবর্তী? কে এই ছেলেটা? তোমার সাথে কি সম্পর্ক তাদের?

ঝুমকি : তোমাকে বলতেই হবে তুমি কি লুকোচ্ছ?

শমীক : আঃ আমাকে একটু একা থাকতে দাও-

নীলাঞ্জনা : ঐ ছেলেটা তোমার জারজ সন্তান নয় তো?

শমীক : কী বলছ – যা তা—

নীলাঞ্জনা : তাহলে কি এমন ঘটনা– যা তুমি বলতে পারছ না?

রুমকি : বাবা দেখো– আমরা তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি– আমাদের আদর্শ তুমি– কি হয়েছে সত্যি কথাটা বল—

নীলাঞ্জনা : আমি শেষবারের মতো বলছি– তুমি ভালো করে জান আমি financially যথেষ্ট sound- । আমার মেয়েদের আমি একাই পারব মানুষ করতে– সত্যিটা বলবে কি বলবে না? আমি পরিস্কার বলে দিচ্ছি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কিন্তু আমি প্রস্তুত-

ঝুমকি : (কেঁদে দেয়) বাবা তুমি বল না কি হয়েছে? কী এমন ঘটনা যা তুমি আমাদের বলতে পারছ না–

শমীক : জেনে কি করবি মা– যা করেছি তোদের ভালোর জন্যই করেছিলাম

নীলাঞ্জনা : ভালো খারাপ বুঝি না– আমরা সত্য জানতে চাই– বলবে কি বলবে না? এ্যাই রুমকি-ঝুমকি চল– (তিনজন ভেতরে চলে যায়– শমীর অস্থির - আত্মদংশন- দৃশ্যায়ন উপযোগী আবহ– আলোর সাহায্যে হরনাথ, লক্ষী, জগু এদের মুখ বার বার ভেসে আসবে- চলে যাবে - আবার আসবে - শমীকের যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। নীলাঞ্জনা ওরা বাড়ি ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে আসে– আলো আবার স্বভাবিক হয়)

শমীক : প্লিজ নীলাঞ্জনা– আমায় ছেড়ে যেওনা– সব বলছি (নীলাঞ্জনা বসে পরে - মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে)

নীলাঞ্জনা : বল—

শমীক : পঁচিশ বছর আগের কথা– ঐ ছেলেটার বাবা আমার গাড়ি চালাত—

নীলাঞ্জনা : আমাদের গাড়ির ড্রাইভার হরনাথ যে ছিল– এর কথা বলছিলে? ওকে না তুমি চাকরি থেকে ছাটাই করে দিয়েছিলে কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করায়?

শমীক : আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম– রুমকি তখন তোমার কোলে– ঝুমকির জন্ম হয়নি- ঐ অ্যাক্সিডেন্টে লোকটাকে আমি পিষে দিয়েছিলাম– আমার তখন ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না– তাই টাকার লোভ দেখিয়ে (মাইমে কথা চলবে- হরনাথকে দেখা যাবে জেলে বন্দি - লক্ষী যুবক শমীকের কাছে টাকা চাইছে - পায়ে ধরছে - শমীক জগু-লক্ষীকে লাথি মেরে বের করে দেয়– বড় শমীকের ঘরের আলো নিভে যাবে– অন্য জোনে আলো জ্বলবে - দেখা যাবে যুবক শমীক মস্তান ধরণের সুনীলের সাথে কথা বলছে)

সুনীল : শমীকবাবু - আপনি ভালো করেই জানেন যে আমি কেমন লোক– আমাকে ক্ষেপিয়ে লাভ নেই– সব জানিয়ে দেব– পত্রিকা-টিভি-সব জায়গায়– আপনার জীবনটাকে তছনছ করতে আমার বেশি সময় লাগবে না– যদি আমাকে টাকা না দেন– তবে—

যুবক শমীক : এটা কি পেয়েছো তোমরা– একবার লক্ষী - একবার তোমাকে - আমি ক'জনকে টাকা দেব?

সুনীল : কই লক্ষীকে তো আপনি ৭-৮ মাস ধরে টাকা দিচ্ছেন না– শুনুন আমার সঙ্গে বাতেলাবাজি করবেন না– আমার টাকা লাগবে– সেই টাকা দিয়েই তো আমি লক্ষীর খায়েশ মিটাচ্ছি– আর সেই টাকা আপনি দেবেন– ব্যস—

যুবক শমীক : (নরম হয়ে) সুনীল শোন- তোমাকে একটা বুদ্ধি দেই– আমিও তা জানি তোমার আর লক্ষীর সম্পর্কটা– হরনাথ তো আর জেল থেকে বেরুবে না– ওখানেই মরবে– তাই বলছি– তুমি লক্ষীকে নিয়ে পালিয়ে যাও– আমি আমার পুনার অফিসে তোমার একটা স্থায়ী চাকরি দিয়ে দেব– তোমরা সুখে শান্তিতে ঘর করতে পারবে– তোমারও স্থায়ী একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে– লক্ষীরও কোন অভাব থাকবে না—

সুনীল : কিন্তু হরনাথ? জগন্নাথ? এদের?

যু. শমীক : (ক্রুর হাসি) আগে নিজের কথা ভাবো– তোমার বন্ধু তো আর বেরুবে না– আর ও তো তোমাকে পাওয়ার অব এ্যটর্নি দিয়েই দিয়েছে লক্ষীর দেখাশোনা করার জন্য– তাই লক্ষীর জীবনের ভাবনা এখন তোমাকেই ভাবতে হবে– আর যদি তা কর - তোমার জীবনেও তুমি নিশ্চিত হয়ে গেলে– আর জগন্নাথ - ওর কথা ছাড় - ও ঠিক একটা ব্যবস্থা করে নেবে– তুমি তোমারটা ভাব—

সুনীল : দেখছি চিন্তা করে—

যু. শমীক : আমার মতো ভালো লোক পাবে না– সৎ পরামর্শ দিচ্ছি– আমি আজই পুনার অফিসে ফোন করে বলে রাখছি– পালাও সুনীল পালাও ('পালাও' শব্দটি পুরো প্রেক্ষাগৃহে প্রতিধ্বনিত হবে- বৃদ্ধ শমীকের ঘরের আলো জ্বলবে)

ঝুমকি : আজকের ছেলেটা কি সেই জগন্নাথ?

শমীক : হ্যাঁ—

নীলাঞ্জনা : তুমি সুনীলকে চাকরি দিয়ে দিলে?

শমীক : না- সুনীল লক্ষীকে নিয়ে পালানোর পর ওর নামে পরস্ত্রী হরণের অপরাধের কেস দিয়ে দিলাম– আর পুলিশের ভয় দেখিয়ে এখানে সুনীলের ফিরে আসাটা আটকে দিলাম—

নীলাঞ্জনা : ছি- এতটা ছোট তুমি? চার-চারটা জীবন নষ্ট করে দিলে?

রুমকি : (ঘেন্না) কি বলছ মা? গাড়ি চালাতে না জেনে একটা নির্দোষ লোককে পিষে

দিল সেটা কি জীবন নয়?

ঝুমকি : বাবা - তুমি এ্যাই– এই বাবাকে আমরা এতোদিন আদর্শ মেনে এসেছি? তুমি তো পাঁচ-পাঁচটা খুন করেছো– ছিঃ বাবা ছিঃ

নীলাঞ্জনা : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়- দৃঢ়) এত বড় একটা ঘটনা এতদিন তুমি আমার কাছে লুকিয়ে রাখলে? অতবড় মুখোশধারী তুমি? কে জানে আরো কত ঘটনা লুকানো আছে? (কান্না) আমি এতবছর এমন একটা মুখোশধারীর সঙ্গে ঘর করেছি? ছিঃ রুমকি ঝুমকি চল— (প্রস্থানোদ্যত)

শমীক : (কাতর আবেদন) নীলাঞ্জনা-রুমকি-ঝুমকি আমাকে ছেড়ে তোরা যাস না– (কিছুটা এগিয়ে যায়)

নীলাঞ্জনা : এক পা-ও এগুবে না– আমি চললাম– আমি তোমার পাপের ভাগীদার হতে পারব না– (প্রস্থান)

[একা উদ্‌ভ্রান্ত শমীককে ঘিরে ধরে হরনাথ-লক্ষ্মী-সুনীল-জগু। প্রত্যেকের হাতে দড়ির ফাঁস, এক একজনের ফাঁস এক একবার শমীককে বেঁধে ধরছে, শমীক ছটফট করছে– কোন এক বীভৎস আলো-আবহের কোরিওগ্রাফির মধ্য দিয়ে পর্দা নেমে আসবে]

লেখক : **পার্থ মজুমদার**, ত্রিপুরার বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক ও নাটককার।

M.I.G.A
Make India Great Again
বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য

প্রথম দৃশ্য

(স্পেস ফাঁকা, দর্শকরা এসে চেয়ারে বসেন। বিনয় ছাড়া কাউকে দেখা যায় না স্পেসে। হাতজোড় করে বিনয়।)

বিনয় ঃ নমস্কার সবাইকে। আজকের এই অন্য ভাবনার আসরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আসলে এই পরিস্থিতির মধ্যে কতটা কি করা সম্ভব হবে সেটা নিয়ে আমরা বেশ চিন্তিত ছিলাম। তাও আপনারা এসেছেন আমরা সত্যিই আনন্দিত। আমাদের নাটকে সত্যি বলতে কোন গল্প নেই। গপ্প বলো বললেই জানেন গা টা রিরি করে ওঠে। কি গল্প বলব, কার গল্প বলব, একজনেরটা বললে অন্যেরটা বাদ যাবে না তো? তারচেয়ে বরং চলুন একটু বাস্তব দেখি। আসলে এই নাটকের মধ্যে, আরো অনেক নাটকের মতই, আমরা একটা খোঁজ চালিয়েছি। সত্যের খোঁজ। কারণ এখন যেন মনে হয় truth is stranger than fiction। কয়েকদিন আগে একটা টিভি সিরিজ দেখছিলাম, ভারতীয়, সেখানে একজন চরিত্র আরেকজনকে বলেছিল, " বলো তো পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিস কি?" আপনারা কেউ জানেন? না না কোন রাজকন্যার হার নয় বা রক্তমুখী নীলাও নয়। বিশ্বাস। Trust। হ্যাঁ । বিশ্বাস খুব দামী, precious, কারণ ইদানিংকালে এটা সচরাচর দেখা যায় না। উনি, মানে সেই চরিত্রটি ভালো বলেছেন, নিঃসন্দেহে, তবে আমার কি মনে হয় জানেন তো, বিশ্বের সবচেয়ে দামী জিনিস হচ্ছে সত্য। (একটু থেমে) সত্য হচ্ছে একাধারে সুন্দর এবং ভয়ংকর। It should be treated with great caution. (এমন সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে উঠে আসেন একজন। পোশাক,অঙ্গভঙ্গি কিছুটা মাস্তানের মতো।)

অভয় ঃ আমার একটা প্রশ্ন আছে।

বিনয় ঃ (একটু অপ্রস্তুত) কন......(নিজেকে শুধরে) বলেন।

অভয় ঃ তাহলে- আপনি বললেন *Truth is mighter than the sword*

বিনয় ঃ ওটা পেন।

অ ঃ হ্যাঁ?

বি ঃ পেন, কলম।

অ ঃ মানে?

বি ঃ মানে প্রবাদটায় পেন বলা।

অ ঃ পেন বলা?

বি ঃ হ্যাঁ। Pen is mighter than the sword.

অ ঃ (একজনকে দেখিয়ে, সাগরেদ গোছের কেউ) ওই শালা টোকাটা যা দিলি, (পকেট থেকে কাগজ বের করে দেখে) Google থেকে দেখেও ঠিক করে লিখতে পারিস না, শালা? সবার সামনে পেস্টিজের জিলিপি বানায় দিলি। (বিনয়কে উদ্দেশ্য করে) যাকগে আপনার কথায় আমার কিন্তু খুব হাসি পেয়েছে।

বি ঃ কই হাসতে তো দেখি নি।

অ ঃ ও ভিতরে খুব হেসেছি। অন্তর্যামী যেভাবে হাসেন সেই ভাবে।

বি ঃ ওটা কিভাবে।

অ ঃ এইভাবে। (ভাবলেশহীন ভাবে এক দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

বি ঃ এটা কি?

অ ঃ মনে মনে হাসা।

বি ঃ বাহ।

অ ঃ আরে আপনি মনে মনে গালি দিতে পারলে আমি হাসতে পারি না?

বি ঃ এই কে বলল আপনাকে আমি মনে মনে গালি দিচ্ছি।

অ ঃ এই যে আমি আপনার কথা কেটে দিলাম, এত কিছু করছি। আপনি মনে মনে আমায় গালি দিচ্ছেন না? সত্যি করে বলুন তো?

বি ঃ সত্যি। উফফ। আপনি কে মশাই!

অ ঃ আমি অভয়।

বি ঃ না মানে সেটা বলছি না।

অ ঃ তাহলে কি বলছেন আচ্ছা ছাড়ুন। শুনুন। আপনি কি বললেন Pen is mighter than the sword. তাইতো?

বি ঃ হ্যাঁ।

অ ঃ বলছেন একটি কলম তরোয়াল থেকেও ধাঁড়ালো?

বি ঃ মাইটিয়ার... যাকগে... হ্যাঁ তাই বলছি।

অ ঃ তাহলে তো দুদিন পর বলবেন যে আপনার একটি লেখা আমার এই পিস্তল থেকেও শক্তিশালী। (পেছনের পকেট থেকে ছোট পিস্তল বার করে)

বি ঃ (ভয় পেয়ে) এই আপনি কি করছেন। লেগে যাবে কারোর। আস্তে আস্তে।

অ ঃ কি করবেন লিখে, কতো লিখবেন। আর আমি এক গুলিতে ...Boom ... finish.

বি ঃ কি যা-তা বলছেন মশাই। এখানে একটা সভ্য মানুষের আসর বসেছে। একটু সিভিলাইজড হওয়ার চেষ্টা করুন।

অ ঃ জানি, আমার পোশাক আশাক, চলন বলন দেখে আমাকে আপনাদের ওই

বুদ্ধিজীবি লবির বলে মনে হচ্ছে না তো।

বি ঃ আরে আচ্ছা লোক তো।

অ ঃ (গান ধরে)।[1]

বি ঃ বাহ আপনি গান গাইতে জানেন?

অ ঃ তো এতক্ষণ কি স্ট্যানড আপ কমেডি করে দেখালাম?

বি ঃ না সেটা বলছি না।

অ ঃ আসলে আমার অবস্থা আমার এক বন্ধুর মতো জানেন। সে বেটা তোতলা। কিন্তু যখন গান গায় শালা সব তোতলামো বন্ধ। আমিও যখন গান গাই, তখন ওই আপনাদের ভাষায় ওটাকে কি বলে, শিল্পের পরশ লাগে যখন, আমার এক্সপ্রেশনগুলোও একদম শিল্পীসুলভ হয়ে যায়।

বি ঃ তাই নাকি! (অবাক হয়ে)

অ ঃ (হঠাৎ স্টান্স বদল করে) সত্যের রূপ, ভয়ংকর সুন্দর। এখানে তো লাল , নীল, সবুজের মেলা বসিয়েছেন কিন্তু এখানে তো সত্য কে পাবেন না।

বি ঃ পাবো না তাহলে কোথায় পাবো।

অ ঃ তার জন্যে তো জার্নি করতে হবে।

বি ঃ জার্নি করতে হবে! কোথায়?

অ ঃ into the eternal darkness, into fire, into ice.

বি ঃ কি? আপনি কি কমেডি করছেন?

অ ঃ হ্যাঁ। ডিভাইন কমেডি।

বি ঃ কি?

অ ঃ দান্তে। পড়েন নি নাকি!

বি ঃ আপনি দান্তে পড়েছেন?

অ ঃ হা হা হা (অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে)। ছাড়ুন। আপনি সত্যকে কাছ থেকে দেখতে চান? বাস্তবকে কাছ থেকে ধরতে চান? (পেছনে হামিং শোনা যায়)

বি ঃ হ্যাঁ?

অ ঃ আপনাকে দেখাতে পারি আমি।

বি ঃ কিভাবে দেখাবেন?

অ ঃ আসুন। একটু অংশগ্রহণ করতে হবে কিন্তু।

বি ঃ অ্যাঁ!!! (অবাক) (অভয় ধাক্কা দিয়ে ওকে সেন্ট্রাল স্পেসে ঠেলে দেয়) (মিউজিক টীম সুর ধরে। আস্তে আস্তে, দর্শকদের মধ্যে বসে থাকা নাটকের অন্যান্য সদস্যরা গানের তালে তালে স্পেসের মধ্যে ঢোকে। তারপর মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে গানটি গাওয়া হয়।)

(সবাই কোরাস)

miga miga miga miga miga

দিনে রাতে আলগোছে miga
মানুষের খিদে নাই
অহেতুক লোভ নাই
স্বপ্নের দুনিয়া কি এইটা?
miga miga miga miga miga
স্বপ্নের বাড়ী চাই
চাই ব্র্যান্ডেড জামা
টি শার্টে বিথোভেন
আর রিং টোনে বাদশাহ
OLA টা কবে পাবো
আগরতলায় বসে
জুগনু [2] তো আর ভালো লাগে না
miga miga miga miga
দিনে রাতে আলগোছে miga
তোমারো স্বপ্ন যতো আমারো তা আছে
India কবে হবে তাজা
miga miga miga miga miga

(নাচ ভেঙে যায়, দুজন চরিত্র- একটি ছেলে এবং মেয়েকে দেখা যায়, মেয়েটির হাতে গিফট)

ছেলে ঃ দেখা করো দেখা করো করে মাথা খারাপ করে দিয়েছিলে। হলো দেখা! জানো আমার সময় নেই একদম। এখন এরকম দেখা করে সময় নষ্ট করলে হবে না। এটা তো আমরা হোয়াটসঅ্যাপেও সেরে ফেলতে পারতাম। বা তুমি চাইলে zoom বা google মিটে elaborate একটা Birthday Party করা যেতো।

মেয়ে ঃ আমি চাইলে ...(হাসে)। (pause)আমার সঙ্গে দেখা করলে সময় নষ্ট হয় বুঝি। আর আমি তো elaborate কিছু চাইনি একলব্য। আমি তো তোমার সাথেই সময় কাটাতে চেয়েছি।

ছেলেঃ এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কেমন। এতো দাম দিয়ে একটা গিফট ও দিলাম তারপরো তোমার sobstory শুনতে হচ্ছে। আমার কি সময়ের দাম নেই নাকি? খুব সেলফিশ হচ্ছে ব্যাপারটা।

মেয়ে ঃ (হেসে) সেলফিশ!

ছেলে ঃ হ্যাঁ সেলফিস। তুমি কিছু বোঝো না। তুমি বুঝতে পারছো না যে success আমার হাতের মুঠোয়।

মেয়ে ঃ সেই success কি?

ছেলে ঃ প্রতিপত্তি, যশ, পয়সা, এক নম্বর হওয়া।
মেয়ে ঃ সেই তো। সত্যি আমি কিছু বুঝি না।
ছেলে ঃ Unbelievable, This is really frastrating, you know আর কি চাই তোমার?
মেয়ে ঃ তুমি তোমার সময় দিতে পারো আমায়, তোমার success - এর ভাগ করে নিতে পারো আমায়।
ছেলে ঃ প্লিজ। দেখো, এখন এতো রোম্যান্টিক কথা বলার সময় আমার নেই। আমি success - এর দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে। এসব বলে তুমি আমায় guilty feel করাতে চাইছ?
মেয়ে ঃ আমার কাছে আজ আমরা দেখা করেছি এটাই success । এই আগের মতো হরি'দার দোকানে চা খাওয়া হলো, একটু পুরোনো কথা বলা হলো, এই ছোট ছোট মুহুর্তগুলোই আমার কাছে প্রিয় এবং precious।
ছেলে ঃ তুমি একটা emotional fool।
(কোরাস শুরু আবার)

success চাই শুধু
বাকি সব ভুলে যাই
success মানে কি?
গোলমেলে বড় ভাই
মুহূর্তেরা সব
একে একে চলে যায়
আমি একা বসে থাকি
success নিয়ে ভাই
আমার জীবনী কবে best seller হবে
shortcut জানা আছে দাদা?
(মিউজিক বন্ধ)
আছে আছে। আও কভি হাভেলি পে ...
(আবার শুরু)
মিগা মিগা মিগা মিগা মিগা
দিনে রাতে আলগোছে miga
তোমারো স্বপ্ন যতো আমারো তা আছে
India কবে হবে তাজা
miga miga miga miga miga

(আবার নতুন ফরমেশন)
সম্পাদক ঃ তোমাকে বার বার বলেছি যেটা সত্যি সেটা লেখো।

সাংবাদিক ঃ তাই তো লিখেছি স্যার। আমি নিজে গিয়ে যাঁদের উচ্ছেদ করা হবে তাদের সবার সাথে কথা বলে ওদের পয়েন্ট অব ভিউ টা লিখেছি।

সম্পাদক ঃ ওদের পয়েন্ট অব ভিউ তোমাকে কে লিখতে বলেছে?

সাংবাদিক ঃ কেন স্যার। ওরাই তো আক্রান্ত সবচেয়ে বেশি। ওদের কথা লিখবো না তো কার কথা লিখব? জার্নালিস্ট হিসেবে I have a responsibility.

সাংবাদিক ঃ Don't teach me about journalist's responsibility or ethics. না তুমি ওদের কথা লিখবে না। ওদের কথা লেখার জন্য আমরা পত্রিকায় এতো বিজ্ঞাপন পাই না। সেই বিজ্ঞাপন থেকেই কিন্তু তোমার আমার স্যালারিগুলো আসে। এই যে 'বড়লোক কর্পোরেশন', জানো ওদের কতো টাকা ক্ষতি হচ্ছে, এই একটা বাজে স্লাম এরিয়াতে মাল্টিস্টোরি বানাতে গিয়ে, একদিকে ড্রেন, যা এই স্লাম ডুয়েলারস গুলোর না জানি কি ফেলে ফেলে বিষাক্ত করে রেখেছে। এদিকেই ওদের এতো মাথাব্যথা তার ওপর তুমি আবার ওই লোকগুলোর মুখ থেকে ওদের জবানবন্দী নিয়ে এসেছ।

সাংবাদিক ঃ কিন্তু স্যার ওরা কোথায় যাবে। ওদের এতোগুলো লোক কোথায় ঘুমোবে, কি খাবে?

সম্পাদক ঃ কোথায় থাকবে তা আমি কি জানি। আরেকটা স্লাম বানাবে। ওরা যেরকম করে থাকে।

সাংবাদিক ঃ আপনি কবে থেকে ওই বড়লোক কর্পোরেশনের দালাল হয়ে গেলেন স্যার।

সম্পাদক ঃ শোন তোমার এই আইডিয়ালিজম না তোমার কাছেই রাখো। তুমি জানো না এই ব্যাপারগুলো। নেহাত তুমি ভালো রিপোর্টার তাই তোমাকে আমি ফায়ার করছি না। তোমার এই রাবিশ খবরের জন্যে আমি আমার এমপ্লয়ির ভাত মারবো না। You can go now.

সত্যের বিবরণ
সত্যেরই প্রহসন
মুর্খের ভণ্ডামি
যাহা জল তাহা পানি।
আমারটা দেখে দিও আমি তোমারটা
তবেই না asli maja.
Miga miga miga miga miga
দিনভর রাতভর মিগা
তোমারো স্বপ্ন যতো আমারো তা আছে
India কবে হবে তাজা
miga miga miga miga miga

হঠাৎ তুমুল শব্দ, বোমা পড়েছে, চারিদিকে সাইরেন বাজছে।)

১ ঃ রাজপথে বিরাট হাঙ্গামা-পুলিশের লাঠিচার্জে আন্দোলনরত কিছু মানুষ আহত। আপনার প্রতিক্রিয়া?

২ ঃ না প্রতিক্রিয়া নেই কোন।

১ ঃ সে কি এতো বড় কাণ্ড ঘটেছে- তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই? কিছু বলুন।

২ ঃ না না, কিছু বলব না। রোজ রোজ এই একই কথা বলতে বলতে, একই জিনিষ দেখতে দেখতে ধ্বস্ত হয়ে গেছি-অর্থহীন লাগে শব্দগুলো।

১ ঃ রোজ রোজ। বাড়িয়ে বলছেন না একটু? যাই হোক কিছু তো বলতে পারেন।

২ ঃ নেই নেই কোন কথা নেই, শুধু কোটেশন পড়ে আছে কিছু- " কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

১ ঃ তবে এগুলো তো কোটেশন। নিজের কথা কিছু বলুন। পথে ঘাটে এতো খুনোখুনি, চুরি, রাহাজানি চলছে।

২ ঃ উন্নয়নকালে এরকম কিছু ঘটনা হয়ে থাকে ম্যাডাম। তাছাড়া চারিদিকে এত মেলা, খেলা, আহ্লাদের ফোয়ারা দেখতে পাচ্ছেন না? এর মধ্যে বার বার প্রতিক্রিয়া দিয়ে দিয়ে আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলতে চাইছেন?

(আবার কোরাস)

নগরজীবন সে তো ছবির মতো
পুঁজিবাদী স্যান্ডউইচ গোগ্রাসে গেলো
উন্নয়নকালে প্রতিবাদী মনের জানালাটা খোলা তবে বাকি
চলো এরপরে কি হয় দেখি
চলো এরপরে কি হয় দেখি

দ্বিতীয় দৃশ্য

(দুটি মানুষ, একটি ছেলে (২) একটি মেয়ে (১) হলে ভালো, নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তর খেলায় মত্ত, বির বির করছে, যন্ত্রের মতো তাদের চালচলন, অঙ্গভঙ্গি, মেয়েটি দাঁড়িয়ে একটি যন্ত্র চালাচ্ছে দেখা যায়, হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, আর ছেলেটি প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে আছে নীচে)

১ ঃ অন্ধকার কখন হয়?

২ ঃ রাত হলে!

৩ ঃ রাত কখন হয়?

২ ঃ অন্ধকার হলে।

(রিপিট করতে থাকে, একই জিনিস, বার বার, বিনয় ও অভয় প্রবেশ করে)

অ ঃ এদের দেখুন।

বি ঃ এরা একই জিনিস বার বার বলছে কেনো? এই অন্য কিছু বলো না তোমরা এই। (ওরা শোনে না)

১ ঃ রাত কখন হয়?

২ ঃ অন্ধকার হলে।

১ ঃ অন্ধকার কখন হয়?

২ ঃ রাত হলে!

বি ঃ আর আলো? (১, ২ একটু থতমত খেয়ে ওঠে, যন্ত্রের অসঙ্গতির মতো শব্দ শোনা যায়) আলো? আলো কখন হয়?

২ ঃ অন্ধকার শেষ হলে

১ ঃ অন্ধকার কখন হয়?

২ ঃ রাত হলে। (আবার একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি)

বি ঃ (অস্বস্তিতে) আর স্বপ্ন? স্বপ্ন কখন হয়?

২ ঃ (একটু থেমে) ঘুমে।

১ ঃ আর ঘুম কখন হয়?

২ ঃ রাতে?

১ ঃ আর রাত কখন হয়?

২ ঃ অন্ধকার হলে।

(চলতে থাকে, বিনয় হাজার চেষ্টা করলেও কিছু বদলায় না।)

বি ঃ এসব কি?

অ ঃ বৃত্ত

বি ঃ সে তো বুঝলাম। কিন্তু কিসের?

অ ঃ জীবনের।

বি ঃ হ্যাঁ!!!

কোরাস-

And in the naked light I saw
Ten thousand people, may be more
People talking without speakijg
people hearing without listening
People writing songs that voices never share
No one dared
Disturb the sound of silence[3]

(পেছনে কোরিওগ্রাফি)

(সেটিং পালটে যায়, একলব্য পেছনে ব্যাগ নিয়ে ঢোকে, চারিদিক একবার দেখে নেয়,

কেউ নেই, মাস্কিং টেপ দিয়ে একটা লাইন টানে মাটিতে, তারপর তার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে। জল খায়। এরপর অরেকজন ঢোকে। সে একলব্যের পেছনে দাঁড়ায়।)

২ ঃ এটাই কি লাইন?

একলব্য ঃ তাই তো মনে হচ্ছে।

২ ঃ আপনিই কি প্রথম দাদা?

একলব্য ঃ তাই তো মনে হচ্ছে।

২ ঃ আপনার কি নাম?

একলব্য ঃ তাই তো.... (নিজেকে সামলে নেয়)। একলব্য।

(এরপর আরো কয়েকজন যোগ দেয় ২-এর পেছনে, ৬-৭ জন একটা লাইনে দাঁড়ানো, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, ঠাট্টা ঝগড়া চলে, পুজোর লাইনে যেরকম হয় আর কি। অভয় এবং বিনয় লাইনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়)

(অভয় বিনয়কে বলে)

অভয় ঃ আমাদের জীবনে লাইনে দাঁড়ানোর একটা আশ্চর্য সিগ্নিফিক্যান্স আছে কিন্তু।

বিনয় ঃ তাই নাকি?

তা ঃ হ্যাঁ! জীবন মানে জি বাংলা নয় কিন্তু লাইনে দাঁড়ানো।

গ্যাসের বিল দেবেন- লাইনে দাঁড়ান।

ভিসা নেবেন - লাইনে দাঁড়ান।

ঘুষ দেবেন- লাইনে দাঁড়ান।

(বিনয় যোগ দেয়)

বি ঃ তোষামোদ করবেন? লাইনে দাঁড়ান।

পৃষ্ঠপোষকতা করবেন? লাইনে।

অ ঃ পরীক্ষায় প্রথম হবেন?

কোরাস ঃ লাইনে

অ ঃ এমনকি এখন একা পথ চলতে গেলেও লাইনে দাঁড়াতে হয়। ওখানেও ঐ ভিড় প্রচণ্ড। কারণ লাইনে আমরা দাঁড়াই কোন কারণে নয়, অভ্যাসে, নিয়মের বশে। দ্য লাইন অব কন্ট্রোল। দেখা যাক এদের জিজ্ঞেস করে।

(অভয় একটা ছোট প্যাড বের করে খুব মনোযোগ কিছু দেখতে থাকে, তারপর প্রশ্ন করে একলব্যকে)

অ ঃ কি নাম?

এক ঃ একলব্য।

অ ঃ কত টাকা বেতন পাও মাসে।

এক ঃ ১ লাখ টাকা।

অ ঃ দিনের শেষে নিজের জন্যে কত সময় থাকে?

এক ঃ ১ ঘন্টা

অ ঃ তখন কি করো?

এক ঃ ১ নম্বর হওয়ার প্রস্তুতি।

অ ঃ বাহ, আপনি স্বাগত। আসুন। (একলব্য খুব খুশী হয়ে লাইন ক্রস করে আর অভয় পরের জনকে প্রশ্ন করতে থাকে মাইমের সাহায্যে)

বি ঃ (একলব্য কে উদ্দেশ্য করে)- নমস্কার, আপনি কি ইঁদুর দৌড়ে বিশ্বাসী।

এক ঃ হ্যাঁ

বি ঃ বাহ এর কারণ জানতে পারি?

এক ঃ ইঁদুর দৌড় ছাড়া আমার মতো ছেলের অস্তিত্ব কি?

বি ঃ সেকি! এরকম কেন বলছেন?

এক ঃ ছোটবেলায় ভালো গান গাইতে পারতাম। পড়াশুনোর চাপে সেটা বন্ধ হলো। (২ লাইন ব্রেক করে বেরিয়ে যায়)

সবাই ঃ আরে আরে আরে ... হচ্ছে টা কি! নিয়ম নেই নাকি এখানে কোন? (অভয়, যে কিনা একে একে ছাড়ছিল সেও বোকা বনে যায়)

অ ঃ এই আমি জানি না, ও লাইন ব্রেক করে চলে গেলো। খাতায় এন্ট্রি পর্যন্ত করল না।

২ ঃ (বিনয়কে) আমি খব ভালো ধাঁধাঁ লিখতে পারতাম। কেউ উৎসাহ দিল না। বলল ধাঁধা লেখা আবার ক্রিয়েটিভিটি নাকি? যারা এরকম বলত তাদের জন্যে একটা ধাঁধাঁ বানিয়েছিলাম।

বি ঃ তো বলে ফেলুন।

২ ঃ এখন ভুলে গেছি।

বি ঃ বাহ আপনি তো ধাঁধার থেকেও জটিল দেখছি মশাই। (এবার আরেকজন-৩-লাইন ভেঙে বেরিয়ে যায়ঃ)

সবাই ঃ আরে আরে আরে ... হচ্ছে টা কি! নিয়ম নেই নাকি এখানে কোন?

অ ঃ (থতমত খেয়ে) এই আবারো বেরিয়ে গেলো। এখন থেকে কম লোক ডাকতে হবে। (তারপর মাইমে লাইনের বাকিদের সাথে ঝগড়া করতে থাকে)

৩ ঃ আমি খুব ভালো প্রতিমা তৈরি করতে পারতাম। মাটির ছোট, বড় হরেকরকম মূর্তি। বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোর মূর্তিও আমিই তৈরি করতাম। কিন্তু আমায় বলে দেওয়া হল যে সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির মেয়েরা নাকি মাটির মূর্তি গড়ে না। সেই থেকেই বন্ধ।
(এরকম সময় চট করে শেষে দাঁড়িয়ে ছিল সে একটা সুযোগ পেয়ে হঠাৎ সামনে এসে ঢুকে পড়ে একেবারে অভয়ের সামনে)

বাকিরা ঃ এই এই কি হল, আমরা আগে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কি হল। এই

এই এই ... (কোলাহল তৈরী হয়)

অ ঃ আপনার পরিচয়?

৪ ঃ মানি সিং।

অ ঃ দক্ষতা?

৪ ঃ লটস অফ মানি।

অ ঃ তাই নাকি? তা আপনি তো শেষে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কি করে সামনে চলে এলেন?

৪ ঃ শিয়ার লাক ।

অ ঃ শিয়ার লাক কি করে হলো?

৪ ঃ লটস অব মানি। হা হা হা।

অ ঃ আরে আপনাকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে মশাই।

৪ ঃ ইয়েস। আসলে সারা জীবন খুব স্ট্রাগল করেছি হামি। কেরিয়ারের শুরুতে বাবা আমাকে জাস্ট ১ মিলিয়ন ডলার দিয়ে সাহায্য করেছিল। ভাবতে পারছেন। জাস্ট ১ মিলিয়ন ডলার।

অ ঃ তাই নাকি? আমার বাবা তো কেরিয়ারের শুরুতে পেছনে একটা গাট্টা দিয়েছিল।

৪ ঃ Does , গাট্টা come in dollar?

অ ঃ এখনো না। তবে শীঘ্রই আসিতেছে।

৪ ঃ ইয়েস। তাই তো আই আন্ডারস্ট্যান্ড the value of money and the plight of rural India.

বি ঃ এই যে মানি সিং?

৪ ঃ ইয়্যো। (লাইন ক্রশ করে এগোয়)

(বাকিরা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই আর। এক ধরনের ঔদাসিন্য গ্রাস করছে এদের।)

বি ঃ আপনার কি মতলব?

৪ ঃ সিম্পল। টাকা মাটি মাটি টাকা।

বি ঃ আরে এটা তো একজন মহাত্মা বলেছেন।

৪ ঃ হ্যাঁ বলেছেন তো। আর আমি এটা পালন করছি। টাকা মাটিতে আর মাটিতে টাকা। (মাটি ঠুকে ঠুকে দেখায়)

বি ঃ মানে আপনি ল্যান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেন তাই তো?

৪ ঃ ইয়েস। টাকা মাটি... (দেখায়)

বি ঃ আরে আপনি ঠিক বোঝেন নি। ওটার মানে আলাদা। উনি মাটি বলতে ...

৪ ঃ আরে মতলব কৌন জাননা চাহতা হে ভাইয়া। আমি যেটা বুঝেছি ওটাই

রিয়েলিটি। আর এই গরীবরা এতো জায়গা দিয়ে করবে টা কি? এতো ল্যান্ডস ওদের জিম্মায়। আমি দেশের জন্যে খরিদ করছি। ওদের পয়সা দিয়েছি। দেশের লিয়ে কাজ করব। প্রফিট কামাবো।

বি ঃ কিন্তু সে তো আপনার প্রফিট।

৪ ঃ তো আমার প্রফিট দেশের প্রফিট না? আমি দেশের লোক না?

বি ঃ কিন্তু

৪ ঃ কিন্তু পরন্তু নেই। হম আতা হায়। (প্রস্থান করতে যায় অমনি লাইন থেকে বেরিয়ে ঘোমটা মাথায় এক তরুণী খপ করে ওর হাত ধরে, বাকিরা মেয়েটিকে থামানোর চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, হতাশ হয়ে লাইনে দাঁড়ানো সবাই প্রস্থান করে)

৫ ঃ আমাদের যে জমি আপনি নিয়েছেন সেটা আমাদের ফিরিয়ে দিন বাবু।

৪ ঃ হোয়াই? আর ইউ স্টুপিড? কিনেছি আমি সেটা।

৫ ঃ না। আমরা বার বার বলেছি আমাদের টাকার দরকার নেই। আপনার টাকা দিয়ে আমাদের কিছু হবে না। আপনি জোর করে ...

৪ ঃ লিসেন, ইউ ডার্টি আগলি ফেলো, আমি লিজ নিয়েছি এই জায়গাটা কেমন। আমার অনেক টাকার ইনভেস্টমেন্ট আছে। আমাকে কি ক্রেজি ডগ বাইট করেছে যে সেটা আমি দিয়ে দেবো?

৫ ঃ এই জমি, আমাদের। আমাদের মান-ইজ্জত জড়িয়ে এই ভূমির সাথে। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ভবিষ্যৎ?!

৪ ঃ ইয়েস! ভবিষ্যৎ ইজ ব্রাইট! রাইট ইউ আর!

৫ ঃ বাবু যেয়ো না । বাবু ...

(৫ এসে বিনকে ধরে)

৫ ঃ বাবু আমার কথা শোন।

বি ঃ কি তোমার সমস্যা? কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলো।

৬ ঃ (কথা বলে, কিন্তু আওয়াজ শোনা যায় না, মাইম করতে থাকে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলে, কিন্তু আওয়াজ নেই।)

বি ঃ কি বললে, কি কি? আমি তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না কেন?
কি বলছ? অভয় আমি এর কথা শুনতে পাচ্ছি না কেন? (খুব চেষ্টা করে শোনার)

অ ঃ তুমি শুনতে পাচ্ছো না কারণ তুমি শোনার ক্ষমতা হারিয়েছ। তুমি মাটির থেকে বহু দূরে, বিনয়। অনেকেই অবশ্য তাই। তোমার একার দোষ না। তোমার সমস্ত শিক্ষা নিয়ে তুমি চরম স্বার্থপরের মতো নিজেকে অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছ। আস্তে আস্তে কোনও বিষয়ের গভীরে ঢোকার ক্ষমতা তোমার লোপ পেয়েছে। এই ঘুপচির মতো ক্ষুদ্র জ্ঞান তোমায় আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে

রেখেছে। তুমি একদম একা হয়ে গেছ, বিনয়। বাঁচার উদ্দেশ্য পর্যন্ত ভুলেছ।

বি ঃ কি বলছ কি তুমি। আমি বাঁচার উদ্দেশ্য জানি না?

অ ঃ না জানো না।

বি ঃ বাঁচার উদ্দেশ্য সুখ।

অ ঃ না

বি ঃ বাঁচার উদ্দেশ্য আরাম।

অ ঃ না।

বি ঃ তাহলে বাঁচার উদ্দেশ্য কি?

অ ঃ বাঁচা।

বি ঃ (অসহায়ভাবে) কিন্তু।

অ ঃ চোখ খোলো। তুমি তো সত্য দেখতে চেয়েছিলেন। এখনো শেষ হয় নি। (হ্যাচকা টানে)

(৫ ফিরে যায়- একটা ফরমেশন তৈরী করে লাইনে যারা আগে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সাথে মিলে। তারপর কোরাস একসাথে গেয়ে ওঠে)

এতো কাছে তবু অচেনা
মুখে আজ কিছু রোচে না
বাড়ালেই হাত পাওয়া যায়
সংশয় তবু ঘোচে না
হতে পারে এটা অভিনয়
তবু এই টুকু মন্দ নয়।।
এখনো হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়
ছোঁয়া যায় আঙুলের পেলবতা[4]

(বিনয় একদিকে বসে ওদের হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করে, ওরাও বিনয়ের আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। গান শেষ হয়।)

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

(মিছিল শুরু হয়, প্লেকার্ডে নানা ধরণের শ্লোগান, মাথায় m.i.g.a টুপি। ৭-৮ জন মিছিলে হাঁটছে। সঙ্গে মানান সই মার্চবিট)

১ ঃ We don't need nuclear weapons. We have internet,

২ ঃ think- it is not illegal yet,

৩ ঃ স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি, প্রগতি। আমাদের তিন দাবী।

১ ঃ সুশিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, চলমান অর্থনীতি। আমাদের তিন দাবী।

৫ ঃ তাহলে টোটাল কয় দাবী হল?
২ ঃ ছয়, ছয়, ছয়।
৪ ঃ অনিয়ম অনিয়ম অনিয়ম। চারিদিকে অনিয়ম।
১ ঃ হ্যাঁ, বিশৃঙ্খলা।
২ ঃ মগজে কারফিউ।
১ ঃ এসব কিছুর থেকে মুক্তি চাই।
৩ ঃ দূরে আকাশে আলোর রোশনাই।
১ ঃ ছোঁয়া যাবে?
২ ঃ ছুঁতে পারবো?
৪ ঃ ছোবোই।
১ ঃ Make india
২ ঃ great AGAIN
১ ঃ make india
২ ঃ great AGAIN

সামনে গেলে মিগা
পেছনে গেলে মিগা
পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ
মিগা মিগা মিগা

(হঠাৎ একটা আওয়াজ হয়। বড় গং। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকে ওদিকে পড়ে যায়। একাট গোলাকার বৃত্ত তৈরী হয়। মাঝখানে ছেড়ে ওরা বুকে ভর দিয়ে এগোনোর চেষ্টা করে। গোল তৈরি করে। বিনয়ও রয়েছে এই বৃত্তে। সবাই যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। একজন লোক[5] -১- মাঝখানে লাফ দিয়ে এসে একটি ডান্ডা নিয়ে দাঁড়ায় । চোখে তার পৈশাচিক দৃষ্টি। খোঁচা দেয় মাঝে মধ্যে। নেচে নেচে। একটা হামিং শোনা যায়। দর্শকদের সেই লোকটি বলে। কোরাস মাটিতে ঘুরতে থাকে, বুকে ভর দিয়ে)

১ ঃ আপনারা Tower of Babel - এর গল্প শুনেছেন ? সেই গল্পে লেখা আছে, যে জগতের শুরুর কালে, পৃথিবীতে সব মানুষেরাই এক ভাষায় কথা বলতো। তখন সবাই মিলে ঠিক করল যে একটা স্তম্ভ বানাবে যেটা গিয়ে ঠেকবে স্বর্গে। তো সবাই লেগে পড়ল কাজে। আর সবার যেহেতু এক ভাষা তাই তাদের মধ্যে একটা মানসিক সংযোগ ছিল। আস্তে আস্তে, আকাশ ভেদ করে সেই স্তম্ভ ওপরের দিকে উঠতে লাগলো, স্বর্গের উদ্দেশ্যে। দেবতারা দেখলেন ভারী বিপদ। এভাবে চলতে থাকলে তো এই মানবজাতি স্বর্গে এসে উপস্থিত হবে। তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে। তখন ওরা করলেন কি, মন্ত্রবলে ওদের সবার ভাষা আলাদা আলাদা করে দিলেন এবং তাদের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন। তারপর কেউ কারোর কথা

বুঝল না, আর কোনদিন ওরা এক হতে পারল না, স্বর্গের দ্বারও বন্ধ হলো চিরজীবনের জন্যে। এখন ভাষার জায়গায় সংযোগের জায়গা হচ্ছে, অনুভূতি ভাবনা। সেই জায়গায় আঘাত করতে হবে। ওদের ভাবতে দিলে চলবে না, অনুভব করতে দেওয়া যাবে না, ওদের বোঝাতে হবে যে TO FEEL IS TO DIE.... TO THINK IS TO DIE..... তবেই পাওয়া যাবে TOTAL CONTROL ! হা হা হা হা হা হা।

১ ঃ (খোঁচা দিয়ে) তুমি কে?

২ ঃ কৃষক

১ ঃ তোমার কি দাবী?

২ ঃ শস্যের ন্যায্য মূল্য।

লোক ঃ পাবে। (বলে খোঁচা দেয়। কৃষক যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে)

১ ঃ আরেকজনকে। তুমি কে?

৩ ঃ ছাত্র

১ ঃ তোমার কি প্রয়োজন?

৩ ঃ উচ্চ শিক্ষা।

১ ঃ খোঁচা দিয়ে - পাবে।

(১ নেচে নেচে এক ধরণের আদিম নাচ নাচে আর খোঁচা দিতে থাকে আর হাসতে থাকে।)

১ ঃ তোমার কি দরকার মেয়ে?

৪ ঃ নিরাপদ একটি সমাজ।

১ ঃ পাবে। (বলে খোঁচা দেয়।) আর তুমি?

৫ ঃ আমি শ্বাস নিতে চাই। I want to breathe.

১ ঃ পারবে। (খোঁচা দেয়।)

৬ ঃ সিটিজেন।

১ ঃ কি চাও।

৬ ঃ Make in India Great Again

১ ঃ ইন্ডিয়া তো আগে থেকেই গ্রেট। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস। তাকে আবার গ্রেট কেন করতে হবে। যেমন আছে সেরকমই থাকবে।

২ ঃ কোভিডের ভ্যাক্সিন?

১ ঃ পাবে

৩ ঃ সমমর্যাদা।

৪ ঃ সুন্দর একটি সকাল।

৫ ঃ অতৃপ্তির অবসান।

৬ ঃ যুক্তি

৩ ঃ সেকুলারিটি

১ ঃ সব পাবে। আর কি চাও?

বিনয় ঃ এই শাস্তি থেকে মুক্তি।

১ ঃ কি বললি?

বি ঃ এই শাস্তি থেকে মুক্তি।

১ ঃ কি বললি?

বি ঃ এই শাস্তি থেকে মুক্তি।

১ ঃ শালা... (জোড়ে জোড়ে খোঁচা দেয়।)

(১-এর প্রস্থান)

(যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে সবাই, বিনয় এদেরই মধ্যে একজন ছিল। সে এবার আস্তে আস্তে ওঠে। চারিদিকে তাকায়, মৃতদেহের স্তূপ। প্রায় প্রত্যেকটা মৃতদেহের পাশে গিয়ে কোন সাড়া পাওয়া যায় কিনা। অভয় ঢোকে)

বি ঃ এ কি?

অ ঃ সভ্যতার সংকট।

বি ঃ আর যে নেওয়া যাচ্ছে না।

অ ঃ কেন? তুমি তো সত্যি দেখতে চেয়েছিলে। যুদ্ধের শেষ কেবল মৃতদেহরাই দেখে বিনয়।

বি ঃ হ্যাঁ চেয়েছিলাম। কিন্তু এ কিরকম সত্যি?

অ ঃ আসলে আমরা নিজেরা যেমন চাই সেরকম করে আমাদের সামাজিক সত্যিগুলোকে গুছিয়ে নিয়েছি। আমাদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, অভিমান সমস্ত কিছুই সেই সত্যির অন্তর্গত, কিন্তু খুব একপেশে সেই সত্যি। প্রচণ্ড মিশেল সেই সত্যিতে। আমাদের সমাজে বর্বরতা কিরকম দাত নোখ বের করে বিভীষিকা বিস্তার করতে ব্যস্ত তুমি দেখতে পাচ্ছো না?

বি ঃ হ্যাঁ এই মানব যন্ত্রণার মহামারী আমাদের সভ্যতার মজ্জাগত একটি সত্য হয়ে উঠেছে। দিগ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে এই মহামারী, বাতাস বিষিয়ে তুলেছে, আমাদের মন কলুষিত করেছে। করোনা ভাইরাস তো একটি উপলক্ষ্য মাত্র। আজ আমরা বাস্তবে যা দেখতে পাচ্ছি। যা অনুভব করছি যে বিলাপ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে প্রত্যেকটা আলোচনায়, আড্ডায় সেগুলোর জন্য দায়ী কে?

অ ঃ দায়ী কে?

বি ঃ তুমি জানো না?

অ ঃ না বিনয়। আমি জানি না। এটা জনতেই তোমার সাথে এতটা পথ হেঁটে এসেছি। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল নরক দিয়ে, থ্রু ইনফার্নো, তারপর এই

যা দেখলাম তা পার্গাটোরি। আমাদের এই যাত্রার শেষভাগে আমরা হয়ত চলে এসেছি। (মৃতদেহের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যায় ওরা)

(ক্লান্ত পিয়ানো বাজে, দূরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে)

বি ঃ ওই দেখো। ও কে?

অ ঃ আমাদের গন্তব্য হয়ত।

(মৃত্যুঞ্জয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে)

অভয় ঃ আমি অভয় আর ও বিনয়। আর আপনি?

হিয়া ঃ আমি মৃত্যুঞ্জয়।

(অভয় আর বিনয় একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।)

হিয়া ঃ আমার মৃত্যুঞ্জয় নাম নিয়ে সংশয়বোধ থাকলে হিয়া ডাকতে পারেন।

বিনয় ঃ বাহ। হিয়া। সুন্দর নাম।

হিয়া ঃ আপনারা কেন এসেছেন আমি জানি। উত্তর খুঁজতে তো? উত্তর আমার জানা নেই তবে আমিও আপনাদের মতো এতক্ষণ যাত্রা করেই এসেছি।

বিনয় ঃ বলার মতো কিছু পেলে? আসল সত্যিটা কী, জানতে পারলে?

হিয়া ঃ আসল সত্যি একটা কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হয়েছে আপনার?

বিনয় ঃ তবে?

হিয়া ঃ আমার মনে হয়েছে সত্য কি তা একটা ধারণা বা চিন্তায় লুকিয়ে নেই। সত্য সামগ্রিক একটা বোধ। এই যে যাত্রা করে এসেছেন, যা অনুভব করেছেন এতক্ষণ এগুলোই সত্য। এগুলোই বাস্তব। সত্য, সেতো স্থির আবার সে বাতাসের মত ছড়িয়ে আছে আশে পাশে, সব জায়গায়। সত্য আছে গ্রহণে, সত্য আছে বর্জনে। হেঁয়ালির মতো মাঝে মাঝে আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। আমাদের আসলে তাঁকে ধরার মাধ্যমটুকু জানা নেই। চারিদিকে এতো স্তরে স্তরে মিথ্যে, ভনিতা, আড়াল। এগুলো সরিয়ে আসল সত্যকে খোঁজা বড় কঠিন। ধরে নেওয়া যাক, এই যে পথ পেরিয়ে এলেন, এই পেরিয়ে আসা টুকুই সত্য।

(আস্তে আস্তে মৃতদেহগুলো উঠে দাঁড়ায়, লাইন দিয়ে হাঁটতে থাকে, হেঁটে হেঁটে দর্শকদের মধ্যে মিশে যায়)

বিনয় ঃ এরা কারা?

হিয়া ঃ এরা মহামানব। সমস্ত ধরণের যন্ত্রণার, অপমানের, ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়ে এসেছে এরা দহন করেছে নিজেদের, শোধন করেছে নিজের আত্মাকে। এরাই আমাদের পরিত্রাতা। এরা নবজীবনের আশ্বাস। এরা নতুন যাত্রার জন্য তৈরি, জীবনের মহৎ মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে এরা লড়বে। এরা বিনয়, এরা অভয়, এরা মৃত্যুঞ্জয়। এদের গান আমরা গাইব, যে গান এরা শেখাবে সীমান্তবিহীন দেশে

দেশে গিয়ে শিশু কিশোরদের। ধরুন।

অ/ব ঃ আমি?

হিয়া ঃ হ্যাঁ। এই নিন গীটার

অ ঃ আমি পারবো?

হিয়া ঃ পারবেন।

গান

ওই তুমি অন্ধকারের পরে আলোর কাছে এসে জাগো
ওই বিহানকালের শিশিরের অভ্যেস হয়ে জাগো
জাগো আমার মনে
জাগো আমার সাথে
জাগো মোর শিরায় শিরায়
মনের সুরে গাঁথা
তোমার প্রেমের ভাষা
জাগাও মন জাগাও তারে
কখনো হৃদয় জুড়ে হারানো গানের সাড়া
শুনে মন বিলাপমাখা ভাবনায় যে শব্দহারা
আমি দাঁড়িয়ে যেন স্মৃতির মুখোমুখি
সত্যের পরিচয়ে পৃথিবীকে মাপি
তোমার আমার এই পথ তো কেবলই সত্যি
ওই তুমি হেমন্ত রোদ হয়ে পরশ দিয়ে চলে যাও
ওই তুমি আঁধার পথে আলোর সম্মতি দিয়ে যাও
জাগে আমার মনে
জাগো আমার সাথে
জাগো মোর শিরায় শিরায়
মনের সুরে গাঁথা
তোমার প্রেমের ভাষা
জাগাও মন জাগাও তারে।

---

[1]. যে কোন জীবনমুখী গান হতে পারে। ত্রিপুরা থিয়েটারের প্রযোজনায় কবীর সুমনের ‘আজ জানালার কাছে ডেকে গেছে এক পাখির মতন সকাল’ গানটি গাওয়া হয়েছে।

[2]. Ola, Uber- এর মতই পরিবহনকারী সংস্থা। আগরতলায় জনপ্রিয়।

[3]. আমেরিকান ফোক-রক ডুও সাইমন ও গারফাঙ্কেলের বিখ্যাত গান Sound of Silence- এর একটি অংশ।

[4]. আমেরিকান ফোক-রক ডুও সাইমন ও গারফাঙ্কেলের বিখ্যাত গান Sound of Silence- এর অনুপ্রেরণায় তৈরী বাংলা ব্যান্ড চন্দ্রবিন্দুর গানের একটি অংশ।

[5]. ত্রিপুরা থিয়েটারের প্রযোজনায়, অভয়ের চরিত্রে যে অভিনয় করেছে সে-ই এই লোকটির (১) চরিত্রে অভিনয় করে। কারণ পরিচালক চেয়েছেন যে বিনয় এবং অভয় দুজনেই যেন এই process-এর মধ্যে নিয়ে যায়।

ঋণ স্বীকার ঃ-

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। Dante Alighieri,

৩। শঙ্খ ঘোষ- (প্রতিক্রিয়া কবিতা)

৩। বাদল সরকার (বীজ নাটকের কিছুটা)

৪। চন্দ্রবিন্দু এবং Simon and Garfunkel.

লেখক ঃ **বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য,** এম.ফিল গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

ত্রিপুরা থিয়েটারের সদস্য সদস্যাগণ

শুভ্রাংশু চক্রবর্তী - উপদেষ্টা

বিভু ভট্টাচার্য- সভাপতি

শেখর সি দত্ত - সহ সভাপতি

গায়ত্রী চৌধুরী- সহ সভানেত্রী

কমল মজুমদার- সম্পাদক

শ্যামল কান্তি দে- সহ সম্পাদক

বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য- সহ- সম্পাদক

অপূর্ব সাহা- অফিস সম্পাদক

শ্যামলিমা দে- সহ অফিস সম্পাদিকা

মিহির ভট্টাচার্য- কোষাধ্যক্ষ

দেবব্রত মুখার্জী- কার্যকরী সদস্য

শুভঙ্কর ভট্টাচার্য- কার্যকরী সদস্য

মৃণাল কান্তি চ্যাটার্জী- সদস্য

শিল্পী ভট্টাচার্য- সদস্যা

সবিতা ভট্টাচার্য- সদস্যা

মণিদীপা রায়- সদস্যা

কণকনা মজুমদার - সদস্যা

সুপ্রিয়া চৌধুরী- সদস্যা

সাগরিমা দে- সদস্যা

অভিজিৎ ভট্টাচার্য- সদস্য

দিবাকর ভৌমিক- সদস্য

গঙ্গোত্রী মুখোপাধ্যায়- সদস্যা